গল্পমালা ৩

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭১

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

এইচ. পি. রায় এ্যাণ্ড কোম্পানী

৭৩/এ আমহার্স্ট রো

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

গৌতম রায়

সূচী

লেখক পাঠক প্রসঙ্গ

এখনকার কালের গতি বড় দ্রুত। রুচিও তাড়াতাড়ি বদলায়। কোন এক বিশেষ লেখকের পক্ষে সেই রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা কঠিন। দু চার বছর যেতে না যেতেই পাঠকের কাছে তাঁর প্রিয় লেখকের লেখা একঘেয়ে লাগতে থাকে। তিনি লেখকের রচনার মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ পান না। বিষয়ে ভঙ্গিতে উপকরণে প্রকরণে লেখকের পরবর্তী লেখা তাঁর পূর্ববর্তী লেখার অনুকরণ বলে মনে হয়। নীরস লাগে। প্রৌঢ় প্রবীণ লেখক তাঁর যৌবনের উত্তাপ তাঁর রচনার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন না। দিতে গেলে তা হাস্যকর হয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রচনায় ভাবানুতার পরিবর্তে ভাবুকতা আসে। প্রাণ চাঞ্চল্যের অভাবের ক্ষতিপূরণ অন্যভাবে হয়। কিন্তু বেশির ভাগ পাঠকই ধৈর্য আর সহানুভূতি নিয়ে পড়তে চান না। পড়তে পারেন না। বিশেষ বিশেষ লেখক সম্বন্ধে তাঁদের এক বিশেষ ধরনের পরিতৃপ্তির প্রত্যাশা থাকে। তা যখন মেটে না তখনই তিনি বিরূপ হন। লেখকের রচনার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন তাঁদের চোখে বড় একটা পড়ে না। বাইরের সাদৃশ্যই তাঁদের বেশি পীড়া দেয়।

যাঁরা অনেকদিন ধরে অনেক পরিমাণে লেখেন অথচ যাঁরা অসামান্য প্রতিভার—প্রতিভা নাই বা বললাম—দক্ষতা কুশলতার অধিকারী নন তাঁদের এই দুর্ভাগ্য বহন না করে উপায় নেই।

আমার পূর্ববর্তী অনেক প্রিয় লেখকের অধুনাতম লেখা যেমন আমার উপভোগের সীমার বহির্ভূত তেমনই আমার অনুবর্তীরাও আমার লেখা সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেন এই অপ্রিয় সত্য আমার অননুমেয় নয়। প্রত্যেক লেখকই তাঁর নিজের লেখার বিষয় আর রীতির মধ্যে আবদ্ধ। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাঁর সাহিত্য রুচি তাঁর নিজের রচনার রীতি আর রূপের শাসন মেনে চলে। এর ব্যতিক্রম কদাচিৎ দেখা যায়। প্রবীণ নবীন অনেক লেখকই আমার রচনায় আনন্দ পাবেন না একথা মেনে নেওয়া ভালো। প্রত্যেকেই নিজের রচনার সাদৃশ্য ও স্বাধর্মকে পছন্দ করেন। দু একজনের বেলায় কি দু একটি অসামান্য রচনার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

তবু আমরা সাধারণ পাঠকের চেয়ে যিনি লেখক তাঁর রসোপভোগের ওপর বেশি নির্ভর করি। যিনি লেখক তিনি ভাষায় আত্মপ্রকাশের রহস্য—তার আনন্দ আর যন্ত্রণার সঙ্গে বেশি পরিচিত। শব্দের ছাঁচ, বাক্যের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি যত জানেন একজন অলেখক তা জানেন না। যে শ্রোতা নিজেও গায়ক তিনি যেমন গানের সমঝদার হতে পারেন একজন অগায়ক শ্রোতা তেমন পারেন না। কিন্তু আশ্চর্য একজন লেখকই তাঁর আর একজন সমসাময়িক লেখকের সবচেয়ে অনুদার সমালোচক। তাঁর সহিষ্ণুতা নেই, গ্রহিষ্ণুতা নেই। কারণ তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টির জালে আষ্টে পৃষ্টে জড়ানো, নিজের সৃষ্টির বাইরে বেশির ভাগ রচনাই তাঁর কাছে অনাসৃষ্টি, অপসৃষ্টি। লেখা যে কী দুরূহ, কত আয়াসসাধ্য, কথা আর মনকে বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো যে কী কঠিন তা তিনি লেখার আসন ছেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভুলে যান। তখন তিনি নির্মম সমালোচক ছাড়া আর কেউ নন। তিনি অতি মাত্রায় একনিষ্ঠ আত্মনিষ্ঠ বলেই কি তাঁর এই সীমাবদ্ধতা? তাহলে কার রুচি, কার রসবোধের ওপর নির্ভর করব?

যিনি লেখক নন, কিন্তু বিদগ্ধ পাঠক তাঁর ওপর। যাঁর রুচি বহু পাঠাভ্যাসে পরিশীলিত। নানা দেশের নানাকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় নিবিড়। শুধু তাঁরই বিচার-বুদ্ধি দিয়ে আমি নিজের লেখা যাচাই করে নিতে পারি। কিন্তু তেমন পাঠকের দেখা পাওয়া কঠিন, আমার লেখা তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া কঠিনতর। তাঁর অস্তিত্বে আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাসী কিন্তু আমার অচেনা মহলে তাঁর বাস, আমিও তাঁর অজ্ঞাত লোকের বাসিন্দা।

হলদে বাড়ি

চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে পড়ছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মখমলে ঢাকা।

আর গলন্ত মোমের মতই নরম অঞ্জনার হাত। আঙুলগুলি এমনভাবে জড়িয়ে আছে চিন্ময়ের আঙুলের সঙ্গে যে, চিন্ময়ের মনে হচ্ছে হাত ছাড়িয়ে নিলেও গলানো মোম তার হাতে জড়িয়ে থাকবে। হাত অবশ্য ছাড়িয়ে নিল না চিন্ময়, অঞ্জনার হাত সুদ্ধু তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল।

কয়েকজন লোক অঞ্জনার একেবারে ডান কাঁধ ঘেঁসে চলে গেল। কোন রকমে কাঁধটা সংকুচিত করে স্পর্শ বাঁচাল অঞ্জনা।

"দেখেছ, রাস্তায় কি ভিড়!"

চিন্ময় বলল, "অন্তত চারগুণ লোক বেড়েছে কলকাতায়।"

"আরো বেশি, আরো বেশি, কিন্তু যাই বল, এবার সত্যি সত্যি কসমোপলিটান শহর হয়ে উঠল কলকাতা। আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান সব এসে তাঁবু পেতেছে, না আছে এমন দেশ নেই। বেশ লাগে আমার, শুধু যদি ওদের চেহারাটা অত কুৎসিত না হতো।"

চিন্ময় হাসল, "ভারি একটা আফসোসের কথা বটে।"

অঞ্জনা বলল, "দেখ যুদ্ধ জিনিসটা আমার কাছে যে খুব অপছন্দের তা নয়। কিন্তু এখনকার মারণাস্ত্রগুলি বড় অসুন্দর। তরোয়ালের মত সূক্ষ্ম ধারালো ঝক্‌ঝকে নয়। বড় স্থূল, জটিল সব যন্ত্র। অনেকখানি জায়গা জুড়ে সব পড়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্র তাই সমস্ত পৃথিবী না জুড়লে তার চলল না।"

চিন্ময় বলল, "হ্যাঁ, প্রাসাদের জানালা খুলে বসে বসে দেখবে, তারপর বিজয়ীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে বরমাল্য দেবে ছুঁড়ে তার উপায় নেই। এ যুদ্ধে বরং সভয়ে জানলা দরজা বন্ধ করে রাখতে হয়, কখন বোমার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে। বড় প্রোসেইক।"

অঞ্জনাও হাসল, "তা ছাড়া কি, ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের তলোয়ার, আর প্রবালের মত গাঢ় টকটকে লাল রক্ত, ভেবে দেখ তো কি সুন্দর, কোন বাহুল্য নেই, সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্নতা। সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্যি বলা যায়, মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান, এদিক থেকে সেকালই আমার পছন্দ।"

চিন্ময় হাসল, "তোমার পছন্দের তারিফ করছি। তবে ওটা কিন্তু সেকালও নয় একালও নয়, কেবল যাত্রার কাল।"

অঞ্জনা মুখ ভার করল, "বেশ বেশ, যাত্রাই হলো, ভারি তো ঐতিহাসিক। কেবল তথ্য খুঁটে খুঁটে গেলে। তার চেয়ে বেশি করতে পারলে না।"

চিন্ময় বলল, "মাবাত্মক আঘাত হেনেছ এবার। সন্ধি প্রার্থনা কবছি।"

অঞ্জনা হাসল, "বিনা শর্তে তো?"

চিন্ময় বলল, "না, একেবারে বিনা শর্তে নয়, দু-একটা শর্ত আছে।"

পথ দিয়ে যেন ওরা হেঁটে যাচ্ছে না, হাওয়ায় ভেসে চলেছে। রাস্তায় ভিড় এখনো আছে। ট্রাম বাস আর ট্যাক্সি চলছে সশব্দে। পেভমেন্টের ওপর স্থানে স্থানে কতকগুলি লোক হাত পা জড়ো ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। অভ্যাসবশে তাদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ছে চিন্ময়, আর তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে অঞ্জনা। দু'পাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নায় ভিজে উঠেছে। কিন্তু বর্ণ গন্ধ ধ্বনি ভরা এই পরিচিত পৃথিবী ওদের কাছ থেকে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুতে মিলিয়ে আছে শুধু একটা অশরীরী সৌরভ, বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট সেতারের মধুর একটা টান। কিন্তু আরো খানিকটা এসে একটা গলির মোড়ে এই জ্যোৎস্নার সমুদ্রের মধ্যে কদাকৃতি এক কুমীরের পিঠ ভেসে উঠল অঞ্জনার চোখের সামনে।

রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে গলির মধ্যে ডানদিকে বড় একটা ডাস্টবিন। তারই ভিতর আকণ্ঠ ঝুঁকে পড়ে একটা লোক দু'হাতে কি ঘাঁটছে, তার পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে লোকটা মুখ তুলে তাকাল। হাতে তার কিছু ওঠেনি। কেবল তরল খানিকটা জিনিস দু'হাতে

জড়িয়ে গেছে। তাতে জিভ লাগিয়ে একটু চেটে লোকটিও মুখ বিকৃত করল। তারপর অঞ্জনাকে দেখে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে দু'হাতে তার জানু পর্যন্ত জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ডটি ঘটে গেল। চিন্ময় কি অঞ্জনা বাধা দেওয়ার অবকাশ পর্যন্ত পেল না। দু'জনেই মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অঞ্জনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ছি ছি ছাড়ো ছাড়ো।"

প্রত্যুত্তরে লোকটি অঞ্জনার জানু দুটি আরো আঁকড়ে ধরে প্রায় নিজের বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল, তারপর ঊর্ধ্বে অঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কি বলল বোঝা গেল না।

অঞ্জনা আবার অসহায়ের মত বলল, "ছাড়ো ছাড়ো।"

পাশ থেকে চিন্ময়ও ধমক দিয়ে উঠল, "এই ছাড়, ছাড় শিগ্গির।"

লোকটি যেন ভ্রূক্ষেপই করল না, বার দুই জুতার ওপর মুখ রাখল অঞ্জনার, তারপর আবার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। তার মুখের বিকৃত ভঙ্গিতে কেবল বোঝা গেল সে কাঁদতে চাচ্ছে।

অঞ্জনা তিরস্কারের কণ্ঠে চিন্ময়কে বলল, "তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল মজাই দেখবে ?"

এবার চিন্ময় বাহু ধরে লোকটিকে ছাড়িয়ে নিল। ধমক দিয়ে বলল, "দূর থেকে চাইতে পারিসনে ? পা ধরতে গেলি কোন সাহসে ?"

অঞ্জনা বিরক্তকণ্ঠে বলল, "থাক্ থাক্ বীরত্ব খুব দেখা গেছে। এবার কিছু দিয়ে ওকে বিদায় করে দাও।"

চিন্ময়ও নিরুত্তরে গম্ভীর মুখে ব্যাগ খুলে একটা সিকি ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে।

আরো খানিকটা পথ হন্ হন্ করে এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় থামল। পরমুহূর্তে চিন্ময় গিয়ে আলগোছে অঞ্জনার কাঁধে হাত রাখল।

অঞ্জনা শিউরে উঠে কাঁধটাকে সংকুচিত করল, "ছি, ছুঁয়ো না, আমার সমস্ত গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে স্নান না করে নিলে আর ভালো লাগবে না। আর তুমিই বা কি রকম, ঐ হাত দিয়েই না লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছিলে—আর সেই হাতই আমার কাঁধে রাখছ ?"

এ সময় কথা কাটাকাটি করলে ফল আরো খারাপ হয়। চিন্ময় গম্ভীর মুখে হাতটা সরিয়ে নিল।

অঞ্জনা এবাব কোমলকণ্ঠে বলল, "আর হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। এখনো বেশ খানিকটা পথ। একটা ট্যাক্সি ডাকবে ?"

চিন্ময় বলল, "এখনই ডাকছি। অনেক আগেই ডাকা উচিত ছিল।"

ট্যাক্সিতে উঠে অঞ্জনা বেশ একটু ফাঁক রেখে সরে বসল। আবার বলল, "ভারি গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। বাড়ি গিয়ে ভালো করে চান করে ফেলতে হবে।"

শুচিতার বাড়াবাড়িতে অদ্ভুত শুচিবায়ুতা দাঁড়িয়ে গেছে অঞ্জনার। ঠিক ওর ঠাকুরমার মত। ওর মাও নাকি এমনি ছিলেন শোনা যায়।

যেন একটা বাংলা দৈনিক থেকে উদ্ধৃত করছে এমনভাবে চিন্ময় বলল, "ওদের সব এখন হাসপাতালে পাঠান হচ্ছে !"

অঞ্জনা বলল, "তাই তো দেখছি কাগজে।"

তিন চার মিনিটেব মধ্যে বাড়িব সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে সাদা একখানা জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে। আসলে রঙ এই জাহাজী প্যাটার্নের বাড়িখানার সাদা নয়, হাল্কা হলদে। রাত্রে এমন দেখাচ্ছে ! ধবধবে সাদা রঙ পছন্দ রমলার, কিন্তু অঞ্জনা ভক্ত হলুদ রঙের, সোনালি হলুদ।

ক্ষিতীশবাবু ছোট মেয়ের পছন্দমত রঙই দিয়েছেন বাড়িখানায়। আর রমলার পছন্দ অনুযায়ী রঙ রাত্রে হয়ে যায়।

হলদে রঙ পছন্দ অঞ্জনার। জানালা দরজায় হলদে রঙের পর্দা, ফুলদানির ফুল আর কাঁচের আলমারির সারিগুলি প্রায়ই সব হলদে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গম্ভীর মুখে দু'জনে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলো।

ডান দিকের আর একটা ঘরে ক্ষিতীশবাবু ঝুঁকে পড়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা বই লিখছেন। পেন্‌সনের পর যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারি কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ক্ষিতীশবাবু, ঘরের দেওয়ালগুলিতে নানা দেশের বড় বড় মানচিত্র, আলমারিগুলিতে মোটা মোটা বই। সাময়িকপত্রে বিভিন্ন ছোট ছোট আর্টিকেল লিখে এবার একটা বড় বইয়ে তিনি হাত দিয়েছেন—তাই নিয়েই ব্যস্ত। কাল তাঁর তেষট্টিতম জন্মতিথি গেছে। সেই উপলক্ষে মেয়ে, জামাই আর ভাবিজামাই চিন্ময় এসেছেন। আজও তাঁদের যেতে দেননি। রবিবার অফিস আদালত সবই তো বন্ধ, কি এমন কাজকর্ম থাকতে পারে, যা থাকে কাল করলেই চলবে।

তেতলার বড় রুমটায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট টানছেন অর্জুনবাবু। রমলা শঙ্কিত মুখে বারবার দোরের কাছে আসছেন আর ফিরে গিয়ে বসছেন।

দোরের পাশে এসে দু'জনে দাঁড়াতেই অর্জুনবাবু বললেন, "এই যে এসেছ, তোমার দিদি তো অস্থির হয়ে উঠেছেন এরই মধ্যে।"

অঞ্জনা বলল, "অস্থির হবার কি আছে, আসছি।"

তারপর পুবদক্ষিণ কোণে তার নিজের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

অর্জুনবাবু বললেন, "কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন ছদ্ম গাম্ভীর্য কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মিলে পরামর্শ করে এসেছ বুঝি?"

রমলা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "অঞ্জু ওভাবে মুখ গম্ভীর করে চলে গেল যে? রাস্তায় কোন কিছু ঘটেনি তো?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকালেন রমলা।

চিন্ময় ভারি বিরক্তি বোধ করল। এই ডিটেকটিভগিবির কি মানে হয়? তারপর অর্জুনবাবুর দিকে চেয়ে চিন্ময় জবাব দিল, "কি আবার ঘটবে। একটি লোক হঠাৎ অঞ্জনাকে পথের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল।"

আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন রমলা। কিন্তু অর্জুনবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে, বললেন, "ন্যারেশনটা থার্ড পার্সনেই সুবিধা বটে। লোকটিকে দোষ দেওয়া যায় না; এমন জ্যোৎস্নাধবল রাত, জনবিরল পথ। ওই তো সম্পূর্ণ কাঙ্ক্ষিত পরিণতি। ওতে আকস্মিকতার কি আছে?"

চিন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল, "পা জড়িয়ে ধরেছিল একটা ভিখারি।"

এবারো অর্জুনবাবু হাসলেন, "একেবারে পা? তা কি করবে ভাই, মাঝে মাঝে ভিখারিও সাজতে হয় বইকি।"

চিন্ময় এবার অসহায়ভাবে রমলার দিকে তাকাল। রমলা ধমক দিয়ে উঠলেন অর্জুনবাবুকে, "কি যা তা আরম্ভ করেছ। ভালো লাগে না, সব সময়েই রসিকতা।"

তারপর আদ্যোপান্ত সব শুনে রমলা আরো শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। দু-তিন বছর বয়সেই মা মারা যায় অঞ্জনার, সন্তান স্নেহে রমলাই এই ছোট বোনটিকে মানুষ করে তুলেছেন।

একটু চুপ করে থেকে রমলা বললেন, "যে মেয়ে, এখন একটা কাণ্ড-কারখানা না ঘটালেই বাঁচি।"

অর্জুনবাবু বললেন, "কাণ্ড আবার কি ঘটাবে। তুমিও যেমন, গেল কোথায়?"

রমলা বললেন, "কোথায় আবার বাথরুমে। সারা রাতের মধ্যে চান শেষ হয় কি না দেখ।"
চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, "এমন শুচিবায়ু হয়ে উঠল কি করে?"

রমলা বললেন, "ছেলেবেলা থেকেই সৌখীন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খুব ভালোবাসে। বাবা বলতেন, 'ও সৌখীন হবে না তো হবে কে, ও আমার সৌন্দর্যের প্রতিমা। তোরা কেউ কোন বাধা দিস না, যা খুশি করুক, ওকে খুশি দেখতে ভালো লাগে না তোদের?' বাড়ির কোথাও এক কণা ধুলো জমলে, কি এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকলে ও সহ্য করতে পারে না। সেই মুহূর্তে তা পরিষ্কার করিয়ে তবে ছাড়বে। ঝি চাকরদের একটুও অপরিচ্ছন্ন থাকবার জো নেই, ও নিজে তাদের

পোশাক পরিচ্ছদ পছন্দ করে দিয়েছে, দু-তিন রকমের। তা আবার সপ্তাহে সপ্তাহে বদলানো চাই—ওর জানলাগুলির পর্দার রঙের মত। এমন কি চাকরদের কারো মুখে একদিনের দাড়ি জমবে তার জো নেই, ডেইলি তাদের শেভ করতে হবে। ঝিদের সে বালাই নেই। কিন্তু তাদের বিপদ চুল নিয়ে। উস্‌কো খুস্‌কো তারা থাকতে পারবে না, আবার এক ফোঁটা তেল বেশি পড়ে গেলেও চলবে না। দেখতে একটু বেশি রকমের কুশ্রী এমন একটি ঝি একবার এ-বাড়িতে এসেছিল কাজ করতে, দু মাসের মাইনে বেশি দিয়ে ও তাকে বিদায় করে দিয়েছিল। এর আগে একটি পাঞ্জাবী ড্রাইভার ছিল নাম ইন্দ্রনাথ, ভারি সুপুরুষ, খুব ভালোবাসত তাকে অঞ্জনা। মোটরে বসে চারপাশে আর কিছুর দিকে ওর চোখ থাকত না, কেবল ইন্দ্রনাথকে দেখত, আর দেখত ওর গাড়ি চালান।"

চিন্ময় একবার চোখ তুলে রমলার দিকে তাকাল।

রমলা মৃদু হাসলেন, "তারপর দাঁত রসাঁয় একদিন সেই ইন্দ্রনাথের গাল উঠল ফুলে, ও আর বেরোয় না ঘর থেকে, ওঠে না গাড়িতে, মুখ ভার করে ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকে, বললুম, 'কি হোলো তোর?'

'ওকে তুমি হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও দিদি, এক্ষুনি।'

'বলিস কি রে, আর একটা ড্রাইভার ঠিক না করে—, বাবার কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে যে।'

'তা হোক গিয়ে, তুমি পাঠিয়ে দাও।'

সমস্ত মুখটাই ফুলে গেছে, হাসতে আর পারে না ইন্দ্রনাথ, তবু কথা শুনে হাসবার অদ্ভুত চেষ্টা করে সে বলল, 'এর জন্যে আবার ডাক্তারদের দরকার কি দিদিমণি, আমি এমনিতেই ভালো হয়ে যাব।' অসুখের চেয়ে ডাক্তারকে ইন্দ্রনাথ বেশি ভয় করত। তার আশঙ্কা ছিল ডাক্তার দেখালে সমস্ত দাঁত তারা ফেলে দেবে। কিন্তু কিছুতেই অঞ্জু শুনবে না, না খেয়ে-দেয়ে পড়ে রইল। একেবারে ছোট নয় তখন, চৌদ্দ-পনের বছর বয়স হবে। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রনাথকে পাঠান গেল জোর করে। কিন্তু সে আর ফিরে এল না। বোধ হয় ডাক্তারও ইন্দ্রনাথ দেখায়নি, দাঁত রসাও তার সম্পূর্ণ সারেনি একেবারে। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম সে একেবারে দেশে চলে গেছে। বাবার বেশ অসুবিধা হয়েছিল ক'দিন। আর সেই প্রথম এবং সেই শেষ ওকে খুব বকেও ছিলেন। তার কয়েকদিন পর থেকেই হিস্টিরিয়া"—তাড়াতাড়ি থেমে গেলেন রমলা।

চিন্ময় আর একবার রমলার দিকে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল অঞ্জনা। স্নান সেরে শাড়ি বদলে এসেছে। সম্পূর্ণ নতুন দেখাচ্ছে তাকে। সৌন্দর্যের প্রতিমাই বটে। প্রসাধনের সামান্য পরিবর্তনে ওকে একেকবার এক এক রকম দেখায়। চিন্ময় মুগ্ধ হয়ে ভাবল, একি শাড়ির রঙ, না মনের রঙ। কোন গ্লানি নেই, ক্ষোভ নেই, দৈন্য নেই পৃথিবীতে। শুধু তরল জ্যোৎস্নায় গড়া এই সুন্দরী বসুন্ধরা। অঞ্জনা শুধু নিজেই সাজেনি, আপন সজ্জায় পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলেছে।

অর্জুনবাবু বললেন, "এসো।"

অঞ্জনা বলল, "বা, আমাকে দেখেই সব চুপ করে গেলেন যে।"

অর্জুনবাবু বললেন, "তোমাকে চুপ করেই দেখতে হয়।"

"কিন্তু ঐ চুরুটটা আগে ফেলে দিন। কি দুর্গন্ধ।" হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় অঞ্জনা শিউরে উঠল, মনে হলো শুধু চুরুটের নয় আরো যেন কি একটা বিশ্রী গন্ধ সমস্ত ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। পাপিয়ার সুরভিতেও তা ঢাকা পড়ছে না।

রমলার চোখের ইসারায় অর্জুনবাবু তাড়াতাড়ি ফেলে দিলেন চুরুটটা।

রমলা বললেন, "থাক, আর কোন কথা নয়, চল সব খেয়ে নেওয়া যাক। বাবাকে তাঁর লিখবার ঘরে গিয়েই জোর করে খাইয়ে এসেছি। যুদ্ধের বই তো নয়, তিনি যেন নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছেন। নাওয়া খাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই। ব্লাড প্রেসারের রোগী, এত অনিয়ম অত্যাচার যদি সয় তো কি বলেছি। আবার বেড়ে পড়বে অসুখ, তখন বুঝবেন মজা। ঠাকুর চাকরগুলি বোধ হয় যোগনিদ্রায় অভিভূত। ঠেলে তুললে তবে তাঁরা উঠবেন। এসো সব।"

অঞ্জনা বলল, "তোমরা খাও গিয়ে দিদি। আমার ভালো লাগছে না, খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"মাত্র দুটিখানি খাবি অঞ্জু, রাত্রে উপোস দেওয়া ভালো নয়।"

সব পড়ে রইল। দু'চার চামচ কোনো রকমে মুখে দিয়ে অঞ্জনা টেবিল থেকে উঠে পড়ে বলল, "আমার ভারি খারাপ লাগছে। উঠলুম আমি।"

রমলা শুষ্ক মুখে বললেন, "আচ্ছা তুই যা। একেবারে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি আসব সঙ্গে ?"

"না না, তোমার আসতে হবে না। সব তাতেই বড় বাড়াবাড়ি তোমার দিদি।"

কিন্তু খেয়ে উঠে সবাই হাত মুখ ধুতে না ধুতেই অঞ্জনার ঘর থেকে অদ্ভুত শব্দ কানে এল সকলের।

রমলা বললেন, "আমি আগেই বুঝেছি।"

চিন্ময় বলল, "তাহলে খেতে না দেওয়াই উচিত ছিল।"

মুহূর্তের মধ্যে অঞ্জনার ঘরের সামনে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। বই ছেড়ে উঠে এসেছেন ক্ষিতীশবাবু। চাকরবাকরের ভিড় জমে গেছে দোরে।

বমিতে সমস্ত ঘরটা ভেসে যাচ্ছে। শাড়িতে লেগে গেছে খানিকটা। নিজের গায়ের গন্ধে অঞ্জনা নিজেই যেন পাগল হয়ে যাবে। একেবারে সমস্ত বেশবাস খুলে ফেলতে চাচ্ছে অঞ্জনা, আবার সেগুলিকে চেপে ধরছে লজ্জায়।

রমলা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, "সরে যাও, ভিড় করো না এখানে। ভয় নেই অঞ্জনা।"

অঞ্জনা চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "কি নোংরা, কি দুর্গন্ধ, আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও, শিগ্‌গির সরিয়ে নিয়ে যাও, টিকতে পারছিনে। কি নোংরা আর কি বিশ্রী গন্ধ।"

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে রমলা ওর কাপড় ছাড়ালেন। তারপর পাশের আর একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে নিয়ে খাটের ওপর শুইয়ে দিলেন ওকে। এ ঘর চিন্ময়ের জন্যে ঠিক করা হয়েছে। পূব দক্ষিণ খোলা। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়ছে।

কিন্তু খাটে শুয়ে একটুক্ষণ চোখ বুঁজে চুপ করে থেকে অঞ্জনা বার কয়েক নাসিকা কুঞ্চিত করে কষ্টে কিসের ঘ্রাণ নিয়ে মুখ বিকৃত করল, "উঃ, এখনও তাই। এখনও সেই নোংরা গন্ধ, আমি টিকতে পারছি না। সমস্ত বাড়িটাই কি নোংরা হয়ে উঠল।"

আরো কয়েকবার নাসিকা কুঞ্চিত করল অঞ্জনা, "গন্ধে টিকতে পারছি না, আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।"

রমলা এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে বললেন, "এই চুপ কর, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে অঞ্জু। চুপ।"

পাশে চিন্ময় দাঁড়ান। রমলা তার দিকে চেয়ে চুপে চুপে বললেন, "এই সময় ধমক দিতে হয়, চড়চাপড় দিতে হয় দরকার হলে। কিন্তু ঠেকান গেল না বোধ হয়।" রমলা ফিস ফিস করে বললেন, "ফিট হচ্ছে আমি আগেই বুঝেছিলাম।"

দুটো হাত অঞ্জনা টান করে মেলে ধরল, আঙুলগুলো দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ।

রমলা চিন্ময়কে বলল, "দেখ দেখি থামাতে পার কি না।"

চিন্ময় এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনার প্রসারিত হাতখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীর ঘৃণায় সংকুচিত করে শিউরে উঠল অঞ্জনা, "ছি ছি ছি, ছাড়ো ছাড়ো।"

সঙ্গে সঙ্গে কি যেন মনে পড়ে গেল চিন্ময়ের। তারপর ধীরে ধীরে সে সরে দাঁড়াল।

গেটে মোটরের শব্দ। ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন।

ভাদ্র ১৩৫০

প্রতিদ্বন্দ্বী

খুশিতে রেবার মুখ আরও সুন্দর দেখায়। দোতলা বাড়িটার সমস্ত ঘরগুলি, ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র সে ঘুরে ঘুরে দেখে। কখনো বা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে বাইরের চলন্ত জনস্রোত, কখনো বা ফুলের টবগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সরোজিনী পিছনে পিছনে আসেন আর মুচকি হাসেন। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রেবা জিজ্ঞাসা করে, 'সমস্ত বাড়িটাই কি আমাদের মা ? কোন ভাড়াটে এসে এখানে কোন দিন থাকবে না তো ?'

সরোজিনী হেসে বলেন, 'তুমি যদি থাকতে দাও তো থাকতে পারে, সমস্ত বাড়িই যখন তোমার।'

রেবা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলে, 'নীচের তলায় অবশ্য কেউ এসে থাকতে পারে। না হলে বাড়িটা ভারি খালি খালি লাগবে।'

সরোজিনী সহাস্যে জবাব দেন, 'তা কি করে হবে মা। গোটা নীচের তলাটাই যে অবিনাশের স্টুডিয়ো।'

রেবা আরও গম্ভীর হয়ে যায়, 'ঠিক, তাই তো।'

ওর মুখের ওপর থেকে সহজে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না সরোজিনীর। পাথর কেটে অবিনাশ যে সব মূর্তি গড়ে, তারই একখানা যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে এর জন্যই যেন সে এতকাল প্রতীক্ষা করছিল। দেশ-বিদেশে শুধু রূপ খুঁজেই বেড়িয়েছে অবিনাশ। কিন্তু কিছুতেই কোন মেয়েকে তার পছন্দ হয়নি।

সরোজিনী বলতেন, 'তোর কপালে আছে কালো কুশ্রী মেয়ে। অত বাছাবাছির ফল কি কোনদিন ভালো হয় ?'

শ্যামবাজারের এক অখ্যাত গলিতে মধ্যবিত্ত এক কেরানীর ঘরে এমন রূপ যে এতদিন লুকিয়েছিল, তা অবিনাশের ছাড়া আর কার চোখে পড়বে,—সারাজীবন ধরে পৃথিবীতে যে কেবল রূপ খুঁজেছে আর সৃষ্টি করেছে।

অবিনাশের স্টুডিয়োতে ঢুকে রেবা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর খিল খিল করে হেসে ওঠে, 'সত্যি, কি অদ্ভুত মানুষ তুমি। আমি কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি মোটে টেরই পেলে না।'

কি একটা অসমাপ্ত মূর্তির সামনে নিবিষ্ট মনে অবিনাশ কাজ করে যাচ্ছিল, মৃদু হেসে ঘাড় ফিরাল, 'আগে থেকে টের পেলে অমন মিষ্টি হাসি কি শুনতে পেতাম ?'

হাসি বন্ধ করে রেবা জবাব দেয়, 'মা গো, কি অসভ্য তুমি। কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা তোমার। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ি আমাদের বিজয় কাকাও করতে পারেননি। তুমি যে এত বড়লোক, তা সত্যি আগে বিশ্বাস হয়নি।'

কেমন একটু ম্লান ছায়া পড়ে অবিনাশের মুখে, মৃদু হেসে বলে, 'তাই না কি ?'

জবাব না দিয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিটার দিকে রেবা একবার তাকায়। আর অবিনাশ অপেক্ষমাণভাবে তাকিয়ে থাকে রেবার দিকে, নিশ্চয়ই সুন্দর কোন মন্তব্য এবার তার মুখ থেকে বেরুবে। কিন্তু ততক্ষণে জানালা দিয়ে রেবার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর।

'এই শোন, শিগগির এস, যদি দেখবে তো ছুটে এস শিগগির।'

রেবার কলকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অনন্যোপায় হয়ে অবিনাশকে উঠে আসতে হয়।

'কি ?'

রেবা বলে, 'দেখ ভিখারিটার দুটো পা-ই কাটা। তবু হামাগুড়ি দিয়ে কি ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে চেয়ে দেখ। পা নেই তবুও চলবে। যদি নিজেদের বাড়িতে থাকতুম, চেঁচিয়ে ওকে আমি ঠিক এদিকে ডেকে আনতুম। কিন্তু এখানে তা করতে গেলে লোকে নিন্দা করবে। কিন্তু যাই বলো ভারি

অদ্ভুত লাগছে আমার। একটা পাও নেই তবু ওর চলা থামছে না।'

অবিনাশ এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'আর আমার তৈরি মূর্তিগুলোর দুটো করে পা থাকা সত্ত্বেও এক পাও কেউ নড়ছে না, তাই নয় ? কিন্তু জানো রেবা নড়ে ওরা ঠিকই, কেবল সকলের তা চোখে পড়ে না। পুত্তলিকার চোখ আছে, দেখতে পায় না, আসলে তেমন পুতুলের সংখ্যা মানুষের মধ্যেই বেশি।'

মূঢ় দৃষ্টিতে রেবা স্বামীর দিকে তাকায়। কথার অর্থ সবটা না বুঝতে পারলেও ক্রোধের আভাসটা তার কাছে অস্পষ্ট থাকে না। অবিনাশ তার ওপর রাগ করেছে, কিন্তু কেন ? বড় বড় শিল্পীদের মেজাজ কি এই রকম ? অবিনাশ যে তাকে পছন্দ করবে, এ কথা বাড়ির কেউ ধারণা করতে পারেনি। বাংলাদেশের নামকরা শিল্পী অবিনাশ। অনেক নামকরা সুন্দরীকে সে অপছন্দ করেছে। রেবাকে যে তার পছন্দ হয়ে গেছে এটা রেবার ভাগ্য আর শিল্পীর খেয়াল। বড়দার মুখে এই ধরনের ব্যাখ্যাই সে শুনেছে। মা বলেছিলেন, 'আর তো কোন দিক থেকে কোন আপত্তির কারণ নেই বিভূতি, তোদের মুখেই শুনছি বাংলাদেশের ইনি একজন নামকরা লোক, অবস্থাও খুব ভালো। কিন্তু আমার রেবার তুলনায় বয়সটা একটু যেন বেশি মনে হয়, পঁয়ত্রিশ চল্লিশের কম কি হবে ? আর—'

বাধা দিয়ে বিভূতি বলেছে, 'পুরুষের পক্ষে ও আবার একটা বয়স ? সবাই তো আর তোমার বড় ছেলের মত নয় যে বাল্যকালেই বিয়ের পর্বটা শেষ করে রাখবে। সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করে তবে আজকালকার ছেলেরা বিয়ে করে। আর যে দিন কাল, তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে হতে লোকের অতটুকু বয়সের প্রয়োজন হয়। এ তো আর বাপ-দাদার আমলের সম্পত্তি পেয়ে বড়লোক হয়নি, কিংবা পাট-রসুনের কারবারে সিন্দুক ভরেনি, শিল্পের সেবা করেছে। একদিক থেকে এসেছে যশ, আর একদিক থেকে অর্থ, শুধু মূর্তিকেই তো গড়েনি, নিজের প্রতিষ্ঠাকেও গড়ে তুলেছে। হ্যাঁ, আর কি আপত্তির কথা বলছিলে—'

সৌদামিনী ভয়ে ভয়ে বলেছেন, 'না না আমার আবার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে। পাঁচুর মা বলছিল—ভদ্রলোকের চেহারাখানা দেখতে ঠিক ভদ্রলোকের ছেলের মত নয়। লক্ষ্মীপ্রতিমার মত রূপ আমার রেবার, তার বরের চেহারা যদি এমন হয়—পাঁচুর মা-ই বলছিল—'

বিভূতি কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর জবাব দিয়েছে, 'বাড়ির ঝিই বুঝি হয়ে উঠেছে তোমার পরামর্শদাতা। বেশ তো, সে-ই তোমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করুক। আমরা তো জানতুম পুরুষের রূপের প্রয়োজন হয় না। যশ আর ঐশ্বর্যই যথার্থ রূপ। 'কন্যা বরয়তে রূপম্', কথাটা বুঝি কন্যার জবানীতেই তুমি বললে ? কিন্তু এক রূপ ছাড়া তোমার মেয়ের কি আছে বলো তো ? ষোল সতের বছর বয়স হয়েছে ভালো করে বাংলা একখানা বই পর্যন্ত পড়তে পারে না। সংসারের কাজকর্ম কি জানে না জানে তুমিই জানো। চেষ্টা কি আমি কম করেছি, এই অভাব-অনটনের সংসারেও দিয়েছিলাম তো ভর্তি করে। কিন্তু ফি বছরে ফেল। রূপের গরবেই অস্থির, আর পড়াশুনো।'

পাশের ঘর থেকে দাদা আর মায়ের কথোপকথন কান পেতে সব শুনেছে রেবা, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ; ভদ্রলোক এর চেয়েও যদি বুড়ো আর বিশ্রী চেহারার হত তা হলেও তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় রেবার আপত্তি থাকত না। দাদার সংসারে আর এক মুহূর্তও তার থাকতে ইচ্ছা নেই।

অবিনাশ অপলকে ওর দিকে চেয়েছিল। বিষণ্ণ, চিন্তিত ভঙ্গীতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে রেবাকে। এই ভঙ্গীর একটি মূর্তি গড়তে হবে ওর। অবিনাশ মনে মনে ঠিক করল।

কিন্তু মুহূর্তখানেক মাত্র, তার পরেই রেবার ঠোঁটে আবার হাসি ফুটে উঠেছে।

'হাসছ যে ?' অবিনাশ একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হাসি চাপতে চাপতে রেবা বলল, 'ছোড়দার কথা মনে পড়ে গেল, দাদা হলে হবে কি, ভারি ফাজিল।'

'কেন, কি ফাজলামি করেছিলেন তিনি ?'

হাসিতে রেবা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। 'তিনি ? ছোড়দা হয়ে পড়ল 'তিনি' ? আমার চেয়ে মাত্র

দেড় বছরের বড়। আর সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে বলে তুমি তাকে তিনি বলবে ?'

অবিনাশও হাসল, 'আচ্ছা তা না হয় না-ই বললুম. কিন্তু হাসছিলে কেন ?'

'ছোড়দা কি বলছিল জানো ? তুমি আমাকে বিয়ে করেছ মডেল করবে বলে। প্রত্যেক আর্টিস্টেরই নাকি দু'একটি করে মডেল থাকে। অর্ডার মাফিক ঘন্টার পর ঘণ্টা কিভাবে তাদের কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কোমর বাঁকিয়ে. ছোড়দা তাই দেখাচ্ছিল। মাগো, এমন হাসাতে পারে ছোড়দা। আর যাই কর, আমাকে কিন্তু তোমার মডেল হতে বলো না, ছোড়দার ভঙ্গী আমার মনে পড়বে. আর হাসতে হাসতে আমি মারা পড়ব।'

অবিনাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, 'আচ্ছা যাও, মারা তোমাকে পড়তে হবে না।'

দোরের বাইরে হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে রেবার, 'কে, মণিরাম ? দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমাকে আমি একটা জিনিস কিনতে দেব,' রেবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

আসলে জিনিস কিনতে দেওয়াটা ছল। মণিরামের বরিশালী ভাষা শুনতে এবং শুনে হাসতে ভালোবাসে রেবা। তার মুখের ওপরই তার অনুকরণ করে। বাড়ির অন্য কেউ এমন করলে ভারি অসন্তুষ্ট হয় মণিরাম—কিন্তু রেবাকে দেখলে সে একেবারে খাস বরিশালের ভাষা আরম্ভ করে। রেবা যত বেশি হাসে, উচ্চারণের টান মণিরাম তত বাড়িয়ে দেয়। ঘরের ভিতর থেকে তা শুনে অবিনাশের মনে হয় বরিশালী ভাষা জানা না থাকলে রেবাকে হাসাবার জন্য বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য পর্যন্ত করতে পারত মণিরাম, ওর মত লোকের মনেও রূপোপভোগের সাধ আছে। রূপ, কিন্তু এই মূঢ় ছেলেমানুষের রূপ দিয়ে কি করবে অবিনাশ ? যার কেবল রূপই আছে, রূপবোধ নেই, রূপ-সৃষ্টির কোন কাজে যাকে লাগান যাবে না, তাকে দিয়ে কি হবে অবিনাশের ?

যত দিন যায় বিরক্তি অবিনাশের তত বেড়ে ওঠে। রেবার চঞ্চল প্রাণবত্তা কিছুর মধ্যেই যেন ধরে রাখা যায় না। যত ব্যর্থ হয় অবিনাশ, তত তার ক্রোধ বাড়ে। ইতিমধ্যে অনেকবার চেষ্টা করেছে রেবার মনে যাতে শিল্প-বোধ আসে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, এসব কথা তুললেই সে পালিয়ে যায়। কোন না কোন ছলে চলে যায় বাইরে। ইদানীং সযত্নে বরং সে অবিনাশকে পরিহার করেই চলতে চায়।

নতুন একটি দেবমূর্তিতে হাত দিয়েছে অবিনাশ। ময়মনসিংহের কোন এক জমিদারের ষোড়শী কন্যা বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। তাঁর মন যাতে প্রবোধ মানে, ধর্মভাব জাগে, তার আয়োজনের অন্ত নেই, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবার দেবমূর্তির প্রয়োজন। মদনমোহনের মনুষ্যপ্রমাণ মর্মরমূর্তি অবিনাশকে গড়ে দিতে হবে।

খানিক পরে সরোজিনী ঘরে ঢুকলেন। এইমাত্র পূজার ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। শ্বেত পাথরের রেকাবীতে দেবতার প্রসাদ। কয়েক খণ্ড শসা, আর দুটি নতুন গুড়ের সন্দেশ তাঁর নিজের হাতের তৈরি।

'হাত পাত অবিনাশ।'

কাজের সময় কারো বাধা অবিনাশ সহ্য করতে পারে না, ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বিরক্তির সুরে বলে, 'কেন, হয়েছে কি ?'

সরোজিনী প্রসন্ন হাসি হাসেন, 'কিছুই হয়নি, প্রসাদ নে।'

'ওঃ, মিছামিছি কেন বিরক্ত করতে আসো বলোতো ? প্রসাদের আমার দরকার হয় না। তোমার মত পৌত্তলিক আমি নই, তা তো জানোই।'

সরোজিনী হাসেন, 'তুই-ই বা পৌত্তলিক কম কিসে ! জীবন ভরে এত পুতুল আর কে গড়েছে ?'

সরোজিনীর সস্নেহ ব্যবহারের স্নিগ্ধতায় নিজের আচরণের জন্য মনে মনে লজ্জাবোধ করে অবিনাশ। হাত বাড়িয়ে একখণ্ড শসা তুলে নিয়ে বলে, 'তা ঠিক। পাথর কেটে কেটে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টাই কেবল করলুম, নিজের জীবনকে সুন্দর করে গড়তে শিখলুম না।'

বাৎসল্য-স্নিগ্ধ কণ্ঠে সরোজিনী জবাব দেন, 'কেন, কার চেয়ে তুই কম ? কিন্তু পরের মেয়ের সঙ্গে অমন রুক্ষ ব্যবহার করিসনে অবিনাশ। দেখিসনে মেয়েটা এ ক'মাসের মধ্যেই কেমন গম্ভীর

হয়ে গেছে। ওর মুখ ভার দেখলে আমার ভালো লাগে না। ওর ম্লান বিষণ্ণ মুখ দেখলে আমার বুকের ভিতর যেন কেমন করে ওঠে।'

অবিনাশ জবাব দেয়, 'কিন্তু সংসারে লোককে মাঝে মাঝে গম্ভীরও তো হতে হয় মা। মানুষের সেও এক রূপ। আচ্ছা, ওকে একবার পাঠিয়ে দিওতো এখানে।'

একটু পরে রেবা এসে উপস্থিত হয়, 'সত্যি ডেকেছ আমাকে?'

অবিনাশ বলে, 'কেন, তোমাকে কি আমি ডাকতে পারি না। তুমিই তো আসতে চাও না এ ঘরে।'

'আসতে কি আর ইচ্ছে করে না আমার?'

'করে? কেন, বলতো?'

অর্থপূর্ণভাবে রেবা একটু হাসে, 'আহা, কিছু যেন বোঝেন না!'

বোঝে, অবিনাশ সবই বোঝে। অবিনাশের আদর চায় রেবা, তার কাছ থেকে গল্প গুজব শুনতে রেবা ভালোবাসে, এ ঘরে আসে রেবা নিতান্ত অবিনাশের জনাই, অবিনাশের সৃষ্টির দিকে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য কি আগ্রহ নেই রেবার, কিন্তু ও ধরনের দৈহিক আরাম তো যে কোন পুরুষই রেবাকে দিতে পারত। তার জন্য শিল্পী অবিনাশের কি প্রয়োজন ছিল। দেশ-দেশান্তর থেকে কত নরনারী অবিনাশের এই স্টুডিও দেখতে এসেছে, দেখে মুগ্ধ হয়েছে, শুধু কোন মুগ্ধতা এল না, বিস্ময় জাগল না রেবার মনে, তার শিল্পকে তার সৃষ্টিকে একটুও ভালোবাসল না রেবা! স্বামীর খ্যাতি আছে, ঐশ্বর্য আছে এটুকুই সে বোঝে, তার সৃষ্টির প্রতিভাকে উপলব্ধি করবার মত বোধশক্তি রেবার নেই।

'আচ্ছা রেবা, স্টুডিও ভ'রে নানা রকমের এত যে মূর্তি, এর কোনটিই কি তোমার মনে আনন্দ দিতে পারল না, এর কিছুই কি তোমার ভালো লাগে না, সত্যি বল তো?'

রেবা জবাব দেয়, 'বাঃ! তোমার নিজের হাতে তৈরি জিনিষ, আর আমার ভালো লাগবে না? সব আমার ভালো লাগে।

নৈরাশ্যের বিবর্ণ হাসি অবিনাশের ঠোঁটে কিছুক্ষণ লেগে থাকে।

ঝুলনের আগেই মূর্তি সম্পূর্ণ করে পাঠিয়ে দিতে হবে। দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয় অবিনাশকে। মূর্তি শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য জমিদারের তরফ থেকে কোন খোঁজ-খবর নেই। অবশেষে দু'দিন পরে শহরের ম্যানেজার এসে উপস্থিত হলেন অন্য কি কার্যোপলক্ষে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, যাওয়ার পথে হয়ে গেলেন অবিনাশের বাড়ি। অবিনাশ বলল, 'কি ব্যাপার? মূর্তি কি নেওয়ার ইচ্ছা নেই আপনাদের?'

ম্যানেজার বললেন, 'আমরা ভারি লজ্জিত মশাই, যার জন্য মূর্তির দরকার ছিল, তার আর প্রয়োজন নেই।'

অবিনাশ বলল, 'কেন?'

ম্যানেজার গোঁফের তলায় মুচকি হেসে বললেন, 'সে সব বড় ঘরের বড় কথা আমাদের মুখে সাজে না।'

অবিনাশ মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

'বেশ, না সাজে না বলবেন। শুধু এইটুকু আমি শুনতে চাই, মূর্তিটি আপনারা নেবেন, না আর কাউকে বিক্রি করে দেব?'

ম্যানেজার বললেন, 'আহা শুনুনই না মশাই আগাগোড়া, তারপরে চটবেন।'

'বলুন।'

'বলব কি মশাই বড় ঘরের সব বড় বড় কথা। আমি কিন্তু আগে থাকতেই একটু একটু টের পেয়েছিলাম। পুরনো মন্দিরের ঠিক সংলগ্নই আমার বাসা কি না। আসতে যেতে সব আমার চোখে পড়ত। কর্তা আর গিন্নী অবশ্য বলাবলি করতেন—মল্লিকার ধর্মে ভারি মতি হয়েছে, ঠাকুরের ওপর অচলা ভক্তি। আমি দেখতুম ঠাকুরের ওপরই বটে, তবে শালগ্রাম ঠাকুরের ওপর নয় পুরোহিত

ঠাকুরের ওপর। বুড়ো বাপের বাতব্যাধি হওয়ায় যজমানী কাজে ছোকরাই আসত কি না।'

'তারপর '?'

'তারপর আর বলবার মত কথা নয়। নানা কেলেঙ্কারী ব্যাপার। এই দুর্ঘটনার পর থেকে মেয়ে, মন্দির, মদনমোহন, সব কিছুর ওপরই কর্তা ক্ষেপে গেছেন। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে মূর্তির কথা তাঁকে মনে করিয়ে দেয় ?'

ম্যানেজার আর একবাব দেবমূর্তিটির দিকে তাকালেন। 'কিন্তু যাই বলুন মূর্তিটি ভারি চমৎকার হয়েছে আপনার। অবশ্য মুখে দেবভাবের কিছু অভাব আছে। যা হোক, আমি তো আর জমিদার নই, তাঁর সামান্য কর্মচারী মাত্র, তাঁর মত অত টাকা তো আর আমি দিতে পারব না। শ'দুয়েক টাকার মধ্যে যদি দেন আমাকে, মূর্তিখানি আমি নিয়ে যাই।'

ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল অবিনাশের মুখ। 'আজ্ঞে না ধন্যবাদ।'

পাশের ঘর থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেবা সব শুনছিল আর সকৌতুকে হাসছিল, অবিনাশেব কর্কশ কণ্ঠে চমকে উঠল। রাগলে যেন আরও বেশি কুশ্রী দেখায় অবিনাশের মুখ। আর তারই পাশে চোখে পড়ল মদনমোহনের মূর্তি, স্থির প্রসন্ন হাসি মুখটিতে অনুক্ষণ লেগে রয়েছে। সত্যিই ভারি সুন্দর হয়েছে তো মূর্তিখানা। মনে মনে কথাটা রেবা আবৃত্তি করলে।

ম্যানেজার বিদায় নিলে রেবা ছুটে এল ঘরে, 'এই শোন, মূর্তিটি কাউকে বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু, ওটি আমি নেব, ভারি চমৎকার হয়েছে।'

অবিনাশ শ্লেষের হাসি হাসল, 'ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছ বুঝি।'

'বাঃ ? তা কেন ? সত্যি আমার ভারি ভালো লেগেছে।'

অবিনাশ বলল, 'তাই নাকি ? আমার অসীম সৌভাগ্য। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে হাজার টাকায় মূর্তিটি বিক্রি হয়ে যাবে দেখে নিও।'

রেবা বলল, 'হাজার টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ো। গয়না বেচে শোধ দেব।'

সরোজিনী শুনে হাসলেন, 'কথা শোন মেয়ের। বেশ তো অবিনাশ। সখ হয়েছে বৌমার, রাখুক না। তোর স্টুডিয়োতেও তো কত মূর্তি তুই নিজে সখ করে রেখে দিয়েছিস। আর খদ্দের যদি আসেই, তা হলে না হয় বিক্রি করে দিবি, তাতে কি।'

রেবা মনে মনে বলল, 'হুঁ দিলেই হ'ল আর কি। একবার ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যেতে পারলে এ মূর্তি সেখান থেকে বার করে আনবে সাধ্য কার। মা নিজেই আপত্তি করবেন তখন।'

অবিনাশ কি এক কাজে বাইরে গিয়েছে। সরোজিনী মেঝের ওপর শীতলপাটি বিছিয়ে চৈতন্য-চরিতামৃত পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেই ফাঁকে মণিরামের সাহায্যে মূর্তিটি একেবারে ঠাকুরঘরে নিয়ে বসিয়ে রাখল রেবা।

একেই সকাল থেকে অবিনাশের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, তারপর তার বিনা অনুমতিতে রেবা এই কাণ্ড করেছে দেখে তার ধৈর্য একেবারে লোপ পেল। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল রেবাকে, সরোজিনীকেও কসুর করল না, আর মণিরামকে ঘাড় ধরে বের করে দিল বাড়ি থেকে। রেবার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে বার বার মনে হতে লাগল রাগ করলে এত কুশ্রী দেখায় অবিনাশকে যে, তার দিকে একেবারেই চাওয়া যায় না।

সন্ধ্যার পর ক্রমেই অবশ্য মেজাজটা পড়ে এল অবিনাশের। পরিপাটি ভোজনের পর চিত্ত বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সত্যি, এত কাণ্ড না করলেও চলত। মনে মনে বেশ লজ্জিতই হল অবিনাশ। বিছানায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে মনে মনে অবিনাশ প্রতিজ্ঞা করল, মূর্তিশিল্প আর না, এবার থেকে জীবন-শিল্পের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মার কাছে আগেই ক্ষমা চেয়েছে। রেবা এলে তার কাছেও মার্জনা ভিক্ষা ক'রে বলবে, 'মূর্তিটা তোমাকে দিয়ে দিলুম।' এতদিন পরে শিল্পবোধ জেগেছে তা হলে রেবার, শিল্পকে সে ভালোবাসতে শিখেছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রেবা যখন ওপরে এল, অবিনাশের ততক্ষণে নাক ডাকা আরম্ভ করেছে। রেবা মুহূর্তকাল স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। এতদিন ভালো করে চেয়ে দেখেনি। আজ মনে হল,

ঘুমুলেও বড় বিশ্রী দেখায় অবিনাশের মুখ। প্রৌঢ় মুখে রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। স্থানে স্থানে কুঁচকে গেছে চামড়া। এত অসুন্দর তার স্বামী আর সত্যিই এত বুড়ো। নিশ্চয়ই বয়স পাঁচ সাত বছর তাদের কাছে কমিয়ে বলেছিল। পঁয়তাল্লিশের একটা দিনও কম হবে না কিছুতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ ফিরিয়ে নিতেই দেয়ালের বড় আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছায়া ভেসে উঠল রেবার। সত্যিই এত সুন্দর সে দেখতে! অপলকে রেবা কিছুক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। আর উগ্র আনন্দে অপূর্ব হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার যৌবন, তার সৌন্দর্য অবিনাশের কুশ্রী ব্যবহারের একমাত্র প্রতিশোধ।

জানালার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত শহরতলী চোখে পড়ে। নারিকেল গাছগুলোর মাথার ওপর গোল হয়ে উঠেছে চাঁদ। সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে। এখানে অবিনাশের কোন অস্তিত্ব নেই, তার কথা অনায়াসে বিস্মৃত হওয়া যায়।

অপূর্ব আনন্দে সমস্ত মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে রেবার। দেরাজ থেকে চাবি নিয়ে কাঁচের আলমারী খুলে একখানা স্কাই ব্লু শাড়ি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল রেবা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর প্রসাধনের নানা টুকিটাকি আসবাব। কৌটো খুলে আঙুলের ডগায় ক্রীম নিয়ে সস্নেহে নিজের সুগৌর কপোলে বুলিয়ে দিল। দেশি বিদেশি নানা রঙের ফুলদানীগুলি সাজিয়ে রেখেছে। তার ভেতর থেকে বেলকুঁড়ির মালাটা তুলে নিয়ে ঘনবদ্ধ কবরীতে রেবা জড়াতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে সরোজিনী এই সময় ডেকে বললেন, 'বউমা, ঘুমিয়েছ?'

এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস রোধ করে রাখল রেবা, তারপর কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল, 'না।'

সরোজিনী বললেন, 'ঠাকুরঘর বোধ হয় খোলা রেখে এসেছ। রাতে-বিরাতে কিছু একটা ঘরে ঢুকবে, যাও বন্ধ করে এসো।'

মদনমোহনের প্রসন্ন সুন্দর মুখ হঠাৎ রেবার চোখের ওপর ভেসে উঠল, স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, 'যাই মা।'

খানিক পরে ঘুম ভাঙল অবিনাশের। উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত আসবাবপত্র সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বিছানা শূন্য, ঘরের কোথাও রেবা নেই। মনে মনে হেসে অবিনাশ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিশ্চয়ই রেবা কোথাও বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অভিমানে। আজ অবিনাশের মান-ভঞ্জনের পালা। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে বেরোল অবিনাশ। হঠাৎ পিছন থেকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে চমকে দেবে রেবাকে।

তেমনি নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির সবগুলি ঘর দেখতে দেখতে রেবাকে খুঁজে বেড়াল অবিনাশ। কিন্তু কোথাও রেবার দেখা মিলল না। হঠাৎ অবিনাশের চোখে পড়ল সরোজিনীর পূজার ঘর থেকে নীলাভ আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এত রাত্রে কে ওখানে? রেবা কি শেষ পর্যন্ত ঠাকুর-ঘরে ঢুকেছে। অবিনাশ নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

ভেজান দরজাটা আস্তে ঠেলে দিল অবিনাশ, তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নরম নীল আলোয় সমস্ত কক্ষটি অপূর্ব রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মদনমোহনের গলায় দুলছে বেলকুঁড়ির মালা। আর তার সামনে আর একটি মর্মরমূর্তির মত রেবা দাঁড়িয়ে। মাথার আঁচল খসে পড়েছে মাটিতে। হাতের মোমবাতি থেকে গলিত মোম ঝরে ঝরে পড়ছে সেই আঁচলের ওপর।

'রেবা।'

অবিনাশের কণ্ঠ করুণ আর্তনাদের মত কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হল। চমকে উঠে মুখ ফিরাল রেবা। লজ্জায় শঙ্কায় অপূর্ব সুন্দর দুটি চোখ।

পৌষ ১৩৫০

স্বখাত

অমৃতসরে চাকুরি উপলক্ষে মাস কয়েক প্রবাস জীবন কাটিয়ে এসে বন্ধু রমেনকে দেখে ভবতোষ অবাক হয়ে গেল। মুখে সেই প্রসন্ন হাসি নেই, মনে নেই আনন্দ। অবশ্য ইতিপূর্বে অন্য বন্ধুদের চিঠিপত্রে খবর কিছু কিছু সে পেয়েছিল। বাপের পাল্লায় পড়ে রমেনকে কালো এবং নিরক্ষরাপ্রায় মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছে। কিন্তু বউয়ের রঙ কালো বলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, এমন ছেলেও যে এযুগে থাকতে পারে রমেনের মুখ না দেখলে তা ভবতোষের বিশ্বাস হোতো না। সমস্ত ঠাট্টা পরিহাসের উত্তরে রমেন কোনো জবাব না দিয়ে কেবল ম্লান হাসে। বাল্যবন্ধু মিতভাষী রমেনের এই হাসিতে এমন একটু বেদনার আভাস থাকে যা, ভবতোষের সিনিক মনকেও স্পর্শ না ক'রে পারে না। দুঃখটা তার কাছে যত লঘুই মনে হোক রমেনকে যে তা গভীরভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ধরেছে, এ কথা ভবতোষ মনে মনে টের পায়।

রমেনের বাবা নিবারণবাবু একদিন নিজেই এলেন ভবতোষের ওখানে।

'তুমি এসেছ বাবা ভবতোষ, আমি এবার সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছি। ছেলেবেলা থেকেই তোমার কথা ও মেনে চলে, ওর অসীম নির্ভর তোমার ওপর। অন্যান্য বন্ধুরা ক্ষেপিয়ে ওর আরো মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছে। তুমি একটু ওকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলো,এমন করলে লোকে কি মনে করবে।'

'কেন, কি করে?'

'না, করেও না কিছু বলেও না কিছু, সেই তো হয়েছে আরো মুস্কিল। ওর ওই ভূতান্তরিত ভাব দেখেই তো আমার হৃদয় ফেটে যায়। আর ওই নিরাপরাধ কচি মেয়েটার মন বা কেমন করতে থাকে বল তো?'

'সে তো সত্যিই, কিন্তু বউ একটু দেখে শুনে আনলেই পারতেন।'

নিবারণবাবু চটে উঠলেন, 'আবার কি দেখে শুনে আনব? সদ্বংশের ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও মোটামুটি জানে, দেখতে শুনতেও কুশ্রী বলা চলে না, আবার কি? তোমাদের যে একেবারে বি এ, এম এ পাশওয়ালা অসামান্যা রূপসী না হলে পছন্দ হবে না, তা কি ক'রে জানব?'

'তেমন পছন্দটাকে কি আপনি খুব খারাপ মনে করেন?'

'খারাপ নয় তো কি? ঘরের স্ত্রী খুব রূপসী আর বুদ্ধিমতী হওয়াই কি ভালো?'

ভবতোষ হাসল, 'তা হলে তিনি বেশি দিন আর ঘরে থাকেন না, এই তো আপনার আশঙ্কা?'

একমুহূর্ত ক্রুদ্ধ-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থেকে নিবারণবাবুও অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'না বাবা ভয় সে জন্য নয়, ঘরেই তিনি থাকেন কিন্তু পুরুষের বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সমস্ত হরণ ক'রে একেবারে সর্বময়ী হয়ে থাকেন, স্বামীর আর স্বামিত্ব থাকে না।'

নিবারণবাবু বিদায় নিলে ভবতোষ মনে মনে না হেসে পারল না, কত রকম দুঃখই যে আছে সংসারে। তার নিজের সমস্যা অবশ্য একটু ভিন্ন ধরনের। স্নেহের আতিশয্যে তার বাবা তার ঘাড়ে একটি বউ গছিয়ে দিয়ে যাননি বটে কিন্তু অপরিমেয় দেনার আর অসংখ্য পোষ্যে দাঁড়ির দুই পাল্লা সমান ক'রে রেখে গেছেন। দুটি বোনেরই বিয়ের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। অবশ্য সেজন্য ভবতোষের খুব বেশি আফশোস নেই, কেননা কোনো বয়সেই মেয়েরা আজকাল আর অরক্ষণীয়া নয়। কিন্তু পাড়ার ছেলেগুলি ওদের প্রেমে পড়বার জন্য নাকি অত্যন্ত ঔৎসুক্য দেখাচ্ছে। তার মধ্যে দু'একটি সবর্ণের ছেলেও আছে। অবশ্য অসবর্ণ হলেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু সকলেই প্রেমে পড়বার জন্যে যেমন উৎসুক বিয়ে করবার জন্যে তেমন নয়। কেননা, এ সব যুদ্ধসংক্রান্ত অস্থায়ী চাকরিতে স্থায়ীভাবে কোনো মেয়ের ভরণপোষণের ভার নেওয়ার ভরসা হয় না, তার বদলে ছোটখাট উপঢৌকনে কিংবা দু'এক সন্ধ্যা সিনেমা দেখিয়ে সাময়িক প্রেমিক হতেই সাধ

যায়। সেজো ভাইটি আছে মেসোপটেমিয়ায়, মাস কয়েক ধরে তার খোঁজখবর নেই, সাংসারিক কাজ কর্মের অবসরে মা ইতিমধ্যেই তার জন্যে ডুকরে ডুকরে কাঁদা আরম্ভ করেছেন। দুশ্চিন্তা এবং ভ্রাতৃবাৎসল্য ভবতোষের মনেও আছে কিন্তু তবু কেন যে মায়ের কান্না শুনলে দুঃসহ বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রি-রি করতে থাকে তা কে বলবে। চাকুরিস্থানেও শনি বক্রভাবে অবস্থান করছেন, ওপরওলাদের সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না। অথচ ফস ক'রে ছেড়ে দেওয়ার মত অবস্থাও নয়।

এ সব দুঃখের কোনোটিই নিবারণবাবু কিংবা তাঁর একমাত্র ছেলে রমেনের নেই। কলকাতায় বাড়ি আছে, সওদাগরী অফিসে আছে স্থায়ী চাকুরি। পোষ্যের সংখ্যা স্বল্প। তবু এঁদের মনেও দুঃখের অভাব নেই। নিবারণবাবুর ছেলের মুখে নেই হাসি আর তাঁর ছেলের বউয়ের গায়ে নেই দুধে আলতার রং। কিন্তু রং তো থাকারই কথা ছিল। হয় তো নিবারণবাবুর নিজের ব্যক্তিগত আদর্শে আর কিঞ্চিৎ আর্থিক আসক্তিতে সে রংকে কিছু নিস্প্রভ হতে দিয়েছেন। আর ভীরু মুখচোরা রমেন জাঁদরেল বাপের সামনে যেমন মাথা তুলতে পারেনি, তেমনি ভুলতে পারছে না অর্ধশিক্ষিতা সাধারণ একটি বাঙালী মেয়ের পতিত্ব বন্ধু-সমাজে তাকে পতিত ক'রে রেখেছে। আসলে স্ত্রীর শিক্ষা এবং রূপ তো স্বজনবন্ধুদের কাছে আত্মমর্যাদা বাড়াবার জন্যেই। দামী ঘড়ির মত, রুচিসম্মত আসবাবের মত, স্ত্রীও যদি বন্ধুদের সপ্রশংস ঈর্ষা জাগাতে না পারল, তবে আর তার সার্থকতা কি ! মনে মনে হাসল ভবতোষ।

পরদিন ভবতোষ রমেনের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোলো, এবং তার স্ত্রী ও শ্বশুরকুল সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিল। খড়দয়ের বিখ্যাত নিত্যানন্দ পরিবারের মেয়ে। সমস্ত পূর্ববঙ্গে ওঁদের শিষ্যসেবকেরা ছড়িয়ে আছে, তাদের পারমার্থিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের আর্থিক সংস্থান সকলেই অল্পবিস্তর ক'রে গেছেন, রমেনের শ্বশুর কিছু ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে পৈতৃক সম্পত্তিটুকুই কেবল গ্রহণ করেছেন। শিষ্যমহল অন্য সরিকদের কাছে বিক্রি ক'রে দিয়ে মহকুমা শহরের আদালতে পেস্কারী নিয়েছেন ; বয়েসের সময় রোজগার নিতান্ত কম করেননি, পৈতৃক তালুক এবং খামার দুই-ই কিছু কিছু বাড়িয়েছেন।

এক পুরুষে এ কালের আদবকায়দায়ও নিতান্ত কম অগ্রসর হননি। মেয়েকে ইংরেজী স্কুলের থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছেন। দু'একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছেন এবং স্বামীর বন্ধুবান্ধব দেখলে যে, এক হাত ঘোমটা টানতে হয় না এটাও সে বাপের বাড়ি থেকে শিখে এসেছে।

সব তথ্য একে একে সরবরাহ করে রমেন বলল, 'সুতরাং বুঝতেই পারছ ভবতোষ পিতৃদেবের অভিমতে আফশোষের আমার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।'

ভবতোষ বলল, 'সেটা কেবল পিতৃদেবের অভিমত তাই বা ভাবছ কেন, যাই হোক, বউতো আগে দেখাও। তারপরে বিচার করে দেখব, আক্ষেপ যথার্থই তোমার কর্তব্য কিনা।'

'আচ্ছা তাহলে তোমার রায়ের প্রতীক্ষাতেই রইলাম।'

রমেনের ন-দশ বছরের একটি বোনের সঙ্গে তার স্ত্রী এলো ঘরে। ভবতোষ আড়চোখে দেখে নিলে মেয়েটিকে, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হোলো একেবারে সোজাসুজি তাকালেও ক্ষতি ছিল না। রমেনের বিনয় যে এমন নির্মমভাবে সত্য তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বছর আঠারো-উনিশ হবে বয়স। আর এই বয়সের যৌবনটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পুরুষের চোখে মেয়েদের যৌবনই যথেষ্ট নয় ; তার ওপর নিজের শ্রেণীগত শিক্ষার আর রুচির প্রলেপ থাকা চাই। একবার গাঁয়ের কোনো এক আত্মীয় বাড়িতে গিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভবতোষ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল তার নাকে নাকছাবি দেখে। এই মেয়েটির নাকে অবশ্য নাকছাবি নেই, কিন্তু সমস্ত মুখে স্থূল সারল্যের সঙ্গে অদ্ভুত একটু চতুর মনোভাবের ঢং মিশান রয়েছে। তা যেমন হাস্যকর তেমনি অশ্লীল, মেয়েটি যেন ইতিমধ্যেই জগৎরহস্যের পার দেখে ফেলেছে। পুরুষের স্বভাব, মেয়েদের সম্বন্ধে তার সমস্ত বাসনা কামনার স্বরূপ—কিছুই যেন ওর জানতে বাকি নেই।

ভবতোষ দু'হাত তুলে ছোট একটি সপ্রতিভ নমস্কার জানিয়ে বলল, 'বসুন, রমেন যে এমন লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করে ফেলবে, তা আমি আশঙ্কাই করিনি, মিষ্টান্নের খরচ বাঁচাবার মতলব বোধ হয় গোড়া থেকেই ছিল, না হলে একটা খবর অন্তত দিতে পারত। বা, বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন যে।'

মাধুরী নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সব চেয়ে দূরের চেয়ারটায় গিয়ে বসল। রমেনের বন্ধুদের তার ভালো লাগে না, এরা যেন কেবল যাচাই করবার জন্যে আসে তার কতটুকু বিদ্যা, কতটুকু বুদ্ধি, কতটুকু রূপ। বিয়ের চার-পাঁচ বছর আগে থাকতে, এই যে যাচাই-বাছাই আরম্ভ হয়েছে এর যেন শেষ নেই। ভেবেছিল বিয়ে হয়ে গেলে আর এসব বালাই থাকবে না, কিন্তু ব্যাপারটা ইদানীং যেন আরো বেড়েছে। স্বামীর নিত্য নতুন বন্ধু আসবে আর তাদের সামনে ভেবেচিন্তে ওজন ক'রে ক'রে কথা বলতে হবে, জবাবটা একটু কাঁচা হয়ে গেলেই স্বামীর মান যায়, মন পাওয়া যায় না।

রমেন একেকদিন স্পষ্টই বলে, 'মানুষের সঙ্গে কথা বলতেও শেখনি।'

মাধুরী ক্রুদ্ধভাবে জবাব দেয়, 'না শিখিনি তো, তার হবে কি, আমি লেখাপড়া শিখিনি, দেখতে ভালো না, এ কথা তো সব বন্ধুকেই তুমি বলে দিয়েছ, তবে আর তোমার লজ্জা কিসের ? এতই বলেছ আর একটু বাড়িয়ে বলতে পারলে না আমার বউ বোবা, একেবারেই কথা বলতে পারে না, তাহলে তুমিও বাঁচতে আমিও বাঁচতুম।'

মাধুরীর কথার ঝাঁঝে তখনকার মত রমেন নিজেই বোবা হয়ে রয়েছে।

নমস্কার বিনিময়ের পর একটু চুপ করে রইল ভবতোষ, কি কথা বলা যায় এর সঙ্গে, তারপর বলল, 'কই আমার কথার জবাব দিলেন না ?'

একটু যেন চমকে উঠল মাধুরী, 'কোন কথার ?'

'মিষ্টান্ন থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম কেন ?'

'ও, তা আমি কি জানি ?'

'কিচ্ছু জানেন না ?'

'নিশ্চয়ই আপনাদের ভাগ্যে ছিল না।'

ভবতোষ একবার রমেনের মুখের দিকে তাকাল। স্ত্রীর এমন নির্বোধ জবাবে তার মুখ হতাশায় ম্লান।

ভবতোষ বলল, 'যা বলেছেন। আমাদের ভাগ্যই খারাপ, রমেনের কিন্তু ভাগ্য ভালো।'

'কেন, একথা বলছেন যে ?'

'কেন বলছি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।'

ভবতোষের দিকে তাকাতেই মাধুরী সলজ্জে চোখ নামাল।

'আপনি ঠাট্টা করছেন। এতো সবাই জানে, আমাকে ওঁর পছন্দ হয়নি।'

'এই সব বুঝি ও বলে বেড়ায় ?'

'বলেই তো, সকলের কাছেই বলে।'

'কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। ওর মুখের কথা আর মনের কথা এক নয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যে ভালোবাসে এ কথা বন্ধুদের কাছে অস্বীকার করতে তারা কম ভালোবাসে না।'

'তাই নাকি ? আপনি জানলেন কি ক'রে ? বিয়ে করেছেন বুঝি ?'

'উঁহু, ঠিক ধরতে পারলেন না, এ সব কথা লোকে বিয়ে করার আগেই শেখে আবার বিয়ে করার পরেই ভুলে যায়।'

মাধুরী হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই, যাই চা ক'রে নিয়ে আসি।'

ভবতোষ বলল, 'আর আপনার কাছে কথা গোপন করবার জো নেই। এতক্ষণ ধরে প্রাণটা চা-চাই করছিল বটে,—কি ক'রে বুঝতে পারলেন বলুন তো ?'

মাধুরী দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে একবার ফিরে তাকিয়ে বলল, 'ও আমরা বুঝতে পারি।'

সে ঘর থেকে চলে গেলে ভবতোষ রমেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চমৎকার মেয়ে, আমার তো বেশ লাগল।'

রমেন বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ।'

ভবতোষ বলল, 'হুঁ, আমি ঠাট্টা করবার আর মানুষ পেলাম না, কত বড় রসবোধ তোমার যে, তোমার সঙ্গে আমি ঠাট্টা পরিহাস করতে যাব, একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি এই বউকে কেউ খারাপ বলে ?'

বন্ধুর তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হওয়ার চেয়ে মনে মনে যেন একটু খুশিই হোলো রমেন, 'কিন্তু ওর মধ্যে কী এমন দেখতে পেলে বল তো ?'

বন্ধুর মনে আনন্দের আমেজ লেগেছে দেখে ভবতোষ মনে মনে হাসল, তারপর বলল, 'সে যদি আমার দুটো চোখ তোমাকে ধার দিতে পারতাম তা হলে বুঝতে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়, তাই আমি এক মুহূর্তে যা দেখলাম জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে একটু একটু ক'রে তোমাকে তাই দেখতে হবে।'

রমেন বলল, 'তোমার সবটাতেই হেঁয়ালী।'

হেঁয়ালীই বটে, কিন্তু বেশ লাগে মাঝে মাঝে এমন হেঁয়ালী করতে, বিশেষত জীবনটা যখন এত কাঠখোট্টা এত নীরস, একেবারে জলের মত পরিষ্কার আর জলের মত পানসে, তখন মাঝে মাঝে চেষ্টা ক'রে যদি একটু দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর ছোঁয়াচ তাতে লাগাতে পারা যায় মন্দ কি, আর তো কিছু করবার শক্তি নেই, কেনো দিক থেকেই জীবনটাকে একটু মোড় ফেরান যায় না ; কেবল যত ইচ্ছা যত খুশি বানানো যায় কথা, আর সেই মনগড়া কথা দিয়ে কেবল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া যে-জীবনকে যে-জগৎকে কিছুতেই গড়ে নেওয়া গেল না।

তারপর থেকে ভবতোষ প্রায়ই আসে রমেনদের বাড়ি। চা খায় আর কথা বলে ; অফিস আর সংসারের ঝামেলার ফাঁকে ফাঁকে অবসরটা বেশ কাটে। এ যেন একাধারে তার খেলা আর কর্তব্য ! দাম্পত্য জীবনে সুখী করতে হবে বন্ধুকে। সাধারণ আটপৌরে স্ত্রীকে প্রেয়সী বানিয়ে তুলতে হবে।

নিজের শক্তির পরিচয়ে ভবতোষ নিজেই বিস্ময় বোধ করে, কোনোদিন কাব্যচর্চার ধার সে ধারেনি, নিতান্ত কাঠখোট্টা বস্তু-জগতের মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই নানা দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে আসতে হয়েছে। নরম ভাবালুতা তার ধাতে নেই। কিন্তু দরকার হলে সেও যে এমন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে তা কে জানত।

মাধুরী সম্বন্ধে তার বাছা বাছা চমকপ্রদ বিশেষণগুলিতে রমেন খুশি হয়, চাপা লজ্জায় আর আনন্দে মাধুরীর শ্রীহীন সৌন্দর্যহীন ভোঁতা মুখও সুন্দর দেখায় ; কিন্তু সবচেয়ে খুশি হয় ভাবতোষ নিজে। এক একটি ধারালো শব্দ তার মুখ থেকে খসে পড়ে আর তার ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত পৃথিবী যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে।

অফিসের ফাইলের পাতা উল্টাতে উল্টাতে কিংবা কোনো সুপিরিয়র অফিসারের সামনে, হয়তো বা মায়ের সঙ্গে কোনো বৈষয়িক পরামর্শ করবার সময়—নিতান্ত অস্থানে অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কখন যে, একেকটি কথা মনের ভিতর থেকে নীল পদ্মের মত ভেসে ওঠে তার ঠিক নেই, আর সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মন প্রসন্ন মাধুর্যে পূর্ণ হয়ে যায়। চোখের সামনে ভাসতে থাকে রমেনের ছোট ঘরখানা ; রমেন, তার স্ত্রী, ভবতোষ আর তার অফুরন্ত কথার ঝরণা।

নিবারণবাবু এবং পরিবারের অন্য সকলেই বেশ কৃতজ্ঞ ; রমেনের মুখে হাসি ফুটেছে। হাসি ফুটেছে মাধুরীর মুখে। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে ভবতোষ, যে রমেনের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের মত নয়, যে স্ত্রীর বিদ্যা এবং শ্রীহীনতার ইঙ্গিত দিয়ে রমেনকে ক্ষেপিয়ে তোলে না। ভবতোষ মনে মনে হাসে : সেও অবশ্য ক্ষেপিয়েই তোলে কিন্তু এ আরেক রকমের ক্ষেপামি। সুস্থতার সঙ্গে এই ক্ষেপামির রাসায়নিক মিশ্রণ না ঘটলে বঙ থাকে না পৃথিবীতে, রস থাকে না।

রমেন আর মাধুরী সিনেমায় যাবে, সঙ্গী ভবতোষ। খেয়াল হোলো জ্যোৎস্না রাত্রে নৌকো করে

ওরা গঙ্গায় বেড়াবে, ভবতোষ সঙ্গে আছে। ভবতোষ না হলে ওরা অসম্পূর্ণ। আর ওরা সামনে না থাকলে, সঙ্গে না থাকলে, ভবতোষের কথার উৎস অমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভরে ওঠে না।

সেদিন অফিস ছুটি। কিন্তু সাংসারিক কাজে ছুটি নেই। সমস্ত দিনটা মায়ের ফাইফরমাস খাটতে হোলো। বোনদের আবদার মত কিছু জিনিস আনতে হোলো বাজার থেকে। ছোট ভাই এসে চেপে ধরল, তার অঙ্ক বুঝিয়ে দাও। সকলের দাবি মিটিয়ে ভবতোষ একটু বাইরে যাচ্ছে, মা ডেকে বললেন, 'এই রোদ্দুরে কোথায় বেরুচ্ছিস খোকা, এখনো তো তিনটে বাজেনি।'

ভবতোষ একটু রুক্ষভাবে বলল, 'কেন আরো কিছু দরকার আছে নাকি, বলে ফেলো '

'না, আমাব আর কিছু দরকার নেই। চা-টা খেয়েই না হয় বেরুতিস।'

'ও, সে চায়ের তো তোমাদের অনেক দেরি, আমার একটু কাজ আছে বাইরে।'

রান্নাঘরের সামনে দিয়েই পথ। সেটুকু অতিক্রম করতে না করতেই ছোট বোন নীলিমা এসে সামনে দাঁড়াল। হাতে চায়ের কাপ, অল্প অল্প রুপালি ধোঁয়া উঠছে।

নীলিমা হেসে বলল, 'তোমার কাজ যে কোথায় তাতো জানি রাঙাদা, চা-টা খেয়েই যাও, তাতে অন্য জায়গায় আর এক কাপ খাওয়ার নিশ্চয়ই বাধা হবে না।'

অসাময়িক এবং অপ্রত্যাশিত চায়ে তৃপ্ত হয়ে ভবতোষ বলল, 'খুব যে কথা শিখেছিস, কোথায় যাচ্ছি কি ক'রে জানলি?'

'সেটা জানা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু আশ্চর্য তোমার পছন্দ।'

ভবতোষ সকৌতুকে বলল, 'কেন পছন্দটা এমন মন্দ দেখলি কিসে।'

নীলিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'না মন্দ আর কি। তবু যদি রমেনদার বউকে স্বচক্ষে না দেখতাম।'

রমেনদার স্ত্রীর প্রসঙ্গে নীলিমার কাছে ভবতোষ নিজেই এমন অনেকবার মুখ বাঁকিয়েছে, কিন্তু আজ নীলিমার এই মুখ বাঁকানো—তীরের বাঁকা ফলার মত গিয়ে তার হৃদয়ে ঢুকল। অথচ কথাটি তো সত্যি। প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই মাধুরীর মধ্যে। আর এই না থাকায় কিছুমাত্র ক্ষতিও নেই ভবতোষের। তবু একটা তীব্র বেদনায় মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রমেন মাধুরীকে নিজের লেখা একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছিল, ভবতোষ এসে ঘরে ঢুকল।

'ইশ রসভঙ্গ ক'রে ফেললাম নাকি?'

মাধুরী একটু সরে বসে সলজ্জভাবে বলল, 'না-না, আসুন আসুন, আমি তো ভাবতেই পারিনি এই দুপুরে—'

ভবতোষ চেয়াব টেনে বসে বলল, 'আমাব দুর্ভাগ্য, অথচ আমি যদি বলি এই দুপুর ভবে আমি কেবল এই কথাই ভেবেছি তাহলে বমেন গল্প রেখে এখুনি লাঠি নিয়ে আসবে, সুতরাং সে কথা মনেই চাপা থাক। গল্পটা শেষ করে ফেল রমেন।'

মাধুরী বাধা দিয়ে বলল, 'না না, ও থাক। লেখা গল্পের চেয়ে মুখের গল্পই আমার ভালো লাগে, ভগবান যখন মুখ দিয়েছেন তখন কেন যে, মানুষ গল্প না বলে লিখতে যায় আমি বুঝতে পারি না।'

ভবতোষ বলল, 'আমিও না। কিন্তু অমন করে বলবেন না, বমেন আমাকে এক্ষুনি ঘর থেকে বাব করে দেবে!'

রমেন হেসে বলল, 'যাই বলো ভবতোষ, ইদানীং তুমি যেন বড় ভীরু হয়ে পড়েছ, এত ভীরুতা যেন ভালো ঠেকছে না।'

ভবতোষ মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই শুনুন।'

মাধুরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুই বন্ধুতে বসেই শোনাশুনি করুন, আমি যাই কাজ আছে।'

ভবতোষ বলল, 'বাঃ, আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার কাজের কথা মনে পড়ে গেল।'

মাধুরী বিব্রত হয়ে বলল, 'আচ্ছা বলুন, আপনার কথা শুনেই যাই।'

ভবতোষ বলল, 'আমার প্রথম কথাই হোলো এই, আমার কথা শুনেই যেতে পারবেন না।'

'তবে কি করতে হবে?'

'শুনে বসে থাকবেন এবং বসে শুনতে থাকবেন।'

মাধুরী বলল, 'বাঃ, আপনার আবদার তো কম নয়, আর আমার কাজ ক'রে দেবে কে ? বাজে কথা ছাড়ুন, কি বলবেন চট ক'রে বলে ফেলুন দেখি।'

মাধুরীর ভাবান্তরটা ভবতোষ লক্ষ্য না ক'রে পারল না। এই রূপহীনা অর্ধশিক্ষিতা মেয়েটি আত্মপ্রত্যয়ে হঠাৎ এমন দৃঢ় হয়ে উঠল কি ক'রে ?

ভবতোষ বলল, 'একটি মেয়ে আপনার নিন্দা করছিল।'

'আমার ? কেন ?'

'কেন আবার ? নিন্দার কি কোনো কারণ থাকে ? বলছিল আপনার নাকি রূপ নেই।'

একবার আরক্ত হয়ে মাধুরীর মুখখানা আরো ম্লান হয়ে উঠল, 'সে কথা তো সত্যিই।'

ভবতোষ বলল, 'না সত্যি নয়, রূপ ধরবার মত চোখ সকলের থাকে না। আর রূপটা বড় কথা নয়। আমরা পাঁচজনে মিলে তার একটা বাঁধা-ধরা সাধারণ মাপকাঠি তৈরি করেনি। আমরা যাকে বলি অসাধারণ তাও সেই কাঠির মাপেই মাপা। সেই মাপের একটু এদিক ওদিক হলে আর রূপ আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সে আমাদের দৃষ্টিরই দুর্বলতা। রূপ দিয়ে কি হবে, আপনার স্বরূপ আছে, যা রূপের চেয়ে অনেক দামী।'

মাধুরীকে যেতে দেখে ভবতোষ বলল, 'ও কি, চলে যাচ্ছেন যে ?'

মাধুরী চলে যেতে যেতে বলল, 'এই বুঝি আপনার কাজের কথা, ফের যদি আবার আপনি ও রকম পাগলামি শুরু করেন'—বলতে বলতে মাধুরী বেরিয়ে গেল।

রমেনও একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'সত্যি ভবতোষ, হোলো কি তোমার, পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি ?'

তার কণ্ঠের বিরক্তি চাপা রইল না।

হঠাৎ ঘা খেয়ে ভবতোষ ম্লান হেসে উঠে দাঁড়াল, 'তোমার বউকে একটু ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি যে ক্ষেপে যাবে—'

'না না, বসো বসো।'

কিন্তু ভবতোষ আর বসল না। না আর নয়, আর তাকে দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই। এবার তার প্রস্থানের সময় হয়েছে।

তবু কি অদ্ভুত কথা : রূপ আর স্বরূপ। কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো কথা আরো চমৎকার ক'রে কেন বলতে পারল না ভবতোষ, যাতে মাধুরীর সমস্ত কুশ্রীতা সমস্ত মালিন্য, দেহমনের সকল দৈন্য ঢাকা পড়ে যায় ; যে কথার টুকরো হীরকখণ্ডের মত ওর সমস্ত অঙ্গ ভরে জ্বলতে থাকে !

ভবতোষ একবার থমকে দাঁড়াল। এসব কি ভাবছে সে ? না, আর নয়। যথেষ্ট কৌতুক করা হয়েছে। এবার নিজেকে ওদের ভিতর থেকে সরিয়ে আনতে হবে, তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। বন্ধু রমেন ওই কুশ্রী কুরূপা বউকে ইতিমধ্যেই দুর্লভ মাথার মণি ক'রে তুলেছে, হারাই-হারাই ভাবে মন তার শঙ্কিত। এরই মধ্যে ঈর্ষাকাতর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চোখে ভাসতে শুরু করেছে। ভবতোষ নিজের মনেই হাসল। আর নয়, উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে এবার ভবতোষ নিজেকে নেপথ্যে নিয়ে যাবে। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তার।

ভবতোষ ওদের বাড়ির সীমানা পার হয়ে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিন্তু কী অদ্ভুত ভ্যানিটি মেয়েদের, মাধুরীর মত মেয়েও কি ক'রে ভাবতে পারল এই উচ্ছ্বসিত স্তবস্তুতি তার জন্যেই, আর এ সব একেবারে অকৃত্রিম—একটুও ঠাট্টা নয়। আসলে ভবতোষ যদি কারো রূপে মুগ্ধ হয়ে থাকে সে তার আপন কথার মাধুরীর। কিন্তু সে কথা রমেনের বুঝবার সাধ্য নেই, তার স্ত্রীর তো নেই-ই।

ঘুরে ঘুরে কখন এসে ভবতোষ অন্যমনস্কের মত ওদের সদর দরজা দিয়ে ঢুকে ছাদের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা কেউ দেখলে কি ভাববে। এই মুহূর্তেই ভবতোষের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে দিনের মত আবার যদি সে এসে ছাদের আলসে ধরে ঝুঁকে দাঁড়ায় আর ভবতোষকে দেখতে পেয়ে বলে, 'কি চা না খেয়েই পালিয়েছিলেন যে বড় ?'

ভবতোষ বলবে, 'পালাবার কি আর জো আছে !'

মাধুরী হেসে জবাব দেবে, 'জো নেই, স্বীকার করছেন তাহলে ?'

হঠাৎ ভবতোষের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, এক দুর্বোধ্য আনন্দ আর দুঃসহ বেদনায় তার সমস্ত সত্তা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এ কি হোলো, তার অপরূপ কথার মাধুরী কেবল কি পৃথিবীর ওই একটিমাত্র কুরূপা মেয়ের দেহাধার ছাড়া কিছুতেই অন্য কোনো রূপ খুঁজে পেল না ?

অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

আবরণ

পাটের ক্ষেত নিড়িয়ে দুপুর রোদে বাড়ি ফিরে এসে বংশী দেখল ঘরের ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। বিরক্ত হয়ে ঈষৎ কর্কশ স্বরে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বংশী ধমক দিয়ে উঠল, 'দিন দুপুরে দোর এঁটে ঘরের মধ্যে করছিস কি শুনি ? দোর খুলে দে।'

কিন্তু ভিতর থেকে কোন জবাব এল না।

বংশীর গলা আরও চড়ে গেল, 'গেরাহ্যিই হচ্ছে না, বলি খুলবি দোর না বন্ধ করেই থাকবি ?'

এবার চাঁপা স্বামীর চেয়েও উচ্চতর গ্রামে চেঁচিয়ে উঠল, 'না বন্ধ করে থাকব কেন ! নেংটা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোককে দেখাব সোয়ামীর আমার কেরামতি কতখানি। ভাত কাপড়ের কেউ নয় কেবল পীরিতের গোঁসাই।'

বংশী জ্বলে উঠে বলল, 'দিন নেই রাত নেই, চব্বিশ ঘণ্টা কেবল ভাত কাপড়ের খোঁটা। ভাত কাপড় আমি দিই না তো তোর কোন বাপে এসে দেয়রে হারামজাদী। খুলে দে দরজা। নইলে লাথি মেরে ভেঙে ঘরে ঢুকব বলে দিচ্ছি।' বলে বংশী সত্যিই একটা ধাক্কা দিল ঝাঁপে।

চাঁপা এবার শঙ্কিত কাতর কণ্ঠে বলল, 'এক্ষুনি এসো না কিন্তু, পায়ে পড়ি তোমার—আমি বড় বেসামাল হয়ে আছি।'

'ও', বংশী একটু মুচকি হাসল। তারপর চাঁপা সত্যিই কতখানি বেসামাল হয়েছে দেখবার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখল। এই গরমের মধ্যে সেই ছেঁড়া ময়লা কাঁথাটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে চাঁপা কতকগুলি টুকরো টুকরো ছেঁড়া নেকড়া জোড়া দিচ্ছে।

বংশী জিজ্ঞাসা করল, 'শাড়িখানা একেবারেই গেছে নাকি ?'

চাঁপা চমকে উঠে পিছনে তাকিয়েই বেড়ার ফাঁকে বংশীর দুটো কৌতূহলী চোখ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দুই হাতে সেই ফাঁক চেপে ধরে বলল, 'ছি ছি ছি, আবার এখানে এসে দাঁড়িয়েছ। সরো সরো শিগগির, আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব তোমার জন্যে ?'

বংশী সরে এসে বলল, 'আমি তো আর পরপুরুষ নই—সোয়ামী। আমার কাছে অত লজ্জা কিসের তোর ?'

চাঁপা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'আহাহা, কি সাধের সোয়ামী আমার। এই এক বছরের মধ্যে একখানা কাপড় দিতে পারল না জুটিয়ে তার আবার সোয়ামী, বলতে লজ্জা করে না ?'

কাপড় চাঁপার নেই অনেক দিন ধরেই। কিন্তু বংশী কি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে ? সে কি কম চেষ্টা করেছে হাটে গঞ্জে একখানা কাপড়ের জন্যে ? কিন্তু কোথাও নেই কাপড়। সব দোকানদারের মুখেই এক কথা। নেই, নেই। ওবার যেমন চাল ছিল না, এবার তেমনি একগাছি সুতোও কোথাও জুটছে না। বংশীর নিজের জন্য ভাবনা নেই। কাপড়ে তার দরকার করে না। সেই সস্তার বাজারেই বছরে একখানার বেশি তার কাপড় লাগেনি। এখন তো চব্বিশ ঘণ্টা গামছা পরেই কাটে। কেবল হাটে বাজারে বের হবার সময় ন্যাকড়া-ট্যাকড়া যা হোক কিছু একটু জড়িয়ে নিলেই হয়। কিন্তু অমন সোমত্ত বউয়ের দেহ কি গামছায় ঢাকে ? আর সেই গামছাই কি ছাই আছে দেশে ! এক হাতি সওয়া হাতি গামছার দাম পাঁচ সিকে দেড় টাকা। বংশী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কিন্তু এমন নেংটা হয়ে পড়লি

কি করে ? সকালেও তো কি একটা পরে ছিলি ।'

চাঁপা বলল, 'হুঁ—বেনারসী পরে ছিলাম । শাড়ি গয়নায় গা তো আমার ভরে রেখেছ কি না । জল ভরে কলসীটা কেবল কাঁখে তুলতে গেছি, কাপড়খানা একেবারে রঞ্জে রঞ্জে খসে গেল । বাড়ি আর আসতে পারি না এমনি দশা । গয়লাদের বিনোদ ছিল ঘাটে । আমার ইচ্ছা করতে লাগল গলায় দড়ি দি ।'

বংশী ধমক দিয়ে বলল, 'অমন দড়ি দড়ি করিস নে । মুখের এক লব্জ হয়ে গেছে কেবল দড়ি আর দড়ি । শেষ পর্যন্ত দড়িতেই টানবে ।'

বংশীর মনে পড়ল, ঝুমুর কান্দির গোকুল মণ্ডলের মেয়ে সত্যিই নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে, কালকের হাটে সব বলাবলি করছিল ।

নদী থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে বংশী বলল, 'ভাতটাত দিবি—না ঘরে খিল দিয়েই থাকবি সারা দিন ?'

চাঁপা সানুনয়ে বলল, 'সব আছে রান্নাঘরে । নিজেই এবেলা নিয়ে থুয়ে খাও ।'

'কেন, তুই আসতে পারবি নে ?'

'অবুঝের মত কথা বলছ কেন ? দেখছ না দশা । কি করে বেরোই ?'

বংশী রাগ করে উঠল, 'ঢং দেখ মাগীর । একেবারে লজ্জাবতী লতা । কাঁথা জড়িয়েই আয় না, না হয় আমি চোখ বুজে থাকব, চাইব না তোর দিকে । রঙ্গ করিসনে এখন । খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট । নিজে তো এক গাদা পান্তা সেঁদিয়ে বসে আছিস্ ।'

চাঁপাও সক্রোধে বলল, 'আছি তো আছি । পারব না আমি বেরুতে । কেন, একবেলা বেড়ে খেতে পারো না ? হাতে কি কুট হয়েছে ?'

বংশী বলল, 'তেজ দেখ মাগীর । আচ্ছা আসি খেয়ে । দেখব'খন তেজ তোর ভাঙা যায় কি না ।'

ঘরে গিয়ে দেখে ভাত বাড়াই আছে । সব গুছিয়ে টুছিয়ে ঠিক করে রেখে গেছে চাঁপা । কলমী শাক চচ্চড়ি আর তার পাশে খানিকটা কাসুন্দি আর একটি কাঁচা-লঙ্কা সযত্নে রেখে দিয়েছে । দেখে মনটা যেন প্রসন্ন হল বংশীর, তবু বউটা খাওয়ার সময় কাছে বসে না থাকলে কেমন যেন খালি খালি লাগে ।

খেয়ে এসে তামাক সেজে বহুক্ষণ ধরে দাওয়ায় বসে বসে নিবিষ্ট মনে বংশী হুঁকা টানল, তারপর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কি সারা দিন রাত কি আজ বাইরেই ফেলে রাখবি না কি ।'

কিন্তু চাঁপার কোন সাড়া পেওয়া গেল না । ভারী রাগ বউটার, মনে মনে ভারী অভিমান । হুঁকো টানতে টানতে তারপর হঠাৎ এক দুষ্ট বুদ্ধি খেলল বংশীর মাথায় । দাওয়ার বেড়ায় গোঁজা কাঁচিখানা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে ঝাঁপের এক পাশের দড়ি দিল কেটে । তারপর ঝাঁপটা সামান্য একটু টেনে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল । কিন্তু স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই পা আর এগুলো না বংশীর । একেবারে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ—মাদুরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁপা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে । মোটা আর ময়লা কাঁথাটা লুটোচ্ছে পায়ের কাছে । গরমে বেশিক্ষণ বোধ হয় আর গায়ে রাখতে পারেনি । ঘুমের ঘোরে লাথি মেরে ঠেলে ফেলেছে । পাশে ছেঁড়া টুকরো টুকরো নেকড়াগুলো ইতস্তত ছড়ানো । সেলাই করে সুবিধা হচ্ছে না দেখে গায়ের রাগে চাঁপা নিজেই বোধ হয় সেগুলি আবার টেনে ছিঁড়েছে । পলকের জন্য সেই নিরাবরণ নারী দেহের দিকে তাকিয়ে বংশী চোখ ফিরিয়ে নিল ।

এর জন্য কি কম লোভ ছিল বংশীর । একেক রাত্রে কি কম খোসামোদ করেছে বউকে ? আজ আর কোন বাধা নেই । কিন্তু আজ দুটো চোখ ভালো করে বংশী মেলতে পারল না । ছি ছি ছি ।

তাড়াতাড়ি সেই মোটা কাঁথাটা স্ত্রীর দেহের ওপর বংশী তুলে দিতে গেল ।

একটু নাড়াতেই চমকে জেগে উঠল চাঁপা, তারপর স্বামীর দিকে এক দুর্বোধ্য অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আবার ঢাকতে যাচ্ছ কেন, নাও ওটাও খুলে নাও ।'

বংশী তার দিকে তাকিয়েই বলল, 'টাকা নিতে এসেছিলুম । শহর থেকে নিয়ে আসছি কাপড় ।'

বাঁশের চোঙার ভিতর থেকে খান চার পাঁচ এক টাকার নোট বের করে নিয়ে বংশী দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু কি দেখল বংশী ? বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূরে সে এসে পড়েছে। কিন্তু চাঁপার সেই দেহ কিছুতেই যেন চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চাইছে না। ছি ছি ছি।

যে ভাবেই পারুক চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক, কাপড় একখানা আজ এনে দিতেই হবে বউকে, নইলে গোকুল মণ্ডলের মেয়ের মত চাঁপাও হয়তো কখন গলায় দড়ি দিয়ে বসবে। যে লজ্জা চাঁপার আর দিনে দুপুরে যে কাণ্ড আজ করে বসল বংশী।

কাঠ ফাটা রোদে মাইল আড়াই রাস্তা পাড়ি দিয়ে বংশী গুপীগঞ্জে এসে পৌঁছল। গত হাটবারেও শহরের সব দোকানে বংশী একখানা কাপড়ের জন্য প্রায় মাথা কোটাকুটি করেছে। রাগ করে ভেবেছে আর আসব না, কিন্তু না এসে উপায় কি ! কাপড় আজ জোটাতেই হবে।

পাড়া-গাঁ-ঘেঁষা ছোট গঞ্জ। হাটবার ছাড়া দুপুরের পরে আর কোন ভিড় থাকে না। সকালে বাজার মেলে, দুপুরের আগেই একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করে। গরমের দুপুরে ঘুমোবার উপায় নেই, নকুল সা'র মুদী দোকানের সামনে যে অল্প একটু ছায়া পড়েছে সেখানে মাদুর পেতে গঞ্জের দোকানীরা খোলা গায়ে তাস খেলতে জড় হয়েছে। একজন খেলুড়ের কাঁধের ওপর তিন চার জন করে দর্শক এবং পরামর্শদাতা এসে ঝুঁকে পড়েছে। চলতে চলতে বংশী সেখানে এসে থেমে দাঁড়াল। কাপড়ের দোকানের মালিক সুবল মল্লিকও আছে এই দলে।

বংশী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'মল্লিক মশাই ও মল্লিক মশাই, একবার আসবেন একটু এদিকে ?'

সুবল বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে তাকিয়ে বংশীকে দেখে আরও অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল, 'কি বলছিস ?'

'আজ্ঞে একবার দোকানে যদি একটু আসতেন।'

'দোকানে ! দোকানে এসে করব কি ? এই পরশুদিন না বলে দিলুম তোকে, কোনরকম কাপড়ই নেই, ভেবেছিস রাতারাতি গাড়িতে গাড়িতে কাপড় এসে হাজির হয়েছে, না ?'

বংশী বলল, 'আজ্ঞে আট হাত হোক ন'হাত হোক কোনরকম একখানা শাড়ি যদি দিতেন—'

সুবল বাধা দিয়ে বলল, 'আমি গড়িয়ে দেবো, না ? কাপড় কিনতে হয় গরমেন্টের কাছে যা, থানায় যা, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যা। বেচা কেনা ব্যবসা বাণিজ্য দোকানদারদেব হাত থেকে উঠে গেছে—বুঝলি ?'

বংশী বলল, 'আজ্ঞে ঘরের মেয়েছেলের দিকে যে আর চাওয়া যায় না, কত্তা।'

কে একজন রসিকতা করে বলল, 'তাহলে বাইরের মেয়েছেলের দিকে তাকাবি।'

বংশী তার দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুবলকে জিজ্ঞেস করল, 'কাপড় আসেনি তাহলে ?'

সুবল বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, না, কতবার বলব।'

বাকি দু তিনটে কাপড়ের দোকান ছিল অন্য গলিতে, বংশী সেগুলিতেও একে একে চেষ্টা করে দেখল। কিন্তু কোন মহাজনের ঘরেই কাপড় নেই। কাপড় চাইতে গেলে সবাই ধমকে উঠে, মারতে আসে। কত ভদ্রলোকের বউঝিরা আছে নেংটা হয়ে, তার চেয়ে ওর বউয়ের লজ্জা হল বেশি।

ঘুরে ঘুরে দিন কেটে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত আজও কোন সুবিধা হল না কাপড়ের। কোন্ মুখে দাঁড়াবে গিয়ে বউয়ের কাছে। চাঁপার কথা মনে হতেই বংশীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে বংশী আবার গঞ্জের একেবারে উত্তর প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হল। এখানে দোকানপাট বেশি নেই। কেবল একটা বিড়ির দোকান, আর একটা সোডালেমনেডের। পিছনে ঘনবদ্ধ কলাগাছের সারি। তার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ কয়েকটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছে রাস্তায়। সেদিকে চেয়ে বংশী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। শহরের পতিতা পল্লী।

ঠিক সেই সময় সুখদাও এল বিড়ি কিনতে। উদ্দেশ্য কেবল বিড়ি কেনাই নয়। নিজেকে বিজ্ঞাপিত করাও। কাল থেকে ঘরে কোন খদ্দের আসেনি। হঠাৎ দেশসুদ্ধ লোক যেন সচ্চরিত্র হয়ে

গেছে।

সুখদা যতক্ষণ ধরে বিড়ি কিনল, বিড়িওয়ালার সঙ্গে হেসে হেসে রসিকতা করল. বংশী অপলকে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কমলা রঙের শাড়িখানি ভারি চমৎকার মানিয়েছে। সুখদাও তার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে সামনের কলাবাগানের দিকে এগিয়ে গেল।

বংশী খানিকক্ষণ ইতস্তত করল। তারপব দ্রুত পায়ে সুখদার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। আরও দু-তিনটি মেয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের অতিক্রম কবে সুখদা বংশীকে একেবারে নিজের ঘরেব সামনে নিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল, তারপর একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'অতক্ষণ ধরে কি ভাবছিলে বল দেখি ? যাবো কি যাবো না—নয ? না এসে কি আব জো আছে।'

তারপর অদ্ভুতভাবে হাসে মেয়েটি।

বংশী বলল, 'জো নেই ?'

'বাবারে বাবা—আবার তর্ক কবে। বাইবে কেন, ঘরের ভিতরে এসে যত খুশি তর্ক করো না। কতক্ষণ বসবে ?'

'বেশিক্ষণ নয়।'

'বাব্‌বা ! ও বেলায় দেখি জ্ঞানের নাড়ি খুব টনটনে। তা যতক্ষণই হোক দু টাকাব কমে কিন্তু পারব না, দেখছ না জিনিসপত্রের কি দর। এসো।'

বংশী পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢুকল। মেঝেতে পাতা বিছানা। সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুখদা বলল, 'বোস, অমন আড়ষ্ট হয়ে রইলে কেন গো, হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বোসো না।'

বংশী বলল, 'এই তো বসেছি।'

তারপর বংশী ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। টিনের ছোট একটি খুপরী—পাখির খাঁচার মত ঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে খানকয়েক বাসন কোসন, পান খাওয়ার সরঞ্জাম, দেয়ালে টাঙানো ছোট মত একখানা আয়না, আর দড়িতে ঝুলানো একখানা জীর্ণ গামছা।

সুখদা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে হাসল, 'ধন দৌলত দেখছ বুঝি ঘরের। কিছু নেই—ওবারের দুর্ভিক্ষে সব বেচে খেতে হয়েছে। তারপর হল অসুখ'—হঠাৎ সুখদা থেমে গেল, তারপর বলল, 'দেরি করবে না-কি বেশি ? তাহলে কিন্তু আরো বেশি লাগবে।'

বংশী অদ্ভুত একটু হাসল, 'তা হলে আর দেরি করে লাভ কি।' সুখদা হাত পেতে বলল, 'তবে—'

বংশী ট্যাঁক থেকে দু'খানা এক টাকার নোট সুখদার হাতে ফেলে দিল।

সুখদা উঠে পড়ল। দড়ি থেকে গামছাটা পেড়ে নিয়ে শাড়িখানা বদলে সযত্নে দড়িতে আবার টাঙিয়ে রাখল, তারপর বিছানায় এসে বসল—বলল, 'ওমা, ওদিকে যাচ্ছ কেন ?'

বংশী ততক্ষণ এক লাফে উঠে দড়ি থেকে শাড়িটা পেড়ে বগলে পুরেছে।

সুখদা সেদিকে চেয়ে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা কোথায় যাব গো ! এই জন্যই ঘরে এসেছ না কি তুমি।' বংশীকে বিনা বাক্যে দোরের দিকে এগুতে দেখে সুখদা তাকে গিয়ে একেবারে জাপটে ধরল, তারপর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ও পদ্ম, ও বিন্দি—'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বংশী মুখ চেপে ধরল সুখদার, এবং হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে টান দিয়ে তার পরনের গামছা খুলে নিয়ে শক্ত করে মুখ বেঁধে ফেলল। সুখদা হাত দিয়ে সেই বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছে দেখে একহাতে তার দুটো হাত জোর করে ধরে আর এক হাতে বেড়ায় টাঙানো দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে কষে দু'হাত বেঁধে ফেলল সুখদার। ধস্তাধস্তিতে সুখদা ততক্ষণে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে গেছে। এতক্ষণে বংশী নিশ্চিন্ত। শাড়িটা বগলদাবা করে মৃদু হাস্যে একবার সুখদার দিকে তাকাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চোখের সামনে সেই উলঙ্গ অনাবৃত নারী-দেহ। হঠাৎ এই রকম আর একটা অসহায় দেহ মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ যে আরো দুঃসহ, আরো কুশ্রী, আরো কদর্য। শাড়ি পরবার ধরনে যাকে আঠার উনিশ বছরের যুবতী বলে মনে হয়েছিল, অনাবৃত দেহে তার শিথিল চর্ম প্রৌঢ়ত্ব বেরিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় সর্বাঙ্গে চাকা চাকা ক্ষতচিহ্ন, বুকের উপর বিকৃত, বিস্তীর্ণ দুটি মাংসপিণ্ডের মাথায় বড় বড় দুখানা ঘা থক থক করছে।

মুহূর্তকাল আড়ষ্ট কুঞ্চিত দেহে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বংশী। তারপর হঠাৎ দুই চোখ বুজে সেই

কমলা রঙের শাড়িখানা ছুঁড়ে দিল সুখদার কুৎসিত দেহটার ওপরে।
ততক্ষণে পদ্ম আর বৃন্দারা রুদ্ধ দ্বারের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আর পিছনে পিছনে এসে পৌঁছেছে থানার নরহরি কনস্টেবল।
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

পদক

খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে শান্তি নেই, এমন কি মনটা অস্বস্তিতে ভরা থাকলেও বাড়িতে এতটুকু মেজাজ দেখাবার জো নেই কৈলাস কর্মকারের। চঞ্চলা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। গালিগালাজের দরকার হয় না, গলাটা একটু রুক্ষ হলেই মুখ তার ভার হয়ে যায়। তারপর নতুন একদফা শাড়ি গয়না ছাড়া কিছুতেই আর হাসি ফোটে না সে মুখে।

অথচ মন-মেজাজ খারাপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে কৈলাসের। ব্যবসা-বাণিজ্যে কেবল মন্দাই নয়, কিছুকাল ধরে প্রায় বন্ধ হবার জো হয়েছে। বিক্রি-বন্ধকের রেওয়াজ যেন গাঁ থেকে উঠে গেছে হঠাৎ। মাসখানেক হতে চলল, এক রতি সোনা-রূপা আসেনি বাড়িতে। ওপাড়ার যুধিষ্ঠির মণ্ডলের বউ সেদিন কাঁধ-বসা ছোট একটি পিতলের কলসী নিয়ে এসেছিল সন্ধ্যার সময়। এত পুরনো যে, রঙ প্রায় কালো হয়ে গেছে। কিন্তু তার বদলেই তাকে দিতে হবে পাঁচ টাকা। কৈলাস তাকে গাল দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। 'তার চেয়ে পুকুর থেকে বরং এক কলসী জলই তুমি তুলে নিয়ে যাও, বউ! খেয়ে পেটও ভরবে, ঘরের জিনিসও থাকবে ঘরে।'

তবু মণ্ডলের বউ যা হোক পুরনো একটা কলসী নিয়ে এসেছিল, কিন্তু হরলাল ঢুলীর স্ত্রী নয়নের আক্কেলখানা দেখ! বেলা দুপুরের সময় একেবারে শুধু হাতে এসে হাজির।

'দশটা টাকা দাও না নারাণের বাপ, ধানের নৌকা এসেছে ঘাটে।'

হাত দু'খানা শূন্য। জীর্ণ আঁচলেও কোন রহস্য আর প্রচ্ছন্ন নেই। তবু কৈলাস সেদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করল, 'একেবারে দশ টাকা! আচ্ছা কি এনেছ বার কর দেখি।'

নয়ন বলল, 'পোড়া কপাল আমার, বার করবার মত কিছু আর বাকি আছে নাকি নারাণের বাপ? একটা কুটোও আর নেই ঘরে। বন্ধক রাখতে চাওতো আমাকে রাখতে পারো।'

নয়ন রসিকতার ভঙ্গিতে মিষ্টি করে একটু হাসল।

আট দশ বছর আগে হলে মাত্র ওইটুকু হাসিতেই চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারত কৈলাসের। কিন্তু সে দিন নেই, সে বয়স নেই, সেই নয়নই কি আর নয়ন আছে! ছেলেমেয়ে মিলে গুটি সাতেক সন্তান হয়েছে নয়নের। আকালের বছরে তাদের চারটি মরেছে। নয়ন নিজেও মরতে বসেছিল। এই দু'তিন বছর পরেও নয়নের দেহ থেকে সেই মৃত্যুর চিহ্ন ভালো করে মিলায়নি। কিন্তু আর এক চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সে চিহ্ন সম্ভাবিত নতুন জীবনের। তবু মৃত্যুর চেয়েও যেন তা বীভৎস। বোধ হয় পুরো দশ মাসেরই পোয়াতী হবে নয়ন। ক্লান্ত দেহের দিকে তাকিয়ে কৈলাস ভাবল। তারপর নীরস রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, 'না ভাই ঢুলী-বউ, তোমাকে বন্ধক রাখতে পারি অত ধনদৌলত আমার ঘরে নেই। তার চেয়ে—'

চুড়ির ঝঙ্কার শোনা গেল দোরের দিকে। কৈলাস চকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকাল। আধো খোলা দরজার পাশে চঞ্চলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৈলাসকে থেমে যেতে দেখে চঞ্চলা ঠোঁট টিপে তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'বল না, কি বলছিলে! এত ভয় কিসের! ঘরে তোমার ধন-দৌলত না থাকে গায়ে গহনা তো আমার আছে। তাই দিয়েই না হয় ঢুলী-বউকে বাঁধা রাখো।'

কৈলাস বিব্রত হয়ে বলল, 'কি যে বল—'

নয়ন চেয়ে দেখল, কথাটা মিথ্যা বলেনি চঞ্চলা। ঘরের সমস্ত ধনদৌলত উজাড় করেই বোধ হয়

স্ত্রীর জন্য গয়না কিনেছে কৈলাস। সারা অঙ্গ সোনায় মুড়ে দিয়েছে। নাকে কানে হাতে গলায় কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। অতিকষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে রাখল নয়ন। কি একটা ব্যথায় বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ক্ষুধার জ্বালার চেয়েও সে যন্ত্রণা যেন বেশি দুঃসহ। এক রতি সোনাদানা কোন দিন গায়ে উঠেনি নয়নের। কিন্তু বাপের দেওয়া রূপার গয়না নিতান্ত কম ছিল না। পায়ে মল ছিল, মোটা মোটা দু'গাছা বালা ছিল হাতে, কানে ঝুমকো ছিল দু'গাছা, কিন্তু আজ কিছুই আর নেই। আকালের বছরে ঘটি-বাটি, মাঠের কাঠা কয়েক জমি, ঘরের ওপরকার করোগেট টিনের চাল পর্যন্ত বিক্রি করে খেতে হয়েছে। সেই সঙ্গে গেছে নয়নের মল, বালা, ঝুমকো। জেলেপাড়ার বাতাসী, তুলসী, মেনকা কারো গায়েই কিছু ছিল না। কিন্তু এক আধখানা করে গয়না আবার দেখা দিয়েছে তাদের গায়ে। মেনকার স্বামী মুকুন্দ তো সোনার নাকফুল গড়িয়ে দিয়েছে বউকে। কি কপাল নিয়ে এসেছিল নয়ন, ঘরের পুরুষ গা থেকে গয়না কেবল খসিয়েই নিল, কোন দিন একখানা পরিয়ে দেখতে জানল না।

নয়নের পলকহীন চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে চঞ্চলা মুখ মুচকে আবার একটু হাসল, 'কি বল ঢুলী-বউ, দেব নাকি খসিয়ে? খুশি হবে তো তাহলে? বাধা পড়বে? পছন্দ করবে, প্রাণভরে ভালোবাসবে আমার টাকপড়া, দাঁতনড়া সোয়ামীকে?'

কথা শেষ না হতে হতে হেসে যেন একেবারে গড়িয়ে পড়ল চঞ্চলা।

বিরক্ত হয়ে এবার ধমক দিয়ে উঠল কৈলাস, 'আঃ থাম দেখি, রঙ্গ-রস সব সময় ভালো লাগে না।'

নয়নের দিকে ফিরে এবার কৈলাস কাজের কথায় মন দিল, 'রঙ্গ-রস রাখো ঢুলী-বউ, কারবারপত্র বন্ধ, টাকা পয়সা আসবে কোত্থেকে! বাঁধা দেওয়ার মত কিছু যদি এনে থাক দেখতে পারি চেষ্টা চরিত্র করে।'

নয়নের ক্লান্ত করুণ মুখখানা এবার কঠিন দেখাল: 'কিছু যদি থাকতই নারাণের বাপ, তোমাকে বার বার বলতে হত না। তোমার দোস্ত চাঁদের কান্দী বিয়ে বাড়ির বায়না রাখতে গেছে। এসেই তোমার টাকা ফেরত দিয়ে যাবে। টাকা মারা যাবে না, নারাণের বাপ। ধানের নৌকা ঘাট থেকে এখনই চলে যাচ্ছে, তাই এসেছিলাম।'

কৈলাস বলল, 'তাই বলে দেশ ছেড়ে তো আর চলে যাচ্ছে না। বায়না সেরে আসুক দোস্ত। সে-ই এসে ধান কিনবে গঞ্জ থেকে। মিছামিছি তুমিই বা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ঢুলী-বউ?'

কৈলাস যেন ভরসা আর আশ্বাস দিচ্ছে নয়নকে। ভঙ্গি দেখে গা জ্বলে গেল নয়নের। অন্য সময় হলে বুড়ো মিনষের এই ঢঙ সে মোটেই নিঃশব্দে সহ্য করত না। কথার তুবড়ি ছুটিয়ে দিত কৈলাসের মুখের ওপর। কিন্তু আজ আর অনর্থক বাদ প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্তি হল না নয়নের। দেহ আর বয় না। সামর্থে কুলায় না ঝগড়া করা। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে নয়ন বাড়ির দিকে পা বাড়াল। কিন্তু পেছন থেকে ফের ডাকল কৈলাস, 'রাগ করলে নাকি ঢুলী-বউ?'

ভারি মমতা কৈলাসের কণ্ঠে। নয়ন রাগ করলে সত্যিই যেন প্রাণে খুব ব্যথা পাবে কৈলাস। দুঃখের আর শেষ থাকবে না। কথার জবাব দিতে ঘেন্না করে নয়নের, আবার জবাব না দিয়েও থাকা যায় না। জিহ্বাটি অস্থির হয়ে মুখের মধ্যে যেন আপনিই নড়ে নড়ে ওঠে। নয়ন মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'রাগ করব কেন? আমার কি আক্কেল নেই যে রাগ করব? আমি কি জানিনে, রাগ করলে মনে দুঃখ পাও তুমি?'

অনেক কাল আগে নয়নের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত কৈলাস। আড়ালে আবডালে, কখনো ভাষায়, কখনো আভাসে প্রণয় নিবেদনও করেছিল বার কয়েক। কিন্তু নয়ন রাজি হয়নি। কখনো হেসেছে, পরিহাস করে বলেছে, 'তোমার দোস্তর তাহলে উপায় হবে কি কর্মকার, নয়নহারা হয়ে সে বাঁচবে কি করে!'

কখনো দিয়েছে ধমক, কখনো ধক্ ধক্ করে কেবল আগুন জ্বলেছে তার চোখে, আজ সেই জ্বালা যেন দেহে মনে জড়িয়ে গেল কৈলাসের। নয়নের চোখে সেই আগুন আর নেই, কিন্তু সাপের জিহ্বার মত বিষ আছে পরতে পরতে। রসনার রসে আর বিষে কোন ভেদ নেই।

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করল কৈলাস। বলল, 'ঠিকই ধরেছ বউ, তুমি রাগ করলে দুঃখ এখনো পাই। কেবল রাগ দুঃখ মিটাবার উপায় পাই নে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

'কর।'

কৈলাস বলল, 'তোমার হাত পা তো দেখছি একেবারে শূন্য, ঝড়ো কাটা। কিন্তু দোস্ত তো দিব্যি গয়না গলায় দিয়ে আজকালও মনের আনন্দে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

নয়নের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, 'তার মেডেলগুলির কথা বলছ ?'

কৈলাস বলল, 'ওই হল, মেডেলই বল আর গয়নাই বলো, একই কথা ! পুরুষ মানুষ তো আর হার, নেকলেস,নাকছাবি, কানপাশা পরে চলতে পারে না, গয়নার সখ তারা ওই মেডেলেই মেটায়। আক্কেলখানা দেখ ! তোমার গায়ে এক রতি সোনা-রূপা নেই আর নিজের—তুমিই বা কি রকম মানুষ ঢুলী-বউ, টাকা পয়সা না দিয়ে যায়, ওগুলিও তো চেয়ে রাখতে পার দোস্তের কাছ থেকে। কচি কচি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর। পয়সার সব সময় দরকার। কিন্তু খালি হাতে কি আজকাল কেউ কাউকে কিছু দেয়—না দিতে পারে ঢুলী-বউ ! দেবে কোন্ ভরসায়, তবু ওই রূপার চাকতিগুলি যদি কাছে রাখো, সময়ে অসময়ে হাত পাতলে দু-চার টাকা অন্তত মেলেই।'

নয়ন স্থির দৃষ্টিতে একবার কৈলাসের দিকে তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা এবার তো কিছু আর হোল না, এর পর থেকে তোমার পরামর্শ মতই চলব কর্মকার। চাকতিগুলি নিজের হাতেই রাখব, দরকার হলে সময়ে অসময়ে যাতে তোমার হাতে তুলে দিতে পারি।'

কথা শেষ করে নয়ন এক ঝিলিক হাসল আর সে হাসি বিষাক্ত তীরের মত গিয়ে বিধল কৈলাসের বুকে।

কেবল কৈলাস কেন, কথাটা নয়নেরও অনেকদিন অনেকবার মনে হয়েছে, শুধু মনে হওয়াই নয়, এ নিয়ে কোন্দলও করেছে নয়ন স্বামীর সঙ্গে।

একটি দুইটি নয়, তিন কুড়ি মেডেল জোগাড় হয়েছিল হরলালের। কাছাকাছি দু-চার দশ গ্রামের মধ্যে এমন ঢুলী আর নেই, এমন পরিষ্কার হাত কারোরই নেই ঢোলে। কত জায়গায়, কত দেশে-বিদেশে, বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, বড় বড় নামজাদা সব লোকের বাড়িতে নামকরা বাদ্যকরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢোল বাজিয়েছে হরলাল। সব জায়গায় সে প্রশংসা পেয়েছে, যশ পেয়েছে আর সে তরল গালানো যশ শক্ত হয়ে রূপ ধরেছে মেডেলের। কি তার জেল্লা, কি তার কারুকার্যের বাহার ! কোন কোনটির মধ্যে নাম লেখা থাকত হরলালের। নিজের নাম ধাম হরলাল কোন রকমে লিখতে পড়তে পারে। কিন্তু নয়ন তো আর পারে না। সে কেবল চেয়ে দেখত আর আঙুল বুলাত স্বামীর নামের অক্ষরগুলির উপর। যেন সস্নেহে সাদরে স্বামীর গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

কিন্তু রূপার মেডেল যত এল, রূপার টাকা তত এল না। একেবারে যে এল না তা নয়, কিন্তু আসা না আসা সমান হয়ে গেল। হাতে পয়সা এলে একেবারে রাজার হালে থাকতে চাইত হরলাল। হাঁড়ি ভরে, খালুই ভরে দুধ মাছ আনত বাজার থেকে। নিজেরা খেত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের খাইয়ে আমোদ ফুর্তি করত। তারপর বয়স যত বাড়তে লাগল, জিহ্বা কেবল দুধ মাছের রসে তৃপ্ত রইল না হরলালের। গাঁয়ে থাকলে তাড়িই খেত, শহরে গঞ্জে গিয়ে খেত মদ। দেশ বিদেশ থেকে তখন কেবল মেডেল নয়, দু-এক বোতল মদও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে লাগল হরলাল।

নয়ন রাগ করে বলত, 'ওসব কি ছাই ভস্ম আনছ হাতে করে ?'

টলতে টলতে আড়ষ্ট গলায় জবাব দিত হরলাল, 'ছাই ভস্ম নয় রে পাগলী, ও সব হাতে না থাকলে ঢোলে ভালো করে হাত খোলে না। এ কেবল আমার কথা নয়, বড় বড় ওস্তাদ মহাজনের বাণী।'

মুখের কাছে মুখ নিয়ে রাত্রে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আনত নয়ন, 'ছি ছি, মুখে কি সব বিশ্রী গন্ধ তোমার !'

সোহাগ করে হরলাল সেই মুখ স্ত্রীর মুখের ওপর চেপে ধরত, 'কি যে বলিস, বিশ্রী কোথায় ! এ

হল ওস্তাদের মুখেব গন্ধ। যেতে দে কয়েক দিন, তারপর তোর নাকও ওস্তাদের নাক হবে।'

ক্রমে সে গন্ধ অবশ্য নয়নের নাকে একদিন সইল কিন্তু সংসার সইল না। নয়নের খাড়ু বাজুব সঙ্গে মেডেলেও টান পড়ত হরলালের। তবু নয়নের গায়ে যখন একখানা গয়নাও রইল না, হরলালের গলায়, জমিদার বাড়িতে উপহার-পাওয়া হরলালেব বহুকালের জীর্ণ কোটের বুক পকেটের ওপর দু-চাবখানা মেডেল তখনো চিক চিক করতে লাগল।

নয়ন ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, 'কেমনতর ধরণ তোমার, আমার বাজু বন্দ সব গেল, তবু তোমার গয়না পরবার সখ গেল না!'

বুক পকেটের ওপর লটকানো চারদিকে সোনার কাজ করা সবচেয়ে দামী মেডেলটির দিকে সস্নেহে একবার তাকিয়ে হরলাল হেসে বলেছিল, 'তুই মিথ্যাই হিংসা করছিস নয়ানী! এ গয়না পুরুষ মানুষের কেবল সখের গয়না, সোহাগের গয়না নয়। সখ করে, সোহাগ করে গয়না পুরুষ মানুষ নিজেরা পরে না, মনের মানুষকে পরায়।'

নয়ন বলেছিল, 'আহাহা, কত গয়নাই পরেছে তোমার মনের মানুষ, সখের নয় তো কিসের গয়না তবে?'

হরলাল জবাব দিয়েছিল, 'সে কথা তুই ভালো করে বুঝবিনে নয়ন বউ, এ পুরুষ মানুষের মানের গয়না। এ গয়না গায়ে পরবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, যে মান একদিন পেয়েছিলাম, সে মান আমাকে আজও রাখতে হবে। হেলায় খেলায় চলবে না। এ গয়নার দিকে আর দশজনে লোভের চোখে, খারাপ চোখে তাকায় না, এ গযনাপরা মানুষকে মানুষ ভয় ভক্তি করে, শ্রদ্ধা সমীহর চোখে দেখে।'

নয়ন সত্যিই বুঝতে পারেনি। কিন্তু তর্ক করতে ঝগড়া করতে সাহস হয়নি তার। বাবু ভুঁইয়াদের সঙ্গে মিশে মিশে হরলালও যেন তাঁদের মতই কথা বলতে শিখেছে। আর কিছু না বুঝলেও নয়ন এটুকু বুঝল, ওসব কথার জবাব তার মত লেখাপড়া না-জানা চাষিচামারের মেয়েমানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বামীর কথার জবাব দিতে হলে তাকেও বাবু ভুঁইয়ার বউঝিদের মত লেখাপড়া শিখতে হবে। এ সব কথার জবাব তো গেঁয়ো গালাগালির মধ্যে নেই, আছে বইয়ের ছাপার অক্ষরে। শুধু ঢোলেই ভালো হাত খোলে না হরলালের, সমস্ত ঢুলীপাড়ায় বইয়ের ছাপা অক্ষর পড়তে পারে, ছাপা অক্ষরের মত অক্ষর লিখতে পারে নিজের হাতে হরলালের মত এমন একজনও নেই। সারা গাঁয়েই বা কজন আছে! শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নয়ন। মুখ তো নয়, ছাপা অক্ষরের বই।

কিন্তু স্বামীর আজকের কাণ্ড দেখে নয়নের মনের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। চাঁদেরকান্দির বিয়ে বাড়ির বাজনা বাজিয়ে দলবল নিয়ে ঢোল কাঁধে সন্ধ্যাসন্ধি ফিরে এল হরলাল। ছেলেমেয়েগুলি চার পাশ থেকে ঘিরে ধরল, 'কি এনেছ বাবা!'

নয়ন হাসিমুখে ঢোল নামিয়ে রাখল স্বামীর কাঁধ থেকে, কালো সুতার কারে বাঁধা মেডেলের মালাটা গলা থেকে খসিয়ে নিল। বুকের মধ্যে খচ করে উঠল মালা হাতে নিয়ে। আগেকার মত সেই অগুনতি মেডেল আর নেই, তিন চারটি মেডেলই ফাঁক ফাঁক করে ঝুলিয়ে মালা করা হয়েছে। আজকাল বড়লোকদের তো আর সেই কাল নেই, সেই দান নেই, ঢোলের বাজনা শুনে ওস্তাদের গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দিতে জানে না তারা। কিন্তু ভাগ্যে যদি থাকে আবার হবে, আবার সব হবে নয়নের। মেডেলে মেডেলে হরলালের বুক ঢেকে যাবে আগের মত। মুখে হাসি এনে স্বামীর বুক পকেটে আঁটা সেই সোনালী মেডেলখানাও আস্তে আস্তে খুলে সাদরে একবার হাতের মধ্যে মুঠ করে ধরল নয়ন। স্বামীর সমস্ত যশ, খ্যাতি, তার সমস্ত গুণপণা যেন নয়নের মুঠির ভিতরে স্পন্দিত হচ্ছে। বড় মেয়েকে ডেকে হুকুম দিল, 'হাঁ করে কি দেখছিস? যা, শিগগির হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক ভরে আন বাপের জন্য। কত দূর থেকে হয়রান হয়ে এসেছে মানুষ!'

তারপর সহাস্যে নয়ন মুখ ফিরাল স্বামীর দিকে, 'বাঁচিয়েছ। এবার মজা বুঝিয়ে দেব মুখপোড়া কর্মকারকে। ধানের নৌকো এখনো বাঁধা রয়েছে ঘাটে। দাও, টাকা দাও, সেই নৌকো থেকে ধানের বস্তা নিজের কাঁধে করে নিয়ে আসি। কর্মকারের বাড়ির উপর দিয়ে আসব, তার চোখের সামনে দিয়ে আসব। ও চেয়ে চেয়ে দেখবে, ওর সোঁৎলাপড়া ময়লাধরা টাকা ছাড়াও আরো টাকা আছে

মানুষের, সে টাকায়ও ধান রাখা যায়।'

কিন্তু আশ্চর্য মুখে হাসি নেই হরলালের, বিন্দুমাত্র শব্দ নেই মুখে।

নয়ন থমকে গিয়ে বলল, 'কি হল ?'

হরলাল আস্তে আস্তে বলল, 'টাকা নেই নয়ন, সব খরচ হয়ে গেছে।'

'খরচ হয়ে গেছে ! মদ খেয়ে সব উড়িয়ে এসেছ বুঝি ! আর আমার সোনার চাঁদেরা উপোস করে আছে দু'দিন ধরে।' চেঁচিয়ে উঠল নয়ন। মনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা তার মুখে ক্ষোভে আর আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

হরলাল বলল, 'তোর গায়ে হাত দিয়ে বলছি বউ, মদ নয়।'

দু'পা পিছিয়ে গেল নয়ন, 'খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে। মাতালের আবার গায়ে হাত দিয়ে দিব্য ! মদ নয় তবে কি মেয়েমানুষ ? গাঁটের কড়ি উজাড় করে দিয়ে এসেছ বুঝি তার পায়ে ? চুলে পাক ধরতে চলল, তবু বদখেয়াল গেল না মনের ?'

না, সে সব বদখেয়ালও নয়। স্ত্রীকে সবই খুলে বলল হরলাল। পথের মধ্যে বাবুইহাটির বাজারের ওপর দলের বংশীবাদক কানাইর কলেরা হয়েছিল। ডাক্তারের ভিজিট আর ওষুধের টাকা কানাই পাবে কোথা ? বিয়েতে বাঁশী বাজিয়ে ভাগের ভাগ তার জুটেছে আড়াই টাকা। কিন্তু তাই বলে দলপতি হয়ে নিজের দলের মানুষকে তো আর সেই বাজারের দোচালা ঘরের মধ্যে হরলাল ফেলে আসতে পারে না ! দেশ বিদেশের মানুষ বলবে কি ?

বলবে কি ! খানিকক্ষণ নয়নও একটি কথা বলতে পারল না। তারপর দুঃসহ ক্রোধে নয়ন যেন ক্ষেপে উঠল একেবারে। তার হাবভাব দেখে সভয়ে হরলাল একটু পিছিয়ে গেল। রাগ হলে নয়ন সব পারে। আঁচড়াতেও পারে, কামড়াতেও পারে।

'আর ঘরের মধ্যে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আমি যদি উপোস করে মরি তাহলেই বুঝি লোকে তোমাকে কাঁধে করে চৌদোলায় চড়িয়ে দেবে, না ? তা' পোড়া দেশের মানুষ চড়াতেও পারে। যা তাদের আক্কেল বুদ্ধি, তাতে তাও পারে তারা। ঘরে একটাও দানা নেই আর তুমি এলে দান-দাতব্য করে ! এমন বুদ্ধি না হলে আর শুকিয়ে মরব কেন গুষ্ঠিসুদ্ধ, এমন কপাল না হলে—'

হরলাল বলতে গেল, 'কিন্তু তুই অমন করছিস কেন নয়ন ! এ টাকা তো কোনও খারাপ কাজে—'

নয়ন বলল, 'যে গুণধর পুরুষ তুমি। তোমার ভালো কাজও যা, খারাপ কাজও তা।'

তা ছাড়া কি। বুকের ভিতরে হাহাকার করে উঠল নয়নের। মতি-গতি যখন খারাপ হয় তখন মদ মেয়েমানুষে টাকা উড়ায় হরলাল, আর বুদ্ধিটি ভালো থাকলে নাম-যশের জন্য দান-দাতব্য করে। তার মদের নেশা যেমন, নামের নেশাও তেমনি। নয়নের কাছে কোন প্রভেদ নেই। হয় মদে, না হয় বারভূতে খায় হরলালের টাকা। আর হাড় কালি হয়ে যায় নয়নের ধামা-কুলো বুনতে বুনতে। বেশির ভাগ সময় সেই ধামা-কুলো বিক্রির পয়সাতেই দুটো দানা জোটে নয়নের ছেলেমেয়েদের। হরলালের হাতে টাকা কবেই বা থাকে ! মুখে মদ, গলায় মেডেল নিয়ে সে তো দিব্যি দেশ ভরে নেচেকুঁদে বেড়ায়, তার দুঃখ কি !

চমকে উঠল যেন নয়ন। এই মুহূর্তে সেই মেডেলের রাশ হরলালের গলায় নেই, নয়নের হাতের মধ্যে জ্বলছে আর সেই জ্বালায় হাত পুড়ে যাচ্ছে নয়নের, বুক জ্বলে যাচ্ছে, মন পুড়ে যাচ্ছে খাক হয়ে। এই মেডেলের জন্য অনেক জ্বলেছে নয়ন। আর নয়, আর নয়।

দুই হাতের মুঠোয় মেডেলগুলিকে শক্ত করে চেপে ধরল নয়ন, যেন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, কেড়ে নিয়ে যাবে কেউ। তারপর কাঁটাল গাছটার তলা দিয়ে অন্ধকারে নয়ন পা বাড়াল।

হরলাল অবাক হয়ে বলল, 'চললি কোথায় বউ ?'

পিছন ফিরে তাকাল নয়ন, তারপর নিতান্ত শান্তভাবে জবাব দিল, 'কর্মকারবাড়ি।'

কি যেন একটু আপত্তি করতে গিয়ে হরলাল চুপ করে গেল, পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা যা।'

কাঁটালতলা পেরিয়ে বিপিন ঢুলীর পোড়ো ভিটে। তার পরেই কৈলাসের বাড়ি। নতুন মুলি

বাঁশের বেড়া ঘেরা দাওয়ায় বসে সন্ধ্যার পর কৈলাস মহাজনী কারবারের খোরাবাঁধা খাতা খুলে বসেছে। পাশে জ্বলছে চিমনি ফাটা হ্যারিকেনে লাল কেরোসিনের আলো। এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে কলম নিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে কৈলাস। হুঁকোও চলছে না, কলমও নয়। হরলাল আর নয়নের দাম্পত্য কলহের প্রতিটি কথা শুনবার জন্য কলম আর হুঁকো তো দূরের কথা, হৃদপিণ্ডকেও যেন সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে রাখতে পারে কৈলাস। বয়সের সময় কতদিন ওদের ঘরের পিছনে গিয়ে আড়ি পেতেছে, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে চেষ্টা করেছে ভিতরের কাণ্ড, কোন কোন দিন ধরা পড়েছে কিন্তু হার মানেনি কৈলাস। দোস্তের ঘরের পিছনে আড়ি পাতবে না পাতবে কোথায় ?

'সে কথা ঠিক। কিন্তু আর বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসো। তামাক সাজ নয়ন,' বলে হরলাল তাকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সে দিন নেই, সে কাল নেই। আজকাল আর আড়ি পাতবার দরকার হয় না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা আপনিই কানে আসে। কেবল পারতপক্ষে হরলাল আর আসে না। দেখা হলে এখনো সেই ছেলেবেলার মত 'দোস্ত' বলে ডাকে, কৈলাসও 'দোস্ত' বলে সাড়া দেয়। কিন্তু মন সাড়া দেয় না, হৃদয় পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে চোখ দেওয়া সত্ত্বেও সে চোখে হরলাল কোন দিন সড়কি বসিয়ে দেয়নি, কৈলাসও লাঠি মারেনি তার মাথায়। কেবল চোখেই দেখেছে, বন্ধুনীকে কোন দিন জোর করে চোখে দেখতে চেষ্টা করেনি কৈলাস। তবুও চল্লিশ পেরিয়ে 'দোস্ত' কথাটি কেবল দু'জনের শুকনো মুখের ডাক হয়ে রয়েছে, অন্তরের রসসিন্ধু সে ডাকে আর উত্তাল হয়ে ওঠে না। আবাল্যের বন্ধুত্বে নয়ন এসে যে বাধার সৃষ্টি করেছিল, সে বাধা, সে পরীক্ষা দুজনেই পার হয়ে গেছে, তবু বন্ধুত্ব টেকেনি। কৈলাসের মনে হয়েছে—হরলাল বোকা। হরলাল বলেছে, কৈলাস আগে ছিল কামার, এখন চামার হয়ে গেছে। তা হবে। চিরটা কাল একইভাবে হরলাল ঢোল বাজিয়ে আর তাড়ি টেনে কাটিয়ে দিল বলে কৈলাসও যে ঠুক ঠুক করে চিরদিন পরের বউঝির গয়না গড়বে, আর হাঁপর ফুয়োবে তার কি কথা আছে ? বোকারা বুদ্ধিমানদের চামারই বলে থাকে। সে কথার মার আর যারই হোক, কৈলাসের কোন দিন গায়ে লাগে না। চামার না হলে পারত কৈলাস এমন বিত্তবিভব করতে ? পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে অমন পনের বছরের সোনার প্রতিমাকে ঘরে এনে সোনায় মুড়ে রাখতে পারত ? কামারগিরি না ছাড়লে দেশ বিদেশের বউঝিদের গয়না গড়িয়েই চুল-দাড়ি পেকে যেত কৈলাসের। হরলাল ঢুলীর স্ত্রী নয়নের মত তার বউয়ের গায়েও কোনদিন গয়না উঠত না, বাড়িতে উঠত না এমন আটচালা টিনের ঘর। ধানের সময়, পাটের সময় মাঠের শস্যে উঠান তা হলে ভরে উঠত না কৈলাসের।

'কে ?'

পা টিপে টিপে নয়ন একেবারে কৈলাসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অদ্ভুত তার উল্লাস। জোরে আর জেদে যেন ফের আবার যৌবনের জোয়ার এসেছে দেহে।

সেই উল্লাসের জোয়ার কৈলাসের মনে এসে লাগল। নয়ন আবার এসেছে। আসতেই হবে। সেই দুপুরের নয়ন আর সন্ধ্যার নয়নে অনেক তফাত, অনেক পার্থক্য।

নয়ন ফিস ফিস করে বলল, 'শুনেছ তো সব ?'

সব যে শুনেছে, সে কথা কৈলাস গোপন করল না, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনন্দকে মুখের ছদ্ম বিষণ্ণতায় ঢাকবার চেষ্টা করে বলল, 'সবই কানে গেছে। তোমরা তো জাত-মান ঢেকে ছোট করে কেউ কথা বলো না। এত চেঁচামেচি পাড়ার কার কানেই বা না গেছে শুনি ?'

নয়ন বলল, 'তা যাক, কারো পরোয়া করি নাকি আমি ?' তারপর একটু চুপ করে থেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে একবার হাসল নয়ন, 'কেবল একজন ছাড়া। সে জন তুমি গো তুমি। তোমার কাছেই ফের এলাম কর্মকার। ধান আজ আমি কিনবই।'

কৈলাস তেমনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি ঢুলীবউ, টাকা নেই আমার কাছে।'

'আছে আছে, এখন আছে।' বলতে বলতে আঁচল খুলতে লাগল নয়ন। 'চন্দ্রুলি কোথায়, আমার

সতীন ?'

কৈলাস অবাক হয়ে বলল, 'রাঁধছে রান্না ঘরে ।'

মেডেলের মালাটি আঁচল থেকে খুলে ঝপ করে হঠাৎ কৈলাসের গলায় পরিয়ে দিল নয়ন, 'এবার, এবারও কি টাকা নেই তোমার কাছে ?'

উৎসাহে আনন্দে চোখ দুটো চক চক করে উঠল কৈলাসের । গলার মেডেলের মালাটা খুলতে খুলতে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ছি ছি, এ কি করলে ?'

কিন্তু মুখের কথা যে তার মনের কথা নয়, তা বলবার ভঙ্গিতে গোপন রইল না । নয়ন তাব মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল । আর একটি করে মেডেল হাতের তেলোতেই ওজন করে দেখতে লাগল কৈলাস । না জিনিস খুব বেশি নেই । কেবল এই সোনার কাজ কবা বড় গোল মেডেলটি ছাড়া। কিন্তু সেটিকে দু-একবার ঘুরিয়ে দেখেই কৈলাস চমকে উঠল ; যেন বিদ্যুৎ ছুঁয়েছে হাত দিয়ে ।

কৈলাস বলল, 'বাঃ রে, এ জিনিস এখনো আছে, এতো সেই আমার মেডেল !'

নয়ন অবাক হয়ে বলল, 'তোমার মানে ?'

কৈলাসের চোখ যেন পলক ফেলতে চায় না, 'মানে আমারই হাতের ! তেঁতুলকান্দির চৌধুরীদের মেজবাবুর বিয়েয় বড়বাবু এ জিনিস ফরমায়েস দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন । তারপর দোস্তকে পরিয়ে দিয়েছিলেন এক উঠান লোকের মধ্যে ।'

নয়ন কৈলাসের হাত থেকে আস্তে আস্তে তুলে নিল মেডেলটি । ফের নতুন করে দেখল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, 'সত্যিই ভারি চমৎকার, ভারি মিহি তোমার হাত ছিল কর্মকার !' তারপর একটু মৃদু হেসে চোখ তুলে বলল, 'ঠিক তোমার দোস্তের হাতের মত ।'

লজ্জিত অপ্রতিভ ভঙ্গিতে নয়নের দিকে তাকিয়ে কৈলাস একটু হাসল । হবলালের প্রসঙ্গ ওঠায়, তার সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় জ্বালা ধরল না মনে । বরং উপমার যাথার্থ, উপমার মাধুর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে যেন সুদূর এক স্বপ্নাচ্ছন্নতার ভিতর থেকে কৈলাস জবাব দিল, 'বড়বাবুও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন নয়নবউ ।'

পৌষ-মাঘ ১৩৫৩

পতাকা

উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচির একটা ছক কেটে রেখেছেন শচীবিলাস । গাঁয়ের নানা বয়সী উৎসাহী ছেলেদের আনাগোনার বিরাম নেই । ঝাঁড় থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে সোজা একটি তল্লা বাঁশ কেটে আনা হয়েছে । নমঃশূদ্র পাড়ার গগন ঘরামি তার ধারাল দাঁ নিয়ে নিখুঁতভাবে ছোট ছোট গিটগুলি চেঁছে সমান করে দিয়েছে বাঁশটির । শচীবিলাস একবার তাঁর আঙুলের শীর্ণ ডগাগুলি বুলিয়ে নিলেন তার ওপর । মুখে একটা প্রসন্ন পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল ।

কিন্তু কেবল মুখের ভাবে নয় প্রশংসাটা ওঁর মুখের ভাষায় শুনতে চায় গগন, 'ঠিক হয়নি ছোট কর্তা ?'

শচীবিলাস মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, 'বেশ হয়েছে । পাকা হাত তোমার গগন । ঠিক হবে না কেন । তোমার হাতে বড় বাঁশের বড় বড় গিটগুলি পর্যন্ত তেলের মত পালিশ হয়ে যায়, আর এতো সামান্য একটা তল্লা বাঁশ ।'

গগন তাড়াতাড়ি জিভ কেটে মাথা নিচু করে নিজের হাতে চাঁছা বাঁশটির ওপর কপাল ছোঁয়াল । তারপর শচীবিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে একি বললেন ছোট কর্তা । একি ঘর গেরস্থালীর কোন কাজে লাগতে যাচ্ছে যে সামান্য বলছেন । এতে যে স্বাধীনতার নিশান উড়বে । বাঁশ বলতে মধু বাবুরা তো আমাকে ধমকেই দিলেন । বললেন, বাঁশ নয় ঘরামি, বাঁশ নয়, পতাকা দণ্ড ।'

শচীবিলাস স্নিগ্ধ একটু হাসলেন, 'বেশ তাই বল।'

সাদা ধবধবে একখণ্ড খদ্দরের কাপড়ে সযত্নে রঙীন তুলি বুলিয়ে দিল নীলকমল পাল। মাঝখানে সাদা জমির ওপর এঁকে দিল চরকা, দুই পাশে হরিত হলুদের ঢেউ। তারপর তুলি রেখে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হয়েছে ছোট কর্তা ?' শচীবিলাস স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'বেশ হয়েছে নীলকমল, চমৎকার হয়েছে।'

ছোট্ট একটি কাঁচের গ্লাস শচীবিলাসের মুখের সামনে প্রায় এগিয়ে ধরল ইন্দিরা, 'ওষুধটা এবার খেয়ে নিন বাবা।'

শচীবিলাস একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার ওষুধ!' কিন্তু পরমুহূর্তেই বিরক্তি দমন করে মেয়ের হাত থেকে ওষুধের গ্লাসটা তুলে নিলেন শচীবিলাস। চুমুক দেওয়ার আগে সস্নেহে একবার তাকালেন মেয়ের দিকে, কোমল কণ্ঠে বললেন, 'এক দিন কিন্তু ওষুধ না খেয়েও আমি ভালো থাকতাম ইন্দু।'

ইন্দিরা বলল, 'না না ওষুধটা খান।'

ওষুধ খেয়ে খালি গ্লাসটা মেয়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন শচীবিলাস। তাঁর মুখখানা একটু যেন ক্লিষ্ট, একটু যেন কঠিন দেখাল। হয়তো তা কেবল কটু স্বাদ ওষুধের জন্যই নয়। ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কি যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মত সাড়া দিয়ে ওঠে না শচীবিলাসের। মাঝে মাঝে সংশয় হয়। প্রশ্ন করেন নিজেকে দৈন্যটা কার। কার্পণ্য কোথায়। তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে ? রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশি। কথায় কথায় তর্ক বাধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে। তারপর ইন্দিরা হঠাৎ এক সময় উঠে গিয়ে নিয়ে আসে ওষুধের গ্লাস, কি চায়ের কাপ, কি তেলের বাটি। শচীবিলাস সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যান। একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'আজকাল আমি বুঝি খুব রূঢ়ভাষী হয়ে উঠেছি ইন্দু।'

ইন্দিরার মুখখানা একটু যেন আরক্ত হয়ে ওঠে, তারপর দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, 'না, বাবা, সত্যিই আপনার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে।' কিংবা 'রোজই তো এই সময় আপনি চা খান বাবা।' 'বেলা যে একেবারে গড়িয়ে গেছে। এর পর চান করলে যে শরীর আপনার আরও খারাপ হবে।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন শচীবিলাস। ইন্দিরা মিথ্যা বলেনি, সময় ভুল হয়নি তার। তবে কি শচীবিলাসেরই ভুল ? না ইন্দিরার এই অভ্রান্ত সময়-জ্ঞানের মধ্যেই অশ্রদ্ধা, অসহিষ্ণুতা আন্তরিক সৌহার্দ্যের অভাব মিলে রয়েছে ? রাজনীতি আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিষ্কে নয়, জ্ঞান মাত্র নয়, তা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশ সেবা। বিজ্ঞান নয়, ধর্ম। সূক্ষ্ম চারুশিল্প। কল্পনার রঙে অন্তরের রসে বার বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে। তিনি জোর করে স্বীকার করেন, 'হ্যাঁ, আমি পৌত্তলিক।' ইন্দিরা হাসে, 'এক হিসাবে তা ঠিক, দেশ আপনাদের কাছে প্রতিমা, দেশের লোক আপনাদের কাছে পুতুল। ভাবেন, তাদের ইচ্ছামত ভাঙা যায় গড়া যায়। গায়ে তাদের রঙ লাগান আর অপছন্দ হলে মুছে ফেলেন। বলেন ভুল হয়েছে।'

ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকান শচীবিলাস। তিন বছর বয়সের মা-মরা মেয়ে ইন্দিরা। কিছুতেই কোলছাড়া হতে চাইত না। বকে, ধমকে, কাঁদিয়ে ওর পিসীর কোলে দিয়ে তবে শচীবিলাস বেরুতে পারতেন। আজ তার শোধ নিচ্ছে ইন্দিরা। তার ভাষায় আজ আর আবদার নেই, অভিমান নেই, আছে কেবল শ্লেষ আর ব্যঙ্গ। তাই ওষুধ খাওয়াবার দিকে ইন্দিরার লক্ষ্য আছে, যত্ন আছে, কিন্তু ওষুধ ছাড়াও যে শচীবিলাস সত্যি সত্যি আজকের দিনে ভালো থাকতে পারেন—এতে ইন্দিরার বিশ্বাস নেই। এই উচ্ছ্বাস হয়তো তার কাছে উপহাসের বস্তু।

মহকুমা শহর থেকে শচীবিলাসের জন কয়েক কংগ্রেস কর্মী সহযোগী বন্ধু এই উপলক্ষ্যে আজই সন্ধ্যায় এসে পৌঁছুবেন। এর আগের দু-তিন বছর শচীবিলাসকেই তাঁরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন

শহরে। তিনি সেখানে সভাপতিত্ব করেছেন, তুলে ধরেছেন জাতীয় পতাকা। কিন্তু এবার ডাক্তাররা নিষেধ করেছেন। ইদানীং ব্লাড প্রেসারটা বড় বেশি বেড়ে উঠেছে শচীবিলাসের। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে হৃদযন্ত্র। এ সময় পঁচিশ মাইল রাস্তা মোটরে যাওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই সমীচীন হবে না। আর যে রকম পথ ঘাটের অবস্থা। চিকিৎসকদের শাসন হয়তো গ্রাহ্য করতেন না শচীবিলাস, কিন্তু গাঁয়ের লোকের অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এবার তাদের মধ্যেই থাকতে হবে তাঁকে। এর আগে পর পর কয়েক বছর তিনি দেশে থাকতে পারেননি। কখনো জেলে, কখনো বা অন্য কোন জেলায় এ দিনটি তাঁকে কাটাতে হয়েছে। এত দিন বাদে নিজের গ্রামবাসীদের মধ্যে যখন এসেই পড়েছেন শচীবিলাস তখন তাদেব নিয়েই এবারকার উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হোক। সমগ্র দেশের গৌরব শচীবিলাস, কিন্তু এই গাঁয়ের একান্ত আপনজন। একথা যেন ভুলে যান না তিনি। শচীবিলাস ভোলেননি, সানন্দে সম্মত হয়েছেন।

'নীরদবাবুরা বোধ হয় সন্ধ্যাসন্ধি এসে পৌঁছবেন ; বৈঠকখানাটা ভালো করে ধোয়ামোছা হয়েছে তো ইন্দু ? রান্নাঘরে একটু খোঁজখবর নিয়ো বউঠান কি করছেন না করছেন।'

দূব সম্পর্কিত এক জেঠতুতো ভাইয়েব বিধবা স্ত্রী অনেক দিন ধরেই শচীবিলাসের সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন। ইদানীং সকন্যা শচীবিলাসই তাঁর আশ্রয় নিয়েছেন বলা চলে। ঘর সংসারের সমস্ত ভারই তাঁর ওপর। রাজনৈতিক প্রোগ্রামে বাপ মেয়ে দুজনই যখন দীর্ঘ দিনেব জন্য বাইরে চলে যান, চারুবালা একাই দু'একজন ঝি চাকরের সাহায্যে আগলে রাখেন বাড়িঘর। পিতাপুত্রীব কারোবই রাজনীতির ধার তিনি ধারেন না। নিজেব ঘবকন্না নিয়েই মশগুল। অবসব সময় কাঁথা সেলাই করেন, আসন বোনেন কিংবা সুর করে পযাব ছন্দে বসে বসে পড়েন বামায়ণ, মহাভারত আর চৈতন্যচরিতামৃত।

কি একটা কাজে এ ঘরে এসেছিলেন চারুবালা। দেবরের কথা কানে যেতে বললেন, 'স্বদেশী বন্ধুদের বুঝি স্বদেশী হাতেব রান্না ছাড়া চলবে না ঠাকুরপো ? তাই বউঠানে বিশ্বাস নেই, দেশোদ্ধারিণী মেয়েকে পাঠাচ্ছ বাঁধতে।'

শচীবিলাস বললেন, 'কি যে বলছ বউঠান, ইন্দু আবার রাঁধতে পারে নাকি, তোমাকে জোগান দেওয়ার জন্য পাঠাচ্ছিলাম।'

চারুবালা প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'কথা শোনো। রাঁধতে আবার কোন মেয়ে না পারে ? আমাদের আমলে মেয়েরা কেবল রাঁধত আব চুল বাঁধত, আর একালের মেয়েরা তার বদলে না হয় রাঁধে আর দল বাঁধে। এমন কোন কাজ নেই যা ইন্দু না জানে। আজকের সব রান্না ওকে দিয়ে আমি রাঁধাব দেখে নিয়ো।'

ইন্দিরার রান্না শচীবিলাসের একেবারে অনাস্বাদিত নয়। কাছে থাকলে দু'একটা তরকারি প্রায়ই তাঁর জন্য সে রেঁধে দেয়। খেতে ভালোই লাগে শচীবিলাসের। কিন্তু মুখে তা তিনি স্বীকার করেন না। আজও করলেন না, 'তা রাঁধাতে চাও রাঁধাও। কিন্তু নুনের বৈয়ম আর লঙ্কার গুড়োর কৌটোটা একটু দূরে সরিয়ে রেখো বউঠান। মেয়ের কথার মধ্যে নুন ঝালের পরিমাণ এত বেশি যে ঝোলে তার কিছু কম পড়লেও এসে যাবে না।'

শচীবিলাসের বন্ধুদের সঙ্গেও ইন্দিরা অসংকোচে, কুণ্ঠাহীন ভাবে বিতর্ক চালায়, তাঁদের রাজনৈতিক মতামতের ওপর ইন্দিরা যে তেমন শ্রদ্ধা পোষণ করে না তা চারুবালাও লক্ষ্য করেছেন। ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগে না। শত হলেও তাঁরা ইন্দিরার বাপের বয়সী, অনেকে ইন্দিরার বাবার চেয়েও বেশি নামকরা লোক। কতবাব জেল খেটেছেন দেশের জন্য। নিজের বাবার সঙ্গে যাই করুক বাইরের ওই সব প্রবীণ ভদ্রলোকদের সঙ্গে ইন্দিরার মত একুশ বাইশ বছরের একটি মেয়ের অমন অসহিষ্ণু উত্তেজিত আলোচনা করা চারুবালার চোখে বিসদৃশই লেগেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে ইন্দিরার অপ্রতিভ আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হল চারুবালার। শচীবিলাসের কথার জবাবে বললেন, 'কিন্তু সারা গায়ে তোমাদের নিশ্চয়ই কাটা ঘা আছে ঠাকুরপো। না হলে নুন ঝালের ছিটাকে অত ভয় কেন ? আয় ইন্দু, তোর চুল বেঁধে দি। চুলগুলিকে কেমন বাবুইর বাসা করে রেখেছে দেখ। আচ্ছা মেয়ে হয়েছিস যা হোক।'

ইন্দিরাকে নিয়ে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেলেন চারুবালা। শচীবিলাসেব মনে হল এমন স্নেহের ভঙ্গিতে, এমন আদর করে আজকাল তিনিও তো আর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন না। কেবল ইন্দিরার দোষ দিলেই বা চলবে কেন। তিনিই কি তেমন ভাবে বুঝে দেখতে চেষ্টা করেন ইন্দিবার যুক্তি, ইন্দিরার বক্তব্য ? শুনতে না শুনতে তিনিও কি ইন্দিরার মতই উত্যক্ত আর অসহিষ্ণু হযে ওঠেন না ? দলগত মতভেদ কি এতই দুরতিক্রম্য যে বাপ মেয়ের সম্পর্ককেও তা স্পর্শ করে ? তরুণ তরুণীর পরস্পরের প্রতি দুটি অনুরক্ত হৃদয়কেও বিচ্ছিন্ন করে দেয় ?

নিরুপমের কথা মনে পড়ল শচীবিলাসের। সামান্য মতানৈক্যেব জন্য নিরুপমকে ইন্দিবা প্রত্যাখ্যান করেছে। নিরুপমও সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে ইন্দিরার সঙ্গে, কিন্তু নিরুপমও তো বামপন্থী। সেও তো বিপ্লববাদী। ত্যাগ স্বীকার দেশের জন্য সেও তো করেছে। তবু তাকে সহ্য কবতে পারেনি ইন্দিবা। অত্যন্ত অনায়াসে তার প্রেমকে সে অস্বীকার করেছে। একদিন শচীবিলাসও তো বামপন্থী ছিলেন, চরমপন্থী ছিলেন তাঁর আমলে। ফাঁসী যেতে যেতে ফিরে এসেছেন। কিন্তু রাজনীতিতে কাল যা বাম আজ তা দক্ষিণ। ডাইনে বাঁয়ে মুহূর্তে তা পাশ বদলায়। আর বদলায় মন। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলে। এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।

সন্ধ্যার পব মোটবে কবে শচীবিলাসের বন্ধুবা এসে পৌঁছলেন। প্রত্যেকেই এতদঞ্চলেব প্রখ্যাত কংগ্রেস কর্মী। এদের অনেকের সঙ্গেই শচীবিলাস একত্র কাজ করেছেন, জেল খেটেছেন একসঙ্গে। মোটরের ধুলো উড়ে এসে লেগেছে ওদের জামা কাপড়ে। চশমার কাঁচে পুরু হয়ে ধুলোর পর্দা পড়েছে। শচীবিলাস নিজের হাতে ঝেড়ে দিলেন বন্ধুদের কাপডেব ধুলো। ইন্দিবা ট্রেতে করে কাপ আর চায়ের কেটলি নিয়ে এল সাজিযে।

শরীরের প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখছেন না বলে শচীবিলাসকে অনুযোগ করলেন বন্ধুবা। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ জানালেন কালকের প্রোগ্রামটা একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে। আরো কয়েকটি জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ভার পড়েছে তাঁদের ওপব। এ যাত্রা এখানে বেশিক্ষণ দেরি করলে লোকে অতিরিক্ত বন্ধুবাৎসল্যের অপবাদ দেবে।

শচীবিলাস হেসে বললেন, 'মাভৈঃ, এখানকার অনুষ্ঠান সূর্যোদয়ের আগেই না হয় শেষ করা যাবে।'

বন্ধুদের জন্য প্রোগ্রামটা সামান্য একটু অদল বদল করলেন শচীবিলাস। পুবের আকাশে রক্তবর্ণ সূর্য যখন গোল হয়ে দেখা দেবে মাঠের মত বিস্তৃত সেখেদের চটান জায়গাটায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে এ গাঁয়ের। সংকল্প বাক্য পাঠ এবং আনুষঙ্গিক বক্তৃতার পর অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ কববে। ছেলেদের হাতে থাকবে পাকাটির ডগায় ছোট ছোট জাতীয় পতাকা। ঠিক যেমন এ গাঁয়ের বার্ষিক নগর সংকীর্তনের সময় থাকে। মেয়েদের হাতে থাকবে শঙ্খ। সকলের হাতে হযতো শঙ্খ দেওয়া সম্ভব হবে না, অত শঙ্খ গাঁয়ে নেই। কিন্তু মুখে মুখে হুলুধ্বনি তো প্রত্যেকেই দিতে পারবে। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে গৃহস্থ বধূরা কিশোর কিশোরীদের এই শোভাযাত্রা আধো ঘোমটার আড়াল থেকে চেয়ে দেখবে। বাবকোষ থেকে কেউবা ছিটাবে ফুল, কেউবা পিতলের থালা থেকে খেজুর পাটালিব টুকরো ছিটিয়ে দেবে। ছেলে মেয়েরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে মুখে পুরবে আর সুমিষ্টস্বরে বলে উঠবে 'বন্দেমাতবম্'। নিজের পরিকল্পনায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান শচীবিলাস। তারপর বিকালের দিকে সভা বসবে সমস্ত গাঁযের। আবৃত্তি হবে, সঙ্গীত হবে, গাঁয়ের ভাষায় বক্তৃতা করবে গগন ঘরামি আর নীলকমল পালের দল। সহযোগী বন্ধুদের তিনি ততক্ষণ ধরে রাখবেন না। বাত্রে জাতীয় দেশাত্মবোধমূলক অভিনয় করবে ছেলেরা। তাঁর উঠানে সে জন্য থিয়েটার মঞ্চ আগে থেকেই তারা তৈরি করে রেখেছে।

বন্ধুদের ডেকে সদ্য তৈরি জাতীয় পতাকাটা দেখিয়ে আনলেন শচীবিলাস। সবুজ কাঁচা বাঁশের সঙ্গে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত খদ্দরের কাপড় মজবুত সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। একেবারে গাঁয়ের প্রথায় তৈরি নিশান। বন্ধুরা সবাই প্রশংসা করলেন, চমৎকার হয়েছে। সত্যিই—রুচি আছে শচীবিলাসের।

অনেক রাত্রে শুয়েও রাত্রে শচীবিলাসের বহুবার ঘুম ভেঙে গেল। শেষের দিকে একটু তন্দ্রার মত এসেছে কি একটা গোলমালে শচীবিলাস চমকে উঠলেন। ব্যাপার কি, কান খাড়া করে শুনলেন কিন্তু কথাবার্তার মর্ম যেন সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন না। পাড়ার ছেলেদের গলা। সবাই তাঁর উঠানে এসে জড়ো হয়েছে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছে। ফলে তাদের উত্তেজনাটাই বোঝা যাচ্ছে, কথা বোঝা যাচ্ছে না।

শচীবিলাস বিছানা ছেড়ে নেমে এলেন উঠানে, 'কি হয়েছে বিনয়, সবাই একসঙ্গে চেঁচিও না, যে কেউ একজন এসে বলো।'

বিনয়ই এগিয়ে এল, 'মকবুলরা বলছে তাদের চটানে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলতে দেবে না। আমরা যে সামিয়ানা টানিয়েছিলাম রাত্রে এসে তারা তা খুলে ফেলেছে। ছেলেরা ভোর হতে না হতেই এম, ই, স্কুল থেকে চেয়ার বেঞ্চগুলি মিটিং-এর জায়গায় টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখ আর সিকদার বাড়ির লোক এসে বাধা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। চেয়ার টেবিল তারা পাততে দেবে না ওখানে। কিছুতেই নাকি মিটিং হতে দেবে না। আপনি একবার হুকুম দিন জেঠামশাই, দেখি ওরা কেমন করে না দিয়ে পারে।'

অতুল বলল, 'কেবল সেখ আর সিকদাররাই হবে কেন, চরকান্দির সমস্ত মুসলমানই এসে জড়ো হয়েছে ওখানে। পীরপুরের সেই বুড়ো মৌলবীকেও দেখলাম। বোধ হয় তারই কারসাজি এসব, কুবুদ্ধি দিয়ে রাতারাতি সকলের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

শচীবিলাস স্তব্ধ হয়ে রইলেন। একি বিভ্রাট, এমনভাবে বাধা আসবে এ যে তিনি কল্পনায়ও আনতে পারেননি।

পিছনে পিছনে ইন্দিরাও এসে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের কথায় হেসে বলল, 'তুমি ভুল করছ অতুলদা। একজনের কুবুদ্ধিতে রাতারাতি গাঁশুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরতে পারে না। মাথা আর মুখ ওদের ঘুরেই ছিল।'

অতুল রুক্ষকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, 'ঘুরেই ছিল ? তোমাকে ওরা আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছে বুঝি ইন্দিরা ?'

ইন্দিরা বলল, 'না অতুলদা তোমাদের মত ওরাও অতখানি বিশ্বাস আমাদের করতে চায় না। আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম হত।'

শচীবিলাস ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কি হত না হত সে কথা এখন থাক, কি হবে এই মুহূর্তে সেই কথাই ভাবো।'

শচীবিলাসের বন্ধুরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপারটা সব শুনে তাঁরাও হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না। কোন একটা মীমাংসায় আসতেই হবে। কিন্তু পথটা কি ?

অতুল আর বিনয়ের দল ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। গুণ্ডা প্রকৃতির মুসলমানদের বাধা তারা মানবে না। ওখানেই আজ উঠবে দেশের জাতীয় পতাকা। এ পতাকা কোন সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র দেশের স্বাধীনতার প্রতীক। ওরা ভুল করছে বলে সে ভুলকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। সে ভুলকে জোর করে ভাঙতে হবে।

কিন্তু শচীবিলাস অত সহজে মন স্থির করতে পারলেন না। কলকাতা আর নোয়াখালির দাঙ্গার সময় গ্রামের হিন্দু মুসলমানের চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। মুসলমান যুবকেরা হিন্দুদের লক্ষ্য করে নানা রকম বক্রোক্তি করেছে। আস্ফালন করেছে আড়ালে আবডালে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে, গোপনে গোপনে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হতে চেষ্টা করেছে। আর যাঁরা সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ তাঁরা দালানে তালাচাবি দিয়ে গৃহলক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে নেপালী দারোয়ান পাহারায় রেখে সাময়িক ভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন শচীবিলাসের মনে হয়েছে দাঙ্গার সংক্রামক মহামারী থেকে এ গাঁকেও রক্ষা করা গেল না ! হিন্দু মুসলমানের মারাত্মক হানাহানি এখানেও বেঁধে উঠল বলে। কিন্তু তিনি আর ইন্দিরা রাত দিন সতর্ক রয়েছেন। একবার গেছেন হিন্দুদের পাড়ায় আর একবার ঘুরেছেন মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে। এক হাতে থামিয়েছেন ভীত পলায়নপর হিন্দুদের আর এক হাতে উত্তেজিত মুসলমান জনসাধারণের

হাত ধরেছেন। যে জন্যই হোক দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলে লাগেনি। মারাত্মক সময়টা নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে ছিল তারা ফের ফিরে আসতে শুরু করেছে। কৌতুকে কৌতূহলে ক্ষোভে আর আক্রোশে যে সব মুসলমান যুবক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তারা ফের শান্ত হয়ে গৃহস্থালিতে মন দিয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ্য করে আবার হঠাৎ একি বিভ্রাট এলো। সংঘাতের আবার এ কোন সূচনা দেখা দিল আজ। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইলেন শচীবিলাস। তারপর ছেলের দলকে বললেন, 'আচ্ছা চল, দেখি গিয়ে ওরা কি চায়।'

বিনয়ের দল জাতীয় পতাকাটা সঙ্গে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল, শচীবিলাস বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা রেখেই এসো বিনয়। আগে দেখি ওদের উদ্দেশ্যটা কি।'

বিনয় আর অতুলরা অসন্তুষ্টভাবে শচীবিলাসের অনুসরণ করল। তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও যে কেউ কেউ খুশি হলেন না সে কথা শচীবিলাস বুঝতে পারলেন।

শচীবিলাসের বাড়ির নিচেই বড় একটা চটান। ওপারে মুসলমান পাড়া। সেখেদের বাড়িব বসির ছিল শচীবিলাসের দোস্ত। তাঁর কাছ থেকেই তিনি জায়গাটুকুর খানিকটা অংশ কিনে রেখেছিলেন। ইচ্ছা ছিল সমস্তটুকুই কিনবেন। কিন্তু বসির সেখ ছাড়েনি। বলেছে, 'অত লোভ কেন দোস্ত। ঘোর-দৌড় দেখতে গিয়ে ছেলেবেলায় কতবার মামা-বাড়িতে এক কাঁথার তলে দুজনে রাত কাটিয়েছি মনে পড়ে? আর একখানা জমি দু'জনে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে পাবব না? ভোরে উঠেই তোমাকে একেবারে মুসলমানের জমিতে পা দিতে হয়, ঠাকরুনরা কাঁথা কাপড় মেলবার জায়গা পান না, এই জন্যই অর্ধেকটা বেচে দিলাম তোমাকে। নইলে জমি বেচবার তো আমাব দরকার ছিল না। ভয় নেই সীমানা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে যাব না তোমার সঙ্গে।'

শচীবিলাস বলেছিলেন, 'আমরা না হয় কাজিয়া মোকদ্দমা না বাধালাম কিন্তু আমাদের ছেলেরা? তারা যদি বাধায়?'

হেসে দাড়িতে হাত বুলিয়েছিল বসির সেখ, 'তারা যদি বাধায় তার মজাও তারাই ভোগ করবে। তুমি আমি সেজন্য ভেবে মরি কেন দোস্ত।'

বসির সেখকে বেশিদিন ভাবতে হয়নি। অল্পবয়সেই সে চোখ বুজেছিল; কিন্তু এত দিনে ভাববার পালা এসেছে শচীবিলাসের।

বসিরের ছেলে মকবুল আর মনসুরও কোন দিন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বাধায়নি। কাকা বলে ডেকেছে, সমীহ করে চলেছে সব সময়। বর্গা চষেছে তাঁর ক্ষেতের। পাটের যখন দব ছিল এই চটানটুকুতেও তাবা পাট বুনেছে। ধুয়ে শুকিয়ে ভাগের ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে শচীবিলাসকে। ইদানীং ফসল না হওয়ায় জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে। গরু ছাগলে চরে, পাড়াব ছেলেরা খেলাধূলা করে। আর বছর বছর গাঁয়ের লোক স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিনে জাতীয় পতাকা তুলতে আসে এখানে। কয়েক বছর শচীবিলাসও নিজের হাতে তুলেছেন। মকবুল মনসুররা জায়গা নিয়ে কোন আপত্তি করেনি, বরং তারা এসে সমান ভাবে কামলা খেটেছে, দুর্বাঘাসের ওপব বসে শচীবিলাসের বক্তৃতা শুনেছে, তাদের বউ-ঝিরা বেবিয়ে এসে গাছ গাছালির আড়াল থেকে ঘোমটা তুলে রঙ্গ দেখেছে ছোটকর্তার। এত দিনের মধ্যে কোনদিন কোন আপত্তি ওঠেনি, কোন নালিস অভিযোগ আসেনি কোন পক্ষ থেকে। আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে সমস্ত কিছু কলুষিত হয়ে উঠেছে। সম্মান নেই, শ্রদ্ধা নেই, সৌহার্দ্য নেই। শচীবিলাসের সমস্ত অন্তর বেদনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

চটানের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে মুসলমান জনতা ভিড় করে রয়েছে। উত্তেজিত ভাবে তারা কি যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে। শচীবিলাস এগিয়ে গেলেন সেখানে। ডাকলেন 'মকবুল, মনসুর, এদিকে এসো।'

পিছন থেকে কয়েকটি মুসলমান ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'মকবুল মনসুর নয়, মকবুল মিঞা, মনসুর মিঞা।' শচীবিলাস ম্লান একটু হাসলেন, 'আচ্ছা তাই হবে, মকবুল মিঞা এদিকে একবার আসুন।'

মকবুল এসে জোড়হাত করে দাঁড়াল, 'মাফ করবেন কাকাবাবু। ওই ফাজিল ছোকরাদের কথায়

কান দেবেন না। মিঞা কেন, আমাকে শুধু মকবুল বলেই ডাকুন। আমি আপনার ছেলের মত।'

শচীবিলাস অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু ছেলের মত এ কোন কাজটা করলে তুমি। বছর বছর ধরে এখানে আমরা জাতীয় পতাকা তুলছি আজ হঠাৎ তোমাদের আপত্তির কি কারণ ঘটল। আর আপত্তিই যদি ছিল আগে জানালে না কেন। কেন সামিয়ানা, আর চেয়ার টেবিলগুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে তছনছ করে দিলে।'

মকবুল বলল, 'আজ্ঞে সব ওই বদমাস ছোকরাদের কাণ্ড। ওরা ক্ষেপে গিয়েছে।'

শচীবিলাস চোখ গরম করে বললেন, 'আর ক্ষেপিয়ে তুলেছে তোমাদের ওই বদমাস মৌলবী।'

মুসলমানদের মধ্যে একটা হৈ চৈ শব্দ শোনা গেল। দু'হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বলে মকবুল একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াল শচীবিলাসের সামনে, বলল, 'মৌলবী নয় কাকাবাবু, মৌলবী সাহেব। তিনি এখানকার সালার সাহেব আমাদের, নেতা, আপনি যেমন হিন্দুদের।'

শচীবিলাস ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কেবল হিন্দুদের! আমি কি তোমাদেরও নই?'

মকবুল চুপ করে রইল।

শচীবিলাস আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ, কি বলেছেন তোমাদের মৌলবী সাহেব?'

মকবুল বলল, 'বলেছেন, ও নিশান আমাদের নয়। আমাদের নিশান চাঁদ-মার্কা লীগের নিশান। আপনাদের ওই তে-রঙা উড়তে দেখলে আমাদের গুণাহ্ হয়। ও নিশান এখানে আমরা উড়তে দিতে পারি না।'

শচীবিলাস প্রতিবাদ করে বললেন, 'মিথ্যা কথা। এ নিশান কেবল হিন্দুর নয়, হিন্দু মুসলমান সকলেরই। এ নিশান ভারতের একমাত্র জাতীয় পতাকা। একে অসম্মান কোরো না মকবুল।'

কিন্তু সমস্ত মুসলমান জনতার কোলাহলে শচীবিলাসের কণ্ঠ ডুবে গেল। তাঁর শেষের দিকের কথাগুলি মোটেই শোনা গেল না।

হিন্দু যুবকের দল একদিকে রুখে দাঁড়াল আর একদিকে মুসলমানেরা। সংখ্যায় তারাই বেশি। মুহূর্তে মুহূর্তে তাদের দল স্ফীত হতে লাগল। পিছনের দিকে লাঠি আর খেজুর গাছ কাটা ছ্যানি দেখা গেল কারো কারো হাতে। এখানে কিছুতেই তে-রঙা নিশান তারা ওড়াতে দেবে না।

বিনয় শচীবিলাসের কানের কাছে এসে বলল, 'অনুমতি করেন তো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়ি গোটা কয়েক। ভয়ে ওরা পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।'

শচীবিলাস মাথা নাড়লেন, 'না বিনয়, ওসব নয়।'

বিনয় বলল, 'তবে কি জাতীয় পতাকা এ গাঁয়ে উঠবে না আজ? প্রাণের ভয়ে আমরা পিছিয়ে যাব? অপমান করব জাতীয় পতাকার?'

শচীবিলাস বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। জাতীয় পতাকা আজ আমরা তুলবই এখানে।'

বন্ধুরা বললেন, 'কাজটা সমীচীন হবে না শচী। ফের দাঙ্গা হাঙ্গামার কোন রকম সুযোগ দেওয়া উচিত নয় এখন। চল বরং অন্য স্থান দেখি, গাঁয়ে তো আরো অনেক জায়গা আছে।'

ইন্দিরা বলল, 'তা আছে। কিন্তু গাঁয়ের অনেক মানুষই তা হলে এখানে পড়ে থাকবে। স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনে গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকেরই কোন অংশ থাকবে না।'

শচীবিলাস কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তুমি তা হলে করতে চাও কি? ওদের ওই ভ্রান্ত ধারণার, অবুঝ আবদারের প্রশ্রয় দিতে চাও?'

ইন্দিরা বলল, 'আপাতত এক আধটু তো দিতেই হবে বাবা। কেবল কি ধমকেই ফল হবে? আচ্ছা দেখি আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে।'

স্তব্ধ বিমূঢ় ভঙ্গিতে, শচীবিলাস দাঁড়িয়ে রইলেন। পতাকা উত্তোলনে ঠিক এ ধরনের বাধা তিনি কোন দিন পাননি। কতবার পুলিশের হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন, পতাকার কাপড় তারা ছিঁড়ে ফেলেছে, দণ্ড ভেঙেছে পিঠের ওপর। কতবার কারাদণ্ড নিতে হয়েছে এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে। কিন্তু কোনবার নিরুদ্যম হয়ে পড়েননি শচীবিলাস, নিরুৎসাহ হননি। দু'চার দশ জন পুলিশ দেশের স্বাধীনতাকে আটকে রাখতে পারবে না, তাদের দু'চার দশ হাজার অভিভাবকরাও নয়। কিন্তু আজ আইনের বাধা নেই, পুলিশের দল এসে পথ রুখে

দাঁড়ায়নি। কিন্তু দাঁড়িয়েছে আর এক শ্রেণী। তারা দু'চার দশ জন নয়, দু'চার দশ হাজারও নয়, অনেক অনেক বেশি। তারা পর নয়, নিতান্ত আপনার জন, তাদের ফেলে দেওয়া যায় না, ছেঁটে দেওয়া যায় না, রাগে অভিমানে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না তাদের। দেশের তারা অংশ, অঙ্গের তারা প্রত্যঙ্গ। অথচ তারাই আজ পথের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারাই ছিনিয়ে নিচ্ছে স্বাধীনতা পতাকা শচীবিলাসের হাত থেকে। এর চেয়ে মর্মন্তুদ আর কি হতে পারে, এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণাদায়ক ?

ইন্দিরাকে নিজেদের দলের মধ্যে দেখে মুসলমানরা কৌতূহলী হয়ে উঠল। এই স্বদেশী মেমসাহেবটি তাদের কাছে এক বিস্ময় আর কৌতূহলের বস্তু। কখনো কখনো কৌতুকও তাবা বোধ করে। ইন্দিরা আর শচীবিলাস প্রায়ই দেশে থাকেন না। কিন্তু কলকাতা থেকে দেশে যখন ফেরেন সারা গাঁযে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। আর কোন হিন্দুর ঘরের মেয়ে এমন করে মাঠে ঘাটে বেরোয় না এ অঞ্চলে, বক্তৃতা করে না, দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে না সকলের সঙ্গে। কিন্তু ইন্দিরা সকলেব মধ্যে ব্যতিক্রম। অত্যন্ত সাহস তার, সোমত্ত পুরুষদের প্রায় গা ঘেঁষে সে দাঁড়ায়। চোখে চোখ রেখে কথা কয়। সে কথার বেশির ভাগই হয়তো বোঝা যায় না, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। ভারি মধুর ইন্দিরার বলবার ভঙ্গি। রক্তিম চমৎকার পাতলা দুটি ঠোঁট। তাকে দেখে লোভ হয় মকবুলের। কি যেন আছে এই মেয়ের মধ্যে। বহুদিনেব পুরোন পীরগাঁয়ের সেই পোড়ো মসজিদটার মত। বাইরে এখনো তার গায়ে চমৎকার সব কারুকার্যের চিহ্ন দেখা যায় কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয় না। সেই পোড়ো মসজিদের ভিতরকার রহস্য দূরে দাঁড় করিয়ে রাখে কিন্তু অভ্যন্তরে টেনে নেয না। ছোট কর্তার মেয়ে এই অপূর্ব খাপসুরৎ ইন্দিরাও তেমনি।

খানিক বাদে ইন্দিরা ফিরে এল। মুখে তার বিজয়িনীর হাসি। সে জিতেছে। সন্ধি করতে পেরেছে, সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছে এই উন্মত্ত জনতার সঙ্গে। শচীবিলাসদের কাছে ফিরে এসে ইন্দিরা বলল, 'ওদের রাজি করিয়েছি। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ওরাও যোগ দেবে। আর এখানেই হবে সেই অনুষ্ঠান, অন্যত্র যেতে হবে না।'

শচীবিলাস সাগ্রহে বললেন, 'যোগ দেবে ?'

শচীবিলাসের বন্ধু সহযোগীরা বললেন, 'কি শর্তে ?'

ইন্দিরা বলল, 'ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আপাতত ওড়ানো হবে না।'

পিতৃবন্ধুরা শ্লেষ করে উঠলেন, 'তবে কি ওড়াতে হবে ? চাঁদ মার্কা না কাস্তে-হাতুড়ি-মার্কা নিশান বুঝি ?'

ইন্দিরা মৃদু হেসে বলল, 'না তাও নয়। কোন নিশানের কথাই আজ উঠবে না। আজ প্রতীকের দরকার নেই আমাদের, তার বদলে মানুষকে পেয়েছি।'

অনেক আপত্তি উঠল। বিনয়ের দলের কেউ কেউ চলেও গেল জায়গা ছেড়ে। কিন্তু খানিকটা ইতস্তত করে শচীবিলাস শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন একটা টেবিলেব ওপব, 'বন্ধুগণ।'

তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শচীবিলাস আবার উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধুগণ !'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল আজকের দিনে শূন্য তাঁর হাত। দৃঢ় হস্তে জাতীয় পতাকা তিনি সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। লোকে কানাকানি করছে এটা তাঁর নিতান্তই সন্তানবাৎসল্য। তিনি জানেন তা ঠিক নয়। এ তাঁরই স্বদেশ আব স্বজনবাৎসল্যও বটে। বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নেওয়ার জন্য অভ্যাস বশে পলকের জন্য একটু চোখ বুঝলেন শচীবিলাস। আব আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে মুখে তাঁর গভীর প্রশান্ত পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল। আর কোন ক্ষোভ নেই, কোন বেদনা নেই তাঁর অন্তরে।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা দুলে দুলে উঠছে মৃদু হাওয়ায়। মাঝখানটায় খদ্দরেব পবিত্র শুভ্রতা আর দুইপাশে হরিত হলুদের ঢেউ।

পৌষ-মাঘ ১৩৫৩

শোক

ঘর নির্জন হয়ে গেলে ভিতর থেকে দোরে খিল দিয়ে দেয়াল থেকে স্বামীর ফটোখানা পেড়ে আনল মল্লিকা। ফটো তো নয় যেন জীবন্ত মানুষটিই দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেমে বাঁধানো কাঁচের আড়ালে। কালো বড় বড় দু'টি চোখে সেই সজীব সতৃষ্ণ দৃষ্টি, মৃদু হাসির আভাস দুটি সুন্দর ঠোঁটে, আঁটসাট খাঁকির পোশাকে শশধরের দীর্ঘ, সবল দেহ আরও শক্তিশালী আর বলিষ্ঠ মনে হচ্ছে। দু'হাতে ফটোখানা চোখের সামনে ধরে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইল মল্লিকা। তারপর সব ঝাপসা হয়ে গেল, দুই চোখ ভরে উঠল জলে, গভীর আবেগে কাঁপতে লাগল দু'টি ঠোঁট। চোখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মল্লিকা বুকে চেপে ধরল ফটোখানাকে। তারপর অবুঝ অসহায় একটি ছোট মেয়ের মতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, 'কেন, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে।' যেন মাঝখানে দু' বছর কেটে যায়নি, যেন সদ্য স্বামী শোকের আঘাতে বুক তার দীর্ণ হয়ে গেছে।

কান্নার শব্দে মল্লিকার মা কুমুদিনী এসে দাঁড়ালেন দোরের পাশে। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর সস্নেহে ডাকলেন, 'খুকি।'

প্রথম দু' তিন ডাকে সাড়া দিল না মল্লিকা। তারপর বিরক্ত স্বরে বলল, 'কি বলছ!'

কুমুদিনী বললেন, 'আয় আমার কাছে। আয়, লোকের মধ্যে আয়।'

মল্লিকা জবাব দিল, 'যাও তুমি, যাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে কুমুদিনী ফিরে চললেন। কান্না ছাড়া আর কি সম্বল আছে অভাগীর। কাঁদুক, কেঁদে শান্ত হোক। মেয়ের দশা ভেবে নিজের চোখ দুটোও একবার ছল ছল করে উঠল কুমুদিনীর, আঁচল দিয়ে নিজেই মুছলেন চোখের জল। মেয়ের ঘরের কাছে তাঁর তো শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আরো কাজ আছে সংসারের। জামাইর মৃত্যুতিথিতে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করেছেন। খবর দেওয়া হয়েছে পুরোহিতকে। খুঁটিনাটি অনেক কিছু করতে হবে। করাই সঙ্গত। অপঘাত মৃত্যু হয়েছে শশধরের। তাই দোষ যেন কিছুতেই আর কাটতে চাচ্ছে না। প্রায় রোজ রাত্রেই মেয়ে তার স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠছে। কুমুদিনী নিজেও দেখেছেন—অনেক দিন। গয়ায় যাবার কথা বলেছিলেন মেয়েকে। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কান দেয় না, মেয়েও না, মেয়ের বাপও না। আর মল্লিকার শ্বশুর তো পুরোপুরি নাস্তিক। তাঁর কাছে এসব কথা পাড়তেই পারেননি কুমুদিনী। যাবার সময় আর একবার তিনি মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে ডেকে গেলেন, 'অমন করিসনে খুকি, আয়।'

কিন্তু মল্লিকা তেমনি নিঃশব্দে পড়ে রইল বিছানায়। কি হবে উঠে, কি হবে গিয়ে লোকের মধ্যে। লোক? লোকই তো তার শত্রু। শশধর তো ইচ্ছা করে তাকে ছেড়ে যায়নি, এখানকার লোকেই নৃশংসভাবে তাকে খুন করেছে। জল ভরা চোখ দুটো এবার জ্বলে উঠল মল্লিকার। এখানকার প্রত্যেকটি মানুষকে যদি সে খুন করতে পারত তবে বুঝি সাধ মিটত প্রাণের। এখনো সেই দিনটি, এখনো শশধরেব সেই ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত অসাড় দেহ চোখের সামনে ভেসে উঠে মল্লিকার। ফটোতে স্বামীর অমন সুন্দর প্রতিকৃতি সেই রক্তে মুছে ঢেকে লুপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু স্মৃতি থেকে সব তো লুপ্ত হয় না। সে সময়ের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তের কথা এখনো যে স্পষ্ট মনে পড়ে মল্লিকার।

বিয়ের পরে ছ'মাস যেতে না যেতেই চাকুরিতে পদোন্নতি হল শশধরের। এল· সি· থেকে সাবইনস্পেক্টার। শাশুড়ী খুশি হয়ে বললেন, 'পয়মন্ত বউ, বেঁচে থাক মা, সতী সাবিত্রী হও।' আরো মাস ছয়েক বাদে কুমারপুরে বদলী হওয়ার খবর এল। শশধর বলল, 'এটি কিন্তু ভালো হল না।'

মল্লিকা বলল, 'কেন, আমার বাপের বাড়ির শহর বলে?'

শশধর ঠোঁট টিপে হাসল, 'হ্যাঁ তাই, শ্বশুরবাড়ির ধুতি পাঞ্জাবিতে কি আর দারোগাগিরি করা চলবে?'

মল্লিকা বলল, 'সে জন্য ভাবতে হবে না। কেন গভর্নমেন্ট বুঝি খাঁকির পোশাক আর যোগাবে না

সেখানে ?'

মল্লিকা সত্যিই খুশি হয়েছিল। স্বামীর গৌরবটি এবার প্রত্যক্ষ করবে বাপের বাড়ির দেশের লোক। আত্মীয় স্বজনের কাছে গৌরব বাড়বে মল্লিকার। সামান্য একজন মুহুরীর মেয়ে বলে ওখানকার উকিল, ডাক্তার, পেসকার, মুনসেফের ছেলেমেয়েরা তার দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকাত। দেখবে তারা মল্লিকার নতুন রূপ, নতুন পদ। আসলে থানার দারোগাই তো শহরের সব। সব চাইতে বেশি ক্ষমতা তার হাতে। চোর ডাকাত যেমন তাকে ভয় করে চলে, তেমনি খাতির করে তাকে বাজারের দোকানদার, ডাক্তার, উকিল, মাস্টার, মুনসেফ সবাই। দেখে দেখে সব বুঝে নিয়েছে মল্লিকা। জানতে শিখতে তার কিছু আর বাকি নেই।

মনে মনে শশধরও যে খুশি হয়েছে তাও মল্লিকা জানে। শ্বশুরবাড়ির শহর বলে নয়, কুমারপুর জায়গাটিও শশধরের ভারি পছন্দ হয়েছে। বেশ শান্ত, স্বাস্থ্যকর জায়গা। কোন রকম হাঙ্গামা হুজুক নেই। শ্বশুরবাড়ির দেশই বটে। কেবল একটু চিন্তা আছে শশধর উপরওয়ালাকে দেখাবার মত কাজ পেলে হয় তাতে। দেশটি যেন নিতান্ত সাধু মহান্তে না ভরে যায়। তাহলে দ্রুত উন্নতিতে বাধা পড়বে শশধরের।

আশঙ্কাটি স্ত্রীর কাছেও মাঝে মাঝে খুলে বলত শশধর। স্বামীর জন্য সোয়েটার বুনতে বুনতে মল্লিকা জবাব দিত, 'অত ভাববার কি আছে তাতে ? বলতে পারবে না তোমার ভয়েই এখানকার সব লোকে সাধু সজ্জন হয়েছে। আসলে দেশটা শান্ত থাকুক গভর্নমেন্টও তো তাই চায়।'

সত্যিই ভারি শান্ত জায়গাটা। নদীর পার ঘেঁষে থানার কোয়ার্টার্রি, জানলার নীল পর্দা তুলে আষাঢ়ের মেঘলা দুপুরে মাঝে মাঝে জলের দিকে চেয়ে থাকত মল্লিকা। চোখে পড়ত খেয়ায় পারাপার হচ্ছে লোক। রঙ বেরঙের পাল তুলে দিয়ে মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে।

শশধর বলত, 'কেবল বসে থেক না, বই পড়, খবরের কাগজ পড়, জ্ঞান বাড়বে।'

বিদেশী যুদ্ধের খবর পড়ত মল্লিকা কাগজ খুলে। ইংরেজ আর জার্মানের যুদ্ধ, অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম, মানুষের আর জায়গার। রক্তারক্তি কাণ্ড হচ্ছে, প্রলয় ঘটছে নাকি সে সব দেশে। কিন্তু এত উত্তেজনা সত্ত্বেও দু'চার লাইন পড়তে না পড়তেই চোখ দুটো ঢুলে আসত মল্লিকার, কাগজটা হাত থেকে খসে পড়ত মাটিতে।

তারপর হঠাৎ দেখা গেল নতুন রকমের খবর। দেখতে দেখতে কেন যেন ক্ষেপে উঠেছে দেশটা। উপড়ে ফেলছে রেললাইন, স্টেশন জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জ্বালাচ্ছে পোস্ট অফিস, কাটছে ট্রাম লাইনের তার। নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন, এ নাকি তারই প্রতিবাদ। রাগে, দুঃখে লোকগুলি কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

মল্লিকা বলল, 'আমাদের বোবা ঝিটার মতই ছটফট করছে দেখছি। রাগলে ওরও এই দশা হয়। ওর রাগ তো তুমি দেখনি। সে এক মারাত্মক ব্যাপার।'

শশধর গম্ভীর মুখে বলল, 'হুঁ।'

কাটল দিন কয়েক। তারপর শোনা গেল এখানকার হাইস্কুলের ছাত্ররা সেদিন এক শোভাযাত্রা বের করেছে। মিটিং করে গালাগাল দিয়েছে সরকারকে। ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে থানা থেকে হুকুম জারি করে দিয়েছে শশধর ওরকম মিটিং আর প্রসেশন যেন আর না হয়। সরকারি ডাক্তারের ছেলেও ছিল নাকি এই দলে। তাকেও আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছে।

মল্লিকা শুনে বলল, 'আহাহা, ওদের মিটিং-এ কি এসে যায়। তোমরা অত চটছ কেন তার জন্য।'

শশধর রূঢ়স্বরে বলল, 'চুপ কর তুমি। কেবল স্কুলের ছেলেরাই নয়, পিছনে তাদের মাস্টার আর বাপ-খুড়োরাও আছে। ধমক তাদেরও না দিলে চলবে না।'

শুনে হাসি পেল মল্লিকার। অত বড় মান্যগণ্য বুড়ো বুড়ো মানুষকে সত্যিই ধমকাবে নাকি শশধর ? মন্দ হবে না তো ব্যাপারটা। কয়েক বছর আগে বার লাইব্রেরির উকিলদের সৌখীন থিয়েটার শুনতে গিয়ে সামনের দিকে বসেছিল মল্লিকা। ভবেশবাবু তা দেখে তাকে আচ্ছা করে

ধমকে দিয়েছিলেন—, 'ওঠো এখান থেকে। এ তোমাদের জায়গা নয়, এখানে উকিল মুন্‌সেফের বাড়ির মেয়েরা সব বসবেন।'

সেই ভবেশ ডাক্তারও নাকি আছে এ সব গোলমালের মধ্যে। তাকে যদি একবার ধমকে দিতে পারে শশধর, বেশ মজা দেখে মল্লিকা।

কিন্তু দারোগার হুকুম না মেনে ছেলেরা সেদিন ফের মিটিং ডাকল কালীবাড়ির মাঠে। আশেপাশের দশ-পনের গাঁ ভেঙে আসতে লাগল তরুণ যুবকের দল। থানা থেকে দলবল নিয়ে শশধরও চলল সেখানে। পরণে শক্ত খাঁকির পোশাক, হাতে বন্দুক।

মল্লিকা বলেছিল, 'শুনেছি ওখানে নাকি অনেক লোকজন এসেছে, গোলমাল হতে পারে।'

তার দিকে তাকিয়ে অমন ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ মুচকে একটু হেসেছিল শশধর, 'গোলমাল যাতে না হতে পারে সেই জন্যই তো যাচ্ছি।'

মল্লিকা বলেছিল, 'কি জানি বাপু, আমার কিন্তু ভয় করছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, দেরি করো না যেন।'

মল্লিকার সকাতর অনুরোধটুকু মনে মনে উপভোগ করতে করতে শশধর জবাব দিয়েছিল, 'আচ্ছা আচ্ছা তাড়াতাড়িই ফিরব, দেরি হবে না। তোমার হুকুম মানতে হবে বইকি, সব চেয়ে বড় ওপরওয়ালা যখন তুমি।'

কিন্তু হুকুম শেষ পর্যন্ত মানেনি শশধর, দেশের লোকে তাকে মানতে দেয়নি। মাঠশুদ্ধ লোক তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তার হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। ভয়ে পালিয়ে এসেছে তার দলবল কনেস্টবলেরা। একটিলোককেমারবার জন্য দেশশুদ্ধ লোক না এনেছিল হেন অস্ত্র নেই। ইট, লাঠি, সোডার বোতল, সব কিছুর আঘাতই শশধরের মাথায় মুখে পিঠে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কানের পিঠ থেকে কাতলা মাছের রক্তের মত কয়েক ঘণ্টা অবিরল রক্ত ঝরেছিল শশধরের। সন্ধ্যার দিকে তার মৃত দেহ যখন থানার লোকেরা ঘরের সামনে এনে নামিয়ে রেখেছিল মল্লিকা একবার সে দিকে তাকিয়েই আর্তনাদ করে সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল দু'দিনের মধ্যে আর তার জ্ঞান ভালো করে ফিরে আসেনি।

দু'দিন পরে যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে মা-বাপের আশ্রয়ে। থানার ইন্‌স্পেক্টর দেখা করতে এসেছিলেন তার সঙ্গে, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'যা হয়েছে তার আর চার নেই বউমা, কিন্তু উচিত প্রতিশোধ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে, আরো হবে। বিশ্বস্ত কর্মচারির মৃত্যু সরকার অত সহজে ভুলবে না।'

তারপর শোকশয্যায় শুয়ে শুয়েই সেই প্রতিশোধের কাহিনী একটু একটু করে কান পেতে শুনেছে মল্লিকা। পর দিন ভোরেই সদর থেকে সশস্ত্র পুলিশ আর সৈন্যে ঘিরে ফেলেছিল শহরকে। দোকান পাট থেকে ডাল তেল নুন ছড়িয়ে ফেলেছিল রাস্তার ধুলোয়। চার পাশের অশিক্ষিত গুণ্ডা বদমাসদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল লুটপাটের জন্য। শহরের সম্মানিত সব বড় বড় মোক্তার, মাস্টার, উকিল, ডাক্তারদের বউঝিরা এক বস্ত্রে অতি কষ্টে মান নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছিল। গহনাপত্রের সঙ্গে মানসম্মানও খুইয়েছিল কেউ কেউ। স্কুলের হেডমাস্টার আর ইতিহাসের মাস্টারকে দু'দিন দু'রাত অনাহারে আটকে রাখা হয়েছিল থানায়। শহরের অধিকাংশ যুবকদের নৃশংস নির্যাতনের পর হত্যার অপরাধে চালান দেওয়া হয়েছিল সদরে। মল্লিকার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ কম হয়নি। তবু মনে হয় আরো হলে ভালো হত। রেণু রেণু করে এ শহরকে ভেঙে গুড়িয়ে কুমারের জলে মিশিয়ে দিতে পারলে বুঝি প্রাণে শান্তি আসত মল্লিকার।

কেন এমন করে মেরে ফেলল তারা শশধরকে। কি করেছিল সে। প্রতিশোধের বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে স্বামীর বিরুদ্ধে নানারকম নিন্দা ধিক্কারের কথাও কানে যায় মল্লিকার। উচিত ফলই নাকি পেয়েছে শশধর, সে নাকি শত্রু ছিল দেশের লোকের। প্রতিবন্ধক ছিল স্বাধীনতার। সেদিনের সেই সভায় এ অঞ্চলের প্রবীণ দেশকর্মী সভাপতি সুরেশবাবুকে নাকি সে অকথ্য কটূক্তি করেছিল, গালিগালাজ করেছিল অশিষ্ট ভাষায়। উত্তেজিত জনতা তা সহ্য করেনি।

শুনে বিশ্বাস হতে চায়নি মল্লিকার। মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে তারা তার স্বামীর নামে। অবাধ্য

ছেলে ছোকরা আর গুণ্ডা বদমাসকেই গালাগাল মারধর করত শশধর। রাগ হলে ঝি চাকরকেও বকত। কিন্তু থানার আর পাঁচজন কর্মচারীর মতন মল্লিকার স্বামী তো অমন নিষ্ঠুর আর অশিষ্ট ছিল না। আরো দুটো থানার ছোট দারোগা বড় দারোগাদের ব্যবহার নিজের চক্ষে তো দেখেছে মল্লিকা, তার চেয়ে বেশি শুনেছে তাদের স্ত্রীর কাছে। কিন্তু শশধর তাদের তুলনায় ছিল দেবতার মত। সে কোনদিন মদ খায়নি, অজায়গায় কুজায়গায় গিয়ে রাত কাটায়নি, কিছুমাত্র খারাপ ব্যবহার করেনি মল্লিকার সাথে। সব সময় হাসিমুখে কথা বলেছে, আদর সোহাগ করেছে প্রাণভরে। মল্লিকার বাপ-মাকে যথেষ্ট সম্মান করে চলেছে। দারোগা বলে কোনদিন একটু দেমাক দেখায়নি। বাইরের স্বজন বন্ধুরা এলে ঘরে ডেকে নিয়ে সাধ্যাতীত আদর আপ্যায়ন করেছে শশধর, অসঙ্কোচে আলাপ করিয়ে দিয়েছে মল্লিকার সঙ্গে। এত সরল, এত উদার যে মানুষ, সে ছিল খারাপ, ছিল দেশের শত্রু, এ কথা কি করে বিশ্বাস করবে মল্লিকা, কেন করবে। আর যদি বেআইনী কাজ করার জন্য গাল দু একটি দিয়েই থাকে শশধর, না হয় দিয়েছেই। সেই জন্যই কি মেরে ফেলতে হবে মানুষকে? আইন নেই? বিচার নেই? কিন্তু বিচার বোধ হয় নেইই দেশে। শশধরকে খুন করবার অপরাধে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কাউকে ফাঁসি দিতে পারেননি। কলকাতা থেকে বড় ব্যারিস্টার দাঁড়িয়ে ছিলেন আসামীদের পক্ষে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাকি মেলেনি কারো বিরুদ্ধেই। শহরের জনকয়েক ছেলে পালিয়ে ফেরার হয়েছে। কয়েকজন ছ'মাস এক বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছে। কেবল জেলে পচছেন সুরেশ্বর চৌধুরী। অন্য সব আন্দোলনের আরো অনেকবার জেল হয়েছে তাঁর। পুলিশ তাঁকে চিনে রেখেছিল। মনে মনে খুব খুশি হয়েছিল মল্লিকা। এই উপলক্ষে অন্তত একজন লোকও জীবন ভরে জেল খেটে মরুক। তাহলেও যেন খানিকটা শান্তি আসে, সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আর কিছুটা প্রতিশোধ নেওয়া হয় শশধরের মৃত্যুতে। এখানকার লোকে বলে এ ব্যাপারে সুরেশ্বরবাবুর নাকি কোন দোষ ছিল না। পুরনো আক্রোশে পুলিশ তাঁর ঘাড়ে সব অপরাধ চাপিয়েছে। এবার বিনা অপরাধেই তিন বছর জেল হয়েছে তাঁর। বেশ হয়েছে। অন্তত এক জনের ওপর দিয়ে তো খানিকটা শোধ নিতে পেরেছে মল্লিকা। তিন বছর তো ভালো, সারা জীবন কেন জেল হল না বুড়োর। অল্প দোষে যত বেশি শাস্তি হয় ততই তো মজার। দোষ কি? কি দোষ ছিল শশধরের? কি দোষ ছিল মল্লিকার, যে এই দশা হল তার কপালে? কি দোষ করেছে সে, যে বিয়ের পর দু'বছর যেতে না যেতেই তাকে সর্বস্ব হারাতে হল?

স্বামীর ফটোখানা মল্লিকা আর একবার চেপে ধরলো বুকে, 'ওগো বলো, কেন এমন হল, কেন। কেন তুমি আমাকে এমন করে ফেলে গেলে?

চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল মল্লিকার।

আর একবার কুমুদিনী এসে ধাক্কা দিলেন দোরে। 'খুকি ওঠ! পুরোহিত মশাই ডাকছেন।'

মল্লিকা বলল, 'বলে দাও আমি পারব না যেতে। কি হবে গিয়ে।' কুমুদিনী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ছি! ওকি বলছিস খুকি। তোরই তো কাজ। মন্ত্র পড়বি, দান দক্ষিণা দিবি নিজের হাতে। ব্রাহ্মণরা বেশি দেরি করতে পারবেন না; একটু বাদেই তাঁদের জায়গা করে দিতে হবে। আর তুই এসে দাঁড়াবি সামনে। চাল আর পয়সা দিবি ভিখিরিদের।'

অবশেষে বাধ্য হয়ে উঠতেই হল। এসব ভালো লাগে না মল্লিকার। কোন উৎসাহ কি আগ্রহ আসে না মনে। কি হবে এসব করে। যেসব ব্রাহ্মণরা খেতে এসেছেন সে দিনের সেই সভায় কে জানে হয়তো এঁরাও কেউ ছিলেন। ছিল এঁদের ছেলেপুলে আত্মীয় স্বজনেরা। এরা সব এই কুমারপুরের লোক। এঁদের খাওয়ালে কেন তৃপ্ত হবে তার স্বামীর আত্মা। মনে মনে অস্বীকার করে মল্লিকা, 'না না কিছুতেই না।'

তবু কোন অনুষ্ঠানই বাদ পড়ল না। খুঁটে খুঁটে সবই করতে হল মল্লিকাকে। প্রতিবারই বিপিনবাবু পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'করো মা করতে হয়।'

বাবার গলার স্বরে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল মল্লিকার।

বারকোষে দুর্বা বেলপাতার সঙ্গে কিছু ফুলও তুলে রাখা হয়েছিল। ফুল দেখে মল্লিকার মনে

পড়ল শশধর এক দিন বলেছিল ফুলের মালার কথা। বলেছিল, 'সেই যে বিয়ের দিন একবার মালা পরেছিলাম, ফের আর পেলাম না সেই মালা।'

মল্লিকা হেসে বলেছিল, 'পরো না একদিন। পরে অফিসে যেয়ো। বেশ মানাবে তোমার খাঁকির কোট প্যান্টের সঙ্গে।' শশধর বলেছিল, 'আচ্ছা তুমি তো গেঁথে রাখো। তারপর না হয় বাজার থেকে চেলির জোড় আনিয়েই পরব। তখন তো মানাবে।'

ইনস্পেক্টরের বাগান থেকে ফুল আনিয়ে মালা গেঁথেও ছিল মল্লিকা, কিন্তু শশধরের পরবার সময় হয়নি। কি একটা ডাকাতির তদন্তে তাকে বাইরে যেতে হয়েছিল। মালা শুকিয়ে গিয়েছিল মল্লিকার।

অনুষ্ঠান সব শেষ হয়ে গেলে মল্লিকা ছোট বোন অতসীকে ডেকে বলল, 'কিছু ফুল আনতে পারবি অতু?'

ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অতসী। বছর আটেক হবে বয়স। মাঝখানে আর একটি ভাই আর বোন হয়েছিল মল্লিকার। তারা নেই। বাড়ির সবার আদরের ধন হয়ে উঠেছে অতসী। কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল নেমেছে কাঁধ পর্যন্ত। সেই চুল দুলিয়ে অতসী জিজ্ঞাসা করল, 'ফুল দিয়ে কি করবি দিদি।' মল্লিকা বলল, 'আছে দরকার। পারবি আনতে?'

অতসী বলল, 'খুব।'

কিন্তু খুব ফুল জুটল না। বর্ষাকালে ফুল কোথায় শহরে? আর এত বেলায় কারো গাছে কি ফুল থাকে নাকি! এ বাসা ও বাসা ঘুরে জুটল কিছু যুঁই, কিছু গন্ধরাজের কুঁড়ি। টোপড় ভরে তাই কুড়িয়ে আনল অতসী। এসে বলল, 'বাব্বা, কত কষ্টে যে জোগাড় করেছি দিদি! কি করবে, মালা গাঁথবে নাকি? দাও আমি দিই গেঁথে।' মল্লিকা বলল, 'এখন না পরে।' এখন না আরো পরে। লোকজনের যখন ভিড় কমবে, স্বামীর ফটো নিয়ে যখন ফের একা গিয়ে ঘরে বসতে পাবরে মল্লিকা তখন। মালা গেঁথে তখন স্বামীর ফটোতে সে পরিয়ে দেবে। বলবে, 'মালা চেয়েছিল, নাও। এবার তো সাধ মিটলো, মিটলো তো?'

ভোজন অন্তে দক্ষিণা নিয়ে বিদায় হলেন ব্রাহ্মণেরা, পয়সা আর একমুঠ করে চাল পেয়ে ভিখারিরা খুশি হয়ে ফিরে গেল। মল্লিকা ঘরে ঢুকতে যাবে হঠাৎ খানিক দূরে লঞ্চ-ঘাটের সামনের বড় রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল।

মল্লিকা বলল, 'ওকি বাবা।'

বিপিনবাবু বলেন, 'সদরের লঞ্চ এসেছে ঘাটে।'

মল্লিকা বলল, 'লঞ্চ তো রোজই আসে, এত কলরব কোলাহল কেন।'

বিপিনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সুরেশ্বরবাবু খালাস পেয়েছেন আজ। তিনিও এসেছেন, এই লঞ্চে।'

খালাস পেয়েছেন? এত তাড়াতাড়ি খালাস পাওয়ার কথা ছিল তাঁর? সবাই একথা আগেই জানত তাহলে? কেবল মল্লিকার কাছেই ইচ্ছা করে সকলে এ কথা গোপন রেখেছে?

মল্লিকা আহত রুক্ষস্বরে বলল, 'আমাকে এ কথা আগে জানাননি কেন বাবা। আজই, এই দিনই সুরেশ্বরবাবুর মুক্তি পাওয়ার দিন আমাকে আগে কেন বলেননি।'

বিপিনবাবু একটু যেন অপরাধীর সুরে বললেন, 'আগে ঠিক আমিও জানতাম না মা। পুরো আড়াই বছরই তাঁর জেল হয়েছিল। কিন্তু শরীর একেবারে ভেঙে পড়ায় গভর্নমেন্ট আগেই ছেড়ে দিয়েছে। শুনেছি কিছুই নাকি নেই আর দেহের। একেবারে অস্থিচর্ম সার হয়ে গেছে। যে কোন দিনই হয়ে যেতে পারে। গভর্নমেন্ট সেই জন্যই আর রাখতে সাহস পায়নি।'

কেমন যেন একটু আর্দ্র শোনাল বিপিনবাবুর গলা। কি বলতে গিয়ে মল্লিকা চুপ করে গেল।

রাস্তা থেকে ছুটতে ছুটতে এল অতসী, 'দিদি, আমার ফুল কোথায়, ফুল?'

মল্লিকা লজ্জিত করুণ চোখে একবার তাকাল বিপিনবাবুর দিকে। তারপর অতসীর দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বলল, 'তোর ফুল?' অতসী বলল, 'বাঃ রে, আমার নয়? কষ্ট করে আমি আনলুম না কুড়িয়ে?'

মল্লিকা কোন জবাব দিতে পারল না।

অতসী কাতর অনুনয়ে বলল, 'আচ্ছা না হয় তোমারই ফুল দিদি, তাই মেনে নিলুম। বলো না কোথায় রেখেছ?'

মল্লিকা আস্তে আস্তে বলল, 'তক্তপোষের তলায়। সাজির মধ্যে কলার পাতা দিয়ে ঢাকা আছে দেখ গিয়ে।'

আঁচল ভরে ফুল নিয়ে ফের রাস্তার দিকে ছুটে চলল অতসী।

মল্লিকা বাধা দিয়ে বলল, 'কাকে দিতে যাচ্ছিস ফুল।' অতসী অবাক হয়ে বলল, 'কাকে আবার, সুরেশ্বরবাবুকে। তুমি কিছু জানো না বুঝি দিদি। তিনি যে খালাস পেয়ে ফিরে এসেছেন। সবাই উলু দিচ্ছে, কাছে গিয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছে তাঁর। আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই যাবে শোভাযাত্রা। এস না সদরের দোরের কাছে, দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। এস, তোমাকেও ভাগ দেব ফুলের।'

বিপিনবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন মেয়েকে, 'দিদিকে সব ফুল ফিরিয়ে দাও অতসী।'

কিন্তু গলায় যেন তেমন তাঁর জোর নেই, ধমকের মধ্যে নেই রাগ।

মল্লিকা বলল, 'থাক বাবা। মিছামিছি বকবেন না ওকে।'

বিপিনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আয়না, আমরা ঘরের মধ্যে গিয়ে বসি।'

মল্লিকা ম্লান একটু হাসল, 'না বাবা তার চেয়ে চলুন বাইরেই দাঁড়াই গিয়ে।'

দেখতে দেখতে শোভাযাত্রা বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল। অতসী ততক্ষণে একটা মালার মত গেঁথে ফেলেছে। তাই ছুটতে ছুটতে ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। দু'জন বলিষ্ঠ যুবকের কাঁধে ভর দিয়ে সুরেশ্বরবাবু কোন রকম এগিয়ে চলেছেন। অত্যন্ত দুর্বল, রুগ্ন শীর্ণ চেহারা। হাড় ক'খানা যেন গুণে নেওয়া যায়। শহরবাসীরা বহু চেষ্টা করেও তাঁকে গাড়িতে তুলতে পারেনি। তিনি হাসি মুখে বলেছেন, এ পথটুকু তিনি হেঁটেই এগিয়ে যেতে পারবেন। হাঁটতে ভালো লাগবে তাঁর। এখনো লেগে আছে তাঁর মুখে সেই অদ্ভুত হাসি। মালা নিয়ে এগিয়ে গেল অতসী। তিনি স্মিতহাস্যে মাথা নিচু করলেন তার সামনে। সঙ্গীরা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বললে। তিনি একটু যেন চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন দরজায় দাঁড়ানো মল্লিকার দিকে। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হল মল্লিকার। মনে হল সুরেশ্বরবাবুর কোটরগত বিবর্ণ চোখ দুটি যেন মুহূর্তের জন্য ছল ছল করে উঠল। পরক্ষণেই তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলতে লাগল।

মল্লিকা আর দাঁড়াল না। ছুটে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। দোর ভেজিয়ে দিয়ে স্বামীর ফটোখানা তীব্র আবেগে দুই ঠোঁটের সঙ্গে চেপে ধরল মল্লিকা। স্বচ্ছ কাঁচের ওপর দিয়ে চোখের জল অঝোরে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেন অমন হল শশধর? কেন অমন করে শেষ হল তার জীবন? সেও কি হতে পারত না ওঁর মত?

অর্ধস্ফুট স্বরে মল্লিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'ওগো তোমার ফুলের মালা কি অতসী তাহলে অমন করে কেড়ে নিতে পারত?'

শ্রাবণ ১৩৫৪

ক্রোড়পত্র

"সুচরিতাসু

পত্রবাহক আমার একজন বন্ধু। একটি দুঃস্থা আত্মীয়াকে নিয়ে ইনি সম্প্রতি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। মেয়েটি বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই বিধবা হয়েছে। পিতৃকুলে কি শ্বশুরকুলে দেখাশোনা করবার মত নিকটসম্পর্কীয়া কেউ নেই। সামান্য লেখাপড়া জানে। কোন প্রতিষ্ঠানের সহায্যে আরো একটু পড়াশুনো কি হাতের কাজ-টাজ কিছু শিখে মেয়েটি যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তার অভিভাবকেরা সেই চেষ্টাই করছেন। তোমাদের সমিতি থেকে যদি কোন ব্যবস্থা

করতে পারো,'আমি ব্যক্তিগত উপকার বোধ করব ।"

এই পর্যন্ত লিখে অসিতবাবু চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, "দেখুন তো হল কিনা ।"

চিঠিখানার ওপর আমি আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম । অফিসের প্যাডের কাগজে লেখা চিঠি । ওপরে বড় বড় ইংরেজী হরফে অসিতবাবুদের নাতিখ্যাত ইন্সিওরেন্স কোম্পানির নাম ঠিকানা মুদ্রিত । তার নিচে ছোট ছোট জড়ানো অক্ষরে এই সুপারিশ চিঠি শুরু হয়ে নিতান্ত মামুলী ভঙ্গিতে শেষ হয়েছে ।

প্যাডসুদ্ধ চিঠিখানা ফের ঠেলে দিলাম অসিতবাবুর দিকে ।

বললুম, "হল কি না হল তা আপনিই সবচেয়ে ভাল জানেন অসিতবাবু ।"

মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম । কথার সুরে সেই ক্ষোভ গোপন রাখতে চেষ্টা করলাম না । অসিতবাবুর সঙ্গে আমার আজ বছর তিন-চার ধরে জানাশোনা । এক টেবিলে মুখোমুখি বসে কাজ করেছি । কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য, রাজনীতি থেকে শুরু ক'রে পারিবারিক এবং দাম্পত্য সুখদুঃখের গল্প করেছি । বছর খানেক আগে এই কোম্পানির সেক্রেটারির পদ নিয়ে অসিতবাবু চলে এসেছেন । আমি আছি সেই পুরনো অফিসের নিচের সিঁড়িতে । কিন্তু তাই বলে আমাদের দু' জনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ আলোচনায় হৃদ্যতাব কোন তারতম্য ঘটেনি । তাই, সুপারিশ-চিঠিখানা অসিতবাবু একটু ভাল ক'রে ধরে লিখবেন এই আশাই করেছিলাম । কেন না, চিঠির কথা সেদিন তিনিই উপযাচক হয়ে বলেছিলেন আমাকে । অফিস-ফেরত ট্রামে পাশাপাশি বসে আগের মতই পুত্রকলত্র ঘর-সংসারেব আলোচনা করেছিলাম দু'জনে । কথায় কথায় আমার মাসতুতো বোন উমার কথাও উঠে পড়ল । তার দুর্ভাগ্য আর মার দুর্ভাবনার কথা সব শুনে অসিতবাবু বললেন, "আজকাল তো মেয়েদের জন্য কত সব ভাল ভাল প্রতিষ্ঠান হয়েছে, দিন না তার কোনটিতে ভর্তি করে । লেখাপড়া কাজকর্ম শিখে স্বাবলম্বী হতে পারবে । আপত্তি না থাকলে যোগ্য ছেলেটেলে দেখে ফের বিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে কোন কোন জায়গায় ।"

বললুম, "আছে নাকি জানাশোনা তেমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ?"

অসিতবাবু মৃদু একটু হেসেছিলেন, "একেবারে কি আর না আছে ? তা হলে দয়া করে বেড়াতে বেড়াতে আসুন না একদিন আমাদের অফিসে । একখানা চিঠি লিখে দেব ।"

প্রায় আধঘণ্টা আমাকে বসিয়ে রেখে, কলমটা একবার খুলে আর একবার বন্ধ করে, দ্বিতীয়বার খুলে মনে মনে কিছুক্ষণ ধরে খানিক কি মুসাবিদা করে অসিতবাবু শেষ পর্যন্ত লিখে দিলেন—আব একটু যত্ন করে আর একটু আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখিয়ে চিঠিখানা লিখলে কি ক্ষতি ছিল অসিতবাবুর ?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছিলেন অসিতবাবু, হঠাৎ বললেন, "অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে ? আপনার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে চিঠি দেখে আপনি খুশী হননি ।"

বললুম, "আমার খুশী হওয়া না হওয়া নিয়ে তো কথা নয় । আপনি লিখে খুশী হলেই হল । আমার কাজ নিয়ে কথা । তবে হ্যাঁ, কলমেব রাশটা একটু কড়া করেই টেনেছেন বলে মনে হচ্ছে ।"

অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, বললেন, "তাই নাকি ? তা হবে । কলমের বাশ কি ইচ্ছা করলেই সব সময় ছাড়া যায় মশাই, না ছাড়বার জো থাকে ?"

বললুম, "তাব মানে ?"

অসিতবাবু বললেন, "ওই দেখুন, অমনি বুঝি কানে লেগেছে কথাটা, না কল্যাণবাবু, বড্ড প্রফেসনাল চোখ কান আপনাদেব, কোন কথা বলে সারবাব জো নেই । আপনারা চট করে মানের দিকে মন দেবেন । মানে আবার কি, মানে নেই কিছু । আসুন, বরং আর একটু চা খাওয়া যাক ।"

কাঠের পার্টিসন-ঘেরা ছোট্ট কামরাটুকুর মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে । অসিতবাবু হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন, বেল টিপে ডাকলেন বেয়ারাকে, বললেন, "দু' কাপ চা ।"

তারপর চিঠিসুদ্ধ প্যাডটা টেনে নিলেন অসতিবাবু । আর একবার সম্পূর্ণ চিঠিখানা পড়ে নিজের পুরো নামটা সই ক'রে দিলেন । ড্রয়ার থেকে অফিসেরই নামাঙ্কিত একখানা লেফাফা টেনে বের ক'রে তার মধ্যে ভরলেন চিঠিখানা । খামের ওপর একটু কি ইতস্তত করলেন, তারপর খামটা সরিয়ে রেখে নিচু হয়ে চুমুক দিলেন কাপে, পকেট থেকে সিগারেটকেসটা বের ক'রে দেশলাইয়ের কাঠি

জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর মৃদু একটু হেসে বললেন, "আপনার জন্য লিখতে লিখতে একটা গল্পের কথা মনে পড়ছিল।"

বললুম, "গল্প !"

অসিতবাবু বললেন, "হ্যাঁ, গল্প ছাড়া আর কি। সুপারিশ-চিঠি লিখে তো আপনাকে খুশী করতে পারিনি, ফাউ হিসাবে একটা গল্পের প্লট দিয়ে যদি পারি। শুনবেন ? সময় আছে হাতে ?"

বললুম, "নিশ্চয়ই, গল্প শুনবার মত সময়ের আমার কখনো অভাব হয় না।"

মনে মনে কিন্তু একটু বিস্মিতই হলাম। দেখতে অমন ছিপছিপে হলে কি হয়, অসিতবাবু ভারী রাশভারী মানুষ। বয়স বছর বত্রিশ-তেত্রিশ। মুখ দেখলে হঠাৎ আরো কম বলে মনে হয়। চেহারায় সৌন্দর্যের চেয়ে কমনীয়তা বেশি। কিন্তু আকৃতির সঙ্গে অসিতবাবুর প্রকৃতির যেন তেমন মিল নেই। এতদিন যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁকে গম্ভীর স্বল্পভাষী বলেই জেনেছি। এমন ভূমিকা ফেঁদে গল্পের প্লট শোনাবার আগ্রহ তিনি কোন দিনই প্রকাশ করেননি। তাই গল্পের চাইতে গল্পকার সম্বন্ধেই বেশি কৌতূহল বোধ ক'রে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে থাকলেও আমাকে যে দেখছিলেন না তা তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলুম। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট টেনে চললেন--তারপর হঠাৎ শুরু করলেন : "আজকের কথা নয়। আজ থেকে এগারো বছর আগেকার কথা। মফঃস্বল শহরের কলেজে একটি ছেলে তখন বি· এ· পড়ত। নাম ধরুন তার অরুণ। ছেলেটির বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। বাপ হলেন গাঁয়ের যজমানী ব্রাহ্মণ। চার পায়সা দু' আনা দক্ষিণা কুঁড়িয়ে আর গামছায় সিধে বেঁধে ঘরে ফিরতেন। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েতে ঘর যেমন পুরিপূর্ণ ছিল বলাবাহুল্য ভাঁড়ার তেমন ছিল না। প্রিন্সিপ্যাল ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে ধরাধরি ক'রে কলেজে হাফ-ফ্রীশিপ পেয়েছিল অরুণ। দু' জায়গায় দুটি ছেলে পড়িয়ে ব্যবস্থা করেছিল হোটেল-খরচের। কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই দুটি ট্যুইশানিই হাতছাড়া হয়ে গেল অরুণেব। দুটি ছাত্রের বাবাই ছিলেন সরকারী চাকুরে। একজন স্টেশনমাস্টার আর একজন পোস্টমাস্টার। ভাগ্যক্রমে দু' জনই গেলেন বদলী হয়ে। দুর্ভাবনায় অরুণের প্রায় মাথায় হাত ওঠবার জো হল। এই সময় তাকে বাঁচাল এসে সহপাঠী বিভাস। ছেলেটির সঙ্গে অরুণের সামান্যই পরিচয় ছিল। মেলামেশা প্রায়ই ছিলই না। কারণ বিভাসের যা খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল তা কলেজেব মাঠে, পাঠে নয়। আর অরুণ ছিল একটু পড়ুয়া ধরনের ছেলে। দু' জনেই দু'জনকেআড়চোখে দেখত, সামনাসামনি পড়লে বড় জোর একটু ঘাড় নাড়ত, আলাপটা তার বেশী আর এগুতো না।

কিন্তু বিভাস নিজেই যেচে এসে আলাপ করল অরুণের সঙ্গে। প্রায় বিনা ভূমিকায় বলল, 'শুনলাম, আপনার নাকি দুটো ট্যুইশানিই গেছে ?'

অরুণ একটু অবাক হল, একটু বা অপমানিত। তার ট্যুইশানি থাক আর যাক, এই আধাপরিচিত বিজাতীয়প্রায় ছেলেটি কেন সে সম্বন্ধে খোঁজ নিতে আসবে ?

অরুণ একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, আমার দুটো ট্যুইশানিই ছিল এ খবরও আপনি তা হলে শুনেছিলেন ?'

বিভাস হেসে বলল, 'তা শুনেছিলাম বই কি। প্রফেসারদের রাবিশ লেকচারগুলি ছাড়া আর সবই আমাদের কানে যায়। চোখ কান আপনাদের তুলনায় আমাদের অনেক বেশী খোলা। আপনারা আমাদের দেখতে না পারলে কি হয় আমবা সব দেখি, সব শুনি। বকাটে ছেলে বলে আপনারা আমাদের ঘৃণা করেন। অবশ্য ভাল ছেলে বলে আপনারাও যে আমাদের কাছে শ্রদ্ধা পান তা নয়, কিন্তু স্নেহ আমরা আপনাদের করি। শত হলেও আপনারা কলেজের গর্ব।'

তারপর সেই স্নেহের বাস্তব প্রমাণ দেবার জনাই যেন বিভাস হঠাৎ প্রস্তাবটা ক'রে বসল। 'একটা কাজ আছে আমার খোঁজে। করবেন ? হাজিরা অবশ্য দু' বেলাই দিতে হয়। তবে থাকতে হবে সব মিলে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক। মাইনে মাস অন্তে পঁচিশ টাকা।'

অরুণের কাছে পঁচিশ টাকা তখন ঐশ্বর্য। হোটেল-খরচ, হাত-খরচ, কলেজের মাইনে—পঁচিশ টাকায় সব হবে। আত্মমর্যাদায় বেশ একটু চিড় খেল অরুণের। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর এবং নিস্পৃহ

ভঙ্গিতে অরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ কোন্ ক্লাসের ক' জন ছেলেকে পড়াতে হবে ?' বিভাস হেসে বলল, 'ক' জন নয়, এক জনই। ছেলে অবশ্য প্রায় ডজন খানেক আছে ও বাড়িতে। কিন্তু ছেলে আপনাকে পড়াতে হবে না। কাজটা পড়ানো নয়, শোনানো। এখানকার ভবেশ চাটুয্যের নাম শুনেছেন ত ? তিনি আমার মেসোমশাই, তাঁকে সকালে বিকালে খানিকক্ষণ ক'রে বই আর খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হবে। বছর পাঁচ ছয় হল মেসোমশাই অন্ধ হয়ে গেছেন। রাজী থাকেন ত বলুন।'

অরুণ একটু ইতস্তত করতে লাগল। সে যখন স্কুলে পড়ে তখন থেকেই ছেলে পড়াতে শুরু করেছে। যে সব বাড়িতে রেসিডেনসিয়াল ট্যুইশানি করেছে কেবল ছেলে পড়িয়ে কর্তব্য শেষ হয়নি, গৃহস্থের হাটবাজার করতে হয়েছে, ছাত্রের ছোট ছোট ভাই বোনকে রাখতে হয়েছে কখনো কখনো। নইলে স্কুল কলেজের ভাত নামেনি। তবু শত হলেও সে সব ছিল ট্যুইশানি। কাজটা শিক্ষাদানের, পদটা গুরুর। কিন্তু অন্ধ মনিবকে বই পড়ে শোনানোটা একটু যেন বেশী রকম চাকরিগন্ধী বলে মনে হল অরুণের কাছে! ট্যুইশানি ক'রে পড়াটা বেওয়াজ আছে ছাত্রমহলে, কিন্তু চাকরি ক'রে পড়ার মধ্যে কেমন যেন একটু মর্যাদা হারাবার ভয় আছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে চট ক'রে বলা যায় না।

বিভাস বলল, 'দেখুন ভেবে। যদি রাজী থাকেন কালই কিন্তু বলবেন আমাকে। হ্যাঁ, আর একটা কথা আছে, আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখা দরকার। কেবল বিষয়-সম্পত্তি, যশ-প্রতিপত্তির দিক থেকেই নয়, মুখে আর মেজাজেও আমার মেসোমশাই খুব নামকরা লোক। কেউ ওঁর কাছে খুব বেশীদিন টিঁকে থাকতে পারেননি। এখন আপনার কপাল আর আমার হাতযশ।'

এত সব শুনেও পরদিন অরুণ সেই পাঠকগিরি গ্রহণ করতে সম্মত হল, কাজটা একটু চাকরিগন্ধী বটে কিন্তু খানিকটা নতুন ধরনেরও। ছাত্রকে পড়া বোঝাবার দায়িত্ব নেই, পাস করাবার দায়িত্ব নেই, কেবল মনিবের সামনে বসে গড়গড় ক'রে ছাপার অক্ষরগুলি পড়ে যেতে হবে। সময় আর সামর্থ্য বাঁচিয়ে নিজের পড়াশুনোর কাজে তা লাগাতে পারবে অরুণ। বদমেজাজ বলে ভয় কি। কর্তব্যে যদি কোন ত্রুটি না হয় মেজাজ দেখাবার সুযোগই পাবেন না। সব চেয়ে যা বড় কথা মাস অন্তে পঁচিশটি টাকা এখন আর কে তাকে দিচ্ছে। মুখ আর মেজাজ মনিবের যেমনই হোক, টাকার ওপর ত আর সে মুখ মুদ্রিত থাকবে না। টাকায় ত রাজার মুখই থাকবে।

কিন্তু কাজটা যত সহজ ভেবেছিল অরুণ শুরু ক'রে দেখল তত সহজ নয়। প্রথম দিন কয়েক ভালই কাটল, তারপর বড়ই বাড়াবাড়ি শুরু করলেন ভবেশবাবু। ষাটের কাছাকাছি হবে বয়স, কিন্তু চিত্ত পাঁচ ছয় বছরের ছেলের মত চঞ্চল। খেয়ালের অন্ত নেই। এই পড়তে বলেন 'মহাভারতের শান্তিপর্ব', তার দশ মিনিট বাদে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', আর তার ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে 'প্রজাস্বত্ব আইন।' কোনদিন ধমকে ওঠেন, 'জ্বর হয়েছে নাকি তোমার মাস্টার ? সাগু খাচ্ছ নাকি যে চিঁ চিঁ করছ অমন ক'রে ? জোবে জোরে গলা ছেড়ে পড়। বই পড়তেই তোমাকে রেখেছি। ভূতের মন্তর পড়বার জন্য ত তোমাকে ডাকিনি।'

পরদিন যদি স্বরগ্রাম একটু চড়িয়ে দেয় অরুণ, ভবেশবাবু অমনি কানে আঙ্গুল দেন, 'আস্তে হে ছোকরা আস্তে। চোখে দেখতে পাই নে বলে কি আমাকে কালাও ঠাওরালে নাকি তুমি ? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কানের পর্দা ফুটো ক'রে ফেলবার মতলব বুঝি ? চোখ দুটো ত গেছেই, এবার কান দুটোও যাক! তা হলেই আমার ছেলে-ভাইপোরা বগল বাজিয়ে নাচতে পারবে।'

কোনদিন বা উচ্চারণতত্ত্ব বোঝান তিনি অরুণকে, 'দেখ মাস্টার কথায় বলে শব্দব্রহ্ম নাদব্রহ্ম। আর সেই শব্দের প্রাণ উচ্চারণের মধ্যে। বামুনের ছেলে কিন্তু জিভটি করেছ একেবারে শূদ্রের মত। উচ্চারণেই যদি কিছু বোঝা না গেল, তাতেই যদি ভুল রইল, তোমার মুখ থেকে শাস্ত্র শুনে আমার কোন্ অক্ষয় স্বর্গবাস হবে শুনি। কি একখানা জিভই করেছ। বিশুদ্ধভাবে না বলতে পারো দেবভাষা, না রাজভাষা। একেবারে চাষাড়ে জিভ। যা বলছি শোন। একটা জিভছোলা কিনে নাও। তারপর রোজ দু' বেলা সকালে বিকালে চেঁছে চেঁছে পরিষ্কার করো জিভ। দেখবে স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে, উচ্চারণও আটকাবে না। বুঝেছ ?'

বুঝতে অরুণের বাকি ছিল না। দেবভাষাই হোক আর রাষ্ট্রভাষাই হোক কোন বইয়েব ভাষার সঙ্গে ভবেশবাবুর মনের ভাষার মিল ছিল না। ছাপার অক্ষর কোন দিনই তাঁর কাছে বসক্ষরা বলে মনে হয়নি। তাঁর চিত্ত-বিনোদনের জন্যে ছেলেরা নানা রকম ব্যবস্থাই করেছিল। কীর্তন ভজন শোনাবার জন্য সুকণ্ঠ গায়ক ছিল এক জন, কলকাতা থেকে নতুন নতুন রেকর্ড কিনে পাঠাতেন এক ভাইপো, বেড়াবার জন্য ঘোড়ার গাড়ি বাঁধা ছিল একখানা, সকালে বিকালে তাঁর খেয়াল অনুযায়ী হাত ধরে বাগানে কি পুকুরের ধারে কিংবা চাঁদমারীব মাঠে বেড়িয়ে আনবার জন্য ছিল আলাদা লোক। কিন্তু কিছুতেই চিত্তে শান্তি পাননি ভবেশবাবু। শেষে এক অধ্যাপক বন্ধু বুঝি পবামর্শ দিয়েছিলেন বই শুনবার। জিনিসটা তাঁর কাছে নতুন বলে কিছুদিন মন্দ লাগেনি। কিন্তু দিন কয়েক পরে ফের একঘেয়ে লাগতে লাগল। পাঠে কিছুতেই রস পেলেন না। ঘনঘন পাঠক বদলি হতে লাগল, কিন্তু এ পদটা একেবারে তুলে দিলেন না। সংসারের আপনজন ত নিতান্ত দায়ে না পড়লে তাঁর বড় একটা খোঁজ খবর নেয় না। মাইনে করা যত হরেক রকমের লোককে নিজের সেবায় নিয়োগ ক'রে রাখা যায়, ততই ভাল। এমনি ক'রে যতটুকু গুরুত্ব আর মর্যাদা বাড়ানো যায় মন্দ কি। সব রকমেই ত তিনি বঞ্চিত হয়ে আছেন, ভোগসুখ ত সব উঠে গেছে সংসাব থেকে। খসুক কিছু গাঁটের কড়ি ছেলে-ভাইপোদের।

অভিযোগের অন্ত নেই ভবেশবাবুর। কেবল চোখই ত তাঁর যায়নি, চোখের সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে। ছেলেদের পিতৃভক্তি নেই, স্ত্রীর নেই পতিপ্রেম, পুত্রবধূরা যার যার ঘব সংসার ছেলেপুলে নিয়ে ব্যস্ত, সবাই এড়িয়ে চলছে ভবেশবাবুকে—সবাই হেনস্থা করছে। অথচ এত সব বিষয়সম্পত্তি, জোতজমি, ক্ষেত, খামার, জলা, শহরের উপান্তে এত বড় দোতলা পাকা বাড়ি, আম কাঁটাল সুপারি নারকেলের বাগান সব প্রায় ভবেশবাবুর নিজের হাতে করা। নিজের বুদ্ধিবলে আব বাহুবলে। অথচ সে সব কথা পরিবারের আর কারও মনে নেই। বেঁচে থাকতেই তিনি বাদ পড়ে গেছেন সংসার থেকে। দূরে বাড়ির এক কোণে তাঁকে সরিয়ে রেখেছে সবাই।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। ছেলেরা, ভাইপোরা, বউরা, নাতি-নাতনীরা কেউ বড় একটা তাঁর কাছে ঘেঁষে না। সবাই ভয় ক'রে তাঁর গালাগাল-বকাবকিকে। তারা কাছে এলে তারাও সুস্থ থাকতে পারে না, ভবেশবাবুর নিজেরও অসুস্থতা বাড়ে।

সমস্ত পরিবারটির মধ্যে কেবল একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। ভবেশবাবুর ছোট মেয়ে। বছর ষোল সতের হবে বয়স। কিন্তু প্রভাবে প্রতিপত্তিতে বাড়ির সবাইকে সে ছাড়িয়ে গেছে। অন্ধবদ্‌মেজাজী ক্রোধান্ধ বাপকে সে-ই কেবল আয়ত্তে আনতে পারে। বকতে, গালাগাল দিতে মেয়েকেও কসুর করেন না ভবেশবাবু। তবু মেয়ে ছাড়া দু' দণ্ড তাঁব চলে না। ভবেশবাবু কখন খাবেন, কখন ঘুমোবেন, কখন বেড়াবেন, কখন কি বই শুনবেন, কোন্ রেকর্ড শুনবেন, সব মেয়েটির নখদর্পণে। তার অনুমোদন ছাড়া কিছুই হবার জো নেই, মেয়েটি—"

অসিতবাবুকে বাধা দিয়ে বললুম, "যতদূর মনে হচ্ছে এই অসীম প্রভাবতী প্রভাবশালিনী মেয়েটিই আপনার নায়িকা। কিন্তু কেবল কি গুণ বর্ণনা করলেই একটি মেয়েকে ফুটিয়ে তোলা যায় মশাই ? তার চেহারা কেমন ছিল বলুন, রূপের বর্ণনা দিন।"

অসিতবাবু বললেন, "রূপ ? ক্ষমা করুন মশাই, আমি মোটেই রূপদক্ষ নই। গল্প উপন্যাসের নায়িকার রূপের মত এক কথায় অবর্ণনীয় বলেই না হয় ধরে নিন।"

বললুম, "আচ্ছা, রূপের কথা না হয় গেল। নাম ? নাম একটা রাখবেন ত ?"

অসিতবাবু একটু হাসলেন, "কেন, অনামিকা বাখলে চলবে না ?"

বললুম, "তাও চলে। তবে ডাকবার সময় ছোট ক'রে অনু বলেই না হয় ডাকবেন সংক্ষেপে।"

এবার তারিফের ভঙ্গিতে অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তারপর বললেন, "না অনু নয়। অত মৃদু মিহি নামে চলবে না। ভবেশবাবুর মেয়ের নাম জয়ন্তী। কেবল গুণ নয়, দোষও জয়ন্তীর কম ছিল না। ওই বয়সে অমন অহঙ্কারী, দেমাকী, রাশভারী মেয়ে অরুণ আর কোনদিন দেখেনি।

সে দেমাক যে জয়ন্তী মুখ ফুটে প্রকাশ করত তা নয়। তার চালচলনে ভাবে-ভঙ্গিতে সে দেমাক

আপনিই ফুটে বেরুত। বাপের জন্য নিজের হাতে চা জলখাবার তৈরি ক'রে নিয়ে আসত জয়ন্তী, কাঁচের আলমারী খুলে বের করত নানা ধরনের বই, ইংরেজী বাংলা তিন চারখানা খবরের কাগজ এনে অরুণের টেবিলে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে যেত। প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে অরুণের সঙ্গে কথা বলবার তার কোন দরকারই হয়নি। কিন্তু তার নিঃশব্দ যাতায়াতে এই কথাটি যেন মুখর হয়ে উঠত যে, সে মনিবের মেয়ে আর অরুণ তাদের পঁচিশ টাকার মাইনের চাকুরে। মাঝে মাঝে বাপের পাশে বসে বসে জয়ন্তী পড়া শুনত অরুণের। ক্লাসের টীচার যেন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে তার পাঠের যতি-বিরতির ভুল ধরবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে, জয়ন্তীর ভঙ্গিটা প্রায় সেই রকমই দেখতে হত। জয়ন্তীর অবজ্ঞার জবাবটা অরুণও ঔদাসীন্যের ভাষায় দিত। কোন কৌতূহল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ পেত না অরুণের চোখে। সে চোখ ঢাকা থাকত বইয়ের পাতায়। সে আর তার শ্রোতা ছাড়া যে তৃতীয় কারও অস্তিত্ব আছে ঘরে সে সম্বন্ধে তার চেতনা মোটেই ধরা পড়ত না।

শহরের খবরের কাগজ যায় বিকালের গাড়িতে। সন্ধ্যাবেলায় শোনাতে হয় সংবাদপত্র। খান দুই কাগজ আগাগোড়া পড়ে শুনিয়ে অরুণ উঠতে যাচ্ছে হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলের উপর মাইকেলের গ্রন্থাবলী। একটু অবাক হল অরুণ। কেন না কাব্যপাঠের প্রোগ্রাম এখন নয়। হয়ত ভুলেই কেউ নামিয়ে রেখেছে বইখানা মনে ক'রে অরুণ বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, জয়ন্তী ভবেশবাবুকে ডেকে বলল, 'বাবা, তুমি সেদিন মেঘনাদবধ শুনতে চেয়েছিলে না ? শোন না একটু।'

ভবেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখন মেঘনাদবধ ?'

জয়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, দয়ালদাস তো ছুটি নিয়ে গেছে বিয়ে করতে। সে তো ক'দিন আর আসতে পারবে না। এসময়টায় বই-টই শুনলে পারো খানিকক্ষণ।'

দয়ালদাসের নাম অরুণ এর আগেও শুনেছে। কীর্তন ভজন শোনায় সে ভবেশবাবুকে। ভবেশবাবু বললেন, 'কথাটা মন্দ বলিসনি। পড় মাস্টার, মেঘনাদবধখানাই পড়। গোড়া থেকেই শুরু করো না—সম্মুখে সমরে পড়ি বীরবাহু চূড়ামণি। এম· ই· স্কুলের ফিফ্‌থ ক্লাশে খানিকটা পাঠ্য ছিল আমাদের। বেড়ে লিখেছে।'

অরুণ একটু ইতস্তত ক'রে গম্ভীর মুখে ফের গিয়ে বসল চেয়ারে। তারপর পড়তে শুরু করল মেঘনাদবধ। কণ্ঠে অসন্তুষ্টি আর বিরক্তির সুর চাপা রইল না। একটু বাদেই ঢুলতে শুরু করলেন ভবেশবাবু। আর সেই ফাঁকে অরুণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। জয়ন্তী একবার তাকাল অরুণের দিকে, তারপর ভবেশবাবুকে ডেকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'কেমন লাগছে বাবা ? আরো একটু শুনবে ?'

ভবেশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, থামলে কেন মাস্টার পড় পড়। বেশ লিখেছে ইটালী আবিসিনিয়ার কথাটা। মুসোলিনীই বুঝি জিতে চলেছে ?'

অরুণ অদ্ভুত একটু হেসে বইখানা বন্ধ ক'রে বলল, 'আমি এবার যাই চাটুয্যেমশাই আপনি বরং ঘুমোন।'

জয়ন্তী বলল, 'বাবা, সর্গটা উনি শেষ না করেই যেতে চাইছেন।'

কৌচে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন ভবেশবাবু, এবার তড়াক ক'রে উঠে বসলেন, 'যেতে চাইছেন ? উঁহু, উঁহু, সর্গ শেষ করো মাস্টার, সর্গ শেষ করো। ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেছ কি ধরা পড়েছ আর চাকরি গেছে। নাঃ, কাউকে আর বিশ্বাস করবার জো নেই সংসারে। লঙ্কায় যে আসে সে-ই রাবণ। ভবেশ চাটুয্যের কাছে যে আসে সেই জোচ্চর ফাঁকিবাজ। বিভাসের কাছে শুনলুম ছেলেটি গরীব, ছেলেটি ভাল। তোরাও তো সবাই গোড়ায় তাই বলেছিলি। অথচ দেখ দিখি কাণ্ড। সর্গটা শেষ না করেই উঠে পালাতে যাচ্ছিল। আচ্ছা জয়ন্তী, যত পাঠক আসবে আমার কাছে সবাই ঠগ্ হবে ? সংসারে কারো ওপর একটু নির্ভর করা যাবে না ? না ছেলেদের ওপর না ভাইপোদের ওপর—'

জয়ন্তী বলল, 'তুমি ভেব না বাবা। আমি যতক্ষণ আছি কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

অরুণ বলল, 'ফাঁকি আপনাকে কেউ দিচ্ছে না চাটুয্যেমশাই। সন্ধ্যায় কেবল আপনি খবরের কাগজ শুনতেন, তাই শুনিয়েই চলে যাচ্ছিলুম। মেঘনাদবধ কি আরো খানিকক্ষণ আপনি শুনতে

চান ?'

ভবেশবাবু রূঢ় স্বরে বললেন, 'শুনতে চাই বা না চাই। সর্গটা তুমি আগে শেষ করো তারপর যাও! কাজ কেউ অর্ধেক ক'রে ফেলে রাখবে তা আমি কোনদিন সহ্য করতে পারি নে।'

মেঘনাদবধ আরো খানিকক্ষণ এগুতে না এগুতে ভবেশবাবু ফের ঢুলতে শুরু করলেন। অরুণ কোনরকমে সর্গটা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কারো অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করল না।

ফিরে এসে হোটেলের খাওয়া সেরে অনেক রাত পর্যন্ত নিজের পড়াশুনো করল অরুণ। তারপর দীপ নিবিয়ে শুয়ে পড়ে মনে মনে সংকল্প করল এই পাঠকগিরি আর নয়। মাসখানেক না হয় ধার কর্জ করে চালাবে বন্ধুদের কাছ থেকে। তারপর একটা না একটা ট্যুইশান কোথাও জুটে যাবেই। কিন্তু এই খেয়ালী বড়লোক আর তাঁর খেয়ালী দেমাকী মেয়ের খোশ-খেয়াল সহ্য করবার আর কোন মানে হয় না। এ পর্যন্ত কেউ জোচ্চোর ফাঁকিবাজ বলেনি অরুণকে। কর্তব্যে কোনদিন কেউ তার ত্রুটি ধরতে পারেনি। বিনা কারণে ধরেছেন কেবল ভবেশবাবু আর তাঁর মেয়ে। তাঁদের কথার একমাত্র জবাব কাজ ছেড়ে দেওয়া। তাই দেবে অরুণ। কাল গিয়ে সকালের পাঠটুকু শেষ করে জানিয়ে আসবে পদত্যাগের কথা।

সকাল বেলা পাঠ শুরু হয় মোহমুদ্গরে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে আলবোলা টানতে টানতে রোজ ভোরে জীবনের অনিত্যতার কথা শুনতে থাকেন ভবেশবাবু। অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন আরো নিস্পৃহ আর গম্ভীর মুখে অরুণ এসে বসল ভবেশবাবুর সামনের চেয়ারে। জয়ন্তী এসে ঘরে ঢুকল। মুখে কঠিন গাম্ভীর্য, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে জয়ন্তী খুলে ফেলল কাঁচের আলমারী। বের করল প্রাতঃপাঠ্য মোহমুদ্গর, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা, পকেট-সংস্করণের শ্রীশ্রীচণ্ডী।

গম্ভীরভাবে মোহমুদ্গরখানা টেনে নিল অরুণ। সে আজ তৈরি হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক। তারপরেই এঁদের মোহ ভাঙবে। স্পষ্টভাষায় মুখের ওপর কাজ ছাড়বার কথা বলে দেবে ভবেশবাবুকে। কালক্ষেপ না করে পড়া শুরু করল অরুণ।

'নলিনীদলগত জলমতিতরলম্—'

কিন্তু হঠাৎ সেই মোহমুদ্গরের পাতায় ভাঁজকরা এক টুকরো নীলাভ কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল অরুণের! সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে তার নিজের নামটুকু লেখা আছে তাতে। কৌতূহল সংবরণ করা সম্ভব হল না। চিঠিটুকু হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে ফেলল অরুণ।

'কেমন, দেখলেন তো মজা? আর দেবেন ফাঁকি? এসেই অমন আর পালাই পালাই করবেন? আহাহা, কি পড়াটাই না পড়লেন কাল। বাবার দোষ নেই, আপনার কাব্যপাঠ শুনলে যে কোন লোকের খবরের কাগজ পাঠ বলেই মনে হত। তবু আপনি বলতে চান যে ফাঁকিবাজ নন?

চিঠিতে সম্বোধনও ছিল না, স্বাক্ষরও ছিল না। কিন্তু লেখাটুকু কার বুঝতে বাকি রইল না অরুণের।

ধমক দিয়ে উঠলেন ভবেশবাবু, 'বলি ও ছোকরা, হল কি তোমার, দু' ছত্র পড়তে না পড়তেই বাকরোধ হয়ে গেল নাকি? না! তোমাকে দিয়ে আর কাজ চলল না আমার।'

থতমত খেয়ে অরুণ চিঠিটুকু পকেটে পুরে ফিরে পড়তে শুরু করল, 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং—'

কিন্তু এ মুদ্গরে, এ ধর্মবাণীতে কি কোন একুশ বছরের যুবকের মোহ ভাঙে, না কোনদিন ভেঙেছে?

'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং—'

নিষ্প্রাণ সুরে আবৃত্তি ক'রে চলল অরুণ, কিন্তু সতৃষ্ণ অপলক দুটি চোখে তাকিয়ে রইল এক সপ্তদশী তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠীর দিকে।

ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে একটু আগে ঘরে ঢুকেছে জয়ন্তী। ভোরেই স্নান সেরে নিয়েছে। ভিজে ঘন কালো চুলের রাশ পড়েছে কটি ছাড়িয়ে। খয়েরী রঙের শাড়িটি বেশ মানিয়েছে সুঠাম

তনু দেহের গৌরবর্ণের সঙ্গে।

ভবেশবাবুকে চা পরিবেশন ক'রে আর একটি কাপ অরুণের ছোট টেবিলটুকুর উপর রেখে দিল জয়ন্তী। প্রথম দিনই অরুণ জানিয়ে দিয়েছিল সে চা খায় না। তারপর থেকে কেউ আর তাকে চা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু আজ যখন শুভ্র সুন্দর ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের মত একটি চায়ের কাপ এসে পৌঁছল মোহমুদ্গরের পাশে, এসে পৌঁছল 'চা চাইনে,' তার সমস্ত অস্তিত্ব মুখর হয়ে উঠল, 'চাই চাই চাই।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অন্ধ ভবেশবাবু বললেন, 'কই মাস্টার, হল কি তোমার ?'

নিজের হাতের চায়ের কাপটি তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে অরুণ সঙ্গে সঙ্গে তোতাপাখীর মত বলে উঠল, 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং...'

জয়ন্তীর গম্ভীর সুডৌল মুখখানি হাসির আভায় চিক্‌চিক্ করে উঠল। আভাস দেখা গেল ছোট ছোট সাদা মুক্তার মত বিন্যস্ত-করা কটি দাঁতের। তারপর কি একটি কাজের ছলে সেখান থেকে সরে গেল জয়ন্তী।

অরুণের পদত্যাগ করা আর হল না।

তারপর কখনো মোহমুদ্গরের পাতার ফাঁকে, কখনো শ্রীমদ্‌ভাগবতে, কখনো হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে টুকরো কাগজগুলির আদানপ্রদান চলতে লাগল। দিনের পর দিন ভাষা বদলালো, ভঙ্গি বদলালো, স্বাক্ষর সম্বোধন শুরু হয়ে অদল-বদল হল তাদেরও। জয়ন্তী কি অরুণের শান্ত গম্ভীর মুখ দেখে বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো ছিল না। কিন্তু কলমের মুখ তাদের ক্রমেই খুলে যাচ্ছিল।

কথাবার্তাও শুরু হয়েছিল অরুণের আর জয়ন্তীর। সব কথাই অবশ্য ভবেশবাবুর সম্বন্ধে। তাঁর সেবা পরিচর্যা, রুচি অরুচির কথা। কখনো বা আলোচনা হত পঠিত বইয়ের কখনো বা সংবাদপত্রীয় রাজনীতির। তবু সেইসব অবান্তর কথার মধ্যে গূঢ়ার্থ চলত। যদিও ভবেশবাবুর ঘরের আলমারীর বই আর কেউ ছোঁয় না, যদিও আলমারীর চাবি জয়ন্তীর আঁচলেই বাঁধা থাকে, তবু সাবধানের মার নেই, শাস্ত্রে আছে 'শতং বদ মা লিখ।' কিন্তু না লিখে কি পারা যায়। না লিখলে মনে হয় অর্ধেক হল আর বাকি রয়ে গেল অর্ধেক। Writing makes a man perfect—এ প্রবচনের সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, writing makes love complete.

শঙ্কিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তারা তাকাত ভবেশবাবুর দিকে। তাঁর চোখের অনড় মণি দুটির কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু মেজাজের পরিবর্তন যেন তাঁর শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেবা-শুশ্রূষায় উৎসাহ আর মনোযোগ যেন আরো বেড়ে গেছে জয়ন্তীর। ভারি স্নিগ্ধ মধুর শোনাচ্ছে অরুণের কণ্ঠ। ঘড়ির কাঁটা দেখে তোতাপাখীর মত সে কেবল বই আর খবরের কাগজ ক'খানা পড়ে দিয়েই উঠে যায় না, পড়া শেষ হয়ে গেলেও বসে বসে গল্প করে ভবেশবাবুর সঙ্গে। তাঁর অন্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় পৃথিবীকে। নবীন লেখকদের ফাঁকে ফাকে নবীনতর লেখকদের কাব্য উপন্যাস পড়ে শোনায়, পড়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। চন্দ্রসূর্যের আশেপাশের গ্রহনক্ষত্রের খোঁজ খবর দেয়। জয়ন্তী বই তোলে বই নামায়, অন্ধ বাপের পরিচর্যা করে। চা, জল খাবার এনে দেয় ভবেশবাবু আর অরুণের জন্য। আনে মুখশুদ্ধি, চা ধরলেও অরুণ তখনও পান সিগারেট ধরেনি। হাত পেতে নেয় একটি লবঙ্গ কি একটু হরীতকীর টুকরো। নিতান্ত সাত্ত্বিক, বিশুদ্ধ বস্তু। জয়ন্তী আলগোছে যেন ওপর থেকে ছুঁড়ে দিতে চায়, কিন্তু কি করে যে আঙুলগুলি আপনিই নেমে আসে, ছোঁয়া লেগে যায় অরুণের হাতের তালুর সঙ্গে তা কেউ বুঝে উঠতে পারে না। জয়ন্তী আরক্ত হয়ে ওঠে, রোমাঞ্চিত হয় অরুণ।

কিন্তু বাড়িতে তো কেবল অন্ধ ভবেশবাবুই ছিলেন না, তাঁর চক্ষুষ্মান পুত্র-কলত্রও ছিলেন, ছিলেন পুত্রবধূ, ভাইঝি ভাগ্নীর দল। এতগুলি চোখকে ফাঁকি দিতে পারা কি সহজ! অরুণ আর জয়ন্তী অবশ্য খুব চেষ্টা করত গম্ভীর হয়ে থাকতে, তৃতীয় কারো উপস্থিতিতে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্যের অভিনয় করতে, কিন্তু দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু' জনের চোখে যে আনন্দের আলো জ্বলে উঠত তাতে তাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা গোপন থাকত না। সব কিছুই সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেত। অরুণ আর জয়ন্তীর অলক্ষ্যে বাড়ির অন্যান্য পরিজনের পাহারা আরও সতর্ক হয়ে উঠল, দৃষ্টি

হল অনুসন্ধিৎসু। তারপর একদিন জয়ন্তীর বড় বউদি বারান্দার অন্ধকারে তাদের একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেললেন। দেখে ফেললেন অরুণের হাতের মধ্যে ধরা জয়ন্তীর হাত। জয়ন্তী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল। অরুণ দু'পা এগুতে যাচ্ছিল, বড় বউদি বললেন, 'দাঁড়ান! আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

একটু বাদেই এলেন জয়ন্তীর মা। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন অরুণের দিকে, বললেন, 'দাঁড়াও।'

অরুণের পাশ দিয়ে তিনি ঢুকলেন গিয়ে স্বামীর ঘরে। অরুণ তাঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। জয়ন্তীর মা অরুণকে শোনাতেই চাইছিলেন।

জয়ন্তীর মা স্বামীকে বললেন, 'ওর অনেক ভাগ্য বড় খোকা মেজো খোকা আজ বাড়ি নেই। তা হলে হাড় আর মাস তারা আলাদা ক'রে ফেলত। কিন্তু কেলেঙ্কারি আর বাড়িয়ে কাজ নেই, লোকে হাসবে। শুধু ডেকে বলে দাও কাল থেকে ওকে আর আসতে হবে না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'কার কথা বলছ?'

জয়ন্তীর মা সখেদে বললেন, 'কার কথা বলছি! হায় আমার কপাল, এমনি যদি না হবে চোখ দুটো যাবে কেন তোমার! অরুণ। তোমার ওই পাঠক ছোকরা।'

ভবেশবাবু বললেন, 'কেন, আগেকার বুড়ো পাঠকগুলির চাইতে ও তো ভালই কাজ করছে। কাজে মোটেই ফাঁকি দেয় না, উচ্চারণও বেশ শুধরেছে। আর আমার পাঠক তাড়াবার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কিসের? তা ছাড়া এ ঘরে তুমি এলেই বা কেন? ঠাকুর চাকর, নাতিনাতনীর রাজ্যে তো তুমি বেশ রাজরানী হয়ে আছ। অরুণ না এলে চলবে কি ক'রে? আমাকে বইপত্র কে পড়ে শোনাবে, তুমি?'

জয়ন্তীর মা বললেন, 'কেন, তোমার গুণের মেয়েই রয়েছে। আজ দু' তিন বছর ধরে বলছি বিয়ে দাও, বিয়ে দাও, এবার হল তো?'

ভবেশবাবু বললেন, 'কি হল?'

জয়ন্তীর মা আবার বললেন, 'হবে আমার কপাল!' তারপর ফিসফিস করে স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললেন। দু' তিন মিনিট নিঃশব্দে কাটল। অরুণ ভাবল এবার ভবেশবাবু চিৎকার করে উঠবেন, এবার বজ্রগর্জনে ডাক পড়বে তার।

কিন্তু ভবেশবাবুকে মৃদুকণ্ঠে বলতে শোনা গেল, 'অরুণরা পদবীতে কী?'

ভবেশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'চক্রবর্তী। কেন, তা দিয়ে তোমার কি হবে?'

ভবেশবাবু বললেন, 'না, অমনিই জানতে চাইছিলাম। বাড়ির অবস্থা কি রকম?'

ভবেশবাবুর স্ত্রী রুক্ষস্বরে বললেন, 'শুনছি ত যজমানী করে বাপ। দিন আনে দিন খায়। আর ছেলের এখানে পাঁচ দুয়ারে ভিক্ষা করে পড়ার খরচ চলে। কেন তা দিয়ে কি হবে তোমার?'

ভবেশবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না, এমনিই জানতে চাইছিলাম।'

জানাজানি খুব বেশী হতে দিলেন না জয়ন্তীর মা কি তাঁর বড় খোকা, মেজো খোকারা। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল। মহকুমা শহরে ওকালতি করে ছেলে। সদ্য পাস ক'রে এসে বসলেও ইতিমধ্যেই নাকি নাম তার বেশ ছড়াতে শুরু করেছে। বংশ মুখোপাধ্যায়। বাপ মা ভাই বোন সব আছে। পাকা বাড়ি আর পর্যাপ্ত ভূসম্পত্তি আছে গাঁয়ে। রূপে, গুণে, স্বাস্থ্যে স্বভাবে এমন ছেলে কদাচিৎ মেলে। পণ যৌতুকের দাবী অবশ্য কিছু বেশী।

জয়ন্তীর মা বললেন, 'তা' হোক। তবু এ-সম্বন্ধ হাতছাড়া করব না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। সব চেয়ে কাছাকাছি যে দিন আছে পাঁজিতে পাত্রপক্ষকে বলে সেই দিনই ঠিক করে ফেল। টাকা তোমাদের হাতে না থাকে গায়ে গয়না তো আমার আছে।'

জয়ন্তীর বিয়ের দিন দুই পরে একখানা খামের চিঠি হাতে এল অরুণের। গোপন হাত-চিঠি নয়, বইয়ের পাতার আড়ালে ছোট্ট ছোট্ট টুকরো নয়, প্রকাশ্যে ডাকের চিঠি। কলেজের ঠিকানায় পিয়ন এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। ক্লাস শেষ হলে কলেজ কম্পাউন্ড পেরিয়ে পুকুরের ধারে নির্জন ঝাউ গাছটার তলায় এসে লেফাফার মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলে ধরল অরুণ। অত্যন্ত পরিচিত হস্তাক্ষর। স্বাক্ষর সম্বোধন এ চিঠিতেও কিছু নেই। কিন্তু প্রতিটি অক্ষর জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছে।

'ভেবেছিলুম শত হলেও তুমি পুরুষ। তুমি কিছুতেই চুপ করে থাকবে না, তুমি কিছুতেই মুখ বুজে সইবে না। তুমি দাঁড়াবে বুক ফুলিয়ে—সমস্ত শাসন ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা গঞ্জনার সামনে তুমি দাঁড়াবে মুখোমুখি। আমি যে চোখ বুজে ছিলুম, আমি যে মুখ বুজে ছিলুম সে কি কেবল ভয়ে? সে কি কেবল লজ্জায়? তা নয়, নিশ্চিন্তেও। ভেবেছিলুম তুমিই তো আছ, তুমি থাকতে আমার ভাবনা কি। কিন্তু দেখলুম যা ভেবেছিলুম সব ভুল। ভালই হয়েছে সে ভুল এত অল্পেই ধরা পড়ল, এত অল্পেই চুরমার হল ভেঙে।'

হঠাৎ পিছনে থেকে কে এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল চিঠিখানা। চমকে উঠে মুখ ফিরাল অরুণ। দেখল বিভাস মুখ মুচকে হাসছে। কিছু কিছু বিভাস আগেই জানত। কেন না ইতিমধ্যে অরুণের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এবার সব কিছুই জানল। তারপর ধিক্কার দিয়ে বলল, 'সত্যিই তুমি কাপুরুষের অধম। পুরুষের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে! পরম অপদার্থ।'

অরুণ পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। কোন জবাব দিল না। বিভাসের কথারও নয়, জয়ন্তীর চিঠিরওনয়। জবাব দেওয়ার কিই বা ছিল। দিন কয়েক আগে লোক মারফৎ খবর দিয়ে গোটা চার পাঁচ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তার বাবা। ছোট ভাই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, তার ওষুধের দামটা বাকি পড়েছে ডাক্তারখানায়। অরুণ যে এক বড়লোকের বাড়ি কাজ পেয়েছে আর তাদের সুনজরে পড়েছে এ খবর তিনি আগে পেয়েছিলেন।

মাস কয়েক বাদে ফল বেরুল পরীক্ষার। দেখা গেল, পুরুষের নাম ডোবালেও মফঃস্বলের সেই অখ্যাত কলেজটির নাম অরুণ গেজেটের মাথার দিকে তুলে ধরতে পেরেছে। প্রথম হয়েছে দর্শনে। এমন ভাল রেজাল্ট সে কলেজের ইতিহাসে নাকি আর দেখা যায়নি। অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে বিভাসও এসে কাঁধ চাপড়ে দিল অরুণের, বলল, 'না হে, সেদিনের সেই কথাটা একটু এ্যামেন্ড করে নিচ্ছি অরুণ। হৃদয় ভাঙলেও যার কলম ভাঙে না, কাপুরুষ হলেও ছেলে হিসাবে তাকে ভাল না বলে জো নেই।'

কিন্তু এ সান্ত্বনায় কি বুক ভরে? এই ভালত্ব দিয়ে কি ভুলিয়ে রাখা যায় মন!

গেজেটের মাথার দিকে নিজের নাম ছাপা হলেই কি জীবনের সব ক্ষোভ সব দুঃখ সব লজ্জা চাপা পড়ে যায়?

কলকাতায় এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল অরুণ। আস্তানা নিল উত্তর কলকাতার একটি জনবহুল সস্তা মেসে। ফের বসল বই পত্র নিয়ে, কিন্তু বইতে কিছুতেই মন বসতে চাইল না। বিরাট শহর, বিচিত্র লোকজন, বিচিত্রতর সহপাঠী সহাধ্যায়িনীরা, কিন্তু কোন কিছুই আকর্ষণ করতে পারল না অরুণকে, সব ছাড়িয়ে তার মন কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল মফঃস্বল শহরের একখানি দক্ষিণ-খোলা ঘরে যেখানে রোজ সকাল সন্ধ্যায় দেখা হত একটি স্মিতমুখী অপরূপদর্শনার সঙ্গে।

বিভাসের ছোট পিসীর বিয়ে হয়েছে জয়ন্তীর শ্বশুরবাড়ির পাশের গাঁয়ে। তিনি একদিন স্বামীর সঙ্গে চোখের চিকিৎসার জন্য এলেন কলকাতায়। বিভাস গেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেল অরুণ। কথায় কথায় জয়ন্তীদের খবর বললেন বিভাসের পিসীমা। জয়ন্তী মোটেই শান্তিতে নেই শ্বশুরবাড়িতে। কি করে বিয়ের আগের বিশ্রী সব কানাঘুসা অতিরঞ্জিত হয়ে কানে গিয়েছে জয়ন্তীর শ্বশুর আর শাশুড়ীর। উঠতে বসতে তাঁরা তাকে নানারকম বাঁকা বাঁকা কথা শোনাচ্ছেন। নবনীর মনও ভারি সন্দিগ্ধ। সর্বদা স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখতে চায়। অভদ্র ইঙ্গিত করে যখন তখন। ভবেশবাবুর খুব অসুখ। তবু অসুস্থ বাপকে একবার দেখতে আসবার অনুমতি পায়নি জয়ন্তী।

ফেরবার পথে অরুণ বিভাসকে বলল, 'আমিই সব কিছুর জন্য দায়ী বিভাস। আমিই নষ্ট করে দিলুম একটা জীবনকে।'

বিভাস হেসে মাথা নাড়ল, 'দূর পাগল। অত সহজেই কি একটা জীবন নষ্ট হয়। কিছু নষ্ট করতে হলেও ক্ষমতার দরকার। তোমার দ্বারা তা হবে না। মন দিয়ে পড়াশুনো করো। অন্য কোন দিকে মন দিয়ে তোমার কাজ নেই। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিভাস একটু সিনিক ধরনের ছেলে। খোঁচা দিয়ে কথা বলা তার অভ্যাস। অরুণ মনে মনে

হাসল। কোন কিছু নষ্ট করবার নাকি তার ক্ষমতা নেই। না থাক্ না-ই রইল। সে রকম ক্ষমতা সে চায় না। কিন্তু কষ্ট করবার, কষ্ট পাবার ক্ষমতা তো আছে। আছে দুঃখবোধের, দুঃখ পাবার অধিকার, জয়ন্তীর কাছে সে দুঃখের রূপ আলাদা, ধরন আলাদা কিন্তু কারণ তো একই। সেই ঐক্যের মধ্যে জয়ন্তীর সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য খুঁজে পেল অরুণ। নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা! অরুণ যদি শুনতে পেত জয়ন্তী বেশ সুখে আছে তা হলে হয়ত নিশ্চিন্ত হত, স্বস্তি পেত, কিন্তু দুঃখ আর বেদনার ভিতর দিয়ে এমন তীব্রতর অস্তিত্বের স্বাদ পেত না। দেখাসাক্ষাৎ, চিঠি-পত্রের যোগাযোগ না থাক, চিরকাল ধরে দু' জনের যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য এই দুঃখ। এই অস্বস্তি আর শান্তিহীনতা।

যথাসময়ে মৃত্যুর খবর এল ভবেশবাবুর। কি একটা খারাপ জ্বরে ভুগে ভুগে মারা গেছেন। বহু জোর জবরদস্তি করে বাপকে শেষ মুহূর্তে দেখতে এসেছিল জয়ন্তী। কিন্তু দেখা হয়নি। জয়ন্তী এসে পৌঁছবার আগেই তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

অরুণ ভাবল এবার একখানি চিঠি লিখবে জয়ন্তীকে। কিন্তু লিখতে গিয়ে ইতস্তত করতে লাগল। কি লিখবে ঠিক পেল না ; যা লিখল মনঃপূত হল না। ছিঁড়ে ফেলল চিঠি।

এম. এ.-তে আশানুরূপ ফল হল না। তবু বন্ধুরা ধরে বসল, 'খাওয়াতে হবে। অদ্বিতীয় না হয়ে না হয় দ্বিতীয় হয়েছ। কিন্তু আমরা যে প্রায়ই সব তৃতীয় শ্রেণীর। মিষ্টিমুখ ছাড়া আমাদের সান্ত্বনা কিসে।'

ট্যুইশানের টাকায় মেসের ঘরে ঘরোয়া ধরনের ছোট একটু ভোজসভা বসল। সবাই এসে পৌঁছল। কিন্তু বিভাস আর আসে না। শেষ পর্যন্ত দেখা মিলল বিভাসের। রাত তখন ন'টা। সবাই রুখে উঠে বলল, 'এত দেরি হল যে, খবর কি তোমার?'

অরুণকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বিভাস বলল,'খবর খুব সুবিধার নয়। নবনী মারা গেছে কলেরায়। সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিল শ্বশুরবাড়িতে। সেইখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে অনুকূলদা আজই রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েই দেরি হল এতখানি।'

পরমুহূর্তে ভোজের আসরে ফিরে এল বিভাস। সমানে চালাতে লাগল গল্পগুজব আর চপ কাটলেট। একেবারে নির্বিকার চিত্ত, যেন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু অরুণ রইল নির্বাক, স্তব্ধ হয়ে। তার বৈকল্য বুঝি কিছুতেই আর ঘুচবে না।

আরো খবর এসে পৌঁছল নানা রকমের। জয়ন্তীর শ্বশুর পুত্রশোকে পাগলের মত হয়ে যা তা বলছেন। অসময়ে এই যে অপমৃত্যু হয়েছে নবনীর, তা নাকি জয়ন্তীরই পাপে। তাতে নাকি জয়ন্তীর হাত আছে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয় নবনীর। জয়ন্তীকে তাঁরা ফিরিয়ে নেননি, কিন্তু ছিনিয়ে নিয়েছেন তার সমস্ত অলঙ্কার আসবাবপত্র। দাবি করেছেন নবনীর লাইফ ইনসিওরেন্সের পাঁচ হাজার টাকা। জয়ন্তী স্বেচ্ছায় লিখে দিয়েছে তার স্বত্ব।

এবার স্তব্ধতা ভাঙল অরুণের, কাটিয়ে উঠল সমস্ত দ্বিধা আর ভীরুতা। সরাসরি চিঠি লিখল জয়ন্তীকে। লিখল, 'তোমার দু বছর আগেকার চিঠির জবাব আজ দিতে বসেছি জয়ন্তী। আজ নয়, দু বছর ধরেই তোমার চিঠির জবাব দিতে চেষ্টা করেছি। লিখেছি আর ছিঁড়েছি, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছি নিজেকে। ছিঁড়েছি সেদিনের সেই ক্লীব কাপুরুষকে। সেদিন আমার ভুল হয়েছিল। আজ আমাকে সেই ভুলের সংশোধন করতে দাও জয়ন্তী। জানি এই মুহূর্তে আমার আওড়ানো উচিত মোহমুদ্গর। তা আমি পারব না, কি করে পারব! আমার মন এখনো মোহে আচ্ছন্ন। সে মোহ জীবনের, সে মোহ তোমার। রূপ-রস-ভালবাসা-ভরা পৃথিবীর।'

এইসব আরো অনেক কথা লিখেছিল অরুণ। তার কলমের কোন রাশ ছিল না। লিখেছিল, এই দু' বছর ধরে যা ঘটে গেছে তা শুধু দুর্ঘটনা, তা শুধু দুঃস্বপ্ন কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নকে যে চিরকাল সত্য বলে, বাস্তব বলে মেনে নিতে হবে তার কি কথা আছে। কোন ঘটনাকে আজ তারা মেনে নেবে না, অন্তরের জোরে ভালবাসার জোরে ঘটনাকে তারা ঘটিয়ে নেবে। অবশ্য বিত্ত সম্পদ কিছু নেই অরুণের, বরং অনেকগুলি ভাই বোনের দায়িত্ব আছে ঘাড়ে। সেই সঙ্গে দায়িত্ব নেবে সে

জয়ন্তীরও। দারিদ্র্যের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। দারিদ্র্যকে সে ভয় করে না। চিত্তের তেমন দৃঢ়তা জয়ন্তীরও নিশ্চয়ই আছে। অরুণের বাবা অবশ্য গোঁড়া সেকেলে ব্রাহ্মণ। নানা সংস্কারে তাঁর মন আচ্ছন্ন। বিধবা-বিয়েতে তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন সে আশঙ্কা আছে। কিন্তু জয়ন্তী সঙ্গে থাকলে সমস্ত বাধাবিঘ্নকেই জয় করতে পারবে অরুণ। কিছুতেই আর পিছু-পা হবে না। তারপর লিখল, জয়ন্তীর সঙ্গে সে সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করছে। আরো অনেক বক্তব্য আছে তাব। যে সব কথা মুখোমুখি ছাড়া বলা যায় না।

সপ্তাহখানেক বাদে জবাব এল জয়ন্তীর। সংক্ষেপে সম্মতি জানিয়েছে সে সাক্ষাতের।

উল্লাসে , আনন্দে, উত্তেজনায় ভরে উঠল-অরুণের বুক। মন উঠল অধীর আর উন্মুখ হয়ে। গাড়ির একটা রাত্রি যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। ভোর ভোর সময়ে পৌঁছল সেই শহরে। অতীতের সুখস্মৃতির সেই শহর। কিন্তু অতীত আজ বর্তমানে রূপ ধরেছে, স্মৃতি হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

দু' ধারে ঝাউগাছের সার। মাঝখান দিয়ে লাল সুরকি ঢালা পথ। দিগন্তে যে ভোরের সূর্য উঠেছে, উঠেছে লাল হয়ে তা অরুণের আনন্দের রঙে রঙীন। সদ্য জাগ্রত সুন্দর মফঃস্বল শহরের জনবিরল কয়েকটি আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে সেই অতি পরিচিত সাদা ধবধবে বাড়িটির সামনে দুরুদুরু বুকে এসে দাঁড়াল অরুণ। দেখা হল জয়ন্তীর বড় দাদা অনুকূলের সঙ্গে। প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে সাত আট বছরের একটি সুদর্শন ছেলে। অরুণকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'কি চাই ?'

'দেখা করতে চাই জয়ন্তীর সঙ্গে।' নির্ভীক জড়তাহীন স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল অরুণ। এই একটি দিনের মহড়া দিচ্ছে সে ক'দিন ধরে।

অনুকূলের মুখখানা মুহূর্তের জন্য টক্‌টকে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তে আত্মসংবরণ করে সহজ শান্ত সুরে তিনি বললেন, 'বেশ। আমি খবর পাঠাচ্ছি জয়ন্তীকে। যদি সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় আমার আপত্তি নেই।'

ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন অনুকূল, 'যাও, তোমার ছোট পিসীর কাছে গিয়ে বলো, অরুণবাবু নামে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।'

মুন্সেফী থেকে সাবজজিতে প্রমোশন পেয়েছিলেন অনুকূলবাবু। নৈতিক পবিত্রতায় যেমন তাঁর বিশ্বাস ছিল তেমনি ছিল নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। পৈতৃক সনাতন হিন্দুসংস্কারের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিষ্টাচার।

খবর এল জয়ন্তী প্রতীক্ষা করছে অরুণের জন্য। বাড়ির সেই ভিড় আর নেই। ভবেশবাবু মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ছোট ছোট পরিবারে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে যার যার চাকরির জায়গায় ' মা গেছেন মেজ ছেলের সঙ্গে। পুত্রবধূ আসন্ন-প্রসবা। তাঁর সহায়তা চাই। জয়ন্তী আছে অনুকূলের তত্ত্বাবধানে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলার সেই দক্ষিণ-খোলা ঘরখানিতে গিয়ে পৌঁছল অরুণ। ভবেশবাবুর সেই ঘর। সব প্রায় তেমনিই আছে। সেই টেবিল, চেয়ার, পালঙ্ক। চারদিকে বইভরা কাঁচের আলমারী। জানলার নিচে সেই শস্যশ্যামলা মাঠ। দিগন্তে ঝাউ আর দেবদারু। কেবল নেই ভবেশবাবু, কিন্তু তাঁর কথা সেই মুহূর্তে মনে পড়ছিল না অরুণের। তার সমগ্র অস্তিত্ব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল কেবল একজনের জন্য।

একটু বাদে পাশের দরজার পাট ঠেলে ঘরে ঢুকল জয়ন্তী। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে অরুণ নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে গেল, ভবেশবাবুর মত সেও যেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ; রঙীন শাড়িতে কাঁকনে হারেপ্রবালে দুলে যে অপরূপ সুন্দরী একটি তন্বী কিশোরীর স্মৃতি মনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছিল অরুণের, এই মেয়েটির সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই। খাটো আর মোটা সাদা থান তার পরনে। গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নটুকুও নেই। চোখে মুখে শীর্ণ কাঠিন্য। অন্তরের শুষ্ক শূন্যতা সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠেছে। একটা অব্যক্ত হাহাকারে ভরে উঠল অরুণের মন। মহড়া-দেওয়া কথাগুলি মুখে এল না। জয়ন্তীই প্রথমে কথা বলল, 'কেন এসেছ ? কি চাই তোমার ?'

অরুণ বলল, 'কি যে চাই, তা তোমার অজানা নেই জয়ন্তী। আমার চিঠির জবাব এখন পর্যন্ত তো পাইনি। আমি তার প্রতীক্ষা করছি।'

জয়ন্তী অদ্ভুত একটু হাসল, 'প্রতীক্ষা করছিলাম আমিও। তোমার চিঠির জবাব সত্যিই দেওয়া দরকার। আর সে জবাব মুখোমুখি না দিলে তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না।'

দেরাজ টেনে বের করল জয়ন্তী অরুণের লেখা সেই দীর্ঘ চিঠিখানা। বের করল একটা মোমাবাতি আর দেশলাই। তারপর সেই দীপের শিখায় ধরল চিঠিখানা। সম্বোধন থেকে স্বাক্ষরটুকু পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পুড়ল জয়ন্তী, পুড়ল অরুণ।

জয়ন্তী বলল, 'এই তোমার চিঠির জবাব। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরেব মেয়ের বিয়ে একবারই হয়। আর যেন আমাকে চিঠি লিখবার স্পর্ধা তোমার না হয় কোনদিন।'

স্পর্ধা! একি বলছে জয়ন্তী। না, অরুণ-ই ভুল শুনেছে! এগিয়ে এসে অরুণ এবার হাতখানা ধরে বসল জয়ন্তীর, বলল, 'তুমি ভাল করে ভেবে দেখ, ভাল কবে বুঝে দেখ জয়ন্তী।'

হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না জয়ন্তী, শুধু জ্বলন্ত চাখে তাকাল অরুণের দিকে, বলল, 'ভেবেছিলাম সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান তুমি হারাওনি, ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে দারোয়ান সঙ্গে রাখবার দরকার হবে না। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। এবার বোধ হয় তাকে ডাকবার সময় হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর হাতখানা ছেড়ে দিল অরুণ। যেন সাপে ছোবল মেরেছে। বিষের ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বাঙ্গে।

'আমার স্বামীকে বোধ হয় তুমি দেখনি।' অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'তিনি ছিলেন মহৎ, সুন্দব, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, সত্যিকারের আদর্শ পুরুষ ছিলেন তিনি। তোমাব মত কাপুরুষ ছিলেন না।'

অরুণ যে পরিচয় শুনেছিল নবনীর, তার সঙ্গে জয়ন্তীর স্বামীর মিল নেই।

কিন্তু জয়ন্তী আবার বলল, 'তুমি বোধ হয় কোনদিন তাঁকে দেখনি, তাই তোমার এ দুঃসাহস হয়েছিল।'

অরুণ বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, সেবার তোমাদের বিয়ের পর দূব থেকে আমি সেদিন দেখেছিলাম নবনীবাবুকে।'

জয়ন্তী অদ্ভুত একটু হাসল, 'কিন্তু কাছ থেকে তো দেখনি। তা হলে অন্যরকম দেখতে। দেখবে আজ কাছ থেকে?'

অরুণ অবাক হয়ে গেল। জয়ন্তী কি প্রকৃতিস্থ নেই? স্বামীর শোকে তাব কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মৃত নবনীকে সে কেমন করে দেখাবে?

কিন্তু জয়ন্তী বলল, 'দেখবে তো এসো। পাশের ঘরেই তিনি রয়েছেন।' জয়ন্তীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি সম্বন্ধে অরুণের আর সন্দেহ রইল না। তবু উপেক্ষা করতে পারল না তার ডাক। চলল পিছনে পিছনে।

গিয়ে দেখল পাশের ছোট্ট ঘরটিতে নবনীর বাঁধানো অয়েলপেন্টিং। সবল সুদীর্ঘ দেহ। সর্বাঙ্গে শৌর্যের দৃঢ়তা, চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। স্নেহময় প্রেমময় অপূর্ব সুন্দর এক যুবকের প্রতিকৃতি। অরুণের যতটা মনে পড়ল এতখানি সুপুরুষ ছিল না নবনী। প্রেম, বুদ্ধির, ক্ষমার এমন সমন্বয় ছিল না তার আকৃতি-প্রকৃতিতে, তার জীবনে। অরুণ লক্ষ্য করল নবনীর প্রতিকৃতির চারদিক ঘিরে রয়েছে সদ্য-গাঁথা গন্ধরাজের মালা। শুধু তাই নয়, সামনে আসন পাতা রয়েছে। এক পাশে সাজানো রয়েছে একরাশ ফুল আর শ্বেতচন্দন। সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে আর এক পাশে।

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না অরুণের। চিনতে বাকি রইল না জয়ন্তীর স্বামীকে। সে ত শুধু নবনী নয়, সে জয়ন্তীর স্বামী। স্বামিত্বের আদর্শ রূপ। অরুণ বুঝতে পারল, মরে নবজন্ম নিয়েছে নবনী জয়ন্তীর মনে, মৃত্যু তাকে অমৃতত্ব দিয়েছে। মরলোকের মানুষ নবনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত অরুণ, কিন্তু জয়ন্তীর মনোলোকের মানস-নবনীর কাছে সে একেবারে নিরস্ত্র, নিঃসহায়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ। কোন কথাই আর বলল না জয়ন্তীকে। বলবার কিইবা

ছিল। কিংবা অনেক কথাই হয়ত ছিল বলবার, কিন্তু বলে কোন লাভ ছিল না।

দোরের কাছে ফের দেখা হল অনুকূলের সঙ্গে। চুরুট মুখে পায়চারি করছেন। বললেন, 'কথাবার্তা শেষ হল আপনাদের ?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, শেষ হল।'"

অসিতবাবু থেমে ফের সিগারেট ধরালেন। তারপর চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম অসিতবাবুকে। সাধারণ চেহারার মোটামুটি সুদর্শন শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। এর আগেও অনেকবার দেখেছি। কিন্তু এমন করে আর দেখিনি। তাঁর রূপের সঙ্গে যেন আজ নিগূঢ় এক রহস্যের সংযোগ ঘটেছে।

একটু পরে বললুম, "কিন্তু গল্প ত আপনার ওখানেই সত্যি সত্যি শেষ হল না। তারপর কি হল বলুন।"

অসিতবাবু ছাইদানিতে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেললেন। তারপর একটু হেসে ফের শুরু করলেন : "তারপর আবার কি হবে। যেমন হয়। কিছুদিন ঔদাস্যে নৈরাশ্যে ঘোরাঘুরিতে, ছুটোছুটিতে কাটল। উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলতে লাগল হৃৎপিণ্ড। অরুণ ভাবল চিরদিন বুঝি এমন করে জ্বলতেই থাকবে। জ্বলার বুঝি কোনদিন বিরাম হবে না। কোনদিন নিববে না সেই জ্বলন্ত দুঃখানল। কোনদিন ভুলতে পারবে না জীবনের এই কটি দিনকে। বছর কয়েক পরে অবশ্য ভুল ভেঙেছিল অরুণের। বুঝতে পেরেছিল জীবনে এসব বৃত্তান্ত ভোলাটাই সহজ, মনে রাখাই অত্যন্ত কঠিন। মনে রাখতে চাইলেই কি মনে রাখা যায় ! জীবনের আরো অনেক দাবী আছে, দায়িত্ব আছে, প্রয়োজন আছে, তাদের স্বীকার না করে জো থাকবে না। ভুলবার জন্য পালালো অরুণ বাংলার বাইরে। সুদূর পশ্চিমে নিল এক প্রফেসারী। কিন্তু বাংলার বাইরেও ত বাঙালিনীর আজকাল অভাব নেই। আর গায়ে গেরুয়া পরলেই কি মনের কাঙালপনা অত সহজে মেটে ? দ্বারে দ্বারে হাত পাতবার অভ্যাস যায় সহজে ? বছর তিন চার পরে হাত পেতে যে মেয়েটির পাণিগ্রহণ করল অরুণ সে মেয়েটিও দেখতে সুশ্রী, শুনতে সুকণ্ঠী, সদালাপী, সুশিক্ষিতা — এঁরও একটি নাম চাই নাকি আপনার, কল্যাণবাবু ?"

নিস্পৃহভাবে বললুম, "দিন না, ক্ষতি কি।"

অসিতবাবু বললেন, "ঈস, আপনার সমস্ত কৌতূহল মাটি করে ফেললুম বলে মনে হচ্ছে। কৌতূহল না থাকুক শুনে একটু কৌতুক হয়ত বোধ করতে পারেন আপনি, তাই বলছি। অরুণের স্ত্রীর নাম কল্যাণময়ী। বাপ একটু সেকেলে ধরনের প্রবাসী বাঙালী। কাজ করেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে, রুচির মধ্যে একটু পুরাকালীন ছাপ আছে, তাঁর রুচির ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারল না অরুণ, কিন্তু কন্যার ওপর ফেলল। গড়ে-পিটে পুরোপুরি এ-কালিনী করে তুললো তাকে। নামটাকে ছেঁটে কেটে করল কলি। তারপর চলে এল কলকাতায়। পরমার্থতত্ত্বের অধ্যাপনা করতে করতে কিছু বেশি মাইনে পেয়ে চাকরি নিল ইনকামট্যাক্‌স্ অফিসে। পরমার্থের চেয়ে বড় চরমার্থ, তারপর সেখান থেকে আরো দু' একটা অফিস অদল-বদল হল। বয়ে চলল সময়ের স্রোত। মন্বন্তরে, যুদ্ধে, দাঙ্গায় রাঙা হল শহর। তারপর সেই রঙ ফের ফিকে হয়ে এল, কিছু বা ধুয়ে গেল চোখের জলে, কিছু কলের জলে, কিছু বা ঢাকা পড়ল ধুলোয়, কিছু শুকিয়ে গেল, একটু একটু করে লোকে সব ভুলতে লাগল। ভোলার চেয়ে মনে রাখা ঢের কঠিন। জীবন-সংগ্রাম কঠিনতর। তার স্বাদ পুরোপুরিই পেতে হচ্ছিল অরুণকে। ভাই-বোনদের সংখ্যা আর বাড়েনি। কিন্তু তাদের ভাইপো ভাইঝিরা একটি দুটি আসতে শুরু করেছে। আয় বৃদ্ধি সেই অনুপাতে অনেক রয়েছে পিছিয়ে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে শু ছেড়ে স্যান্ডাল পরল অরুণ, স্যুট ছেড়ে লুঙ্গি। তারপর পুরনো ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে স্ত্রীর দেওয়া চায়ের কাপটি হাতে নিতে যাবে এমন সময় পরিতোষ এসে উপস্থিত। পরিতোষ পুরনো সহকর্মী বন্ধু। ঠিক সহকর্মী নয়, এ্যাসিস্ট্যান্ট-সহায়ক। পদটা অরুণের চেয়ে একধাপ নিচেই। তবে বয়সও কম। পরে উন্নতি করতে পারবে। পরিতোষ এসে ধরল তার বিয়েতে বরযাত্রী যেতে হবে। নিমন্ত্রণপত্র অবশ্য আগেই দিয়েছিল। এবার পত্রদ্বারা

নিমন্ত্রণের ত্রুটি সংশোধন করতে এসেছে।

অরুণ বলল, 'ক্ষেপেছো। একবার বর হয়েছি তাই যথেষ্ট। যাত্রী-টাত্রী হয়ে ভারি হাঙ্গামা। তার চেয়ে দূর থেকে আশীর্বাদ করছি।'

কিন্তু পরিতোষ নাছোড়বান্দা। সে শরণ নিল অরুণের স্ত্রীর। মনিবপত্নীকে দু' এক রাত সিনেমা দেখিয়ে সে প্রায় হাত করে ফেলেছিল।

কল্যাণী (কলি আর কল্যাণময়ীর মাধ্যমিক রূপ) বলল, 'না এ বড় অন্যায়। তুমি দিনের পর দিন ক্রমেই কুনো হয়ে যাচ্ছ। সমাজ সামাজিকতা অমন করে ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? বিশেষ করে পরিতোষ ঠাকুরপোর বিয়ে। না গেলে কি ভাল দেখায় ? তিনি কত করেন আমাদের জন্যে।'

অগত্যা উঠতেই হল। যাবে বরযাত্রী, কিন্তু অরুণকে জোর জবরদস্তি করে প্রায় বরবেশ পরিয়েই ছাড়ল কল্যাণী। বিয়েটা বিশেষ করে মেয়েদেরই উৎসব। বিয়ের নাম শুনলেই মন নেচে ওঠে তাদের। সে বিয়ে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। আত্মপরে এখানে প্রভেদ নেই।

বিবাহবাসর বড়িশায়। এতকাল কলকাতায় থেকে ও জায়গাটার কেবল নামই শুনেছে অরুণ, যাওয়ার কোন উপলক্ষ ঘটেনি। এবার ঘটল। কথা ছিল বরের মোটরেই ঠাঁই হবে। কেন না অরুণ সম্ভ্রান্ত অতিথি। কিন্তু পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে দেখল গাড়িতে তার ভাইপো ভাগ্নের দল উঠে বসেছে। তারা কিছুতেই নামবে না। সম্ভ্রান্ত অতিথির জন্যও নয়। অরুণ হেসে তাদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলে আর পাঁচসাত জন বয়স্ক সহযাত্রীর সঙ্গে শ্যামবাজারের মোড় থেকে তিনের-এ বাস ধরল।

বাসের মধ্যে আলাপ হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। পরিতোষের কি রকম ঠাকুরদা হন সম্পর্কে। বয়সটা ঠাকুরদা-জনোচিত নয়, কিন্তু সম্পর্কোচিত রসিকতা বেশ আছে।

তিনি বললেন, 'ভিড়ে তো গলে যাচ্ছি মশাই, কিন্তু লাভ কতটুকু কী হবে তাতে ঘোর সন্দেহ আছে।'

অরুণ বলল, 'কেন ?'

তিনি বললেন, 'আমরা তো ইতর জন। মিষ্টান্ন ছাড়া তো আর কিছু নেই বরাদ্দে। কিন্তু ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা যা দেখছি তাতে সেটুকুও জোটে কিনা সন্দেহ!'

অরুণ বলল, 'কেন ?'

ঠাকুরদা বললেন, 'আরে মশাই বিয়ে কার জানেন ? বিধবার। বিয়ে চূড়োয়, কোন শুভ কাজে যে হাত ছোঁয়ালে মহাভারত পর্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যায়, অধিবাস-টাস নয় তার একেবারে সাক্ষাৎ বিয়ে! বলুন দেখি কি কাণ্ড! গোড়াতেই অযাত্রা। মিষ্টিমুখ নয় মিষ্টিকথা শুনেই এ যাত্রা বিদায় নিতে হবে! আমি আপনাকে বলে রাখলুম।'

অরুণ একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'পরিতোষ কি বিধবা বিয়ে করছে নাকি ? কই আমাকে তো আগে বলেনি।'

ঠাকুরদা বললেন, 'আমাকেই কি আগে বলেছে ? পরে শুনলুম আগে থেকেই নাকি এক-আধটু জানাশোনা ছিল। তা জেনেই হোক না জেনেই হোক নেমন্তন্ন যখন নিয়েছি জাতটা সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। এখন যদি পেটটা না ভরে তো দু' কুলই গেল।'

আবহাওয়াটা ভাল নয়। কৃষ্ণপক্ষের মেঘলা আকাশ। শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে পড়ল অরুণরা! সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল ফোঁটায় ফোঁটায়। মনে মনে ভারী বিরক্ত হয়ে উঠল অরুণ। আচ্ছা স্থান কাল পাত্রী ঠিক করেছে পরিতোষ! এ তো আসলে বিয়ে নয়, বিয়ের মোড়কে সমাজ-সংস্কার।

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে হয় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। কন্যাপক্ষ থেকে দু' একটি ছাতার যা সরবরাহ হয়েছে তার তলায় গেলে অংশত ভিজতে হয়। তার চেয়ে একক পুরোপুরি ভেজাই ভাল। এর আগে লজ্জা করছিল, কল্যাণীর পুরনো বিশেষ বেশবাসটির জন্য এবার দুঃখ হল অরুণের।

অবশেষে সদলবলে এসে পৌঁছানো গেল বিয়ে-বাসরে। জীর্ণ একটা দোতলা বাড়ি আর সামনে

পানাভরা মজা পুকুর ইলেকট্রিকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তবু অরুণরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো বাড়ির ভিতর থেকে হুলুধ্বনি উঠল, বেজে উঠল শাঁখ। অমন প্রতিকূল পরিবেশেও খুশীর আমেজ লাগল অরুণের মনে।

টাক-পড়া প্রৌঢ় কন্যাকর্তা এগিয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন, আপনাদেব খুবই কষ্ট হল।'

পরিতোষের সেই ঠাকুরদা বললেন, 'আজ্ঞে তা আপনাদের কৃপায় একটু হল বই কি!'

কন্যাকর্তা হয়ত একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক মুখে জোগাল না, কিন্তু জবাব এল তাঁর পিছন থেকে। কেবল বিনীত নয়, মধু-বিনিন্দিত কণ্ঠে, 'একটু কেন, কষ্ট আপনাদের যথেষ্টই হয়েছে। গরীবের মেয়ের বিয়ে। কষ্টের কথা তো জেনেশুনেই আপনারা দয়া করে এসেছেন। কৃপা আপনাদের, আমরা কৃপার্থী।'

চমকে উঠে সেই সুধাকণ্ঠের অধিকারিণীর দিকে চোখ তুলে তাকাল অরুণ। তারপব আর চোখ নামাতে পারল না। জয়ন্তী, বেশবাসের তেমন পরিবর্তন হয়নি। সেদিনের প্রায় তেমনি একখানা সাদা থান পরনে। হয়ত ততখানি স্থূল আর হ্রস্ব নয়। তেমনি নিরাভরণ দেহ।

কিন্তু অদ্ভুত বদল হয়েছে চেহারার! সেদিনের সেই শুষ্কতা, শীর্ণতা, শূন্যতার বদলে পরিপূর্ণতা, স্বাস্থ্যে আর লাবণ্যে টলটল করছে মুখ, জ্বলজ্বল করছে, তৃপ্তিতে আনন্দে।

অরুণকে দেখে একটু যেন চমকে উঠল জয়ন্তী, কিন্তু পরমুহূর্তে তার স্মিতমুখ ঠিক তেমনি সহজ হয়ে উঠল স্বাচ্ছন্দ্যে।

কন্যাকর্তা বিভূতিবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'তরঙ্গিনী নারীকল্যাণ সমিতির সম্পাদিকা। এঁরাই উদ্যোগ আয়োজন করে বিয়ে দিচ্ছেন আমাদের রেবার। এঁদেব সমিতিরই সভ্যা কিনা সে। তারপর অরুণকে দেখিয়ে বললেন, আর উনি আমাদের পরিতোষের বন্ধু। নাম—নাম—'

জয়ন্তী মৃদু একটু হাসল, 'নাম আমি জানি বিভূতিবাবু। আমাদের পরিচয় আছে।'

দু'খানা হাত জোড় করে নমস্কার জানাল জয়ন্তী। যেন একটি মুদ্রিত শ্বেতপদ্ম এসে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করল তার শুভ্র, সুন্দর কপালটুকু।

একটু বাদে জয়ন্তী বলল, 'ভালই হল, রেবার বিয়েতে বিভাসদাকে পেয়েছি আমরা দলে। খুলনা থেকে আজই এসে পৌঁছেছেন তিনি। ভাগ্যে স্টেশনে গিয়েছিলাম। তাই দেখা। জোর করে ধরে এনেছি। ঘুমোচ্ছেন শুয়ে শুয়ে। আগের দু' রাত নাকি ঘুমোননি। আজ সন্ধ্যা থেকেই তার শোধ তুলছেন। ডেকে দেব?'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল অরুণ। তারপর দলের সঙ্গে গিয়ে বসল বরযাত্রীদের আসরে। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পালাতে চেষ্টা করল অরুণ, কিন্তু ভিড় তাকে স্পর্শ করল না। চাপা দেওয়া ক্ষতের মুখে যেন নতুন করে আবার খোঁচা লেগেছে। জ্বালা ধরেছে পুরনো দিনের মত। হতাশার জ্বালা, অপমানের জ্বালা, ব্যর্থতার জ্বালা। তার শোধ নেওয়া হয়নি। সেই সঙ্গে অবাকও লাগছে একটু একটু। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কৌতুককরও বটে। সেই স্বামী-পূজারিণী জয়ন্তী হয়েছে নারীকল্যাণ-সঙ্ঘের সম্পাদিকা, বিধবা-বিয়ে হচ্ছে তার উদ্যোগে যে সে দিন দম্ভভরে বলেছিল হিন্দুর মেয়ের মাত্র একবারই বিয়ে হয়। হাতখানা ধরেছিল বলে যে দরোয়ান লেলিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল তাকে। আর একবার সহনাতীত জ্বালা করে উঠল সেই গোপন ক্ষতদেশে। স্থান কাল সব যেন ভুলে গেল অরুণ, ব্যবধান ভুলে গেল আট-ন বছরের। ভাবল, এখান থেকে উঠে গেলে কেমন হয়। যেখানে জয়ন্তী আছে সেখানে সে থাকবে কেমন করে।

বিয়ের লগ্নের দেরি আছে। তার আগে বরযাত্রীদের আপ্যায়নপর্বটা হয়ে যাক। কারণ আকাশেব অবস্থা ভাল নয়। ফের তো ফিরে যেতে হবে। কন্যাকর্তা এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। পরিতোষের ঠাকুরদা অরুণের কানে কানে বললেন, 'চলুন মশাই, চলুন, আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হিতৈষিণীদের ধন্যবাদ। এই দুর্যোগের মধ্যেও জলযোগের ব্যবস্থাটা ওঁরা বহাল রেখেছেন।' তারপর আর একটু চাপা গলায় বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন, মিষ্টিমুখ না হলেও বোধ হয় তত আর আপসোস ছিল না। চোখ জুড়িয়ে গেছে মশাই, হিতং মনোহরী চ দুর্লভং বচঃ। হিতৈষিণীর মনোহারী মুখ আরো সুদুর্লভ।'

ভিতরবাড়ি থেকে বিভাস এসে পৌঁছল। সোল্লাসে জড়িয়ে ধরল অরুণের হাত, 'আরে তুমি ? আমি তো ভেবেছিলাম মরে হেজে একেবারে ভূত হয়ে গেছে। কত মারাত্মক কাণ্ডই তো ঘটল।'

অরুণ একটু হাসল, 'তুমি তো ভূত হওনি দেখছি !'

বিভাস বলল, 'কে বলল যে হইনি। ভূতেরাও দেখতে প্রায় মানুষের মত। দেখবার অভ্যাস না থাকলে চেনা যায় না। বিয়ে থা করে একেবারে দারুভূত মুরারি সেজে বসে আছি। তেমন ছুটোছুটি আর করতে পারি নে। দেখছ না, বেশ একটু নেয়াপাতি ভুঁড়ির মত হয়েছে। ভাল খেয়ে-দেয়ে নয়, যা-তা খেয়ে খেয়ে। বদহজম। তার পর, তোমার খবর কী ?'

কন্যাকর্তা ইতিমধ্যে আর একবার এসে হাতজোড় করে অরুণের সামনে দাঁড়ালেন। সহকারী বরকর্তা—পরিতোষের সেই ছোটদার বয়সী ঠাকুরদা ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে টানলেন হাত ধরে। অরুণ দু' জনকেই এক কথায় জবাব দিল, 'মাপ করুন।'

কাজের এক ফাঁকে কখন জয়ন্তী এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওঁর জন্য ব্যস্ত হবেন না বিভূতিবাবু। উনি না হয় একটু পরেই খাবেন।'

বিভূতিবাবু বললেন, 'কিন্তু একেবারে খাবেন না বলছেন যে।'

জয়ন্তী একটু হাসল, 'বলছেন নাকি ? আচ্ছা সেজন্য ভাববেন না।'

লগ্ন এগিয়ে এসেছে। বিয়ের আয়োজন চলছে ভিতরে। জয়ন্তী আবার সেদিকে চলে গেল।

আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে, বোধ হয় জয়ন্তীদের সমিতিরই কোন সহকারিণী, টিপ্পনি কেটে বলল, 'আপনার যে আজ খুব উৎসাহ দেখছি জয়ন্তীদি। পুরনো বন্ধুদের দেখা পেয়েছেন বলে বুঝি ?'

জয়ন্তী ধমকের সুরে বলল, 'বাজে বকিসনে। আমার উৎসাহ কম দেখেছিস কবে ? তোদের মত ঢিলেমি আমার কোনদিনই নেই।'

কিন্তু ধমকের মধ্যে কৃত্রিমতা ধরা পড়ল। মাজা গৌরবর্ণের সুডৌল মুখখানিতে আরক্ত আভাস গোপন রইল না।

বৃষ্টি থেমেছে। সিগারেট ধরিয়ে বিভাসকে সেই পানাভরা পুকুরের ধারে ঠেলে নিয়ে গেল অরুণ। বলল, 'চল, একটু ঘুরে আসা যাক।'

বিভাস বলল, 'অবাক করলে ! কোথায় যাবে এত রাত্রে এই কাদা কাচড়ের মধ্যে। তার চেয়ে বিয়ের আসরে গিয়ে বসলেই হত। খুব খুশী হত জয়ন্তী।'

অরুণ বলল, 'না না, চল। কথা আছে।'

বিভাস মুখ টিপে হাসল, 'বুঝেছি। এতক্ষণে তোমারও তো বোঝা উচিত ছিল। তুমি একটা আস্ত হাঁদারাম। তোমার দোষ নেই। ভাল ছেলেরা তাই হয়। তারা খেলাটা বোঝে না, লীলাটাও নয়।'

তারপর সেই পানাভরা পুকুরের কাদামাখা পাড়ে পায়চারী করতে করতে বিভাসের মুখ থেকে অরুণ শুনতে লাগল জয়ন্তীর ইতিবৃত্ত, তার বিবর্তনের কাহিনী।

একনিষ্ঠ স্বামীপূজা বেশ কিছুদিন চলেছিল জয়ন্তীর। দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কাটত স্বামীর ফটো নিয়ে সেই ছোট ঘরটুকুর মধ্যে। ফুল তুলত, মালা গাঁথত, মালা পরাত। অধ্যায়ের পর অধ্যায় বসে পড়ত গীতা আর শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী তার বড়দা অনুকূল কোন কথা বলতেন না, কোন বাধা দিতেন না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তিনি বদলী হয়ে গেলেন অন্য জেলায়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে চাকরি খুইয়ে বাড়ি এসে বসলেন মেজদা শশাঙ্ক। চালানি ব্যবসা শুরু করলেন বাঁশের আর কাঠের। তিনি বললেন, 'পুজো করবে করো, কিন্তু কেবল পুজো নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সংসারে কাজ আছে অনেক। তোমার মেজো বউদি চিররুগ্না। কতগুলি ছেলেমেয়ে। তাদের দিকে না চাইলে পারব কী করে।'

ফলে সকলের দিকেই চাইতে হল জয়ন্তীকে। গোশালাথেকে আঁতুড়ঘর পর্যন্ত। হাঁপ ছাড়বার সময় নেই। কিন্তু সময় না পেয়ে জয়ন্তী যেন বেঁচে গেল। বিয়ের আগে প্রণয়ঘটিত দুর্ঘটনায়, বিয়ের পরের বৈধব্যের দুর্ভাগ্যে যে সম্মান যে মর্যাদা সে হারিয়েছিল, একটু একটু করে সেই হৃতশ্রী

আবার ফিরে এল, আবার সে হয়ে উঠল পরিবারের মধ্যে অপরিহার্য। পাড়ার যে সব মেয়েরা তার সঙ্গ এড়িয়ে চলত, মা-বাপের কাছ থেকে তারা ফের অনুমতি পেল জয়ন্তীর কাছে এসে সেলাই শিখতে। সূচিশিল্পে দক্ষতা ছিল জয়ন্তীর।

সেই সেলাই-সমিতি থেকেই উৎপত্তি নারীকল্যাণ —সমিতির।

একদিন স্বামীর প্রতিকৃতির জন্য বেলফুলের মালা গাঁথতে বসছে জয়ন্তী, হঠাৎ পায়ের ওপর এসে ঘোষেদের কমলা বলল, 'দিদি আমাকে রক্ষা করো। ও আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চায়। নিয়ে গিয়ে এবার একেবারে মেরে ফেলবে সেই মতলব।'

কমলাও বাপের বাড়িতে যখন থাকে সেলাই শেখে জয়ন্তীর কাছে এসে। তার দুর্ভাগ্যের কথা কারো অজানা ছিল না। কমলার স্বামী প্রিয়বর মদ্যপ, দুশ্চিরিত্র। তাই নিয়ে কমলা কোন কথা বলতে গেলেই সে তার মুখ চেপে ধরে, গলা টিপে ধরে, লাথি মারে এলোপাথাড়ি। বেদম মার খেয়ে সেদিন কোন রকমে পালিয়ে এসেছে কমলা। প্রিয়বর এসেছে পিছনে পিছনে। কেলেঙ্কারির ভয়ে কমলার বাবা তাকে সেই স্বামীর হাতেই সঁপে দিতে চাইছে। এখন জয়ন্তী যদি রক্ষা না করে উপায় নেই কমলার।

মালা-গাঁথা ফেলে রেখে উঠে পড়ল জয়ন্তী।মনে পড়ে গেল নিজের কথা। নিজেদের দাম্পত্য-জীবনের কথা। বলল, 'তোমার ভয় নেই, কমলা, আমি যতক্ষণ আছি কেউ তোমাকে সেই দুর্বৃত্ত স্বামীর হাতে ঠেলে দিতে পারবে না।'

কথা দেওয়া যত সহজ হল, রক্ষা করা তত সহজ হল না। বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কমলার বাবা, কমলার স্বামী। এমন কি জয়ন্তীর মেজদা শশাঙ্ক বললেন, 'যার যেমন স্বভাব তার তেমনি সঙ্গ। ও সব ন্যাইসেন্সের জায়গা আমার এখানে হবে না। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওসব হিতব্রত, সমাজসংস্কার করতে পারো আমার বাড়িতে চলবে না।'

জয়ন্তী বলল, 'বেশ।শ্বশুরবাড়ি আর তোমার বাড়ি ছাড়াও আরো অনেক বাড়ি আছে শহরে। দেখি তার কোনটি পাই কিনা।'

এক্‌জিবিশনে প্রাইজ পাওয়া নিজের যে সব সূচিশিল্পের নমুনা ছিল তার কাছে খুঁজে পেতে জড়ো করল জয়ন্তী, কুড়িয়ে নিল সঙ্গিনীদের হাতের কাজ, দু-চারখানা অলঙ্কার যা অবশিষ্ট ছিল বাঁধল আঁচলে, বিক্রি করে জমল কিছু টাকা। সেই টাকায় ভাড়া নিল কলেজ-পাড়ায় প্রফেসারদের বাসার কাছে ছোট দোচালা একখানা টিনের ঘর। অফিস বসল নারীকল্যাণ-সমিতির। ঘুরে ঘুরে সহায়তা পেল দু'তিন জন পসারহীন তরুণ উকিলের। মামলা রুজু হল কমলার স্বামী প্রিয়বরের নামে, মারপিট অত্যাচারের অভিযোগে, খোরপোশের দাবীতে। আশ্চর্য, মামলা জিতে গেল জয়ন্তী। প্রাচীনপন্থীরা বাঁকা কটাক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র কোট করলেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' কিন্তু উৎসাহী তরুণের দল জয়ন্তীকে ঘিরে ধরল। দুর্নাম, অপবাদের ঢেউ কোন কোন পাড়ায় অবশ্য উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল। কেউ কেউ খুঁড়ে বের করলেন অতীতের ইতিবৃত্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ রুখতে পারল না জয়ন্তীকে। ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় সে ভেসে চলল। স্রোত তার অনুকূলে।

বিধবা বিয়ে সম্বন্ধে জয়ন্তীর দিন কয়েক একটু দ্বিধা ছিল। এ প্রসঙ্গে সে বলত, 'কেন, একজন পুরুষের স্কন্ধগত হওয়া ছাড়া মেয়েদের কি অন্য কোন কাজ নেই? একজন মরে গেল বলে যে আর একজনের কাঁধে চাপতেই হবে তার কী মানে আছে। নিজেদের হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, মাথা আছে। চলবার পক্ষে, বাঁচবার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট। গোঁফদাড়ি নাই বা থাকল। তার ওপর এত লোভ কেন মেয়েদের।'

কিন্তু কিছুদিন বাদেই এই উগ্র নারীস্বাতন্ত্র্য শিথিল হয়েছিল জয়ন্তীর। সমিতির একটি অল্পবয়সী মুখচোরা লাজুক বিধবা মেয়ে তার ভারী স্নেহের পাত্রী ছিল। প্রমাণ পাওয়া গেল জজকোর্টের একটি সুদর্শন কেরানীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছে। সবাই ভাবল মুখচোরা মিনতির এবার নাম কাটা যাবে সমিতি থেকে। কিন্তু কেরানীটির অসীম সাহস। সে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করে বলল, 'নাম কাটেন কাটুন। কিন্তু আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা না হলে কান কাটা যাবে। মিনুর আর কোন জায়গায় স্থান হবে না। বলে কয়ে ওর বাপ-মাকে রাজী করাতেই হবে। আর তা কেবল আপনিই পারেন।'

জয়ন্তী একটা রাত সময় নিল ভেবে দেখবার। তারপর তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। হয় তো তার মনে পড়েছিল হাত পা নাক চোখ কান মাথার দিক থেকে মেয়ে আর পুরুষে আলাদা আলাদা হলেও হৃদয়ের ক্ষেত্রে দুই জাতই বড় অসহায়, বড় নির্ভরশীল পরস্পরের ওপর।

বিয়ের পরও মিনতির নাম রইল সমিতির খাতায়, আর কর্মতালিকায় বিধবা বিয়েটিও অন্তর্ভুক্ত হল।

টিনের ঘরের বদলে পাকা বাড়ি উঠল সমিতির। বসল স্কুল, বসল তাঁত, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, ওই ধরনের আরো কয়েকটি লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত হল। সমিতির শাখা-অফিস বসল কলকাতায়।

অনেকক্ষণ ধরে জয়ন্তীর দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী বলে গেল বিভাস। সে কাহিনীর মধ্যে অরুণের নাম গন্ধ মাত্র নেই।

অরুণ মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবল এই মহাভারত শুনে তার লাভ হল কী। সময় নষ্ট করবার জন্য বিভাসের ওপর অদ্ভুত একটা আক্রোশই বরং এসে গেল তার।

অরুণ বলল, 'তা তোমার জয়ন্তী নিজেই আর কাউকে বিয়ে করল না কেন ? একটা মহৎ দৃষ্টান্ত থেকে যেত সমিতিতে। অনুপ্রাণিত হত আরো অনেক শাঁখাসিঁদুর বঞ্চিতার দল।'

বিভাস একটু হাসল, 'এ প্রশ্ন কেবল তুমি নয়, আরো অনেকে করেছেন। তাদের মধ্যে প্রবীণ জজ ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে তরুণ উকিল, প্রফেসার সবাই ছিলেন। কিন্তু জয়ন্তী তাঁদের প্রত্যেককে নিরুত্তর আর নিরাশ করেছে। বলেছে, উঁহু। এ সম্বন্ধে সমিতির সভ্যাদের রেকর্ড খুব ভাল নয়। যে সব সভ্যারা নতুন করে শাঁখাসিঁদুরের স্বাদ পাচ্ছেন তাঁরা এমন করে ডুবে যাচ্ছেন ঘর-সংসারে যে চার আনা চাঁদা পর্যন্ত মিলছে না তাঁদের কাছ থেকে। সে দশা তো আমারও হতে পারে। তার চেয়ে একেবারে পাকা চুলেই ফের সিঁদুর পরব। দ্বিতীয়বার মুছবার আর ভয় থাকবে না। সমিতির ভিতটাও তত দিনে আশা করি পুরোপুরি পাকাপোক্ত হবে।'

বিভাস একটু থামল, তারপর আরও একটু চাপা গলায় বলল, 'কিন্তু অনেকেরই ধারণা এসব বাজে অজুহাত জয়ন্তীর। আসল মনের কথা নয়।'

অরুণ বলল, 'আসল মনের কথাটা তা হলে কী ?'

বিভাস জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'কী জানি ভাই ! মেয়েদের চরিত্র, মেয়েদের মন দেবাঃ ন জানন্তি কূতঃ মনষ্যাঃ।'

খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হল। শাঁখে আর হুলুধ্বনিতে শুরু হল বিয়ে। পরিতোষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল অরুণ, বিদায় নিল কন্যাকর্তা বিভূতিবাবুর কাছ থেকে, বিভাসকে ঠিকানা দিয়ে বলল, 'দেখা করো।'

কেবল বলল না কিছু জয়ন্তীকে। তাকে এড়িয়েই পেরিয়ে গেল বাড়ির সদর দরজা। বাস অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। বরযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা দু'এক জন যেতে পারেননি তাঁদের জন্য নারীকল্যাণ-সমিতি হঠাৎ ভারী সদয় হয়ে উঠেছেন। নিজেদের ব্যয়ে ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন একখানা। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি। সহযাত্রীরা তাড়াতাড়ি গিয়ে সীট দখল করেছেন। অরুণও সেই দিকে যাচ্ছিল, পিছনে কার পায়ের শব্দে মুখ ফিরে তাকাল। দেখল, জয়ন্তী দ্রুত এগিয়ে আসছে তার দিকে। অরুণের কাছাকাছি এসে ব্লাউসের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বের করল ছোট চাঁদার খাতা। হেসে বলল, 'সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক। আমাদের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না একথা সবাই জানে। পালিয়ে গেলে আমরা পিছু নিই। আর চাঁদাটা এমনই জিনিস জোর জবরদস্তি ছাড়া তা আদায় হয় না।'

গাড়ির ভিতর থেকে যে সব সহযাত্রী মুখ বাড়িয়েছিল তারা ফের সভয়ে মুখ লুকাল। অরুণও বিব্রত বোধ করল একটু। তারপর পকেট হাতড়ে বের করল দশ টাকার একটি নোট। এইটিই শুধু আছে। গৃহিণীপনা জানে কল্যাণী। স্বামীর ঘড়িপকেটে অযথা বেশী টাকা গুঁজে দেওয়ার সে কোনদিন পক্ষপাতী নয়। সে টাকা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হিসাব পাওয়া যায় না খরচের।

অরুণ ভাবল জয়ন্তী খুব খুশী হবে এই অপ্রত্যাশিত দানে। কিন্তু জয়ন্তীর কথা শুনে সে অবাক

হয়ে গেল। দশ টাকার নোটখানা দেখেও ঘাড় নাড়ল জয়ন্তী, মৃদু হেসে বলল, 'যাঁরা অসামান্য তাঁদের কাছ থেকে সামান্য পাঁচ দশ টাকা তো আমরা নিই নে।'

অরুণ বিরক্তির সুরে বলল, 'আমি অসামান্য নই। আর এই দশ টাকা ছাড়া এখন কিছু নেইও আমার কাছে।'

জয়ন্তী বলল, 'কী জানি, কারো কারো তো এখনো অসামান্য বলেই ধারণা। তাছাড়া টাকা না থাকলে তার বদলে ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে আমরা অন্য জিনিসপত্রও নিয়ে থাকি।'

কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য জিনিসপত্রই বা অরুণের কাছে এমন কী আছে ? হঠাৎ জয়ন্তীর দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের আঙুলের দুটি আংটির দিকে চোখ পড়ল অরুণের। দামীটি শ্বশুরবাড়ির। কমদামীটি নিজের। ছাত্র বয়সে মা দিয়েছিলেন। সেই থেকে আছে হাতে। অনামিকায় বড় আঁট হয়, তাই রেখেছে কনিষ্ঠায় পরিয়ে। মনে পড়ল সেই প্রথম প্রেমের সময় জয়ন্তীকে দু' এক বার পরিয়েছে এই আংটি। প্রতিবারই ফেরত দিয়েছে জয়ন্তী। লোকে দেখলে কী বলবে। আজ কি, এত দিন বাদে লোকভয় লোপ পেয়েছে জয়ন্তীর। হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করল অরুণ। তারপর আঙুল থেকে খুলতে চেষ্টা করল শ্বশুরের দেওয়া পোকবাজ বসানো আংটিটি।

কিন্তু জয়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, এত বড় দান সইবে না। তাছাড়া দাতাকে হয়ত এর জন্য বউয়ের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। তার চেয়ে নিজেরটি দেওয়াই ভালো।'

আংটিটি খুলে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে অরুণ বলল, 'কিন্তু আংটিটি আজ যদি নিজের হাতে পরিয়ে দিতে যাই জয়ন্তী ফের দারোয়ান ডাকবে না তো ?'

জয়ন্তী হেসে উঠল, 'ওমা, বলছ কী তুমি ? নিজের হাতে পরিয়ে দেবে কাকে ? দেখছ না কি মোটা হয়ে গেছি, ও আংটি তো কড়ে আঙুলেও লাগবে না আমার। আমি চাইছিলুম রেবার জন্য। ওর ভাবী সখ আংটি পরবার। তাড়াতাড়িতে দিয়ে উঠতে পারিনি।'

অরুণ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর আংটিটি তুলে দিল জয়ন্তীর হাতে।

তার পরিবর্তে জয়ন্তী দিল একখানা ছাপানো কার্ড। তাদের নারীকল্যাণ-সমিতির নাম ঠিকানা। বলল, 'যদি কোন দরকার হয় চিঠি দিয়ো।'"

অসিতবাবু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, বললেন, "চলুন দেখুন তো গল্পে-গল্পে কত রাত হয়ে গেল।"

বললুম, "তা একটু হল বইকি ! কিন্তু আমার সুপারিশ চিঠির খামের ওপর নাম-ঠিকানা তো লেখেন নি।"

অসিতবাবু বললেন, "ও ভবি দেখছি ভুলবার নয়, সুপারিশ চিঠিটা বেশ মনে রেখেছেন দেখছি।"

সাদা খামটা টেনে নিয়ে মাথা একটু নিচু করে তার ওপর ঠিকানা লিখতে লাগলেন অসিতবাবু, "সম্পাদিকা ফরিদপুর নারীকল্যাণ-সমিতি, বউবাজার ব্রাঞ্চ, ফরডাইস লেন, কলিকাতা।"

স্বাচ্ছন্দ্যে আর পরিতৃপ্তিতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে অসিতবাবুর মুখ। অরুণ কি এখনো প্রেমপত্র লিখছে জয়ন্তীকে ?

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫

ঋণ

মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভারী টানাটানি পড়ল টাকার, সংবাদপত্রের ভাষায় প্রায় 'অচল অবস্থা'। কাঁচা বাজারের বরাদ্দ ছিল দিনে দেড় টাকা। আগের সপ্তাহ থেকেই কেটে ছেঁটে তাকে আঠের আনায় নামিয়ে এনেছিল প্রিয়তোষ, এবার একেবারে চৌদ্দ আনায় টেনে আনল। একবেলা আমিষ, একবেলা নিরামিষ এই চলছিল দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। এবার মাছটি একেবারে ছাঁটাই করতে

পারলেই ভালো হয়। কিন্তু কুন্তলার তাতে ঘোর আপত্তি। 'তাহ'লে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াও ছেলেমেয়েদের। আমি পারব না। দুধ নেই, ঘি নেই, দু'বেলা দু'টুকরো মাছ তাও যদি তোমার না সয়—।' ভারী ঝামেলা বিন্তু আর মিনুকে নিয়ে। মাছ ছাড়া একবেলাও চলবার জো নেই ওদের। নিজে কোন দিন মাছ খায়, কোন দিন খায় না কুন্তলা। নিজের ভাগের খণ্ডটুকু দ্বিখণ্ডিত করে ছেলেমেয়ের নৈশ ভোজের জন্য তুলে রাখে। কিন্তু ঔদার্য প্রিয়তোষেরও কি কম। পাতে মাছের অর্ধেকটা তরকারি দিয়ে ঢেকে সেও রেখে যায় বাটির মধ্যে। দেখতে পেলে কুন্তলা ভারী রাগ করে।

দু'বেলা খাওয়ার পর দু'বেলা দু'টি সিগারেট খাওয়া প্রিয়তোষের বিলাস। মাসের শেষের দিকে এসে একটা কমায়। অফিস থেকে ফেরার সময় হাঁটে। পরিচিত কেউ সঙ্গে থাকলে বলে, 'পয়সা দিয়ে গাড়ীর ভিড় ঠেলার চাইতে বিনা পায়সায় রাস্তার ভিড় ঠেলা অনেক ভালো।'

তবু এত কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও মাসের শেষে অবস্থা অচল হয়ে পড়ল। মেয়ের অসুখে ওষুধে ডাক্তারে গোটা দশেক টাকা বেহিসেবী ব্যয় হয়ে গেছে। জ্বরটা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল, সময় মত ডাক্তার না দেখালে আরো খরচান্ত হতে হত।

সকাল বেলা বাজারের জন্য একটি টাকা হাতে দিয়ে কুন্তলা বলল, 'এই কিন্তু শেষ সম্বল। যেভাবে পাবো অফিস থেকে ফেরার সময় কিছু জোগাড় করে নিয়ে এস। নইলে কাল আর হাঁড়ি চড়বে না বলে দিচ্ছি।'

'না চড়ে না চলল', জবাব দিল প্রিয়তোষ। তারপর একটু চুপ করে থেকে স্ত্রীর আরও কাছে এসে গলা নামিয়ে প্রিয়তোষ ফিস ফিস করে বলল, 'এবার চাওনা টাকাটা ওদের কাছে।' পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল প্রিয়তোষ।

কুন্তলা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, 'ইস বয়ে গেছে আমার, কেন, তোমার মুখ নেই, তুমি চাইতে পারো না, দাতাগিরি ফলাবার সময় মনে ছিল না তখন ? এখন আদায়ের বেলায় বুঝি এই দত্তের ঝি ? হাত পেতে নিলে ওরা যে হাত উপুড় করতে জানে না তাতো জানা কথা।' প্রিযতোষ বলল, 'আঃ আস্তে, শুনতে পাবে।' কুন্তলা বলল, 'পায় তো পাক, অত ভয় কিসের, তবে যে বলেছিলে চাও গিয়ে টাকাটা, নিজের মান সম্মান খুব বাঁচাতে শিখেছ—আমার তো আর কোন মান সম্মান নেই।'

প্রিয়তোষ গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা বেশ, আমিই চাইব। তোমাকে চাইতে হবে না।'

আকারে ইঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রিয়তোষ আগেও বারকয়েক চেয়েছে। কিন্তু কি ক্ষিতীশ, কি তার স্ত্রী সবাণী কেউ যেন ইশারা বোঝে না। অসাধারণ ওদের না বুঝবার ক্ষমতা, কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় কি করেই বা চাওয়া যায় টাকাটা, চাইলেও যে পাওয়া যাবে না একথা ঠিক। অথচ মানটুকু খোয়াতে হবে।

দেওয়ার সময় অযাচিত ভাবেই টাকাটা প্রিয়তোষ ধার দিয়েছিল ক্ষিতীশকে। নিকটতম প্রতিবেশী ক্ষিতীশ ! যাকে বলে 'পরবর্তী দরজার'। আর সে দরজা পাশের বাড়ির না, পাশের ঘরের। দোতলায় বাড়িওয়ালা বিধুবাবু নিজে থাকেন সপরিবারে। একতলার ভাড়াটে ক্ষিতীশ আর প্রিয়তোষ। দু'জনেরই একখানা করে শোয়ার ঘর, একখানা রান্নার। এজমালী কল, চৌবাচ্চা, পায়খানা, ছাদ। একই দড়িতে দুই পরিবারের ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি, শেমিজ, জামা প্যান্ট শুকোয়। একই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে চটি পায়ে দিয়ে দু'জনে বাজারে বেরোয়। বাঁ হাতে থলি, ডান হাতের দু'টি আঙুল ঠোঁটের জ্বলন্ত বিড়িতে আটকা থাকে। রেশন আনবার দিন একই দোকানের সামনে একই সারিতে দু' তিনটে থলি হাতে সপ্তাহে ঘণ্টা দেড়েক করে দু'জনে দাঁড়ায়। সাড়ে ন'টার মধ্যে নাকে মুখে ভাত তরকারি গুঁজে দু'জনেই ছুটতে ছুটতে বাসের হ্যান্ডেল ধরে। কোন দিন ভিতরে ঢোকে, কোনদিন সারাটা পথই ঝুলতে ঝুলতে অফিসে গিয়ে পৌঁছায়। প্রিয়তোষ সরকার আর ক্ষিতীশ মজুমদার। জাতে একজন কায়স্থ আর একজন ব্রাহ্মণ। কিন্তু আভিজাত্যে দু'জনেই সমান।

তবু ইদানীং একটু উনিশ বিশ শুরু হয়েছিল। দু'তিন মাস ধরে অফিসের মাইনে নিয়ে ভারী গোলমাল হচ্ছিল ক্ষিতীশের। মাসিক বাড়ি ভাড়া, সাপ্তাহিক রেশনের দিন, প্রাত্যহিক বাজারের সময় যেমন নিয়ম বেঁধে আসছিল, অফিসের মাইনে তেমন নিয়ম মেনে চলছিল না। সাত তারিখে দিন ছিল মাইনের কিন্তু সরতে সরতে সাতাশে গিয়ে তিরিশে পেরিয়ে পরের মাসে গিয়ে পৌঁছতে শুরু করেছিল। কেবল তাই নয়। কোন মাসে মাইনের শতকরা ষাট ভাগ, কোন মাসে আধাআধি নিয়েও ফিরতে হচ্ছিল ক্ষিতীশকে, যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর একাউন্ট্যান্টের কাজ করে ক্ষিতীশ, ব্যাঙ্ক ফেল, মন্দা বাজার এবং ডিরেক্টরদের অব্যবসায়ী বুদ্ধির ফলে সে কোম্পানী উঠি উঠি করছিল। সব টের পেয়েও নানারকম চেষ্টা চরিত্র করে ক্ষিতীশ ঠিক ছেড়ে যেতে পারছিল না।

সব খবরই কানে আসত প্রিয়তোষের। অবশ্য কানে যাতে না আসে পারতপক্ষে সেই চেষ্টাই করত। ব্যাঙ্কের বাঁধা মাইনের চাকরি। তিন বছর কাজের পর পঁচানব্বইতে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্ন বস্ত্রের সমস্যায় নিজেই অস্থির। প্রতিবেশীর অভাব অভিযোগে চোখে ঠুলি আর কানে তুলো না গুজলে আত্মরক্ষার উপায় নেই। নিজেও তো এমন কিছু শান্তিতে নেই প্রিয়তোষ। তেল, কয়লার ব্যয় বাহুল্য নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দু-চার দিন বাদে বাদেই বচসা হয়। চিনি নিয়ে রাত দুপুরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে আলাপ চলে একেকদিন, তার স্বাদ চিনির মত নয়। নৈশ দাম্পত্য আলাপ ইদানীং আদির চেয়ে বীর আর রুদ্ররসেই বেশী সরস হয়ে উঠে। পরের হাঁড়ির খবর রেখে লাভ নেই। তাতে নিজের হাঁড়ি ভাঙবার আশঙ্কা আছে। রাতদিন কেবল হিসাবের ওপর চলে প্রিয়তোষ। অফিসে হিসেবের কাজ, বাড়িতেও সেই হিসেবের ফিসফিসানি।

তবু পূজার সময় ষষ্ঠীর দিন ভারী একটা বেহিসেবী কাজ করে বসল প্রিয়তোষ ! পূজার বাজারে বেরুবার আগেই হিসেবটা ঠিকই রেখেছিল কিন্তু ফিরে এসে আর রাখতে পারল না।

গত বছর তবু এক মাসের বোনাস দিয়েছিল কোম্পানী, এবার মন্দা বাজারের দোহাই পেড়ে শুধু মাইনে দিয়েই হাত গুটিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ছেলে মেয়ের পুজোর জামা জুতোর বেলায় তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। বিশেষ করে সাতদিন আগে থেকে রাতদিন খোঁচাবার জন্য যখন অগাধ অপত্যস্নেহ নিয়ে কুন্তলা রয়েছে ঘরে। ফর্দ তার আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। বিন্তুর জন্য হাওয়াই শার্ট আর মুজাই জুতো। মিনুর জন্য সিল্কের ফ্রক। প্রিয়তোষ বলেছিল, 'বেশ, তবে বিন্তু আর মিনুর মার জন্য কিন্তু এবার বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসব শুধু শূন্য হাতে।'

কুন্তলা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, শূন্য হাতকে কোনদিন ভয় করেছি না কি যে অত ভয় দেখাচ্ছ।'

বাজার করবার জন্য ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই বেরুল প্রিয়তোষ, মাস কয়েক আগে থেকেই দু' চার টাকা করে যা জমিয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে তুলে পকেট পুরে এনেছিল আগের দিন। কুন্তলার সব বাক্স ট্রাঙ্ক কৌটা ঝাড়াঝাড়ি করেও মিলল গোটা পনের টাকা। সস্তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের জামা হল, জুতো হল, কুন্তলার জন্য প্রথমে কিনল সাবান, স্নো, পাউডার তারপর ধাঁ করে পনের টাকা দিয়ে একখানা শাড়িই কিনে ফেলল। গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা সারা হল এবারের মত। ট্রাম বাসে বড় ভিড়। মনের আনন্দে বউবাজারের মোড় থেকে একটা রিকশাই ডেকে ফেলল প্রিয়তোষ, প্যাকেটগুলি বগলে চেপে ছেলে মেয়ের দু' হাত ধরে রিকশায় টেনে তুলে নবাবী সুরে হুকুম দিল, 'চল, তালপুকুর রোড, জলদি চল।' বিন্তু আর মিনুর মনেও ভারী ফুর্তি, দোকানেই দু'জনে বেশবাস-বদলে ফেলেছে, বাড়ি আসা পর্যন্ত সবুর সয়নি। নতুন হাওয়াই শার্টের দিকে বিন্তু বাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে না বাবা ?'

প্রিয়তোষ বলল, 'চমৎকার।'

মিনু বলল, 'আর আমাকে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'অপূর্ব। তারপর মৃদু হেসে সিগারেট ধরাল।

ঠুংঠুং করে রিকশা চলছে।

বিন্তু আবার বলল, 'গোলাপী রঙই সবচেয়ে ভালো না বাবা ?'

শার্টের গোলাপী রঙই পছন্দ হয়েছে বিন্তুর। প্রিয়তোষ হলদে রঙের একটা শার্ট তার জন্য

বেছেছিল। কিন্তু আট বছরের বিল্টু মাথা নেড়ে নাকচ করেছে,—'তুমি রঙ চেন না বাবা।'

শেষ পর্যন্ত বিল্টুর মতেই সায় দিয়েছে প্রিয়তোষ।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ।

ছেলের গোলাপী রঙের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ আর একবার বলল, 'খুব ভালো, গোলাপী রঙের মত রঙ আছে নাকি সংসারে ?'

কিন্তু রঙটা বদলে গেল বাড়ির ভিতরে ঢুকে। দোরে রিকশা এসে থামবার সঙ্গে সঙ্গে নানু আর কানুও দৌড়ে এসেছিল। ক্ষিতীশের দুই ছেলে। বিল্টু মিনুর খেলার সঙ্গী। রিকশার কাছে দাঁড়িয়ে নানু বলল, 'কিরে নতুন জামাজুতো এল বুঝি তোদের ?'

বিল্টু সোল্লাসে বলল, 'হ্যাঁ ভাই। দেখেছিস জামার রঙ ? গোলাপী রঙই সবচেয়ে ভালো না রে নানু ? তোরা যখন জামা কিনতে যাবি এই রঙের জামা কিনতে বলিস কাকাবাবুকে, দোকানে এখনো আছে।'

নানু ম্লান মুখে বলল, 'থাকলে কি হবে। আমাদের জামা এবার আর আসবে না। অফিস থেকে টাকা পায়নি কিনা বাবা, এই কানু, হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন অমন করে, আয় ঘরে আয়। গোলাপী রঙ আবার একটা রঙ নাকি। দূর, দূর।'

বিল্টুর চাইতে বছর দেড়েকের বড় নানু। বুদ্ধিতে পাকা। ছোট ভাইর হাত ধরে সে টেনে নিয়ে গেল ঘরে।

বিল্টু একটুকাল মুখ কালো করে চুপ করে রইল,তারপর বলল, 'দেখলে বাবা, কি ভীষণ হিংসুটে নানুটা, ওদের নিজেদের জামা জুতো হবে না কিনা তা—'

মিনু মাথা নেড়ে বলল, 'না দাদা। তোর গোলাপী রঙটাই খারাপ, আমি তখনই বললুম—। কি বল বাবা, আমরা তো তখনই বলেছিলুম তাই না ?'

প্রিয়তোষ গম্ভীর বুখে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে, যাও এবার ঘরে যাও।'

খানিকক্ষণ আগেও নিজেকে মহাসুখী মনে হয়েছিল প্রিয়তোষের এখন তার আর চিহ্নমাত্র রইল না। না ! নির্ভেজাল সুখ আর কপালে নেই মানুষের।

প্যাসেজটুকু পার হবার সময় কানে গেল ক্ষিতীশের স্ত্রী সবর্ণী শাসন করছে ছেলেদের, 'যেমন হ্যাংলা ঘরে জন্মেছিস, তেমন তো হবি। সাতজন্মেও দেখিনি বাপু তোদের মত ছেলে। জামাজুতো এর আগে কোন দিন পরোনি, না ?'

কান্নাভরা গলা ভেসে এল নানুর, 'হুঁ, কত দিয়েছ জামাজুতো, পুজোর সময় সবাই জামা পরবে, জুতা পায়ে দেবে। বিল্টু মিনু সবাই। আর আমরা বুঝি—'

কান্নার আবেগে গলা বোধ হয় বুজে এল নানুর।

সবর্ণীর গলাও এবার অন্য রকম শোনা গেল, 'আমি কি করব। যেমন কপাল করে এসেছিস, যেমন ঘরে জন্মেছিস তেমন তো হবে। নইলে পুজোগণ্ডার দিনে কতজনে কত সাধ আহ্লাদ করে, আর আমার—।'

প্রিয়তোষ আর দাঁড়াল না। গম্ভীর মুখে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ছেলে মেয়ের জামা জুতো, প্যান্ট আর নিজের শাড়ি টয়লেট দেখে ততক্ষণে ভারী খুশী হয়ে উঠেছে কুন্তলা। স্বামীকে দেখে বলল, 'আহহা, শাড়ি আবার কিনতে কে বলল তোমাকে। যা আছে তাতেই তো হত। বাপের বাড়ি থেকেই তো একখানা পাব। আবার কেন মিছামিছি—'

প্রিয়তোষ বলল, 'আচ্ছা, ক্ষিতীশবাবু গেলেন কোথায়।'

কুন্তলা বলল, 'খানিকক্ষণ আগেও তো ঘরেই ছিলেন। সবর্ণীদির মুখের চোটে না থাকতে পেরে দাবায় গিয়ে বসলেন বোধ হয়। তোমাদেরও বলি, আচ্ছা কি করে এ সময় তোমাদের দাবা খেলা আসে বল দেখি। ছেলে দুটো জামা জামা করে কাঁদছে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'ওদের জন্য তোমার কি খুব দুঃখ হচ্ছে কুন্তলা ?'

কুন্তলা বলল, 'আহাহা। ও কথা আবার জিজ্ঞাসা করে নাকি। ছেলে মেয়ে তো আমাদেরও হয়েছে। বুঝি তো সব।' মতলবটা আগেই ঠিক করে রেখেছিল প্রিয়তোষ। এবার বলল, 'বোঝ যদি

তাহলে এক কাজ করো। মাইনের টাকায় তো এখনও হাত পড়েনি। ওর থেকে গোটা পঁচিশেক টাকা আমাকে বের করে দাও।'

কুন্তলা স্বামীর চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'চেয়েছেন না কি ?'

প্রিয়তোষ বলল, 'চাইতে কি পারে ? তুমি আমি পারতাম ? যাদের আর কিছু নেই কুন্তী, অহংকারটুকু ছাড়লে তাদের আর বাকি থাকে কি।'

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বাক্স খুলে পাঁচ টাকার পাঁচখানা নোট বের করে দিল স্বামীর হাতে। প্রিয়তোষ বলল, 'এক কাজ করো। গোপনে তুমিই দিয়ে এস না ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রীর হাতে।'

কুন্তলা বলল, 'না বাপু আমার লজ্জা করে। শেষে যদি কিছু মনে করে বসে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'আচ্ছা তাহলে আমার কাছেই দাও।'

কুন্তলা বলল, 'খুব বলে কয়ে বুঝে শুনে দিও কিন্তু। মনে যেন কোন রকম দুঃখ না পায়।'

'সে তোমাকে বলতে হবে না।' বলে প্রিয়তোষ নোট ক'খানা হাতের মুঠির ভিতর লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। মনে মনে ভাবল মেয়েছেলের হাতে টাকা দেওয়াটা ভালো দেখাবে না। ক্ষিতীশবাবুকেই খুঁজে বের করতে হবে।

কাছেই পাওয়া গেল ক্ষিতীশকে। সামনের গলির রোয়াকে বসে দাবা খেলছে বীরেন দাসের সঙ্গে। প্রিয়তোষ একপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বীরেন বলল, 'এই নাও কিস্তি। আর নড়ন চড়ন নেই। একেবারে মোক্ষম। আজ হল কি তোমার মজুমদার ? বার বার তিন বার একেবারে গো হার হারলে। সাত দিনের মধ্যে আর মাছ মাংস মেয়ে মানুষ ছুঁয়ো না বুঝেছ ?'

প্রিয়তোষ বলল, 'ক্ষিতীশবাবু, দয়া করে একবার আসবেন একটু।'

ক্ষিতীশ উঠে এসে বলল, 'ব্যাপার কি।'

প্রিয়তোষ বলল, 'চলুন কথা আছে।'

খানিক দূরে নিরালায় একটা নারকেল গাছের আড়ালে ডেকে নিয়ে প্রিয়তোষ বলল, 'এই যে দেখুন, কিছু মনে করবেন না। এতদিন এক জায়গায় আছি। তা ছাড়া বলতে গেলে আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

ক্ষিতীশ একটু বিস্মিত হয়। দিন দুয়েক ধরে কথা বন্ধ দুই পরিবারে। চৌবাচ্চার জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল সবর্ণী আর কুন্তলার মধ্যে। সেই বিবাদ মীমাংসা করতে এসে নিজেরাই কথা কাটাকাটি শুরু করেছিল ক্ষিতীশ আর প্রিয়তোষ। শেষে কথা বন্ধ।

ক্ষিতীশ বলল, 'তা তো বটেই। বয়সে দু তিন বছরের বড়ই হব আপনার চাইতে। তাই কি।'

প্রিয়তোষ একটু ইতস্তত করে বলল, 'তাই বলছিলাম কি, মানে আমাদের বিন্তু মিনুও যা নানু কানুও তাই। ওদের জন্যেই যা ঝামেলা, নিজেদের জন্য কে এত মাথা ঘামায় মশাই। তাই বলছিলাম এই পঁচিশটা টাকা—'

মুঠি খুলে নোটগুলি এবার এগিয়ে ধরল প্রিয়তোষ।

ক্ষিতীশ যেন একটু হক চকিয়ে গেল, 'টাকা দিয়ে কি হবে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'কি আবার হবে মশাই। পঁচিশ টাকায় এখনকার দিনে কি হয় তা কি আর বুঝিনে ? বাজার তো দেখে এলুম স্বচক্ষে। ছেলেদের দুটো হাওয়াই শার্ট আপনি টাকা দশেকের মধ্যে পাবেন। আর বউদির জন্য—'

ক্ষিতীশ একবার নিঃশব্দে প্রিয়তোষের চোখে চোখে তাকাল। প্রিয়তোষ দেখে আশ্বস্ত হল, ক্রোধ দ্বেষের লেশ মাত্র নেই ক্ষিতীশের, চোখ দুটি কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করছে।

ক্ষিতীশ বলল, 'কিন্তু—'

প্রিয়তোষ বলল, 'না, আপনার কোন কিন্তু টিন্তু আজ আর শুনব না দাদা। তা ছাড়া সঙ্কোচের কি আছে, ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক খুললে মাইনের বাকিটা তো আপনিও পেয়ে যাবেন। কতদিন আর আটকে রাখতে পারবে। তখন দেবেন, এ মাসে না হয় ওমাসে ; কোন সঙ্কোচ করবেন না আপনি।'

নোট ক'খানা গুঁজে দিয়ে ক্ষিতীশের লোমশ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল

প্রিয়তোষ, বলল, 'না করতে পারবেন না দাদা।'

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব করল প্রিয়তোষ।

স্বল্পভাষী ক্ষিতীশ কৃতজ্ঞতা জানাতেও জানে না, কিন্তু চতুর্গুণে তার ক্ষতিপূরণ করল সবর্ণী আর নানু কানুরা। ঘণ্টা দুই বাদে নতুন হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে নানু কানু এসে দাঁড়াল প্রিয়তোষের সামনে, 'আমাদের জামা কেমন হয়েছে দেখুন কাকাবাবু।'

প্রিয়তোষ হেসে বলল, 'বেশ হয়েছে। কিন্তু তোমরা সবাই যে একেবারে গোলাপ গুলিয়ে এসেছ। ব্যাপারখানা কি?'

নানু আর কানু একসঙ্গে হেসে উঠল, 'বাজারে যাওয়ার সময় বিন্তু আমাদের কানে কানে গোলাপী রঙের কথা বলে দিয়েছিল তা জানেন?'

প্রিয়তোষ বলল, 'ও, তাই বুঝি। তা তোমরা সবাই তো রঙে রঙে একাকার হয়ে উঠলে, আর আমিই রইলাম কেবল বেরঙা মানুষ।'

ছেলেরা সরে গেলে সবর্ণী এসে বলল, 'বিনয়ে আর দরকার নেই ঠাকুরপো। খুব হয়েছে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'বিনয় আবার কোথায় দেখলেন। আলকাতবার গোলা গায়ে মেখে জন্মেছি; যে দেখে সেই বলে।'

সবর্ণী হেসে উঠল, 'কথা শোন। আহাহা কি আফসোস। বাইরে আলকাতরা হলে হবে কি, ভিতরে যে একেবারে সাত রঙের কারখানা বসিয়ে ছেড়েছেন। নইলে রসিয়ে রসিয়ে অমন করে কি কেউ কথা বলতে পাবে?'

কুন্তলা এসে বলল, 'বাজে কথায় আসল কথা লুকাও কেন বাণীদি, শাড়িখানা এনে দেখাও।'

'দেখাই ভাই, দেখাই! দুটো কথা বলছি তো অমনি হিংসে।'

তারপর প্রিয়তোষকে শাড়িও এনে দেখাল সবর্ণী। কেনা-কাটায় বেশ পটুতা আছে ক্ষিতীশের—এরই মধ্যে চওড়া খয়েরি পেড়ে মিলের শাড়িও একখানা কিনে এনেছে স্ত্রীর জন্য।

সবর্ণী বলল, 'দেখুন দেখি কি কাণ্ড মানুষের। আমার জন্য আবার এসব আনবার কি দরকার ছিল।'

খানিক বাদে এক কাপ চা নিয়ে এল সবর্ণী, 'দেখুন দেখি ঠাকুরপো, ঠিক মত চিনি হয়েছে নাকি?'

প্রিয়তোষ বলল, 'আপনার হাতের চা-ই যদি খেলাম, তাহলে চিনি দিয়ে খাব কেন। কিন্তু এই অসময়ে আবার চা।'

সবর্ণী বলল, 'এবার নিন। কত সময় অসময় মানেন আপনারা।' বলে, কি যেন এক গভীর অর্থ জ্ঞাপন করে প্রিয়তোষের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ মুচকে হাসল সবর্ণী।

টাকার কথাটা কেউ মুখ ফুটে বলল না। কিন্তু প্রিয়তোষেব বুঝতে বাকী রইল না সবর্ণী সব জেনেছে বুঝেছে, প্রিয়তোষের সৌজন্যে কৃতার্থ হয়েছে।

পুজোটা মিলে মিশে বেশ কাটল। পাড়ার মধ্যে সার্বজনীন দুর্গোৎসব তিনজায়গায়। ঘব গৃহস্থালী গুছিয়ে একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে সবাই দেখে বেড়াল। ছেলে পুলে নিয়ে আগে সবর্ণী আর কুন্তলা। পিছনে ক্ষিতীশ আর প্রিয়তোষ। বিজয়ার দিন কোলাকোলি করতে গিয়ে পরস্পরকে দু'জনে জড়িয়ে ধরল। সবর্ণী চা আর নিজের হাতের তৈরী নাড়ু এনে দিল প্রিয়তোষের হাতে। প্রিয়তোষ দোকান থেকে তিন টাকার খাবার আনিয়ে সবর্ণীদের আপ্যায়ন করল। কোজাগরী পূর্ণিমায় ঘর দোর ভরে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকল সবর্ণী আর কুন্তলা। যার যার তার তার নয়। একজন আর একজনের। ছাদের ওপর নারকেল গাছের পাতায় পাতায় আকাশ থেকে জ্যোৎস্না ঢলে পড়ল। ঘরের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের গোপন কাহিনীর বিনিময় করতে গিয়ে গলাগলি ধরে হাসিতে ঢলে পড়ল দুই সখী।

কিন্তু তারপর শুরু হল কৃষ্ণপক্ষ। শোনা গেল ইতিমধ্যে অফিস থেকে মাইনের বাকি টাকাটা পেয়ে গেছে ক্ষিতীশ। ব্যাগে টাকা এল কি না এল, মানুষের বাজারের থলি দেখলেই তা বোঝা যায়। তিন টাকা করে পোনা মাছের সের। প্রিয়তোষ ধারে ঘেঁষতে সাহস পেল না। দু' টাকা দরের

চিংড়ি মাছ নিল একপো। কিন্তু আশ্চর্য, ক্ষিতীশ দিব্যি দেড়পো পোনা মাছ কানিতে বেঁধে থলির মধ্যে ফেলে দিল। উচিত নয় বুঝেও মনে মনে কেমন একটু ক্ষুণ্ণ হল প্রিয়তোষ। একসঙ্গে না পারে নাই পারল, গোটা দশেক টাকা অন্তত ক্ষিতীশ দিলেও পারত। কারো অবস্থাই তো কারো অজানা নেই। ঝোঁকের মাথায় পুজোর সময় বেশী খরচ করে ফেলে বড় বেকায়দায় পড়ে গেছে প্রিয়তোষ। অতটা না করলেও চলত। পরদিন দেখা গেল প্রিয়তোষের বেগুনের চাইতে ক্ষিতীশের বেগুন আকারে বেশ একটু বড়। বছরের নতুন আলুও আগে খেল ক্ষিতীশ।

কুন্তলা খবর দিল, 'জানো সবণীদিরা আজ আধ সের গাওয়া ঘি রেখেছে। ছ'টাকা করে সের। ক্ষিতীশবাবুর জন দুই গায়ক বন্ধু এসেছিলেন। সবণীদি বললেন শত হলেও তাঁদের তো আর দালদার লুচি খাওয়ানো যায় না।'

ঘুম পাচ্ছিল, প্রিয়তোষ শিউরে জেগে উঠল, 'গাওয়া ঘি! বল কি।' তারপরেই অবশ্য লজ্জিত হয়ে উত্তেজনাকে দমন করল প্রিয়তোষ।

কুন্তলা বলল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার মত বেকুব তো সবাই নয়। মাসের আগে ভাগে সব খরচ করে—শেষে এখন মুখ শুকিয়ে থাকা। আধসের করে দালদা রাখতুম তাও তোমার সহ্য হল না। এদিকে শুকনো শুকনো রুটি তো বিন্তু মিনু খেতে চায় না। চিনির বেলায়ও তো তুমি সমান কঞ্জুস।'

প্রিয়তোষ বলল, 'হুঁ।'

আগে আগে সব খরচ হয়ে গেছে। কোন দফায় বেশী খরচ হল তা মুখ ফুটে কি কুন্তলা কি প্রিয়তোষ কেউ কাউকে বলল না বটে কিন্তু অকথিত এবং ভদ্রলোকের অকথ্য সেই তথ্যটুকু মনের মধ্যে গরম তেলের মত ফুটতে লাগল।

ভাঁটার টান পাশের ঘরেও শুরু হয়েছিল। কথা তো মানুষ কেবল মুখ দিয়েই বলে না, চোখের চাউনি দিয়ে বলে, চলন দিয়ে বলে, এমন কি গায়ের গন্ধেও যেন মনের ঝাঁজ বের করে দিয়ে ছাড়ে। ক্ষিতীশের আর সবণীর বুঝতে কিছুই বাকি ছিল না।

হাতের তলায় মাথা রেখে ক্ষিতীশ অর্থচিন্তায় ব্যস্ত—সবণী এসে পাশে দাঁড়াল, 'দেখ, আগে এসব জিনিস আমি বিশ্বাস করতাম না। এবার করতে হল।' ক্ষিতীশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ সব সে সব নয়, আমি সব জিনিসেই বিশ্বাস হারিয়েছি। ভূমিকা ছেড়ে কি বলছিলে বল।'

ধমক খেয়ে সবণী ঘাবড়াল না। কি করে যেন টের পেল তার বিশ্বাস আর ক্ষিতীশের অবিশ্বাস মূলত এক। তার কথায় ক্ষিতীশ খুশী ছাড়া অখুশী হবে না। সবণী স্বামীর আরো কাছে ঘেঁষে এসে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'মা বলতেন মানুষের চোখেও বিষ থাকে। আগে বিশ্বাস করতুম না, এবার টের পেলুম সত্যি থাকে।'

ক্ষিতীশ অদ্ভুত একটু হাসল, 'থাকে নাকি? কি করে টের পেলে?'

সবণী বলল, 'সেদিন যখন ঘি রাখি না, কুন্তলা এমন আদেখলার মত চেয়ে ছিল যে তখনই বুঝেছিলুমি কিছু একটা ঘটবে। সেই লুচি খাওয়ার পর থেকে নানুর কানুর দু'জনেরই পেটের অসুখ হয়েছে।'

ক্ষিতীশ বলল, 'ছিঃ, অসময়ে ওরা উপকার করেছে, সে কথা ভুলো না।'

মুখে বলল বটে কিন্তু বাজার নিয়ে আসবার সময় প্রিয়তোষের তাকাবার ভঙ্গিটা তার চোখের সামনে আর একবার ভেসে উঠল। আশ্চর্য, একটি কথা ছাড়া প্রিয়তোষের চোখে আর কোন কথা নেই। 'ক্ষিতীশ, তুমি পঁচিশ টাকা ধারো আমার কাছে। তা শোধ না দেওয়া পর্যন্ত তোমার একদিন একটু ভালো মাছ কিনবার অধিকার নেই, নতুন তরকারি কিনবার অধিকার নেই। অধিকার নেই বিড়ির বদলে শখ করে একটা সিগারেট ধরাবার, ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে অত্যন্ত ভিড় দেখেও তোমার ক্ষমতা নেই ফার্স্ট ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।'

না, মনের দুর্বলতায় প্রিয়তোষের কাছ থেকে ধারটা নিয়ে ফেলে ভারী বেয়াকুবিই করে ফেলেছে ক্ষিতীশ। এমন ক্ষুদ্র মহাজন নিয়ে অনুক্ষণ বাস করা অসম্ভব। ধারে কাছের কারো কাছ থেকে ধার করাটা এতদিন প্রিন্সিপলের বাইরে ছিল ক্ষিতীশের। এবার নীতিচ্যুতির মজাটা টের পাচ্ছে ক্রমশ।

সবাণী বলল, 'শুধু আকাশ পাতাল ভাবলে হবে না। ওদের দেনাটা এবার দিয়ে ফেল। এমন মাথা নিচু করে থাকা দিনরাত ভালো লাগে না।'

ক্ষিতীশ বলল, 'দিলেই পারো। টাকা তো এনে তোমার কাছেই দিই।'

সবাণী বলল, 'আহাহা, কত টাকাই আনো বাক্স সিন্ধুক বোঝাই করে। অফিস থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে চেয়ে চিন্তে যে দশ পনের টাকা আনো তাতো রেশন আর বাজারেই শেষ হয়ে যায়। একটি পয়সা এদিক ওদিক করবার জো থাকে নাকি তার থেকে যে দেনা শোধ দেবে ?'

সে কথা ঠিক, তবু টাকা হাতে এলে অন্তত দশটা টাকা প্রিয়তোষকে দেবার কথা না ভেবেছে তা নয়, না হয় এক সপ্তাহ বাজার নাই বা হল, নুন ভাত খাক বউ ছেলেরা। বজায় থাকুক মান-সম্মান। কিন্তু কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া আংশিক দেনা শোধের পদ্ধতিটাও মনঃপূত হয়নি ক্ষিতীশের। মাত্র পঁচিশটি তো টাকা। এক থোকে যেমন নিয়েছে, তেমনি এক থোকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই মান থাকে। মাঝে মাঝে একথাও ক্ষিতীশ ভেবেছে যে অন্য কারো কাছ থেকে চেয়ে এনে প্রিয়তোষের টাকাটা পরিশোধ করে। কিন্তু নতুন কে এমন আছে যার কাছে হাত পাতবে। বরং সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে পুরনো বন্ধুদের হাতেই কিছু কিছু টাকা এখন ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। দু' একজন তো মুখ ফুটে তাগিদ দিতেই শুরু করেছে।

দ্বিতীয় মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুখ প্রিয়তোষদেরও ফুটল।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী মন্দাকিনী আর কুন্তলা একসঙ্গে ঢুকেছে বাথরুমে। আলাপের আভাস পেয়ে সবাণী দোরের বাইরে থমকে দাঁড়াল।

'চক্ষুলজ্জা বড় বালাই দিদি। ও জিনিসটা যাবা চোখ থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে তাদের আর মার নাই। ছেলেটার এত অসুখ গেল। ডাক্তারে ওষুধে কত খরচ। কেউ একবার শুধোল না দিদি, তোমরা কি দিয়ে কি করছ।'

পুজোয় কেনা ঠাণ্ডা গন্ধ তেলের কিছু অবশিষ্ট ছিল। সেইটুকু মাথায় মেখে গামছা হাতে স্নান করতে এসেছিল সবাণী। তেলটুকুতে সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল।

কুন্তলা বেরিয়ে যাওয়ার পর সবাণী ঢুকল বাথরুমে। মন্দাকিনীর কাপড় কাচা তখনো শেষ হয়নি।

ছাদে ভিজে শাড়ি মেলতে যাওয়ার সময় সিঁড়ির গোড়ায় পা টিপে টিপে কান খাড়া করে একবার দাঁড়াল কুন্তলা। সবাণীর গলার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, 'মানুষের জিভ তো মন্দাদি কেবল মিষ্টি তেতো চেখে দেখবাব জন্যই তৈরী হয়নি। তার আরো গুণাগুণ আছে। সত্যি কথাটা জিভ দিয়ে যেমন সহজে বেরোয়, মিথ্যেটা তেমন বেরোয় না। জিভে আপনিই আটকে আটকে যায়। তা যাদের যায় না মন্দাদি, তারা বড় সুখী সংসারে।' একটু থেমে দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রাঞ্জল করল সবাণী, 'আচ্ছা, আপনারাও তো দেখেছেন দিদি, নিজের ঘর সংসার ফেলে দুপুরে দুপুরে দু'দিন গিয়ে বাতাস করেছি মেয়ের মাথার কাছে বসে। এই আক্রাগণ্ডার বাজারে একদিন বেদনা, আর একদিন কমলালেবু এনে দিয়েছেন উনি। তবু নাকি কেউ কাউকে শুধোয় না। এ বাজারে এর চেয়ে বেশী তত্ত্ব-তালাস করবার কার সাধ্য আছে বলুন তো।'

আড়ালে আবডালে এ সব চললেও তৃতীয় সপ্তাহে সামনা সামনি মৌখিক সৌজন্যটা মোটমুটি বজায় রইল। থলি হাতে প্রিয়তোষ বাজারে বেরুবার সময় উনোনের পাশে সবাণীকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'রাঁধতে বসে গেছেন বুঝি বৌদি।'

সবাণী মুখে হাসি টেনেই জবাব দেয়, 'হ্যাঁ ভাই। বাজারের বেলা হয়ে গেল বুঝি আপনাদের ?'

কোন দিন সবাণী আগে ভদ্রতা করে, মুলোর জোড়া কত করে আনলেন ঠাকুরপো ?'

প্রিয়তোষ স্মিত হাস্যেই বলতে চেষ্টা করে, 'আর বলবেন না বউদি, এই তো এইটুকু এইটুকু মুলো, এরই জোড়া ছ' পয়সা। শুনলে সংসারের মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।'

এখনও রস আছে প্রিয়তোষের কথায়। কিন্তু ঝাঁজটা যেন কেমন কেমন। হাসি আসতে চায়নি সবাণীর। তবু হাসতে হয়।

মুখোমুখি নিজেরাও সৌজন্য রাখতে চায় কুন্তলা আর সবণী। কুন্তলা বলে, 'এসো না দিদি, পান খেয়ে যাও একটু।'

সবণী ভারী মিষ্টি করে জবাব দেয়, 'না ভাই পান ছেড়ে দিয়েছি। সে দিন চুনে ভারী মুখ পড়ে গিয়েছিল।'

কুন্তলা মনে মনে জ্বলে। হুঁ যত দোষ চুনের। মানুষেব মুখের যেন আর কোন দোষ নেই।

বাসে ট্রামে দু'জনের দেখা হয়ে গেলে ভদ্রতা দেখাতে এককে দিন এখনও সাধ যায় প্রিয়তোষ আর ক্ষিতীশের।

প্রিয়তোষ হয়ত বলে, 'কন্ডাক্টর দো টিকিট এক আনাওয়ালা।'

ক্ষিতীশ বাধা দিয়ে নিরস্ত করে, 'না না না প্রিয়তোষবাবু, আমিই নিচ্ছি।' মনে মনে ভাবে, 'পঁচিশ টাকাই হজম করতে পারছে না, এরপর আরো?'

জোর করেই দু'খানা টিকেট নিয়ে নেয় ক্ষিতীশ।

প্রিয়তোষ মনে মনে ভাবে, 'যাক, তবু এক আনা উসুল হল।' কিন্তু পরদিন দু'জনকে বাসের দুই প্রান্তে দেখা যায়।

এমনি করে তৃতীয় সপ্তাহ কাটল। চতুর্থ সপ্তাহেরও পার হল ছ' দিন। সপ্তম দিনে সংসারের দশম খবর শুনল প্রিয়তোষ।

একটি টাকা মাত্র সম্বল। মাসের শেষে কোথায় হাত পাততে যাবে প্রিয়তোষ? কেন পাতবে? পাওনাদার হয়ে কেন অন্যের কাছে দেনাদার হতে যাবে? যেমন করে পারুক ক্ষিতীশ জুটিয়ে আনুক টাকা। এ কর্তব্য তার। কেবল ধার দেওয়াই তো মানুষের কাজ নয়, প্রতিবেশীকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়াও মনুষ্যোচিত।

কুন্তলাকে আর একবার আদেশের ভঙ্গিতে অনুরোধ করল প্রিয়তোষ, 'যাও না একবার ঘুরিয়ে টুরিয়ে বলে দেখ না ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রীকে। তোমাদের মেয়েতে মেয়েতে তো কত কথাই হয়। এতে আর দোষ কি।'

কুন্তলা বলল, 'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে বাকি রেখেছি কিনা। বলতে হলে এখন একেবারে সোজাসুজি বলতে হয়। তেমন বলা—যে যেচে টাকা দিয়েছিল সে বলুক গিয়ে। আমার কোন দায় পড়েছে।'

প্রিয়তোষ দাঁত কিড় মিড় করে বলল, 'আচ্ছা আমিই বলব।' তারপর চটির শব্দ করতে করতে গিয়ে দাঁড়াল ক্ষিতীশের ঘরের সামনে।

'ক্ষিতীশবাবু আছেন নাকি, ও ক্ষিতীশবাবু?'

ছেলেরা খেলতে বেরিয়েছে গলিতে। সবণীই আধখানা ঘোমটা টেনে শঙ্কিতভাবে দোরের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রিয়তোষের গলাটা মোটেই ভালো শোনাচ্ছে না। সত্যি সত্যি মুখের ওপর আজ তাগিদ দিয়ে বসবে নাকি লোকটি। তাহলে তো একেবারে মাথা কাটা যাবে।

সবণী যতদূর সাধ্য কণ্ঠে মাধুর্য এনে বলল, 'তিনি তো বাড়ি নেই ঠাকুরপো।'

'প্রিয়তোষ বলল, 'বাড়ি নেই মানে! দাবায় গিয়ে বসেছেন বুঝি?'

সবণী আরও একটু হাসল, 'না দাবায়ও নয়। কলকাতার বাইরে গেছেন এক বন্ধুর কাছে।'

প্রিয়তোষ আর্তনাদের সুরে বলল, 'বাইরে গেছেন!'

ঘোমটাটা ঠিক করতে গিয়ে একটু বুঝি উঠেই গেল। সবণী তেমনি মধুর হাস্যে বলল, 'হ্যাঁ ঠাকুরপো, একটু দরকারে বেরিয়েছেন। দিন দু'য়ের মধ্যেই ফিরবেন বলে গেছেন।'

প্রিয়তোষ মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বউ সবণী। দুই সন্তানের মা বলে বোঝা যায় না, এমন আঁটসাট গড়ন! হাসলে সবণীকে চমৎকার মানায় কিন্তু এই মুহূর্তে তার হাসিতে সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠল প্রিয়তোষের। মন তো তারে তারে বাঁধা। আগে থেকেই কি করে যেন টের পেয়েছে, তাই না বলে কয়ে সরে পড়েছে ক্ষিতীশ। পাকা দাবারু, এক চালে প্রিয়তোষকে মাত করে গেছে। কিন্তু মাত হয়ে ফিরবার ছেলে প্রিয়তোষ নয়। দাবা খেলতে সে

জানে না। কিন্তু ছক উল্‌টে ফেলতে জানে। যারা নিজেরা শিষ্টাচারের ধার ধারে না, তাদের সঙ্গে ভদ্রতা রাখবার মত কাপুরুষতা নেই প্রিয়তোষের। সবর্ণীর দিকে আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল প্রিয়তোষ। স্নান সেরে সদ্য পাটভাঙা শাড়ি পরেছে সবর্ণী! প্রিয়তোষের কাছ থেকে ধার করা টাকায় কেনা সেই চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি। সেদিন ভারী ভালো লেগেছিল দেখে, সুন্দর মানিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, আজ সেই লাল পাড় দেখে রক্তের কথা মনে পড়ল।

সবর্ণী বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ঠাকুরপো, বসবার কিছু দেব?'

প্রিয়তোষ মাথা নাড়ল, 'না বউদি, মাফ করবেন, বসবার সময় নেই। হ্যাঁ উনি কবে ফিরবেন বললেন?'

প্রশ্নের ধরনে সবর্ণীর মুখের জোর করা হাসি এবার নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। মেয়েছেলে বলে বুঝি আর পরোয়া করবে না প্রিয়তোষ। মুখের উপরেই বলে বসবে, 'যে ভাবে পারো বের করো টাকা।'

কিন্তু আজ কোন ভাবেই যে পাবে না সবর্ণী।

প্রিয়তোষ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কবে ফিরবেন বললেন?'

সবর্ণী ঠিক একই জবাব দিল, 'দু দিন বাদেই ফিরবেন।'

সবর্ণীর গলা এবার যেন একটু শুকনো শুকনো, কাঁপা কাঁপা মনে হল।

কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে প্রিয়তোষ বাঁকা বিদ্রূপে বলল, 'দু' দিন—খুব লম্বা পাড়ি দিয়েছেন দেখছি। কিন্তু আমার যে তাঁকে আজই খুব দরকার ছিল বউদি।'

আর ভয় নেই সবর্ণীর। যা বলবার প্রিয়তোষ সব বলে ফেলেছে। লোকে এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে বলবে কি।

সবর্ণীও এবার বিদ্রূপ ভঙ্গিতে হাসল, 'খুব দরকার যখন ছিল ভোরে এলেই পারতেন, তিনি তো আর লুকিয়ে যাননি, দিব্যি দিনের আলোয় রোদ উঠবার পরে বেরিয়েছেন।'

মুহূর্তকাল জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে ফিরে যেতে যেতে প্রিয়তোষ বলল, 'দিনেই যান আর রাতেই যান, একই কথা। তা ছাড়া তিনি থাকলেই বা কি হত।'

নিজের ঘরের দিকে কয়েক পা যখন প্রিয়তোষ এগিয়ে গেছে, সবর্ণী একটু উঁচু গলায় ডাকল, 'ঠাকুরপো, একটু শুনে যান।'

এতক্ষণ কি যেন চিন্তা করছিল সবর্ণী, এবার যেন উপায় খুঁজে পেয়েছে।

প্রিয়তোষ ফিরে এসে বলল, 'বলুন।'

'আপনার কি খুবই দরকার।'

প্রিয়তোষ এবার একটু ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ মানে ক্ষিতীশবাবুকে দরকার।'

সবর্ণী একটু হাসল, 'কিন্তু তাকে তো আর পাচ্ছেন না। দয়া করে একটু কাজ করে দেবেন?'

এর আগে বহু ফাই ফরমাশ খেটেছে প্রিয়তোষ। ক্ষিতীশের অনুপস্থিতে বাজারে এনে দিয়েছে, রেশন এনেছে।

আজ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি।'

আঁচলের গিট খুলে গুণে গুণে তিনখানা দু'আনি প্রিয়তোষের হাতে দিল সবর্ণী, প্রিয়তোষের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ফোন করবেন দয়া করে! বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন বোধ হয়। সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকরি করেন। তেতলা বাড়ি করেছেন বালিগঞ্জে। তিনি আমার আত্মীয়।' কথাটা সগর্বে বলল সবর্ণী। 'নম্বরটা গাইডেই পাবেন। আমার নাম করে বলবেন, উনি বাড়ি নেই। তাঁকে আমার বিশেষ দরকার।'

ফোন করে দিল প্রিয়তোষ। এ ভাবে যদি কাজ উদ্ধার হয় মন্দ কি। টাকা নিয়ে কথা। যেমন করে হোক পেলেই হল। ফোনে সবর্ণীর জরুরী দরকারের কথাটা একটু বিশেষভাবেই বলল প্রিয়তোষ। ফোনে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মতি পাওয়া গেল, তিনি আসবেন বিকালের দিকে।

অফিস ছুটি। সারা দিন প্রিয়তোষ বাড়িতেই রইল। বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল সবর্ণীর ঘরে। নানু আর কানু দোকান থেকে কি কি সব নিয়ে এল। আনল আধ পোয়াটাক খাঁটি ঘি, কিছু মসলা, গোটা

দুয়েক ডিম। ডিমের তৈরী জিনিস খুব ভালো খান বিশ্বম্ভর। সবর্ণী সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল। ডিম এ বাড়িতে কালে ভদ্রে আসে। কিন্তু বিশ্বম্ভরের ডিম না হলে একদিনও চলে না। বিশ্বম্ভরের এই ডিম্বপ্রীতি, এই রোজ ডিম খাওয়ার ক্ষমতা, তা যেন সবর্ণীর নিজেরই, কেননা বিশ্বম্ভর সবর্ণীর আত্মীয়। প্রিয়তোষদের কেউ নয়।

না হলেও ডিম কেনার সময় প্রিয়তোষ নিজে একেকটা ডিম চোখের সামনে ধরে বেছে বেছে দিল সবর্ণীর দুই ছেলে নানু কানুকে। এটুকু ভদ্রতা করা যায়। বিশ্বম্ভব আসবাব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

এ ঘরের জিনিস ওঘরে আদান প্রদান বন্ধ হয়ে ছিল। আজ আবার শুরু হল। সবর্ণীই নিজে চেয়ে নিল কুন্তলাদের সব চেয়ে ভালো চায়ের কাপ আর প্লেট জোড়া। এটুকু চাইতে আর দোষ কি। এতো ঠিক চাওয়া নয়, চাওয়া চাওয়া ঠাট্টা। কয়েক ঘন্টা বাদেই সমস্ত পাওনা ওদের আজ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবে সবর্ণী। সে আর দেনাদার থাকবে না। চায়ের কাপ চাইতে এসে সেই কথাই সবর্ণী ঘোষণা করতে চাইল। বিশ্বম্ভর মুখুয্যের মত বড়লোক সবর্ণীর ঘরেই আসেন, কুন্তলাদের ঘরে না।

তা নাই বা এলেন, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তো আসছেন বাড়িতে। আর তাঁর আসবার বিশিষ্ট অর্থও আছে একটা। অমলেট মামলেট ছাড়া ডিমের আর একটা জিনিস তৈরী করতে জানে কুন্তলা—হালুয়া। তার কায়দাকানুন, মশলাব ভাগ সবর্ণীকে সে বলে দিল। একখানা সাবান ছিল ঘরে। বাথরুম থেকে হাত পা মুখ ভালো করে ধুয়ে নিল। বাক্স খুলে বার করল পুজোর শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য জামা প্যান্ট বেরুল।

ঠিক একই রকম ঘটা পড়ে গেছে সবর্ণীব ঘরে। সাধ্যমত সেও সাজল, পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন ফিটফাট রাখল ঘরদোর। প্রিয়তোষের ঘরে চেয়ার আছে একখানা। বড ছেলে নানু সেখানা বয়ে নিয়ে গেল।

সবর্ণী মনে মনে বলল, 'আহাহা চেয়ারের কি ছিরি দেখ।' বহুদিনের পুরনো চেয়ার। পালিস টালিস উঠে গেছে। ফাটলে ফাটলে বাসা বেঁধেছে ছারপোকা। কোন ভদ্রলোক এতে বসতে পারে ?

ট্রাঙ্কের তলা থেকে কুমারী কালের বোনা ফুল তোলা আসনখানা বের করে তার ওপর পেতে দিল সবর্ণী।

কুন্তলা তা দেখে স্বামীকে অন্তরালে বলল, 'আদিখ্যেতা দেখ একবার। কুটুম্ব স্বজন যেন আমাদের ঘরে আর কেউ আসে না।'

প্রিয়তোষ বলল, 'করতে দাও, করতে দাও। আমাদের প্রাপ্যটা পেলেই হল।'

কুন্তলা এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি তোমার কে হন দিদি।'

সবর্ণী সগর্বে বলল, 'জামাইবাবু।'

কুন্তলা তবু বলল, 'আপন ?'

সবর্ণী কুন্তলার চোখে চোখে তাকাল, 'আপন না হলেও আপনের বাড়া। ব্যবহারেই মানুষ আপন পর হয় ভাই। আপন পর কি আর গায়ে লেখা থাকে ?'

সম্পর্কটা একটু দূরেরই। পিসতুতো বোনের বর। সে পিসীও আপন পিসী নয়। তবু কিশোরী বয়সে সবর্ণীর ওপর ভারী মমতা ছিল বিশ্বম্ভরের। গাল টিপেছেন, বেণী টেনেছেন, হাতের নাগালে পেলে কিছুতেই আর ছাড়েননি। বিয়ের পরেও দু'চারবার দেখা হয়েছে। ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ক্ষিতীশ ওই এক ধরনের মানুষ। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে জানে না। তাহলে ভালো চাকবি বাকরিই হত।

আশায় আশায় কাটল সারাদিন। তারপর রাত আটটায় গলির মোড়ে সশব্দে মোটর থামল। মোটর থেকে ডাক শোনা গেল বিলাতী কুকুরের।

সবর্ণী বলল, 'ঐ এলেন।'

সবর্ণীর ছোট ছেলে আব কুন্তলার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে বড় দুটি। প্রিয়তোষের

সঙ্গে তারাও এগিয়ে গেল মোটরের কাছে।

বিশ্বম্ভর প্রিয়তোষকে দেখে বললেন, 'আচ্ছা গোলমেলে নম্বর যা হোক। খুঁজে খুঁজে হয়রান। তেত্রিশের ডি কোন বাড়িটা বলতে পারেন মশাই।'

প্রিয়তোষ সবিনয়ে বলল, 'এই যে আসুন আসুন, আমাদেরই বাড়ি।'

বিশ্বম্ভর ভ্রু কুঁচকালেন, 'আপনাদেরই বাড়ি মানে! সবণীর কে হন আপনি। ক্ষিতীশের কোন ভাই টাই ছিল বলে তো জানতুম না।'

প্রিয়তোষ আমতা আমতা করে বলল, 'না স্যার, সে সব কিছু নয়, আমি পাশের ঘরের ভাড়াটে।'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'ও, পাশের ঘরের। সিম্পাথেটিক নেবার, আই সি, আপনিই ফোন করেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ বেশ, চলুন।'

ড্রাইভার চুপচাপ বসে আছে সীটে।

দোর খুলে বিশ্বম্ভর নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। নানু আর বিল্টুর মত প্রিয়তোষও সভয়ে পিছিয়ে গেল।

বিশ্বম্ভর মৃদু হাসলেন, 'আপনিও ছেলেমানুষ দেখছি। দেখছেন না বাঁধা আছে। অত ভয় কিসের।' কুকুরের মাথায় সস্নেহে একটু চাপড় দিলেন বিশ্বম্ভর, 'Behave yourself Jack.' তারপর প্রিয়তোষের দিকে ফিরে বললেন, 'চলুন।'

বেশ লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথায় টাকের আভাস আছে একটু। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে।

নানু আর বিল্টু পরস্পরের দিকে তাকাল। মোটরে চড়ে যিনি এলেন, তাঁর গায়েও হাওয়াই শার্ট। বেশ একটু আত্মীয়তা অনুভব করল দুজনে। ওঁর শার্টের রঙটা অবশ্য একটু আলাদা। গোলাপী নয়, ধবধবে সাদা, খদ্দরের।

নানু ফিসফিস করে কিন্তু বেশ সগর্বে বলল, 'আমার মেসোমশাই।'

বিল্টু বলল, 'তাহলে আমারও, নারে নানু। আমার বাবাও তো তোর কাকাবাবু।'

নানু একটু দাক্ষিণ্য দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

খুব দীর্ঘ ঋজু চেহারা বিশ্বম্ভরের। মুখের সরু পাইপটাও বেশ ঋজু, একেবারে পার্পেন্ডিকুলার ভাবে বসান।

খানিক এগিয়ে প্রিয়তোষ ব্যস্তভাবে বলল, 'মাথা নিচু করুন স্যার, নিচু করুন।'

বিশ্বম্ভর তাড়াতাড়ি মাথা নোয়ালেন। সদরটা ভারী নিচু। পেরিয়ে এসে বিরক্তমুখে বললেন, 'কি সব উল্টো প্যাটার্নের বাড়ি এ অঞ্চলে। ওটা ভেঙ্গে ফেলতে পারেন না?'

প্রিয়তোষ বললেন, 'আজ্ঞে আমাদের তো নয়, বাড়িওয়ালার বাড়ি।'

'বাড়ি বলবেন না, বস্তী বলুন। তবে এর চেয়ে বস্তীর ঘরগুলোও বেশ খটখটে, আলো হাওয়া আছে। স্বাস্থ্যকরও! কি যে সব কনভেনশন আপনাদের। আমি নিজের চোখে দেখেছি দু'একটি বস্তী। ভাড়াও কম, থাকারও সুবিধে।'

সহানুভূতির আভাস ফুটে উঠল বিশ্বম্ভরের গলায়। সবণী এগিয়ে এসেছিল দোরের কাছে। শেষ কথাগুলো তার কানে গেল।

'আসুন জামাইবাবু। এত রাত হল যে।'

'হ্যাঁ, মিনিস্টারের সঙ্গে একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, সেরে এলুম। তারপর খবর কি তোমার? সব ভালো? ক্ষিতীশ কোথায়?'

সবণী মৃদু হাসি টেনে বলল, 'বাইরে গেছেন একটু দরকারে। আসুন, ভিতরে আসুন।'

'আবার ভিতরে?'

কাঁচা পায়খানা আর কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ এখান থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে। পকেটের রুমালে একবার হাত দিলেন বিশ্বম্ভর। কিন্তু কি ভেবে তুলে নিয়ে নাকে চাপলেন না। বড় দৃষ্টিকটু দেখাবে।

সবণীরা মনে আঘাত পেতে পারে।

ভিতরে আসতে আসতে বিশ্বম্ভর সস্নেহে বললেন, 'একটু ভালো জায়গা দেখে নিতে পার না। ছেলেপুলের অসুখ বিসুখ হবে যে এখানে থাকলে।'

সবাণী বলল, 'পাই কোথায়, দিন না খুঁজে।'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'খোঁজবার মানুষ তো তোমার আছেই। তিলমাত্র সময় নেই। রাত দিন এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে বলবার নয়। তোমার ফোন পেয়ে মনে ভারী আনন্দ হল। ঝোঁকেব মাথায় কথা দিয়ে বললুম যাব। কিন্তু আসা কি সহজ।'

ঘরের মধ্যে চেয়ারে এসে বসলেন বিশ্বম্ভর। দোরের আড়ালে কুন্তলা এসে উঁকি দিল। ওধার থেকে নেমে এল মন্দাকিনীরা।

বিশ্বম্ভর বললেন, 'তোমার নাকি খুব জরুরী দরকার, ব্যাপাব কি।'

সবাণী একবার দোরের দিকে তাকাল। প্রিয়তোষরা আশে পাশেই আছে। সবাণী বলল, 'বিশ্রাম করুন, পরে বলব!'

বিশ্বম্ভর একটু হাসলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। বড় খুশী হলুম। আগেকাব দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। ভারী শান্ত নির্বিরোধ ছিল জীবন। কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ছিল না।'

অতীত থেকে হঠাৎ বর্তমানে ফিরে এলেন বিশ্বম্ভর, 'আজ কিন্তু ভাই বেশী দেরি করতে পারব না, বড্ড তাড়া। শ্যামবাজার যেতে হবে একটু, সমীরণ ঘটকের ওখানে।'

সবাণী বলল, 'তিনি আবার কে?'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'ঝানু আই· সি· এস·। ভারী কুটকচালে বুদ্ধি। তবু খবর পাঠিয়েছে যখন একবার দেখা করতে হবে।'

বিশ্বম্ভর উঠে দাঁড়ালেন।

সবাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কি জামাইবাবু, কতদিন পরে এলেন, জল টল কিছু—'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'আজ থাক। আজ বড় ব্যস্ত।'

সবাণী বলল, 'সে কি। ডিমেব নতুন জিনিস করেছি আপনাব জন্য। ডিমের প্রিপ্যারেশন ক[illegible] ভালো খেতেন আপনি মনে আছে তো?'

'আছে।' কষ্টে একটু হাসলেন বিশ্বম্ভব, 'আচ্ছা আন।'

প্লেটে করে ডিমের প্রিপ্যারেশনগুলি নিয়ে এল সবাণী।

বিশ্বম্ভর একটু ছুঁলেন কি ছুঁলেন না, বললেন, 'অতয় কি হবে। আমাকে [illegible] ভেবেছ?'

'কিন্তু ডিম তো আপনি ভালোই খেতেন।'

'খেতাম। এখন আর বড় একটা খাইনে। ভারী গোলমাল চলেছে পেটের [illegible] কি আর ফিরে আসে সবাণী। কেবল স্মৃতি থাকে, স্মৃতিই মধুর।'

কুন্তলার ঘর থেকে চেয়ে আনা চায়ের কাপেও একটু চুমুক দিলেন বিশ্বম্ভর। দিয়েই রেখে দিলেন। মুখবিকৃতিটুকু চোখ এড়াল না সবাণীর।

বিশ্বম্ভর হাতঘড়ি দেখে বললেন, 'ওরে বাবা, এরই মধ্যে আটটা পঁচিশ। বড্ড দেরি হয়ে গেল। ঘটকের আবার সময়জ্ঞান টনটনে। উঠি ভাই।'

গলির মোড়ে মোটরকার পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিল সবাণী। সঙ্গে সঙ্গে গেল প্রিয়তোষ। শিষ্টাচার আছে তো। পিছনে পিছনে এল নানু আর বিন্তু। আর একবার ডাক শুনবে কুকুরের। একটু বেশী কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। বাঁধাই তো আছে। ভয় কি!

ব্যস্তভাবে গাড়িতে উঠলেন বিশ্বম্ভর। ঘড়ি যেন দৌড়ে চলেছে। আটটা সাতাশ।

ড্রাইভার স্টার্ট দিচ্ছে, হঠাৎ বিশ্বম্ভরের কি মনে পড়ে গেল। হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে, আর এক হাতের ইশারায় সবাণীকে ডেকে বললেন, 'ও সবু, শোন শোন। ভারি অন্যায় হচ্ছিল ভাই, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

সবাণী মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'কি জামাইবাবু।'

বিশ্বম্ভর মৃদু হাসলেন, 'আরে ভাই তোমার সেই দরকারের কথা—কিছু মনে করো না।'

বলে, ব্যাগ খুলে একখানা একশ টাকার নোট বার করলেন বিশ্বম্ভর, 'এই নাও। ক্ষিতীশকে একবার দেখা করতে বলো বুঝেছ ?'

মনটা একেবারে কুঁকড়ে গেল সর্বাণীর। প্রিয়তোষ রয়েছে, ড্রাইভার রয়েছে, সর্বাণী ঘাড় নেড়ে জানাল, বুঝেছে। কিন্তু গুটানো হাতখানা এগিয়ে দিল না, শুধু বলল, 'আজ থাক জামাইবাবু। আপনার বুঝি আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিশ্বম্ভর একবার সর্বাণীর দিকে তাকালেন, বললেন 'আচ্ছা, তবে থাক।'

তারপর ইশারা করলেন ড্রাইভারকে। গাড়ি ছুটে চলল।

প্রিয়তোষ সর্বাণীর দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে রইল, তারপর প্রসন্ন পরিতৃপ্তস্বরে বলল, 'চলুন বউদি।'

সর্বাণী বলল, 'হ্যাঁ, আসুন। ডিমের অতগুলি জিনিস একা খেলে পেটে সইবে না।' মৃদু হাসল সর্বাণী।

প্রিয়তোষও হাসল, 'একা খেতে আপনাকে দিচ্ছে কে।' পরমুহূর্তে প্রিয়তোষ, কুন্তলা আব ছেলেদের কলহাস্যে সর্বাণীব ঘর আবার মুখর হয়ে উঠল।

পৌষ ১৩৫৫

টর্চ

ছটায় শো, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সুরমা যখন শো-হাউসের সিঁড়িতে এসে পা দিল তখন দেয়াল-ঘড়িতে ছ'টা বেজে বার মিনিট হয়ে গেছে।

স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সুরমা বলল, 'তোমার মত কুঁড়ে তো আব দু'টি নেই. উঠতে বসতেই ছ' মাস। বই বোধ হয় অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে।'

নিরুপম স্ত্রীর সুন্দর প্রসাধিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। স্বভাবে অবশ্য নিরুপমের মন্থরতা আছে কিন্তু আজকের দেরি যে নিজেব মন্থরতার জন্য নয় সে কথাটা আর উল্লেখ করল না নিরুপম. হাসি আর দৃষ্টি দিয়েই বোঝাতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন : আবম্ভ হয়েছে তো কি হয়েছে। শেষ তো আর হয়নি। তার নিশ্চয়ই অনেক দেবি।'

কাউণ্টার থেকে দু'খানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট নিল নিরুপম. তারপব সস্ত্রীক গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কালো পর্দার সামনে টর্চ হাতে দ্বারী নিরুপমের হাত থেকে টিকিট দুখানা নিয়ে টর্চ জ্বেলে একটু দেখে অর্ধেকটা ছিঁড়ে রাখল, বাকি খণ্ডাংশ নিরুপমেব হাতে দিয়ে একটু সবে দাঁড়াল।

অন্ধকার হলেব ভিতবে ঢুকতেই খানিক দূর থেকে আর একটা টর্চ এগিয়ে এল। নিরুপম টিকিটের অর্ধাংশ দু'খানি লোকটির হাতে দিতে দিতে হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে মানিক যে. তুমি এখানে কবে থেকে ?' মানিক বলল, 'আজ্ঞে, মাস ছয়েক হোল এসেছি।'

নিরুপম বলল, 'আগে যেন শ্যামবাজারের দিকে কোন্ হাউসটায় কাজ করতে ? মীনারে না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নিরুপম বলল, 'তারপর তোমার দাদা প্রমথবাবু ভালো আছেন তো ? বাড়িওয়ালা আর কোন গোলমাল টোলমাল করে না তো ?'

মানিক বলল, 'আজ্ঞে না। আসুন উকিলবাবু, এই দিকে সীট আপনাদের।'

টর্চ হাতে এগিয়ে গেল মানিক। নিরুপম চলল পিছনে পিছনে। কিন্তু সুরমার পা যেন তখনো একটু আটকে রইল মাটিতে. সেই মানিক মুখুয্যে। কোন ভুল নেই। মাথায় সেই কোকড়ানো চুল। কপালের ডান দিকে সেই কাটা দাগ। আগের চেয়ে আরো একটু যেন রোগা হয়েছে. না মাথায় একটু বেড়েছে ব'লেই মনে হচ্ছে এখন, কি জানি। বেশবাসেও অবশ্য তখনকাব দিনেব মত শৌখিনতা নেই। আধময়লা হাফসার্ট গায়ে। পায়ে স্যাণ্ডাল. তবু পাঁচ বছর আগেব মানিককে

এখনো বেশ চেনা যায়। মানিকও কি তাকে চিনেছে ?

নিরুপম একটু পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কই, এসো।' মানিকের হাতের টর্চটা আর একবার যেন ঝলসে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সপ্রতিভতা ফিরে এল সুরমার। স্বামীর পিছনে পিছনে এগিয়ে গিয়ে তার বাঁ দিকের সীটে বসে পড়ল। মানিক ততক্ষণে সরে গেছে।

আসল বই তখনো আরম্ভ হয়নি। একটা ইংরেজী বইয়ের ট্রেলার দেখানো হচ্ছে পর্দায়। কূলহীন নীল সমুদ্রে ঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে পালাচ্ছে শঙ্খচিলের ঝাঁক। জেলে ডিঙিগুলি ভিড়তে চেষ্টা করছে তীরে।

নিরুপম সিগারেট ধরিয়ে হাসল, 'যাক, ভাবনা দূর হোল তো তোমার ? বই শুরু হ'তে এখনো দেরি আছে বোঝা যাচ্ছে।'

দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রবেশ-পথ দিয়ে তখনো দু'একজন করে দর্শক ঢুকছে। আর অন্ধকার ঘরে জোনাকির আলোর মত ছোট ছোট টর্চ জ্বলছে আর নিবছে। নীল সমুদ্র থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে টর্চের আলো-বেঁধা অন্ধকার কালো ঢুকবাব পথগুলির দিকে সুরমা একবার তাকিয়ে কি দেখল, তারপব বিরক্তির সুরে বলল, 'আঃ, সিনেমা দেখবার এত শখই যদি থাকে, কেন যে লোকে দেরি করে আসে বুঝিনে। দু'মিনিট আগে আসলেই তো হয়। ভারি খারাপ লাগে আমার যাই বলো।'

নিরুপম সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল, 'কি খারাপ লাগে ?'

সুরমা বলল, 'লোকের এই দেরি করে আসা। আর গেটকীপারগুলির ঘন ঘন এই টর্চ জ্বালা। ভারি চোখে লাগে।'

নিরুপম একটু হাসল, 'তুমিও তাহ'লে ব্যাপাবটা লক্ষ্য করেছ ?'

'কি ?'

নিরুপম বলল, 'মানিক টর্চটা বেশ একটু উঁচু ক'রে ধরেছিল। যাতে পথ দেখবার সঙ্গে মুখও দেখে নেওয়া যায়।'

সুরমা ধমকের সুরে বলল, 'কি যে বল।'

নিরুপম বলল, 'আহা, লজ্জার কি আছে, ও তো কেবল তোমার মুখই দেখেনি। যত মেয়ে ছবি দেখতে আসে হাতের কাযদায় টর্চ ঘুরিয়ে সবাইর মুখই ও দেখে নেয়। এই দেখ আরো দু'টি মেয়েকে পাকড়াও করেছে।'

ইশারায় দোরেব দিকটা দেখিয়ে দিল নিরুপম—যে দোব দিযে সুরমারা এসেছিল ঠিক সেই দোর দিয়ে আরো দু'টি মেয়ে হলের ভিতবে ঢুকছে। টর্চ জ্বেলে তাদের হাতেব টিকেটের নম্বর দেখে নিচ্ছে মানিক।

সুরমা চোখ ফিরিযে নিয়ে বলল, 'তোমাব যত বাজে কথা আর যত আলাপ বাজে লোকের সঙ্গে। সিনেমা দেখতে এসে গেটকীপারেব সঙ্গে কেউ আলাপ জুড়ে দেয় ? চাবদিকের লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে, এত লজ্জা করছিল আমার।'

নিরুপম বলল, 'কি কবব বল, তোমার মত অতখানি আভিজাত্য তো নেই, ছোট আদালতের ছোট উকিল। ঘটিচোর বাটিচোর নিযে কারবার।'

সুরমা একটু হাসল, 'থাক থাক ! রেণ্ট কনট্রোলের কেস না হয় দু'একটা আজকাল পাচ্ছই, তাই ব'লে অত অহংকার ভালো নয়। কিন্তু ওকালতি কি মানুষে করে না ? তাই ব'লে পানওয়ালা বিড়িওয়ালাব সঙ্গে পথে-ঘাটে তোমাব মত গল্প জুড়ে বসে নাকি।'

নিরুপম বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। একেবারে পানওয়ালা বিড়িওযালা ক্লাসের লোক নয় মানিক। রীতিমত কুলীন বামুনেব ছেলে। আমাব মক্কেল প্রমথ গাঙ্গুলীব কি রকম কাজিন হয় সম্পর্কে। সেবাব তার কাছেই শুনেছিলাম গল্পটা।'

ট্রেলার শেষ হয়ে গেছে। মূল বই 'মায়ামৃগে'ব ভূমিকালিপি জানানো হচ্ছে দর্শকদেব। নায়কের ভূমিকায তরুণ এক অভিনেতা। কিন্তু নায়িকা প্রবীণা, শহরের খ্যাতনামা নটী।

নিরুপমেব পাশের জন দুই ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকালেন। মুখে কিছু না বললেও বক্তব্যটা তাঁদের চোখে অস্ফুট রইল না, 'দাম্পত্যালাপের জন্য ঘরে কি যথেষ্ট জায়গা নেই

আপনাদের ?'

কিন্তু পার্শ্ববর্তীদের সেই সবাক দৃষ্টি অবজ্ঞা ক'রে নিরুপম স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'ভারি মজার গল্প। অন্ততঃ তোমার এই সিনেমার গল্পের চাইতে যে অনেক ভালো তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। জানো, মানিক ইচ্ছা ক'রে এই চাকরি নিয়েছে? পৃথিবীতে যত মেয়ে আছে সকলের চোখ টর্চের আলোয় ঝলসে দেবে এই ওর পণ। আর এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মূলে আছে বিশ্বাসঘাতিনী এক মেয়ে।'

সুরমা একটু যেন শিউরে উঠল, তারপর বলল, 'আঃ, থামো এবার। বই আরম্ভ হয়ে গেছে দেখ।'

নিরুপম হাসল, 'তোমার আরম্ভ কি আর এখন থেকে হয়েছে নাকি?'

তারপর দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে নিরুপমও ছবিতে মন দিল।

মন দিতে চেষ্টা করল সুরমাও। কিন্তু কিছুতেই যেন কাহিনীটা বুঝে উঠতে পারল না। কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ হাত নাড়ছে, মুখ নাড়ছে, হাসছে, কথা বলছে, গান গাইছে। ছবির পর ছবি আসছে। কিন্তু বিষয়টা কি, বক্তব্য কোথায় কিছুতেই যেন ধরতে পারল না সুরমা। তারপর খানিক বাদেই সব যেন ফের পরিষ্কার হয়ে গেল। পর্দায় যে ছবিগুলি আসতে শুরু করেছে তার কোনটাই যেন আর সুরমার অপরিচিত নয়। সব চেনা সব জানা। এবার আর কাহিনীটা দুর্বোধ্য লাগল না সুরমার। নিবিষ্ট মনে সে ছবি দেখতে লাগল। টেরও পেল না চিত্তপট কখন চিত্রপটকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছে।

বড় একটা সার্চলাইটে নদীর দু'দিকের নারকেল আর সুপারি গাছগুলি ঝলসে দিতে দিতে সন্ধ্যার পর স্টীমারখানা এসে থামল গোলোকগঞ্জ স্টেশনে। যেমন স্টীমার তেমনি স্টেশন। একদিকে কাঠের গুদাম, আর একদিকে ছোট ছোট খানকয়েক টিনের ঘর। সামনে একটা গ্যাসপোস্টের মাথায় চৌকো অপরিচ্ছন্ন কাচের লণ্ঠনের মধ্যে টিম টিম ক'রে জ্বলছে আলো।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নতুন শহরের দৃশ্যটা একটু দেখে নিয়ে সুরমা বলল, 'বাবা, তোমাকে ভালো মানুষ পেয়ে তোমার সিভিল সার্জন বন্ধু এমন ক'রে ঠকালে তোমাকে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বদলি করলে?'

সুরমার বাবা বাক্স তোরঙ্গ বিছানা কুলির মাথায় তুলে দিচ্ছিলেন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। এসময় অন্য কোন ছেলে-মেয়ে এমন কি স্ত্রী যদি এমন ঢঙে কথা বলত তার গালে ঠাস ক'রে চড় বসিয়ে দিতে পারতেন সুবিমলবাবু। কিন্তু সুরমার ওপর তাঁর একটু বেশী পক্ষপাত আছে—ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী বলে নয়, পড়াশুনো, সেলাই, গানে সব চেয়ে ভালো বলে নয়, সুরমার মত এমন মমতাভরা মন তার আর কোন ভাই-বোন পায়নি, এমন কি তার মাও নয়।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাই সুবিমলবাবু একটু হাসলেন, 'কেন, জায়গাটা মন্দ কি রমি। নদীর ধারে নারিকেল-সুপারির কুঞ্জ। দিব্যি ব'সে ব'সে কাব্যচর্চা করতে পারবি। কেউ বাধা দেবে না। তোর পক্ষে তো ভালোই হলো, আমি তোর কথা ভেবেই গোলেকগঞ্জে আসতে আপত্তি করলুম না।'

সুরমার মা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'মেয়ের সঙ্গে গল্প পরেও করতে পারবে। এবার এই বড় ট্রাঙ্কটা কুলিকে তুলে দাও তো।'

'এই দিচ্ছি।'

মাল তোলা হয়ে গেলে দল বেঁধে সবাই নিচে নামল সুরমারা। বড় দুই ভাই চাকরি করে কলকাতায়। তারা আসেনি। বাপ-মায়ের সঙ্গে এসেছে কেবল সুরমা আর তার ছোট দুই বোন, এক ভাই।

শহরের জন-দুই ভদ্রলোক অভ্যর্থনা জানালেন সুরমার বাবাকে, 'আসুন ডাক্তারবাবু। এই যে গাড়ি আপনাদের। একখানাতেই হবে বোধ হয়।'

সুবিমলবাবু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তা হবে। হাসপাতাল কত দূর এখান থেকে ?'

'তা মাইল দেড়েক তো হবেই।'

'বলেন কি, অত ? শহরের বাইরে নাকি ?'

'আজ্ঞে না। শহরের মধ্যেই। যত ছোট মনে করছেন, গোলোকগঞ্জ তত ছোট শহর নয় ডাক্তারবাবু। এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় বিজনেস-সেণ্টার।'

সবাই মিলে ঘোড়ার গাড়িতে উঠল—সুরমারা। চাবুক খেয়ে পিচ-বাঁধানো একটা নাতিপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে মন্থরগতি অশ্ব দু'টি খানিকটা বেগবান হোল। জানালা দিয়ে শহর দেখতে দেখতে চলল সুরমা। বেশীর ভাগই টিনের ঘর। মাঝে মাঝে দু' একটি একতলা পাকা বাড়ি। স্কুল, বাজার, বইয়ের দোকান, মনোহারী দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট সবই আছে। কেবল গায়ে মফঃস্বল সংস্করণের ছাপ। দেখতে দেখতে হঠাৎ বড় একখানা সাইনবোর্ডে চোখ আটকে গেল সুরমার। বিজয়া স্টোর্স। চশমা, সাইকেল, গ্রামোফোন, ঘড়ি সুলভে বিক্রয় ও মেরামত হয়।

সুরমা বলল, 'বাবা, আমার চশমাটা কিন্তু কাল সারিয়ে নিতে হবে।'

মাঝখানের একটা স্টেশন থেকে স্টীমার উঠবার সময় বাক্স মাথায় করা একটা কুলির সঙ্গে ধাক্কা লেগে সুরমার চশমার ডান দিকের হাতলটা ভেঙে অকেজো হয়ে রয়েছে। আর একটু হ'লে চোখই যেত। কিন্তু চোখ বেঁচে গেলেও চশমাহীন চোখ, মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছে সুরমা। জ্বালা করছে, চোখের মধ্যে কটকট্ করছে। স্টীমারের মধ্যেও শারীরিক অস্বস্তির কথা বার দুই বাবাকে জানাতে বাধ্য হয়েছে সুরমা। সুবিমলবাবু আশ্বাস দিয়েছেন, 'গোলোকগঞ্জে নেমেই আগে তোমার চশমার ব্যবস্থা করব।'

হিরণবালা বলেছেন, 'হ্যাঁ, তাই কোরো, নইলে তোমার মেয়ের জ্বালায় রাত্রে আর কারো সুস্থ থাকা যাবে না।'

মেয়ের কথায় সুবিমলবাবু বললেন, 'কাল কেন, দোকানে নেমে আজই তোর চশমাটা ঠিক ক'রে নিয়ে যাই, এই গাড়োয়ান রোকো হিঁয়া পর।'

কিন্তু সুরমার মা ধমক দিলেন, 'মেয়ের সঙ্গে তোমারও কি মাথা খারাপ হোল নাকি! এই রাত্রে চশমা সারাতে যাবে! বুলুটুলুরা ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে উঠেছে। নতুন জায়গা। কি রকম কোয়ার্টার, কি বন্দোবস্ত আছে না-আছে তুমিই জানো। একটা রাত চশমা চোখে না থাকলে কি মরে যাবে নাকি তোমার মেয়ে ?'

সুবিমলবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আচ্ছা, থাক তাহ'লে, কালই আসব কি বলিস রমি।'

সুরমা কানের কাছে রগটা একটু টিপে ধ'রে বলল, 'থাক বাবা, কোন কালেই আর আসবার দরকার নেই, আমি বিনা চশমাতেই চলতে পারব।'

গাড়ি ফের চলতে শুরু করল। জানলা দিয়ে সুরমা আর একবার তাকাল দোকানের দিকে। রাস্তায় যে ক'খানা দোকান চোখে পড়েছে তার মধ্যে এইখানাই সব চেয়ে ভালো। দোতলা বাড়ির নিচের তলায় সব চেয়ে বড় একখানা ঘরে বেশ সাজানো গুছানো দোকান। সুরমাদের গাড়ি দোকানের সামনে থামতে দেখে আঠার উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারার কৌতূহলী একটি ছেলে দোরের কাছে এগিয়ে এসেছিল। গাড়ি ফের চলতে আরম্ভ করায় দোকানের মধ্যে সেও ফিরে গেল। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, টিকোল নাক, বড় বড় দুটি চোখ। শ্যামবর্ণের ওপর ভারি মিষ্টি মোলায়েম মুখ। চোখের জ্বালাটা মুহূর্তের জন্য যেন জুড়িয়ে গেল সুরমার। মনে হোল ছেলেটিও যতক্ষণ গাড়ির দিকে তাকিয়েছিল তার চোখে পলক ছিল না. গাড়ি নয় গাড়ির আরোহিণীই যে তাকে মুগ্ধ করেছে তা বুঝতে দেরি হয়নি সুরমার!

ছোট ছোট টিনের ঘরে সরকারী অস্থায়ী হাসপাতাল। আশেপাশে ছনের ঘরও আছে খান কয়েক। তারই লাগা বড় একখানা আটচালা বাংলো প্যাটার্নের ছনের ঘরে বড় ডাক্তারের কোয়ার্টার।

রান্নাখাওয়া, বিছানা বাণ্ডিল খুলে সাজানো গুছানোয় রাত অনেক হোল। অল্পদিনের নোটিশে বাসা গুটানো, আর অল্প দিনের জন্য বাসা বাঁধা বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে সুরমার বাবা-মার।

পরদিন ভোরে উঠে বাবা বললেন, 'চল, তোর চশমাটা সারিয়ে নিয়ে আসি. সেই সঙ্গে টুকটাক জিনিসগুলিও কিনে আনা যাবে। সবই ভালো, কেবল ইলেকট্রিক লাইট নেই এই হোল মস্ত অসুবিধা।'

মা বললেন, 'আর যাই আনো না-আনো, আব একটা হ্যারিকেন, বোতল খানেক কেরোসিন তেল কিন্তু যে ভাবেই পারো যোগাড় ক'রে এনো।'

সুরমা বলল, 'আমার আর গিয়ে দরকার কি বাবা।'

মা হেসে বললেন, 'এখনো তোর রাগ পড়ল না রমা। কই রাত্রে খাবার সময়, ঘুমবার সময় তো রাগের কথা মনে ছিল না। এখন ভোরে উঠে ফেব বুঝি মনে পড়েছে। তুই ওঁর সঙ্গে না গেলে ফর্দেব অর্ধেক জিনিস আসবে, অর্ধেক আসবে না।'

সুতরাং সঙ্গে যেতেই হোল সুরমাকে। কাছাকাছি ভালো দোকান নেই। সবাই বলল চশমা সারাবার এখানে একমাত্র জায়গা চৌরাস্তার মোড়ের বিজয়া স্টোর্স।

দোকান সবে খুলেছে। বাবার সঙ্গে সুরমা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই কোঁকড়ানো চুলেব ছেলেটি সাদর অভ্যর্থনা জানায়, 'আসুন, আসুন।'

যেন অনেকক্ষণ ধ'বে এই খদ্দেরদেরই সে প্রতীক্ষা করছে। সুরমারা যে আসবে তা যেন তাব জানা কথা।

তাবপর দু'চার কথায় সুরমার বাবা আলাপ করলেন মানিক মুখুযোব সঙ্গে। দোকানের মালিক নয়, মানিক কর্মচারী। মালিকের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে।

খাপের ভিতর থেকে হাতল-ভাঙা চশমাটা বের ক'রে দিল সুরমা।

মানিক একটু দেখে পরীক্ষা ক'রে বলল, 'এ ধবনের ফ্রেম তো আমাদেব নেই, কিন্তু যা ক'বে দেব এর চেয়ে সুন্দর হবে।'

সুরমার বাবা বললেন, 'একটা হাতল বদলে নিলে হয় না?'

মানিক মাথা নেড়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'না, সে বড় বিশ্রী দেখাবে, তার চেয়ে নতুন ফ্রেম করিয়ে নিলে অনেক ভালো হবে দেখতে।'

একটা পীজবোর্ডের বাকসের ডালা সুরমাদের সামনে খুলে ধরল মানিক, বলল, 'দেখুন, কোনটা পছন্দ।'

সুরমা এবার কথা বলল, 'কোন্‌টার কি দাম?'

মানিক তেমনি স্নিগ্ধ হেসে বলল, 'দামের জন্য ভাববেন না। আগে পছন্দ করুন। আমাদের চেয়ে সস্তায় কেউ দিতে পারবে না। প্রায় কলকাতার দরেই আমরা সব জিনিস বিক্রি করি এখানে।'

নিতান্তই বেচাকেনার ব্যাপার। কিন্তু তাও যে এমন মধুর ক'রে বলা যায়, মধুর লাগে শুনতে তা যেন সুরমা এই প্রথম অনুভব করল। ফ্রেম একটা নিজের পছন্দমত বেছে নিল সুরমা।

ইতিমধ্যে মালিক বিপিন সরকার এসে পৌঁছলেন। বেঁটে কালো গোলগাল চেহারা। হাতাকাটা ফতুয়া গায়ে। ভুঁড়ির কাছে বোতামগুলি খোলা।

সুরমার বাবা সুবিমলবাবু বললেন, 'জিনিসটা কিন্তু এক্ষুণি ক'রে দিতে হবে।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক দেরি হবে, মিস্ত্রী এখনো আসেনি কি না।'

সুবিমলবাবু বললেন, 'আবার তাহ'লে হাসপাতাল থেকে এতটা পথ আসতে হবে। আচ্ছা, কাউকে না হয় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।' দোকানের মালিক এবার সহাস্যে বললেন, 'ও, আপনি হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু বুঝি, নমস্কার নমস্কার। আমি চিনতেই পারিনি। আপনাকে আসতে হবে না ডাক্তারবাবু। আমার দোকান থেকেই লোক গিয়ে দিয়ে আসবে। এর আগে সদাশিববাবুও চমৎকার লোক ছিলেন। ভারি অনুগ্রহ ছিল আমাদের ওপর। সব এই দোকান থেকেই নিতেন।'

চমৎকার লোক ব'লে গণ্য হবার ইচ্ছা সুরমার বাবারও হোল, বললেন, 'আচ্ছা, হ্যারিকেন আছে আপনাদের এখানে? আমার একটা হ্যারিকেন দরকার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যারিকেন আছে, টর্চ আছে। সব পাবেন এখানে।'

সুরমা বলল, 'একটা টর্চও নাও বাবা। রাত্রে কোথাও বেরুতে টেরুতে হ'লে টর্চেই সুবিধা।'

সুবিমলবাবু হাসলেন, 'হ্যাঁ, নাম যখন শুনেছ টর্চ, একটা না নিয়ে তুমি কি আর ছাড়বে। ছেলেবেলায় টর্চ একটা পাশে জ্বেলে না রাখলে তোমার ঘুম হোত না।' মনে মনে ভারি লজ্জিত হোল সুরমা। খেলনা হিসাবে টর্চটা সে পছন্দ করত মনে আছে। কিন্তু সে কথা আবার কেউ তোলে নাকি। বাবার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে!

টর্চ ছাড়া আরো দুই একটা দরকারী স্টেশনারী জিনিস কিনে নিল সুরমা। টর্চের ভিতরে ব্যাটারী ভ'রে জ্বালিয়ে, একটু পরীক্ষা ক'রে দেখিয়ে দিয়ে মানিক স্মিতহাস্যে বলল, 'নিন। খাঁটি জার্মানীর জিনিস। যুদ্ধের বাজারে এসব মাল এখন আর আসে না। যেমন মজবুত তেমনি—'

সুরমা বাবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'বিজয়া স্টোর্সের কোন জিনিসই এঁরা খারাপ বলবেন না। চল বাবা।'

বিকেলের দিকে মানিকই গেল সুরমার চশমার ডেলিভারি দিতে। কেবল ফ্রেম নয়, নতুন খাপও নিয়ে এসেছে একটা।

সুবিমলবাবু হাসপাতালে গেছেন। টাকা দিয়ে সুরমাই রাখল জিনিস। বলল, 'একি, আবার খাপ কেন, আব একটা খাপ তো আমার ছিল।'

মানিক বলল, 'নিন না। নতুন ফ্রেম করালেন। নতুন একটা কেসও ইউজ ক'রে দেখুন না। আপনার পুরোন খাপটার রঙ উঠে গিয়েছিল, দেখতেও তেমন ভালো ছিল না।'

সুরমা মনে মনে হাসল। জিনিস বিক্রি করবাব ফন্দী। ঝানু দোকানদার মানিক। কিন্তু চামড়ার নতুন ধরনের কেস-এর সবুজ রঙটা সত্যিই ভারি ভালো লাগল সুরমার। পছন্দ আছে মানিকের, রঙ চেনে।

তারপর মাসেব পর মাস চেনাজানাটা এগিয়ে চলল। সুরমার মা-বাবা দু'জনেই মানিককে পছন্দ করলেন। ভারি চালাক চতুর ছেলে। বাপ-মা অল্পবয়সেই গেছেন ব'লে পড়াশুনোটা তেমন অগ্রসব হ'তে পারেনি, কিন্তু বিদ্যার অভাবটা বুদ্ধি দিয়ে অনেকখানি পুষিয়ে নিয়েছে মানিক। আলাপ টালাপে সহজে ধরা পড়ে না যে, মানিকের বিদ্যা থার্ডক্লাস পর্যন্ত। মফঃস্বল শহরের একটা স্টেশনারী দোকানে সাধারণ সপ-এ্যাসিস্টান্টের কাজ করে।

সুরমার মা একদিন বললেন, 'পড়াটা যদি না ছেড়ে দিতে মানিক—'

মানিক হেসে জবাব দিল, 'তাহলে নির্ঘাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতাম মাসীমা। পড়াশুনোব ফল যে কি তা তো রমাদিই দেখাচ্ছেন। যে ভাবে বই নিয়ে উপুড় হয়ে আছেন দিনরাত তাতে এবার আর ফ্রেম পাল্‌টালে চলবে না, গ্লাস পালটাতে কলকাতায় ছুটতে হবে।'

সুরমা বই-এর পাতায় চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, নিজে আকাট মূর্খ হয়ে আছ কিনা, তাই আব কারো পড়াশুনো দেখতে পার না। ভাবো সবাই তোমার মত—'

ইণ্টারমিডিয়েট সিভিকসের পাতা থেকে চোখ তুলে এবার মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে সুরমা হাসল। কিন্তু মানিকের মুখে হাসি নেই, সে মুখ বেদনার্ত যন্ত্রণাকাতর। যেন অকস্মাৎ ঘা খেয়েছে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে।

সুরমার মা ধমকে উঠলেন, 'ইস্, গরব দেখ মেয়ের। ভারি তো পড়াশুনো তার আবার—। সবাই কি সমান সুযোগ সুবিধা পায় সংসারে?'

সুরমা লজ্জিত অনুতপ্ত সুরে বলল, 'আমি ঠাট্টা করছিলাম মানিক।'

মানিক জবাব দিল, 'জানি রমাদি, ঠাট্টা ছাড়া আপনি আর কি করবেন।'

বয়সে হয়ত বছর খানেকের চেয়ে বেশী ছোট হবে না মানিক। কিন্তু বিদ্যায়, পদমর্যাদায় একেবারেই নগণ্য। তাই বাবা-মার সঙ্গে সুরমাও কেমন ক'রে যে একদিন তাকে তুমি বলতে শুরু করেছিল খেয়াল ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ক্ষোভ হোত সুরমার, সত্যি সত্যিই যদি ওকে এমন তুচ্ছার্থে 'তুমি' বলতে না হোত। 'আপনি' সম্বোধনের যোগ্য হ'লে যেন আরো বেশী আপন হয়ে উঠত মানিক। সুরমার পড়াশুনো নিয়ে মানিক মাঝে মাঝে নিজের ধরনে ঠাট্টা তামাসা করত। সে তামাসাটা তীক্ষ্ণ এমন কি বিদ্বেষমূলকও হোত একেক সময়। কতকগুলি বইয়ের রাশ

যে দু'জনের মাঝখানে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রাখবে তা যে মানিকেবও সহ্য হোত না, একথা সুবমার বুঝতে বাকি থাকত না। বুঝেও চুপ ক'রে থাকত সুরমা।

কিন্তু চুপ ক'রে থাকবার ছেলে মানিক নয়। যখনই আসত হই চই ক'রে বাড়ি মাথায় ক'রে তুলত। বিজয়া স্টোর্সের মালিক যাতায়াতটা অপছন্দ করতেন না। মানিকই যে একটা গ্রামোফোন আর একটা দেয়াল-ঘড়ি ডাক্তারবাবুদের গছিয়েছে তা তিনি জানেন। তাছাড়া ফি মাসেই কিছু না কিছু দরকারী জিনিস মানিক বিক্রি করছে সুরমাদের কাছে। এমন ক'রে ধরে পড়ত মানিক, এমন ক'রে জিনিসের গুণ আর অপরিহার্যতা বর্ণনা কবত যে না নিয়ে জো থাকত না, নিজেদেব দোকানের জিনিস সুরমাদের দিয়ে কেনাতে পারলে যেন তার আনন্দের সীমা থাকে না।

এ সব সত্ত্বেও সুরমার মা-বাবা যথেষ্ট খুশী ছিলেন মানিকের ওপর। বাজারে কোথায় কোন জিনিস সস্তায় মিলবে সব মানিকের নখদর্পণে। একবার মুখের কথাটি বললেই হোল মানিক তখনি ছুটবে তার সাইকেল নিয়ে। কোথায় খাঁটি সবষের তেল মেলে, সুরমার দেড় বছরের রোগা ছোট ভাইয়ের জন্যে কোথায় পাওয়া যায় ছাগলের দুধ, গাছপাকা পেঁপে আর বেল ভালো খান সুরমার বাবা, বাজারের চেয়েও বেশী সরেস অথচ সস্তা দামে গাঁয়ের চাষী-বউদের কাছ থেকে কি ক'রে তা সংগ্রহ ক'রে আনতে হয় মানিকের মত কেউ জানে না।

কিন্তু কেবল বেল আর পেঁপে নয় সেই সঙ্গে অদরকারী কিছু না কিছু ফুলও নিয়ে আসে মানিক। সাত মাইল দূরের খাড়াডাঙার বিল থেকে তুলে নিয়ে এল হয়ত একরাশ শ্বেত পদ্ম, চৌধুরীদের পুকুর থেকে দুর্লভ দু'টি লাল সাপলা, কি মল্লিকদের লম্বা লম্বা ডাটাসুদ্ধ এক গোছা সাদা চন্দ্রমল্লিকা। ব্লাউজের হাতায় লতানো নীল বর্ডার তুলতে তুলতে সুরমা বলে, 'এসব আবার তোমাকে কে আনতে বলল।'

মানিক হাসে, 'জানেন না বুঝি। টুলুটা ফুলের জন্যে একেবারে ঝুলোঝুলি। তাই আনলাম।'

টুলু সুরমার ছ'বছরের বোন। মানিকের কথাব ভঙ্গিতে সুরমাও হাসে, তাবপর মানিকের হাত থেকে ফুলগুলি নিয়ে তার সামনেই নিজের টেবিলের দু'টো ফুলদানি সাজিয়ে রাখে।

কাটল বছব দেড়েক। আই. এ.-এর রেজাল্ট বেরুল সুরমার। বাড়িতে পড়েও ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। সবাই খুশী। মানিক বলল, 'এমন কি আর বাহাদুরী। দিন বাত পড়ে থাকতে পারলে আমি আরো এক ডিভিশন ওপরে উঠতে পারতুম।'

সুরমা হেসে বলল, 'তা তো পারতেই। আপাতত এই তক্তাপোশেব ওপরে উঠে বড় ঘড়িটাকে একটু ঠিক ক'রে দাও দেখি। দুদিন ধ'রে ঘড়িটার নড়ন-চড়ন নেই। যেমন বাজে মার্কা জিনিস---'

মানিক বলল, 'বিজয়া স্টোর্সের কোন জিনিসই বাজে মার্কা নয়---'

সুবমা অপূর্ব ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকালো, 'তার মানে বলতে চাও বিজয়া স্টোর্সের বাইরে যা কিছু আছে সবই বাজে। আমিই ঘড়ি হ্যাণ্ডেল কবতে জানি না।'

মানিক বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। যারা ওস্তাদ, যাদেব হাতের গুণ আছে তাদের হাতে বাজে জিনিসও বেশিদিন লাস্ট করে। আর---'

সুবমা ঠোঁট টিপে হাসল. 'আচ্ছা, তোমার ওস্তাদী, তোমার হাতের গুণটা একবার দেখি।'

দেয়াল-ঘড়ি সুরমার ঘরে। মানিক সুরমার বিছানাটা নিজের হাতে একটু গুছিয়ে নিয়ে তার ওপর উঠে ঘড়িটা পেড়ে আনল। তারপর ঘরের মেঝের ওপরই খুলে ফেলল সমস্ত কলকব্জা।

সুরমার মা বললেন, 'তুই তো আচ্ছা মানুষ বাপু। পাগলকে ক্ষেপিয়ে দিলি। এবার সারা রাত ভুগবে কে?'

সুবমা মানিকের দিকে তাকিয়ে ছদ্ম কোপে বলল, 'ভুগবে আবাব কে। যে ওস্তাদীর বড়াই করছিল সেই ভুগে মরুক, আমাদের কি। ঘড়ি ঠিক ক'রে না দিলে উঠতে দেব না, রাত যতই হোক।'

উঠতে না দিলেও গা ধোয়া চুলবাঁধা শেষ করে চাঁপা ফুলের রঙের শাড়িখানা পরে নিজের হাতে সুরমা চা আর জলখাবার এনে দিল মানিককে।

মানিক একবার একপলক তাকিয়ে কি দেখল, তারপর ফের মুখ গুঁজল ঘড়ির কলকব্জার মধ্যে।

সন্ধ্যা উতরে গেল। সাতটা বাজল, আটটা বাজল, সুরমার বাবার হাতঘড়িতে ন'টা বাজল রাত।

সুরমা বলল, 'কি ব্যাপার, ঘরখানা পুরোপুরি দখল করবার মতলব আছে নাকি ? তোমার ঘড়ি বন্ধ আছে ব'লে বিশ্বসুদ্ধ লোকের ঘড়ি অচল হয়েছে ? রাত কত হোল দেখতো।'

মানিক চমকে উঠে সুরমার মুখের দিকে তাকাল। যেন রাত ক'টা হয়েছে তা লেখা আছে সুরমার মুখে !

একটু বাদে মানিক ঘড়িটাকে তুলে ফের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এবার চলছে।'

সুরমা চেয়ে দেখল সত্যিই চলা শুরু করেছে ঘড়ি। তারপর ফিরে দেখল মানিক একেবারে দোরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুরমা বলল, 'ওকি পালাচ্ছে যে। খেয়ে যাবে না ?'

মানিক বলল, 'না যাই।'

মানিক চলতে শুরু করল।

কিন্তু ছুটে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল সুরমা, 'এই শোন শোন। এত অন্ধকারে কি ক'রে যাবে একা একা ? আলো নিয়ে যাও।'

'না না, আলো লাগবে না, বেশ যেতে পারব।'

কিন্তু গেল না মানিক। একটু যেন থেমে দাঁড়াল জানালার ধারে।

সুরমা বলল, 'হুঁ, যেতে পারবে বললেই হোল আর কি। যাওয়া যেন অতই সোজা।' তারপর বালিশের তলা থেকে টর্চটা এনে জানালার শিকের ভিতর দিয়ে গলিয়ে জোর ক'রে মানিকের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা সঙ্গে নিয়ে যাও।'

খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে শুতে এগারটা হোল। ঘরের আলো নিবিয়ে দিল সুরমা। পাশে বাবার ঘরেরও আলো নিবেছে। গরমের দিন। ঘরের সবগুলো জানালা খুলে দিল সুরমা। এতক্ষণ গুমোট ছিল, এবার বেশ বাতাস আসছে, কিন্তু কেবল বাতাস নয়, হঠাৎ এক ঝলক আলোও এসে পড়ল ঘরের মধ্যে।

ব্যাপার কি, কিসের এ ভুতুড়ে আলো। সাহসের অভাব নেই সুরমার। বিছানা থেকে জানালার ধারে উঠে এসে বলল, কে ?'

সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা আবার জ্বলে উঠল, 'আমি।'

শিউরে উঠল সুরমার সর্বাঙ্গ, মানিক। তার হাতেই কেবল টর্চ জ্বলছে না। টর্চের চেয়েও হিংস্রভাবে জ্বলছে দুটো চোখ।

'তুমি ? কি চাও এখানে ? তুমি এখনো যাওনি !'

'না যাইনি, যেতে পারিনি। যাওয়া কি অতই সোজা ?'

পাশাপাশি ঘর, সুরমার বাবা ঘর থেকে উঠে এলেন, 'কে, কে ওখানে ? দরজা খোল রমি।'

অত্যন্ত তিক্ত স্বর সুবিমলবাবুর।

সুরমা বলল, 'দরজা খুলে কি হবে বাবা। চোর ঘরে ঢুকতে পারেনি। জানালার বাইরে দাঁড়িয়েছে।'

বাজের আওয়াজ বেরুল সুবিমলবাবুর গলায়, 'বাহাদুর সিং, পাকড়াও শুয়োরের বাচ্চাকো।'

বাহাদুরের আগে আগে ছড়িহাতে ছুটে গেলেন সুবিমলবাবু।

আশ্চর্য, মানিক ছুটে পালাতে পারত কিন্তু পালাল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল নেপালী দারোয়ান বাহাদুরের হাতে।

বাহাদুর টর্চটা কেড়ে নিল মানিকের হাত থেকে। তারপর ডাক্তারবাবুর হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদিমণির টর্চ। চোট্টা চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছিল।'

সুবিমলবাবু টর্চটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন শান-বাঁধানো সিঁড়ির ওপর। সামনের কাচটা চৌচির হয়ে ফেটে গেল।

পরদিন মেথর এসে ভাঙা টর্চটা দেখতে পেয়ে বলল, 'নেব দিদিমণি ?'

সুরমা কোন কথা বলল না, কেবল ইশারা করল হাতের।

বই শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বুঝি মিনিটখানেক বসে ছিল সুরমা। নিরুপম তার কাঁধে আলগোছে আঙুল ছোঁয়াল, 'ব্যাপার কি, একেবারে তন্ময় হয়ে গেছ দেখছি। আর কিছু দেখবার নেই। এবার ওঠো। যত সব রাবিশ বাজে গল্প। ব'সে ব'সে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে আমার। প্রেমের সঙ্গে পলিটিক্সের জগা-খিচুড়ি। কিচ্ছু হয়নি।'

সুরমা একটু যেন অবাক হোল, 'পলিটিক্স!'

নিরুপম বলল, 'তবে দেখলে কি এতক্ষণ ধ'রে?'

সমস্ত হল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সুসজ্জিত তরুণ তরুণীর দল বেরুচ্ছে সদর দরজা দিয়ে। যেন রঙের ধারা। আর এক দল ঢুকবার জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে। স্বামীর পিছনে পিছনে বেরিয়ে এসে ভারি স্বস্তি বোধ করল সুরমা। অন্ধকার ঘরে ভুতুড়ে টর্চের আলো আর দেখতে হবে না।

কিন্তু টর্চের কথাটা নিরুপম ভোলেনি দেখা গেল। বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'তার চেয়ে আমার গল্পটা যদি শুনতে, বাজি রেখে বলতে পারি অনেক ভালো লাগত। কিন্তু বলতেই দিলে না আমাকে।' সুরমা জোর ক'রে একটু হাসল, 'আচ্ছা, এবার না হয় বলো।'

নিরুপম বলল, 'না, বলবার মুড আর নেই, 'মায়ামৃগ' সমস্ত মেজাজ নষ্ট ক'রে ফেলেছে। মোট কথা অল্প বয়সে টর্চের আলোয় একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখতে গিয়ে তাড়া খেয়েছিল মানিক। অথচ গোড়ার দিকে নাকি মেয়েটির ভারি সহানুভূতি ছিল। মুখ দেখতে দিতে খুব যে আপত্তি ছিল তার রকম-সকমে মনে হোত না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাপ-মার ধমক আর চোখ রাঙানিতে মেয়েটি বেশ নির্বিবাদে ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢাকল। মেয়েদের মত সেয়ানা জাত তো আর নেই।'

সুরমা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আর ছেলেটি।'

নিরুপম বলল, 'ছেলেটিকে তো দেখলেই। ধরা পড়ে কেবল তাড়াই নয় বেদম মারও খেতে হোল তাকে। দম নেওয়ার জন্য পালাল দেশ ছেড়ে। বছর কয়েক ভ্যাগাবণ্ডের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল। চুরি-জোচ্চুরি না করল এমন কাজ নেই। তারপর কি ক'রে জোটাল এই শো-হাউসের চাকরি। আবার হাতে পেল টর্চ। পথ দেখাবার ছলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরতে লাগল মেয়েদের মুখের ওপর। কেউ কেউ মুখ বুজে সইল, কেউ কেউ প্রতিবাদ করল। ফের তাড়া খেল মানিক কিন্তু বাংলাদেশে সিনেমা হাউস তো দু'একটা নয়। টর্চ হাতে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াল মানিক, শহরতলী থেকে শহরে উঠে এল! হাতে টর্চ। আর টর্চের সামনে বিব্রত লজ্জিত ত্রস্ত এক একখানি মুখ।'

সুরমা বলল, 'খুব হয়েছে, এবার থাম।'

নিরুপম হাসল, 'কিন্তু এক-একখানি মুখ নয়, মাত্র একখানি মুখই তার লক্ষ্য! টর্চের আলোয় মানিক আজও সেই মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

সদর দরজার কড়া নাড়তে ঝি এসে দোর খুলে দিল। স্বামী-স্ত্রী ভিতরে ঢুকল দু'জনে। দোতলায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একখানা বৈঠকখানা। নিরুপমের মক্কেলরা এসে বসে। আর একখানা শোয়ার ঘর। স্ত্রীকে কাপড় ছাড়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য খানিকক্ষণের জন্য নিরুপম বসবার ঘরে গিয়েই ঢুকল। সুরমা ঢুকল নিজের ঘরে। দামী খাট, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, শাড়ি আর শৌখিন জিনিসে বোঝাই কাচের আলমারী, বইয়ের সেলফে ঘর সাজিয়েছে সুরমা। পৈতৃক পেশার সঙ্গে কিছু পরিমাণ পৈতৃক বিত্ত-সম্পত্তিরও নিরুপম উত্তরাধিকারী হয়েছে। মোটামুটি সচ্ছল সুখের সংসার দু'জনের কিন্তু আজ ঘরে ঢুকে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সুরমা। কি যেন একটা মনের মধ্যে মুহুর্মুহুঃ বিঁধছে। সত্যিই সুরমা দায়ী মানিকের এই অধঃপতনের জন্য? সত্যিই কি অন্যায় করেছিল সে? সত্যিই কি আর কিছু তার করবার ছিল?

বাথরুমে ঢুকে আর একবার ভালো ক'রে স্নান ক'রে নিল সুরমা। সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু মন ঠাণ্ডা হয় না।

খাওয়া দাওয়া শেষ হোল। নিবল ঘরের আলো। খানিকবাদে নিরুপম ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম

আসে না সুরমার। যতবার চোখ বোজে ততবার যেন ঘরের মধ্যে টর্চের আলো দেখতে পায়। শো হাউসের সেই ভুতুড়ে জোনাকির আলো। বারবার জ্বলছে আর নিবছে। আবার উঠে বাথরুমে গেল সুরমা। ভালো ক'রে চোখ মুখ আর মাথা ধুয়ে এল। এবার দু'চোখ ভেঙে ঘুম এল। কিন্তু ঘুম ভাঙতেও দেরি হোল না। একটা তিন ব্যাটারীর টর্চ কে যেন সুরমার মুখের ওপর জ্বেলে ধরেছে। ভালো ক'রে চোখ মেলতে পারছে না সুরমা, চোখ বুজতেও পারছে না।

সত্যি সত্যিই যখন ঘুম ভাঙল, ঘরের মধ্যে নরম নীলাভ আলো জ্বলছে শেডের আড়ালে। নিরুপম তাকে সস্নেহে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে, 'কি ব্যাপার, এমন চীৎকার ক'রে উঠলে কেন?'

সুরমা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও তুমি! কিছু না, স্বপ্ন দেখছিলাম,' একটু হাসতে চেষ্টা করল সুরমা, 'তোমার সেই টর্চের স্বপ্ন।'

একটু যেন ছায়া পড়ল নিরুপমের মুখে তারপর সেও হাসতে চেষ্টা করল, 'আচ্ছা ভয়কাতুরে মানুষ তো! কিন্তু গল্প বলতে পারি স্বীকার করো তাহ'লে?'

সুরমা চোখ বুজে বলল, 'তা পার।'

অবশ্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিরুপমের কাছে টর্চের ব্যাপারটা নিতান্তই গল্প। তারপর গোলকগঞ্জের পরেও আরো দু'তিন জায়গায় বদলি হয়েছিলেন সুরমার বাবা। কিন্তু সুরমা আব তাঁব সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াযনি। দাদা বউদিব কাছে কলকাতায় একটানা কাটিয়েছে। দাদার বন্ধু নিরুপম দত্ত। সেই সূত্রে আগেও আলাপ ছিল। পরে আরো ঘনিষ্ঠতা হল। তাবপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে বিয়ে হয়ে গেল। গোলোকগঞ্জের কোন কথাই ওঠেনি। ওঠবার মত কথা কি-ই বা ছিল। তবু একেকদিন সুরমা ভেবেছে স্বামীকে সব খুলে বলবে। কিন্তু কোথায় যেন বেধেছে। কাহিনীটা কৌতুকের, তবু সবটুকু যেন কৌতুকের নয়।

পরদিন বেলা দশটায় খেয়ে দেয়ে কোর্টে বেরুল নিরুপম; সুরমা নতুন টাই পরিয়ে দিল স্বামীকে। কেসে ভরতি করল সিগারেট।

কিন্তু স্বামী বেরিয়ে যেতেই মনটা ফের কেমন এক ধরনের অস্বস্তিতে ভ'রে উঠতে লাগল। কাল মানিককে না দেখলেই যেন ভালো হোত, স্বস্তি পেত ওর কাহিনী এমন ক'রে না শুনলে। অবশ্য নিজের দায়িত্বই যে সুরমার ষোল আনা তা সে স্বীকার করে না। মানিক তার নিজের কৃতকার্যের ফল ভুগছে। শাস্তি পাচ্ছে নিজের দুষ্কর্মের। কিন্তু পরক্ষণেই সুরমার মনে হোল শাস্তিটা যেন বড় বেশী নিষ্ঠুর। মানিকের সেই একদিনের চাপল্যের অপরাধে সুরমাদের পরিবাব থেকে সে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হয়েছিল, তাব এতদিনের সেবা-পরিচর্যা সব ধুয়ে মুছে গিয়েছিল, এতদিনের স্নেহ, সহানুভূতি, অনুকম্পার কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না সুরমার মা-বাবা, এমন কি সুরমারও মনে—তা সুরমা সহজভাবেই মেনে নিয়েছিল। এই তো স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু চিরজীবনের জন্য মানিকের এই উচ্ছন্নে যাওয়া, তার এই মনোবিকৃতি যেন সুরমাকে বারবার পীড়া দিতে লাগল। ঘরের কাজে মন বসল না, মন বসল না আধখানা পড়া নতুন নভেলে।

পাড়ার মধ্যেই সিনেমা। নিরুপমের বলা আছে যখন একা একা মন খারাপ লাগবে তখন সিনেমায় গিয়ে বসবে। কিন্তু কোনদিন স্বামীর এ পরামর্শ সুরমা গ্রহণ করেনি। আজ ভাবল যায়। কাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় বইটা ভালো ক'রে কিছু বুঝতেই পারেনি, আজ আবার গিয়ে দেখবে। তারপর ফের যদি দেখা হয় মানিকের সঙ্গে, আজ একা পেয়ে সত্যিই সে যদি তার মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে ধরে, সুরমা চেঁচিয়ে উঠবে না, বাধা দেবে না, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পরম শুভাকাঙ্খিনীর মত উপদেশ দেবে, 'এসব চপলতা ছাড়ো মানিক, বিকৃতি দূর কর মনের। সৎ হও, সুন্দর হও, বলিষ্ঠ হও, সুখী হও জীবনে।'

একটু যেন পা কাঁপল সুবমার, কিন্তু নিজের চিত্তদৌর্বল্যের জন্য পরমুহূর্তে নিজেই সে হেসে উঠল। দিনে দুপুরে কিসের এত ভয়। দেখাই যাক না, কি বলে মানিক, কি করে। সুরমা আর কিছুতেই ঘাবড়াবে না। ভয় পাওয়ার দিন আর তার নেই।

আড়াইটায় শো আরম্ভ। কিন্তু টিকেট কেটে আজ প্রায় মিনিট পনের আগে গিয়েই হলে ঢুকল

সুরমা। ঢুকেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। পরিষ্কার দিনের আলো ঘরের মধ্যে। এ-ঘরে তো টর্চ জ্বলবে না। অন্য একটি ছেলে এসে টিকেট দেখে আসন দেখিয়ে দিয়ে গেল সুরমাকে। সমস্ত ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখল সুরমা। কোথাও মানিকের দেখা নেই। সময় আর কাটে না। দু'আনা দিয়ে একখানা বই কিনল সিনেমার। নিল আইসক্রীম।

অবশেষে দোর বন্ধ হোল, অন্ধকার হোল ঘর। ফের ঢুকতে লাগল বিলম্বিত আগন্তুক দল। আট দশটা টর্চের আলো ফের জ্বলতে নিবতে শুরু করল। সুরমা লক্ষ্য করল মানিক এসেছে। হ্যাঁ, কালকের মত প্রথম শ্রেণীর দ্বাররক্ষক হয়েই দাঁড়িয়েছে সে। বুকের মধ্যে একটু কেঁপে উঠল সুরমার। বেশীর ভাগ আসনগুলিই ফাঁকা। ম্যাটিনী শোয় উঁচু শ্রেণীর খুব কম লোক এসেছে ছবি দেখতে। স্ত্রীপুরুষ দু'চারজন যারা ঢুকছে টর্চের সাহায্যে তাদের মানিক বসিয়ে দিয়ে গেল। দু'একজনের সীট একেবারে কাছাকাছি চেয়ারগুলোতে। গাটা শিরশির ক'রে উঠল সুরমার। কিন্তু মানিকের যেন কোন দিকে কোন লক্ষ্য নেই। সুরমা ভাবতে লাগল, মানিক কি তাকে সত্যিই লক্ষ্য করেনি, চিনতে পারেনি, নাকি চিনেও না-চিনবার ভান করছে?

পর্দায় ফের 'মায়ামৃগে'র অভিনয় চলতে লাগল। দর্শকদের উল্লাসে মাঝে মাঝে চমক ভাঙতে লাগল সুরমার। কিন্তু আজও তার অন্যমনস্কতা ঘুচল না। আজও বইয়ের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না সুরমা। বিরক্ত হয়ে বই শেষ হবার অনেক আগেই সে উঠে পড়ল।

দোরের কাছে আবার ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠেছে। হ্যাঁ, মানিকের হাতেরই টর্চ। কিন্তু মুখের কাছে নয়, পায়ের কাছে।

মানিকের চোখে কোন ঔৎসুক্য নেই, কৌতূহল নেই, পরিচয়ের চিহ্ন নেই। কিংবা মানিক তাকায়নি তার দিকে, নিতান্ত অভ্যস্তভাবে সুইচ টিপেছে টর্চের। সুরমা একটু থামল, একটু ইতস্তত করল। মানিক যন্ত্রবৎ দোরের দিকে টর্চটা আরো একটু বাড়িয়ে ধ'রে কালো পর্দাটা ফাঁক ক'রে দিয়ে বলল, 'যান, এই তো রাস্তা।'

আধোখোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুরমা। কিসের একটা ব্যর্থতা আর অপমানে বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে। আজও মানিক তাকে অপমান করেছে। মুখের ওপর টর্চের আলো জ্বেলে নয়, না-জ্বেলে। আজ আর দুঃসহ রকমের উজ্জ্বল নয় মানিকের টর্চ। ভারি ক্ষীণ, নিবুনিবু। আর পরিচয়ের আলো একেবারেই নিবে গেছে।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

অমনোনীতা

ভিড় দেখে আগের বাসটি ছেড়ে দিয়েছি। দ্বিতীয়টিতে দেখি ভিড় আরও বেশি। ভিতরে বহু যাত্রী দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। একবার ভাবলাম, এটাও ছাড়ি। কিন্তু ঘড়ির দিকে চেয়ে মত বদলাতে হল। বারোটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। রবিবার হলেও বাসায় ফিরতে আরও বেশি দেরি করা সঙ্গত হবে না।

সরকারী বাস স্টার্ট দিয়েছিল, ড্রাইভারকে হাতের ইশারায় গতি মন্থর করতে বলে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লাম। টাক-পড়া একজন প্রৌঢ় সহযাত্রীর সঙ্গে একটু ধাক্কা লাগল, তিনি একটু বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলেন, 'অনেকক্ষণ তো দাঁড়িয়ে ছিলেন মশাই, কিন্তু গাড়ি চলতে শুরু করলে তবে উঠলেন কেন? একটু আগে উঠতে কি হয়েছিল আপনার?'

এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে আমি সামনের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। কোথাও বসবার জায়গা নেই। সমস্ত বেঞ্চগুলি যাত্রীতে ঠাসা। বাকি যাঁরা বসতে পারেনি তাঁরা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথার উপরকার রড থেকে ঝুলন্ত চামড়ার একটা হাতল আমিও ধরলাম। সামনের লেডিস সীটে একটি মেয়ে একেবারে জানলার ধার ঘেঁষে বসে রয়েছে। বেঞ্চের যতটুকু

স্থান দখল করে রয়েছে তার চেয়ে অনধিকৃত স্থান রয়েছে বেশি। দেখলাম জায়গাটুকুর দিকে আরও কয়েকজনের লুব্ধ চোখ বার বার পড়ে ফিরে যাচ্ছে। মনে মনে একটু হাসলাম। পাশের স্থানটুকুই শুধু দর্শনীয় নয়। দেখবার বস্তু আরও আছে। পিছন থেকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে পিঠের ওপর নুয়ে পড়া এলো খোঁপাটি। সাদা ব্লাউজের নীচে ঈষৎ পুষ্ট বাহুমূলের ডৌলটি বেশ চমৎকার। ব্লাউজের হাতায় সবুজ রঙের সূক্ষ্ম দুটি রেখার চারু শিল্প, কানে অর্ধচন্দ্রাকৃত আধুনিক রুচির ইয়ার-রিং দুটিও বেশ মানিয়েছে। পরনে চওড়া খয়েরী-পেড়ে মিহি সাদা খোলের শান্তিপুরী, গায়ের রঙটা একটু ফরসা হলে বেশ মানাত। কিন্তু রঙ ফরসা নয়, এমন কি শ্যামবর্ণও নয়, দিব্যি কালো। তবু সমস্ত মিলিয়ে বেশ লাগছিল। রূপের বিচারে রঙ তো সব নয়, রুচিই অনেকখানি।

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ প্রবল এক ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিলাম। উল্টো দিক থেকে একখানা বেসরকারী বাস বাঁ থেকে ডাইনে সরে এসে একটু বোধ হয় পথের রীতি লঙ্ঘন করেছিল। আমাদের ড্রাইভার হঠাৎ ব্রেক কষে সংঘর্ষ বাঁচিয়েছে। কিন্তু আমি ঠিক মান বাঁচাতে পারলাম না, পুরোবর্তিনীর কাঁধের সঙ্গে বেশ একটু লেগে গেল। মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে এবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, আমিও একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললাম, 'সরি। খুব লাগল ?'

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে মেয়েটি বলল, 'আপনি ? বসুন।'

আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে মেয়েটি আবার একটু হাসল : 'সঙ্কোচ করবেন না, আপনি আমাকে চেনেন কিন্তু আপনার বোধ হয় মনে নেই।'

আমি বললাম, 'আছে।'

মেয়েটি আরও একটু জায়গা করে দিয়ে বলল, 'আসুন।'

এবার আর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলাম না। পাশে গিয়ে বসলাম মেয়েটির। মেয়েটি আর কেন, চিনে যখন ফেলেছি, আসল নামটাই বলি। ফুল্লরার সঙ্গে এমন ভাবে দেখা হবে কোনদিন ভাবিনি। পিছন থেকে ওকে কেন যেন কুমারী মনে হয়েছিল। পাশে বসে দেখলাম, তা নয় মাথায় আঁচল না থাকলেও সিঁদুর আছে। কপালে আছে সুগোল সুন্দর একটি ফোঁটা। আশ্চর্য, সিন্দূরে ফুল্লরাকে এমন সুন্দর মানাবে সেদিন ভাবতে পারিনি। মানিয়েছে বটে, কিন্তু এ সৌন্দর্যের মধ্যে কোথাও যেন একটু নিষ্ঠুরতা আছে। একজনের সিঁথির সিঁদুরের সঙ্গে কি আর একজনের হৃদয়ের একটি রক্তাক্ত আঁচড়ের তুলনা চলে ?

উপমাটুকু মনে আসায় নিজেই ভারি লজ্জিত হলাম। ছিঃ, মনের এ কি কাঙালপনা ? ফুল্লরার সঙ্গে কোনদিন কি আমার হৃদয়ের সম্পর্ক হয়েছে যে তাতে আঁচড় পড়বে ? মাত্র একদিনই তো দেখা হয়েছিল ফুল্লরার সঙ্গে। মানে দেখতে যেতে হয়েছিল।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখলাম, ফুল্লরা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে ছুটে চলেছে 'আট-এর বি' স্টেট বাস। আমিও একটু বাইরের দিকে তাকালাম। খোলা জানলা দিয়ে একটি সাদা দ্বিতল বাড়ি চোখে পড়ল। দোর বন্ধ, জানলায় নীল রঙের পর্দা।

মনে হল ফুল্লরাদের জানলার পর্দার রঙও এমনি নীল ছিল। কিন্তু রঙপুরের সেই বাড়িটির দোর-জানলা আজকের মতো এমন বন্ধ ছিল না। বরং রাত এগারটা পর্যন্ত বাড়ির অন্দর সব খুলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে ছিলেন রাজেনবাবু। তাঁকে অত রাত অবধি বাইরে বসিয়ে রাখবার দায়িত্ব অবশ্য মোটেই আমার নয়। কি একটা গোলমালে গাড়ি পুরো দুটি ঘণ্টা লেট। চলন্ত গাড়িতে উঠে হঠাৎ যদি অচল হয়ে পড়তে হয়, আমার ধারণা কেউ ধৈর্য রাখতে পারে না। চঞ্চল হয়ে ওঠে সকলের মনই। অত রাত্রে অপরিচিত জায়গায় গাড়ি থেকে নেমেছি বলেই যে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল তা নয়, ধৈর্য হারিয়েছিলাম তার অনেক আগে। এ সব দুর্ভোগ ভোগবার কথা দাদার, আমার নয়। মেয়ে দেখতে তাঁরই প্রথমে আসবার কথা। প্রাথমিক নির্বাচনের কাজ তিনি সারবেন। তারপর তাঁর পছন্দ হলে রাজেনবাবু মেয়ে নিয়ে আসবেন কলকাতায় তাঁর আত্মীয়ের বাসায়। সেখানে সবান্ধবে আমি গিয়ে দেখব এবং মনোনয়ন সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত জানাব। এই

ছিল গোড়ার দিকে বন্দোবস্ত। কিন্তু অফিস থেকে দাদার ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায়, অফিসই কামাই করে ছুটতে হয়েছে আমাকে।

বলেছিলাম, 'এবারও তারিখ বদলাও, টেলিগ্রাম করে দাও— ছুটি পেলাম না।'

দাদা বললেন, 'তাই কি হয়, এই ছ'মাস ধরে চিঠিতে টেলিগ্রামে কেবল তারিখ পাল্টাচ্ছি। ভদ্রলোকেরা কি মনে করছেন বল্ তো! অত আগ্রহ তাঁদের।'

সত্যিই রাজেনবাবুদের আগ্রহের মাত্রাধিক্যটা আমি নিজেও লক্ষ্য না করে পারিনি। নিজেদের অসুবিধার কথা জানিয়ে যতবার আমরা তারিখ স্থগিত রেখেছি, ততবার তাঁরা জোর তাগিদ দিয়েছেন, 'দয়া করে ছুটি নিন, ছুটি নিয়ে একবার কেউ আসেন আপনারা। আরো দু-একটা সম্বন্ধের আলোচনা চলছে। কিন্তু আপনাদের কথা না পেলে আমরা কোনদিকেই এগুতে পারছি না।'

দাদাকে বলেছিলাম, 'বেশ তো, ওদের এগুতে দাও না, আমরাই না হয় একটু পিছিয়ে থাকি।'

কিন্তু দাদা তাতে রাজী হন না : 'ছিঃ, সে বড় অভদ্রতা হবে। এতদিন ধরে যখন আলোচনা চলছে, ওঁরাও এত আশা করেছেন, পছন্দ হোক না হোক, একবার গিয়ে দেখে আসা দরকার।'

বললাম, 'বেশ, তুমি তা হলে ভদ্রতা রক্ষা করে এস।'

দাদা বললেন, 'তাই যাব।'

কিন্তু শেষ-মুহূর্তে তিনি ছুটি পাননি শুনে আমি ধৈর্য রাখতে পারলাম না, বললাম, 'বেশ, যা করবার কর, আমি কিছু জানিনে।'

দাদা একটু হেসে বললেন, 'যা করবার তাই করছি। রাজেনবাবুকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি—ধীরঞ্জন আজই রওনা হচ্ছে।'

দাদার সঙ্গে খুব একচোট কথান্তর হল। আর সেই কড়া কথার প্রায়শ্চিত্ত করতে স্যুটকেস গুছিয়ে শেষ পর্যন্ত রওনাও হতে হল আমাকে। সঙ্গে নেওয়ার জন্য দু-একজন বন্ধুর খোঁজ করলাম। কিন্তু এত শর্ট নোটিশে কেউ অত দূরে যেতে রাজী হল না।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু নারাণ পর্যন্ত হেসে বলল, 'রঙপুরের রঙ তুমিই দেহে মনে মেখে এস ভাই, আমরা এই কলকাতা শহরে বসেই দিব্যি তা দু চোখ ভরে দেখব।'

স্টেশনে নেমে একবার এদিক ওদিক তাকালাম। যদিও খবর দেওয়া আছে, তবু এত রাত্রে কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের আতিথ্য নেওয়া ঠিক হবে কি না, ইতস্তত করলাম একটু।

সতেরো-আঠারো বছরের সুদর্শন একটি ছেলে কেবলই আমার দিকে তাকাচ্ছিল, তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'সব চেয়ে ভালো হোটেল কোনটা এখানে?'

ছেলেটি পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম কি ধীরঞ্জন মিত্র?'

'কি করে চিনলে?'

ছেলেটি বলল, 'বাঃ, অর্জুনদা আপনার দু-তিন রকমের স্ন্যাপ সট পাঠিয়েছেন। আপনাকে চিনব না?'

এবার ছেলেটিকেও চিনলাম। অর্জুন আমার স্কুলের সহপাঠী। তারই দূর-সম্পর্কের আত্মীয় রাজেনবাবুরা, লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ফটো সে এদের পাঠিয়েছে, অথচ মেয়ের ফটো সে একবারও তো আমাদের দেয়নি। ভারি রাগ হল। ছেলেটি আবার একটু আত্মপরিচয় দিল, 'আমার নাম জীবন, আমার দিদির সঙ্গেই—'

তারপর একটু হেসে বলল, 'বুঝেছেন!'

বললাম, 'বুঝেছি।'

জীবন বলল, 'আপনি লোক ভারি খারাপ। আমাদের এখানে এসেছেন, কিন্তু হোটেল খুঁজছিলেন কেন? আমরা কি হোটেলে থাকি? ভজন, গাড়ি নিয়ে এস এদিকে। ধীরঞ্জনবাবুকে খুঁজে পেয়েছি।'

ফতুয়া গায়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের একটি লোক এগিয়ে এল। তার আত্মপ্রত্যয় দেখে বুঝতে

বাকি রইল না.'ভজন বাড়ির প্রিয় ও পুরনো চাকর।

ভজন বলল, 'আসুন জামাইবাবু, গাড়ি আমি অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছি। গাড়োয়ান বেটা ঢুলছে বসে বসে।'

লাজ্জিত ভঙ্গীতে জীবন ধমক দিয়ে উঠল, 'ধোৎ, এখনি জামাইবাবু কি রে! কেবল তো দেখতে এলেন—'

ভজন ততক্ষণে অপ্রস্তুত হয়ে নিজেই জিভ কেটেছে: 'কিছু মনে করবেন না বাবু, এ বাড়ির অনেক জামাইবাবু কিনা, ডাকতে ডাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে। স্টেশনে প্রায়ই তাঁদের নিতে আসি, তুলে দিয়ে যাই, তাই—'

জীবনের সঙ্গে গাড়িতে উঠে ভিতরে বসলাম। ভজন সামনের বেঞ্চে বসে বলল, 'তা দু দিন আগে আর পরে। ফুলু দিদিমণিকে দেখে আপনাব পছন্দ হবে। আর আপনাকে তো সবাই পছন্দ করেই বসে আছেন। এমন সুন্দব জামাই এ বাড়িতে আর আসেনি।'

জীবন আর একবার ধমক দিল, 'ধোৎ!'

গলার স্বরটুকু বেশ মিষ্টি জীবনের। দেখতেও সুন্দব, ফবসা রঙ, নাক-চোখও বেশ চোখা। কেন জানি না, মনের অপ্রসন্নতা অনেকখানি এরই মধ্যে দূর হয়ে গেল।

আধো আলো-অন্ধকারে মন্থরে চলল গাড়ি। বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তায় পড়লাম। দেখলাম শহরটা বেশ ছড়ানো। কেবল ছড়ানোই নয়, ছিটানোও। এখানে এক টুকরো, ওখানে এক টুকরো। মাঝখানে ছোট ছোট মাঠ আর আমবাগান।

তারপর দোতলা একটি বাড়িব সামনে এসে গাড়ি থামল। বাড়ির কর্তা ছুটে এসে দাঁড়ালেন: 'এই যে, আসুন। কি দুর্ভোগই না হল! দু-দুবাব লোক পাঠিয়েছি স্টেশনে। গাড়ির দেখা নেই, আজকে গাড়ির আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

গাড়ি থেকে নেমে রাজেনবাবুকে হাত তুলে নমস্কাব করে সৌজন্য জানিয়ে বললাম, 'খুব কষ্ট দিলাম আপনাদের।'

রাজেনবাবু বললেন, 'কি যে বলেন! যারা নিজেদের বাড়িতে থাকে তাদের কষ্ট, না, দূর থেকে গাড়িতে যাদের ছুটে আসতে হয় তাদের কষ্ট? আর আজকাল যা হাল হয়েছে রেলওয়ের! কেতাদুরস্ত টাইম-টেবিলটাই আছে। সময়-টময় ঠিক নেই।'

আমার অসুবিধা ঘটেছে বলে ভদ্রলোক যেন রেলকর্তৃপক্ষের কাউকে সামনে পেলে ঝগড়া করতে পারেন তাঁর ভাব দেখে এমনি মনে হল। সম্ভাব্য শ্বশুরের দিকে আমিও একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। সুদর্শন না হলেও সাধারণদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো।

রাজেনবাবুর সঙ্গে তাঁর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। চেয়ার টেবিলে সাজানো অনতিপ্রশস্ত একখানা ঘর, দুটো আলমারী ভরা আইনের বই। সোনার জলে লেখা: আর. এন. বসু। রঙপুরে অনেক দিনের প্র্যাকটিস রাজেনবাবুর, সে কথা আগেই শুনে এসেছি।

রাজেনবাবু বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম নিরঞ্জনবাবুই আসবেন। কিন্তু এই বেশ হয়েছে, একালের রীতিনীতিই ভালো। নিজেরা দেখেশুনে পছন্দ করে—। হ্যাঁ, এই ভালো।'

কথার ধরন দেখে মনে হল রাজেনবাবু নিজের মনকে বোঝাচ্ছেন, নিজের সেকালের মনকে একালের রীতিনীতি মেনে নিতে বলছেন।

দোরের পাশে ভজন এসে দাঁড়াল: 'বড়বাবু আপনি যেন আবার গল্পে বসবেন না। মা বলছেন, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

রাজেনবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: 'ঠিক ঠিক। সারাদিন গাড়িতে কেটেছে। আর যাতায়াতে আজকাল যা হাঙ্গামা, উঠুন, আলাপ-টালাপ পরে হবে। ভজন, বাবুকে কুয়োর ধারে নিয়ে যাও, জল গামছা—'

হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসবার পর রাজেনবাবু বললেন, 'আর দেরি নয়, ভজন, এবার আমাদের জায়গা করে দিতে বল।'

জায়গা করাই আছে। ভিতরের দিকের একখানা ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দুখানা আসন পাতা হয়েছে। একজন প্রৌঢ়া বিধবা পরিবেশন করতে এল। রাজেনবাবু ভাতে হাত দিয়ে বললেন, 'আঃ, তুমি কেন, তোমার মা আসতে পারলেন না ?'

রাঁধুনী বলল, 'মার বোধ হয় লজ্জা করছে।'

রাজেনবাবু বললেন, 'লজ্জা আবার কিসের ? ছেলের বয়েস, দুদিন পরে হয়তো—আসতে বল তাকে।'

একটু বাদে ঘিয়ের বাটি হাতে রাজেনবাবুর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন। চামচ করে ঘি দিতে লাগলেন পাতে। রাজেনবাবুর তুলনায় তাঁর স্ত্রীর বয়স অনেক কম বলে মনে হল। দেখতেও বেশ সুন্দরী। দেখলাম আহার্যের প্রচুর আয়োজন করা হয়েছে। তিন রকমের ডাল, চার রকমের মাছ, টক, মিষ্টি। খেতে খেতে রাজেনবাবু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'এই আড়মাছের ঝোলটা বুঝি ফুলুর নিজের ?'

রাজেনবাবুর স্ত্রী জবাব দিলেন, 'কই মাছের তরকারিটাও ফুলু করেছে।'

রাজেনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাছ রাঁধতে ভারি ভালোবাসে। কেমন হয়েছে রান্না ?'

মৃদু হেসে বললাম, 'ভালো।'

খাওয়াটা বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে হল। কলকাতার মীর্জাপুরের বোর্ডিং হাউসে বহুদিন এমন চর্ব্য-চোষ্যের স্বাদ মেলেনি।

খাওয়ার পরে শোয়ার ব্যবস্থাটিও বেশ পরিপাটী, পাশের আর একখানা ঘরের তক্তাপোশে পুরু দুগ্ধ-ফেন বিছানা। বালিশ, পাশ-বালিশ, একটু দূরে উঁচু টিপয়ের উপর ফুলদানিতে কয়েকটি রজনীগন্ধা, ভালো লাগল।

বাটিতে করে পান নিয়ে এল জীবন। আমি বাটি থেকে গোটা দুই লবঙ্গ তুলে নিলাম।

জীবন বলল, 'পান খান না বুঝি ? আমি দিদিকে তখনই বলেছিলাম—খুব তো সাজছিস, কিন্তু পান হয়তো উনি খানই না। অর্জুনদা একবার লিখেছিলেন পান নয়, ধূমপানের ভক্ত। এমন চমৎকার 'পান' করেন অর্জুনদা।'

পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের একটি বাক্স বার করল জীবন। তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'দেশলাই আনতে ভুলে গেছি। দিদি, দেশলাইটা দাও তো।'

মৃদুকণ্ঠে জবাব এল, 'আমি পারব না ফাজিল কোথাকার, তখন বললাম, নিলি না কেন !'

বললাম, 'দেশলাই আমার আছে জীবন।'

কিন্তু একটু বাদে জানালার ভিতর দিয়ে জীবনের হাতে নতুন একটি দেশলাই এসে পৌঁছল।

সিগারেটটা সবে ধরিয়েছি রাজেনবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন, ঢুকেই আবার তাড়াতাড়ি সরে আড়াল থেকে বললেন, 'আচ্ছা, কালই কথাবার্তা হবে।'

ভজনের গলা শোনা গেল : 'আপনি যান বড়কর্তা, মা বলছেন অনেক রাত হয়ে গেছে।'

রাজেনবাবু এবার বিরক্তির সুরে বললেন, 'আঃ, যাচ্ছিই তো, রাত হয়েছে সে কথা বার বার তোর মার বলতে হবে কেন, নিজে দেখতে পাচ্ছি না ?'

রাজেনবাবু চলে গেলেন। মনে মনে একটু অপ্রতিভ হলাম। সিগারেটটা একটু পরে ধরালেও হত। জীবন চলে গেলে কি ভেবে একটা পানও তুলে নিলাম। সেই সঙ্গে ভাবলাম, পানটা জীবন থাকতে খেলেই যেন আরও ভালো হত।

কাচের গ্লাসে জল ছিল। মুখ-টুখ ধুয়ে শুতে যাচ্ছি বালিশের ঢাকনির দিকে চোখ গেল। চারদিকে নীল রঙের লতানো বর্ডার। মাঝখানটা সাদা সাদা। কিন্তু নীল রঙটা আমার চোখে যেন লেগে রইল। ঢাকনিতে কারও নাম ছিল না। কিন্তু হাতের কাজটুকু যে কার, তা আমার বুঝতে বাকি রইল না। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু পাশের বড় ঘরটির আলো তখনও নেবেনি।

ভাই-বোনের কথাবার্তা কানে গেল।

'দিদি, এবার শো গিয়ে, তোকে আর কিছু দেখতে হবে না। আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি

হয়নি।'
'তুই বড্ড ফাজিল হয়েছিস জীবন।'
ঘুমোবার আগে একবার মনে হল, দাদার যে ছুটি মেলে নি সেটা ভালোই হয়েছে।
খুব ভোরে ঘুর ভাঙল। হাতমুখ ধুয়ে আসবার পরে প্রথমে চা বিস্কুট তারপর লুচি হালুয়ার প্রাতরাশটাও বেশ ভালোই জমল। সকালে কাগজ পাওয়ার জো নেই। আগের দিনের কাগজটা দেখছি, দুখানা পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে জীবন এসে দাঁড়ায় : 'আচ্ছা ধীরঞ্জনবাবু, দেখুন দেখি এই চিঠি দু'খানা।'
দেখলাম রাজেনবাবুর নামে মাসখানেক আগের লেখা দু'খানা চিঠি। জরুরী কারণে দেখতে আসবার নির্দিষ্ট তারিখ পাল্টাতে হয়েছে বলে আমরা দুঃখ জানিয়েছি। দু'খানা চিঠিই দাদার জবানী। কিন্তু দু'খানা হাতের লেখা বিভিন্ন।
জীবন চিঠি দুটি আমার হাতে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা ধীরঞ্জনবাবু, এই চিঠি দু'খানার মধ্যে কোন্‌খানা আপনার দাদার?'
হেসে বললাম, 'তুমিই বল।'
জীবন বলল, 'আমরা নিজেদের ভিতরে আগেই বলেছি। পাঁচ টাকা বাজি রেখেছি দিদির সঙ্গে। বলুন কোন্ চিঠিখানা আপনার হাতের?'
বললাম, 'কোন্‌খানা আমার হাতের হলে তোমার সুবিধা হয়?'
জীবন অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, 'না না, আপনি আগে বলুন।'
নিজের লেখা চিঠিটা এগিয়ে দিলাম।
জীবন বলল, 'না, দিদিরই জিত হল। পাঁচটা টাকা মার কাছ থেকে চেয়ে দিতে হবে আমাকে। আচ্ছা, এখন দিচ্ছি, এ টাকা পরে আমি ঠিক জায়গা থেকে আদায় করে নেব।' জীবন একটু হাসল।
আমিও হাসলাম, তারপর জীবনকে বললাম, 'এবাব তোমার বাবাকে খবর দাও, আমি নটার গাড়িতেই যাব ভাবছি।'
জীবন বলল, 'আপনি ভাবলেই হল আর কি!'
একটু বাদে পঞ্জিকা হাতে রাজেনবাবু এসে হাজির হলেন, বললেন 'চশমাটা আবার ফেলে এলাম। ইয়ে দেখ তো ; আজকের তিথিটা অবশ্য অমাবস্যা, কিন্তু আটটা দশ মিনিট তের সেকেণ্ড গতে ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণ আরম্ভ কিনা। রাত্রেই অবশ্য আমি একবার দেখে রেখেছি তবু, তোমাদের নতুন চোখ— ।' একটু থেমে অপ্রতিভ ভঙ্গীতে বললেন, 'এই দেখুন আবার 'তুমি' বলে ফেললাম, বুড়ো হওয়ার এই হল বিপদ। সব সময় ভদ্রতা রাখা যায় না।'
বললাম, 'তাতে কি হয়েছে! কিন্তু এর জন্য দিনক্ষণ আবার বাছতে যাচ্ছেন কেন?'
রাজেনবাবু মৃদু একটু হাসলেন, 'দিনক্ষণ না মানলে চলে!'
অগত্যা তাঁর হাত থেকে পঞ্জিকাটা নিয়ে চিহ্নিত পাতাটায় একটু চোখ বুলিয়ে বললাম, 'আপনি ঠিকই দেখেছেন। মাহেন্দ্রক্ষণ আটটা দশ মিনিট তের সেকেণ্ড থেকেই শুরু। কিন্তু আমি যে ভেবেছি নটার গাড়িতে—'
রাজেনবাবু একটু হাসলেন : 'অত তাড়াতাড়ি করলে কি আর চলে!'
সুতরাং মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। তারপর যে ঘরটায় রাত্রে আমার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সেখানেই ছোট্ট একটি টেবিল পেতে মুখোমুখি দু'দিকে দুখানা চেয়ার এনে রাখল ভজন।
জীবন আমাকে সেই ঘরে নিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'এবার দিদিকে দেখবার পালা আপনার। বাবা মা বলছেন, ছেলের পক্ষের কোন অভিভাবক যখন আসেননি, ছেলে নিজেই দেখতে এসেছে, তখন মেয়ের পক্ষেরও অভিভাবক গোছের কারও না থাকাটাই ভালো। আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?'
বললাম, 'না।'

মনে মনে একটু খুশীই হলাম। রাজেনবাবুর পঞ্জিকা সবখানিই তা হলে একেবারে পুরাতন পঞ্জিকা নয়।

একটু বাদে বছর উনিশেকের একটি মেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে নতমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। সদ্য স্নান করে এসেছে। ভিজে চুল পিঠ ভরে ছড়ানো। ফিকে চাঁপা রঙের একটি শাড়ি পরনে। কিন্তু প্রথমেই যেন একটা ধাক্কা খেলাম, এত কালো ? এত কালো রঙের সঙ্গে কি কোনও রঙ মানায় ? মনে হল চাঁপা রঙের শাড়িটাও ঠিক মানায়নি। মেয়েটি রঙিন শাড়ি কেন পরতে গেল মিছামিছি ?

বললাম, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

মেয়েটি আমার সামনের চেয়ারে বসল। জীবন কি একটা অজুহাতে সরে গেল। মাঝখানে ছোট একটি টেবিলের ব্যবধানে নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসে একটি অপরিচিতা মেয়ে আর আমি। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুমাত্র রোমাঞ্চ বোধ করলাম না। একটি মেয়ের সঙ্গে এ তো কেবল মাহেন্দ্রক্ষণের ক্ষণিক আলাপ নয়—চিরজীবনের জন্য সঙ্গিনী নির্বাচন। দেখেশুনে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। শুধু ভাবপ্রবণ হলে চলবে না। আমরা প্রেমিক-প্রেমিকা নই, পরীক্ষক-পরীক্ষার্থিনী। রঙের পরীক্ষায় প্রথমেই মেয়েটি ফেল করল। পাসের নম্বর না দিতে পেরে আমিই কি কম আঘাত পেয়েছি ? আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। নাক চোখের গড়ন নিতান্তই চলনসই ধরনের, তাতে রঙের ক্ষতিপূরণ হয় না। ঠোঁট দুটিকেও তেমন পাতলা বলা চলে না। একটুকাল চুপ করে ছিলাম। কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু কি বলব যেন ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মেয়েটি মৃদুস্বরে বলল, 'আমি কি এবার যাব ?'

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। বড় অভদ্রতা হচ্ছে। মেয়েটি কি ভাবছে মনে মনে ! মনে যাই থাক ওকে তা বুঝতে দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর কিছুতেই হওয়া চলবে না। আমাদের মতামত একদিন ও জানবেই, কিন্তু আজ এই মুহূর্তেই যদি না জানে তাতে কি ! এ মুহূর্তটি না হয় মাহেন্দ্রমুহূর্ত হয়েই থাক।

মেয়েটির কথার জবাবে আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'বাঃ, যাবেন কেন ? আলাপ-টালাপ কিছু হল না, এক্ষুণি যাবেন ?'

মেয়েটি সরল প্রশান্ত দুটি চোখ আমার দিকে একবার মেলে ধরে আবার নামিয়ে নিল, তারপর অবনত মুখে মৃদুস্বরে বলল, 'আমি ভাবলাম আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।'

একবার যেন মায়া হল। মনে হল, আর কেন, ছেড়ে দিই এই নিরীহ আশ্রমমৃগীকে। কথার মায়াজালে ওকে মিছামিছি জড়িয়ে আমার লাভ কি, কি দরকার এই নিষ্ঠুর খেলায় ! কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না। ভাগ্য কি আমার সঙ্গেই কম খেলা খেলেছে ? কি দরকার ছিল এর জন্য আমাকে এত দূরে এই রঙপুর পর্যন্ত টেনে এনে সমস্ত রাত ভরে সকাল ভরে বিচিত্র বর্ণের পটভূমি তৈরি করে শেষে তার ওপর আকস্মিক এই কালো তুলি বুলিয়ে দেওয়া ? আমি কেন তার শোধ নেব না ?

একটু হেসে বললাম, 'আমার ধারণা ছিল আপনি সত্যিই গুণতে জানেন। হাতের লেখা সম্বন্ধে যখন আপনার এমন নির্ভুল আন্দাজ, তেমনি স্পষ্ট জিজ্ঞেস না করলেও কার কি জানবার ইচ্ছে তা আপনি বেশ অনুমান করতে পারবেন।'

মেয়েটি মৃদু হাসল, 'তা কি করে পারব ? সব জিনিসই কি আর আন্দাজ করা যায় ?'

বললাম, 'মাঝে মাঝে আন্দাজ করে নেওয়া ছাড়া উপায় কি ? এই ধরুন আপনার নাম। জিজ্ঞেস করাটা অভদ্রতা অথচ বিলিতী কায়দা অনুযায়ী মাঝখান থেকে কেউ আমাদের আলাপ-পরিচয়ও করিয়ে দিয়ে যাননি। বাড়ির কাউকে ফুলু ফুলু ডাকতে শুনেছি। আন্দাজ করেছি আপনার নাম হয় ফুলমালা, না হয় ফুলদেবী।'

মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই হাসল : 'আপনার আন্দাজ কোনটাই ঠিক নয়, আমার নাম ফুল্লরা—ফুল্লরা বসু।'

আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। আসলে নাম জানবার স্পৃহাটা আমার তেমন প্রবল ছিল না, ওকে হাসিয়ে দাঁতের গঠন বিন্যাসটা কৌশলে দেখে নেওয়ারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু না হাসালেও পারতাম।

ফুল্লরার সামনের দুটি দাঁত অসমান আর বেশ একটু ফাঁক ফাঁক।

কিন্তু শুরু যখন করেছি মাঝখানে থেমে গিয়ে লাভ কি! শেষ পর্যন্ত যাওয়া যাক। বললাম, 'আন্দাজে আমার তুলনায় আপনি অনেক ওস্তাদ। আচ্ছা, আন্দাজ করুন তো এবার জিজ্ঞেস কি করব আপনাকে।'

ফুল্লরা বলল, 'তা কি করে বলব! কারও সব জিজ্ঞাসার জবাবই তো দিয়ে ওঠা যায় না। এরপর যদি কে কি জিজ্ঞেস করবেন তাও বলে দিতে হয়—'

ফুল্লরার জবাবে এবার আমি খুশী হলাম। এতক্ষণে ও পাস-মার্ক পেয়েছে।

বললাম, 'আমি ভেবেছিলাম এ সব ব্যাপারে জবাবের মতো প্রশ্নগুলিও আপনার সব জানা। অন্তত আরও কয়েকবার তো শুনেছেন। এই ধরুন এখন আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত—আপনি কোন্ পর্যন্ত পড়াশুনো করেছেন! আধুনিক গান ভালোবাসেন না ক্লাসিকাল, মাংসের কাবাবে কি কি মসলা লাগে—'

ফুল্লরা বলল, 'সব প্রশ্নের জবাব একসঙ্গে কি করে দেব?'

বললাম, 'বেশ, আলাদা আলাদা করে দিন। খবরদার, গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর, পৃথক পৃথক করে—'

ফুল্লরা একটু হাসল, 'আচ্ছা, তাই বলব। গত বছর ম্যাট্রিক পাস করেছি।'

'কোন্ ডিভিশনে?'

'ডিভিশন তত ভালো হয়নি।'

বললাম, 'তা নাইবা হল, শ্রেণী-বিভাগে ইউনিভার্সিটিকে সেরা ওস্তাদ মনে করবার কোন কারণ নেই। এবার গান।'

ফুল্লরা বলল, 'গান আমি জানি নে।'

বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই বিনয় করছেন। যিনি যত গান জানেন, তিনি তত বেশি বিনয় করতে জানেন। এই নিয়ম।'

ফুল্লরা বলল, 'গান আমি সত্যিই জানি নে।'

বললাম, 'আচ্ছা, আপনি কতখানি মিথ্যা কথা বলছেন তা জানবার সুযোগ আশা করি পরে পাওয়া যাবে। মাংসের কাবাব সম্বন্ধে তৃতীয় প্রশ্নটা আমি উইথড্র করে নিচ্ছি। তার বদলে বলুন তো নটার পরে আর কখন গাড়ি আছে কলকাতার? এ গাড়ি তো ধরা গেল না।'

ফুল্লরা বলল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! গাড়ি আরও আছে।'

'কখন?'

'রাত আটটায়।'

'কি সর্বনাশ! সারাদিনে আর গাড়ি নেই?'

ফুল্লরা বলল, 'সারাদিন আর কই! দিনের তো অনেকখানিই কেটে গেল।'

ফুল্লরার কথার ভঙ্গীতে মনে হল দিনের এতখানি যেন না কেটে গেলেই ভালো হত।

বললাম, 'তা হলে আজকের দিনটাও আপনাদের জ্বালাতন করতে হবে।'

ফুল্লরা এবার কোন জবাব দিল না।

বললাম, 'আচ্ছা, এবার তা হলে ওঠা যাক। ইতি ইন্টারভিউর প্রথম পর্ব। কিন্তু এই বলে মনে করবেন না এই শেষ। গাড়ি যখন ধরতে দিলেন না, সারাদিন ধরে রাখলেন, তখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাকব আর এমনি এক এক পসলা প্রশ্নবৃষ্টি করব।'

ফুল্লরা কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসল।

ফুল্লরা উঠে পাশের ঘরে ঢুকল। সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে করতে কানে গেল মৃদু গঞ্জনা দিচ্ছেন মেয়েকে ফুল্লরার মা।

'গান একেবারে জানিসনে কেন বলতে গেলি? একটু একটু তো জানিস? তাই না হয় বলতিস।'

ফুল্লরা কি জবাব দিল শুনতে পেলাম না। হয়তো কিছুই জবাব দেয়নি।

তারপর সারাদিনের মধ্যে অনেকবার দেখা হল ফুল্লরার সঙ্গে। রাজেনবাবু আর তাঁর স্ত্রীকেও বেশ প্রফুল্ল দেখলাম। খেয়ে দেয়ে কোর্টে বেরিয়ে গেলেন রাজেনবাবু। বাড়ির সবাইকে বলে গেলেন, আমার যেন আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি না হয়। খানিক বাদে ফুল্লরার আড়ষ্টতা অনেকখানি কেটে গেছে দেখলাম। মনে হল আগের চেয়ে অনেক সহজভাবে সে চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। ছদ্ম কলহে মেতেছে জীবনের সঙ্গে। আমার মনটা থেকে থেকে কেমন করে উঠতে লাগল। অনেকবার মনে হল ছুটে গিয়ে নটার গাড়ি তখন যদি ধরতাম সেই ভালো হত। চান করে এসে দেখি ফুল্লরাই সকলের অলক্ষ্যে আয়না চিরুনি টিপয়টার ওপর রেখে দিয়ে গেল। আমি আর জীবন পাশাপাশি খেতে বসলে ফুল্লরাকে দিয়েই সমস্ত পরিবেশন করালেন তাঁর মা। দেখলাম, এ বেলা মাংসের কাবারের ব্যবস্থা হয়েছে।

সারা দিনটা আমাকে স্থির থাকতে দিল না জীবন। বলল, 'কনে দেখা তো হয়েই গেছে, চলুন এবার শহর দেখে আসবেন।'

বললাম, 'তোমাদের শহরের আবার দেখবার আছে নাকি কিছু?'

জীবন বলল, 'নেই মানে? দেবী চৌধুরাণীর রঙপুরের কথা ভুলে গেলেন নাকি?'

ঘুরে ঘুরে দিনটা কোন রকমে কাটল। তারপর এক সময় সত্যিই রাত্রের গাড়ির সময় এল।

রাজেনবাবু বললেন, 'আজকের রাতটা থেকে গেলে হয় না?'

বললাম, 'তা কি করে হয়?'

রাজেনবাবু বললেন, 'নিরঞ্জনবাবু এলে অন্যান্য কথাবার্তাও এই সঙ্গে হয়ে যেত।'

বললাম, 'সে তো এক রকম হয়েই আছে। তার জন্য আটকাবে না।'

ভাড়া-করা ঘোড়ার গাড়িতে জীবনকে নিয়ে রাজেনবাবু স্টেশনে নিজেই তুলে দিতে এলেন। ভজনকে দিয়ে ইন্টার ক্লাসের একখানা টিকিটও কাটালেন তিনিই। কিছুতেই নিষেধ শুনলেন না।

বললেন, 'নিরঞ্জনবাবুর চিঠি কবে পাব?'

বললাম, 'চিঠি পেতে দেরি হবে না।'

কলকাতা পৌঁছে দাদাকে দিয়ে তার পরদিনই চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। মিনিটখানেক মনটা অবশ্য একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইল। কিন্তু দৌর্বল্যকে আর বেশি প্রশ্রয় দিলাম না।

দাদা সব শুনে বললেন, 'এখনও ভেবে দেখ ভালো করে। সংসারে রূপটাই তো সব নয়।'

হেসে বললাম, 'দাদা, কথাটা ঠাকুরদাদাদের মুখে মানায়, তোমার মুখে শোভা পায় না। রূপ তো কেবল রূপই নয়। মেয়েদের রূপও দুর্লভতম গুণ।'

দাদা আর কিছু বললেন না। রাজেনবাবুকে খুব ভদ্র ভাষায় অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে আমাদের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিলেন।

তারপর চার বছর কেটেছে। বিয়েও করতে হয়েছে। ভার্যা ফুল্লরার তুলনায় মনোরমা হলেও মনোবৃত্ত্যনুসারিণী যে হয়েছে, এ কথা বলতে পারিনে।

আর একবার তাকিয়ে দেখলাম ফুল্লরার দিকে। জানলা দিয়ে কি এত দেখছে ফুল্লরা? দু' পাশের বাড়িঘর, না, চার বছর আগের সেই স্মৃতিচিত্র?

একটু দূরে দু'জন সহযাত্রীর কথাবার্তা কানে এল: 'কি ভিড়, দেখছ। কিন্তু—'

'রবিবার যদি ট্রামে বাসে উঠতেই হয় স্ত্রীকে সঙ্গে আনা ভালো। বসবার জায়গার অভাব হয় না।'

সহাস্য সমর্থন শোনা গেল: 'যা বলেছ।'

ফুল্লরা এবার মুখ ফিরিয়ে এদিকে একটু তাকাল। মুখের রঙটা বদলাল কিনা ঠিক যেন বুঝতে পারলাম না। কালো রঙের পরিবর্তন বোঝা অত সহজ নয়।

বাস সমস্ত সারকুলার রোডটা পার হয়ে বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে থামল। ফুল্লরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার আমাকে নামতে হবে।'

একবার ভাবলাম বলি, 'আমাকেও।'

কিন্তু তা আর বললাম না, ওকে নিঃশব্দে পথ ছেড়ে দিলাম।

ফুল্লরা মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে স্মিতমুখে জোড়হাতে বলল, 'আচ্ছা, যাই এবার। ভালো আছেন তো ?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, 'আপনি ?'

ফুল্লরাও জবাব না দিয়ে মৃদু একটু হাসল; তারপর এগিয়ে গেল দোরের দিকে।

ফুল্লরা কি সত্যিই সুখী হয়েছে ? সে দিনের সেই নিষ্ঠুর ছলনার কোন রকম প্রতিশোধ না নিয়ে ফুল্লরা যে পূর্বপরিচয় স্বীকার করল, তার পাশে বসবার আমন্ত্রণ জানাল, এ দাক্ষিণ্য কি তার সেই অপরিমিত সুখ-সমৃদ্ধিরই প্রকাশ ? না কি বর্তমান বিড়ম্বিত জীবনের পটভূমিকায় আমার মতোই সেই ছদ্ম মাধুর্যের রঙটুকু ফুল্লরা আজও ধরে রাখতে চায়, আজও মনে রাখতে চায় সেই কাঁচা রঙ লাগানো মাহেন্দ্রমুহূর্তটিকে ?

কথাটা কোনদিনই কি আর ফুল্লরাকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হবে ?

ভাদ্র ১৩৫৬

হেডমিস্ট্রেস

সকালের চায়ের পাট শেষ ক'রে তক্তপোষে সাড়ম্বরে শুয়ে সিগারেট মুখে খবরের কাগজে চোখ আর চার বছরের মেয়ে মিণ্টুর পিঠে সস্নেহে হাত বুলাচ্ছিল শৈলেন। হঠাৎ কানে এল, 'না, অর্চনা মিত্তিরটা একেবারেই যা তা। যাই বল। কেবল স্টাইল আর পোষাক-আসাকের দিকেই লক্ষ্য। পড়াশুনার ধারেও ঘেঁষবে না। ইংরাজীতে এবারও ফেল করল।'

কাগজ থেকে মুখ তুলে শৈলেন স্ত্রীর দিকে তাকাল। একটু দূরে জানালার কাছে টুলটা টেনে নিয়ে সুপ্রীতি খাতা দেখছে। ফার্স্ট ক্লাসের খাতা ক'খানা এখনই দেখে শেষ করা চাই। পুজো উপলক্ষে আজ বন্ধ হয়ে যাবে স্কুল।

শৈলেন একটু হাসল, 'ফেল করল, আহা হা বেচারা। কেউ ফেল করেছে শুনলে বড় দুঃখ লাগে। দাওনা ওকে কটা নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে।'

সুপ্রীতি খাতা থেকে মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। শ্যামবর্ণের ওপর মুখখানা বেশ সুন্দর। চোখ দুটি বড়, লম্বা নাকটি একটু বাঁকানো, পাতলা ঠোঁট, কোমল চিবুক, হাসলে টোল পড়ে।

সুপ্রীতি কিন্তু হাসল না, জোড়া ভ্রূ কুঁচকে, স্বামীর দিকে চেয়ে রুক্ষ স্বরে বলল, 'তার মানে ?'

শৈলেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের একটু হাসল, 'মানে আর কি। টাকা তো নয়, গোটা কয়েক নম্বরই তো। বাক্স থেকে তো আর বের করে দিতে হবে না। রঙীন পেনসিলে অকৃপণ হাতে কোন এক জায়গায় বসিয়ে দিলেই চলবে। তাই দাও, মেয়েটা খুশি হোক।' নিজের মনটা ভারি খুশি রয়েছে আজ শৈলেনের। যদিও খুশি হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। অফিস থেকে এবার আর বোনাস দেবে না ; মাসের মাইনেটি প্রথম দশ দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু আজ অফিস ছুটি। ভোর থেকে শীত শীত হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে বাতাসে শারদীয় ভাব। শহরতলীর পাশাপাশি দুটো রাস্তায় লাল কাপড়ে সার্বজনীন পুজোর সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আর জানালার বাইরে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ একটি নীল অপরাজিতা চোখে পড়েছে শৈলেনের। কৈশোরের আর প্রথম যৌবনের অনেকগুলি দিন রাত সেই রঙ মেখে স্মৃতির দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে। অবশ্য কেবল রঙীন স্মৃতিই নয়, তার নেপথ্যে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতিও আছে। সুপ্রীতি আজ দু'মাসের মাইনে পাবে। শৈলেন ভেবেছিল ভোরে উঠে বলবে, 'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে একটু গাওনা প্রীতি', কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। দক্ষিণ সিঁথি বিদ্যাবীথির হেডমিস্ট্রেস শ্রীযুক্তা সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় গভীর মনোযোগ আর গম্ভীর মুখভঙ্গীর সহযোগে ছাত্রীদের ইংরেজী জ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। দেশী সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ সারির সাধারণ একটি কেরাণীর কোন

চাপল্য দেখলে তিনি হয়তো বেত তুলতেও পারেন।

স্বামীর কথা শুনে সুপ্রীতি অবশ্য বেত তুলল না, কিন্তু মুখখানাকে আরও কঠিন, গলার স্বরটিকে আরও রুক্ষ ক'রে তুলল, 'তোমার সবই ঠাট্টা, না ? স্কুলের পরীক্ষাটা বুঝি আর পরীক্ষা নয় ? কোন রকম দায়িত্ব তার নেই ? শুধু চোখ বুজে নম্বর বসিয়ে গেলেই হল, তাই বুঝি ভাব তুমি ?'

রীতিমত হেডমিস্ট্রেসসুলভ ধমক। এর উত্তরে শৈলেন হাসতে পারত, অন্যদিন হাসেও, কিন্তু আজ তার হাসি পেল না। তার বদলে মিণ্টুই হেসে উঠল, 'কি মজা। বাবাকে বকো মা, আরো বকো আমাকে নতুন জুতো কিনে দিলে না। কেবল বলে দেব দেব, কোন দিন দেয় না।'

সুপ্রীতি মেয়েকে ধমক দিল, 'এই চুপ!' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'এইতো কাল রাত থেকে বলছি, ক'খানা খাতা দেখে দাও। কাজ-কর্ম তো নেই। অফিস থেকে এসে চুপচাপ বসে বসেই তো সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দিলে। আজও সকাল থেকে বসে আছ তো আছই। কেন দু'খানা খাতা দেখলে, নম্বরগুলি টোটাল দিলে কি জাত যায় ?'

শৈলেন কাত হয়ে ছিল, এবার উঠে সোজা হয়ে বসল, 'আলবৎ যায়। তোমার খাতা দেখে দেওয়াটা কি আমার চাকরি নাকি ?'

সুপ্রীতি কঠিন কণ্ঠে বলল, 'তাতো নয়ই। কিন্তু তোমার অফিসের সময় জুতোয় কালি আর জামায় বোতামগুলি রইল কিনা, তা লক্ষ্য করা, দেরাজের চাবি আর জরুরী কাগজপত্র গুছিয়ে পকেটে গুঁজে দেওয়া নিশ্চয়ই আমার চাকরি, কি বল ?' খাতার পাতায় চোখ নামাল সুপ্রীতি। নীল পেনসিল দিয়ে অর্চনা মিত্রের আরো কতকগুলি ব্যাকরণের ভুল কেটে ফেলল। দাগের দৈর্ঘ্য আর গভীরতা দেখে ওর রাগের তীব্রতাটা টের পাওয়া গেল।

আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শৈলেন। আশ্চর্য যে সেবা পরিচর্যাটুকু নিতান্তই ভালোবাসার দান, দৈনন্দিন দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে যা একান্ত স্বাভাবিকভাবেই মিশে রয়েছে, আজকাল তা নিয়েও খোঁটা দেয় সুপ্রীতি, তারও চুলচেরা হিসাব করতে চায়। তার কারণ ওর আর্থিক ক্ষমতা হয়েছে। সংসারে অর্থমূল্যই যে পরম মূল্য তা টের পেয়েছে সুপ্রীতি।

গোড়ার দিকে শৈলেন নিজেই ওর স্কুলের পরীক্ষার খাতাগুলি টেনে নিত, বলত, 'দাও আমি দেখে দিচ্ছি, খাতা প্রতি দু'আনা ক'রে কিন্তু দিতে হবে, সিগারেটের খরচ বাবদ।' সুপ্রীতি হেসে বলত, 'ওরে বাবা আমার গরীব স্কুল। তোমার শ্বেত হস্তীর খরচ জোগাবে কি ক'রে। দু'টো খাতা আর একটা সিগারেট, এই চুক্তি কেমন ?'

শৈলেন সেই সর্তেই রাজী হয়ে যেত। কিন্তু একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তার দেখা খাতা স্ক্রুটিনাইজ করতে বসেছে সুপ্রীতি। এদিকে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মিণ্টুর, উনানে তরকারী পুড়ছে।

শৈলেন বলেছিল, 'খাতাগুলি তো আমি দেখেই রেখেছি। আবার দেখছ কি !'

সুপ্রীতি একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি খাতাগুলি আঁচলের তলায় লুকিয়েছিল। যেন গোপনে লেখা কবিতার খাতা, কি প্রেমপত্র। তারপর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিয়েছিল, 'এ্যানুয়ালের খাতা কিনা। তাই একটু ভালো ক'রে দেখছিলাম নম্বর টম্বর ঠিক আছে কিনা। গোলমাল হলে লজ্জায় পড়তে হবে।'

'কেন গোলমাল কিছু দেখলে না কি ?'

সুপ্রীতি মুখ টিপে হেসেছিল, 'তা একটু আধটু দেখলাম বইকি। তুমি তো আর সেরিয়াসলি দেখনি। বেশির ভাগই আন্দাজী কারবার।' তারপর সুপ্রীতি মুখ তুলে তাকিয়েছিল স্বামীর দিকে, 'অবশ্য দোষটা কেবল তোমার নয়, মেয়েদের স্কুল বলে কেউ সেরিয়াসলি নেয় না। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী পর্যন্ত এটাকে একটা ছেলেখেলা বলেই ভাবেন। কেবল মেয়েদের শিক্ষাই বা বলি কেন, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই তো তাই। যেহেতু লেখাপড়াটা অল্প বয়সে শিখতে হয়, তোমরা এটাকে অল্প দামী ছেলে ভুলাবার জিনিস ছাড়া কিছু ভাবতে পার না। তোমরা—'

শৈলেন বাধা দিয়ে বলেছিল, 'দোহাই লক্ষ্মীটি, এমন চমৎকার বক্তৃতাটা টিচার্স কনফারেন্সের জন্য তুলে রাখ। অফিস থেকে খেটে খুটে এলাম এবার একটু চা চাই।'

তারপর থেকে সুপ্রীতির খাতা আর শৈলেন দেখে না। একটু মজা, একটু অবসর বিনোদনের ভাব শৈলেনের মনে ছিল বই কি ! সমস্ত জীবনটাই যখন কাজে ভর্তি তখন কোন কোন কাজ কারো কারো কাজ নিয়ে একটু আধটু খেলতে ইচ্ছা তো হয়ই। আর খেলার মাঠে সাধ হয় কাজের লোক হ'তে।

'আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

কিন্তু সুপ্রীতি তার স্কুল নিয়ে খেলা ভালোবাসে না। কোন রকম চাপল্য সহ্য করে না ও। মাত্র বছর দেড়েকের চাকরিতে মাষ্টারনীর মুখোশ ওর মুখে শক্ত হয়ে আটকে বসেছে। সে মুখোশ ও কখনো যেন খুলতে চায় না, না কি চাইলেও পেরে ওঠে না। ওর ছাত্রী পড়ানো গম্ভীর মুখে আদায় ক'রে চুমো খেতে মাঝে মাঝে দ্বিধা হয় শৈলেনের, ভয় হয়। সে চুম্বন হয়তো ওর মুখোশে ঠেকে যাবে, মুখ স্পর্শ করবে না।

মাঝে মাঝে শৈলেন ভাবে এই মাস্টারীর চাকরি থেকে স্ত্রীকে ছাড়িয়ে আনবে, ওর স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে কষ্ট হয়, আরো কষ্ট হয় ওর গলার স্বর, মুখের লাবণ্য বদলে যাচ্ছে দেখে। পেশার ছাপ পড়ে যাচ্ছে ওর চেহারায়, সে ছাপ দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই সৌন্দর্যপ্রীতি বেশিক্ষণ মনে ঠাঁই পায় না। সুপ্রীতির উপার্জন আজ সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। শ্যামবাজারে আছে একান্নবর্তী পরিবারের আর এক ভগ্নাংশ। দাদা, বৌদি, ভাইপো, ভাইঝির দল। কেউ বেকার, কেউ অর্ধবেকার—টিউশনি সম্বল। তারা এসে হাত পাতে। কারো কলেজের মাইনে বাকি। কারো চিকিৎসার খরচ জোটে না। কোন সপ্তাহে বা থাকে না রেশনের টাকার সংস্থান।

শৈলেন মুখ ঝামটা দেয়, 'আমি কি করব ?'

তবু করতে হয়, না করলে এখনো মন খুঁত খুঁত করে।

আর সেই সুযোগে সুপ্রীতি দিনের পর দিন ঘরে বাইরে হেডমিস্ট্রেস হয়ে ওঠে। দুঃসহ ! সিগারেটের টুকরোটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল শৈলেন। কিন্তু শিকে ঠেকে জ্বলন্ত টুকরোটা ফিরে এসে পড়ল ট্রাঙ্কের ঢাকনির ওপর। সুপ্রীতির নিজের হাতে তৈরী লতা আঁকা ঢাকনি পুড়তে লাগল। পুড়ুক।

মিণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'আগুন লাগল, মা আগুন লাগল।'

পোড়া গন্ধ ততক্ষণ সুপ্রীতিরও নাকে গেছে। খাতা ফেলে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, 'হচ্ছে কি সব শুনি ? সবাইকে পুড়িয়ে মারবার ইচ্ছা বুঝি।'

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুপ্রীতি স্বামীর দিকে তাকাল। সিগারেটের আগুন ততক্ষণ নিভে গেছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দুজোড়া চোখ অনন্তকাল ধ'রে জ্বলছে তো জ্বলছেই। একটু বাদে সুপ্রীতি ফের তার জল-চৌকিখানার ওপর গিয়ে বসল। আর শৈলেন গেল আলনার কাছে। জামা চড়াল গায়ে। কোথাও বেরিয়ে পড়বে বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে।

কিন্তু বেরুবার জো নেই। রান্নাঘর থেকে ঝি রাসমণি এসে থলি হাতে সামনে দাঁড়াল, 'দাদাবাবু বাজারে যান।'

বিদ্যাবীথির ঝি রাসমণি। সংসারে আর কেউ নেই। খোরাকীর বদলে হেডমিস্ট্রেসের বাসায় কাজ করে। সুপ্রীতি ব্যস্ত থাকলে মাঝে মাঝে রেঁধেও দেয়। স্কুলের সেক্রেটারী অনুকূল সরকারই ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

'বিনা মাইনেয় এমন কম্বাইন্‌ড্ হ্যাণ্ড আর কোথাও পাবেন না শৈলেনবাবু। জানেন তো আজকালকার দিনে বউ পাওয়া বরং সহজ, কিন্তু শহর ভ'রে খুঁজলেও পছন্দসই একটি ঝি জোগাড় করতে পারবেন না।'

প্রৌঢ় অনুকূলবাবু একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

রাসমণির কথায় শৈলেন জবাব দিল, 'আজ আর বাজার হবে না। আমার কাজ আছে।'

রাসমণি অবাক হ'য়ে বলল, 'ওমা সে কি, বাজার না হলে খাবেন কি, ঘরে কি এক রত্তি

তরকারীও আছে ! তেমন গেরস্থ নাকি আপনারা, যে কিছু জমিয়ে রাখবেন ? ভাঁড়ার সব ধোয়া মোছা। যান শিগগির বাজারে যান, আমার উনুন বয়ে গেল।'

থলিটা হাতে গুঁজে দিতে এল রাসমণি।

কিন্তু দু'পা পিছিয়ে গেল শৈলেন, রুক্ষ স্বরে বলল. 'বলছি তো পারব না। দরকার থাকে নিজে বাজার ক'রে নিয়ে এসো।'

রাসমণি নিজের থুতনিতে আঙুল দিয়ে বলল, 'কি আহ্লাদের কথা রে। দুবেলা দু' মুঠি ভাতের বদলে আমি বাসন মাজব, রাঁধব, আবার মেয়ে মানুষ হয়ে বাজারও করব ? ভাবলেন কি আপনারা ? যান্ আর দিক্ করবেন না। আমাকে কোন রকমে দুটি নামিয়ে রেখেই আবার ইস্কুলের কাজে বেরুতে হবে।'

কেবল স্কুলের কাজ আর স্কুলের কাজ। বউ আর ঝি দুজনের মুখে একই কথা।

শৈলেন রাগ ক'রে বলল, 'কাল থেকে বাসার কাজ আর তোমাকে করতে হবে না। শুধু স্কুলের কাজই কোর।'

এবার রাসমণি হাসল। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হয়েছে। অল্প বয়সের বিধবা। সন্তানাদি কিছু হয়নি। এখনো বেশ আঁট-সাঁট চেহারা। ভরাট মুখ। পরণে সরু চুল পেড়ে ধুতি। মাথায় কালো মিশমিশে চুল আছে এক গোছা। রঙটা ফর্সাপানা। পান দোক্তায় ভরা মুখ। হাসলে কোন কোন সময় এখনো রাসমণিকে ভালোই দেখায়। কিন্তু এখনকার হাসিতে শৈলেনের চিত্ত জ্বলে গেল। রীতিমত অবজ্ঞার হাসি ঝিটার মুখে। ও জানে শৈলেন ওকে কাজে বহালও করেনি, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়ার শক্তিও তার নেই। কোয়ার্টারটা স্কুলের। স্বয়ং সেক্রেটারী হেডমিস্ট্রেসের সেবা পরিচর্যার জন্য তাকে এখানে রেখেছেন। শৈলেন কথা বলবার কে।

রাসমণি সুপ্রীতির দিকে এবার ফিরে তাকাল, 'ও বড় দিদিমণি, বলি খাতা তো দেখছেন, এদিকে যে বাজার হয় না। সোয়ামীর সঙ্গে ফের বুঝি এক চোট হয়ে গেছে ? ঝগড়া করবেন আপনারা, আর তার ফল ভুগবে আর মানুষে। মজা মন্দ নয়। এত ঝগড়া লাগে কিসে আপনাদের ?'

সুপ্রীতি রাসমণির দিকে তাকিয়ে এবার হাসল, 'তুমি থামতো। বাজার না হয়, ডাল ভাত হবে আজ।'

মিণ্টু বলে উঠল, 'আমি কিন্তু ডাল খাব না মা। বাবা ইলিশ মাছ আনবে, তাই খাব।'

সুপ্রীতি কি বলতে যাচ্ছিল, সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল, 'শৈলেনবাবু আছেন নাকি, ও শৈলেনবাবু ?'

সেক্রেটারী অনুকূল সরকারের গলা, শৈলেনের নাম ধ'রে ডাকলেও তিনি এসেছেন হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি মুখুয্যের কাছে। গৃহস্বামীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, বিশেষ কোন কথাও নেই। স্কুলের দরোয়ান ভজন সিং-এর মত শৈলেনও এই হেডমিস্ট্রেসের কোয়ার্টারের দ্বাররক্ষী মাত্র, আর কিছু নয়। মনে মনে সেক্রেটারীর ওপর অত্যন্ত বিদ্বেষ বোধ করল শৈলেন। ভাবল আজ লোকটির মুখের সামনে দোর বন্ধ ক'রে দেয়।

কিন্তু রাসমণি তাকে ততক্ষণে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে, 'আসুন, বড়বাবু, দোর খোলাই আছে।'

ময়লা শাড়ি পরা ছিল সুপ্রীতির। একটা জায়গায় একটু ছেঁড়াও আছে। আড়ালে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানা বদলে ফিকে হলদে রঙের পরিষ্কার শাড়িখানা পরে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে চলল। ছোট্ট একটু বসবার ঘর আছে লাগাও। সেক্রেটারী চট ক'রে এদের শোয়ার ঘরে ঢোকেন না। ছোট ঘরে ছোট টেবিলের সামনে গিয়েই বসেন। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা শেষ ক'রে অনেক সময় সেখান থেকেই চলে যান।

শৈলেন স্ত্রীকে কাঁপা গলায় বলল, 'কেবল কি শাড়ি বদলালেই হবে। মুখে পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নেবে না ? গলায় সরু হার ছড়াও পরে নাও, বেশ দেখাবে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সুপ্রীতি বলল, 'ইতর কোথাকার।'

তারপর সোজা চলে গেল সেক্রেটারীর ঘরে।

রাসমণি ফের এসে তাগিদ লাগাল, 'আর দেরি করবেন না, দাদাবাবু। উনুন জ্বলে গেল। মাস অন্তে আপনিই তো শেষে কয়লার হিসাব করেন। এত লাগে, অত লাগে। কেন লাগে এবার বুঝে দেখুন।'

উপায় নেই। মনে যত বিক্ষোভই থাকুক, দিনযাত্রার এতটুকু ব্যত্যয় হ'লে চলবে না। থলি হাতে ঘর থেকে বেরুল শৈলেন। রাসমণি বলল, 'মাছ, পান, তরকারী আর শুকনো লঙ্কা কিন্তু একেবারেই নেই। মনে থাকে যেন, কালকের মত ভুলে যাবেন না।'

সেক্রেটারীর সঙ্গে ইস্কুল সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে হঠাৎ সুপ্রীতি বলল, 'খয়েরের কথা বললিনে রাসমণি, খয়ের আসে যেন।'

অনুকূলবাবুর গলা শোনা গেল, 'অমন ক'রে পিছন থেকে বললে কি কারো কানে যায় মিসেস মুখার্জি, না মনে থাকে। সামনে ডেকে ভালো ক'রে বলুন। ও শৈলেনবাবু এদিকে আসুন, আরে শুনুন, শুনুন, সিগারেট নিয়ে যান।'

আপ্যায়নে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন অনুকূলবাবু।

স্ত্রীর মনিব। সিগারেট তো তাঁকে শৈলেনেরই খাওয়াবার কথা। কিন্তু সিগারেট আর নেই, আছে বিড়ি। তা তো আর দেওয়া যায় না, কিন্তু সিগারেটটা নিতেও যেন কেমন কেমন লাগে। এত ঘনিষ্ঠতা কিসের অনুকূলবাবুর। দৌবারিককে কেন এই খাতির।

তবু ডেকেছেন যখন, না যাওয়াটা অভদ্রতা। বসবার ঘরের সামনে শৈলেন দাঁড়িয়ে শুকনো একটু হাসল, 'না না, সিগারেট থাক, এই তো, এই মাত্র খেলাম। বড় টিডিয়াস জব, যাই বলুন।'

অনুকূলবাবু হাসলেন, 'কি বাজার করাটা ? আপনাদের মত কবি মানুষের পক্ষে সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের বেলায় কথাটা খাটে না। আমাদের তো বাজারেই দিন রাত কাটাতে হয়। তবু সকালের বাজারটি কিন্তু নিজের হাতে না করলে মন ওঠে না। চাকর বাকর অবশ্য গোটা তিনেক আছে, কিন্তু সব ব্যাটা পকেট কাটা। তা' দুচার আনা ওরা মারে মারুক, তবু যদি পছন্দসই জিনিসটি ঘরে আসে। তা তো আসবে না, ওরা কি জিনিস চেনে ? ওদের হাতে বাজার ছেড়ে দিলে সেদিনের খাওয়াটাই মাটি। নিন।' দামী সৌখীন সিগারেট কেসটি বাড়িয়ে ধরলেন অনুকূলবাবু। অগত্যা একটা গোল্ড ফ্লেক তুলে নিল শৈলেন। কিন্তু আশ্চর্য তেমন যেন স্বাদ নেই গোল্ড ফ্লেকে।

চল্লিশ পেরিয়ে গেছে অনুকূল সরকারের বয়স। কিন্তু বেশ মোটা সোটা শক্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ইঁট সুরকির কারবারে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন যুদ্ধের বাজারে। স্থূল জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও রুচিটি সূক্ষ্ম। ওপাড়া থেকে এপাড়ায় আসতে হলেও বেশ সেজেগুজেই বেরোন। পরণে খদ্দরের মিহি ধুতি। সাদা পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম পরানো, হাতে লাল, নীল পাথর বসানো গুটি দুই আংটি। কেবল সাজ-সজ্জাতেই নয় সদনুষ্ঠানেও অনুরাগ আছে অনুকূলবাবুর। সিঁথি বিদ্যাবীথি বলতে গেলে তাঁর নিজেরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। কাজকর্মের ফাঁকে যেটুকু অবসর পান স্কুলের উন্নতির জন্য খাটেন। বছর তিন চার হল স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তারপর আর বিয়ে করেননি। স্ত্রী শিক্ষার ওপর অনুকূলবাবুর স্ত্রীর নাকি খুব ঝোঁক ছিল। তাই তাঁরই প্রীতির জন্য এই গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই সঙ্গে অন্নসংস্থান হয়েছে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবারের। টিচারদের মধ্যে বেশির ভাগই মাত্র ম্যাট্রিক পাশ। দু' তিনজন আণ্ডার ম্যাট্রিকও আছেন। সেকেণ্ড টিচার আই. এ.। গ্রাজুয়েট শুধু হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি। এই প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য কোন হাই স্কুলে এদের চাকরি জোটা কঠিন হোত। ছাত্রীরাও অধিকাংশই দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আশেপাশের উদ্বাস্তু ক্যাম্প আর কলোনী থেকেই বেশির ভাগ আসে। অনেককেই অর্ধবেতনের সুবিধা দিতে হয়েছে। কাউকে কাউকে বিনা মাইনেয়ও বিদ্যা দান করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে, কিন্তু সরকারী সাহায্য এখনো এসে পৌঁছোয়নি। তার জন্য চেষ্টা চরিত্র চলছে। কেবল এপাড়া নয়, শহর ভরে অনুকূল সরকারের বন্ধুবান্ধব। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়ও ক'জন আছেন। তাঁদের কাছ থেকে স্কুলের জন্য নিয়মিত চাঁদা তুলে আনেন অনুকূলবাবু। ছুটিছাটায় স্কুলবাড়িকে বিয়ে-বাড়ি হিসাবে ভাড়া দেন। তাতেও কিছু টাকা আসে। আর স্কুলের সুনাম আর ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাটে সুপ্রীতি নিজে। কেবল ক্লাসে

পড়িয়েই তার দায়িত্ব শেষ হয় না, একটি প্রতিষ্ঠানের সে মাথা। তার জন্য সর্বদা তাকে মাথা খাটাতে হয়।

ফিকে হলদে রঙের শাড়ি প'রে পিঠ ভ'রে একরাশ চুল ছড়িয়ে সেক্রেটারীর টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপ্রীতি। দীর্ঘ তনুদেহ বিনয়ে আনম্র। ভঙ্গিটি অনুরক্তার না হোক, অনুগৃহীতার। মনে মনে হাসল শৈলেন, কোথায় সেই হেডমিস্ট্রেসী প্রতাপ। স্বামীর কাছে না হোক সেক্রেটারীর কাছে তো মাথা নোয়াতে হয়েছে হেডমিস্ট্রেসকে। পুরুষের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে স্ত্রীলোককে। মুহূর্তের জন্য অনুকূল সরকারের সঙ্গে এক ধরনের সান্নিধ্য, অভিন্নতা অনুভব করল শৈলেন।

অনুকূলবাবু বললেন, 'আজই আবার আমাকে একটা সরকারী কাজে দিল্লী যেতে হচ্ছে। তাই ভাবলাম মিসেস মুখার্জির সঙ্গে দেখা ক'রে যাই, আজকে আবার ওঁদের 'পে ডে' কি না', মৃদু হাসলেন অনুকূলবাবু।

ঠিক ঠিক আজ ওদের মাইনের তারিখ। যেতে যেতে ঝুল পকেটে হাত ঢোকাল শৈলেন। মাত্র টাকা দেড়েকের খুচরো আছে সম্বল। এই দিয়েই দিনটাকে বিকেল পর্যন্ত ঠেলে নিতে হবে।

রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে দেখা হল অঙ্কের টিচার অমলা গুপ্তের সঙ্গে। একজন ভদ্রলোকও রয়েছেন পিছনে। হাতে ওষুধের শিশি। ডাক্তারখানা থেকে ফিরছেন। অমলা হেডমিস্ট্রেসের বাসায় মাঝে মাঝে আসে। শৈলেনের সঙ্গে সুপ্রীতি তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ছোটখাট রোগা, ফ্যাকাসে চেহারা অমলার। তবু ওর মধ্যে মুখশ্রীটুকু মন্দ নয়।

শৈলেনকে দেখে অমলা হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল, মৃদু হেসে বলল, 'এই যে।'

তারপর পিছনের পুরুষটির দিকে তাকিয়ে শৈলেনের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমাদের হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। আর ইনি আমার—'

শৈলেনের দিকে তাকিয়ে ফের একটু হাসল অমলা গুপ্ত।

হেডমিস্ট্রেসের স্বামী এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচারের স্বামীর সঙ্গে নিঃশব্দে নমস্কার বিনিময় করল; কিন্তু কথা বলল অমলার সঙ্গেই, 'ভালো আছেন ?'

'হ্যাঁ, বাজারে চলেছেন বুঝি ?'

স্মিত সৌজন্যে মধুর অমলার গলা। শৈলেন জানে তার এ-খাতির সুপ্রীতির জন্যই।

'আপনার কাজের খুব প্রশংসা শুনি।'

শৈলেনের ঠোঁটে মৃদু হাসি, গলায় ফ্লার্টিং-এর সুর। বিশেষ কিছু নয়, সে স্কুলের সেক্রেটারীরই অনুকরণ করছে। শৈলেন সেক্রেটারী না হ'তে পারে, কিন্তু অমলা গুপ্তের কাছে তাদের হেডমিস্ট্রেসের স্বামী।

অমলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'প্রশংসা না আরও কিছু। স্কুলে তো সুপ্রীতিদি ব'কে কাউকে আস্ত রাখেন না। মেয়েরা আর টিচাররা সমান তটস্থ।'

কড়া হেডমিস্ট্রেস বলে একসঙ্গে সুনাম আর দুর্নাম আছে সুপ্রীতির।

শৈলেন মৃদু হাসল, 'তাই না কি ? কিন্তু আপনাকে বকা উচিত নয়, তবে আপনি যেমন লাজুক, আর মুখচোরা তাতে দেখলে সকলেরই বোধ হয় একচোট বকে নিতে ইচ্ছা করে। না বকলে কি আপনার মুখে কথা ফোটে।'

অঙ্কের টিচারের স্বামী ততক্ষণে কটমট ক'রে তাকিয়েছে শৈলেনের দিকে।

শৈলেন মৃদু হেসে পকেট থেকে তাঁকে একটি বিড়ি অফার করল, 'নিন।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'আমি বিড়ি খাইনে, আচ্ছা চলি নমস্কার।'

সস্ত্রীক বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

শৈলেন নিজে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর মনে মনে বলল, 'না খাও না খেলে। হেডমিস্ট্রেসের স্বামী হয়ে আমি বিড়ি টানতে পারি, আর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট টিচারের স্বামী হয়ে তোমার তাতে মান যায়। ঘরে যে কত সিগারেট জোটে তা তো মোটা ফুটোওয়ালা নাক দেখেই টের পেয়েছি। দিনে রাতে এক পয়সার নস্যি ছাড়া তোমার অন্য গতি নেই।'

হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। এ পাড়ায় এই তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। শুধু স্কুলের ছাত্রীরা, তাদের অভিভাবকেরা, টিচারেরা আর তাদের স্বামীরাই নয়, গোয়ালা, মুদি, কয়লাওয়ালা, রেশন শপের মালিক পর্যন্ত তাকে ওই পরিচয়েই চেনে। বাসা হেডমিস্ট্রেসের, সংসার হেডমিস্ট্রেসের, স্বামী হেডমিস্ট্রেসের। এপাড়ায় সুপ্রীতি মুখুয্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়া। প্রায় আধানেত্রী গোছের মহিলা। আর শৈলেন শুধু সুপ্রীতির স্বামী, স্ত্রীনাম-ধন্য পুরুষ, অথচ বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, উপার্জনে শৈলেন সুপ্রীতির চেয়ে অনেক ওপরে। তবু এখানে সে অখ্যাতনামা, প্রায় অজ্ঞাতনামা। এপাড়া ছেড়ে দিতে হবে শৈলেনকে, সুপ্রীতিকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। আশ্চর্য, সুপ্রীতিও যেন চায় না শৈলেন এপাড়ায় পরিচিত হোক, তাকে লোকে জানুক, চিনুক, নিজের খ্যাতির আড়ালে স্বামীকে যেন সে সরিয়ে রাখতে চায়। স্ত্রীর ওপর অদ্ভুত এক ধরনের বিদ্বেষ বোধ করল শৈলেন। অথচ এক সময় এই সুপ্রীতি নামটিকে পৃথিবীর কাছে বিখ্যাত ক'রে তোলার জন্য কি না করেছে সে, তখনো বিয়ে হয়নি, কিন্তু কলেজের জনবিরল লাইব্রেরী ঘরে জানাশোনা গভীরতর হয়েছে। ছাপার অক্ষরে সেই গভীর পরিচয়ের সাক্ষ্য রাখবার জন্য সুপ্রীতির নামে কবিতা লিখেছে শৈলেন। শুধু তাই নয়, নিজে লিখে ওর নামে কবিতা ছেপেছে।

সুপ্রীতি আপত্তি করেছে, 'ও কি, তোমার লেখা আমার নামে কেন ছাপালে। আমি তো আর লিখতে জানিনে।'

শৈলেন জবাব দিয়েছে, 'লেখাতে জানো। সেটা কি কম কথা ?'

সুপ্রীতি বলেছে, 'তবু মিছেমিছি আমার নাম—'

শৈলেন জবাব দিয়েছে, 'মিছেমিছি কেন হবে। ও নামটা কি কেবল তোমারই। এতে আমার স্বত্ব আরো বেশি।'

সুপ্রীতি স্মিতমুখে স্বীকার করেছে, 'তা তো ঠিকই।'

কিন্তু সেদিন আর নেই।

বাজারে গিয়ে মেছুনীর সঙ্গে ঝগড়া, তরকারীওয়াল'র সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল। তারপর ঘর্মাক্ত দেহে বাজার নিয়ে বাসায় ফিরল শৈলেন।

রাসমণি এসে হাত থেকে থলি নামাল।

শৈলেন বলল, 'তোমার দিদিমণি কোথায় ?'

রাসমণি বলল, 'সেক্রেটারী বাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। বোধহয় প্রেসিডেন্টের বাড়িতেই গেলেন। বললেন, জরুরী কাজ।'

শৈলেন বলল, 'হ্যা কাজ তো সবই তার জরুরী। কেবল ঘর সংসারটাই ফালতু।'

ব্যাপার মন্দ নয়। এতদিন জরুরী কাজের আলোচনাটা ঘরে বসেই হোত। মাসখানেক আগে গেছে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসব। তার উদ্যোগ আয়োজনের পরামর্শের জন্য প্রায়ই আসতেন সেক্রেটারী। কমিটির আরো দু' একজন মেম্বারও এসে হানা দিতেন। আবৃত্তি অভিনয়ের মহড়া চলত স্কুলের ছাত্রীদের। সারা বাসাটা বাজারে পরিণত হয়েছিল। রীতিমত রাজকীয় ব্যাপার। কোন্ এক মন্ত্রী এসে সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর সংবর্ধনার জন্য আড়ম্বর আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। আর কথায় কথায় দরকার হচ্ছিল হেডমিস্ট্রেসকে। এইটুক স্বীকৃতি পেয়ে সুপ্রীতিরও উৎসাহের অন্ত ছিল না। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কর্তৃত্বের মোহ, খ্যাতির লোভ তাকে পেয়ে বসেছিল।

মাঝে মাঝে শৈলেন বাধা দিয়েছিল, 'চাকরি করছ করছ, কিন্তু এত হৈ চৈ করছ কেন।'

সুপ্রীতি জবাব দিয়েছিল, 'হৈ চৈ আর কোথায়। এই উপলক্ষে যদি স্কুলটা দাঁড়ায়, যদি এইড্টা আসে—'

কেবল স্কুল আর স্কুল। স্কুল ছাড়া কি আর কোন কথা নেই, চাকরি তো শৈলেনও করে। মাইনে সুপ্রীতির চেয়ে বেশিই পায়। কিন্তু অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক তার দশটা পাঁচটার। কলম রেখে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীর খোলসটাকে ছেড়ে আসে। কিন্তু সুপ্রীতি তখনো হেডমিস্ট্রেস। স্কুলের কোন না কোন কাজ, কোন না কোন প্রসঙ্গ সে বাসার মধ্যে টেনে আনবেই, বছরে বছরে তিনবার ক'রে পরীক্ষার খাতা আসে। রোজ আসে ছাত্রীদের টাসকের খাতা। এছাড়াও স্কুলের নানা রকম

রেকর্ড, রিপোর্টের দিকে চোখ রাখতে হয় হেডমিস্ট্রেসকে। তাছাড়া আরো নানা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আসে কমিটির সদস্যদের দু' একজন, কি ছাত্রীদের অভিভাবক ; সুপ্রীতির বাসাটা বাসা নয়, স্কুলেরই আর এক অংশ।

বিরক্তির অবধি থাকে না শৈলেনের, মাঝে মাঝে সে বিরক্তি প্রকাশও করে, 'বাসাটা যে বাজার হয়ে উঠল। আমাকে তাড়াবার মতলব না কি তোমার ?'

সুপ্রীতি হাসে, 'সত্যি, তোমার বড় অসুবিধা হয়। কিন্তু কি করি বল, দরকারের জন্যই তো লোকে আসে। আচ্ছা এরপর থেকে অন্য ব্যবস্থা করব।'

স্কুলের অফিস রুমে বসেই কিছুদিন দরকারী কাজ সারে সুপ্রীতি, বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। শৈলেনের তাও ভালো লাগে না। অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে সামনে না দেখলে কার মেজাজ না বিগড়ে যায় ?

আজও মেজাজ বিগড়াল শৈলেনের। সেক্রেটারীর সঙ্গে কোথায় বেরুল সুপ্রীতি, কেন বেরুল ? স্কুলের কাজের দোহাই পেড়ে যখন তখন যার তার সঙ্গে বেরুলেই হবে ? একটা শোভনতা বোধ নেই ? পাড়ার লোকে কিছু ভাবতে পারে সে ভয়টাও কি নেই ? মিণ্টুও ঘরে নেই। পাশের বাসার সমবয়সী ছেলেটির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে কি যেন নতুন খেলা খেলতে সুরু করেছে। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল শৈলেনের।

মুখ বাড়িয়ে মেয়েকে ধমক দিল শৈলেন, 'এই মিণ্টু, ঘরে এসো।'

মিণ্টু ঘরে এল না, শুধু ক্রীড়া সঙ্গীকে নিয়ে বাপের চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ওরও তাহ'লে চক্ষুলজ্জা আছে।

ভারি নিঃসঙ্গ অসহায় আর অবজ্ঞাত বোধ করল শৈলেন। ভাবল সেও কোথাও বেরিয়ে পড়বে। খুঁজলে দু' একজন প্রাক্তন বান্ধবী তারও কি মিলবে না সারা শহরে ?

তাড়াতাড়ি দাড়িটা কামিয়ে নিল শৈলেন। স্নান শেষ ক'রে আয়নার সামনে এসে মাথা আঁচড়াতে লাগল। বন্ধুমহলে সুপুরুষ বলে খ্যাতি আছে তার। বান্ধবীমহলে সে খ্যাতি আরো বেশি। ক্লাসে অমন দীর্ঘ চেহারা, ফর্সা রঙ বড় একটা চোখে পড়ত না। আর চোখে পলক পড়ত না সহপাঠিনীদের। তাদের দলে ছিল সুপ্রীতি। কিন্তু সে আজ আর সহাধ্যায়িনী নয়, হেডমিস্ট্রেস।

লণ্ড্রি থেকে ফর্সা জামা কাল আনিয়ে রেখেছিল শৈলেন। কিন্তু কাল ভাঙেনি। ভেবেছিল আজ বিকালে একসঙ্গে বেরুবে সুপ্রীতির সঙ্গে। যাবে কোন সিনেমায়। কিন্তু বিকালের আগেই সদ্য ধোয়া জামাকাপড়ের পাট ভাঙবার দরকার হল।

দেড়টাকা বাজারেই শেষ হয়েছে। মনে পড়ল রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে দু'টাকার একখানা নোট সেদিন লুকিয়ে রেখেছিল শৈলেন। এমন গোপন সঞ্চয় পরস্পরকে লুকিয়ে দু'জনেই মাঝে মাঝে করে। সে টাকা দুঃসময়ে সংসারের জন্যই ব্যয় হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সংসার নেই, কেউ নেই। দু'টাকার নোটখানা শৈলেন সন্তর্পণে ঘড়িপকেটে রেখে দিল।

রাসমণি রান্নাঘর থেকে বলল, 'ওকি দাদাবাবু, এই অসময়ে না খেয়েদেয়ে কোথায় বেরুচ্ছেন। খেয়ে যান। আমার মাছের ঝোল এই নামল বলে। বেশ তেল আছে কিন্তু ইলিশ মাছটায়।'

তেলালো ইলিশ মাছের কথা শুনে আজ আর জিভ সজল হল না শৈলেনের। শুকনো, রুক্ষ গলায় বলল, 'বাসায় আজ আর আমি খাব না, বলিস তোর দিদিমণিকে।'

রাসমণি হেসে মুখ বাড়াল, 'নেমন্তন্ন আছে বুঝি দাদাবাবু ? সে কথা আগে বলতে হয়।'

শৈলেন মনে মনে ভাবল, নিমন্ত্রণ অবশ্য নেই, কিন্তু কোথাও কিছু না জোটে, হোটেল তো আছে। হেডমিস্ট্রেসের এই বাসার চেয়ে তা অনেক ভালো।

কিন্তু ঘর থেকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজায় কার গলা শোনা গেল, 'সপ্রীতিদি আছেন ?'

বিরক্ত হয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল শৈলেন, কিন্তু দোরগোড়ায় আর একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল। শীর্ণ শুষ্কমুখী কোন মিস্ট্রেস-টিস্ট্রেস নয়, বিদ্যাবীথির প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী সপ্তদশী অর্চনা মিত্র। আকাশ রঙের শাড়িটি আঁট-সাঁট ক'রে পরা। গায়ে গৌরবর্ণের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। রঙীন ব্লাউজের

হাতায় লতানো নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য। প্রসাধন-মার্জিত সুন্দর ভরাট মুখ। পিঠের বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সরু হার। ব্লাউসে গোঁজা একটি সেফার্স পেনের চূড়া। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল শৈলেন, 'না, সে তো এখন নেই।'

অর্চনা বলল, 'হেডমিস্ট্রেস নেই বুঝি ?'

শৈলেন একটু হাসল, 'না হেডমিস্ট্রেসও নেই, সুপ্রীতিও নেই। এসো না ভিতরে। হয়তো একটু বাদেই তোমার হেডমিস্ট্রেস এসে পড়বেন।'

অর্চনা এবার একটু ভরসা পেয়ে বলল, 'না, না, তিনি না এসে পড়লেই ভাল। গোপনে গোপনে আপনার কাছ থেকে নম্বরটা জেনে যাওয়া যাবে।' আচ্ছা, আমাদের ইংরাজী খাতা দেখা হয়ে গেছে, না ? এবারও কি খুব কড়া ক'রে খাতা দেখেছেন নাকি হেডমিস্ট্রেস ?'

শৈলেন মৃদু হাসল, 'কি জানি।'

অর্চনা বলল, 'এবারও যদি খারাপ নম্বর পাই, বাড়িতে আর মুখ দেখাতে পারব না। কত পেয়েছি জানেন ?'

শৈলেন বলল, 'না জানলেও, জানতে কতক্ষণ ! খাতাগুলি তো ঘরেই আছে, এসো না !'

অর্চনা বলল, 'আসব ? কিন্তু হেডমিস্ট্রেস এসে পড়বেন না তো ?' এই আশঙ্কার অন্য অর্থ হতে পারে ভেবেই কি অর্চনা অমন আরক্ত হয়ে উঠল, না কি তার রক্তবর্ণের কর্ণাভরণেরই ছটা গালে গিয়ে পড়ল ?

শৈলেন বলল, 'এলেন-ই-বা, এতো আর তাঁর স্কুল নয়। এসো ভিতরে। তাছাড়া অত ভয় থাকলে কি গোপনে গোপনে নম্বর জানা যায়।'

ভরসা পেয়ে অর্চনা শৈলেনের পিছনে ঘরে এসে ঢুকল। ওর হাতে একখানা পাতলা খাতা। বইপত্র কিছুই নেই। ধরণটা অনেকটা কলেজী কলেজী। বয়সের তুলনায় ওকে বড়ও দেখায়। সাধারণ উকিলের মেয়ে। কিন্তু বাড়ির অবস্থার তুলনায় ওকে স্বচ্ছল দেখায় বেশি। নাকি উচ্ছলতাই ওর ঐশ্বর্য।

বেতের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ওকে বসতে বলল শৈলেন। কিন্তু অর্চনা বসল না। সরে এসে বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল ! 'বাঃ, এত বই জোগাড় করেছেন ? এর আগের বারেও তো এত বই ছিল না। রবীন্দ্ররচনাবলীর এই খণ্ডগুলি নতুন কিনেছেন বুঝি ?'

শৈলেন বলল, 'হ্যাঁ !'

নতুনই কিনেছে। টানাটানির সংসারে অনেক কষ্ট হয়েছে কিনতে। কিন্তু কিনে লাভ কি হল। রবীন্দ্রনাথ আর পড়া হয় না। পড়বার সময় নেই, সঙ্গিনী নেই।

বইয়ের র‍্যাকের কাছে একটু এগিয়ে এল শৈলেন, 'কবিতা তোমার ভালো লাগে ?'

অর্চনা হেসে মুখ ফিরাল, 'কবিতা আবার ভালো লাগে না কার। খুব ভালো লাগে। ইংরেজী বাঙলা দু-ই। ভালো লাগে না কেবল ট্রানস্লেশন আর গ্রামার।'

শৈলেন হেসে বলল, 'আমারও।'

অর্চনা বলল, 'তাই নাকি ? আপনিও—'

কথাটা শেষ হল না অর্চনার। দোরের কাছে হেডমিস্ট্রেস এসে দাঁড়িয়েছেন। শৈলেনের কাছ থেকে দু' পা পিছিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল অর্চনা।

সুপ্রীতি দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'অর্চনা তুমি এখানে কেন ? সাড়ে দশটা বাজে। তোমাদের ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে না ?'

রোদেপোড়া তামাটে মুখ সুপ্রীতির। ভারী নিষ্ঠুর, ভারী নির্মম মনে হল অর্চনার। হঠাৎ তার মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না।

কথা বলল শৈলেন, 'আমিই ওকে ডেকে এনেছি।'

সুপ্রীতি বলল, 'ডেকে এনেছ, কেন ?'

শৈলেন একটু হাসল, 'ডাকলাম। ডাকতে ভালো লাগল।'

মুহূর্তের জন্য সুপ্রীতিও তার ছাত্রীর মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

মনে মনে নিষ্ঠুর একটা কৌতুক বোধ করল শৈলেন। এবার ? এবার কোথায় রইল তোমার হেডমিস্ট্রেসগিরি ?

মাত্র একটি কথায় তোমার ফেল-করা ছাত্রীকে এখনও আমি এমন ডবল, চৌডবল প্রমোসন দিয়ে দিতে পারি, তা জান ? এদিক থেকে তোমার সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্টের চাইতে ক্ষমতা কোন অংশে কম নয় আমার। বরং অনেক গুণ বেশি।

অর্চনা বলল, 'আমি যাই প্রীতিদি, নম্বর জানতে এসেছিলাম।'

সুপ্রীতি রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'নম্বর তো ক্লাসে বসেই জানতে পারতে। জানবার আবার কি আছে ? এবারও তো ফেল করেছ। যাও, ক্লাসে যাও।'

প্রায় যেন ঘাড় ধ'রে ওকে বের ক'রে দেবে সুপ্রীতি। ধমক খেয়ে অপমানিত অর্চনা এবার ঘাড় ফিরাল, তারপর মরিয়া হ'যে বলল, 'আপনার হাতে যখন খাতা পড়েছে, ফেল তো করবই। এ আর নতুন কথা কি।'

সুপ্রীতি চেঁচিয়ে উঠল, 'এত স্পর্ধা তোমার ! বেয়াড়া বকাটে মেয়ে !'

কিন্তু অর্চনা ততক্ষণে সদর পার হয়ে গেছে। বেশ হয়েছে। এতদিন বাদে ঠিক মুখের মত জবাব দিতে পেরেছে সে হেডমিস্ট্রেসকে। এখন তিনি যত গালাগালিই করুন, জিৎ অর্চনারই। ঠিক হয়েছে।

হিংস্র আক্রোশে শৈলেনও মনে মনে ভাবল, 'ঠিক হয়েছে।'

ভারি নিষ্প্রভ আর করুণ দেখাচ্ছে সুপ্রীতির মুখ। পরাজিত শত্রুর ওপর এবার করুণা দেখানো যায়।

শৈলেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুপ্রীতি তা' শুনবার জন্য অপেক্ষা না ক'রে রান্নাঘরে চলে গেল, 'মিণ্টুকে ডেকে আন রাসমণি, ওর কি নাওয়া খাওয়া নেই ? ভাত বাড়, আমার বেলা হয়ে গেছে ইস্কুলের।'

রাসমণি বলল, 'বেলা তো সকলেরই হয়েছে বড়দিদিমণি। দাদাবাবুও খাননি। ওঁর নাকি কোথায় নেমন্তন্ন আছে।'

শৈলেন তাড়াতাড়ি বলল, 'না না না, আমি এখানেই খাব। নিমন্ত্রণে আজ আর যাব না।'

মেয়েকে নিয়ে পাশাপাশি খেতে বসল দুজনে। কিন্তু সুপ্রীতির মুখে কোন কথা নেই। শৈলেনের উপস্থিতিকে সে অগ্রাহ্য করছে।

খেতে খেতে হঠাৎ রাসমণির দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্কুলের কোন মেয়েকে আমার ঘরের বইপত্র ঘাঁটতে দিসনে, বুঝলি। আগেই বারণ করবি।'

শৈলেন বলল, 'শুধু সেক্রেটারীর বেলায় এ নিয়ম খাটবে না। তিনি যত ইচ্ছা বই ঘাঁটতে পারেন।'

সুপ্রীতি স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ইতরামিরও একটা সীমা আছে।'

শৈলেন বলল, 'কিন্তু সে সীমাটা কোন ছাত্রীর বেলায় না মানলে দোষ হয় না। হঠাৎ অমন ক'রে কোথায় বেরিয়েছিলে ?'

সুপ্রীতি বলল, 'তা শুনে কি দরকার তোমার। বেড়াতে কি হাওয়া খেতে বেরোইনি। স্কুলের কাজেই বেরিয়েছিলাম।'

শৈলেন অদ্ভুত একটু হাসল, 'ওরকম স্কুলের কাজ তো তোমার চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে।'

সুপ্রীতি রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আছেই তো। স্কুলের কাজ আছে বলেই সংসার চলছে খাওয়া জুটছে।'

ভাতের গ্রাস মুখে না তুলে শৈলেন বলল, 'কী—কি বললে ?' কিন্তু সুপ্রীতি আর কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে মেয়েকে খাওয়াতে লাগল।

শৈলেন স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার রোজগার করা টাকা ফের যদি আমি হাত দিয়ে ছুঁই, আমার নাম ফিরিয়ে নাম রেখ।'

সঙ্গে সঙ্গে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল শৈলেন।

রাসমণি বলল, 'ওকি দাদাবাবু, ভাত যে পড়ে রইল; মাছের ডিমের টক আছে। উঠবেন না, উঠবেন না, শুনুন।'

কিন্তু শৈলেন ততক্ষণে জলের ঘটি নিয়ে আঁচাবার জন্য উঠানে নেমে পড়েছে।

রাসমণি সুপ্রীতির দিকে চেয়ে বলল, 'কাজটা তোমারও ভালো হয়নি দিদিমণি। ছি ছি ছি, সোয়ামীকে মেয়েমানুষে খাওয়ার খোঁটা দেয় কোন দিন ? বাপের জন্মেও তো দেখিনি— ।'

মিণ্টু বলল, 'বাবা ডিমের টক খেল না কেন মা।'

ডিমের টক অবশ্য সুপ্রীতিও খেল না, মেয়েকে বলল, 'তুই বসে বসে খা। আমার বেলা হয়ে গেছে।'

একটু বাদে পরীক্ষার খাতাগুলি বগলে নিয়ে সুপ্রীতি স্কুলে বেরিয়ে গেল। রাসমণিও গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বাসার কাছেই স্কুল। এক ফাঁকে সে স্কুলের কিছু কাজ আগেই সেরে এসেছে।

মেয়েকে ডেকে শোয়াল শৈলেন। বাবার মেজাজ দেখে আজ আর মিণ্টু তাকে বেশি বিরক্ত করল না, গল্প বলবার বায়না করল না, অল্পেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শৈলেনের ঘুম এল না; খানিকক্ষণ একটা বইয়ের পাতা ওলটালো, মন লাগল না; তবু আরো ঘণ্টাখানেক গড়িমসি ক'রে কাটিয়ে দিয়ে বাসা আর মেয়ের দায়িত্ব পাশের ঘরের ভাড়াটে বউটির ওপর গছিয়ে শৈলেন এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত দুনিয়াটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সময় আর কাটতে চায় না, তবু কাটল। বিড়ির আগুনে পুড়তে পুড়তে দিন শেষ হল। অঙ্গারের রঙ লাগল আকাশে।

পাড়ার একটা চায়ের দোকানে উঠে বসল শৈলেন।

'দেখি এক কাপ চা।'

কিন্তু দোকানী চায়ের কাপটি সামনে দিতে না দিতেই পুরোন বন্ধু হেরম্ব হালদার এসে ঢুকল দোকানে, 'এই যে শৈলেন, চা খাচ্ছ নাকি ? দোকানীকে আর এক কাপ চা দিতে বলল শৈলেন। কিন্তু চা খেয়েও হেরম্ব নিবৃত্ত হল না, বলল, 'ইয়ে তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

গোটা পঁচিশেক টাকা পেত হেরম্ব। মেয়ের অসুখের সময় নিতে হয়েছিল। টাকা পনেরো শোধ দিয়েছে। দশ টাকা এখনো বাকি।

শৈলেন সংক্ষেপে বলল, 'কাল নিয়ো।'

হেরম্ব বলল, 'কাল ? আচ্ছা কাল পেলেই চলবে। ভারি টানাটানি যাচ্ছে। কিছুতেই আর কুলোতে পারছি না ভাই। তোমার আর কি, তুমি তো চতুর্ভুজ। ঘরে বাইরে দু'জনে সমানে রোজগার করছ। গার্লস স্কুল বুঝি আজই ছুটি হয়ে গেল ?'

শৈলেন বলল, 'হুঁ।'

হেরম্ব বলল, 'তাহ'লে কাল সকালে, কি বল ?'

শৈলেন বলল, 'বললামই তো।'

চায়ের দোকান থেকে নেমে একটু এগুতেই কামধেনু ডেয়ারীর এককড়ি নন্দীর সঙ্গে দেখা। সাইকেল ক'রে দুধ জুগিয়ে ফিরছে। হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো বড় বড় গোটা দুই কেৎলি, শৈলেনকে দেখে আকর্ণ হেসে বলল, 'এই যে স্যার।'

শৈলেন বলল, 'হুঁ।'

এককড়ি বলল, 'কাল যাব বিল নিয়ে। হেডমিস্ট্রেসকে বলবেন পুজো পার্বনী এবার কিন্তু ভালো রকম দিতে হবে। সামনের বছর থেকে আমার মেয়েকেও দেব স্কুলে।'

আরো বেশিক্ষণ পথে ঘুরলে ধোপার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, মুদির সঙ্গে দেখা হওয়াটাও বিচিত্র নয়। তার চেয়ে ঘরই ভালো।

ঘরে তখন আলো জ্বলছে। চটি বইয়ে মিণ্টুর মন ওঠে না, মোটা অক্সফোর্ড ডিক্সনারীখানা নিয়ে সে পড়তে বসেছে। মেয়ের হাতে কাজের বই দেখেও আজ আর সুপ্রীতি কেড়ে নেয়নি। ওর হয়েছে কি।

'তোর মা কই রে ?' মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল শৈলেন।

মিণ্টু বলল, 'ওই তো জানলা দিয়ে গাড়ি ঘোড়া দেখছে। একটু আগে কত বড় একটা ঘোড়া যাচ্ছিল বাবা তুমি তো দেখলে না।'

সত্যিই জানলার গরাদের সঙ্গে মিশে বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল সুপ্রীতি। সামনে ফাঁকা এক খণ্ড মাঠ। গাড়ি ঘোড়া কিছু সেখানে শৈলেনের চোখে পড়ল না। হেরম্ব আর এককড়ির তাগিদ সে একা কেন ঘাড় পেতে নেবে। শৈলেন মনে মনে ভাবল। এসব খরচের জন্য দায়ী তো সুপ্রীতিও। পাওনাদারদের তাগিদটা ওর কাছেও পৌঁছুক। তারপর শৈলেন নিতান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে যেন গরাদকেই সম্বোধন ক'রে বলল, 'হেরম্ব আর এককড়ির সঙ্গে দেখা হল, ওরা কাল আসবে।'

সুপ্রীতি একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গীতে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এলেই বা কি করব ?'

ওর কালো আয়ত দুটি চোখ যেন বিষণ্ণ কিন্তু শান্ত আর গভীর হয়ে উঠেছে।

শৈলেন চমকে উঠল, 'এলেই বা কি করব মানে ? মাইনে পাওনি ?'

সুপ্রীতির কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। শৈলেন চীৎকার ক'রে ডাকল, 'রাসমণি ! এদিকে এসো তো।' রাসমণি এসে সামনে দাঁড়াতে শৈলেন তেমনি তারস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি ? মাইনে হয়নি স্কুলে ?'

ব্যাপারটা রাসমণির কাছ থেকে পুরোপুরিই শোনা গেল। ও গোড়া থেকেই সব জানে। শুধু সেক্রেটারী নিষেধ করেছিলেন বলেই আগে কিছু বলেনি।

স্কুলের তহবিলে তেমন টাকা নেই। গত মাসে পুরস্কার বিতরণী আর সভাপতির সংবর্ধনায় বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এদিকে ছাত্রীদের মাইনেও তেমন আদায় হয়নি। সেক্রেটারী সেই কথাই হেডমিস্ট্রেসকে জানাতে এসেছিলেন। টিচারদের দু'মাসের মাইনে কোন রকমেই দেওয়া সম্ভব নয়। এখন তাঁরা এক মাসের বেতনই নিন। পরে ছুটির মধ্যে দিন পনের পরে আবার না হয় সেক্রেটারী একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সুপ্রীতি তাতে রাজী হয়নি। পঞ্চাশ ষাট টাকা এক-একজনের মাইনে। পুজোর মাসে দু'মাসের টাকা না পেলে টিচারদের চলবে কি ক'রে। এই নিয়ে অনুকূলবাবুর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা কথান্তরও হয়েছিল সুপ্রীতির।

অনুকূলবাবু চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ আপনি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ভালোই তো, আমার আর কিছু করবার সাধ্য নেই।'

স্থানীয় জমিদার রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে ছুটেছিল সুপ্রীতি। কিন্তু দেখা হয়নি। দোরোয়ান বলে দিয়েছে, তাঁর ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কথা বলা বারণ। তাড়াতাড়িতে কমিটির আর কোন মেম্বারের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারেনি সুপ্রীতি। তা'ছাড়া ছুটিতে অনেকেই তাঁরা বাইরে চলে গেছেন।

সেক্রেটারী বাড়ি গিয়ে এগারটার সময় চাকরের হাতে চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে সব টিচারের এক মাসেরও পুরো মাইনে হয় না। চেকের সঙ্গে হেডমিস্ট্রেসের নামে এক টুকরো নোটও ছিল। স্কুলের নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাতে এর চেয়ে বড় চেক কাটা যায় না। হেডমিস্ট্রেস যেন তাঁর সহকারিণীদের বুঝিয়ে শান্ত রাখেন। মিসেস মুখার্জির যদি বেশি দরকার থাকে তিনি ইচ্ছা করলে দু' মাসের মাইনে নিয়ে নিতে পারেন। তাঁর কাছে স্কুল কমিটি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে সব টিচারের যোগ্যতা কম, রেকর্ড খারাপ, তাঁদের পার্ট-পেমেণ্ট করাই বিধেয়।

স্কুলের টিচারদের ডেকে সব কথাই খুলে বলেছিল সুপ্রীতি। সকলেই বিস্মিত হয়েছিল, ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু যা পাওয়া যায় তা হাত ছাড়া করতে কেউ রাজী হয়নি। কালই তো রেশনের টাকার দরকার হবে, তখন উপায় হবে কি।

প্রথমে নিজের এক মাসের মাইনেটা আলাদা ক'রেই রেখেছিল সুপ্রীতি। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে পারেনি। অঙ্কের টিচার অমলা দত্ত প্রায় কাঁদো কাঁদো হবার জো, 'এই চল্লিশ টাকায় আমার কি হবে দিদি। ওঁর যে সাংঘাতিক অসুখ। ডাক্তারেরই যে অনেক টাকা পাওনা। আরও অন্ততঃ গোটা কুড়ি টাকা আমাকে দিন। আমার কাছে এর পর থেকে আর কোন গাফিলতি পাবেন না, খুব খেটে

পড়াব।'

পনের টাকা সে না নিয়ে ছাড়ল না।

তারপর এল নীলিমা রায়, রেখা ভৌমিক, উমা চন্দ। কারো স্বামীর চাকরি নেই, কারো বাবার মাইনে কাটা গেছে। সকলেরই ধারে-দেনায় অসুখে বিসুখে সংসার অচল। রমা বসু, সবিতা সেন, ললিতা চক্রবর্তীরও একই দশা।

শৈলেনের দিকে তাকিয়ে রাসমণি বলল, 'দাদাবাবু, এমন বোকা মেয়েমানুষ আমি আমার বাপের জন্মেও দেখিনি। দিতে দিতে সব শেষ। কোন বিদ্যাবুদ্ধিতে যে ইস্কুলের বড়দিদিমণি হয়েছিলেন তা উনিই জানেন। আমার মাইনেটা পর্যন্ত দিল না। দিলে কি আমি আর কাউকে বিলিয়ে দিয়ে আসতাম ? ভালোবাসার মানুষ আছে আমার সতের জন ? না কি গণ্ডা দু'তিন ছেলেমেয়ে কোথাও আছে ? আছে নাকি ?'

শৈলেন ঘাড় নেড়ে জানাল, ওসব রাসমণির নেই।

রাসমণি বলতে লাগল, 'ফুরুতে ফুরুতে শেষে যখন গোটা পাঁচেক টাকা বাকি, আমি হাত চেপে ধরলাম,—কর কি বড়দিদিমণি, কালই যে হাঁড়ি চড়বে না। রেশনের টাকাটা অন্তত রাখ।'

শৈলেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেই পাঁচ টাকা এনেছে নাকি, না তাও আনোনি ?'

সুপ্রীতি বলল, 'এনেছি।'

শৈলেন বলল, 'কই, দেখি।'

খোলা দেরাজ টেনে তার ভিতর থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে ম্লান মুখে এগিয়ে ধরল সুপ্রীতি। শৈলেন হঠাৎ সেই নোটশুদ্ধ স্ত্রীর কোমল হাতখানা নিজের বিপুল মুঠির মধ্যে চেপে ধ'রে ডাকল, 'প্রীতি !'

সুপ্রীতি টাল সামলাতে পারল না।

রাসমণি লজ্জায় জিভ কেটে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছি ছি ছি, কাণ্ডজ্ঞান যদি এদের থাকে। মানুষ জন ঘরে রইল কিনা সে খেয়াল পর্যন্ত নেই—ছি ছি ছি। ভালোবেসে বিয়ে করলে লোকে কি এমনই দিশেহারা হয় !

ভাদ্র ১৩৫৭

সুদর্শন চৌধুরী

আমার প্রাবন্ধিক বন্ধু সুদর্শন চৌধুরীকে নিয়ে গল্প লিখতে বসে মনে হচ্ছে, ওর সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা বরং এর চেয়ে সহজ ছিল। ওর সৌম্যদর্শন চেহারার বর্ণনা দিয়ে সুরু ক'রে চারিত্রিক ঋজুতা, আদর্শবাদ, নীতি নিষ্ঠা, বন্ধু আর সাহিত্য প্রীতির কথা উল্লেখের পর সে প্রবন্ধের উপসংহার করা চলত। সমাজ, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে ওর বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি ছাড়াও সমসাময়িক বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসের যে সব সমালোচনা করেছে তার কিছু নিদর্শন তুলে দিলেই পরিষ্কার বোঝা যেত, মতামত আর পছন্দ অপছন্দ প্রকাশের ব্যাপারে সুদর্শন অত্যন্ত নির্ভীক, ওর রসবোধ আর রসবিচার একটু ক্লাসিক ধর্মী। আদি রসের বহুলতায় ওর বীতস্পৃহা, অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, সামগ্রিক জীবনের প্রকাশের শুধুমাত্র প্রয়াস দেখেই যে ও হৃষ্ট-চিত্ত—সে সবও এই আলোচনায় ধরা পড়ত। সুদর্শন মানুষ হিসাবে যে সৎ, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের ছোট গণ্ডীর মধ্যে মহৎ—একটি প্রবন্ধের মধ্যে তাও নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে বলা চলত। কারণ কোন সৎ ব্যক্তি নিয়ে প্রবন্ধ লেখা অনেকটা সততা সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধ রচনার মতই। তার সত্যতা নিয়ে পাঠকের ঘন ঘন প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না, দায়িত্ব নিতে হয় না সংশয় নিরসনের। কিন্তু এখনকার দিনে কোন সৎ ব্যক্তিকে গল্পে ব্যক্ত করতে পারা বড় শক্ত। তার বাস্তবতা সম্বন্ধে পাঠকের মনের প্রশ্ন বোধক চিহ্নগুলি খড়্গের মত লেখকের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

প্রবন্ধে আরও অনেক সুবিধা ছিল। মাত্র ক'টি পৃষ্ঠার মধ্যে সুদর্শনের বাল্য, কৈশোর আর প্রথম যৌবনের ইতিবৃত্ত দিয়ে তার সদসৎ বহু গুণের উল্লেখ করা যেত। কিন্তু একটি গল্পে ওর সম্বন্ধে দু' একটি কথার চেয়ে বেশি বলতে আমি তো সাহস পাই না, বেশি গুণের কথা বলতে গেলেই গল্পের পক্ষে সেটা গুণ হয়ে, দোষ হবে বিদ্যার বেলায়।

এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই প্রাবন্ধিকের পরিচয় দিতে গিয়ে কেন যে সত্যি সত্যিই প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করলাম না তার কারণটা এবার বলি। কারণ শুধু এই নয় যে সুদর্শনের মত চিন্তা আর জ্ঞানানুশীলন আমার নেই, প্রবন্ধ লিখতে গেলে বার বার আমার কলম বন্ধ করতে হবে, কিন্তু তার কারণ কেবল এও নয় যে, সে প্রবন্ধ পড়ে তাতে হাস্যরস না থাকলেও দু' এক মিনিট বাদেই সুদর্শন হাসতে হাসতে তা বন্ধ করবে। আসল কারণটা হোল এই যে, সুদর্শন গোড়ায় গল্প কবিতা লিখতে লিখতে কি ক'রে এমন গোঁড়া প্রাবন্ধিক হয়ে পড়ল সেটা গল্পেরই বস্তু, প্রবন্ধের বিষয় নয়।

সুদর্শনের প্রথম গল্প কলকাতার অধুনালুপ্ত একটি মাসিক কাগজে ছাপা হয়ে যখন বের হয়, ও তখন কুমিল্লা কলেজে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পরীক্ষার্থী। দু' তিন দিন বাদেই কেমিস্ট্রির পরীক্ষা। রসায়নের রস বসে বসে গলাধঃকরণের চেষ্টা করছে সুদর্শন, হঠাৎ ডাক পিওন এসে ছোট একটা সবুজ রঙের মোড়ক লাগানো মাসিক পত্রিকা দিয়ে গেল ওর হাতে। কেমিস্ট্রির মোটা বই ঠেলে রেখে ও তাড়াতাড়ি সেই রঙীন মোড়ক ছিঁড়ে ফেলল। উল্টাতে লাগল মাসিক পত্রিকার পাতা, তারপর এক জায়গায় এসে আর উল্টালো না। চুপ ক'রে চেয়ে রইল। ততক্ষণ মোড়কের সবুজ রঙ কেবল কাগজে নয়, ওর চোখ থেকে সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সুদর্শনের গল্পটি ছাপা হয়েছে কাগজে। সেই সঙ্গে ওর নিজের নাম। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রথম দর্শনে কি অদ্ভুতই না লাগে! এও এক ধরনের আত্মদর্শন।

ষোল-সতের বছর আগেকার সুদর্শনের সেই কাগজ আমি কোন দিন দেখিনি, ওর সেই প্রথম গল্পও পড়া হয়নি আমার। অনেক বছর বাদে 'অগ্রদূত' অফিসে যখন ওর সঙ্গে আমার আলাপ, সে গল্পের, সে কাগজের কোন চিহ্নই ওর কাছে তখন ছিল না। তখন কেন, তার অনেক আগেই ও সে সব হারিয়েছে। ইচ্ছা ক'রেই হারিয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করে হারাতে চাইলেই কি সব থেকে সব হারায়?

সে গল্পের সারাংশ আমি সুদর্শনের কাছে শুনেছিলাম। যৌবনের প্রারম্ভে লেখা কাঁচা হাতের মামুলী কাঁচা গল্প। তবু সে গল্পটুকু অতি সংক্ষেপে আমাকে বলে নিতেই হবে। কারণ এক হিসাবে ওর সে গল্প আমার এ গল্পের ভূমিকা।—

ছোট্ট সুন্দর মফঃস্বল শহর। সেখানে থাকেন নামকরা ডাক্তার ভুবন মহলানবীশ। তিনি কেবল ডাক্তারীতেই নাম করেননি, বিদ্বান, রসজ্ঞ পণ্ডিত বলেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর মেয়ে মীনাক্ষী। দেখতে শুনতে অলোকসামান্যা। সতের আঠার বছরের কুমারী মেয়ে। ভারি স্নিগ্ধ মিষ্টি চেহারা, সুমিষ্ট ভাষা।

ভুবনবাবুর কাছে চিকিৎসার জন্য অনেক রোগী আসে যায়। পাশের গাঁ থেকে সুভদ্র সেনও এল। উনিশ থেকে কুড়িতে পা দিয়েছে সুভদ্র। রূপবান, রুচিবান, উন্নত দর্শন যুবক। কিন্তু একটু রোগে ভুগছে। রোগটা টনসিলের। ভুবনবাবুর চিকিৎসায় অল্প দিনেই তার সে রোগ আরোগ্য হোল। কিন্তু ডাক্তারের বাসায় সুভদ্রের যাতায়াত খান্ত হোল না। কারণ সুভদ্রের বিদ্যানুরাগ ভুবনবাবুর ভালো লেগেছিল।

ভুবনবাবুকেও সুভদ্রের ভালো লাগল, আরো বেশি ভালো লাগল মীনাক্ষীকে। যখন সুভদ্র আর ভুবনবাবুর আলাপ আলোচনা চলে মীনাক্ষী এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। কেবল কি শোনে, দেখেও। সুভদ্র যদি তা দেখে ফেলে, মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি চা আর খাবার আনবার ছলে চলে যায়। কিন্তু চায়ের কাপ আর খাবারের ডিস্ নিয়ে ফের ও চলেও আসে। সুভদ্র বুঝতে পারে মীনাক্ষী আসবে বলেই গিয়েছিল। ওর যাওয়াটাও ছল নয়, আসাটাও ছল নয়, ছল শুধু ওই চা আর জলখাবার টুকু।

তারপর একদিন যখন ভুবন মহলানবীশ অনেক দূরে গেছেন রোগী দেখতে, আর বৃষ্টির জন্য তাঁর বাড়িতে এসে আটকা পড়ে গেছে সুভদ্র তখন যে জানলার কাছে সে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, মীনাক্ষীও তার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার আসতে বোধহয় আরো দেরি হবে। তোমার চা নিয়ে আসি!'

সুভদ্র মাথা নাড়ল, 'না চায়ের আজ দরকার নেই।'

মীনাক্ষী মৃদু হাসল, 'সেকি, এই বৃষ্টির দিনে চা-ই তো সব চেয়ে ভালো লাগবে।'

সুভদ্র বলল, 'সব বৃষ্টির দিনেই কি চা ভালো লাগে?' মীনাক্ষী কোন কথা বলল না।

সুভদ্র আস্তে আস্তে ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

একটু চমকে ওঠল মীনাক্ষী। একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও, আমি বিধবা।'

'বিধবা!'

মীনাক্ষী বলল, 'হ্যাঁ, বাবার জন্যই আমি সাদা থান পরতে পারিনে। দুটি চুড়িও পরে থাকতে হয় হাতে।'

সুভদ্র বলল, 'কেবল দুটি চুড়ি কেন, নতুন করে আরো বেশি অলঙ্কার কি তুমি ফের পরতে পার না?'

মীনাক্ষী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'না তাও হয় না। এসব দিক থেকে বাবা গোঁড়া ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ আর তুমি নাস্তিক বৈদ্য।'

সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল সুভদ্র, আর এল না।

কিন্তু সরোজিনী এলেন সুদর্শনদের বাসায় বেড়াতে। তিনি কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ভবানী ভট্টাচার্যের স্ত্রী। পাশের বাড়ীতেই থাকেন। সুদর্শন কোথায় বেরিয়েছে। সুদর্শনের ছোট বোন লীলা বলল, 'দাদার একটা গল্প ছাপা হয়েছে, দেখেছেন মাসীমা?'

'তাই নাকি দেখি, দেখি।'

সরোজিনী কেবল দেখলেন না, গম্ভীরভাবে তাঁর স্বামীকেও দেখালেন, বললেন, 'এত করে বারণ করেছি, মিনতিকে তোমার ওই গুণধর ছাত্রের সামনে কিছুতেই বেরুতে দিয়ো না। এবার হোল তো? এখন এসব কথা যদি মিনতির শ্বশুরবাড়ীতে যায়, এই বই যদি কোন রকমে রোগা জামাইয়ের হাতে পড়ে তা'হলে তার মনের অবস্থাটা তখন কি হবে শুনি? ছি ছি ছি, তোমার ওই ছাত্র যেন আমার বাড়ীতে আর না ঢোকে।'

ভবানী বাবু বললেন, 'কিন্তু এতো গল্প।'

সরোজিনী বললেন, 'গল্প! তোমার মত সবাই তো আর চশমা এঁটে দিনরাত বসে থাকে না। এ গল্প যে পড়বে তার কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না কি? দেখনা নামগুলি পর্যন্ত কেমন মিলিয়ে মিলিয়ে রেখেছে। ছি ছি ছি—গল্পের সুভদ্র যে ওই সুদর্শন ছোঁড়া তা কি আর কারো বুঝতে বাকি থাকে? বাকি থাক তাই কি ও চায়, সাবধান, মিনতির হাতে যেন এ গল্প না পড়ে।'

মিনতি সে গল্প পড়েনি। তবু শুনেছিল। সুদর্শনের কাছ থেকে নয়, বাপ-মার মধ্যে যে আলোচনা চলেছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই আলাপে সে উৎকর্ণ হয়েছিল।

তারপর দু' তিন দিন বাদেই মিনতিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তার শ্বশুরবাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। প্লুরেসী থেকে তার স্বামী তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে!

কথাটা সুদর্শনের বাপ মার কানেও উঠল। মানে সরোজিনীই দিলেন ওদের কানে।

সুদর্শনের বাবা রীতিমত শাসন করলেন ছেলেকে, 'ছি ছি ছি জাত মান আর রইল না; ফের যদি তোকে গল্প কবিতায় হাত দিতে দেখি তো তার মজা আমি দেখিয়ে ছাড়ব।'

কিন্তু মিনতির বাবা, কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ভবানী ভটচার্য প্রায় ওই কথাগুলিই এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন যে সুদর্শন তা কোনদিন ভুলতে পারল না, আর বোধহয় সেইজন্যেই প্রাবন্ধিক হোল।

কলেজের মধ্যে শুধু সুদর্শনই সেবার কেমিস্ট্রিতে লেটার পেল। আর সেই খবর পেয়ে ভবানী

মোহন নিজে এলেন ওদের বাসায়। সুদর্শনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমার মান রেখেছে।'

সুদর্শন মুখ নিচু করে বলল, 'কিন্তু স্যার সবাই যে অন্য কথা বলে।'

ভবানীবাবু একটু হাসলেন, 'কি বলে ! সুভদ্রের মধ্যে সুদর্শন রয়েছে এই তো ? তারা বোকা, একেবারে বোকা, তারা গল্পের কিছু বোঝে না। সুদর্শন কি কেবল এই সুভদ্রের মধ্যেই আছে ? সে ডুব দিয়েছে ওই ভুবন মহলানবীশের মধ্যে, ডুব দিয়ে দেখেছে ওই মীনাক্ষীর মধ্যে। সুদর্শন নিজে যদি সুভদ্র হয়, সে তাহলে মীনাক্ষীও। তাকে একেকবার একেক রকম হতে হয়েছে। কেবল তো দেখে দেখে লেখা যায় না, হয়ে হয়ে লিখতে হয়।'

বিজ্ঞানের এই প্রৌঢ় অধ্যাপকের মুখের দিকে সুদর্শন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সেই মুহূর্তে তার মনে হোল এই অধ্যাপকের কালো বেমানান লম্বাটে মুখ মিনতির মুখের চেয়ে আরো অনেক বেশি সুন্দর। ঘনীভূত জ্ঞান আর ঘনীভূত রসে কোন পার্থক্য নেই। প্রভেদ নেই রসায়নে আর রসশাস্ত্রে।

একটু বাদে সুদর্শন তার অধ্যাপককে বলল, 'কিন্তু স্যার এসব কথা আপনি জানলেন কি করে ! আপনি তো কোনদিন গল্প লেখেননি। এসব জিনিস এমন করে আমিও তো ভাবিনি, অথচ মনে হচ্ছে এ যেন আমারই ভাবা কথা, আমারই মনের কথা।'

অধ্যাপক সবিনয়ে বললেন, 'এ শুধু তোমার কথাও নয়, আমার কথাও নয় সুদর্শন। আমাদের আগে আরও অনেক জ্ঞানী গুণী এক এক জন এক এক রকম করেও এসব কথা বলে গেছেন। তবু যখন কোন কথা নিজের উপলব্ধি দিয়ে বলি, নিজের অন্তর দিয়ে শুনি, তখন মনে হয় নতুন বললাম, নতুন শুনলাম। যত পড়বে ততই বুঝতে পারবে, ততই জানতে পারবে, উপলব্ধির ক্ষমতাও ততই বাড়বে। জ্ঞানের চেয়ে বড় আনন্দ দুনিয়ায় আর কিছু নেই।'

সুদর্শন বলল, 'কিন্তু রসের আনন্দ কি আরও বড় নয় ?' অধ্যাপক বললেন, 'অন্তত এখন নয়, যতক্ষণ আরও বড় না হচ্ছ ততক্ষণ নয়। এ বয়সে রসের পথ পিচ্ছিল। এখন শুধু একাগ্র মনে জ্ঞানের চর্চা কর, জ্ঞানার্জনে মন দাও : সংস্কৃতের একটি শ্লোকে আছে 'কাব্যাং হন্যতে শাস্ত্রং। এ বয়সে কাব্য চর্চায়, শাস্ত্র চর্চা নষ্ট হবে, সঙ্গীত চর্চায় কাব্য চর্চা নষ্ট হবে, আর রমণীর রূপে যদি আসক্ত হও তা'হলে তোমার সঙ্গীত, কাব্য, শাস্ত্র কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

কথাগুলি সুদর্শনের তখন তেমন ভালো লাগেনি। বড় রূঢ়, বড় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপকের সেই জ্ঞানার্জনের উপদেশ সে ভুলতে পারেনি। অধ্যাপক আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'শুধু জ্ঞান। এখন শুধু জ্ঞান। রসের অভাব কি, রস তো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। রস আছে তোমার বাবা-মায়ের স্নেহে, ছোট ভাই বোনদের শ্রদ্ধা ভক্তির মধ্যে, রস রয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধু-সঙ্গমে। কিন্তু জ্ঞান অত সহজলভ্য নয়, সুদর্শন। অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক তপস্যায় তাকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তবে ঘরে নিতে হয়। তুমি জ্ঞানের পথ থেকে কোনদিন ভ্রষ্ট হয়ো না, জ্ঞান তোমাকে সব চ্যুতি বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে।'

অধ্যাপককে ভালো লাগল, তবু কেন যেন কুমিল্লাকে আর ভালো লাগল না সুদর্শনের। কলকাতায় একটি সস্তা মেস খুঁজে নিল। কিন্তু সস্তা কলেজের দিকে ঝুঁকল না। ভর্তি হোল প্রেসিডেন্সীতে, অনার্স নিল গণিত শাস্ত্রে আর রইল ফিলজফী।

অধ্যাপক কুমিল্লা থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন, 'সায়ান্স ছেড়ে দিলে !'

সুদর্শন জবাব দিল, 'ঠিক ছাড়লাম না, আবার পড়ব। এখন দর্শনটা একটু পড়ে দেখতে ইচ্ছা করছে।'

অধ্যাপক আশীর্বাদ জানিয়ে লিখলেন, 'বেশ তো।'

কিন্তু সুদর্শনের সঙ্গে যখন আমার আলাপ ও তখন 'অগ্রদূত' দৈনিক কাগজে চাকরি করে। সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখে। কিন্তু মন্তব্যে ওর মন নেই। এর আগে আরও অনেক জায়গা ঘুরে এসেছে। সে সব অফিসে ওর মন বসেনি।

আমার দশাও ঐ শনির দশা। ঘুরে ঘুরে এসেছি 'অগ্রদূতে'। আমি অবশ্য সুদর্শনের ঘরে বসি না। আমার চাকরি ওর নিচের তলায়। বসে বসে ইংরাজী সংবাদের বঙ্গানুবাদ করি। কিন্তু আমারও মন বসে না।

একদিন 'অগ্রদূতে'রই রবিবাসরীয় এক সংখ্যায় আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ওপর প্রবন্ধ বেরুল, শুনলাম প্রবন্ধকার ওপরেরই সুদর্শন চৌধুরী। সে প্রবন্ধে লেখক সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের গতি প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। চেষ্টা করেছেন ভবিষ্যৎ দিক নির্ণয়ের। ভালো লাগল।নিজের চিন্তার জোরে তিনি অন্যের মনে চিন্তার উদ্রেক করতে পারবেন।

ওপরে এসে আলাপ করলাম। সব জায়গায় মতের মিল হোল না। তিনি ব্যাপ্তির দিকে জোর দিয়েছেন। আমি গভীরতায় বিশ্বাসী। ওঁর ঝোঁক একান্তভাবে আদর্শবাদের দিকে। আমি বলি সেই সঙ্গে বাস্তবতা যেন বাদ না যায়, তাহলে সব বাদ যাবে। তিনি বলেছেন ভাষা নয় ভঙ্গি নয়, ভাবটাই আসল। কথা নয়, কথ্যই পরম সত্য। আমি বলি ও দুটোকে আলাদা করা যায় না, ওরা অভিন্ন। রসে এসে ভিতব আর বাহির আলাদা থাকে না। সব মিশে একাকার হয়। এক হয় না বলেই তো আপত্তি।

তিনি বললেন, 'কিন্তু এমন লোক কি দেখা যায় না যে দেখতে খারাপ অথচ ভিতবটা ভালো। সেই সততাই কি সব চেয়ে বড় নয়?'

আমি বললাম, 'ওটা উপমার কথা হোল। প্রাকৃতিক সৃষ্টির সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির তুলনা চলে না। সেটা অপ্রাকৃতিক। উপমাই যদি দেন তবে বলি যিনি দেখতেও ভালো তিনিই রসের পূর্ণাবতার। যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ কিম্বা গৌর অঙ্গের রবীন্দ্রনাথ! তাঁদের রূপও যা স্বরূপও তাই, ভাষাও যা ভাষ্যও তাই। এঁরা কুরূপ হ'তে সাহস পাননি।'

তিনি শেষে বললেন, হেসেই বললেন, 'কিন্তু পূর্ণকে তো সব সময় পাওয়া যায় না। ওপরটা ভালো ভিতরটা ফাঁকা, আর ওপরটা খারাপ ভিতরটা ভরাট—আপনি কোন অংশকে নেবেন, কল্যাণ বাবু?'

হার মেনে বললাম, 'শেষাংশটাই কল্যাণের।'

দু'জনের মিল হোল। ক্রমে আপনি থেকে আরো আপন হোল সম্বোধন। তুমিতে নামলাম। কেবল আমিই ওপরে উঠি না, সুদর্শনও মাঝে মাঝে নিচে নামে। দেখলাম ঘর একতলায় আর দোতলায় আলাদা হলে হবে কি, ঘরানা দুজনের একই।

অনুপ্রাসের খাতিরে সঙ্গীত জগতের এই পরিভাষাটা আমি নিতান্তই ব্যবহার করলাম। আসলে আমার নিজের কোন সুরজ্ঞান নেই, কিন্তু ওর আছে।

সুদর্শন বলল, 'আছে আর বলো না, বল ছিল।'

একদিন বললাম, 'চল দেখে আসি—মানে শুনে আসি তোমার কি ছিল আর কি নেই। গান তোমাকে শোনাতেই হবে।'

সুদর্শন হেসে বলল, 'চল।'

ইন্টালী অঞ্চলে পুরোন একতলা বাড়ী। জলের বিশেষ সদ্ভাব নেই, বিদ্যুতের একান্ত অভাব আছে। ঘরের সংখ্যা চার পাঁচখানা। কিন্তু বাসিন্দার সংখ্যা চৌদ্দ পনের জন। বাপ-মা, ভাই-বোন, পিসি-মাসীর একান্নবর্তী পরিবার। এই পরিবেশের মধ্যে সুদর্শনকে নতুন রকমের মনে হোল।

সুদর্শন তার ছোট দু'ভায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, সুব্রত আর শুভব্রত। একজন সেতারী আর একজন ছবি আঁকে।

ওরা চলে গেলে সুদর্শন ভাইদের উদ্দেশ্যে পরম স্নেহে বলল, 'তেমন যত্ন নিতে পারিনে। অর্থও নেই সামর্থ্যও নেই। তেমন সুযোগ সুবিধা পেলে ওরা আরো বড় হোত। যাক দু'জনেই ফাইন আর্টিস্ট হয়েছে এই যা সান্ত্বনা।'

একটু যেন করুণ সুরের আভাস পেলাম ওর গলায়, বললাম, 'দুজন কেন তিন জন বল। তুমিও তো—'

সুদর্শন মাথা নাড়ল, 'না কল্যাণ আমি এখন আর ফাইন আর্টিস্ট নই। আমি স্রষ্টা নই আর।

একেক সময় মনে হয় ভবানীবাবু আমার সর্বনাশ করেছেন। আমার মনে জ্ঞানের আর রসের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে রেখেছেন। আমাকে এক পথ নিতে দেননি। এক মত হতে দেননি। কিংবা তাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা। আমার নিজেরই দ্বিধা বিভক্ত প্রকৃতি আমাকে দু'দিকে টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু কোন দিকে টেনে রাখে না।'

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সুদর্শন সেদিন কিছুতেই গান শোনাল না, বলল, 'এখন আর হবে না। ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর গাই না। গানের গ্রামার নিয়ে গানের কাগজে আলোচনা করি।'

বললাম, 'যত্ন করে যদি শিখেই ছিলে ছাড়লে কেন ?'

সাদা চাদর পাতা অল্প দামী তক্তপোষের ওপর বসে হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় সুদর্শন সেদিন অনেক কথা বলল। চার পাঁচ বছর ধ'রে কত দুঃসাধ্য চেষ্টায় সাংসারিক কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে কত লড়াই ক'রে গভীর একনিষ্ঠায় ও সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনা উঠতেই নিজের অজ্ঞতায় ওর মাথা নিচু হয়ে গেল। বহুদিন ধরে পৃথিবীর ও কোন কিছুর খবর রাখেনি। শুধু বিজ্ঞান নয়; দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি সব বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু সব বাদ দিয়ে জীবন নয়, সব নিয়ে জীবন। এতদিন সুরের জালে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, আর শাস্ত্রকে হনন করেছে, শাস্ত্র দিয়ে সেই সঙ্গীতকে পীড়ন ক'রে সুদর্শন তার শোধ নিল।

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'কিন্তু দুই-ই তো এক সঙ্গে চলতে পারে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে না হোক, একটু আগে পরে। একজন প্রথমা, একজন দ্বিতীয়া।'

সুদর্শন বলল, 'আমি তা পারি না। আমার প্রথমা দ্বিতীয়া নেই। আমার প্রিয়তমা একতমা।'

চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি সুন্দরী তন্বী বধূ চায়ের কাপ হাতে এ ঘরে আসছিলেন। সুদর্শনের কথাটা কানে যেতেই আরক্ত হয়ে চৌকাঠের কাছে থেমে দাঁড়ালেন।

সুদর্শন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, 'এসো এসো। তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না। কথাটা তোমাকে বলিনি স্বস্তি।'

শান্ত মৃদু কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'তা জানি।'

একটু চমকে উঠলাম। জানি মানে ? মিনতির গল্প সুদর্শন তার স্ত্রীকেও বলেছে নাকি ?

সুদর্শন কিন্তু স্মিতমুখে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'জানো যদি তো লজ্জা পাচ্ছিলে কেন ? লজ্জাতেই যে ধরা পড়ে যাচ্ছ।'

স্বস্তি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আমাদের সামনে চা আর খাবার এগিয়ে দিল। সুদর্শনের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ এখনো স্বল্প। আমি তাঁকে কোন রকম সম্বোধন না করলেও ক্রিয়াপদ আর সর্বনামে সম্ভ্রম রক্ষা করি। কিন্তু এখানে চরিতকারের স্বাধীনতা নিয়ে শুধু নামই ব্যবহার করলাম, ক্রিয়াপদকেও হালকা করলাম একটু। শিষ্টাচার এতে ক্ষুণ্ণ হলেও ওরা নিজেরা মোটেই মনঃক্ষুণ্ণ হবে না আমি তা জানি।

আমি সুদর্শনের কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, 'নামটা নিজের দেওয়া নাকি ?'

সুদর্শন অমনিতে বন্ধু বৎসল; এক্ষেত্রে কিন্তু আমার গোপন বিশ্বাসের মর্যাদাটুকু রাখল না! আমার মৃদুস্বরকে উচ্চৈস্বরে ধ্বনিত করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কল্যাণ আমার কানে কানে কি বলল জানো ?'

স্বস্তি একটু বুঝি আন্দাজ করেছিল, কিন্তু সেটুকু স্বীকার না করে ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলল, 'না।' সুদর্শন বলল, 'ও জিজ্ঞাসা করেছিল তোমার নামটা আমার দেওয়া কিনা।' তারপর আমার দিকে ফিরে তাকাল সুদর্শন, 'কেন ওরা গরীব বলে বাপের বাড়ী থেকে নিজের নামটাও কি নিয়ে আসতে পারে না ? না কল্যাণ, অত কবিত্ব আমার নেই, ও নাম আমার দেওয়া নয়। আমি বড় জোর ওর নামের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা 'অ'যোগ করি।'

হেসে বললাম, 'অস্বস্তি ;—ওটা তো নিতান্তই মুখের।' সুদর্শন অসঙ্কোচে বলল, 'সব সময়েই যে মুখের তা কি করে বলি ?'

আমি ওঁর স্ত্রীর দিকে তাকালাম। স্বস্তি ভারি স্বল্পভাষিণী, কোন কথা না বলে আমাদের সামনে থেকে চায়ের কাপগুলি সে সরিয়ে নিতে লাগল।

সুদর্শন আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ওকে নাম দেব কি, নিজের নাম মান, খেয়াল-খুসি নিয়েই অস্থির। সেই চাপে সব ঢাকা পড়ে যায়। নামধাম দূরের কথা আর ঐকটু যে লেখাপড়া শেখাব, তা পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। মোটা ভাত, মোটা কাপড় ছাড়া আমরা স্ত্রীকে আর কি-ই বা দিতে পারি?'

'থাক হয়েছে।'

স্বস্তি একটু হাসল।

ওর পরণে চওড়া লালপেড়ে সাধারণ মিলের শাড়ি। হাতে শাঁখার সঙ্গে দু'গাছা ক'রে চুড়ি। কানে লাল পাথর বসানো পাতলা সোনার ফুল; ফর্সা কপালে নাতিবৃহৎ সিঁদুরের ফোঁটাটি বেশ মানিয়েছে। কিন্তু সব মিলে কেমন যেন একটা করুণ ভাব। চেহারাটা রোগা রোগা বলেই বোধ হয় এমন দেখাচ্ছে।

কাপ প্লেটগুলি গুছিয়ে নিয়ে স্বস্তি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল, 'যাই এবার রান্নাঘরে মেয়ে দুটো মাতলামি সুরু করেছে।'

একটু চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল ঠিকই, আমি ঘাড় নাড়লাম।

স্বস্তি বলল, 'আর একদিন আসবেন কিন্তু।'

ও ঘরের বাইরে চলে গেলে সুদর্শন ফের বলল, 'সত্যি প্রায়ই আমি ভাবি। এত দেওয়ার ছিল, অথচ কি-ই বা দিতে পারলাম।'

স্বস্তি আর একবার ফিরে তাকিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। ওর মুখে তেমন কোন ক্ষোভের চিহ্ন দেখলাম না। মনে হোল নিজের না দিতে পারার দুঃখের মধ্যে সুদর্শন স্ত্রীকে অনেকখানি দিয়ে রেখেছে।

এর পরে আরো দু'চার দিন এসেছি। কিন্তু তারও পরে আর একদিন যখন এলাম তখন পারিবারিক আবহাওয়া আর তেমন শান্ত-স্নিগ্ধ নেই; অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। জ্ঞান আর রসের দ্বন্দ্ব নয়—ভিন্ন ধরণের সংগ্রামের ছাপ লেগেছে।

ওদের মুখ দেখে বুঝলাম, খানিকক্ষণ আগে ঝড় বয়ে গেছে দাম্পত্য কলহের। সে কলহে মাধুর্য নেই।

স্বস্তি আমাকে দেখে সাক্ষী মেনে বলল, 'আচ্ছা, আপনিই বলুন তো কল্যাণবাবু, ওই অফিসে থেকে উনি আর কি করবেন? চার-পাঁচ মাস ধরে মাইনে নিয়ে ওরা গোলমাল করছে, অফিস উঠে যাবে তবু তিনি অন্য জায়গায় যাবেন না। এই তো আপনারাও তো সময় থাকতে চলে গেছেন।'

স্বস্তির কথায় কোন খোঁচা ছিল না। তবু মনের মধ্যে একটু খোঁচা লাগল। কথাটা ঠিক, আরো কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আমি সময় থাকতেই সরে গেছি বটে। চলে গেছি অন্য একটা নতুন কাগজে। না গিয়ে কি করব? বহু দিন ধরেই মাইনের গোলমাল চলছিল। 'অগ্রদূত' যে চলবে তেমন আর ভরসা ছিল না। অন্য জায়গায় সুযোগ পেয়ে আমরা সরে এলাম। সুদর্শন সে সুযোগটি পেতে পেতে পেল না।

কিন্তু আর একটা সাপ্তাহিক কাগজে সুদর্শন এ সময় চান্‌স্ পেয়েও ছেড়ে দিল।

আমরা বন্ধুর দল অবাক হয়ে বললাম, 'এ কি করলে? 'সপ্তর্ষি' তো শুনেছি বেশ বড়লোকের কাগজ, ওখানে গেলেই পারতে!'

সুদর্শন বলল, 'পারতাম না, ওদের মতের সঙ্গে বনিবনাও হোত না। নীতির সঙ্গে মিলত না আমার।'

বললাম. 'অগ্রদূতে'র নীতির সঙ্গেই কি তোমার মিলছে?' সুদর্শন বলল, 'না, তাও মিলছে না। তবু দেখি টাকাগুলি আদায় হয় কি না। অনেকগুলি টাকা বাকি পড়ে আছে। গেলে তো আর এক পয়সাও পাব না। মামলা মোকদ্দমা করে শ্রীপতি দত্তের কাছ থেকে কেউ টাকা আদায় করতে পারেনি তাতো জানো।'

শ্রীপতি দত্ত 'অগ্রদূতে'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

এই যুক্তিতে স্বস্তি একটু নরম হোল। কিন্তু হাতের 'সপ্তর্ষি'র চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ায় স্বস্তি

স্বামীকে ভিতরে ভিতরে ক্ষমা করতে পারল না। ও চাকরি নিয়েও তো টাকার তাগিদ করা যেত। এদিকে সংসারের অবস্থা খারাপ। অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে বাড়ীতে। স্বস্তির নিজেরও স্বাস্থ্য ভালো নয়। একান্নবর্তী পরিবারে বড় ভাইয়ের অনেক দায়িত্ব। সে দায়িত্বে ত্রুটি হচ্ছে সুদর্শনের। একান্নবর্তী পরিবারে বড় বউয়ের অনেক মর্যাদা, সে মর্যাদায় হানি ঘটছে স্বস্তির।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

স্বস্তি বলল, 'জানেন, শ্রীপতি দত্ত ওকে সব টাকা দিয়ে দিতে চাইছিলেন। বলেছিলেন, টাকা নিয়ে আপনি চলে যান। তবু উনি সে টাকা নিলেন না। এমন মানুষ!'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বল কি হে। টাকা পেয়েও তুমি নিলে না কেন?'

সুদর্শন আমার দিকে চেয়ে বলল, 'যে সর্তে টাকা পেতে যাচ্ছিলাম সে সর্তে টাকা আমি নিতে পারি না কল্যাণ।'

সর্তটা কি?'

স্বস্তির কাছেই শুনে নিতে হোল ঘটনাটি।

'অগ্রদূত' অফিসে মাইনে নিয়ে মাসের পর মাস গোলমাল চলতে থাকায় কর্মচারীদের একটা সঙ্ঘ গড়ে উঠল। কম্পোজিটার আর সবাই মিলল সেই দলে। সুদর্শনের কাছে এল দলপতি হওয়ার আহ্বান। সঙ্ঘটা এর আগেও ছিল। সুদর্শন তাতে নামে মাত্র থাকলেও এ সব ব্যাপারের সঙ্গে তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু অফিসে যখন ভাঙন ধরল, আগেকার দলপতিরা যখন দল বেঁধে নানা জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে গেল, তখন জনকয়েক কম্পোজিটাব এসে ধরে বসল সুদর্শনবাবুকে।

'আপনি একটা বিহিত করুন, শ্রীপতি দত্তকে বলেটলে টাকাগুলি আদায় করে দিন। অন্তত আধা-আধি টাকা পেলেই আমরা চলে যাই।'

সুদর্শন অসহায়ভাবে বলল, 'কিন্তু আমি কি করব? আমি তো এ সবের মধ্যে—'

এ সবের মধ্যে নিরীহ ভালো মানুষ সুদর্শনবাবুকে কম্পোজিটারেরাও এর আগে টানতে চায়নি। কিন্তু এখন আর না টানলে চলে না। ভাঙ্গা হাটে লোক আর বড় বেশি নেই। যারা আছে, তারাও এই নিষ্ফল সর্দারি নিতে চাইছে না। সবাই চাকরি খুঁজছে, সুযোগ পেলেই চলে যাবে।

সুদর্শন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা।'

তার নিজেরও অনেক টাকা পড়ে রয়েছে। এভাবে কিছুটা যদি আদায় হয় মন্দ কি।

কোন কোন বিষয়ে শ্রীপতি দত্তকে শ্রদ্ধা করে সুদর্শন। বেশ শক্ত জবরদস্ত লোক, ক্ষমতা আছে অফিস চালাবার। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু কেবল নিজের জেদের জোরে একটা দৈনিক কাগজ চালাবার সাহস করেছে সে। ঘুরে ঘুরে টাকা যোগাড় করেছে, ধরে ধরে বড়লোক বন্ধুদের বানিয়েছে অংশীদার। তারপর কাগজ খুলেছে। একাদিক্রমে চালিয়েছে তিন-চার বছর। অনেক লোকের অন্নসংস্থান হয়েছে, জনকতক বেকার সাংবাদিকের জুটেছে চাকরি। মনে মনে প্রশংসা করেছে সে শ্রীপতি দত্তের। সুদর্শন এমন পারত না, এমন শক্তি তার নেই।

কিন্তু শক্তি থাকলেই কেন লোকে অপব্যবহার করে, অর্থ দেখলেই কেন লোভ হয় মানুষের? সুদর্শন ভিতরে ভিতরে টের পেয়েছে'অগ্রদূতে'র এই অবনতি আর পশ্চাদ্গতির মূলে অন্য সব অংশীদারদের অংশ কিছু-কিছু থাকলেও সব চেয়ে বেশি দায়িত্ব রয়েছ শ্রীপতি দত্তের।

সুদর্শন আমাকে বলল, 'সেদিন আর রাগ সামলাতে পারিনি। মুখের উপরই শুনিয়ে দিলাম কাটা-কাটা কথা।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার মত মুখচোরা মানুষ কাটা-কথা শুনাতে পারল? লজ্জায় মাথা কাটা গেল না?' আমার পরিহাসে সুদর্শনের মুখে একটু যেন বেদনার ছাপ পড়ল, বলল, 'না। শান্ত মুখচোরা মানুষরা চুরির জন্য নিজেদের কম শাস্তি দেয় না কল্যাণ। মুখের সামনে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করায় যে অন্যায় হয়, সেই অন্যায়ের জন্য তারা পাওনার চেয়ে নিজেদের বেশি শাস্তিই দেয়। আড়ালে এসে নিজেদের মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে। মাথাটা ছিঁড়ে ফেলতে পারলেই যেন ভালো হয়। কিন্তু সেদিন পারলাম। কি ক'রে পারলাম এখন নিজেরই বিশ্বাস হ'তে চায় না। কলমের মুখ থেকে

যেমন অনেক সময় আপনিই লেখা বেরোয়, আমার মুখ থেকেও সেদিন পৃথিবীর সমস্ত কটু কথা আপনিই বেরিয়ে এল।'

কি কি কথা বেরিয়েছিল তা আর আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করল না সুদর্শন। আমি ওকে করতে বললামও না। ও না বললেও নিজেদের অফিসে বসে আমি একটু একটু শুনেছিলাম। একরোখা, বলিষ্ঠ চেহারার শ্রীপতি দত্ত কেবল মুখের কথার মানুষ নয়, সুদর্শনের কথা শুনে সে আস্তিন গুটিয়ে এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল দরজার সামনে আরো বিশ-পঁচিশটি কম্পোজিটার আস্তিন গুটাচ্ছে।

শ্রীপতি তখন বলল, 'যান, কাজ করুন গিয়ে।' পরদিন মাথা ঠাণ্ডা করে শ্রীপতি সুদর্শনকে নিজেব চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছিল,'আপনার টেম্পারামেণ্টে সুট্ করছে না বলেই তো আপনি এখান থেকে চলে যেতে চাইছেন সুদর্শনবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

'শ্রীপতি বলল, 'তাই যান। এ আপনার যোগ্য স্থান নয়। দেখছেন তো কোম্পানীর অবস্থা, কাগজের অবস্থা, তবু আমি আপনার বাকি মাইনের সব না পারি বারো আনি শোধ করে দিচ্ছি। যা বাকি রইল, তাও আপনি মাসখানেকের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমি নিজেই লোক দিয়ে আপনাব বাসায় পাঠিয়ে দেব। আপনাকে কষ্ট ক'রে আর আসতে হবে না।'

সুদর্শন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আর কম্পোজিটাররা? অন্য সব সাব-এডিটবরা! তাদেরও তো ওই একই কথা। তারাও তো বেশির ভাগ মাইনে পেলেই চলে যায়।'

শ্রীপতি একটু হাসল, 'আপনি বড় অবুঝের মত কথা বলছেন সুদর্শনবাবু, সবাই চলে গেলে আমার কাগজ চলবে কি করে? যেমন ক'রেই হোক সামনের ইলেকশন পর্যন্ত কাগজ আমাকে রাখতেই হবে। তারপব ফের নিশ্চয়ই সুদিনের নাগাল পাব। আপনাকেও তখন ডেকে আনতে পারব। কিন্তু এখন এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থেকে আর দরকার নেই আপনার। বাড়ী বসে বসে ফীচার লিখুন সেই ভালো।'

সুদর্শন বলে এসেছিল, 'অসম্ভব, আমি তা পারব না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল,'অথচ মজা এই কল্যাণ, এর আগে কত সামান্য কারণে যে চাকরি ছেড়েছি তার আর ঠিক নেই। ওপরওয়ালার সঙ্গে সামান্য কথান্তব হোল—ছেড়ে দিলাম চাকরি, বার কয়েক বলবাব পরেও দু'খানা দরকারী ডিকসনারী কেনা হোল না, কি চাবী হোল না আমার দেরাজের— অপমান বোধ করে ছেড়ে দিলাম চাকরি। কিন্তু আজ শ্রীপতি দত্ত ছাড়াতে চাইলেও, চূড়ান্ত অপমান করলেও আমি আর ছেড়ে আসতে পাবি না, আমার মন ওখানে থাকতে না চাইলেও আমাকে থাকতে হবে। নিজের প্রাপ্য টাকাকে ঘুষেব টাকাব মত ক'রে আমি নিতে পারি না। পারি স্বস্তি?'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুদর্শন আমার সামনেই পবম স্নেহসিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'পারি নিতে? তুমিই বল' পারি?'

স্বস্তি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পাবল না। মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে বইল। কখন আঁচল পড়ে গেছে মাথার, এলো খোঁপা পিঠেব ওপব ভেঙে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই।

একটু বাদে স্বস্তি মুখ তুলে বলল, 'না, তাও তুমি পার না। কিন্তু ও টাকা ছেড়ে দিয়ে আসতে তো পার? যতদিন ও টাকার আশায় আশায় থাকবে, ততদিন অন্য একটা ভালো জায়গায় চাকরি খুঁজে নিতে পারবে।'

সুদর্শন পরম দুঃখে হাসল, 'না তাও আর পারি না। তাছাড়া ভালো জায়গা আর কই স্বস্তি? এখানে সব জায়গাই এক জায়গা।'

স্বস্তি আর কোন কথা না বলে ভিতরের দিকে চলে গেল।

আমরা বেরুলাম বাইরে।

সুদর্শন বলল, 'আজ আর তোমাকে চা দিতে পারলাম না কল্যাণ। চল আজ তুমিই চা খাওয়াবে। চা-টা বোধ হয় চেয়ে খাওয়া যায়।'

বলেই সুদর্শন একটু হাসল, 'তোমার শব্দালঙ্কার আমাকেও পেয়ে বসল বোধ হয়। কিন্তু অলঙ্কারের লোভ মাত্রেই খারাপ। যেমন মেয়েদের পক্ষে, তেমনি লেখকদের পক্ষে। ওতে কেবল নিজেরই চরিত্র নষ্ট হয় না, লেখকের সব চরিত্রের চরিত্রদোষ ঘটে। যেমন তুমি আমার ঘটাচ্ছ।' বললাম, 'তা আমি জানি সুদর্শন, খুব ভালো করেই জানি, তবু নিজের কলমের মুখ বন্ধ করতে পারি না। ও যেন কি ক'রে উড়ে গিয়ে প্রত্যেকের মুখে মুখে জুড়ে বসে থাকে।'

সুদর্শন হাসল, 'উড়তে দিয়ো না। ওর ডানা কেটে দাও। ও মাটি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াক। আমার অধ্যাপক একদিন বলেছিলেন, হয়ে হয়ে লিখতে হয়। তোমাকে দেখে মনে হয় তা বরং সহজ। কিন্তু ঢের কঠিন সেই সঙ্গে না হয়ে হয়ে লেখা। একই সঙ্গে হ'তেও হবে, আবার না হ'তেও হবে। সে বড় শক্ত কাজ ভাই।'

দুজনে এসে মোড়ের চায়ের দোকানটায় বসলাম। একটা ক'রে টোস্ট আর চপ নিতে যাচ্ছিলাম, সুদর্শন বাধা দিয়ে বলল, 'শুধু চা নাও।'

'আর কিছু দরকার নেই?'

সুদর্শন মাথা নাড়ল, 'না, আর কিছুর দরকার নেই।' আমি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, 'আমি জানি দরকার থাকলেও তুমি কিছু নেবে না। কিন্তু এও তোমার এক ধরণের অহংকার সুদর্শন। সংসারে নিতেও হয়, দিতেও হয়। তুমি কেবল হাত উপুড় করবে—হাত চিৎ করবে না, এই বা কি কথা।'

সুদর্শন একটা হাসল, 'তেমন দরকার হলে নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু তোমার এই বাজে দোকানের পচা চপ খেয়ে শরীর খারাপ করব না। আর একটা কথা কি জানো কল্যাণ, চার্বাকের মতে ঋণ করে ঘি খাওয়া বরং ভালো, কিন্তু শাকান্ন খাওয়া ভালো নয়। সে ঋণ জীবনে আর শোধ হয় না।'

একটু বাদে চা খেতে খেতে বললাম, 'আমার মনে হয় কি সুদর্শন, তোমার বিয়ে না করাই ভালো ছিল। বেশ তো ছিলে, কেন আবার মিছিমিছি একটা বিয়ে করতে গেলে?'

সুদর্শন বলল, 'করব না বলেই তো ঠিক ছিল। কিন্তু জ্যোতিষ চর্চা করতে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটে গেল। আমার হাত দেখার 'হবির' কথা জানো তো?'

বললাম, 'জানি: তুমি অমনিতে মিথ্যা কথা বল না। কিন্তু তোমার ওই 'হবি' তোমাকে মিথ্যা কথা বলায়। যা বল, তার কিছু ফলে না।'

সুদর্শন হাসতে লাগল। একটু বাদে বলল, 'সবই যে একেবারে বিফল হয়, তা নয়। আমি ইচ্ছা করে অশাস্ত্রীয় কিছু বলি না। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি কল্যাণ, যত অবিশ্বাসীই এসে হাত বাড়াক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাত ভালো বললে তার মন ভালো হয়, সে দিনটা অন্তত ভালো কাটে।'

'কিন্তু সেই জন্য তুমি মিথ্যা আশা দেবে লোককে?'

সুদর্শন বলল, 'তা দিতে যাব কেন? তা আমি দিই না। একবার দিতে গিয়ে তার ফল হাতে হাতে পেয়েছি।'

'ব্যাপারটা কি?'

কুমিল্লা থেকে এসে অধ্যাপকের সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিল সুদর্শন। একটি-দুটি বছর নয়, পুরো দশ বছর। রসের পথ নয়, রূপের পথ নয়, শুধু জ্ঞানের পথ। বাপের ধমক শোনেনি, মার অনুরোধও নয়: অনেক পিতৃবন্ধুকে আর মার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের ক্ষুণ্ণ করেছে। তাতে বাবা নিজেও কম ক্ষুণ্ণ হননি, বলেছেন, 'পরের বউকে নিয়ে কবিতা লিখতেই আমি তোকে না করেছিলাম। ঘরে তো বউ আনতে নিষেধ করিনি। তুই কি এমন করে তার শোধ তুলবি।'

সুদর্শন সবিনয়ে বলেছিল, 'সে জন্যে নয়। নিজে আগে স্থির হয়ে নিই, তারপর ও সব কথা ভাবব।'

তবু মন যে মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে না উঠত তা নয়। একেক সময় মনে হোত পথটা শুকনো মরুভূমির ভিতর দিয়ে গেছে। তপ্ত বালুতে পুড়ে যাচ্ছে পা। সে জ্বালা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। তবু

মনটা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠেছিল সুদর্শনের। জ্বালা জুড়াবার জন্য সে পৃথিবীর কবিদের কাছে গেছে। ঘটকের দ্বারস্থ হয়নি।

তবু অঘটন ঘটল।

সেবার প্রাক্তন এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে সুদর্শন দেশে যাচ্ছিল। কুমিল্লার গোটা দুই স্টেশন আগে প্রিয়তোষ সেন কেবল নিজেই নামল না, জোর করে বন্ধুকেও নামিয়ে নিল। স্টেশনেরই লাগা সুপারি নারকেলের সার ঘেরা ছোট গ্রাম, আর সেই গ্রামেরই দক্ষিণ প্রান্তে মাঠঘেঁষা বাড়ী।

প্রিয়তোষ বলল, 'আমার মামাবাড়ী। আজ রাত্রে এখানে ঘুমিয়ে কাল সকালের গাড়ীতে এক সঙ্গে কুমিল্লায় চলে যাব।'

খুব যে অনিচ্ছুক হোল, অখুসি হোল সুদর্শন, তা নয়। একটানা শহরে থেকে থেকে মনটা গ্রামের জন্য ওর উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভাবল, একটা রাত্রের তো ব্যাপাব, ক্ষতি কি।

ঢেউ খেলানো করোগেটেড টিনের ঘর। চালের উপর বড় একটা জামরুল গাছ নুয়ে পড়েছে। জং ধরেছে একখানা টিনে। প্রিয়তোষের মামা সেই টিনখানাও বদলাননি ; জামরুল গাছের মোটা ডালটা কেটে ফেলতেও বোধ হয় তাঁর মায়া হয়েছে। ভোর বেলায় একটু ঘুরে বেড়িয়ে এসে বারান্দায় পাতা তক্তপোষ খানাব ওপর বসল সুদর্শন। সবে রোদ উঠেছে, সামনের সুপারি গাছটার পাকা পাকা সুপারিগুলির ওপর লালচে রোদ এসে লেগেছে।

প্রিয়তোষের সবচেয়ে ছোট মামাত বোনটি নতুন বেতের সাজিতে ক'রে নাবিকেল কোরা আর চিনিতে মিশিয়ে এক বাশ গরম মুড়ি এনে সামনে দাঁড়াল।

সুদর্শন বলল, 'এত কে খাবে.'

প্রিয়তোষ বলল, 'আমি আছি কি জন্য। আমারও ভাগ আছে ওতে।'

থাবায় থাবায় মুড়ি চালাতে লাগল প্রিয়তোষ। সুদর্শনেরও খারাপ লাগল না।

তারপর প্রিয়তোষ ওর মামাত ভাইবোনদের ডেকে ডেকে বলল, 'এই সুধা, শান্তি, অন্তু, পন্তু তোমাদের হাত দেখা হবে। জানো মামীমা, আমাদের সুদর্শন চমৎকার হাত দেখতে জানে।'

মামীমা বললেন, 'তাই না কি ?'

প্রিয়তোষেব মামা বাজারে যাচ্ছিলেন, তাব মামীমা ব'লে দিলেন, 'ভালো মাছ এনো।'

প্রিয়তোষ বলল, 'এসো মামীমা, তোমাব হাতই আগে দেখাই।'

সুদর্শন বলল. 'কি ছেলেমানুষী করছ।'

মামীমা বললেন, 'আমার হাতেব আর কী দেখাবে প্রিয়তোষ, আমার ভাগ্যতো প্রায় দেখাই হয়ে গেছে।'

প্রিয়তোষের মামা স্থানীয় মুনসেফ কোর্টে ওকালতি করেন। কিন্তু মক্কেলরা বড় একটা কেউ খোঁজ করে না। মামীব মনে সেই আফশোষ।

'বরং ছেলে মেয়েদেব হাত দেখাও প্রিয়তোষ, ওদেব কি রকম বিদ্যা বুদ্ধি হবে শোন।'

প্রাচ্য আব পাশ্চাত্য জ্যোতিষ দুই ই একটু একটু নেড়ে চেড়ে দেখেছিল সুদর্শন। সেই বিদ্যায় ছোট ছোট হাতগুলির রেখা বিচার কবতে লাগল। মোটামুটি সবাইরই বেশ ভালো হাত, সবাই বিদ্বান হবে, বুদ্ধিমান হবে, ভালো ঘর বর হবে শুধা শান্তির।

কিন্তু তাবপবই আব একখানা হাতকে সামনে নিয়ে এল প্রিয়তোষ, 'এবার ওর হাতখানাও একটু দেখে দাও।'

এক গাছা চুড়ি পরা গৌরবর্ণ সুগঠিত, সুন্দর হাত। এ হাত দেখে আর একখানা হাতের কথা মনে পড়ল সুদর্শনেব। সে হাত সে দূর থেকে দেখেছিল। ধরেনি, শুধু ধরবার গল্প লিখেছিল, তাতেই ধরা পড়ে গেল, কিন্তু ধরতে পারল কি ?

চমকে উঠে ওব মুখের দিকে তাকাল সুদর্শন। আরক্ত মুখখানা তখন ফিরিয়ে নিয়েছে মেয়েটি।

'আঃ ছেড়ে দাও প্রিয়দা, কি হচ্ছে। আমার হাত দেখাবার দরকার নেই।'

মৃদু লজ্জিত কণ্ঠ শোনা গেল ওর।

কিন্তু প্রিয়তোষ নাছোড়বান্দা। স্বস্তির ভাগ্য সে সুদর্শনের কাছ থেকে জেনে নেবেই। সুদর্শনের

দরকার না থাকতে পারে, স্বস্তির দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু দরকার আছে প্রিয়তোষের আর তার মামা মামীর।

ওর ছোট ভাইবোনদের হাত যেমন নিজের হাতে নিয়ে দেখেছিল সুদর্শন, স্বস্তির হাত ঠিক তেমন ক'রে নিল না। প্রিয়তোষ সেই হাতখানা ওর চোখের সামনে মেলে ধরল।

কিন্তু জ্যোতিষীর চোখ প্রসন্ন হল না সে হাতের ঘন রেখাজালের বিস্তারে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুচ্চারিত রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু পরক্ষণেই মন ঠিক ক'রে ফেলল সুদর্শন। ভবিষ্যৎ ওর যাই হোক বর্তমানে ওকে অখুসি করবে না, আঘাত দেবে না ওর মনে।

সুদর্শন প্রিয়তোষকে বলল, 'এ হাতও ভালো।'

প্রিয়তোষ বলল, 'ভালো তো বুঝলাম। কেমন হাতে গিয়ে পড়বে তাই বল।'

সুদর্শন বলতে লাগল, 'সে হবে সরল, সত্যবাদী, বিদ্যানুরাগী।'

জ্যোতিষী ছেড়ে দিয়ে মনের কল্পনা থেকে সেই ভবিষ্যৎ পুরুষ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা ব'লে গেল সুদর্শন, তারপর বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ীতে উঠে প্রিয়তোষ হেসে বলল, 'স্বস্তির ভবিষ্যৎ স্বামীকে আমার মামা মামী চিনতে পেরেছেন, স্বস্তিরও চিনতে বাকি থাকেনি।'

প্রিয়তোষ আবার হেসে বলল, 'ধরা পড়ে গেছ ভাই। আর জো নেই এড়াবার। এতক্ষণ যার আকৃতি বর্ণনা করলে, সে তো তুমি।'

সুদর্শন অনেক আপত্তি করল, প্রতিবাদ করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। সুদর্শনের বাবা মা পর্যন্ত যোগ দিলেন প্রিয়তোষের সঙ্গে। তারপর দৈবের ওপর না হোক, দৈবজ্ঞের ওপর জয়ী হল ওদের পুরুষকার। সে জয়ে সুদর্শনের যে একেবারেই সায় ছিল না সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে।

একটু কাল চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, 'কিন্তু জ্যোতিষী অমন সুন্দর একখানা হাত দেখে প্রথমে খুসি হয়নি কেন?'

সুদর্শন হেসে বলল, 'তা আমি তোমাকে বলব না। তোমার তো জ্যোতিষে বিশ্বাস নেই।'

আমিও হাসলাম, 'তোমারই যেন কত আছে। বলই না—শুনি।'

সুদর্শন বলল, 'স্বস্তির হাতে ছিল ওর স্বামী ভালো হবে না। হবে দুর্বল, হবে পরশ্রীকাতর, ভিতরে ভিতরে আরো কত যে অসদগুণ তার থাকবে তার ইয়ত্তা নেই।'

বললাম, 'ওঃ কি ফাঁড়াই না তাহ'লে গেছে। তুমি তাহলে একটি শান্ত সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়েকে সেই অসৎ লোকটার হাত থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করেছ বল।'

সুদর্শন আমার দিকে মুহূর্তকাল চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সম্পূর্ণই যে পেরেছি, তা তোমাকে কে বলল। সেই অসৎ লোকটা একেবারেই যে গেছে তা তো নয়। এখনো ওর ভাগ্যের সঙ্গে পুরুষকারের পাল্লা চলেছে কল্যাণ। এখনো তো বেশির ভাগ সময় সেই অসৎ লোকটাই বার বার ওপরে উঠে আসছে। আর না হয় ভিতর থেকে উঁকি মারছে।'

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আমরা লোয়ার সার্কুলার রোডে পড়লাম।

একটুকাল চুপচাপ হাঁটবার পরে আমি বললাম, 'এটা তোমার অতি বিনয় সুদর্শন। তোমার মত ভালো লোক আমি তো আর দেখিনি। তোমার সামনেই বললাম। এটা আমার তোষামোদও নয়, বন্ধু প্রীতিও নয়; ভালোকে ভালো বলতে পারার আনন্দ।'

সুদর্শন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তা আমি জানি কল্যাণ, তা আমি বিশ্বাস করি। সেই ভালো লাগার আনন্দে, ভালো বলার আনন্দেই তুমি অত ভালো বলতে পারছ, না হ'লে সত্যি সত্যিই অত ভালো আমি নই। আমি একান্তই সাধারণের মত, সাধারণের চেয়েও নিচে। আরও পাঁচজনের মত হিংসা, ঈর্ষা, রাগ, অনুরাগ কিছুই বেশি ছাড়া কম নেই। ভিতরের সেই মানুষটাকে আমি তো জানি। কিন্তু তাকেই একমাত্র বলে মানি না। আজ তুমি ভালো বলার আনন্দে ভালো বলছ। কিন্তু সকলেই তো আনন্দ থেকে বলে না, শ্লেষ ক'রে, ব্যঙ্গ ক'রে, পরিহাস করেও বলে। তখন আমারও রাগ হয়, দুঃখ হয়, ভালো হ'য়ে অনুশোচনা হয়।'

বললাম, 'সত্যি? তাও হয় তোমার?'

সুদর্শন বলল, 'কেন হবে না, নিশ্চয়ই হয় । আবার তোমরা যখন খুসি হও, আনন্দ পাও তখন আমারও ভালো লাগে । লজ্জা পেয়ে ভাবি কেন আরো ভালো হ'তে পাবলাম না । কেন যোগ্য হ'তে পারলাম না তোমাদের ভালো ধারণার । তোমরা যা আমি তো তাছাড়া আর কিছু নই ।'

হাঁটতে হাঁটতে আমার অফিসের সামনে এসে পড়লাম । ভিতরে ঢুকবার আগে থেমে দাঁড়ালাম একটু ।

সুদর্শন বলতে লাগল, 'আসলে আমাদের ভালো বলার আনন্দ, ভালো লাগার আনন্দ, ভালো হওয়ার আনন্দটাই সত্যি । সেই আনন্দেই আমরা একজন আর একজনকে ভালো দেখি, ভালো দেখতে চাই । সে চাওয়ার জোয়ার ভাঁটা আছে, হ্রাস বৃদ্ধি আছে । এক এক সময় অবশ্য মনে হয় সে চাওয়ার জোর আর নেই । সে ইচ্ছা একেবারে ফুরিয়ে গেছে । কিন্তু তা যায় না কল্যাণ, একেবারে যায় না । আর যায় না বলেই, এত আশা থাকে ।'

আশা থাকলেও 'অগ্রদূত' অফিস আর থাকল না । লিকুইডেশনে গেল । মাঝখান থেকে টাকাগুলি মারা গেল সুদর্শনের । এক পয়সাও আদায় হোল না ।

কাগজে কাগজে ফিচার আর প্রবন্ধ লেখে সুদর্শন ; বলে, 'বেশ আছি ।'

কিন্তু কি রকম বেশ আছে তা শুধু ওর আধ ময়লা ধুতী পাঞ্জাবীতেই ধরা পড়ে তাই নয়, ওর শীর্ণ, শ্রান্ত, উদ্বিগ্ন মুখেও মাঝে মাঝে অস্তিত্বের রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

পুজোর মবশুমে দুজনে প্রাণপণে পাল্লা দিয়ে লিখছি । ও প্রবন্ধ, আমি গল্প ! ঠিক প্রাণের আনন্দে নয়, প্রাণের দায়ে । কেবল প্রাণ রক্ষার জন্যও নয়, দু' একজন বন্ধুব মন রক্ষাব জন্যও ।

দেখাও হ'ল 'বন্দনা' মাসিক কাগজের অফিসে । সম্পাদক গোষ্ঠীদের কেউ আব নেই । সুদর্শন তার লেখা দিয়েছে, আমি তখনও দিতে পারি নি । তাই নিয়ে একটু চিন্তাগ্রস্ত । বললাম, 'এবার কি নিয়ে লিখলে । 'বন্দনা'র ভাদ্র সংখ্যায়ও সংস্কৃতির উপর তোমাব প্রবন্ধটি বেশ হয়েছিল ।'

সুদর্শন বলল, 'তাই নাকি ।'

কিন্তু প্রসঙ্গটা সঙ্গে সঙ্গে পালটে নিয়ে বলল, 'তোমার নতুন গল্প লেখা হোল ?' বললাম, 'না ।'

'কেন, তোমার তো অনেক প্লট আছে মাথায় ।'

বললাম, 'তা আছে । কিন্তু সব জট পাকানো । মাথার ওপরের জটা নয়, ভিতরেব জট ।'

সুদর্শন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আজ একটা গল্প দেখলাম । কিন্তু তোমার কোন কাজে লাগবে না, বড় পুরোন গল্প ।'

'বলই না শুনি । গল্প মাত্রেই পুরোন কথা । শুধু মুখ আর কান নতুন নতুন হয় ।'

সুদর্শন একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'মিনতির সঙ্গে আজ দেখা হোল ।'

'সে কি, কোথায় কি বৃত্তান্ত শিগ্‌গির বল ।'

'অমন উল্লসিত হবার কিছু নেই ।'

'বেশতো ম্রিয়মান হয়েই শুনছি । তবু বল তুমি ।'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কিছুদিন আগে মিনতিরা চলে এসেছে কলকাতায় । বাসা পেয়েছে টালিগঞ্জে। সুদর্শনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, হঠাৎ দৈনিক কাগজের পুজো সংখ্যায় ওর নামের বিজ্ঞাপন দেখে ফের মনে পড়ল । স্বামীকে বলল, 'সুদর্শনদার একটু খোঁজ নিতে পার ?'

'তা পারা যাবে না কেন । লোকটি কে ?'

'কুমিল্লারই লোক । বাবার ছাত্র ছিল ।'

সুদর্শনের সেই গল্পের কথা শীতাংশু হালদারের কানে যায়নি । সরোজিনী সেদিক থেকে খুবই সতর্ক ছিলেন । মেয়েকেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভালো ক'রে ।

স্ত্রীর কৌতূহলকে নিতান্তই স্ত্রীসুলভ কৌতূহল ছাড়া শীতাংশু অন্য কিছু ভাবতে পারল না । কিন্তু এসব ছোটখাট কৌতূহলকে মাঝে মাঝে না মেটালে এমন সব কৌতূহল এসে জোটে যা মিটাবার আর সাধ্য থাকে না । দৈনিক কাগজের অফিসে ফোন করে ঠিকানাটা জোগাড় করল শীতাংশু । তারপর সুদর্শনকে পাকড়াও করল তার বাসায় গিয়ে । বেঁটে খাটো মোটাসোটা ভদ্রলোক । বয়সটি

সুদর্শনের মতই হবে। মাথায় টাকের আভাস পড়ায় একটু বেশি দেখায়। পোস্ট অফিসে ভালো চাকরি করে। পাকিস্তান থেকে গোড়াতেই স্থান বদল করেছিল। কিন্তু স্ত্রীপুত্র **গুরুতেই** আসেনি। মিনতি কখনো বাপের কাছে ছিল, কখনো শ্বশুরের কাছে। মাস তিনেক আগে টালিগঞ্জে বাসা পেয়ে শীতাংশু ওদের নিয়ে এসেছে।

মিনতির কথা শোনবার আগে তার বাবার কথাই জিজ্ঞাসা করল সুদর্শন।

শ্বশুর সম্বন্ধে শীতাংশুকে খুব উৎসাহী মনে হোল না। বলল, 'তাঁর কথা আর বলবেন না। এত ক'রে বললাম চলুন কলকাতায়। কিছুতেই এলেন না। ওখান থেকে এক পাও নড়বেন না তিনি। চলুন আমার সঙ্গে।'

সুদর্শনের অন্য কাজ ছিল। ঠিক সঙ্গে যেতে পারল না। কথা দিল পরে যাবে।

'এতে আপনার লেখা আছে নাকি ?'

'বন্দনা'র ভাদ্র সংখ্যাটা যাওয়ার সময় হাতে ক'রে নিয়ে গেল শীতাংশু।

দিন দুই পরে সকালে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একখানা বইয়ের সমালোচনা লিখতে লিখতে দেরি হয়ে গেল সুদর্শনের।

চারু এভেনিয়ুতে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন পৌনে দশটা বাজে।

দোতলা ফ্লাট বাড়ী। নির্দিষ্ট নম্বরের দরজায় কড়া নাড়তেই ছোট ছোট গুটি তিনেক ছেলে মেয়ে বেরিয়ে এল. তারপর আরো দুটি।

একটি ডেকে বলল, 'মা, দেখ এসে কে এসেছে।'

একটু বাদে ওদের মাও এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল।

সুদর্শনের চেহারার খুব বদল হয়নি। কিন্তু মিনতি বদলেছে অনেক। বেশ মোটা হয়ে পড়েছে। কিন্তু চিনতে কষ্ট হয় না, পীড়িতও হয় না চোখ। পুষ্টতা ওর দেহের দীর্ঘ গড়নের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে।

মিনতি বলল, 'এসো, তোমার তো নটার মধ্যে আসবার কথা ছিল। উনি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে এই খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেলেন।'

ঘরের ভিতরে গেল সদুর্শন। ঘরের মধ্যে দামী খাট তাতে পুরু গদী পাতা।

মিনতি বলল, 'এবার দেশ থেকে আনিয়েছি। ওঁর তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেশে যদি গিয়ে কেউ না-ই থাকি, এ সব সেখানে ফেলে রেখে লাভ কি বল তো।'

সুদর্শন বলল, 'তা তো ঠিকই।'

দু'তিনখানা ভালো চেয়ারও এসেছে দেশ থেকে। তারই একখানায় ওকে বসতে বলল মিনতি। ধুলো ছিল না। তবু হাতখানা চেয়ারের গদির ওপর একটু বুলিয়ে নিল। সুদর্শন বসল চেয়ারে।

সামনের দেওয়ালে বড় একখানা গ্রুপ ফটো। স্বামী আর ছেলে মেয়ের মাঝখানে স্মিতমুখী মিনতির প্রতিকৃতি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

চোখ নামিয়ে সুদর্শন দেখল কেবল মিনতির প্রতিকৃতি নয়, মিনতিও চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ ?'

'ভালো। তুমি ?'

'ভালো।'

এরপর মিনতি সুদর্শনের স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করল। সে কেমন হয়েছে। ছেলে মেয়ে কটি। কোনটি কার মত হয়েছে দেখতে। বাপের মত না মার মত। কেবল মেয়েই হচ্ছে কেন, ছেলে কেন হয়নি।

শেষ প্রশ্নটি ছাড়া আগেকার প্রশ্নগুলির জবাব দিল সুদর্শন। মিনতির কেবল মেয়ে নয় ছেলেও হয়েছে। পাঁচটির মধ্যে ছেলেই তিনটি। তাদের ডেকে নাম জিজ্ঞাসা করল, আদর করল একটু।

থালায় ক'রে খাবার নিয়ে এল মিনতি। পরোটা আর হালুয়া। কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'দেখ জুড়িয়ে গেছে বোধ হয়। কতক্ষণ আগে ক'রে রেখেছি।'

সুদর্শন বলল, 'তাতে কি। কিন্তু এত কে খাবে। কমিয়ে দাও।'

মিনতি বলল, 'এর চেয়ে আর কমাব কি। সামান্যই দিয়েছি খাও।'

ছেলে মেয়েদের হাতে কিছু কিছু তুলে দিতে গেলে মিনতি বাধা দিয়ে বলল, 'আহাহা আর ভদ্রতা করতে হবে না। ওরা এই একটু আগে খেয়েছে। যাও তোমরা ওই ঘরে যাও তো।'

অস্থির ছেলে মেয়ের দল পাশের ঘরে চলে গেলে মিনতি কেটলী থেকে রঙীন কাপে চা ঢেলে সুদর্শনের হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ইয়ে, যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

সুদর্শন বলল, 'কর।'

তবু একটু ইতস্তত করল মিনতি। ওর ফর্সা মুখ একটু যেন আরক্ত হোল। আর সেই রঙের আভাসে আর একদিনের কথা, আরো অনেকদিনের কথা মনে পড়ে গেল সুদর্শনের।

লজ্জিত ভঙ্গিতে মিনতি বলল, 'তোমার সেই গল্পটির কথা বলছিলাম। সে গল্পটা আর আমি পড়তেই পারলাম না। কিন্তু এখন তো পারি। এতদিন বাদে এতগুলি ছেলে মেয়ে হয়ে যাওয়ার পর এখন তো আর দোষ নেই পড়তে।'

চা খেতে খেতে একটু যেন বিষম খেল সুদর্শন, গলা ঠিক ক'রে নিয়ে বলল, 'দোষ নেই। কিন্তু সে গল্পও তো আর নেই মিনতি।'

মিনতি একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'নেই ?'

'না।'

মিনতি বলল, 'তার বদলে বুঝি ওই প্রবন্ধ ?'

সুদর্শন একটু হাসল, 'হ্যাঁ। 'বন্দনা' থেকে পড়লে না কি প্রবন্ধটা ?'

মিনতি বলল, 'প্রবন্ধ আমি কারোরই পড়ি না। প্রবন্ধও না, কবিতাও না। তোমার নাম দেখেই পড়তে গেলাম। অনেকখানি পড়লামও। কিন্তু—' মিনতি একটু হাসল, 'কি যে মাথামুণ্ডু—মানে যত সব শক্ত শক্ত কথা—কিছু বুঝতে পারলাম না।'

কাহিনী শেষ ক'রে সুদর্শন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে রইল।

বললাম,—একটু নির্বোধের মতই বললাম, 'দুঃখ পেলে ?'

সুদর্শন মাথা নেড়ে বলল, 'না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। সে দুঃখ নয়।'

'তবে ?'

সুদর্শন বলল, 'ভাবছি সবাইকে যদি না বুঝাতে পারলাম তবে লিখলাম কি।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলাম। সবাইকে না বুঝাতে পারার দুঃখ, সকলের না বুঝতে পারার দুঃখ এক সঙ্গে ওর মুখে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

কোন জবাব দিলাম না। কি জবাব দেব ?

ও দুঃখ তো সুদর্শনের একার নয়।

আশ্বিন ১৩৫৭

পুণর্ভবা

'বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রে'র কর্ম-পরিষদের মিটিং শেষ হ'ল ন'টায়। কেন্দ্রের পাঠভবন আছে, ত্রৈমাসিক মুখপত্র আছে, এবার একটি নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলোচনা চলছিল। স্থির হ'ল আগামী সপ্তাহে এ সম্বন্ধে সদস্যদের একটি সাধারণ সভা ডাকা হবে। অবশ্য কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্তই যে সবাই গ্রহণ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ পর্যন্ত তাই হয়ে-এসেছে। কর্ম-পরিষদের প্রায় সমস্ত প্রস্তাবই তাঁরা সমর্থন করেছেন আর পরিষদ পালন করেছে সুকৃতির ইচ্ছাকে। তার নিষ্ঠা আর কর্মনৈপুণ্য সভ্যদের উৎসাহ জুগিয়েছে। নিজেদের শৈথিল্যের জন্য লজ্জিত হয়েছেন তাঁরা। সুকৃতিই এই চক্রের প্রাণ-কেন্দ্র। নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি ওরই।

স্বরাজ প্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রৌঢ় যতীশ রায় বললেন, 'কিন্তু মা, এক সঙ্গে অনেকগুলি কাজের ভার নেওয়া কি ঠিক ? তার চেয়ে একটি কাজও যদি আমরা ভালো করে করতে পারি তাতে কেন্দ্রের ভিত্তি শক্ত হবে।'

কিন্তু সুকৃতি কিছু বলবার আগে কেন্দ্রের সম্পাদক শেখর সোম আপত্তি জানাল, 'একটি কাজেব সঙ্গে আর একটি কাজ যে জড়ানো যতীশবাবু। ভিত যদি বলতে হয়, বিদ্যালয়কেই বলা উচিত। সাধারণের মধ্যে যদি আক্ষরিকতা না বাড়ে, শিক্ষা না ছড়ায় তাহলে আমাদের পাঠ-ভবন টিকবে কি করে ? বই পড়বে কে ?'

সুকৃতি সোৎসাহে বলল, 'আমিও ঠিক একই কথাই বলতে চাইছিলাম।'

বলেই লজ্জিতভাবে চোখ নামাল সুকৃতি। তার মনে হল ঘরের আরো অনেকগুলি চোখ যেন বিশেষভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পাড়ার গঙ্গামণি গার্লস হাইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিসেস্ নন্দী মৃদু হাসলেন, 'সত্যি শেখরবাবু, অন্য একজনের মুখের কথা কেড়ে নেওয়ার অভ্যাস ক্রমেই যেন বাড়ছে আপনার।'

শেখর স্থির দৃষ্টিতে মিসেস্ নন্দীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'এখানে আমরা যারা রয়েছি, তাদের আদর্শ তো মোটামুটি এক। তাই একজনের সঙ্গে আর একজনের কথার মিল হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?'

মিসেস্ নন্দী ফের একটু হাসলেন, 'তা সত্যি। সংসারে কিছুতেই আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়।'

হাইকোর্টের প্রবীণ উকিল প্রিয়নাথ বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ ধরে উঠি উঠি করছিলেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন, 'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই মিসেস্ নন্দী, রাত বাড়ছে। বেশ তো, শেখর আর সুকৃতির যদি উৎসাহ থাকে, নাইট্ স্কুল চলবে। বলতে গেলে ওরাই তো সব চালাচ্ছে। দলের মধ্য সবচেয়ে অ্যাকটিভ্ তো ওরাই।'

মিসেস্ নন্দী কথাটার অনুবাদ করে বললেন, 'হ্যাঁ ওঁরাই সবচেয়ে সক্রিয়।'

সদস্যরা বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। যতীশবাবু বললেন, 'কই শেখর, তুমি যাবে না ?'

শেখর তখন আলমারীর পাল্লা খুলে কি একটা বই খুঁজছে, বলল, 'আপনারা এগোন, আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

মিসেস্ নন্দী যতীশবাবুর দিকে আর একবার অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন।

তারপর সুকৃতির দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা আমরা তাহলে চলি সুকৃতি। মৈত্র মশাইর শরীর কি খুবই খারাপ ? নিচে আজ একেবারেই নামলেন না।'

সুকৃতি বলল, 'হ্যাঁ ওঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। আপনার কি তাঁর সঙ্গে কোন কথা আছে অনিমাদি ?'

হেডমিস্ট্রেস্ বললেন, 'ভেবেছিলাম, আমাদের স্কুল সম্বন্ধে একটু— আচ্ছা, সে আব একদিন হবে। আজ আর ওঁকে ডিসটার্ব করব না।'

সকলের জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেলে শেখর বই খোঁজা বন্ধ রেখে সুকৃতির পাশে এসে দাঁড়াল। সুকৃতি জানলার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। একতলার এই বৈঠকখানা ঘর থেকেও ছোট একফালি আকাশ চোখে পড়ে। সেখানে কয়েকটি নক্ষত্র জ্বল জ্বল করছে।

শেখর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কি ভাবছ ?'

সুকৃতি বাইরের দিকে তাকিয়েই মৃদুস্বরে বলল, 'কি আবার ভাবব।'

শেখর বলল, 'না, আর ভাববার কিছু নেই। আমি হৃষীকেশবাবুকে সব বলেছি।'

সুকৃতি চমকে উঠে মুখ ফেরাল, 'বলেছ ? কেন বলতে গেলে ?'

শেখর বলল, 'একদিন তো বলতেই হত সুকৃতি। আঘাত তো দিতেই হতো ; কিন্তু আমি ভাবিনি এত আঘাত তিনি পাবেন। ভেবেছিলাম ওঁর র‍্যাশনাল, যুক্তিপন্থী মন বিষয়টিকে খুব সহজভাবে নিতে পারবে। কিন্তু তা হল না।'

সুকৃতি শেখরেব কথায় কান না দিয়ে অধীরভাবে বলে উঠল, 'ও, সেইজন্যই তিনি নিচে নামলেন

না,মিটিং-এ এলেন না, সেইজন্যই অমন ক'রে বিকেল থেকে শুয়ে রয়েছেন। কারো সঙ্গে কোন কথা বলছেন না। কেন, কেন তুমি বলতে গেলে, কেন্দ্রের কাজ নিয়ে আমি বেশতো ছিলাম, আমি তো বেশ থাকতে পারতাম—'

শেখর বলল, 'কিন্তু আমি পারতাম না সুকৃতি। কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে আমার আরো অনেক জিনিস চাই। তোমারও তা দরকার, আমি জানি। শুধু মুখ ফুটে তুমি বলতে পারছ না। লজ্জা সংকোচ আর সংস্কার তোমার পথ আটকে ধরছে। কিন্তু আমি কোন বাধা মানব না, তোমাকেও কোন বাধা মানতে দেব না।'

শেখর ওর হাত ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুকৃতি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'না আজ নয়, আজ তুমি যাও।'

বলে সুকৃতি নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দোতলার সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলে শেখর আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির চাকর হরিপদ সশব্দে সদর দরজা বন্ধ করতে করতে মুখ মুচকে একটু হাসল।

ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল সুকৃতি। পাশের ঘর থেকে হেমলতা বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমার শ্বশুর তোমায় ডাকছেন।'

সুকৃতি চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। করিডরে আলো নাই। বালব্‌টা ফিউজ হয়ে গেছে, আজও বদলানো হয়নি। অন্ধকারে শাশুড়ীর মুখ দেখতে পেল না সুকৃতি, কিন্তু তাঁর গলা বড় নীরস, বড় রুক্ষ লাগল কানে। হেমলতা কখনো ডাকেন মা, কখনো ডাকেন সুকু। কিন্তু আজ তাঁর মুখে কোন সম্বোধনই নেই। সম্ভাষণে শুধু শাসন আর তিরস্কার ফুটে বেরুচ্ছে। বুকের মধ্যে কিসের একটা খোঁচা লাগল সুকৃতির। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আমি নিজেই যেতাম মা, বাবা কি এখনো শুয়ে আছেন?'

হেমলতা রূঢ়স্বরে বললেন, 'থাক থাক, ওসব ডাক তুমি আর মুখে এন না সুকৃতি। আমি সইতে পারছিনে।'

বলে হঠাৎ সরে গেলেন হেমলতা। সুকৃতি লক্ষ্য করল তিনি শ্বশুরের ঘরে গেলেন না। ডান দিকে ঘুরে পশ্চিমের বারান্দায় রেলিং-এর ধারে দাঁড়ালেন। সুকৃতি নিঃশ্বাস চেপে ধীরে ধীরে শোয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খাটের ওপর বালিশে ভর ক'রে হাতের তেলোয় মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়েছিলেন হৃষীকেশ মৈত্র। সামনে রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' খানা খোলা। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, বইয়ে তাঁর মন নেই। মনঃসংযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় নিজের ওপরই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

সুকৃতি কাছে এসে দাঁড়িয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'এখন কেমন বোধ করছেন বাবা?'

হৃষীকেশ পুত্রবধূর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। সারাদিনের কাজ-কর্মের পর বেশ একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল সুকৃতিকে। তন্বী গৌরাঙ্গী এই সুন্দরী মেয়েটিকে তিনি নিজে দেখে ছেলের জন্য পছন্দ করে এনেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন, 'বাজার থেকে তুমি যা আন, তাই খারাপ বেরোয়। তরিতরকারি, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র যা কেন তাতেই ঠকো। কিন্তু সুকৃতির বেলায় এমন জিতলে কি করে! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি যখন মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে এসেছ, সে নিশ্চয়ই কালোকুচ্ছিৎ, কানা না হয় খোঁড়া। কিন্তু দিদিকে নিয়ে তোমার পছন্দ করা মেয়ে যখন যাচাই করতে গেলুম, অবাক হয়ে দেখলুম তার সব আছে, দুটি চোখ, একটি নাক, দু'খানা হাত দুটি পা—।'

হৃষীকেশ হেসে বলেছিলেন, 'তুমি আর তোমার দিদি বুঝি শুধু ওই-ই দেখে এসেছ?'

হেমলতা বলেছিলেন, 'না গো না। সব দেখে এসেছি। চুল খুলে হাঁটিয়ে, হাসিয়ে সবরকম ক'রে দেখেছি। তোমার ভরসায় বসে ছিলুম ভাব নাকি? কিন্তু যাই বল, এতদিনে তোমার বিদ্যাবুদ্ধির ওপর আমার বিশ্বাস এল। দিদি তো হিংসায় বাঁচে না। নন্তু, ঘন্টুর বউ এ মেয়ের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। অন্যের কথা বলে কি হবে, তোমাদের নিজেদের বংশেও এমন সুন্দরী বউ আর আসেনি। নিজেই না হয় কুচ্ছিৎ, কিন্তু শাশুড়ী খুড়শাশুড়ীর ফটোও তো দেখেছি।'

হৃষীকেশ হেসে বলেছিলেন,'থাক থাক,তোমার আর বিনয় করতে হবে না। কিন্তু একটা কথা। জিতেন মজুমদার আমার চেয়েও গরীব। মার্চেন্ট অফিসের সামান্য কেরাণী, শাখা সিঁদুর ছাড়া কিছুই দিতে থুতে পারবে না ; তা ছাড়া ওরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। সম্বন্ধ করলে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে পারব তো ? এ সব ব্যাপারে তোমার দাদা যা গোঁড়া !'

হেমলতা অবাক হয়ে থেকে বলেছিলেন, 'ওমা তাই নাকি। একথা আগে বলনি কেন ? এতদূর এগিয়ে—আহা মেয়েটির চেহারা আমার চোখে লেগে রয়েছে—ওরা তাহলে রাঢ়ী—'

হৃষীকেশ স্ত্রীকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, 'হলই বা রাঢ়ী তবু তো ব্রাহ্মণ। তোমার ছেলের যা মতিগতি তাতে শ্রেণী তো ভালো, একেবারে জাত ডিঙিয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে আমি বলি কি—'

হৃষীকেশ যা বলেছিলেন তাই হ'ল। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিমলও দেখে এল সুকৃতিকে। এতদিন তার ঘোর অমত ছিল বিয়েতে। এবার শোনা গেল মার অসুবিধার কথা ভেবে এ সম্বন্ধে সে বিবেচনা করতে রাজী হয়েছে।

সুকৃতি আবার ডাকল, 'কি ভাবছেন বাবা ? শরীর কি খুব খারাপ লাগছে ?'

হৃষীকেশ একটু চমকে উঠে বললেন, 'না মা শরীর বেশ ভালোই আছে আমার।'

'তবে ?'

কিন্তু এই ছোট্ট প্রশ্নটিও সুকৃতি উচ্চারণ করতে পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হৃষীকেশ ফের একবার তাকালেন ওর দিকে। অন্য দিনের মত আজও পরনে ফিতে পেড়ে সাদা খোলের সাধারণ মিলের শাড়ী, গায়ে সাদা ব্লাউজ। গায়ে সরু এক ছড়া হার, হাতে দু' গাছি কাঁকন। বিমলের মৃত্যুর পর এই সামান্য ভূষণ সুকৃতি প্রথমে রাখতে রাজী হয়নি। সাদা থান পরেছিল, অলঙ্কারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না গায়ে। সব যখন শূন্য হয়ে গেল, জীবনের সব সাধ আহ্লাদ যখন ঘুচল, তখন আর বাইরের সজ্জায়, বাইরের রঙে কি হবে। অন্তরের নিঃস্বতা অকিঞ্চিৎ বহির্বেশে ধরা পড়ুক। ছদ্মবেশে কাজ কি !

কিন্তু হৃষীকেশ আর হেমলতাই ওর সেই যোগিনী মূর্তি সহ্য করতে পারলেন না। শাশুড়ী বললেন, 'তোমার এই রুক্ষ চেহারার দিকে তাকালে আমার বাড়ি ছেড়ে পালাতে ইচ্ছা হয়।'

ওদের একান্ত অনুরোধেই বেশ বদলাতে বাধ্য হ'ল সুকৃতি। পুত্রের মৃত্যুর পর হৃষীকেশ ওর বধূত্ব ঘুচিয়ে ওকে ঠিক মেয়ের মত করে রাখলেন। শ্বশুরবাড়িতেও মাথার আঁচল খসে পড়ল সুকৃতির। সুচিক্কণ ঘন কালো চুলের রাশের ভিতর দিয়ে সাদা সিঁথি ফের দেখা দিল।

হৃষীকেশ বললেন, 'আজ থেকে আমার কাছে তুমি যা গায়ত্রীও তাই।'

গায়ত্রী হৃষীকেশের একমাত্র মেয়ে। ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে বাপের বাড়ি। লঘু চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। দাদার মৃত্যুর শোক অল্প দিনেই সে ভুলেছে ! হৈ-চৈ, হাসি ঠাট্টায় বৌদিকেও ভুলিয়ে দিতে চায়।

শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য বাপের বাড়িতে গিয়ে প্রথমদিকেও বেশি দিন থাকতে পারেনি সুকৃতি। দু'দিন যেতে না যেতেই হৃষীকেশ গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুকে বলেছেন, 'বেয়াই, তোমার অনেক ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু আমার বাড়ি শূন্য। সুকৃতি যদি আমার কাছে না থাকে আমি টিকব কি করে ?'

মাণিকতলা থেকে শ্যামবাজার,—এমন কিছু দূরের পথ নয়। তবু বাপের বাড়িতে খুব কম যাওয়া হয় সুকৃতির। বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের কাজ বাড়বার পর যাওয়ার আর সময়ই হয় না।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে সুকৃতি বলল, 'সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এবার আপনার খাবার দিই গিয়ে।'

হৃষীকেশ শক্ত হয়ে উঠে বসলেন, 'না খাবার একটু পরে দিয়ো। কয়েকটি কথা বলবার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। বসো।'

সুকৃতি খাটের একেবারে উত্তর প্রান্তে সরে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু হৃষীকেশ বললেন, 'না, আমার কাছে এসে বসো।'

সুকৃতি এগিয়ে এলে হৃষীকেশ তার পিঠের ওপর সস্নেহে আলগোছে ডান হাতখানা রাখলেন। সুকৃতির সর্বাঙ্গ যেন একবার কেঁপে উঠল।

হৃষীকেশ শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমি সব শুনেছি মা। শেখর আমাকে সব বলেছে।'

সুকৃতি একবার ভাবল প্রতিবাদ করে। কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বর বেরুল না।

হৃষীকেশ আবার বললেন, 'হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি! অবশ্য শেখরের কাছ থেকে শোনার আগে আরো অনেক কাণাঘুসা আমার কানে এসেছিল, কিছু কিছু আমি লক্ষ্যও করছিলাম। কিন্তু তোমাদের মুখ থেকে শোনার আগে আমি কিছু বলব না, এও মনে মনে স্থির ছিল আমার।'

সুকৃতি এবারও কোন কথা বলতে পারল না।

হৃষীকেশ একটু থেমে ফের বলতে লাগলেন, 'কিন্তু স্থির থাকতে পারলাম না। তোমার কাছে গোপন করব না মা, তা ছাড়া গোপন এতক্ষণে নেইও, শেখরের কথা শুনে আমার মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিল। দু' বছর আগে বিমলকে যেদিন ওরা ছোরা মেরেছিল, ঠিক সেই দিনের মত অবস্থা হয়েছিল আমার। মনে হল, আর একখানা ছোরা ফের যেন আমার বুকে এসে বিঁধছে।'

সুকৃতি অস্ফুট কাতর স্বরে বলল, 'ওর কথায় আপনি কান দেবেন না বাবা। ওকে আপনি সংস্কৃতি-থেকে সরে যেতে বলুন।'

হৃষীকেশ একটু ম্লান হাসলেন, 'প্রথমে প্রায় সেই রকমই বলেছিলাম। এই চুয়ান্ন বছর বয়স হল আমার। জীবনে এত ধৈর্যহীন হয়েছি বলে মনে পড়ে না। ছেলের মৃত্যুতেও এত বিচলিত হইনি। এখন সেকথা ভেবে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। সংস্কারকে জয় করা, নিজের অধিকারবোধ ত্যাগ করা তো সহজ নয় মা। অথচ শেখরের প্রস্তাবের চেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক আর কি ছিল?'

সুকৃতি ক্ষীণ প্রতিবাদ করল, 'স্বাভাবিক?'

হৃষীকেশ বললেন, 'নিশ্চয়ই, শেখর উচ্চশিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান ছেলে। এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রের পরিচালনায় তার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তুমিও শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা তোমার আছে। সব জেনে শুনে পরস্পরকে তোমরা ভালোবেসেছ, পরস্পরের গুণগ্রাহী হয়েছ। তোমাদের বিয়েতে—' কথাটা একটু যেন গলায় আটকালো হৃষীকেশের কিন্তু পরক্ষণেই পরিষ্কার স্বরে বললেন, 'বাধা দেবে কে? আমি বিমলের মাকে এতক্ষণ এই কথাই বুঝিয়ে বলছিলাম। অল্পশিক্ষিতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। সেকেলে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। তাই ওর সংস্কারে যদি বেধে থাকে, মমত্ববোধে যদি কিছু আঘাত লেগে থাকে, তার জন্য তুমি কিছু মনে কোরো না।'

সুকৃতি কি বলবে ভেবে পেল না। এর চেয়ে হৃষীকেশ যদি তাকে বাধা দিতেন, নিন্দা করতেন, তিরস্কার করতেন, সুকৃতি প্রতিবাদ করত, নানা যুক্তিতর্কে শ্বশুরের তিরস্কারের জবাব দিতে পারত। কিন্তু তা হ'ল না। হৃষীকেশ তাকে সম্মতিই দিলেন, কিন্তু সেই দানের মধ্যে নিজের আহত হৃদয়ের বেদনার্ত অনুভূতিকে সঞ্চারিত না করে পারলেন না। স্ত্রীর যে অন্ধ সংস্কার আর অযৌক্তিক মমত্ববোধের জন্য লজ্জা জানালেন হৃষীকেশ, সেই সংস্কার আর মমত্ববোধ থেকে তিনিও যে সম্পূর্ণ মুক্ত নন তাতো সুকৃতির কাছে গোপন রইল না।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হলে সুকৃতি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাদের দুজনকে যে বড় ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল বিমলের মৃত্যুর পর সে ঘর সুকৃতি ছেড়ে দিয়েছে। যে ঘরে দুজন ছিল সে ঘরে একজনের থাকা দুঃসহ। তার বদলে পুব-দক্ষিণ কোণের সবচেয়ে ছোট ঘরখানা নিজের জন্য বেছে নিয়েছে সুকৃতি। খাট, টেবিল, চেয়ার, আলনা সব সেই বড় ঘরেই রয়ে গেছে। নিজের জন্য সাধারণ সস্তা একখানা তক্তপোষ। মাদুরের ওপর সুকৃতি সাদা চাদর বিছিয়ে নিয়েছে। ও-ঘর থেকে আর কিছুই সে নিয়ে আসেনি, এনেছে বিমলের ছোট একখানা ফটো। বৃহদায়তনের ফটো বিমলের পছন্দ ছিল না। সুকৃতিও এ ফটোকে এনলার্জ করায়নি। তাদের দুজনের সেই ঘর এখন তালাবন্ধ পড়ে থাকে। ছেলেপুলে নিয়ে গায়ত্রী আর প্রভাস যখন আসে এ বাড়িতে, তখন তাদের জন্য ঘরখানা খুলে দেওয়া হয়।

দেয়ালে টাঙানো ফটোখানার নিচে গিয়ে দাঁড়াল সুকৃতি। এ ফটো সুকৃতির নিজের হাতে তোলা। একবার ফটো তোলার ভারি খেয়াল চেপেছিল বিমলের। ক্যামেরা কিনে যখন তখন যার তার ফটো তুলত। আচমকা অপ্রস্তুত অবস্থায় অনেক ফটো তার তুলেছিল বিমল। অদ্ভুত সব ছবি। কোনটিতে সুকৃতি কুল খাচ্ছে, কোনটিতে বা কাপড়ের হিসাব নিয়ে ধোপার সঙ্গে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তর্ক করছে। অলক্ষ্যে লুকিয়ে থেকে বিমল সেই সব ছবি তুলত তার। সুকৃতি বলত, 'তুমি কি আমার একটাও ভালো অবস্থার ছবি তুলতে পার না?'

বিমল হেসে জবাব দিত, 'কেন, এ অবস্থাগুলি খারাপ কিসের? একেই তো রূপের দেমাকের অন্ত নেই, তারপর যদি অমন সাজানো গোছানো ছবি তুলি তুমি একেবারে পটের পটীয়সী হয়ে থাকবে। মাটিতে পা নামাবে না। কিন্তু ভালো হোক মন্দ হোক আমি তবু অনেক ছবি তোমার তুললাম। তুমি আমার একটি তুলে দাও না। চেহারা খারাপ বলে আমার একখানা ফটোও বুঝি আর ঘরে থাকতে নেই?'

সুকৃতি বলেছিল, 'নেই-ই তো। আমাকে ফটো তোলা শিখিয়ে না দিলে তুলব কি করে?'

বিমল বলেছিল, 'এসো শিখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ভাইস-প্রিন্সিপাল হৃষীকেশ মৈত্রের শিষ্যার কি আর কোন শিক্ষককে পছন্দ হবে? আমার মত ছোটখাট প্রাইভেট টিউটরকে কি আর মনে ধরবে তোমার?'

সুকৃতি বলল, 'বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তোমার লজ্জা করে না?'

বিমল বলেছিল, 'কই, করে বলে তো টের পাইনে। এসো তাহলে তোমাকে ক্যামেরার কাজে দীক্ষা দেই। দেখবে ওসব দর্শন-বিজ্ঞান কাব্য-সাহিত্যের চেয়ে আমার এই ক্যামেরাটি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং। পৃথিবীতে বই ছাড়া আরো অনেক জিনিস আছে—যেমন ক্যামেরা, পৃথিবীতে ভাইস প্রিন্সিপাল ছাড়া অন্ততঃ আরো একজন ব্যক্তি আছে—যেমন তাঁর এই পুত্ররত্ন।'

বিমলের ফটোর কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে এল সুকৃতি। শিয়রের কাছে র‍্যাকটা এদেশী ওদেশী দর্শন-সাহিত্যের বইয়ে ভরতি। কিন্তু আজ একখানা বইও তার তুলে নিতে ইচ্ছা করল না। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল সুকৃতি। পৃথিবীতে বই ছাড়া আরো অনেক বস্তু আছে তা এমন নতুন করে আবিষ্কৃত হ'ল কেন। জীবনে স্মৃতি ছাড়া আরো কিছুর আকর্ষণ আছে তা কেন তাকে জানতে হল।

এম, এস, সি পাশ করে এক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে চাকরি নিয়েছিল বিমলেন্দু। তার পর থেকে বইপত্রের সঙ্গে তার আর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না।

এসব প্রসঙ্গ উঠলে বিমল বলত, 'দেখ, আমি আর যাই হই না কেন বাবার প্রোটোটাইপ হতে রাজী নই। সারাজীবন কেবল ছাত্র পড়াব আর ছাত্র সেজে থাকব তা আমার দ্বারা হবে না। বাবা তো আমার সঙ্গে পেরে উঠলেন না তাই তোমাকে এনেছেন, দিন রাত্রির জন্য এক ছাত্রীকে দিয়েছেন গছিয়ে।'

কি আকৃতি কি প্রকৃতি কোন দিক থেকেই হৃষীকেশের সঙ্গে যেন মিল ছিল না বিমলের। অবসর সময়টা হৈ চৈ খেলা-ধূলা সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে কাটাতেই সে বেশি ভালোবাসত। ফলে পাড়ার অল্পবয়সী ছেলে-ছোকরার দলে তার ভক্তের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তা দেখে বিমলের বাল্যকালের সহপাঠী আর হৃষীকেশের ছাত্র শেখর হেসে বলত, 'ওর আর বয়স বাড়ল না!'

বিমল জবাব দিত, 'না বাড়ুক সেই ভালো। তোমার মত আমি আমার বাবার বয়সী হতে রাজী নই।'

ছেলে যে তাঁর মত শান্ত গম্ভীর চিন্তাশীল হয়নি, কাব্যে-সাহিত্যে ওর যে তেমন অনুরাগ নেই তার জন্য মাঝে মাঝে হৃষীকেশ দুঃখ প্রকাশ করতেন, বলতেন, 'নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্য অনেক ভালো জিনিসের স্বাদ ও পেল না।'

আবার কখনো বা হেসে বলতেন, 'এই ভালো, আনন্দ নিয়েই কথা। ও যদি ওসব জিনিসে সত্যিই আনন্দ পায় তাহ'লে আমাদের আপত্তির কি আছে, কি বল?'

সুকৃতি হাসত, 'গোড়া থেকে এক আধটু আপত্তি জানালে ভালো করতেন। আমার তো মনে হয় আপনার ছেলে আপনার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই এমন হয়েছে।'

হৃষীকেশও হেসেছিলেন, 'তাই নাকি? আচ্ছা বেশ, এবার তো তুমি এসেছ। কড়া শাসন ক'রে তুমি ওকে শুধরে তোল দেখি, বুঝব কি রকম বাপের বেটি!'

সুকৃতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা আমি যদি ওঁর পরিবর্তন ঘটিয়ে ওঁকে একেবারে আপনার মত করে তুলতে পারি আপনি কি সত্যিই খুশি হবেন?'

হৃষীকেশ একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, 'তোমার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পেরেছি সুকৃতি। ছেলে অবিকল তার বাপের মত হোক এই কি বাপ চায়, না ছেলের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একজন হয়ে নিজেকে নতুন রূপে দেখতে তার সাধ জাগে, এই তো জিজ্ঞাসা?'

সুকৃতি মৃদু হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, এবার জবাবটা দিন।'

হৃষীকেশ বলেছিলেন, 'তার আগে জবাবটা তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

সুকৃতি এবারও একটু হেসেছিল, 'তার মানে আমার মুখে আপনি নিজের মুখের কথাই শুনতে পাবেন বলে আশা করছেন। কিন্তু আমি যদি তা না বলি?'

হৃষীকেশ বলেছিলেন, 'প্রফেসরের নোট মুখস্থ করা জবাব না শিখলে নম্বর কাটব, আমাকে কি তেমন পরীক্ষক বলে তোমার মনে হয়?'

সুকৃতি বলেছিল, 'না, আপনি তেমন এগজামিনার নন। সেই ভরসায় আমি যা বুঝেছি তাই বলি। প্রথমে বাপ ছেলের মধ্যে নিজেকেই অবিকল দেখতে চান, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। বিশেষ ক'রে যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সাহিত্যিক, নিজেদের মনোযোগ আর চেষ্টা যত্নের অভাবে তাঁদের ছেলেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিন বাপের মনে মমত্ব জন্মে যায়। 'কুর্বন্নপি ব্যলিকানি যঃ প্রিয়, প্রিয় এব সঃ,' তখন ঠিক যা চেয়েছিলেন তা না পেলেও স্নেহবশে, অভ্যাসবশে ছেলের মধ্যে বাপ নিজেকেই দেখতে পান। পাওয়া আর পেতে চাওয়ার মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি ক'রে নিতে হয়।'

শুনতে শুনতে হৃষীকেশ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনের ভাবটা আন্দাজ করতে পেরেছিল সুকৃতি। তাঁর ছেলের সঙ্গে সত্যিই সুকৃতির মনের মিল হয়েছে কি না, সেই আশঙ্কা হয়ত হয়েছে হৃষীকেশের।

বিমলের সঙ্গে রুচিগত প্রকৃতিগত অমিল খুবই ছিল সুকৃতির। কিন্তু এখন মনে হয় তা নিয়ে দু-জনের কারোর মনেই দুঃখ ছিল না, দুঃখবোধের আবশ্যক ছিল না। দিনের বেশির ভাগ সময় তার হৃষীকেশের সাহচর্যে কাটত।

বিমলকে রাত্রে যেটুকু সময়ের জন্য পেত স্বাদ-বৈচিত্র্যে তা যেন আরও উপভোগ্য হোত। বিমলেরও তাই। সারাদিনের হৈ চৈ হুল্লোড় করে, লঘু প্রকৃতির ছেলের দলের সঙ্গে মিশে রাত্রে সুকৃতিকে একটু স্বতন্ত্র রকমের লাগলেও সে স্বাতন্ত্র্যকে বিমল বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'তে দিত না। আদরের উত্তাপে সুকৃতির ভারিক্কিপনাকে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই গলিয়ে তরল করে দিত।

এমনি ক'রেই পুরো দুটি বছর কেটেছিল, সারাজীবনই কাটাতে পারত, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু ছিনিয়ে নিল বিমলকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিবৃত্তির জন্য দুই দলের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় সঙ্গীদের নিয়ে সে বেরিয়েছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে সে ফিরে এল না। সুকৃতি ফের যখন স্বামীকে দেখতে পেল, তখন ফুলে চন্দনে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা, জয়ধ্বনিতে আকাশ মথিত। শেষযাত্রার জন্য সে প্রস্তুত হয়েছে। শাশুড়ী চিৎকার ক'রে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদলেন, কিন্তু সুকৃতি কাঁদতে পেল না, কাঁদতে পারল না, শুধু ভিতরটা জ্বলে গেল।

সপ্তাহ খানেক বাদে হৃষীকেশ একদিন বললেন, 'ওর যে রকম স্বভাব ছিল তাতে হানাহানি ক'রে মরাই ছিল ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু একজনকেও ও মারেনি, মৃত্যুকে রোধ করতে গিয়েই ও মরল। এমন ক'রে বাঁচবার সাহস, এমন ক'রে মরবার সাহস আমার কিছুতেই আসত না মা! ওদের জাত আলাদা। ওরা কেবল পড়ুয়া পণ্ডিত নয়, ওরা কর্মী। ম'রে ও আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল।'

সুকৃতি এ কথার কোন জবাব দিল না। সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতার সম্পর্ক পিতা পুত্রের মধ্যে থাকতে

পারে, ছেলের মহৎ মৃত্যুর কাছে হার মেনে হৃষীকেশ আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারেন, কিন্তু সুকৃতির যা গেল তা তো গেলই। তার সারাজীবন কাটবে কি নিয়ে। সেই শূন্যতা সুকৃতি কি দিয়ে ভরবে। অন্ততঃ হৃষীকেশের সাহচর্যে নয়। বরং কিছুদিন শ্বশুরের সান্নিধ্য সুকৃতির কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল। বিমল ছিল বলেই হৃষীকেশের অস্তিত্বের পটভূমির প্রয়োজন ছিল, এখন বিমল যখন নেই হৃষীকেশের থাকাও সুকৃতির কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে গেছে।

হৃষীকেশ সুকৃতির মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বুঝতে পেরে একটু যেন আহতই হলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঠিক আগের মতই সুকৃতির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বিমলের শোক ভুলে থাকবেন। পুত্রবধূর মধ্যে পুত্রের স্মৃতিকে প্রত্যক্ষ করবেন, কিন্তু তা হ'ল না। সুকৃতি পিছিয়ে গেল, সরে গেল। দুজনের একই অভাব, একই শোক, তবু যেন ঠিক এক নয়। সম্পদের দিনে দুজনের যে শ্রদ্ধা আর প্রীতির সম্পর্ক, যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, দুর্দিনের আঘাত তা সইতে পারল না।

এই সময় এসে হাজির হল শেখর। ঠিক একা নয়, পাড়ার আরও কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে, পাড়ার আরো অনেক ছেলে-বুড়োর প্রতিনিধি হয়ে।

শেখর এসে বলল, 'সবাই আমাকে ধরেছেন বিমলের নামে আমরা কিছু কাজ করি। পাড়ায় ছেলেদের যে ক্লাব আছে তার নাম পালটে ওরা বিমলের নামে রেখেছে। কিন্তু ছেলেদের আরো কিছু করবার ইচ্ছা। এ পাড়ায় তো ভালো লাইব্রেরী নেই, আমরা যদি একটা লাইব্রেরী গড়ে তুলি কেমন হয়? মাস্টার মশাই আর সুকৃতির কাছ থেকে যদি উৎসাহ পাই—'

হৃষীকেশ ম্লান হেসে বললেন, 'উৎসাহটা আমরাই বরং তোমাদের কাছে থেকে পেতে চাই শেখর। বেশ তো তোমরা যদি এ সব করতে চাও আমার যতটুকু সাধ্য করব।'

শেখর বলল, 'আপনার সাধ্য অনেকখানি। প্রথমতঃ সম্পূর্ণ একতলাটা আপনি ছেড়ে দিতে পারেন। আর আপনার যা বই আছে তা যদি আমরা পাই, তাহ'লে অন্ততঃ দুচার বছরের মধ্যে কলকাতার বইয়ের দোকানগুলিতে আমাদের না গেলেও চলে। চাঁদার টাকা আমরা অন্য কাজে ব্যয় করতে পারি। আপনি যদি বই যোগান পাঠক যোগাবার ভার আমরা নিই।'

হৃষীকেশ একটু চুপ ক'রে রইলেন। ছাত্র বয়েস থেকে একখানা একখানা ক'রে তিনি বইয়ের সংগ্রহ বাড়িয়েছেন। জলখাবারের টাকা বাঁচিয়ে, জামা কাপড়ের ব্যয় সংক্ষেপ ক'রে তিনি বই কিনেছেন। তারপর চাকুরী জীবনেও অন্য আমোদ-প্রমোদ, আসবাবপত্রের দিকে না তাকিয়ে তিনি গ্রন্থ সঞ্চয়ে মন দিয়েছেন। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম বয়সে তাঁর অনেক কলহ, কথান্তর হয়ে গেছে। হেমলতা রাগ করে বলেছেন, 'দুনিয়ায় বই ছাড়া কি তুমি আর কিছু চোখে দেখনি?'

হৃষীকেশ হেসে জবাব দিয়েছেন, 'না, আরো একজনকে দেখেছি।'

হেমলতা বলেছেন, 'ছাই দেখেছ। দিন রাত তো বইয়ের পাতার আড়ালেই চোখ ঢেকে রাখ। আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না কি তোমার?'

হৃষীকেশ বই সরিয়ে রেখে হেসে স্ত্রীর হাত নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বলেছেন, 'থাকে হেম, থাকে। বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে যখন আর একজনের মুখ চোখে পড়ে, সে মুখ যে আরো কত সুন্দর দেখায় তা তুমি জানো না।'

হেমলতা নরম হয়েছেন, কিন্তু মুখে বলেছেন, 'থাক, আর বাক্যে কাজ নেই আমার, ঘরের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীর হয়ে হৃষীকেশ মনে মনে আবৃত্তি করেছেন, 'থাকি যবে গৃহ কাজে, তোমারই সে গৃহ নাথ, তোমারই সে কাজ, বইও তো তাই। বইও তো তোমার। বই যখন পড়ি, তোমাকে ভালোবাসবার জন্যই পড়ি, তোমাকে ভালোবাসি বলেই পড়ি। সে বইয়ে তোমারই কথা, তোমারই কাহিনী।'

বড় হয়ে বিমলও বাপের বই কেনার বাতিককে প্রশ্রয় দিয়েছে। জন্মদিনে, কি অন্য কোন উৎসবের দিনে অনেক টাকার বই কিনে এনেছে। সেই সব বই, তার পাতায় পাতায় মমত্ব ছড়ানো।

তাঁকে নীরব থাকতে দেখে শেখর বলেছিল, 'অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে তবে আমরা অন্য ব্যবস্থা করি।'

হৃষীকেশ সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'না আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু বইয়ের যত্ন তো সবাই জানে না শেখর, অনধিকারীর হাতে পড়ে বইয়ের বড় অনাদর হয়।'

শেখর বলেছিল, 'সুযোগ না পেলে অনধিকারীরা অধিকারী হবে কি করে মাষ্টার মশাই ?'

হৃষীকেশ সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন, 'আচ্ছা।'

মূল্যবান, অতি প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু বই রেখে একে একে সমস্ত বইয়ের আলমারী একতলায় বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রকে দান করলেন হৃষীকেশ।

শেখর বলল, 'ভাববেন না, মাষ্টার মশাই। এ লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুকৃতির ওপরই থাকবে, চাবি থাকবে ওঁরই হাতে। আলমারীগুলি শুধু দোতলা থেকে একতলায় নামল, বইগুলি শুধু একজনের হাত থেকে দশজনের হাতে গিয়ে পৌঁছবে।'

হৃষীকেশ একটু হাসলেন, 'পৌঁছুক তাতে ক্ষতি নেই, অক্ষতভাবে ফিরে এলে হয়।'

শেখর বলল, 'সে ভার আমার ওপর রইল। এখান থেকে কিচ্ছু হারাবে না। সুকৃতি বউদি, আপনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিন। লাইব্রেরীয়ান হতে হবে আপনাকে।'

সুকৃতি বলল, 'ব্যাপার মন্দ নয়। আমরা বাড়ি দিলাম, বই দিলাম, আবার লাইব্রেরীয়ানও হব ! অথচ কাজটা হ'ল আপনাদের দশজনের।'

শেখর বলল, 'দশজনেরই তো। কিন্তু আপনিও সেই দশজনের একজন। আপনার সরে গেলে চলবে না।'

সুকৃতি সরে গেল না বরং এগিয়ে এল। দোতলা থেকে একতলায়। মাত্র গোটা কয়েক সিঁড়ির ব্যবধান। কিন্তু এ ব্যবধান যেন অনেকখানি। এ ব্যবধান চিন্তা আর চেষ্টায়, এ অবতরণ কথা থেকে কর্মে। অথচ এমন কিছু কাজ নয়। শেখরের সাহায্যে বইগুলির শ্রেণী-বিভাগ করে একটা তালিকা তৈরী করল সুকৃতি। লিখতে হ'ল নিজের হাতে। প্রথমে শেখরকেই লিখতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু শেখর রাজী হ'ল না, বলল, 'না তার চেয়ে আপনিই লিখুন। অফিসে কলম পিষে পিষে আমার হাতের অক্ষর একেবারে দেবাক্ষর হয়ে গেছে। আর কেউ তো দূরের কথা, অনেক সময় আমি নিজেও পাঠোদ্ধার করতে পারিনে।'

সুকৃতি মৃদু হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা আমিই লিখছি। আমার হাতের লেখাও কিন্তু ভালো নয়।'

শেখর বলল, 'আমার চেয়ে অনেক ভালো।

নির্দিষ্ট দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন হ'ল বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের। দেশের সর্বাধিক লোকপ্রিয় প্রবীণ সাহিত্যিক এসে পাঠভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন। বিমলের সারল্য, সাহস, সততার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, অপরিচিতের দল বক্তৃতা দিলেন। পরদিন থেকে কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা চাঁদা দিয়ে কেন্দ্রের সদস্য হ'ল, বই পড়বার উৎসাহ আর আগ্রহ বাড়তে লাগল তাদের। সহরের যাঁরা গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত শিল্পী—তাঁদের একে একে, কোন কোন দিন বা একসঙ্গে অনেককে কেন্দ্রে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে লাগল শেখর। সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলি তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণ আর রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

হৃষীকেশ কোনদিনই তেমন মিশুক ছিলেন না, এখনও হতে পারেননি। কলেজের দু' একটি ক্লাস সেরে ঘরের কোণে নিজের মনে পড়াশুনো করেন। শুধু বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের দিনে শেখর তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে আসে, কোনদিন বা বসিয়ে দেয় সভাপতির আসনে। কাজ সেরে অল্পক্ষণের মধ্যেই হৃষীকেশ বিদায় নেন।

কিন্তু সুকৃতি যায় না, তার গেলে চলে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে থাকে। আর তার ফলে কারো উঠবার কথা মনে থাকে না। যেদিন লোকজন কম হয়, ছোট বৈঠক বসে সুকৃতি নিজের হাতে চা পরিবেশন করে, নিজের হাতের তৈরী করা সিঙ্গাড়া সন্দেশ অভ্যাগতদের সামনে এনে ধরে। আলাপ আলোচনার সময় বেশি কথা বলে না সুকৃতি। বরং স্বল্পভাষিণী মুখচোরা মেয়ে বলেই তাকে মনে হয়। কিন্তু তার উপস্থিতিতে সকলের বলবার আগ্রহ বাড়ে। কারণ সকলেই জানেন সুকৃতির মত এমন বুদ্ধিমতী শ্রোত্রী সহরে মেলে না। আলোচনায় মাঝে মাঝে যখন যোগ দেয়

সুকৃতি, তখন বোঝা যায়, বুঝবার আর বোঝাবার ক্ষমতাও তার নেহাৎ কম নেই। সাহিত্য আর দর্শনে পড়াশুনো অনেকের চেয়েই তার বেশি।

হৃষীকেশের অধ্যাপক-বন্ধুর দল খুশি হয়ে বলেন, 'এম· এ পরীক্ষাটি তুমি দিয়ে দাওনা কেন সুকৃতি। তোমার তো কোন অসুবিধে নেই, ইউনিভার্সিটিতে যদি না যেতে চাও, নাইবা গেলে। তোমার শ্বশুর তো একাই একটি ইউনিভার্সিটি।'

সুকৃতি স্মিতমুখে চুপ করে থাকে।

কিন্তু যেদিন আর কেউ আসে না, সেদিনও শেখর আসে। বৃষ্টির দিন, ঝড়েব দিন, ছুটির দিন, কোনদিনই প্রায় বাদ যায় না। কোনদিন বা বইয়ের স্টক মিলায়, কোনদিন বা কেন্দ্রের অন্য কাজে মন দেয়। লাইব্রেরী ঘরে সুকৃতিকেও কাজে ব্যস্ত দেখা যায়। কোনদিন বা কেন্দ্রের মুখপত্র 'সংস্কৃতি'র প্রুফ দেখে।

শেখর একদিন বলল, 'কেমন লাগছে এসব কাজ ?'

সুকৃতি প্রুফ থেকে মুখ তুলে বলল, 'ভালো। কাজের সবচেয়ে বড গুণ তা বেশ ভুলিয়ে রাখে। পড়াশুনোয় এমন করে ভুলে থাকা যায় না।'

শেখর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'কিন্তু আমরা তো ভুলে থাকতে চাইনে, কাজের ভিতর দিয়ে আমরা তাকে মনে রাখতে চাই। জানেন, পড়াশুনোয় বিমলের তেমন ঝোঁক ছিল না, কিন্তু লাইব্রেরী করার দিকে ওর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি।'

সুকৃতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাই নাকি ! কই আমাকে তো এসব কথা কোনদিন বলেননি ?'

শেখর একটু হাসল, 'ও যে ওর বাবার মত নয়, আমাদের মত নয়, তাই দেখাবার জন্য এসব কথা, এসব ইচ্ছা ও আপনার কাছে জোর করে চেপে গেছে। অনেকের অনেক রকম বাতিক থাকে। ওর বাতিক ছিল ওর বাবার প্রোটোটাইপ না হওয়া। আমরা যদি ওর কাছ থেকে কোন কাজ কোন জিনিস আদায় করতে চাইতাম, বলতাম মাষ্টার মশাই কিছুতেই একাজ করতে পারতেন না, এ জিনিস দিতে পারতেন না। আর সঙ্গে সঙ্গে বিমল রাজী হয়ে যেত।'

সুকৃতি এবার হাসল, 'আপনিও তো তাহলে ফন্দিবাজ বড় কম ছিলেন না।'

শেখর বলল, 'কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে ওর ফন্দির ওপরই আমরা সব চেয়ে বেশি নির্ভর করতাম।'

বলে বাল্যের, কৈশোরের গল্প শুরু করল শেখর। চিরকালই এ্যাডভেঞ্চারের দিকে ঝোঁক ছিল বিমলের। ক্লাস পালানো,মাষ্টার মশাইদের জব্দ করা, চুরি করে অন্যের বাগান থেকে পেয়ারা পেড়ে আনা, পিকনিক করতে যাওয়া, অন্যের পুকুরে মাছ ধবতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানো, এমনি টুকরো টুকরো অনেক কাহিনী—যা প্রায় সব ছেলের জীবনেই ঘটে। অথচ শুনতে শুনতে সুকৃতির মনে হত এমন সব অনন্যসাধারণ ঘটনা শুধু শেখর আর বিমলের জীবনেই ঘটেছে। অতীতের স্মৃতি থেকে দুটি দুরন্ত কিশোর যেন জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। হৃষীকেশ আর হেমলতাও কোনদিন তাঁদের ছেলের ছেলেবেলাকে এমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

শেখর আর সুকৃতির মধ্যে যখন এই স্মৃতি মন্থন চলত, হেমলতা মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াতেন। কোন কোন দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেন, কোনদিন বা আর দাঁড়াতে পারতেন না। চোখে আঁচল চেপে সরে যেতে যেতে বলতেন, 'তুমি চুপ করো শেখর, আমার পরম শত্তুরের নাম আর মুখে এনো না।'

কিন্তু হেমলতা চলে গেলে কৈশোরের পালা থেকে হঠাৎ এক সময় কলেজ জীবনের কাহিনীতে চলে যেত শেখর। কলেজের কমনরুম, বিতর্ক সভা, ইলেকশন নিয়ে রেষারেষি, একজন প্রভাবশালিনী স্থূলকায় সহপাঠিনীকে দলে টানবার জন্য তার সঙ্গে বিমলের অনুরাগের অভিনয়, শেষরক্ষা করবার জন্য শেখরের এগিয়ে আসা, এমনি সব গল্প শুনতে শুনতে সুকৃতির মত গম্ভীর স্বভাবের মেয়েকেও মুখে আঁচল চাপতে হত।

শেখর কিন্তু থামত না, গম্ভীরভাবে বলত, 'আপনি হাসছেন, কিন্তু বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আমার তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

'কেন ?'

শেখর বলল, 'কেন আবার। সহাধ্যয়িনীটি তখন আমার কাঁধে পড়ো পড়ো হবার জো হয়েছেন।'

'কাঁধে নিলেই পারতেন।'

শেখর শিউরে ওঠার ভঙ্গিতে বলত, 'ওরে বাপরে, কাঁধ ভেঙ্গে যেত।'

শুনতে শুনতে সুকৃতি একদিন না বলে পারল না, 'কি অন্যায় ধারণা ! মেয়েরা বুঝি কেবল পুরুষের কাঁধ ভাঙবার জন্যই জন্মেছে।'

শেখর জবাব দিল, 'এতদিন সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু এখন আর তা নেই।'

সুকৃতি বলল, 'তবু ভালো, কিন্তু ভুলটা ভাঙ্গল কি করে ?'

শেখর সুকৃতির দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সে কথা আর একদিন বলব।'

ওর এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ভঙ্গিতে সুকৃতির ভিতরটা যেন শিউরে উঠল, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা না করেও জানতে হ'ল, শুনতে হ'ল। সুকৃতি যতটা অবাক হবে, যতটা আঘাত পাবে ভেবেছিল, তাতো কই পেল না ! বলতে পারল না, 'ও কথা তুমি বোলো না, ও কথা বলা পাপ।'

বলতে পারল না, 'তুমি চলে যাও, তুমি আর এস না।'

কারণ ততদিনে এমন হয়েছে যে, শেখর না এলে বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের কাজে মন বসে না সুকৃতির, এমন অভ্যাস জন্মে গেছে যে, বিমলের স্মৃতিকথা শেখরের মুখ থেকে না শুনলে ভালো লাগে না। আজ দেখল কখন অলক্ষিতে কথার চেয়ে কথকই একটু একটু করে তার মনের সবখানি জায়গা জুড়ে বসেছে।

তবু প্রথমটা এড়াতে চেষ্টা করেছিল। সরে থাকতে, লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা করেছিল সুকৃতি। শরীর খারাপ হওয়ার অজুহাতে কদিন আর নিচে নামেনি। কিন্তু শেখরের সাহসের অন্ত নেই। সে ওকে ঘরের কোণ থেকে খুঁজে বের করল, কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করল, তারপর সেই হাতেই শক্ত কবে চেপে ধরল ওর মুঠি।

কেবল কব্জির জোরই তো নয়, যুক্তির জোরও ওর আছে।

'কেন অত সঙ্কোচ করছ তুমি। আমরা তো কোন অন্যায় করছি না, কারো অধিকার কেড়ে নিচ্ছি না, আর কারো দাবীকে অগ্রাহ্য করছি না, কাউকে বঞ্চিত করছি এমনও তো নয়। নিরর্থক লজ্জায়, কর্মপরিষদের গুটিকয়েক প্রৌঢ়ের সমালোচনার ভয়ে সারাজীবন ধরে নিজেদের বঞ্চনা করলেই কি আমরা খুব লাভবান হব ?'

সুকৃতি বলেছিল, 'কিন্তু বাবা, মা ?'

'মানে তোমার শ্বশুর শাশুড়ী ?' বিচ্ছেদের দুঃখ তো তাঁদের সইতেই হবে। এমন দুঃখ তোমার নিজের বাবা মাও তো একদিন পেয়েছিলেন, গায়ত্রীর কাছ থেকেও তার বাবা মা পেয়েছেন। এ দুঃখ তাঁদের সইবে। কিন্তু তোমার সারাজীবন লজ্জা আর সংস্কারের ভয়ে নিষ্ফলা মরুভূমি হয়ে থাকবে তা আমার সইবে না।'

শুধু শেখর নয়, মন স্থির করতে হৃষীকেশই সুকৃতিকে বেশি সাহায্য করলেন, নিজেই উদোগী হয়ে ডাকিয়ে আনলেন শেখরকে। বললেন, 'আমার সেদিনের অধীরতার জন্য কিছু মনে কোরো না।'

শেখর মাথা নিচু করে বলল, 'মনে করেছিলাম বলে আজ লজ্জিত হচ্ছি।'

হেমলতাকে বুঝানো গেল না। তিনি রাগ করে ভবানীপুরে তাঁর দাদার কাছে চলে গেলেন। সুকৃতির বাবাকেও খবর দিয়ে আনিয়ে সব কথা বললেন হৃষীকেশ।

জিতেনবাবু বললেন, 'আপনার আচরণ আমার ভালো লাগছে না বেয়াই, ওর কপালে যা ছিল হয়েছে। দুদিনের জন্য হলেও সুখ-শান্তির স্বাদ ও পেয়েছে। আমার বিধবা মেয়ের ফের বিয়ে না

দিয়ে যদি ওর আইবুড়ো বোনগুলির একটা ব্যবস্থা করতেন আমার অনেক উপকার হত। তা ছাড়া আপনার ঘরে মেয়ে দিয়েছিলাম কি এই জন্যই ? আপনি শেষ পর্যন্ত ভিন্ন জাতের ঘরে ওকে ঠেলে দিলেন ? এমন করে জাত মারলেন আমার ? আমাকে তখনই অনেকে নিষেধ করেছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর বামুনকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। তারা সব পারে।'

জিতেনবাবুর কথার ধরণে হৃষীকেশ রাগ করলেন না, হেসে বললেন, 'তা অনেকটা ঠিকই বলেছেন। এতখানি যে পারব ভাবিনি। কিন্তু জিতেনবাবু, এখন জাত যা যাবার আমারই যাবে। আপনি তো ওকে গোত্রান্তর করেই দিয়েছিলেন, আপনার আর ভয় কি।'

কিন্তু গোত্রান্তর করলেই বুঝি অন্তরের ব্যাথা মরে, মনের সব দুঃখ, সব জ্বালা দূর হয়, সন্তানের হিতাহিতের ভাবনা আসে না ?

রাগ করে রূঢ় ভাষায় আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন জিতেনবাবু, সুকৃতি এসে সামনে দাঁড়াল, 'তুমি ও ঘরে চল বাবা। ওঁকে মিছামিছি দোষারোপ কোরো না। যা বলবার আমাকে বল।'

জিতেনবাবু বললেন, আমি কাউকে আর কিছু বলতে চাইনে সুকু। আমার সব বলা-শোনা শেষ হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে এখন উঠতে পারলেই বাঁচি।'

বলে সত্যি সত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিলেন জিতেনবাবু। মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে এককাপ চা পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না।

সপ্তাহ দুই বাদে সুকৃতিকেও একদিন বিদায় নিতে হ'ল। মনে পড়ল চার বছর আগে আর একটি আনন্দের দিনে স্নেহপ্রবণ প্রৌঢ়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে চোখের জল ফেলেছিল সুকৃতি। সেদিন তাঁরও চোখ শুকনো ছিল না। আজ তিনি বিমুখ হয়ে চলে গেছেন। কিন্তু হৃষীকেশের মুখে অবিকল তাঁরই মুখ ফুটে উঠেছে।

সুকৃতি ডাকল, 'বাবা'।

হৃষীকেশ সস্নেহে তাঁর পিঠে হাত রাখলেন।

বাড়ির দুটি চাকর টানাটানি করে ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বিছানা আসবাবপত্র, রাশীকৃত করল দোরের সামনে। শুধু ট্যাক্সি নয়, জিনিসপত্র বয়ে নেওয়ার জন্য একখানা লরী পর্যন্ত এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে।

শেখর দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'এসব কি মাষ্টার মশাই, এত জিনিসপত্র কোথায় যাবে।'

হৃষীকেশ বললেন, 'এ সব জিনিসই সুকৃতির। ওর সঙ্গে এগুলি তাই দিয়ে দিচ্ছি।'

শেখর স্থিরদৃষ্টিতে জিনিসগুলির দিকে তাকাল। বিমল আর সুকৃতি যে বড় খাটখানা ব্যবহার করেছে, সেই খাট, যে আলনায় বিমলের স্যুট ঝুলানো থাকত, সেই আলনা। যে আলমারি দপকারী অদরকারী নানা জিনিসে বিমল বোঝাই করে রাখত সেই আলমারী।

কিসের একটা অস্বস্তিতে যেন সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠল শেখরের। যেন অদৃশ্য কোন প্রেতের অশুচি দুঃসহ শীতল স্পর্শ তার গায়ে এসে লেগেছে।

শেখর মাথা নেড়ে বলল, 'না মাষ্টার মশাই, এগুলি তো সুকৃতির সঙ্গে যাবে না, এসব আপনি তুলে রাখুন।'

হৃষীকেশ শেখরের দিকে তাকালেন, 'তুলে রাখব ? কিন্তু এগুলি তো আমার আর কোন কাজে আসবে না শেখর। এসব ব্যবহার করবার আর তো কেউ নেই।'

শেখর বলল, 'তাহলে এসব বরং আপনি গায়ত্রীকে দেবেন।'

হৃষীকেশ বললেন, 'গায়ত্রী আর সুকৃতিকে আমি তো আলাদা করে দেখিনি শেখর। গায়ত্রীকে আমি বিয়ের সময় সব দিয়েছি। ওর এসব জিনিসের অভাব নেই।'

শেখর বলল, 'আমার অবশ্য অভাব আছে। কিন্তু এসব জিনিস-ব্যবহারে আমার প্রবৃত্তি নেই, প্রয়োজন নেই মাষ্টার মশাই।'

হৃষীকেশ স্থির দৃষ্টিতে শেখরের দিকে তাকালেন।

শেখর বলল, 'তা ছাড়া সুকৃতি এখন চলল গরীবের ঘরে। একতলা ভাড়াটে বাড়ি। ছোট দুখানা

ঘর। একখানায় মা থাকেন। রাজ্যের হাঁড়িকুড়ি দিয়েই তিনি গরীবের গৃহস্থালী গড়ে তুলেছেন। এসব জিনিস রাখবার তো সেখানে জায়গা হবে না।'

হৃষীকেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার ঘর যে অত ছোট তা আমার জানা ছিল না শেখর! আচ্ছা ওগুলি তাহলে এইখানেই থাক। ও দেবেন, ও গোপাল, ফার্নিচারগুলো সব নামিয়ে নে তো।'

চাকরেরা জিনিসগুলি ফের নামাতে শুরু করল।

সুকৃতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এবারকার অনুষ্ঠান শুধু রেজিস্ট্রি অফিসের শপথ বাক্যের মধ্যে শেষ হয়েছে। কেউ উলুধ্বনি দেয়নি, শাঁখ বাজেনি, সানাই শোনা যায়নি। তবু দুপুরের পর বিকাল, বিকালের পর গোধূলি রঙ লেগেছিল আকাশে, সুর বেজেছিল মনের মধ্যে। এক আচমকা আঘাতে সে সুর থেমে গেল। সানাইদারের হাত থেকে কে যেন বাঁশীটা হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কি হ'ল, কেন এমন হ'ল!

ইশারায় শেখরকে কাছে ডেকে আনল সুকৃতি, একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ও কি করছ! ওঁকে ওসব কথা কেন বলতে গেলে।'

শেখর বলল, 'কিন্তু ওসব জিনিস নিতে আমার লজ্জা করছিল সুকৃতি।'

'লজ্জা আমারও করছিল, কিন্তু উনি যখন দিতে পারলেন, নিতে না পারায় আমাদের লজ্জা যে আরো বেশি, ওঁর কাছ থেকে আমরা অনেক নিয়েছি।'

শেখর বলল, 'তা নিয়েছি! কিন্তু এসব নিতে পারব না।'

সুকৃতি আর কোন কথা বলল না।

বেরুবার আগে হৃষীকেশকে প্রণাম করে বলল, 'আপনি রাগ করে থাকবেন না, যাবেন কিন্তু, বেশি দূর তো নয়।'

হৃষীকেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না গড়পার আর এখান থেকে দূর কিসের, রাস্তার এপার আর ওপার। আচ্ছা যাব একদিন।'

মাণিকতলা থেকে গড়পাড় দূর নয়, কাছেই। তবু এইটুকু পথ যেতে যেতে সুকৃতির মনে হ'ল যেন লোক থেকে লোকান্তরে যাত্রা করেছে। পথের যেন শেষ নেই। শেখরের বাসায় অবশ্য এর আগে আরো দু' একবার এসেছে সুকৃতি। বিমল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের কাজে আসতে হয়েছে। কিন্তু আজকেব আসা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজকের দিনের রং আলাদা, রূপ আলাদা, সুর আলাদা। কিন্তু তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সুর বাজছে না কেন!

শেখর স্ত্রীর পাশে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল, এবার বলল, 'তোমাকে আগেই বলেছি মা'র এ বিয়েতে মত ছিল না। তিনি সাদরে সাড়ম্বরে বধূবরণ করবেন তেমন আশা কোরো না। ভেবেছিলাম, প্রথমে একটি হোটেলে-টোটেলে গিয়ে উঠব, কিন্তু তাতেও মা রাজী হননি। তা ছাড়া ভাবলাম, ওভাবে পালিয়ে বেড়িয়েও তো লাভ নেই। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানোই ভালো, তোমার কি ভয় করছে?'

সুকৃতি মৃদুস্বরে বলল, 'না, ভয় কিসের, তুমি যখন পাশে আছ—'

শেখর একটু হাসল, 'হ্যাঁ, গাড়ীর মধ্যে আপাতত পাশেই আছি। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে তো আর সব সময় পাশে থাকতে পারব না। কাজকর্মে বেরুতেই হবে। তখন মার সঙ্গে একা তোমার বোঝাবুঝির পালা। ভয় করবে নাকি?'

সুকৃতি বলল, 'না মাকে আমার কোন ভয় নেই।'

শেখর চোখ তুলে তাকাল, 'তবে কাকে তোমার ভয়?'

সুকৃতি একথার কোন জবাব না দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।

মান অভিমান ছেলের সঙ্গেই সরোজিনী যা করবার করেছেন। সুকৃতির সঙ্গে কোনরকম বিসদৃশ আচরণই তিনি করলেন না। আত্মীয়-স্বজন বড় কেউ নেই, দূর সম্পর্কের যারা আছে তাদের শেখর

ইচ্ছা করেই খবর দেয়নি। সরোজিনীও এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করেননি। দোতলার ভাড়াটে বিধুবাবুর দুই মেয়ে চন্দ্রা আর নন্দাই শাঁখ বাজিয়ে অনুষ্ঠানে একটু সুরের ছোঁয়াচ লাগালো। সুকৃতি সরোজিনীকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'আগে ও ঘরে চল।

সরোজিনী নিজের শোবার ঘরে এসে ঢুকলেন। স্বামীর সঙ্গে সুকৃতি এলো পিছনে পিছনে।

ঘরের এক কোণে একখানা জলচৌকির ওপর সাদা আর কালো পাথরের ছোট ছোট দুটি মূর্তি।

সরোজিনী বললেন, 'আমাদের ইষ্টদেবতা, রাধাশ্যাম, বৃন্দাবন থেকে তোমার শ্বশুর নিয়ে এসেছিলেন।' পাশের আর একখানা চৌকির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওই যে তিনি।'

তাঁর দেখাবার আগেই সুকৃতি দেখেছে। দ্বিতীয় জলচৌকিখানার ওপর তরুণবয়স্ক আর একটি পুরুষের সুবৃহৎ চিত্র-প্রকৃতি। বোধহয় অল্প দিন আগে নতুন করে প্রিন্ট আর এন্‌লার্জ করা হয়েছে। শেখরের চেয়ে ওর বাবা দেখতে যে বেশ সুপুরুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। তাঁর দীর্ঘ নাক আর প্রশস্ত কপাল আর আয়ত চোখের কিছুই শেখর পায়নি। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক এমনি নাক, এমনি চোখ সুকৃতি আরো একজনের যেন দেখেছে। সে কথা মনে হতেই ওর সর্বাঙ্গ শির শির করে উঠল। বড়ো ফটোতে ভারি আপত্তি ছিল তার। সে বলত, 'তাতে আসল মানুষটি ছোট হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি যখন মরব তখন না হয় একটা ফটো বড় করে বাঁধিয়ে রেখো ঘরে।'

সুকৃতি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, 'ফের যদি তুমি ওসব বাজে কথা বলো—'

সে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, 'দেখ বাজে কথা হাত দিয়ে চেপে বন্ধ করা যায় না, আর কিছু দিয়ে চেপে রাখতে হয়।'

বলতে বলতে মৌখিক পরামর্শকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করেছিল সে।

সুকৃতিকে নিশ্চলভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সরোজিনী একটু তিক্তকণ্ঠে বললেন, 'হয়েছে মা, এবার এসো। ঠাকুর দেবতা তোমরা মান না জানি, কিন্তু শ্বশুরের ফটোর সামনে একটু মাথা নোয়ালেও পারতে।'

সুকৃতি এই অনুযোগের কোন জবাব না দিয়ে নীরসকণ্ঠে বলল, 'চলুন।'

সরোজিনী ছেলের দিকে একবার তাকালেন, তারপর আগে আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যার পর নন্দা আর চন্দ্রা একরাশ রজনীগন্ধা আর দুটি গোড়ের মালা নিয়ে এসে শয্যাকে ফুলশয্যা বানাল।

নন্দা বলল, 'অমনিতে ছাড়ছিনে শেখরদা, খাওয়াতে হবে।'

চন্দ্রা বলল, 'অমন চুপ করে থাকলে চলবে না বৌদি। গান শোনান। দাঁড়ান, ওপর থেকে হারমনিয়মটা নিয়ে আসি।'

সুকৃতি একটু হেসে বলল, 'গান তো আমি জানিনে ভাই, গান তোমরা গাও, আমি শুনি।'

নন্দা হেসে উঠল, 'তবেই হয়েছে। দিদির গলা কাটলেও সুর বেরুবে না।'

চন্দ্রা বলল, 'আচ্ছা তোর তো বেরুবে। তোর মধুকণ্ঠই না হয় একটু শুনিয়ে দে বউদিকে।'

কিন্তু সুকৃতির শোনবারও যেন তেমন আগ্রহ নেই। উৎসাহ না পেয়ে দুই বোন হারমনিয়ম আনবার ছলে সেই যে ওপরে চলে গেল আর নামল না।

রাত্রে শেখর ঘরে এসে দেখল সুকৃতি ঘরের এককোণে জানালার ধারে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে শেখর ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, স্ত্রীর কাঁধে একখানা হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকল, 'সুকৃতি।'

ও যে শিউরে উঠেছে তা স্পষ্ট টের পেল শেখর। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি আজও কিছু ভুলতে পারনি।'

সুকৃতি কোন জবাব দিল না।

শেখর কোমল কণ্ঠে বলল, 'জানি ভোলা অত সহজ নয়! কিন্তু ভুলতে তো হবেই। প্রেতকে তো আমাদের জীবনের সঙ্গে চিরকাল জড়িয়ে রাখতে পারিনে সুকৃতি।'

প্রেত! কথাটি সুকৃতির বড় বিশ্রী লাগল কানে। বিমলের সম্বন্ধে এত বড় একটা রূঢ় শব্দ না উচ্চারণ করে কি পারত না শেখর? ভুলতে হয়, ভুলতে হবে, একথা সবাই জানে। তা কি এমন

জোর গলায় বলবার দরকার ছিল !

শেখর বলল, 'রাত অনেক হয়ে গেছে। এবার শোবে এস।'

সুকৃতি মৃদুকণ্ঠে বলল, 'তুমি যাও ঘুমোও গিয়ে। আমি বরং এখানে আর একটু দাঁড়াই। কেন যেন ঘুম পাচ্ছে না।'

শেখর অধীর স্বরে বলল, 'ঘুম আমারও পাচ্ছে না। শুনেছি আজ নাকি একসঙ্গেই জাগতে হয়। আজকার রীতিনীতি তোমারই তো বেশি জানবার কথা।'

বলেই হঠাৎ থেমে গেল শেখর। এ ধরনের কথা তো বলবার তার ইচ্ছা ছিল না। তার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, তার মুখ কিছুতেই সে চাপতে পারল না।

শেখর লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি কিছু ভেবে বলিনি সুকৃতি। কিছু মনে কোরো না।'

সুকৃতি বলল, 'না, মনে করবার আর কি আছে, চল।'

বিছানায় শুয়ে শেখর বলল, 'এর চেয়ে যদি ওদের অনুরোধ রাখতে, একটু গানটান গাইতে মনটা হালকা হত। চন্দ্রা নন্দাকে অমন মিথ্যা কথাটা বলতে গেলে কেন, তুমি তো গান জানো। সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সেবারের ফাংশনে তুমি তো একখানা চমৎকার রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলে।'

সুকৃতি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু সেই গান কি এখানে জমত ?'

শেখর বলল, 'না, তা জমত না, কিন্তু সেই শোক-সঙ্গীত ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তো অন্য রকমের গানও লিখেছেন, তার দুটি একটিও কি তোমার আজ মনে পড়ল না ?'

সুকৃতি চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ফের কথা বলল শেখর, 'আর একটা কথা। মা যখন তোমাকে বাবার ফটোর কাছে নিয়ে গেলেন, একটা প্রণাম করলে ক্ষতি ছিল কি ?'

সুকৃতি জবাব দিল, 'নিজে যখন কোন ফটো পুজো করলাম না, তখন অন্যের পুজোর ওপর কি করে ভক্তি আসে বল ?'

শেখর বলল, 'ও। কিন্তু দু' বছর ধরে আমরা কি কম পুজো করেছি ? তাতেও যদি তোমার সাধ না মিটে থাকে তুমি তার ফটো এনে এ ঘরে টানিয়ে রাখতে পার, আমি তাতে কিছুমাত্র আপত্তি করব না।'

সুকৃতি একথার কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরল।

একটু বাদে ফের যখন স্ত্রীকে কাছে টেনে নিল শেখর, তখন তার ঠোঁটে লোনা জলের দাগ লাগল।

অনুতপ্তস্বরে শেখর বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো সুকৃতি, ক্ষমা করো। আমি এসব কথা বলতে চাইনি। দুঃখ দিতে চাইনি তোমাকে। আজকের রাত সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম কল্পনাই ছিল। কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে যে এত তফাৎ তা আমার জানা ছিল না।'

সুকৃতি নিজেই কি তা জানত ? সুকৃতি নিজেই কি বুঝতে পেরেছিল সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সেই কর্মী শেখরের পার্থক্য এক রাত্রেই এমন করে ধরা পড়বে ?

পরদিন সরোজিনী বললেন, 'একটা কথা নিজের মুখেই তোমাকে বলছি বাছা, কিছু মনে কোরোনা।'

সুকৃতি বলল, 'বলুন।'

সরোজিনী বললেন, 'এখানে পাঁচ ঘর পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে আমাদের বাস করতে হবে। তাদের নিন্দামন্দ আমাদের তো একেবারে অগ্রাহ্য করলে চলবে না মা। তা ছাড়া আগে তোমার কি হয়েছিল না হয়েছিল তাতো আর সবাই জানতে আসবে না। সবাই তোমাকে আমার ছেলের বউ বলেই জানবে।'

সুকৃতি মুখ নিচু করে বলল, 'আমি তো তাই মা।'

সরোজিনী বললেন, 'তাহলে হিন্দুর ঘরের রীতিনীতিগুলি ভালো করে মেনে চল। সিঁথিতে কপালে সিঁদুর পরো, আমি আজই শাঁখারীকে খবর দিচ্ছি। সধবা ঝি-বউদের হাতে শাঁখা না থাকলে

কি মানায় ?'

বেশটা যে পর্যাপ্তভাবে বদলানো হয়নি তা নজরে পড়ায় সুকৃতি একটু লজ্জিত হ'ল, কিন্তু সরোজিনীর নির্দেশ মত বেশ পরিবর্তনেও কি কম লজ্জা !

শেখর তা টের পেয়ে বলল, 'মা যা বলেছেন তা শোনাই ভালো, অনর্থক ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে—'

সুকৃতি একটু হেসে বলল, 'তাতো বটেই। আসলে কথাটা তো শুধু মার নয়, তাঁর ছেলেরও, কিন্তু দু'দিন আগেও যে তুমি বলতে সিঁদুর টিঁদুর তুমি পছন্দ কর না, বড় ন্যাস্টি মনে হয় তোমার কাছে—'

শেখরও হাসল, 'দু'দিন আগে যা ছিলে এখন কি তুমি তাই আছ ?'

অফিস থেকে ফিরে এসে শেখর দেখল, তার মার পছন্দ মতই সাজসজ্জা সব বদলে ফেলেছে সুকৃতি। পায়ে আলতা পরেছে, সিঁথিতে পুরু করে দিয়েছে সিঁদুরের দাগ, গাঢ় লাল রঙের শাড়ীতে অদ্ভুত রূপ খুলেছে সুকৃতির। কে বলবে ওর বয়স আঠার উনিশের বেশি ?

শেখর হেসে বলল, 'বাঃ একেবারে চমৎকার গৃহলক্ষ্মী হয়ে রয়েছ দেখছি। আজ তো বৃহস্পতিবার, এবার মা নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর পুঁথি খানা তোমার হাতে তুলে দেবেন।'

সুকৃতিও হাসল, 'তাহলে তোমার হাতেও ধান দুর্বা দিতে ভুলবেন না।'

হঠাৎ টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই সুকৃতি বলল, 'ভালো কথা তোমার একটা চিঠি আছে।'

'কোথাকার চিঠি ?'

সুকৃতি মৃদুস্বরে বলল, 'বিমল-সংস্কৃতি-কেন্দ্রের।'

একটু যেন আটকে গেল গলা, একটু যেন আরক্ত হল মুখ।

শেখর বলল, 'কই দেখি।'

কেন্দ্রের নামাঙ্কিত সাদা খামটা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিল সুকৃতি। শুধু শেখরের নাম নয়, সেই সঙ্গে সুকৃতির নামও টাইপ করা রয়েছে। সুকৃতি সোম ! নামটা মনে মনে আর একবার উচ্চারণ করল শেখর। সুকৃতি সোম, সোম, সোম শব্দে এত মাধুর্য তা যেন আগে ওর জানা ছিল না !

খামের ভিতর থেকে চিঠি বের করল শেখর। সহকারী সম্পাদক, অধ্যাপক মুরারি মুখার্জি কর্মপরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করেছেন, বিষয় কেন্দ্রের গঠনতন্ত্র। শেখরের মুখখানা গম্ভীর দেখাল।

সুকৃতি বলল, 'চা টা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। সাড়ে ছটা বাজল বলে।'

শেখর বলল, 'তা বাজুক গিয়ে। আমি আজ আর যাব না। কালকে একটা রেজিগ্‌নেশন-চিঠি পাঠিয়ে দেব। তারপর চার্জটা একদিন বুঝিয়ে দিয়ে এলেই হবে।'

সুকৃতি চুপ করে থেকে বলল, 'এসব তুমি কি বলছ !'

শেখর স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'বলবার আর কি আছে সুকৃতি ? কেন্দ্রের পরমায়ু আর কতদিন ? দেখছিলে না, এরই মধ্যে আগন্তুক সভ্যদের সংখ্যা দিনের পর দিন কি রকমে কমে আসছিল। এর পর আমরা যদি সরে আসি কেন্দ্র কি আর দু'দিনও টিকবে ?'

সুকৃতি স্বামীর দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিন্তু আমরা সরে আসব কেন ?'

শেখর বিস্মিত হয়ে বলল, 'অবাক করলে। সরে না এসে করব কি ? এর পরে কি ফের ওই বাড়িতে, ওঁদের সঙ্গে কাজ করা যায় ? বাঙলা দেশের অতটা সহ্যশক্তি নেই।'

সুকৃতি বলল, 'অন্তত এক পক্ষের সহ্যশক্তি যে যথেষ্ট আছে, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।'

শেখর স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। কিন্তু কেন্দ্র তো সেই একজনকে নিয়েই নয়। তা ছাড়া তুমি আর আমি এই বেশে যদি তাঁর চোখের সামনে দিয়ে রোজ নড়াচড়া করি তাঁর সহনশীলতার ওপর অত্যাচার করা হবে। তাঁর সেন্টিমেন্টের কথাটাও আমাদের ভাবা উচিত।'

শেখর তক্তপোষের ওপর বসে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি ভালো করে বুঝে দেখ সুকৃতি, তুমি যা বলছ, এখানে তা সম্ভব নয়। পদে পদে ওঁদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আমাদের অস্থির করে তুলবে। ওঁরাও অস্বস্তি বোধ করবেন, আমরাও স্বস্তি পাব না। তার চেয়ে আমরা দূরে থেকে যতটা সাহায্য করতে পারি

সেই ভালো। ওঁদের যদি উৎসাহ থাকে, শক্তি সামর্থ থাকে, বেশ তো, ওঁরা কেন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর সংসারের কাজ সেরে তোমার যদি উৎসাহ থাকে, তাহলে দেশে তো ও ধরনের সভা-সমিতি লাইব্রেরী কালচার ক্লাবের অভাব নেই। পাগলামি কোরো না সুকৃতি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সুকৃতি বলল, 'তোমার নিজের হাতে গড়া জিনিস। তার জন্য তোমার মায়া হয় না?'

সুকৃতির হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল শেখর, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হয় বইকি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মায়া হয় তোমার জন্য। ভেবো না সুকৃতি, নিজের হাতে আমরা নতুন জিনিস গড়ে তুলব।'

সুকৃতি মুখ নিচু ক'রে বলল, 'তাহলে তুমি এত দিন আমার জন্যই—'

শেখর আবেগার্দ্র কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ তোমার জন্যই, আজ তা আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই সুকৃতি। তোমার জন্যই আমি ওসব করেছি। তোমার জন্য সব কবা যায়।'

সুকৃতি আস্তে আস্তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'যাই তোমার জন্য চা ক'রে নিয়ে আসি।'

চা আর খাবাব খেয়ে শেখর হঠাৎ বলল, 'ভালো কথা। একটু বেরুতে হবে আমাকে। মিঃ নন্দীর সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট আছে।'

সুকৃতি বলল, 'তিনি কে?'

শেখর বলল, 'ন্যাশনাল পাবলিশিং কোম্পানীর চেয়ারম্যান। ওঁদের একজন পাবলিকেশন এডিটরের দরকার। খানিকটা কথাবার্তা ওঁদেব সঙ্গে আগেও হয়েছে। যদি কাজটা হয়ে যায়, এখন যা মাইনে পাচ্ছি, তার দেড়গুণ বেশি ওখানে পাব। এতদিন যেভাবে চলেছে চলেছে। কিন্তু এখন তো আর ঠিক তেমন ক'রে চলতে পারে না। তোমার তো আর এত কষ্ট করার অভ্যাস নেই।'

সুকৃতি বলল, 'তা তো ঠিকই। কখন ফিরবে?'

শেখর বেরুতে বেরুতে বলল, 'বেশি দেরি হবে না। এই ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক হ'তে পারে। তাড়াতাড়িই ফিরব।'

দেড় ঘণ্টা নয় ফিরতে প্রায় দু' ঘণ্টাব মতই লাগল শেখরের। মিঃ নন্দী তেমন ভরসা দিতে পারেননি। আরো কিছুদিন বাদে আর একবার খোঁজ নিতে বলেছেন। তাঁর কথাবার্তায় শেখরের মন প্রসন্ন হয়নি।

বাসায় ফিরে তার মেজাজ আবো বিগড়ে গেল। সুকৃতি ঘবে নেই।

শেখর জিজ্ঞেস করল, 'ও কোথায় মা?'

সরোজিনী বিরক্ত স্বরে বলল, 'কি জানি বাপু। এই রাত করে ঘরেব বউ কোথায় কোন কেন্দ্রে না ফেন্দ্রে বেরুল। তার কথার ওপর কথা বলবে কে। যেমন পাশ করা মেম সাহেব বউ এনেছ ঘরে, তেমনি বোঝ মজা: মাত্র দু' দিন বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যেই এই? কত দেখব। তখন পই পই করে নিষেধ করলাম। শেখর ওসবে কাজ নেই, ওসব কি আমাদের ঘরে পোষায়—'

আধ ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে রইল শেখর। আর সরোজিনী সারাক্ষণ ছেলের নির্বুদ্ধিতার কথা বার বার উল্লেখ ক'রে নিজের কপালের দোষ দিতে লাগলেন। শহরে কি আর কোন মেয়ে ছিল না যে, তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা ধাড়ী, বিধবাকে—ছি ছি ছি। এক এক মিনিট যেন এক একটা যুগ। ন'টা বেজে গেল। তবু ফেরবার নাম নেই সুকৃতির। শেখর আর স্থির থাকতে পারল না, ক্রুদ্ধ, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল।

সরোজিনী বললেন, 'তুই আবাব যাচ্ছিস কোথায়?'

শেখর বেরুতে বেরুতে বলল, 'আসছি।'

হৃষীকেশ মৈত্রের বাড়ির এক তলায় সেই বিমল-সংস্কৃতি-কেন্দ্র। কর্ম পরিষদের মিটিং খানিকক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। সদস্যদের সবাই চলে গেছেন। লাইব্রেরী ঘরের কোণের দিকের টেবিলে কনুই চেপে গালে হাত দিয়ে গভীর ভাবনায় যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে রয়েছে সুকৃতি। পরনে সেই

রক্তাম্বর, সিঁথিতে সেই সিঁদুর-শোভা। আশ্চর্য ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শেখর আস্তে আস্তে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর রূঢ় স্বরে ডাকল, 'সুকৃতি।'

সুকৃতি যেন একটু চমকে উঠল, 'এই যে তুমি এসেছ।'

শেখর বলল, 'হ্যাঁ, আসতে হ'ল। কিন্তু আমার বারণ সত্ত্বেও তুমি যে এভাবে চলে এলে?'

সুকৃতি বলল, 'কি করব বল? তুমি কাজের জন্য আসতে পারলে না। আমিও যদি না আসি ওঁরা কি ভাববেন। তা ছাড়া কর্মপরিষদের কোন মিটিং-এ আমরা দুজনে অনুপস্থিত হয়েছি, এমন তো কোন দিনই হয়নি। আজই বা কেন তা হবে?'

শেখর কি বলবে হঠাৎ তা ভেবে পেল না।

সুকৃতি বলল, 'আমি এসে পড়ায় গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন কথাই আজ আর ওঠেনি। তোমার সেক্রেটারীগিরিও বজায় রয়েছে। আলোচনা যা হ'ল, তা সেই নৈশ বিদ্যালয়-সম্বন্ধে। অনেক গোলমালে প্রস্তাবটা এতদিন ধামাচাপা পড়ে ছিল। এবার কিন্তু তোমাকে উঠে পড়ে লাগতে হবে।'

শেখর স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি ঠাট্টা করছ সুকৃতি?'

সুকৃতি মাথা নেড়ে বলল, 'না, এতদিন সংস্কৃতি-কেন্দ্র নিয়ে ভিতরে ভিতরে তুমিই ঠাট্টা করছিলে। কিন্তু এখন তো সেই ছদ্মবেশের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন তোমাকে তোমার নিজের বেশে দেখব, সত্যিকারের কাজের ভিতর দিয়ে পাব।'

'কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার চল।'

সুকৃতি উঠে দাঁড়াল।

ফাল্গুন ১৩৫৭

দাম্পত্য

বীরেনদা আমার দূরসম্পর্কের মাসতুত ভাই। বয়সে বছর দশেকের বড়। কিন্তু বন্ধুত্ব আমাদের বয়সের ব্যবধান, দূর সম্পর্কের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিল। বছর পাঁচ ছয় আগে বীরেনদা আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমরা তখন মীর্জাপুর স্ট্রীটের একটা মেসবাড়িতে একই ঘরে পাশাপাশি থাকতাম। সাহিত্য, সমাজ, দর্শন নিয়ে ছাদে অনেক রাত অবধি আলোচনা করতাম। সব সময় মতের মিল হত তা নয়। কিন্তু সে অমিলে মনের মিল আটকাত না। অনেক সময় আলোচনার সুবিধার জন্য, বিতর্ককে বাড়িয়ে দীর্ঘ করবার জন্যই যে বীরেনদা বিরোধীপক্ষ সাজতেন তা আমি বুঝতে পারতাম।

ওঁর স্ত্রী আর মেয়েরা থাকতেন খুলনা জেলায় ওঁদের গ্রামের বাড়িতে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতেন বীরেনদা। এক একবার আমিও ওঁর সঙ্গে গেছি। বিরহের দিনগুলি বড় বড় আর ঘন ঘন চিঠিতে ভরে উঠত।

আমি মাঝে মাঝে হেসে বলতাম, 'ডাকখরচা না বাড়িয়ে, বউদিকে এখানে নিয়ে আসুন বীরেনদা। কলকাতায় বাসা করুন একটা।' বীরেনদা বলতেন, 'ক্ষেপেছ! স্থায়ী চাকরিবাকরি নেই। শহরে বাসা করে কি মরব? তা ছাড়া অত জড়ানো সংসার আমার স্বভাবে সয় না। এই বেশ আছি। নিজেকে মাঝে মাঝে ব্যাচিলর ভাবতে পারি। তোমাদের মত ব্যাচিলরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে পারি। বাসা করলে তা আর পেরে উঠব না।'

যুক্তিটা স্বার্থপরের মতই মনে হত আমার কাছে। মনে মনে ভাবতাম, বউদিরও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে। তাঁরও তো শহরে এসে বাস করতে ইচ্ছা করে। পাঁচজনের সঙ্গে মিলতে মিশতে, দেখতে শুনতে ইচ্ছা যায়! কিন্তু বীরেনদার অসামর্থ্যের কথা ভেবে চুপ করে থাকতাম।

বউদি কিন্তু চুপ করে থাকতেন না। বাসা করবার জন্যে চিঠিপত্রে প্রায়ই স্বামীকে অনুরোধ করতেন, অনুযোগ অভিযোগ জানাতেন। যখন দেখাসাক্ষাৎ হত তখনো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই একই কথা বলতেন, 'এখানে আমার আর ভালো লাগে না। দুটো কথা বলব এমন লোক নেই।

পাড়াপড়শী যে-কজন আছে সব কুটকচালে। কেবল নিন্দা-মন্দ, পরচর্চা। কিন্তু আমি নিজের জন্যে বলছি না নিমু-ঠাকুরপো, নিজের কথা আর ভাবিনে। যে লোকের হাতে পড়েছি তাতে নিজের ভবিষ্যৎ আমার আর জানতে বাকি নেই। আমি ভাবি মেয়েগুলির জন্য। দেখতে শ্রী তো এক-একটির ওই, তার ওপর যদি লেখাপড়াও একটু-আধটু না শেখে—বৈদ্যের মেয়ে—ওদের নেবে কে বল তো? ওদের গতি কি হবে?'

বীরেনদা বলতেন, 'বৈদ্যের মেয়েদের যদি বৈদ্যের ছেলেরা না নেয়, হাড়ি-ডোমের সঙ্গে বিয়ে দেব।'

বউদি রাগ করে বলতেন, 'তোমার মত বাপের ঘরে যখন ওরা জন্মেছে তখন সেই রকম গতিই ওদের হবে। কিন্তু হাড়ি-ডোমও নেবে না, তাদেরও ভালো মন্দ পছন্দ অপছন্দ আছে।'

তখন পর্যন্ত চারটি না পাঁচটি যেন মেয়ে হয়েছিল বীরেনদার; দেখতে দাদার মতই কালো। গড়নও ওই রকম লম্বা, পাকাটে, বীরেনদার মতই বড় চোয়ালে, জ্যামিতিক চতুর্ভূজের মত মুখের আদল।

বউদি ওদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, 'এও এক ভাগ্য, এতগুলি সন্তান হল, সবকটিই মেয়ে। চেহারাও সবকটির একেবারে বাপের মত। একটাও দেখতে শুনতে একটু অন্যরকম হতে পারত।'

বীরেনদা হাসতে হাসতে বলতেন, 'অন্যরকম পরীক্ষা-টরীক্ষা করে দেখলে তো অন্য রকম হবে। আমি বলি কি, সুন্দর সন্তানের যখন এতই সাধ তোমার, সেই চেষ্টাই একটু করে দেখ, তাতে যদি ফুটফুটে চেহারার ছেলেপুলে হয়। নিজে তো সুন্দরী ছিলে, কিন্তু শুধু তাতে যখন কুলোল না—'

আমার সামনেই এ ধরনের পরিহাস করায় বউদি শুধু লজ্জাতেই আরক্ত হতেন না, রাগেও রক্তবর্ণ হতেন, আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'শুনলে নিমু ঠাকুরপো, শুনলে? এমন মানুষের সঙ্গে কোন কথা বলা যায়, না এর সঙ্গে ঘরসংসার চলে?'

বীরেনদা বলতেন, 'আমিও তো তাই বলছি! মানুষ বদলাও।' বউদি এবার একটু হাসলেন, 'বদলাবার তুমি জো রেখেছ কিনা যে বদলাব? এতগুলি ছেলেপুলে হয়ে গেছে, বুড়ো হয়ে গেছি, এখন আমাকে নেবে কে!'

বীরেনদা অদ্ভুত একটু হাসতেন, 'যদি নিত তা হলে যেতে, না? কিন্তু কেবল তো আমার চেহারা নয়, স্বভাবচরিত্রও গোড়াতেই টের পেয়েছিলে, তখন গেলে না কেন? এখনও অবশ্য আশা ছাড়বার কোন কারণ নেই, হলই বা অতগুলি সন্তান, হলই বা বত্রিশ বছর বয়স, তোমাকে দেখে তো তা আর ধরা যায় না। একটু আঁটসাঁট ভাবে সেজেগুজে থাকলে দিব্যি পঁচিশ ছাব্বিশ বলেই চালিয়ে দেওয়া যায়। কি বল নির্মল, তা যায় না রমাকে?'

বীরেনদা সাধারণত স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকতেন না। ঠাট্টা-পরিহাস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সময়ই এমন করে স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করতেন।

এ কথার জবাবে রমা-বউদি বীরেনদার দিকে অপলকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতেন, 'এসো নিমু ঠাকুরপো। চা খাবে তো আমার রান্নাঘরে এসো। আমি এতদূর বয়ে আনতে পারব না।'

বছর পাঁচ ছয় আগে বীরেনদা শেষ পর্যন্ত কলকাতায় বাসা করলেন। মলঙ্গা লেনের পুরনো একটা দোতলা ভাড়াটে বাড়ির একতলায় ছোট ছোট দু'খানা ঘর।

জীর্ণ দেওয়াল থেকে অনবরত চুন-বালি ঝরে পড়ছে। স্যাঁৎসেতে মেঝে। ঘরে একটি করে দোর আর দুটি করে জানালা আছে। কিন্তু তা দিয়ে আলো-বাতাস যা ঢোকে তার চেয়ে সকাল-সন্ধ্যায় পাড়াপড়শীর উনানের ধোঁয়া আসে বেশি।

একদিন বীরেনদা নিয়ে গেলেন ওঁর বাসায়। রাত্রে খেতে বললেন। অনেকদিন বাদে রমা বউদির মন খুব প্রসন্ন দেখলাম। এতদিনে তাঁর স্বপ্ন যেন সার্থক হয়েছে। তিনি শহরে আসতে পেরেছেন।

বীরেনদা বললেন, 'আমাদের কলকাতা তো এই। আসবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলি কলকাতার মজা টের পাচ্ছে। দুটির জ্বর, একটার পেটের অসুখ, আর দুটির এখনো কিছু হয়নি, কিন্তু দুদিন বাদেই হবে।'

বউদি বললেন, 'হবে, আবার সারবেও। অসুখ-বিসুখ কি গ্রামে থাকতে হত না ?'

বীরেনদা বললেন, 'হত। কিন্তু বিনা ডাক্তার কবরেজ ওষুধ ইনজেকশনেই সারত। মার তুলসীপাতা আর শেফালী পাতার রসে তাঁর নাতনীদের সব ব্যাধিই আরোগ্য হত। এখানে কি আর তা হবে ?'

বললাম, 'মাসিমা বুঝি আসেননি ?'

বীরেনদা বললেন, 'না, এখনো আসেননি। কিন্তু না এসে কি আর ছাড়বেন ? বলে কয়ে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে তবে রেখে এসেছি। বুড়ো মানুষ, এই বদ্ধ ঘরে দম বন্ধ হয়েই মারা যাবেন। কিন্তু তাঁকে তা বোঝায় কার সাধ্য ! শেষ পর্যন্ত বলে এসেছি, তোমাকেও পরের বারে নিয়ে যাব ; তবে রয়েছেন। অথচ, সেখানে আর কিছু না হোক কাঁচামাটি আছে, আলো-হাওয়া আছে।'

রমা বউদি বললেন, 'কেবল আলো-হাওয়াটাই বুঝি সব ?' বীরেনদা তাঁর কথার জবাব দিলেন না, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেখানে থাকলে আরো দশটা বছর সুস্থভাবে বাঁচতে পারতেন—'

রমা বউদি বললেন, 'কোন রকমে বেঁচে থাকতে পারলেই যেন হল। মানুষের আর যেন কোন রকম সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকতে নেই, দুজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে নেই, ছেলেপুলেদের শিক্ষাদীক্ষার কথা ভাবতে নেই—'

বীরেনদা অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বললেন, 'বেশ তো, ভাবো না। বাধা দিচ্ছে কে ?'

বউদি বললেন, 'বাধা আর আবার কে দেবে ! তুমিই দিচ্ছ। তুমি আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষার শনি !'

কিন্তু শনির দৃষ্টির তলায় থেকেও বউদি তাঁর সাধ্যমত সাধ মিটিয়ে চলতে লাগলেন। বুলি টুনি আর রুণুকে কর্পোরেশনের ফ্রী প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। নিজে পছন্দ করে ওদের ফ্রক আর জুতো কিনলেন। নাপিত ডেকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ছোট মেয়েদের চুল হাল-ফ্যাশান মত ববছাঁটা করালেন। একদিন দেখলাম, নিজেও স্যান্ডাল পায়ে ড্রেস করে শাড়ি পরে কোথায় বেরোচ্ছেন। বললাম, 'কোথায় যাচ্ছেন, বাপের বাড়ি নাকি ?'

বউদির বাপের বাড়ি বেলেঘাটা। এর আগে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। কিন্তু সন্তানের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল তাঁর বাপের বাড়ি আসাও তত কমতে লাগল। ছোট বোনেরা বড় হয়েছে। বিয়ে-থার পর তাদেরও ছেলেপুলে হয়েছে। এখন তাদেরও আনতে হয় বাবাকে। বাবা ভদ্রতা করে কয়েকদিন রাখতে চাইলেও, বউদি নিজের বিবেচনা থেকেই থাকতে পারতেন না।

আমার কথার জবাবে বউদি বললেন, 'কেন, বাপের বাড়ি ছাড়া যাওয়ার আর বুঝি কোন জায়গা নেই ? তোমার মত কোন বন্ধু-টন্ধুর বাড়িও তো যেতে পারি।'

বউদি মুখ টিপে একটু হাসলেন।

বললাম, 'বেশখানা সেইরকমই করেছেন। সঙ্গে যদি মেয়েরা না থাকত, তা হলে তাই বিশ্বাস করতাম।'

বউদি বললেন, 'থাকলই বা ওরা সঙ্গে, তাতে কি হয়েছে ! যারা পারে তারা এসব সঙ্গে নিয়েও পারে। এসব বাধায় তাদের কিছু এসে যায় না। সবাই তো আর তুমি আর আমি আর তোমার দাদার মত নয়।'

বললাম, 'আবার আমাকে টানছেন কেন ! আমি কি দোষ করলাম।'

বউদি বললেন, 'দোষ করেছ বই কি। তোমরাই তো পরামর্শ দিয়ে দিয়ে দাদাটিকে অমন অকর্মা আর কাপুরুষ বানিয়ে তুলেছ।'

বললাম, 'বেশ তো, এবার তো আপনি কাছে এলেন। আপনি ওঁকে কতখানি কর্মী আর

বীরপুরুষ বানিয়ে তুলতে পারেন দেখব ।'

বউদি হেসে বললেন, 'সেই ইচ্ছাই তো আছে। এখন আমার কপাল ।'

এরপর বীরেনদা আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন । আমার মনে হল, বউদিই তা করালেন । চাকরির পরেও টুইশ্যন করে, লাইফ ইনসিওরেন্সের দালালি করে যাতে সংসারের আয় বৃদ্ধি হয় তার জন্য বারবার তিনি বীরেনদাকে প্রেরণা দিতে লাগলেন । দাদার কাছে সেটা তাড়নাই মনে হল ।

মেসে যখন আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতেন বেশির ভাগ সময়ই বীরেনদা স্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেন । 'স্থূল প্রকৃতির স্থূল রুচির মেয়েমানুষ । সংসারে খাওয়া-পরা ছাড়া আর কিছু চিনল না ।'

বলতাম, 'চেনার সুযোগ কোথায় বীরেনদা ? প্রাইম্যারি নিড্‌সগুলি তো আগে মেটা চাই ।'

বীরেনদা বলতেন, 'দেখ, ও একটা কথার কথা । নেহাতই বাজে অজুহাত । প্রাইম্যারি, সেকেন্ডারি কথাগুলি রিলেটিভ, আজ যা সেকেন্ডারি কালই তা প্রাইম্যারি হয়ে ওঠে । নীড্‌সকে প্রশ্রয় দিলে ওরা তোমার ঘাড়ে চাপবেই । চোখের উপর সেন্স অব ভ্যালুস দিনের পর দিন কি ভাবে বদলে যাচ্ছে দেখেছ তো ? কাল পাশের ঘরের ভাড়াটেদের সঙ্গে গিয়েছিল সিনেমায় । বাজে একটা ছবি । অত করে বারণ করলাম, তবু দেখা চাই, দেখবার লোভ যে ততটা আছে তা নয় । পাছে প্রতিবেশীরা মনে করে দেখবার পয়সা আমাদের নেই, সেই হল ভয় । মজাটা দেখেছ ?'

এমনি কথায় কথায় বউদির প্রসঙ্গ টেনে আনতেন বীরেনদা, তারপর শুরু হত স্ত্রীর অবাধ্যতা আর একগুঁয়েমির কাহিনী । সেই সঙ্গে সংসারের অভাব-অনটনের কথা । আমার ভালো লাগত না । একদিন স্পষ্টই বললাম, 'বীরেনদা, আসুন এবার অন্য কথা-টথা বলি । সংসারে স্ত্রী আর ছেলেপুলে তো শুধু আপনারই আছে এমন নয় । বেশ তো, খুব যদি অসুবিধা বোধ করেন, ওঁদের ফের দেশে পাঠিয়ে দিন না ।'

বীরেনদা বললেন, 'তার কি আর জো আছে ভাই । পাকিস্তান হওয়ার পরে মা পর্যন্ত এখানে চলে এসেছেন । ঘর তালাবন্ধ । বাড়িতে আর কেউ যাবেন না ।'

বুঝতে পারলাম, আমি অমন রূঢ় কথা বলায় বীরেনদা খুব আহত হয়েছেন । তিনি শীগগির আর এলেন না । আমিই একদিন গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ক্ষমা চাইলাম । বউদির সংসারের খোঁজখবর নিলাম । বুলি টুনিকে ডেকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করলাম । কিন্তু তেমন করে আর জমল না । প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যেই জোয়ার-ভাঁটা আছে । কি করে কখন যে সেই ভাঁটার টান শুরু হয়ে যায় তা টের পাওয়া যায় না । বীরেনদা যে মার্চেন্ট অফিসে ছিলেন সেটা ছাড়লেন, আবার আর একটায় ঢুকলেন । বছর দেড়েক বাদে আরও একবার চাকরি বদলালেন । বউদি আরও দুটি মেয়ের মা হয়েছেন খবর পেলাম । কিন্তু সবই যেন নেহাত খবর মাত্র । এদিকে নিজের সংসার নিয়ে আমাকেও ব্যস্ত থাকতে হল । মা আর ভাইবোনেরা থাকে ভাগলপুরে । কাকার কাছে । দেবর আর বউদির মধ্যে বনিবনাও হচ্ছে না অথচ পৃথক হয়ে যেতেও চক্ষুলজ্জায় বাধছে । কিন্তু ঝগড়াঝাটি থামছে না । মাঝে মাঝে আমাকে গিয়ে আপোষ মীমাংসা করে আসতে হচ্ছে । নিজের চাকরিবাকরি নিয়েও খুব যে সুখে আছি তা নয় । বীরেনদার সঙ্গে যোগাযোগ হ্রাস পেতে পেতে প্রায় বন্ধ হবার জো হল ।

এর মধ্যে বীরেনদা নিজেই এলেন একদিন আমাদের ব্যাঙ্কে । টাকা রাখতে নয়, চাকরির খোঁজে ।

বললাম, 'সে কি, আপনার আগের চাকরির কি হল ?'

বীরেনদা বললেন, 'সে গেছে । তোমাদের এখানে আছে নাকি কিছু খালিটালি ?'

বললাম, 'ক্ষেপেছেন ! এই তো মাসখানেক আগে ছাঁটাই হয়ে গেল ।'

বীরেনদা বললেন, 'তাই নাকি । আচ্ছা বলা রইল । যদি কোন সুবিধা সুযোগ পাও---'

বললাম 'নিশ্চয়ই, সে কি আপনাকে বলতে হবে বীরেনদা ।'

বীরেনদা একটু হাসলেন । বোধ হয় আমার প্রতিশ্রুতির কৃত্রিমতা তিনি টের পেয়েছিলেন । আমার মুখে যতখানি উৎসাহ ছিল, মনে ততখানি ছিল না সেটা বোধ করি তাঁর বুঝতে বাকি

থাকেনি।

কিন্তু বেশি উৎসাহ বেশি আশা-ভরসা আমিই বা তাঁকে কোত্থেকে দেব। নিজেরই কি তেমন সহায়-সম্পদ আছে ? নেই। তা ছাড়া বীরেনদারও দোষ যথেষ্ট। চাকরি করা ওঁর ধাতে নেই। মন দিয়ে কাজকর্ম করলেন না। এত বয়স হল, মন দিয়ে কোন কাজ শিখলেনও না, চিরকাল কেবল এড়িয়ে এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন। এমন কর্মভীরু লোক আমি আর দুটি দেখিনি। একটি মাত্র কাজে বীরেনদার উৎসাহ আছে—বাক্যে। তত্ত্বালোচনায়। বীরেনদা যখন বলেন কায়মন দিয়ে বলেন। একেবারে বাঙ্ময় পুরুষ। আমি এক-একদিন বলেছি, 'আপনি ফিলসফিতে এম্‌-এ-টা দিয়ে দিন! একটা প্রফেসারি-টারি যেমন করেই হোক জুটিয়ে নিতে পারবেন। সেই আপনার লাইন।'

বীরেনদা গভীর নৈরাশ্যে মাথা নেড়েছেন, 'তুমি বুঝি তাই ভেবেছ ? আমি মাস্টারি শুরু করলে ক্লাসে চেয়ার-বেঞ্চগুলি ছাড়া আর কিছু থাকবে না। সে চেষ্টাও করে দেখেছি।'

বলেছি, 'তা হলে এক কাজ করুন। আপনি যা বলেন-টলেন লিখতে থাকুন। একটু গুছিয়ে লিখলে সেগুলি চমৎকার সব গল্প প্রবন্ধ হবে।'

বীরেনদা হেসে ঘাড় নেড়েছেন, 'তা হয় না। কলমটা তো দুই ঠোঁটে চেপে লেখা যায় না, দুই আঙুলের মধ্যে রেখে লিখতে হয়। মুখের কথা মনের মত হয়ে কিছুতেই আমার কলমে আসে না নির্মল। যা আসে তাকে নিজের বলে চিনতে কষ্ট হয়। যা নিজের নয়, নিজের পছন্দমত নয়, তা কি করে ছাপব।'

এমন বন্ধুর জন্য শুধু দুঃখ প্রকাশ করা যায়, আর কিছু করা যায় না।

তাই, যখন বীরেনদার আত্মহত্যার সংবাদ আমি কাগজে পড়লাম, খুব বিস্মিত হলাম না। মানসিক অবলুপ্তি তাঁর আগেই ঘটেছিল। এবার দেহের বিলোপে সব শেষ হল।

মনে পড়ল অনেকদিন আগে তিনি বলেছিলেন, 'দেখ নির্মল, শুধু তোমরাই যে আমাকে অপছন্দ কর তাই নয়। আমিও করি। শুধু অপছন্দ নয়, ঘৃণা করি। নিজের অস্তিত্ব আমার কাছে অসহ্য। রমাই যে আমার চেহারাটা অপছন্দ করে তাই নয়, নিজের আকৃতিটাকে নিজেও আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে। একেকবার আমার ইচ্ছা হয় বিদেহী মন হয়ে সেই বায়ুভূত নিরাশ্রয় হয়ে বেঁচে থাকতে।'

বলেছিলাম, 'সে ভাবে থাকা যায় বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?'

বীরেনদা বলেছিলেন, 'না, বিশ্বাস ঠিক করিনে। কিন্তু কল্পনা করতে ভালো লাগে। কিন্তু যে মনের কথা বলি সেই মনই বা কি। তার কথাও তো না জানি এমন নয়। তা নিয়েই বা গর্ব করব, তাকেই বা সম্বল করব কোন্‌ মুখে। সে মনও তো এই দেহের মতই বিরূপ, বিকৃত। আমার আবার নতুন করে জন্মাতে ইচ্ছা করে নির্মল।'

বললাম, 'তাই জন্মান্‌। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তই তো মানুষ বার বার নতুন করে জন্মাতে পারে।'

বীরেনদা হেসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন, 'তা পারে কি না জানি না নির্মল। তবে কেউ কেউ খুব জোর গলায় সারমন দিতে পারে তা জানি।'

বীরেনদার মৃত্যুতে বিস্মিত হলাম না, আবার হলামও। ওঁর মত লোক আত্মহত্যা যদি করে সারাজীবন ভরে মনে মনেই করে। ট্রেন চাপা পড়তে গেলেন তিনি কোন্‌ সাহসে ? বোধ হয় বেকার জীবন আর মুখরা জীবনসঙ্গিনীই তাঁকে সেই সাহস জুগিয়েছে।

শোকের প্রথম বেগ উপশমিত হবার জন্য দিনকয়েক সময় দিয়ে মলঙ্গা লেনে রমা বউদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এর আগে অবশ্য আরো দু'একজন আত্মীয়-স্বজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, যে বীরেন দত্তগুপ্তের মৃত্যুসংবাদ কাগজে বেরিয়েছে তিনি আমাদেরই বীরেনদা।

মাসিমা দোরের কাছেই ছিলেন। আমাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওরে নিমু, কি দেখতে এলি রে, কি দেখতে এলি তুই, বীরু আমার সর্বনাশ করে গেছে। আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে গেছে রে।'

একটু বাদে মাসিমা খানিকটা শান্ত হলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বীরেনদা কেন এমন করতে গেলেন

মাসিমা, কেন হঠাৎ এমন—'

মাসিমা বললেন, 'কেন আবার, ঘরে যে রাক্ষুসী আছে তার জন্যে। দিনরাত কেবল খাই-খাই আর খাই-খাই। বলি, এখন খাচ্ছিস্ তো ? কোন্ আখার ছাই পোড়ামাটি খাবি এখন শুনি ?'

মাসিমা আরো খোলাখুলি ভাবে সব বললেন। চাকরি যখন ছিল তখনই অভাব অনটন নিয়ে সংসারে ঝগড়াঝাঁটির অন্ত ছিল না। চাকরি যাওয়ার পর তা আরো বাড়ল। এমন দিন যায়নি যেদিন স্বামীর অক্ষমতা নিয়ে রমা বউদি তাঁকে গঞ্জনা দেননি। কতদিন ঝগড়া করে না খেয়ে রয়েছেন বীরেনদা। কতদিন খেতে বসে চোখের জল ফেলে উঠে গেছেন। 'বলি, চাকরি কি লোকের যায় না, বেকার কি লোকে হয় না, কিন্তু এমনটা হয় কোন্ সংসারে ?' মাসিমা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, 'কিন্তু এসব তো ওঁদের গোড়া থেকেই ছিল। হঠাৎ মণিরামপুরের ওদিকেই বা কেন গেলেন, আর—'

মাসিমা বললেন, 'টাকার জন্যে সে কোথাই বা না যেত। বাসায় একটু কালও কি তার সুস্থ মত থাকবার জো ছিল। ঘরে বউ আর দোরগোড়ায় পাওনাদার। এদের জ্বালায় সে রাতদিন অস্থির হয়ে পৃথিবীময় ছুটোছুটি করে বেড়াত। মণিরামপুরে ওর এক বন্ধু আছে অসিত চাটুজ্যে। শুনেছি নাকি বড়লোক বন্ধু। বন্ধু নয় তো, শত্রু ! এত কাণ্ড হল, একবার দেখা পর্যন্ত করতে এল না। পাছে থানা পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হয়। বাছা আমার কিন্তু কাউকেই জড়িয়ে যায়নি। লিখে গেছে 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' আসলে যে দায়ী তার নাম কেন লিখে গেল না ! কেন ওই রাক্ষুসীর নামই পরিষ্কার করে লিখে গেলি না রে বাবা। তার যখন লজ্জাশরম নেই, তুই অত লজ্জা করতে গেলি কেন।'

মাসিমা ফের কেঁদে উঠলেন।

আমি কোন রকমে তাঁকে এড়িয়ে রমা বউদির ঘরে গেলাম। সাদা থানের আবরণের সম্পূর্ণ নিরাভরণা মূর্তি। মাথায় আঁচল নেই। আতেলা একরাশ চুল পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। যাঁকে বধূবেশে দেখেছি তাঁর এই রূপ যেন সহসা সহ্য করা যায় না।

আমি কিছু বলবার আগেই রমা বউদি বললেন, 'এই যে, এসো। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, তবু এই উপলক্ষে দেখা হল।'

রমা বউদি একটু হাসলেন।

আমি নীরবে তিরস্কারটুকু সহ্য করলাম।

রমা বউদি বললেন, 'তারপর—আছ কেমন ?'

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললাম, 'ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বাপের বাড়ি গেছেন। যান না। সেখান থেকে ঘুরে এলে—'

রমা বউদি বললেন, 'বাপের বাড়ি ? কেন, বাপের বাড়ি যাব কেন। সেখানে যেতে হলে আগেই যাওয়া উচিত ছিল। এখন যে দশা দেখছ সে বেঁচে থাকতে এর চেয়ে কি কিছু অন্যরকম ছিল। আমরা এখনো যা তখনো তাই। নতুন কিছু তো হয়নি নিমু ঠাকুরপো।'

বুঝতে পারলাম ফের বীরেনদার অক্ষমতার ইঙ্গিত দিচ্ছেন রমা বউদি। স্বামী বেঁচে থাকতেও খাওয়া পরা, সাধ আহ্লাদ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে তিনি যে বিধবার মতই ছিলেন এ কথাই বলতে চাইছেন রমা বউদি। কিন্তু ওঁর ভঙ্গিটা আমার ভালো লাগল না। যিনি চলে গেছেন তাঁর সম্বন্ধে একটু ভাবপ্রবণ হবেন এমনটাই যেন আশা করছিলাম রমা বউদির কাছ থেকে। সারা জীবনই তো স্বামীর অক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ করছেন, আজ তাঁর জীবনান্তে এ প্রসঙ্গ না হয় রমা বউদি নাই তুলতেন। মৃতের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম নেই ! কিন্তু দেখছি মেয়ে মানুষের আছে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'দুর্বলতা, অক্ষমতা পাপ। কিন্তু সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো তিনি করে গেছেন বউদি।'

রমা বউদির চোখ দুটো জ্বলে উঠল, 'করে গেছে ? কি বলছ তুমি নিমু ঠাকুরপো ! সে জীবন ভরে পাপ করেছে, মরে পাপ করেছে। আর তার সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য রেখে গেছে

আমাকে। কেবল কি আমি ? যাদের জন্ম দিয়ে গেছে ওই সাত সাতটা মেয়েকে পর্যন্ত তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না ? ওরা করবে ওদের ছেলেমেয়েরা করবে। শুনেছি খারাপ খারাপ অনেক রোগ আছে, তা এক পুরুষ থেকে আর-একপুরুষে যায়। কিন্তু অক্ষমতার ব্যাধি তার চেয়েও সাংঘাতিক।'

বললাম, 'সেই অক্ষম পুরুষ তো একমাত্র বীরেনদাই ছিলেন না বউদি। আমাদের দেশে আমাদের সমাজে বীরেনদা কি একজন ? যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আজ আছি তাতে দু'একজনই বরং বীরেনদা না হয়ে পারে, কিন্তু বাকি সবাইকে বীরেনদা হতে হয়। জনকয়েক মিলে আর-সবাইকে বীরেনদা হতে বাধ্য করে। অক্ষমতা অক্ষমতা করছেন ! যার যেটুকু ক্ষমতা সেটুকু বিকাশের, সেটুকু প্রয়োগের সুযোগ এখানে ক'জন পাচ্ছে ? যোগ্য ক্ষেত্র নেই বলেই তারা অযোগ্য।'

রমা বউদি এসব তর্ক আর আলোচনা এড়িয়ে বললেন, 'একটু বোসো নিমু ঠাকুরপো, চা করে নিয়ে আসি।'

বুঝতে পারলাম এ-ধরনের নৈর্ব্যক্তিক কিংবা বহুব্যক্তিক আলোচনার মধ্যে যাওয়ার হয় রমা বউদির সাধ্য নেই, না হয় ইচ্ছা নেই। তিনি একটিমাত্র ব্যক্তিকেই শুধু চিনেছেন। তাঁর অশেষ দুর্ভাগ্যের মূল কারণ হিসেবে তিনি সেই ব্যক্তি বিশেষকেই জানেন। আর কিছু জানতে চান না, আর কিছু মানতেও চান না।

রমা বউদি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছোট ছোট দুটি মেয়ে নিন্তি আর মিন্তি আমার কাছে এগিয়ে এল। এতক্ষণ মা ছিল বলে আসবার সাহস ছিল না।

নিন্তি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলল, 'রাঙাকাকু, আমাদের লজেন্স এনেছ ?'

লজ্জিত হয়ে বললাম, 'না, আর-একদিন আনব।'

অন্যান্যবার যখন আসি ওদের জন্য লজেন্স কি বিস্কুট কিছু নিয়ে আসি। আজ ওসব খেয়াল করিনি, তেমনি মনের অবস্থাও ছিল না।

বললাম, 'তোমার দিদিরা কোথায় গেছে ?'

মিন্তি বলল, 'বড়দি আর মেজদিকে দাদু এসে নিয়ে গেছেন। সেজদি ন'দিরা গলিতে খেলছে। গলিতে খেলা ভারি খারাপ, না রাঙাকাকু ?'

নিন্তি বলল, 'আচ্ছা রাঙাকাকু, ওরা তো গলিতে গেছে, বাবা গেছে কোথায় ? ঠাকুমা বলে, স্বর্গে গেছে।'

চায়ের কাপ হাতে রমা বউদি ঘরে ঢুকলেন, 'মিথ্যাকথা বলেন। নরকে গেছে।'

বললাম, 'ছিঃ বউদি !'

রমা বউদি বললেন, 'ছিঃ কেন। তোমাদের হিন্দু-শাস্ত্রেই তো আছে ওভাবে মরলে নরকে ছাড়া গতি হয় না। নিন্তি মিন্তি যা বাইরে খেল-টেল গিয়ে, যা। যা এখান থেকে।'

তাড়া খেয়ে মেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে চলে গেল।

রমা বউদি নিজের জন্যও এক কাপ চা নিয়েছেন দেখলাম। কাপে একটু চুমুক দিয়ে বললেন, 'এবার আমার জন্যে কোন একটা দাসীবাঁদীগিরির চেষ্টা দেখ, নিমু ঠাকুরপো। খেতে তো হবে, যে কুকুর-বিড়ালগুলিকে রেখে গেছে তাদের খাইয়ে বাঁচাতে তো হবে। কিছু যে করব তারও কি জো রেখেছে। বলব কি, একেবারে খোঁড়া বানিয়ে আমাকে রেখে গেছে ঠাকুরপো, অন্ধ করে রেখে গেছে। কথায় কথায় সেও খোঁটা দিত, তার মাও খোঁটা দেন—তোমার বড় বেশি আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কী ওরা দেখেছিল নিমু ঠাকুরপো।'

রমা বউদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকেই যেন জিজ্ঞেস করলেন কথাটা।

আমাকে নিরুত্তর দেখে নিজেই ফের বলতে লাগলেন, 'আমি কি তার কাছে গয়নাগাঁটি চেয়েছিলাম, বাড়ি গাড়ি চেয়েছিলাম ? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি নিমু ঠাকুরপো, তা চাইনি। চেয়েছিলাম শুধু মোটা ভাত আর মোটা কাপড়। তাও যখন জোটবার কোন লক্ষণ দেখলাম না তখন বললাম আমাকে কিছু শিখতে পড়তে দাও, মেয়েগুলিকে দেখবে কে। রোগা বুড়ো শাশুড়ীও

তা হতে দিলেন না। তাতে যে মান যাবে। বললাম আজকাল কত মেয়েরা লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করছে। বাপের বাড়ি থেকে তো কিছু শিখে আসতে পারেনি, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে গেল—'

বললাম, 'কত বছরে বিয়ে হয়েছিল ?'

রমা বউদি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, বোধ হয় ভাবলেন, এই সুযোগে আমি তাঁর বয়সের হিসাবটা জানতে চাইছি।

'কত আর, বছর পনের ষোল। অবশ্য, শিখলে কি শিখালে সেই বয়সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করে বেরুতে পারতাম। কিন্তু বাবার ওসব দিকে ঝোঁক ছিল না, ভাবলাম স্বামীর কাছে শিখব। এসে দেখলাম স্বামীও সেই রকম। উনিশ বছর যাবৎ বিয়ে হয়েছে, সে একটা অক্ষরও আমাকে শেখায়নি। বই নিয়ে নিজে দিনরাত পড়ে থাকত, কিন্তু আমাকে পড়াতে তার মন যেত না। স্বার্থপর, একান্ত স্বার্থপর আর আত্মসর্বস্ব লোক ছিল। সে আমাকে কিছুই দিয়ে যায়নি নিমু ঠাকুরপো, দিয়ে গেছে শুধু সাত সাতটা কুকুর বিড়াল। আচ্ছা করে আমার হাত পা বেঁধে রেখে গেছে।'

আস্তে আস্তে আমি চা শেষ করলাম। সারাক্ষণ মৃত স্বামীর নিন্দা-মন্দই করতে লাগলেন রমা বউদি। কোন একটা মমতার কথা শুনলাম না তার মুখে। স্বামীকে স্মরণ করে একবারও তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল না। উনিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে বীরেনদা কি তাঁকে একটু সোহাগ-আদরও করেননি ? প্রথম যৌবনের সুখস্মৃতির কথা একবারেও মনে পড়েনি রমা বউদির ? সেই স্নেহপ্রেমের অভাব চিরদিনের জন্য ঘটল সে দুঃখ কি ওঁর মনে একবারও জাগে না ?

আমি এমন আর দেখিনি। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

রমা বউদি বললেন, 'তাহলে দেখ একটু চেষ্টা চরিত্র করে। বাংলা লেখাপড়া মোটামুটি জানি, ইংরাজীও জানি একটু একটু। সেলাই-টেলাইয়ের কাজও জানা আছে। দেখ, যদি কোন সুবিধা-টুবিধা করে দিতে পার—'

বললাম, 'নিশ্চয়ই। সে কথা আপনাকে বলতে হবে না বউদি। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। বন্ধুবান্ধব সবাইকেও বলব। ভাববেন না, একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই।'

সদরের কাছে ফের মাসিমার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, 'আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি নিমু। হারামজাদীর মুখ তো নয়, আগুন ! সে বেঁচে থাকতেও তাকে দগ্ধে মেরেছে, এখন মরে যাওয়ার পরেও রাক্ষুসী তাকে রেহাই দিচ্ছে না ! মুখ দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ওর এমনি কেবল আগুনই বেরুচ্ছে। যে শুনছে সেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁরে নিমু, মরা মানুষের উপর কারো রাগ থাকে ?'

আমি কোন জবাব দিলাম না।

মাসিমা বললেন, 'ওর চোখে এক ফোঁটা জল দেখলি ? আজ তো তবু সাতদিন হয়ে গেল, প্রথম যেদিন খবর এল, একটু বাদে বীরুকে নিয়ে এল ওরা, সেদিনও রাক্ষুসী কাঁদেনি। কাঁদবে কি, ও তো জানে ওর জন্যেই সে গেছে। ওই তো ঠেলে মরণের মুখে পাঠিয়েছে তাকে। পাড়াপড়শীরা পর্যন্ত চোখের জল ফেলেছে, বীরু আমার এত ভালোমানুষ ছিল। কোনোদিন কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ তো দূরের কথা মন কষাকষি পর্যন্ত হয়নি। কেবল ও-ই তাকে দু'চোখে দেখতে পারত না, আর সবাই পারত। সবাই ভালোবাসত।

বললাম, 'তা তো বাসতই।'

মাসিমা বললেন, 'কিন্তু ও হারামজাদী বাসত না। গোড়া থেকেই ওর কুনজরে পড়েছিল। কি বিষই যে আমি ঘরে এনেছিলাম। সেই বিষে বিষেই সে আমার শেষ হয়ে গেল। না দেখতে পারলি, না ভালোবাসলি, তবু তো একসঙ্গে এতকাল ঘরসংসার করেছিস ! তার জন্যেও তো একটা মায়ামমতা হয়। কিন্তু বলব কি নিমু, ও একেবারে নিষ্ঠুর পাষাণ। একফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলল না। শুনেছি ঘরের পরিবারের চোখের জলে আত্মা শান্তি পায়, তার তাপ জুড়োয়। কিন্তু এমন কালসাপিনীকেই ঘরে এনেছিলাম—'

মাসিমা ফের কেঁদে উঠলেন।

রমা বউদির জন্য সাধ্যমত খোঁজখবর করতে লাগলাম। কিন্তু তেমন সুবিধা হয়ে উঠল না। ভাবলাম একটা সিঙ্গার মেশিন আর কিছু ছিট কাপড় ওঁকে কিনে দেব। কিন্তু নিজের তহবিলে যা আছে তাতে ওটুকুও কুলোয় না। আর কার কাছে হাত পাতা যায় ভাবছি, হঠাৎ আমার মেসের ঠিকানায় নীল রঙের এনভেলপের একখানা চিঠি এল।

রুম-মেট শৈলেশ চিঠিখানা হাতে করে এনে হাসতে হাসতে বলল, 'ব্যাপার-কি, আমাদের ঋষ্যশৃঙ্গ নির্মল সেনের নামে মেয়েলী চিঠি! ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে না কি?'

বললাম, 'ডুবলে জল তো কিছু পেটে যায়ই।'

উপরের হাতের লেখা দেখে ঠিক আন্দাজ করতে পারলাম না! যে দু'একটি মেয়েলী লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এ লেখা সে সব হাতের নয়। গোটা গোটা সুন্দর বাংলা অক্ষরে আমার নামাঙ্কিত খামের কিনারাটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠি খুলে তাড়াতাড়ি স্বাক্ষরকারিণীর নাম দেখে নিলাম। রমা দত্তগুপ্তা।

এবার নীল রঙের খামের হেতু বুঝলাম। অনেক দিনের পুরনো খাম। বীরেনদা এ ধরনের নীলাভ রঙের খাম ভালোবাসতেন। বুড়ো বয়স পর্যন্তও রঙীন খামে চিঠি লিখতেন। বউদির চিঠি কদাচিৎ কখনো আসত। তাও এই নীল রঙের খামে। খামগুলি বীরেনদাই তাঁকে কিনে দিয়ে আসতেন। জীবনে তাঁর আর তো কোথাও রঙ ছিল না, সমস্ত গোপন রঙ যেন শুধু চিঠির খামে আর চিঠির ভাষায় গিয়ে জড়ো হয়েছিল।

রমা বউদির চিঠির পাতাও নীল রঙের। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বীরেনদার কিনে দেওয়া চিঠির প্যাড আর খামে তাঁর মারা যাওয়ার দু'দিন বাদে রমা বউদি আমাকে চিঠি লিখছেন! বীরেনদা বেঁচে থাকতে একখানা চিঠিও রমা বউদির পাইনি। আজ কী লিখেছেন রমা বউদি?

'কল্যাণীয়েষু

নিমু ঠাকুরপো, ভেবেছিলাম চিঠিতেই সব কথা জানাতে পারব। এত চেষ্টা করলাম পারলাম না। তুমি এসো। চিঠি পাওয়ামাত্রই চলে এসো। সাক্ষাতেই সব বলব। বলা আমার পক্ষে কঠিন হবে। তবু তোমাকে না বলে উপায় নেই। ইতি।'

শৈলেশ আমার হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে সবটা পড়ে একটু মুচকে হেসে বলল, 'কি ব্যাপার! তোমার এই সোহাগিনী বউদিটি কে হে নির্মল? বিষয়টা যেন বড়ই জটিল জটিল লাগছে?'

শৈলেশ আরো কি বলতে যাচ্ছিল, আমি তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা আমার কাছেও বড় জটিল লাগছে। তবু চিঠি পাওয়ামাত্রই যেতে পারলাম না, অফিসের বেলা হয়ে গিয়েছিল। ছুটির পরে সন্ধ্যার দিকে গেলাম মলঙ্গা লেনে।

রমা বউদি বললেন, 'এসো।'

ঘর থেকে আজও মেয়েগুলিকে বের করে দিলেন, ঘরে আলো জ্বালালেন না, তক্তপোশের এক কিনারে গিয়ে চুপ করে রইলেন।

আমি আরো ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কি? হঠাৎ অমন মারাত্মক চিঠি লিখতে গেলেন কেন?'

রমা বউদি কি যেন ভাবছিলেন, এবার আমার গলা শুনে একটু হাসলেন, 'মারাত্মক! ও তুমি বুঝি অন্যরকম কিছু মনে করে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছ। তা লিখলামই বা এক-আধখানা মারাত্মক চিঠি। কাউকে তো লিখিনি। না হয় তোমাকেই লিখলাম।'

বললাম, 'ঠাট্টা থাক্। ব্যাপার কি বলুন।'

রমা বউদি ফের একটুকাল মুখ নীচু করে রইলেন, তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা তুমি যা ভেবেছ তার চেয়েও মারাত্মক। আমি আবার—আমি আবার—সে আমার আবারও সর্বনাশ করে গেছে নিমু ঠাকুরপো—'

আমি একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তারপর চেষ্টা করেও কিছু একটা বলতে পারলাম না।

রমা বউদি বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম অন্য কিছু। এ-রকম অনিয়ম আমার মাঝে মাঝে হয়। তারপর ভাবলাম টিউমার-টার, কারণ তাও একবার হয়েছিল। কিন্তু এবার যে এই সর্বনাশ এসেছে ধারণাই করিনি।'

এবার সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা এল আমার বীরেনদার ওপর। এ কি অসংযম ! আমি অকৃত্রিম আত্মসংযমের কথা বলছি না, কিন্তু আজকাল তো জন্ম নিয়ন্ত্রণের কত কৃত্রিম ব্যবস্থাই হয়েছে, বীরেনদা কি তা জানতেন না ? তিনি সবরকম খোঁজখবরই যখন রাখতেন এটাও তাঁর না জানবার কথা নয় ; না কি ওঁদের ভিতরে গভীর প্রেমের অভাব ছিল বলে, পরস্পরের শিক্ষা আর রুচির ব্যবধান ছিল বলে ওঁরা দৈহিক মিলনে সামান্যতম ব্যবধানও মানতে চাইতেন না, শুধু দেহের ভিতর দিয়ে ওঁরা পরস্পরের মনকে ছুঁতে চাইতেন, মনকে পেতে চাইতেন ? মনে পড়ল স্বজনবন্ধুদের মধ্যে আমি এমন আরো দু'একজনকে দেখেছি। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মনের মিল যত কম, দেহের মিলনাকাঙ্ক্ষা তত বেশি, সন্তান সংখ্যা তত প্রচুর। নিজে দাম্পত্য জীবনের রহস্য জানি না, কিন্তু অবস্থাটা আমার কাছে ভারী অদ্ভুত এমন কি অসহনীয় মনে হয়। মৃত বলেও বীরেনদাকে আমি আজ কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলাম না। কেমন একটা অস্বস্তিই যেন বোধ করতে লাগলাম, যেমন প্রেতের কল্পনায় করে থাকি।

আর একটা কথা গোপন করব না। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিতে রমা বউদিও যে আমার অংশভাগিনী একথা জেনে খানিকটা যেন স্বস্তি পেলাম।

একটু বাদে রমা বউদি বললেন, 'আর কাউকে বলতে পারব না বলেই তোমাকে ডেকেছি। তুমি আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও নিমু ঠাকুরপো।'

চমকে উঠে বললাম, 'আমি ? আমি কি ব্যবস্থা করব ? এ আপনি কি বলছেন !'

রমা বউদি বললেন, 'সে যে প্রতিশোধ নিয়ে গেল, আমি তার ওপর শোধ তুলব না ! আমি কিছুতেই তার কাছে আর একবার জব্দ হব না। জীবনে সাত-সাতবার হয়েছি। আর নয়। এই উপকারটুকু তুমি আমার কর ঠাকুরপো। সেই জন্যেই তোমাকে আজ ডেকে এনেছি।'

বললাম, 'ছিঃ, কি বলছেন আপনি !'

রমা বউদি বললেন, 'ঠিকই বলছি। সাতটাই তো ভাতে মরবে। আবার আর একটাকে কেন। ওটা তার আগেই যাক। পরিণামটা একবার ভেবে দেখ তো।'

তাঁর হাত এড়িয়ে আমি সেদিনের মত বিদায় নিলাম। কিন্তু রমা বউদি বার বার করে আমাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'তুমি বুঝতে পারছ না, এ নিয়ে আমি যে পরের দুয়ারে খেটে খাব, তা-ও পারব না। আর ক'টাকে বাঁচাবার জন্যই আমাকে এ ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্যে আমি যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজি। আর, সব যায় সেও ভালো।'

রমা বউদি তাঁর বাক্স খুলে তাঁর সর্বশেষ দু'তিনখানা গয়না বের করলেন।

'এই নাও নিমু ঠাকুরপো। এই নিয়ে তুমি আমাকে উদ্ধার কর। আমি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছি না।'

অনেক কষ্টে রমা বউদিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেদিন নিরস্ত করলাম।

চাকরি-বাকরির তেমন ঠিক সুবিধা হল না। তবু ব্যবস্থা করতেই হল। রমা বউদিকে সেলাইয়ের কল কিনে দিলাম। কর্পোরেশন স্কুলে একটা টিচারির জন্যও চেষ্টা চলতে লাগল। ইনফ্যান্ট ক্লাসে রমা বউদি ভালোই পড়াতে পারবেন।

সেক্রেটারী পাড়ারই লোক। জেনেছেন শুনেছেন, বললেন, 'কিছু দিন বাদে ওঁকে তো ছুটি দিতে হবে। তার চেয়ে একেবারে ওসব ঝামেলা চুকালে বরং তিনি জয়েন করবেন, সেই ভালো।'

শুনে ফের রমা বউদি আফশোস করতে লাগলেন, 'পরম শত্রু আমার হাত পা এমন করে বেঁধে রেখে গেল, যাবার আগেও সে শত্রুতা করতে ছাড়ল না। আমি এখন করব কি।'

এর পরের দু মাস রমা বউদির একটানা কৃচ্ছ্রসাধন আর মৃত স্বামীর উদ্দেশে গালি-গালাজ আর

কটূক্তি বর্ষণের কাহিনী। ওঁর শরীর ভেঙে পড়ল, মন অবসাদগ্রস্ত হল। শেষ দিকে আমি আর যেতাম না। দূর থেকে যতটুকু পারি সাহায্য করতাম। হাসপাতালে ব্যবস্থা অবশ্য ওর বাবাই করলেন।

খবর পেয়ে আমি গেলাম দেখা করতে। ওঁর বাপের বাড়ির লোকেরা আগের দিনে এসেছিলেন। আজ আর তাঁরা আসেননি।

রমা বউদিকে একাই পাওয়া গেল, তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো।'

লক্ষ্য করলাম কৃশ আর রুগ্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

শিশু খুব কাঁদছিল বলে নার্স তাকে খানিকক্ষণের জন্যে মার কাছে রেখে গেল।

রমা বউদির কোলে অত্যন্ত রোগা লালচে রঙের শিশুটির দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ মেয়ের মুখ চোখ বোধ হয় বেশ চোখাচোখা হবে বউদি।'

রমা বউদি আমার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসলেন, 'মেয়ে কে বলল তোমাকে ? ছেলে।' বলে মুখ ফেরালেন রমা বউদি।

বুঝতে পারলাম, আমি ভুল শুনেছিলাম, কিংবা কি শুনেছিলাম খেয়াল করিনি। বললাম, 'তাই নাকি ?'

রমা বউদি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। কোন জবাব দিলেন না। দেখলাম ওঁর বড় বড় সুন্দর দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে।

বললাম, 'কাঁদছেন কেন রমা বউদি, হয়েছে যখন একটা ব্যবস্থা হবেই। যেমন করে হোক চলে যাবেই। আপনি ভাববেন না।'

রমা বউদি বললেন, 'সে কথা আমি ভাবছিনে নিমু ঠাকুরপো।'

বললাম, 'তবে ?'

রমা বউদি একটুকাল চুপ করে রইলেন। কিসের একটা আরক্ত আভা তাঁর রুগ্ন ফ্যাকাশে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

রমা বউদি মৃদু স্বরে বললেন, 'তার অনেক দিনের সাধ ছিল এ জিনিস দেখবে। দেখে যেতে পারল না। কেন অমন করে গেল, কেন অমন করে সে চলে গেল ঠাকুরপো ?'

রমা বউদির দু'চোখ বেয়ে এবার জলের ধারা নামল।

চৈত্র ১৩৫৭

অপঘাত

সারা মহকুমা শহরটি সরকারী হাসপাতালের সমুখে এসে ভেঙে পড়ল। একটু আগে খবর পাওয়া গেছে ভুখ মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে যারা গুরুতর রকমে জখম হয়েছিল তাদের মধ্যে হরপ্রসন্ন হাই স্কুলের মাস্টার সুধীর দাসের স্ত্রী, বেলা দাস মারা গেছেন। আরো দু'তিনজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

বহু লোক জোর করে হাসপাতালে ঢুকে পড়তে চাইছিল। অনেক কষ্টে পুলিশ পাহারায় সরকারী কর্মচারীরা তাদের বাধা দিয়ে রেখেছে।

কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সবিনয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন।'

জনতার ভিতর থেকে অনেকগুলি অসহিষ্ণু কণ্ঠ শোনা গেল, 'ধৈর্য। এর পরেও ধৈর্য ধরতে বল তোমরা ! লজ্জা করে না।'

'লজ্জা বলতে ওদের কিছু আছে নাকি ?'

এবার সরকারী হাসপাতালের সবচেয়ে বড় ডাক্তার এগিয়ে এসে অনুনয় করে বললেন, 'আপনারা যদি এখানে গোলমাল করেন, আহতদের চিকিৎসার অসুবিধা হবে। দয়া করে একটুকাল অপেক্ষা করুন আপনারা। যা যা দাবী করা হয়েছে সবই গভর্নমেন্ট মেনে নেবেন। খানিক বাদে

সবাইকেই ভিতরে আসতে দেওয়া হবে। শহীদদের শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রায়ও গভর্নমেন্ট বাধা দেবেন না। কিন্তু একবার আমাদের শেষ চেষ্টা করতে দিন। দেখি এদের বাঁচিয়ে তোলা যায় কিনা।'

জনতার ভিতর থেকে ফের ব্যঙ্গমিশ্রিত মন্তব্য শোনা গেল। 'গুলি করে লাঠি মেরে মানুষকে বাঁচাতে চাও তোমরা। আহাহা, বাঁচাবার কি ওষুধই না বের করেছ।'

ডাক্তার অবিচলিতভাবে বললেন, 'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

পিছন থেকে কার যেন গলা শোনা গেল, 'কিন্তু নাভিশ্বাসের বেলায় সে কথা খাটে না।'

এবার সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

বিমূঢ় অভিভূত সুধীর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করছিল, ফার্স্ট ক্লাসের একটি লম্বাপানা ছাত্র এসে বলল, 'এই যে মাস্টারমশাই আপনি এখানে। আমরা অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি। আপনার মা আপনাকে বাসায় যেতে বলেছেন। ছেলেমেয়েরা ভারি কাঁদাকাটি করছে। আপনার মা কিছুতেই তাদের সামলে রাখতে পারছেন না। যা হবার তা তো হয়েছে। আপনি বাসায় যান। ওদের দেখুন গিয়ে। বেলাদির জন্য আমরা এখানে রইলাম।'

ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত আরো কয়েকজন ভদ্রলোক সুধীরকে বাসায় যেতে অনুরোধ করলেন।

সুধীর আস্তে আস্তে বাসার দিকে এগিয়ে চলল, জন দুই ছাত্র তার সঙ্গে আসতে চাইছিল, সুধীর তাদের দিকে ফিরে বলল, 'আমি একাই যেতে পারব। তোমাদের আর আসাব দরকার নাই।'

হাসপাতাল, আদালত, হাইস্কুল ছাড়িয়ে, বাজার, পোস্ট অফিস, থানা পার হয়ে শহরের একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে সুধীরের বাসা। শহরের সমস্ত লোক রাস্তায় নেমেছে। মেয়ে পুরুষ সবাই এগিয়ে চলেছে হাসপাতালের দিকে, যেতে যেতে সুধীরকে অনেকেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্ত্রীর খবর কি মশাই ?'

সুধীর কখনও ঘাড় নেড়ে কখনও সংক্ষেপে জবাব দিতে দিতে চলল, 'হয়ে গেছে।'

একজন বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'আহাহা ! এসব খুনের দল কোত্থেকে এল বলুন তো ?'

সুধীর কোন কথা বলল না।

কে একজন জবাব দিল, 'আসবে আবার কোত্থেকে, এরা নাকি এদেশেরই।' আর একজন বলল, 'এরা সব সেকেলে স্বদেশী।'

সুধীর নীরবে এগিয়ে চলল।

পুরোন একতলা বিবর্ণ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই সুধীরের বুড়ো মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, 'আমার কি সর্বনাশ হল রে। ওরে কি সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। ডাকাতরা আমার ঘরের লক্ষ্মীকে খুন করে ফেলল। এখন এই দুধের বাচ্চাগুলিকে আমি বাঁচাব কি করে !'

চারটি ছেলে মেয়ে একটু বুঝি শান্ত হয়েছিল। ঠাকুরমাকে গলা ছেড়ে কাঁদতে দেখে এবার তারাও ফের চেঁচিয়ে উঠল।

পাঁচ বছরের মেয়ে টুনি সুধীরের কাছে দাবী করল, 'মা কোথায়, মাকে কোথায় রেখে এলে বাবা। তাকে নিয়ে এসো।'

তিন বছরের বিস্তু বায়না ধরল, 'আমি মার কাছে যাব, বাবা আমি মার কাছে যাব।'

জনকয়েক প্রতিবেশীর বউ এসে ওদের শান্ত করতে চেষ্টা করল।

পাশের বাসার বিনোদ উকিলের মা বিন্দুবাসিনী সুধীরের মাকে বললেন, 'আপনি নিজেই যদি এমন অস্থির হয়ে পড়েন দিদি ওদের সামলাবে কে ? যান, ছেলে এসেছে। এবার সবাইকে নিয়ে ঘরে যান।'

সুধীরের মা সৌদামিনী ফের কেঁদে উঠলেন, 'ঘর কোথায় দিদি, কোন মুখে আর গিয়ে উঠব সেখানে। সর্বনাশী যে আমার সমস্ত ঘর সংসার জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কি দরকার ছিল, কি দুঃখ ছিল তোর। রোজগেরে স্বামী, সোনার চাঁদ সব ছেলে মেয়ে। এদের ফেলে কেন তুই রাস্তায় বেরোলি।

মেরেছে বেশ করেছে। এমন দস্যি বউকে মারবে না, ছেড়ে দেবে তারা ? যে বউ ঘর ছেড়ে স্বদেশী করতে বেরোয় সে আবার বউ। খুন করেছে বেশ করেছে, আমি খুশি হয়েছি।'

বিন্দুবাসিনী বললেন,—'আঃ দিদি, থামুন, থামুন। পাগল হয়ে গেলেন নাকি আপনি !'

সৌদামিনী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সুধীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব ওর দোষ। সব আমার এই কপালের দোষ। সব আমার ওই মেনিমুখো হারামজাদার দোষ। ও কি পুরুষ। ও যদি পুরুষ হত তাহলে কি ওর ঘরের বউ এমন করে মিছিলে বেরোয়। তাহলে কি ওর ঘরের বউকে পরে এসে লাঠি মারতে পারে ?'

সুধীর এগিয়ে এসে মার হাত ধরল, তারপর বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে আর নয়, চল, ঘরে চল মা।'

সৌদামিনী বললেন, 'না যাব না। আমি আর ওঘরে যাব না, নিজের বউকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারলিনে, আর আমাকে তুই ঘর দেখাচ্ছিস। আমি কোন মুখে ঘরে যাব। আমি তোকে গোড়া থেকে বলিনি, পই পই করে নিষেধ করিনি, সুধীর বউয়ের লাগাম অমন করে ছেড়ে দিসনি। আমি তোকে বারবার সাবধান করে দিইনি সর্বনাশী একটা কিছু ঘটাবে। অপঘাত মৃত্যুই টানছে সর্বনাশীকে। যারা একবার অপঘাতে মরবার চেষ্টা করে, মরতে মরতে তারা অপঘাতেই মরে। গলায় দড়ি তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় আমি বলিনি তোকে ? আমার কথা তো তুই শুনলিনে—'

প্রতিবেশীরা এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। সুধীরের আর সহ্য হল না। জোর করে মাকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল, ছেলেমেয়েরা গেল পিছনে পিছনে।

ওদের দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সুধীর।

বেলার নিজের হাতে সুন্দর করে গুছানো ঘর ঠিক তেমনি করে গুছানো রয়েছে। দুরন্ত ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত আজ কোন কিছু ধরে টানাটানি করতে সাহস করেনি। দড়ির আলনায় বেলার খান দুই পুরোন শাড়ি ঝুলানো রয়েছে, তার নীচে ছোট র‍্যাকটিতে সুধীরের বইপত্র গুছানো। বইগুলি শুধু সুধীরের নয়, অবসর সময়ে আজকাল বেলাও নিয়ে পড়ত। ঘরের তিন দেওয়ালে দুটি করে তাক। পৈতৃক আলমারীটা দুর্ভিক্ষের বারে বিক্রী করে দিয়েছিল সুধীর। তারপর আর কিনতে পারেনি। খোলা তাকগুলিকে দিয়েই আলমারীর কাজ চালাতে চালাতে কতদিন কত বক বক করেছে বেলা। কিন্তু কোন জিনিসই অগোছালো রাখেনি। গোটা পাঁচেক আচারের বৈয়ম, ডজন খানেক কাঁচের গ্লাস, জলের কুঁজো, বাইরের কোন অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের জন্য রঙীন প্ল্যাস্টিকের একটু সৌখীন ধরনের কিছু চায়ের কাপ-ডিস, সংসারের আরো অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস নিজের হাতে সযত্নে গুছিয়ে রেখে গেছে বেলা। পশ্চিমের দেওয়ালে ওপরের তাকে বেলার আয়না, চিরুনী, সিন্দূর কৌটা, নিঃশেষিত প্রায় স্নোর শিশি আর পাউডারের বাটিটাও রয়েছে। চিরুনীর ডগায় একটুখানি সিন্দূর লাগানো। মিছিলে বেরুবার আগে বোধ হয় সিঁথিতে একটু সিন্দূর লাগিয়ে গিয়েছিল বেলা। সীমন্তে সিন্দূর পরতে পরতে একবার হয়ত ওর মনে হয়েছিল সুধীরের কথা।

দিন কয়েক আগে বেলাকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিন্দূর পরতে দেখে সুধীর বলেছিল, 'তুমি তো আজকাল রীতিমত আধুনিকা, রাজনীতি রঙ্গিনী। সিন্দূরের রঙের তোমার আর দরকার কি, সিন্দূর পরবার অত ঘটা কেন তোমার ?'

মৃদু হেসে বেলা ঘাড় ফিরিয়েছিল, 'সিন্দূর কি আমি নিজের জন্যে পরি নাকি ?'

'তবে কার জন্যে ?'

বেলা বলেছিল, 'সিন্দূর মেয়েরা কার জন্যে পরে জানো না। সিন্দূরে পুরুষের আয়ুবৃদ্ধি।'

সুধীর বলেছিল, 'আর মেয়েদের বুঝি কিছুই বাড়ে না ?'

কাজের অত তাড়ার মধ্যেও বেলা সিঁথিতে সিন্দূর ছোঁয়াতে ভুলে যায়নি। সুধীরের ভাবতে ভালো লাগল।

সব ঠিক তেমনি আছে। ঘরের চেহারার কোন কিছুরই বদল হয়নি। এমন কি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়া লোহার সেই হুকটা পর্যন্ত অক্ষয় অক্ষত হয়ে রয়েছে। এই হুকে শাড়ি পাকিয়েই সেবার

গলায় ফাঁস এঁটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল বেলা। সেই প্রথমবার অপঘাতে মরতে গিয়েছিল।

সেই তেরশ পঞ্চাশ সনের কথা। সাত সাতটা বছর কেটে গেছে তারপর। কিন্তু সেই বিভীষিকা ভরা অন্ধকার রাতটার কথা সুধীর আজও ভুলতে পারেনি। সে স্মৃতি কি ভুলবার ?

দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ লেগেছে। ষাট টাকা দরে বিক্রী হচ্ছে চালের মণ। কিন্তু অত চড়া দামেও কেউ আর চালের নাগাল পাচ্ছে না। সব নাকি কালো বাজারে অদৃশ্য হয়েছে। সুধীরদের শহরের মুদি দোকানগুলিও চাল আটা শূন্য। বাজারে একটা ক্ষুদ পর্যন্ত কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। শহর ভরে হাহাকার উঠেছে। শহরতলীর মুচি মুদ্দফরাসের দল বেশির ভাগই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। যারা আছে তারাও কচু সেদ্ধ, সাপলা সেদ্ধ খেয়ে কলেরায় প্রায় সাফ হবার জো হয়েছে। কেরানী আর মাস্টারদের পাড়াতেও সেই দশা। দু'বেলা দু'মুঠো জুটছে এমন লোকের সংখ্যা কম।

'কিন্তু তাই বলে তোমার মত কেউ নয়, কোন ভদ্রলোক ছেলেপুলে নিয়ে তোমার মত এমন উপোস করে নেই,' কটু কণ্ঠে স্বামীর মুখের উপর সেদিন বলেছিল বেলা।

সুধীর জবাব দিয়েছিল, 'সাধ করে কি আর উপোস করে আছি। না মিললে করব কি, দেশশুদ্ধ লোকেরই তো এই দশা।

বেলা বলেছিল, 'দেশের খবর আমি জানতে চাইনে। যেমন করে হোক কয়েক সের চাল আমার চাই। চোখের সামনে ছেলে মেয়ে দুটো শুকিয়ে মরবে তা আমি দেখতে পারব না।'

সুধীর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'তা দেখতে না পার চোখ বুজে থাক। এক বেলা না খেয়ে থাকলেই তোমার ছেলে মেয়ে যদি মরে মরুক।'

'এ কথা তুমি বলতে পারলে ? বাপ হয়ে এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না ?'

'এ লজ্জা আজ দেশশুদ্ধ বাপের। আমার একার নয়, বেলা।'

বেলা তিক্ত কণ্ঠে বলেছিল, 'কেবল দেশ আর দেশ। দেশের দোহাই দিয়ে নিজের অক্ষমতা ঢেকে রাখবে বুঝি ভেবেছ ?'

সুধীর বলেছিল, 'তোমার ক্ষমতার বহরটাও সেই সঙ্গে দেখতে পারব।'

বলে সুধীর লংক্লথের পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

সৌদামিনী পিছন থেকে ডেকে বলেছিলেন, 'এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় চললি তুই।'

সুধীর মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিয়েছিল, 'যমের বাড়ি।'

যমের বাড়ি নয়, চালের আড়তদারের বাড়ি থেকে বিয়ের আংটি বিক্রি করে কুড়ি টাকায় দশ সের চাল সংগ্রহ করে রাত গোটা দশেকের সময় ঘরে ফিরে এসেছিল সুধীর। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর সৌদামিনী এসে সদর খুলে দিয়ে দুর্বল দেহে ফের নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। নাতি নাতনী দুটি তাঁরই সাথে মরার মত পড়ে রয়েছে।

সুধীর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'বেলা কই ?'

সৌদামিনী ক্ষীণ কিন্তু বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কি জানি বাপু। সন্ধ্যার পর পাড়ায় কোথায় বেরিয়েছিল, ফিরে এসে নিজের ঘরে খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছে না কি করছে সেই জানে।'

দোরে জোরে জোরে ঘা দিয়ে সুধীর স্ত্রীকে ডেকেছিল, 'ঘুমিয়ে থাকলে হবে না কি, ওঠ, উঠে রান্না চড়াও।'

কিন্তু বেলা কোন সাড়া দেয়নি।

একটু কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে যেতেই জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুধীর। জানলার একটা পাট হয় ভুলে না হয় ইচ্ছা করেই বেলা খুলে রেখেছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে একবার তাকিয়েই সভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল, 'মা ওঠ, ওঠ, সর্বনাশ হয়ে গেল।'

সে আর্তনাদে শুধু সৌদামিনীই উঠলেন না, আশেপাশের বাড়ি থেকে পাড়াপড়শীরাও সব ছুটে বেরুলেন। দোর ভেঙে ঘরে ঢুকে চরম সর্বনাশ থেকে সবাই সে যাত্রা বেলাকে রক্ষা করেছিল। ফাঁসটা অনেকখানি আটকে জিভ বেরিয়ে পড়েছিল। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে সব শেষ হয়ে

যেত।

প্রাণ সে যাত্রা রক্ষা পেল বেলার। কিন্তু মান রক্ষা পেল না। না তার নিজের না সুধীরের। বেলার গলায় দড়ি দেওয়ার খবরটা শহরময় রটে গেল। থানার কনেস্টবল কানাই নন্দী পাড়াতেই থাকে, সেও এল খোঁজখবর নিতে। সুধীরের প্রবীণ হিতৈষীরা তার হাতে কিছু দিয়ে দিতে বললেন। পাছে এ নিয়ে আর কোন রকম গোলমাল বাধে।

সুধীর রাগ করে বলল, 'বাধুক গোলমাল। থানা পুলিশ হোক, ওর শাস্তি হোক, তাই আমি চাই।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে কনেস্টবলকে ঠাণ্ডা করতে হল সুধীরকে।

কিছুদিন ধরে অনেক রকম রটনা হতে লাগল পাড়ায়। কেউ বলল ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর বেলাকে সেজেগুজে বেরুতে দেখেছে। কেউ কেউ বলল ঘটনার দিন মধু পোদ্দারের বাড়ির ওদিক থেকে বেলা অনেক রাত্রে ফিরে আসছিল। মধু পোদ্দারের বাড়ি চালের চেষ্টায় গেলে শুধু হাতে ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু মেয়েদের যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা বেখে আসতে হয়। বেলা যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তার মূলে নাকি তার সেই সম্মান খোয়াবার লজ্জা। কিছুকাল ধরে বেলাকে নিয়ে এ ধরনের আরো নানা রকমের গল্প কাহিনী পাড়া ভরে রটতে লাগল।

দুজনেই কান পেতে শুনল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

খানিকটা সুস্থ হবার পর বেলা একদিন স্বামীকে বলল, 'তুমি এসব বিশ্বাস করছ ?'

সুধীর জবাব দিল। 'আমার বিশ্বাস করায় না করায় কিছু এসে যায় না। হাটে, বাজারে, অফিসে, আদালতে তোমার জন্যে কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই। দেশ থেকে আমাকে এবার চলে যেতে হবে।'

বেলা অনুতপ্ত সুরে বলল, 'তার চেয়ে আমাকে কেন চলে যেতে দিলে না। কেন আমাকে বাঁচাতে গেলে। সব আপদ বালাই নিয়ে আমি মরে যেতাম, তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতাম—'

সুধীর বলল, 'থাক, যেতে দাও ওসব কথা।'

কিন্তু যেতে দিতে চাইলেই কি সব কথা জীবন থেকে চলে যায় ? বেলার এই কলঙ্কের কথাটাও একেবারে গেল না ! অভাব অনটন নিয়ে কোন কথান্তর হলেই সুধীর স্ত্রীকে খোঁটা দিত। 'তোমাকে কিছু বলতেই ভয় হয়, আবার কোন্ দিন দড়ি নিয়ে ঝুলে পড়বে।'

সৌদামিনীও বলতেন, 'থাক থাক, অমন গুণের বউকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই সুধীর। কখন আবার কোন্ কীর্তি করে বসবে, বাড়ি শুদ্ধ লোকের দড়ি পড়বে হাতে।'

মেজো ছেলে ছ' বছরের বিনু পর্যন্ত একদিন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আচ্ছা মা, তুমি নাকি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলে ?'

'কে বলল তোকে ?'

'আমি ঠাক্‌মার কাছে শুনেছি। ভারি মজার না ? আর একদিন দেবে গলায় দড়ি ? আমি দেখব।'

একটু চুপ করে থেকে বেলা জবাব দিয়েছিল, 'আর একদিন কেন গলায় দড়ি দিতে আমার প্রায়ই ইচ্ছা করে। কেবল তোদের জন্যেই দিতে পারিনে।'

নাছোড়বান্দা বিনু আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মার গলা, 'আমরা কিছু বলব না মা, তুমি চুপি চুপি আর একবার দাও আমরা দেখি।'

রঙীন পেনসিল দিয়ে স্কুলের টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে, মা আর ছেলের আলাপ সুধীর একবার কান খাড়া করে শোনে। তারপর ফের বড় বড় কাটা চিহ্নে গোটা পাতাকে কণ্টকিত করে তোলে।

বারান্দায় বসে মালা জপ করতে করতে সৌদামিনী বলেন, 'কেন কিসের এত দুঃখ তোমার শুনি যে বার বার দড়ির কথা বল, দড়ির ভয় দেখাও, ওই দড়িতেই তোমাকে টানছে, তা আমি বলে দিলাম। ওই দড়িতেই তুমি যাবে।'

বেলা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ করে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

পাড়ার বিনোদ উকিলের বাড়িতে দুপুরের পর মাঝে মাঝে তাসের আসর বসত। মোক্তার,

ডাক্তারের স্ত্রীরা গিয়ে জড়ো হত বিনোদবাবুর স্ত্রী মন্দাকিনীর বৈঠকে। পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাস্টারের স্ত্রী বলে সে আসরে বেলার তেমন মর্যাদা ছিল না। কিন্তু তাসে সব চেয়ে ভালো হাত ছিল বলে শশী মোক্তারের স্ত্রী সুরবালা, শ্রীপতি ডাক্তারের স্ত্রী সুহাস, সবাই বেলাকে পার্টনার হওয়ার জন্য টানাটানি করত। বাড়ির খোঁটা আর গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বড় ছেলেকে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে পাঠিয়ে ছোটদের শাশুড়ীর কাছে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ফের একদিন বেলা গিয়ে হাজির হল তাসের আসরে। অনেকদিন বাদে বেলাকে দেখে সকলেই খুব আদর আপ্যায়ন করল। দু'এক হাত তাসও জমল বেশ। তারপরই সবাই মিলে সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে শুরু করল।

মন্দা বলল, 'আচ্ছা ভাই, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি খুলে বলতো, তুমি কেন ও কাজ করতে গেলে ? তোমার এমন সোনার সংসার, সোনারচাঁদ সব ছেলে মেয়ে, কিসের দুঃখ ছিল তোমার। সুধীরবাবুর মতও তো অমন মানুষ আজকাল দেখা যায় না। দোষের মধ্যে ভদ্রলোকের রোজগার একটু কম— ।' ডাক্তারের স্ত্রী সুহাস বলল, 'তা পুরুষের রোজগার একটু কম হওয়া মন্দ নয় ভাই, তেজটাও কম থাকে। কম রোজগেরে স্বামীর ঘর করার অনেক রকম সুবিধেও আছে।'

মন্দা হেসে বলল, 'কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা সে সব স্বামীরা খালি হাতে আদর করে, স্যাঁকরার দোকান পর্যন্ত তাদের হাত পৌঁছোয় না। তোমার এই নতুন নেকলেসটা ক'ভরির ভাই, ভরি পাঁচেকের ত হবেই।'

সুহাস গম্ভীর মুখে বলল, 'সোয়া ছ'ভরির।'

পাছে দুই বন্ধুর মধ্যে হাসি-পরিহাসের ভিতর দিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় সেই ভয়ে শশী মোক্তারের স্ত্রী সুরবালা ফের বেলার প্রসঙ্গ তুলল, 'আচ্ছা ভাই পোদ্দার বুড়ো কি বলেছিল তোমাকে ? উনি বললেন, সুধীরবাবু নেহাতই ঠাণ্ডা মানুষ তাই, আর কেউ হলে সহ্য করত না। বুড়োকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করত।'

সুহাস বলল, 'তাতে ভাই তোমার আর মন্দার উনি'র পকেট ভারি হত, কিন্তু বেলার কি মান বাঁচত। মেয়েদের মান গেলে আর কি থাকে ভাই।'

সুরবালা বেলার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কি সেই মানের ভয়েই—'

বেলা সুরবালার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর পরম শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'না সুরোদিদি, গরীব মেয়েমানুষের মান সম্মানের ভয়টা বড় হয় না। তার চেয়ে প্রাণের ভয়টাই বেশি। দুদিন বাদে না খেতে পেয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে শুকিয়ে মরব, সেই ভয়েই আমি মরতে গিয়েছিলাম, আর কিছুর জন্যে নয়।'

বলে বেলা হাতের তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বেলার কথা বলবার ভঙ্গিটাই শান্ত, ভাব আর ভাষায় অন্তর্জ্বালা বড় বেশি।

বেলা ঘর থেকে বারান্দায় নামতেই মন্দার গলা তার কানে গিয়েছিল, 'কথায় বলে ডেঁয়ো পিঁপড়ের বিষ বেশি, এ হল তাই।'

সুরবালা বলেছিল, 'যা বলেছ। যে কাণ্ড করেছে তাতে কোথায় মাথা নিচু করে থাকবে তা নয়, আবার মুখ তুলে কথা বলে। আমরা হলে তো ভাই মুখ দেখাতে পারতাম না, উনি সেদিন বলছিলেন এসব কেসে জেল পর্যন্ত হয়ে যায়, পাড়ার লোকেরা সব ভদ্রলোক তাই, না হলে এতদিন গারদে বসে ঘানি ঘুরাতে হোত।'

সুহাস কি বলে তা শুনবার জন্য বেলা আর দাঁড়ায়নি।

কিন্তু দু চার পা এগুতেই পিছন থেকে আর একটি মেয়ের গলা ওর কানে গিয়েছিল, 'বেলাদি শুনুন।'

লম্বা কালো মত চশমা পরা উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। এতক্ষণ মন্দাদের ঘরে একটু দূরে বসে কি একটা মাসিক কাগজের পাতা উল্টাচ্ছিল। কারো সঙ্গে কোন আলাপ করেনি। বেলা জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, মেয়েটি সুহাসের বোনঝি, কলকাতার কোন একটা কলেজে সকালে পড়ে। দুপুর বেলায় আবার নাকি একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজও করে। ছুটিতে মাসীর কাছে

এসেছে। শুনে কৌতূহলী হয়ে বারবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল বেলা, কিন্তু মেয়েটি আলাপ করবার কোন আগ্রহ দেখায়নি। হাতের বই থেকে চোখও তোলেনি। কলেজে পড়া দেমাকী মেয়ে ভেবে মনে মনে তার সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষের ভাবই এসেছিল বেলার। এখন তার মুখে স্নিগ্ধ 'বেলাদি' ডাক শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল বেলা।

মেয়েটি বলল, 'আপনার বাসা কতদূরে ?'

'কাছেই।'

'চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। ওঁরা এত গোলমাল করছিলেন যে আপনার সঙ্গে আলাপই করতে পারিনি। চলুন যেতে যেতে কথা বলব।'

কি কথা বলবে তা গোড়া থেকেই টের পেয়েছে বেলা ; এও নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে পোদ্দার বুড়ো তার সঙ্গে কি রসালাপ করেছিল। কেবল কি হাতই টেনে ধরেছিল, না আরো খানিকটা এগিয়েছিল। কলেজে পড়া মেয়েই হোক আর ঘর সংসার করা মেয়েই হোক, এ কৌতূহল যে সকলেরই মজ্জাগত তা বেলার জানতে বাকি নেই।

তাই বেলা প্রথমটা বেশি আমল দিতে চায়নি মেয়েটিকে, বিরস মুখে বলেছিল, 'কি কথা বলবেন।'

মেয়েটি তার মনের ভাব আন্দাজ করে বলেছিল, 'ভয় নেই আপনার। ওঁরা যে সব কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তা আমার জানবার কোন আগ্রহ নেই। আপনি যে মুখের ওপর ওঁদের উচিত কথা শুনিয়ে দিয়ে এলেন, তাতে আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। সেই কথাই জানাতে এলাম আপনাকে।'

যদিও পড়ুয়া মেয়ের মত খানিকটা ছাপানো বইয়ের ভাষায় কথা বলে, তবু ওর ব্যবহারটুকু ভারি ভাল লাগল বেলার।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কি ?'

'শুক্তি রায়।'

'বেশ নামটি তো !'

শুক্তি হেসে বলল, 'ওই নামটিই শুধু বেশ। প্রশংসা করবার মত আর কিছু নেই, না আপনার মত রঙ, না নাক চোখ—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি দেখে নিয়েছি।'

বেলাও এবার হেসেছিল, 'আহাহা, কিন্তু অত বিদ্যা বুদ্ধি আর অমন সুন্দর স্বভাব, তা তো আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারেননি।'

'না, এই জন্যেই তো আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি। দেখি কিছু দেখা যায় কিনা।'

এমনি করে দুজনের আলাপ। সে আলাপের কথা স্ত্রীর কাছেই সুধীর শুনেছিল। নতুন বন্ধু পেয়ে যেন নব জীবন, নব যৌবন পেয়েছিল বেলা।

শুক্তি বয়সে যেমন বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট, বিদ্যায় পড়াশুনায় তেমনি বড়। কিন্তু এই অসমতা দুজনের বন্ধুত্বে কিছুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। বেলা একটু সঙ্কোচ করলেও শুক্তি অবাধে তার সঙ্গে মিশেছে।

এই মেশামেশি আলাপ আলোচনার ফলেই শহরের মহিলা সমিতির প্রথম উদ্ভব। মেয়েস্কুলের ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রী, দু'চারজন শিক্ষয়িত্রী নিয়েই এই মহিলা সমিতি প্রথম খুলেছিল। শুক্তি তারপর এসে ধরে পড়েছিল, 'তোমাকেও এর মধ্যে আসতে হবে বেলাদি।'

বেলা ভিতরে ভিতরে খুশি হলেও মুখে বিনয় করে বলেছিল, 'সে কি কথা ভাই, আমি ওসব সমিতি টমিতির মধ্যে গিয়ে কি করব, না জানি লেখাপড়া না জানি কিছু।'

শুক্তি বলেছিল, 'আপাতত যা জানো তাতেই চলবে। তারপর নিজের গরজে আরো জেনে নেবে। জানিনে বলে ঘোরের কোণে অভিমান করে বসে থাকলে তো আর কিছু জানা যায় না।'

বেলা তবু বলেছিল, 'কিন্তু আমি তো ভাই তোমার মত ঝাড়া হাত-পা নই, স্বামী আছে, সংসার আছে, বুড়ো শাশুড়ি আর ছেলেপুলে আছে—'

শুক্তি হেসে বলেছিল, 'বেশ তো, সেই সঙ্গে তোমার আরো একটি নতুন জিনিস হবে—সমিতি।

দেখবে তার সঙ্গেও তোমার এক নতুন আত্মীয়তা। ঠিক রক্তের সম্পর্ক নয়, আর এক ধরনের সম্পর্ক, কিন্তু তার মধ্যেও রস কম নেই, রঙ কম নেই, সে সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ককে আরো জোরালো করে, আরো মধুর করে।'

বেলা বলেছিল, 'কিন্তু আমার যে বড় ভয় হচ্ছে ভাই, ও সব করতে গিয়ে আমার সংসার যদি মারা যায়।'

শুক্তি বলেছিল, 'ক্ষেপেছ, তোমার সংসার তাতে আরো বাঁচবে। সংসারকে ভালো করে বাঁচাবার জন্যেই তো এই সব সমিতি। এতো ভাই সন্ন্যাসীদের মঠ নয়, যে সংসারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না, আমাদের মঠ সংসারের জন্যেই। ঘর গৃহস্থালীকে আরো আঁটসাঁট মজবুত করে বাঁধবার জন্যই আমরা এই সন্ন্যাস নিয়েছি।'

দেখতে দেখতে বেলা ভিড়ে পড়ল দলে।

সুধীর একদিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয় তোমাদের ওখানে।'

বেলা জবাব দিল, 'খবরের কাগজ আসে। মাসিকপত্র আসে, বইপত্রও অনেক আনিয়েছে শুক্তি। দেশ বিদেশের কত রকম কত আলোচনা হয়। মাঝে মাঝে শুক্তির একজন বন্ধুও আসেন। ভদ্রলোক নাকি কোন কলেজের প্রফেসর। চমৎকার আলাপী লোক।'

সুধীর বলল, 'এবার তোমার আকর্ষণের কারণটা বুঝতে পারছি।'

বেলা বলল, 'উঁহু কিছুই বুঝতে পারনি। আর কারো কোন আকর্ষণের তিনি ধার ধারেন না। কারো দিকে তেমন ভাবে তাকান না তিনি। অল্প বয়সে কতকগুলি ছেলে পুলে হওয়ায় আমি না হয় বুড়িয়ে গেছি, কিন্তু সমিতিতে সুন্দরী মেয়ে তো আরও আছে। তবু আর কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই প্রভাসবাবুর, থাকবে কি, গাঁটছড়া যে ভিতরে ভিতরে আর একজনের সঙ্গে বাঁধা। শুক্তির সঙ্গে শিগগিরই ওঁর বিয়ে হবে, সব ঠিক ঠাক, এখন বাসর ঘরে গিয়ে উঠলেই হয়।'

কিন্তু বাসর ঘরে যাওয়ার আগেই দুজনকে দু মাস আগে পিছে শ্রীঘরে গিয়ে উঠতে হল। কিন্তু তার আগে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। জাতীয় পতাকা আর রঙীন কাগজের ফুল আর শিকলে ঘর সাজিয়ে উৎসব পালন করা হয়েছে শহর ভরে। কিন্তু যত দিন কাটছে তত বেশি করে টের পাওয়া যাচ্ছে সবই যেন কাগজের ফুল আর কাগজী স্বাধীনতা। তাতে রঙ আছে কিন্তু রস নেই।

সমিতিটা উঠি উঠি করেও উঠল না। অনেক মেয়ে ছেড়ে গেল। কিন্তু নতুন নতুন মেয়ে এসেও কম জুটল না। সবাই শিক্ষিতা, স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে নয়। সবাই ঘর ছেড়ে আসতেও পারে না। কিন্তু বেলাই মাঝে মাঝে গিয়ে তাদের খবর নিয়ে আসে, তাদের দেশ বিদেশের খবর দিয়ে আসে।

সুধীর একদিন বলল, 'দেখ লোকে কিন্তু ভারি হাসাহাসি করছে। আমাদের হেডমাস্টারমশাই সেদিন বলছিলেন দুর্বল পুরুষের নারীই সবলা হয় বেশি। কথাটা যে আমাকে লক্ষ্য করেই বলা তা সবাই বুঝেছে।'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেলা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি বললে না কেন মেয়েদের বল দেখে যারা হিংসা করে সেই পুরুষেরাই আসলে দুর্বল। তুমি মোটেই দুর্বল নও।'

সুধীর বলল, 'শুক্তি তোমার কানে কি মন্ত্র দিয়ে গেছে জানিনে, কিন্তু ঘরের বউয়ের এসব রাজনীতি করা কি পোষায়। তোমার ছেলে মেয়ে ঘর সংসারকে যদি ভালো করে গড়ে তুলতে পারো সেই হবে সত্যিকারের দেশের কাজ।'

বেলা বলল, 'তা জানি। কিন্তু নিজের ঘরকেও কি একা একা গড়ে তোলা যায়। আগে ভাবতাম যায় বুঝি, এখন ক্রমেই সন্দেহ হচ্ছে। তা ছাড়া রাজনীতি রাজনীতি করে তুমি প্রায়ই যে ঠাট্টা কর, রাজনীতি তো আমরা করিনে। রাজা মন্ত্রী যুদ্ধ বিগ্রহের ধার তো ধারিনে আমরা।'

সুধীর বলল, 'তবে কি কর তোমরা?'

বেলা জবাব দিল, 'আমরা সমিতির মেয়েদের অসুখ বিসুখে সেবা শুশ্রূষা করি, যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি। যাদের সংসার চলে না তাদের সেলাইর কাজ জোগাই।'

সুধীরের মনে পড়ে সে কাজে নিজেও হাত দিয়েছে বেলা। তাতেও কিছু কিছু আয় বেড়েছে সংসারের। তবু 'সংসার চলে না' কথাটা কোথায় যেন গোপন কাঁটার মত বিঁধল।

একটু বাদে সুধীর বলল, 'এসব যদি কর, তাতে আপত্তি কি। কিন্তু আর যাই কর জটিল রাজনীতির মধ্যে যেয়ো না। ও জিনিস শিশুদের জন্যেও নয়, তোমাদের মত কম লেখাপড়া জানা মেয়েদের জন্যেও নয়। অথচ আমাদের দেশের ইংরাজী বাংলায় একটা সেন্টেন্স যারা শুদ্ধ করে লিখতে জানে না, তারাই সবচেয়ে বেশি হৈ চৈ করে। যত সব দল আর উপদল এই স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছে। ওদের পড়াশুনোটা আগে শেষ করতে দাও। বয়সটা আরো কিছু বাড়ুক, বুদ্ধিটা পাকুক, তারপরে যত দলাদলি করতে হয় করবে।'

বেলা বলল, 'তোমার স্কুলের ছেলেদের কথা তুমিই ভালো জানো, কিন্তু কম লেখাপড়া জানা মেয়েদের কথা যে বলছিলে সে সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি আছে।'

'বল—'

'দেখ, রাজনীতিটা যেমন কঠিন, তেমনি সহজও। সবাই মিলে ভালো খেতে চাই, পরতে চাই, লেখাপড়া শিখতে চাই, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চাই, এর চেয়ে সোজা কথা আর কি আছে। অথচ এই কথাগুলিই নাকি সেই কঠিন রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো। রাজনীতি ফিতি কি ছাই আমারই ভালো লাগে, না সত্যিই কিছু ওর বুঝি। কিন্তু না বুঝেও তো জো নেই, না ভেবেও তো পারিনে। চালের কাঁকর হয়ে রাজনীতি যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে। প্রতি গ্রাসে কির কিব করে। খাওয়ার সময় টের পাও না?'

এ কথার ঠিক ঠিক জবাব হঠাৎ মুখে জোগাল না সুধীরের। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে রইল।

কিন্তু দেখতে দেখতে সেই কাঁকরওয়ালা চালও এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। চল্লিশ টাকা ছাড়িয়ে গেল তার মণ। টাকাতেও মেলে না এমন হল অবস্থা। ঘরে ঘরে প্রশ্ন, 'আবার কি সেই পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষ লাগল?'

চাল না মিললেও শহরের সরকারী মহল থেকে ভরসা মিলল, এই অনটন অল্প স্থায়ী। নানা দিগদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই চাল আসছে। শিগগিরই একটা সুরাহা হবে।

কিন্তু খবরটা যত তাড়াতাড়ি এল, খোরাক তত শিগগির আসবার লক্ষণ দেখা গেল না। ঘরে ঘরে অর্ধাহার, স্বল্পাহার শুরু হল। শহরতলীর সমাজের তলাকার বাসিন্দাদের দু'একবেলা অনাহারে চলতে লাগল।

সমস্ত অঞ্চলটা ফের চঞ্চল হয়ে উঠল। খাদ্য চাই, শস্য চাই, জনসভায় সেই দাবী উত্তাল হয়ে উঠল। ঠিক হল ভুখ মিছিল বেরোবে। মিছিল যাবে মহকুমা হাকিমের আদালতের সম্মুখে।

কিন্তু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়ে গেছে। সভা সমিতি শোভাযাত্রা সব নিষিদ্ধ। যার কোন দাবী থাকে, কোন কথা বলবার থাকে সে নিজে আসুক। দল বাঁধতে চাইলেই গোলমাল বাঁধবে।

কিন্তু সবাই যেন গোলমাল বাঁধাবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে। পেটের আগুন কাউকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, শান্তিরক্ষা হবে কি করে?

বেলা বলল, 'দেখ আমার বড় ভয় করছে।'

সুধীর বলল, 'ভয় আমারও করছে। তুমি যে ফের কি কাণ্ড ঘটাও—'

ওপরের হুকটার দিকে একবার তাকাল সুধীর। বেলা একটু হাসল, 'দেখ এক এক সময় তাই ইচ্ছা করে। আমাদের পাড়ার বিশু মিস্ত্রীর বউটা দুদিন ধরে শুকিয়ে রয়েছে। দু মুঠো ওকে দিলাম তো কোত্থেকে খবর পেয়ে ফটিক কামারের মেয়েটা এসে আঁচল পাতলো। কিন্তু ক'জনকে দেব। একি শুধু দান খয়রাতের ব্যাপার। দান খয়রাতে কি সকলের অভাব মিটবে? না, আমি আর কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। এক একবার মনে হচ্ছে এর চেয়ে সেবার আমার যাওয়াই ভালো ছিল। তা হলে এসব আর দু চোখে দেখতে হোত না। এত জ্বালা সইতে হোত না।'

সুধীর অবশ্য আধ মন চালের ব্যবস্থা এর মধ্যে করে এসেছে। কিন্তু বেলা যে জ্বালার কথা

বলেছে তা তো শুধু তার নিজের আর ছেলেপুলেদের পেটের জ্বালা নয়, সে জ্বালা মিটায় সাধ্য কি সুধীরের।

দু দিন বাদে মিছিল বেরুল রাস্তায়। সে শোভাযাত্রা সুধীরদের ঘরের সমুখ দিয়ে এগিয়ে এল।

বেলা বলল, 'তুমি একটুকাল বস, আমি দেখে আসি। আমাদের সমিতির মেয়েরাও সব বেরিয়েছে।'

সুধীর বলল, 'ওরা বেরিয়েছে বেরোক, কিন্তু তুমি কোলের এসব বাচ্চা কাচ্চা ফেলে কোথায় যাবে?'

বেলা বলল, 'বাচ্চা কাচ্চাদেরই চালের জোগাড়ে। ভয় নেই, সেবারের মত ধার চাইতে যাব না, ভিক্ষে করতে যাব না। জোর করে দাবী জানাব, জোর করে আদায় করে আনব চাল।'

সুধীর বলল, 'তারপর না পেলে সেবারের মত হুকে ঝুলে পড়বে। তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

বেলা বলল, 'না দিলে হুকটা আপনা থেকেই আমার গলার ওপর চেপে বসবে। আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। একা একা ঘরে থাকলেই বরং আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ফের কখন একটা কাণ্ড টাণ্ড ঘটিয়ে বসব। তার চেয়ে তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি। বেশি দেরি হবে না। আমি যাব আর আসব।'

রাস্তা থেকে আরো ক'টি মেয়ের ডাক শোনা গেল, 'কই বেলাদি, বিদায় নেওয়া হোল তোমার?'

তাদের কথার জবাব না দিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছিল বেলা। হাসলে ওকে এখনও ভারি সুন্দর দেখায়।

কে জানত সেই ওর শেষ হাসি, ও আর হাসবে না। আর ওকে হাসতে দেওয়া হবে না।

পাশের ঘর থেকে ছোট মেয়েটার একটানা কান্না ভেসে আসতে লাগল, 'মার কাছে যাব, আমি মার কাছে যাব, ঠামা।'

অস্থিরভাবে চেয়ার ছেড়ে এবার উঠে দাঁড়াল সুধীর, সম্ভব নয়, সহ্য করা আর সম্ভব নয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

রাজপুরুষ

মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা, গায়ে সাদা জিনের কোট, পায়ে পট্টি বেঁধে বুট পরে বেরুবার আগে স্ত্রীর সামনে সোজা হয়ে একবার দাঁড়াল শরৎ, বলল, 'যাচ্ছি।'

সুখলতা বলল, 'ও আবার কি কথার ছিরি। যাচ্ছি নয় বল আসি, সত্যি তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।'

পরম আত্মপ্রসাদে শরতের শীর্ণ ঠোঁটে হাসি ফুটল। বলল, 'দেখাবে না? সরকারী চাকরি, সরকারী পোশাক, এতেও যদি সুন্দর না দেখায় তো দেখাবে কিসে।'

সুখলতা স্বীকার করে বলল, 'তা ঠিক।'

রণ্টু, মণ্টু, মিন্তি, নিন্তি চার ভাই বোন এসে ঘিরে দাঁড়াল বাপকে। বাপের এমন পোশাক তারা এ জন্মে আর দেখেনি। পাগড়ীর রঙ কি লাল, কোটের রঙ কি সাদা, বুটের রঙ কি কালো!

সাত বছরের ছেলে রণ্টু বলল, 'বাবা আমিও লাল পাগড়ী পরব। দেবে আমাকে একটা কিনে?'

ছেলের মূর্খতায় শরৎ হেসে বলল, 'এ পাগড়ী কি কিনতে পাওয়া যায় বাবা? কিনতে পাওয়া যায় না। এ হল সরকারী পাগড়ী। সম্মানের জিনিস, বড় হও, লেখাপড়া শেখ, চাকরি বাকরি কর, তখন সরকার এর চেয়েও ভালো পাগড়ী তোমার মাথায় বসিয়ে দেবেন।'

পাঁচ বছরের মণ্টু বলল, 'আমাকেও দেবে তো বাবা?'

শরৎ বলল, 'দেবে বইকি। তুমিও বড় হও, লেখাপড়া শেখ—'

তিন বছরের মিন্তি বলল, 'আমাকে ?'

শরৎ বলল, 'তোমাকেও দেবে।'

নিন্তি এখনো কথা বলতে শেখেনি। কিন্তু তারও চোখে ওই একই প্রশ্ন।

সুখলতা তাড়া দিয়ে বলল, 'ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ফিরে এসে সোহাগ আলাপ করো। তোমার বেলা হয়ে যাচ্ছে না ? সরকারী কাজে দেরি হলে ক্ষেতি হবে না ?'

সত্যি। ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কেবল সরকারের না নিজেরও। শরৎ আর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

মাথার এই রঙীন লাল পাগড়ী সহজে জোটেনি শরতের। সরকার সত্যিই আর নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ পাগড়ী সস্নেহে তার মাথায় বসিয়ে দেননি। মুরুব্বি বিষ্ণু ভট্চায অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা চরিত্র তদ্বির করে তাকে এই পুলিশের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুবাবু আগে স্বদেশী করে জেল খেটেছেন। এখন দেশী গভর্নমেন্টে তাঁর অনেক সম্মান। মন্ত্রী-টন্ত্রীই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেন যেন তা হতে পারেননি। তা না পারলেও দু-দু'খানা বাস চালাবার পারমিট পেয়েছেন।

মন্ত্রীত্বের চেয়ে তা নেহাৎ কম নয়, শরৎ চাকরির তদ্বিরে টালীগঞ্জে গিয়ে দেখে এসেছে তাঁর বাড়ি। হাল চাল প্রায় রাজবাড়ির মত। বউয়ের গা ভরা গয়না। কলেজে পড়া সুন্দরী মেয়েদের দেখলে চোখ জুড়োয়। তারা গয়না বেশি পরে না। কিন্তু যে চমৎকার চমৎকার শাড়ি পরে, তা শরৎ বাপের জন্মেও দেখেনি। যদি টাকায় কুলোয় অবশ্য অনেকদিন বাদে দু-একটি করে টাকা জমিয়ে জমিয়ে সুখলতার জন্যেও কিনে দেবে এই রকম একখানা শাড়ি। সুখলতারও তো বয়স বেশি নয়, বাইশ তেইশই। অল্প বয়সে কতকগুলি ছেলেপুলে হওয়ায় এই রকম বুড়োটে চেহারা হয়ে গেছে। দামী শাড়ি পরলে ভালো করে সাজলে-গুজলে চেহারার ধরনটা একটু ফিরলেও ফিরতে পারে।

মুরুব্বি বিষ্ণুবাবু বলে দিয়েছেন, 'চাকরি জুটিয়ে দিলাম। আমার কিন্তু মুখ রাখিস শরৎ। অমনিতেই তো পুলিশ লাইনের নানারকম বদনাম আছে। ঘুষ-টুসের মধ্যে কিন্তু যাসনে। খবরদার খবরদার। ভারি কড়াকড়ি কিন্তু। তাহলে ধনে-প্রাণে তুইও যাবি, আমারও মান থাকবে না।'

শরৎ লজ্জায় জিভে কামড় দিল, তারপর হেঁট হয়ে বিষ্ণুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'ছি ছি ছি। আশীর্বাদ করুন বড় কর্তা, অমন কুমতি যেন আমার কোনদিন না হয়। আপনার ভিটেবাড়ির প্রজা না আমি ? ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন না আমাকে ?'

সৎ আর ধার্মিক লোক বলে সত্যিই শরতের খ্যাতি ছিল গ্রামে। কিন্তু দেশবিভাগের পর সে গ্রাম বিষ্ণুবাবুও ছেড়েছেন, শরৎও ছেড়ে এসেছে। তারপর কত অদল বদল হয়েছে। মানুষের চরিত্রও কি বদলায়নি ?

বিষ্ণুবাবু চিন্তিত এবং খানিকটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন, 'দেখে তো এসেছি, কিন্তু লোভ সামলানো বড় শক্ত, বড় শক্ত। বিশেষ করে যখন মনে হয় জীবন ভরে কেবলই ছেড়েই এলাম, কিছুই নিলাম না, কিছুই পেলাম না, সারা জীবন উপবাসী রয়ে গেলাম, তখন যা পাই তাই আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। চেষ্টা করেও সামলানো যায় না।'

শরৎ ওর অনেক কথাই ঠিক মত বুঝল না, কিন্তু শেষ কথাটা বুঝতে পেরে বলল, 'আমি সামলে নেব বড় কর্তা। সব লোভ সামলে নেব দেখবেন। আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন বড় কর্তা।'

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'আশীর্বাদ তো করিই। তোর এই সুমতি বজায় থাকুক শরৎ, চাকরিতে তোর উন্নতি হোক, কাজে কোন রকম গাফিলতি করবিনে, সময় মত আসবি যাবি। আর ওপরওয়ালাকে সব সময় মেনে চলবি, তাকে সব সময় সন্তুষ্ট রাখবি, খুশি রাখবি। উন্নতির চাবিকাঠি কিন্তু তার হাতে এ কথা মনে রাখিস। শুধু আমার আশীর্বাদে কিছু হবে না।'

'হবে বড় কর্তা, আপনার আশীর্বাদেই সব হবে', আর একবার বিষ্ণুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে শরৎ বিদায় নিয়েছিল।

ট্রেনিং-এর পর আমহার্স্ট স্ট্রীট থানায় পোস্টেড হয়েছে শরৎ। টালায় ছোট্ট একটা বস্তীর মধ্যে বাসা। আগে এ বস্তী ছিল মুসলমানের। দাঙ্গার সময় তারা উৎখাত হয়ে গেছে। এখন কয়েক ঘর নিম্নমধ্যবিত্ত নামধারী বিত্তহীন দরিদ্র হিন্দুরা সেখানে মাথা গুজেছে। সবাই ছোটখাট চাকরি-বাকরি

করে, বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করে কেউ কেউ, কেউ বা ধূপকাঠি ফিরি করে, কেউ বা চানাচুর, চীনাবাদাম। কিন্তু সরকারী চাকুরে এখানে একমাত্র শরৎ দাস। তা নিয়ে সুখলতার অহঙ্কারের সীমা নেই। মনে মনে শরৎ নিজেও বেশ খানিকটা গর্বিত। মাইনে অবশ্য বেশি নয়। মাগ্‌গী ভাতা-টাতা শুদ্ধু মাত্র ষাট। তার চেয়ে বেশি রোজগেরে পুরুষ এ বস্তীতে আছে, কিন্তু বেশি সম্মানী পুরুষ আর নেই, সকলে তাকে এখানে বেশ শ্রদ্ধা আর সমীহের চোখে দেখে। গভর্নমেন্টের নিন্দা-মন্দ করতে করতে শরৎকে দেখলে সবাই চট করে কথা গিলে ফেলে, কথা পালটে ফেলে, না হয় বক্তৃতা বন্ধ করে বিড়ি ধরায়। কে জানে বাবা, কোথাকার কথা কোথায় লাগাবে, শেষে দড়ি পড়বে হাতে। পুলিশের জাতকে বিশ্বাস নেই।

ওদের এই শ্রদ্ধা, ওদের এই ভয় শরতের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দেয়। না, মাইনেটাই সংসারে সব নয়। সম্মান মর্যাদা তারও চেয়ে বড়।

গণেশ সরকার থানার হেড কনেস্টবল। থানায় এসে শরৎ তাকে নমস্কার জানাল।

গণেশ বলল, 'হুঁ, উঠতে বসতে সেলাম তো খুব ঠুকছ। খুব বেশি ভক্তি দেখলেই মনটা যেন কেমন কেমন করে, দিনকালটা ভালো নয় কিনা, যাকগে। এনফোর্সমেন্ট থেকে ফোন করেছিল, আমাদের এই সামনের বাজারটায় নাকি চালের কিছু কিছু ব্লাক মার্কেটিং হচ্ছে। স্টেপ নিতে হবে। বলাই নন্দী আর বিলাস তেওয়ারীকে পাঠিয়েছি। তুমিও যাও। দেখ গিয়ে ব্যাপারটা কি। আমি আসছি একটু বাদে।'

'যে আজ্ঞে' বলে শরৎ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

মোড়ের পাশের দোকানটায় একটি পানওয়ালী বসে। সেখানে দুটি লাল পাগড়ী আসর জমিয়েছে। কাছে গিয়ে শরৎ দেখে পাগড়ীওয়ালারা আর কেউ নয়, তারই সহকর্মী বলাই আর রামবিলাস। একজন সিগারেট ধরিয়েছে আর একজন খৈনী টিপছে। কিন্তু দুজনেরই চোখ আধাবয়সী পানওয়ালীটির দিকে।

শরৎ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদা তাকেও খাতির করল, 'এই যে আর একজন এসেছে। এসো খদ্দের লক্ষ্মী, এসো। কতক্ষণ তোমার পথের পানেই তাকিয়ে ছিলাম গো। পানে কি দেব গো? দোক্তা না জর্দা?'

শরৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমার কিছু লাগবে না, আমি পান খাইনে।'

পানওয়ালী মুখ টিপে বলল, 'ওমা তাই নাকি। ও নন্দী ভৃঙ্গী মশাই, বলি কালে কালে এসব কি হোল গো। তোমাদের স্বদেশী রাজত্বে পুলিশেও পান খাওয়া ছাড়ল নাকি। কবে শুনব মাংসে বাঘের অরুচি এসেছে।'

পানওয়ালীর দেহে রূপ না থাকলেও ঠোঁটে রঙ আছে, কথায় রস, আর পানে মধু। খদ্দের জুটবার পক্ষে এদের যে কোন একটিই যথেষ্ট।

বলাই বলল, 'ওর কথা আর বলো না। ও আমাদের ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।'

পানওয়ালী বলল, 'তাই নাকি? আর তোমরা বুঝি ভীম-অর্জুন। ওগো এবার আমার নকুল সহদেবকে এনে দাও। তাদের না দেখে প্রাণ অস্থির।'

বলে খিল খিল করে হেসে উঠল পানওয়ালী। পানের মত ওর হাসিটুকুও বেশ মিষ্টি।

শরৎ বলাইকে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি দিলেই বুঝি কাজ হবে? এসো কাজে এসো।'

বয়সে যাইহোক, শরৎ বলাইয়ের অনেক জুনিয়র। পানওয়ালীর সামনে, রামবিলাসের সামনে ওর কাছে ধমক খেয়ে অপমানে বলাইয়ের চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে আরো জোরে পাল্টা ধমক দিয়ে বলল, 'ইয়ার্কি দিই আর যাই করি তাতে তোর কি, তোর বাবার কিরে হারামজাদা! যা, যে কাজে যাচ্ছিস যা। আমার ওপর মাতব্বরি ফলাতে এসেছেন! কত বড় সিনিয়র আমার! কত বোঝেন, কত কাজকর্ম জানেন!'

শরৎ আর কোন কথা না বলে একটু এগিয়ে বাজারের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সেখানে চালের

চোরা-কারবারকে বাধা দিতে হবে।

পানওয়ালী আর একটা পান হাতে দিল বলাইয়ের, বলল, 'আহা রাগ করছ কেন প্রাণের অর্জুন, মাথা ঠাণ্ডা করো। যুধিষ্ঠিররা এই রকম রস-কস হীন বোকা বোকাই হয়। কি বল ভাই ভীম, তাই না ?'

রামবিলাস বড় বড় গোঁফে তা দিয়ে একটু হাসল, 'ঠিক ঠিক, আচ্ছি বাৎ। তুমি ঠিক বলেছ দ্রৌপদীজী, দুনিয়ায় যুধিষ্ঠিররা বেকুফ্।'

সন্ধ্যা হয় হয়। ছোট বাজারে বেচাকেনা চলছে। শরৎ সদর্পে গিয়ে ঢুকল। এক কোণে নানা বয়সী কয়েকটি স্ত্রীলোক শাক-পাতার আড়ালে নিষিদ্ধ চাল বিক্রী করছিল, লাল পাগড়ী দেখে পুঁটলা পুঁটলি নিয়ে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে পালাল। থলি হাতে ভদ্রবেশী ক্রেতারাও এদিকে ওদিকে সরে পড়লেন।

পালাতে পারল না কেবল একটি মেয়ে, রোগা রোগা চেহারা। তেইশ চব্বিশ বছরই হবে বোধহয় বয়স। পরনে জীর্ণ ছেঁড়া একখানা শাড়ি। জায়গায় জায়গায় গিঁট দেওয়া। তেলহীন উস্কো-খুস্কো চুলের মধ্যে একটু সিঁদুরের আভাস। হাতে দুগাছি মোটা মোটা শাঁখা। একপাশে হাড্ডিসার বছর-দেড়েকের একটি ছেলে। আর একপাশে ধামার মধ্যে কিছু তরি-তরকারি। আর তার নিচে চাল। একসঙ্গে ছেলে আর ধামা নিয়ে সে পালাতে পারল না। শরৎ তাকে ধরে ফেলল, 'এই যাচ্ছ কোথায়, ব্লাক মার্কেটিং করে কোথায় পালাচ্ছ।'

ধমক খেয়ে বাচ্চা ছেলেটা ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলল, মা ও কাঁদ কাঁদ। 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন। আর করব না, ছেড়ে দিন।'

শরৎ ধমক দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দেওয়ার কাজই করেছ কিনা যে ছেড়ে দেব। কেন এই বেআইনী কাজ করছ, কেন এসেছ চাল বিক্রি করতে।'

ফের জোরে একটা কড়া ধমক লাগাল শরৎ।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, 'আজ্ঞে না করলে পেট চলে না যে। বাড়িতে সোয়ামীর অসুখ। তিন মাস ধরে সে বেকার, শয্যাশায়ী। আরো দুটি ছেলে মেয়ে আছে। তাদের রেখে এসেছি ঘরে। ছোটটা কিছুতেই থাকতে চায় না। আমাকে কেবল আঁকড়ে থাকবে। ও আমাকে জ্বালিয়ে খেল। আমার হাড়-মাংস চিবিয়ে খেল সব। এক এক দিন ভাবি তরকারির সঙ্গে ওকেও দিই বিক্রী করে, আমার সব আপদ যাক। এবার ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন।'

শরৎ একটুকাল তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আর একখানা মুখের সঙ্গে যেন কেমন একটু একটু মিল আছে। শরৎ যখন বেকার ছিল তখন তারও যেন এই রকমই হয়েছিল চেহারা, এই রকমই হয়েছিল চোখ-মুখের দশা। এখনো যে সে দশা ফিরে গেছে তা নয়! এখনো মিল রয়েছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা যাও। আজ দিলাম ছেড়ে। কিন্তু খবরদার এরকম বেআইনী কাজ আর করো না।'

'আর করব না।'

মেয়েটির মুখে এতক্ষণে একটু হাসি ফুটল। কৃতজ্ঞ চোখে শরতের দিকে একবার তাকিয়ে ছেলে আর ধামা নিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

বাজারের লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারাও এবার সরে গেল।

কিন্তু তারা গেল তো এল বলাই আর রামবিলাস। পান দোক্তা খেয়ে এতক্ষণে কর্তব্যবোধ জেগেছে তাদের। বাজারে ঢুকতে ঢুকতে এও তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে শিকার পালিয়েছে। ফাঁকে পড়েছে তারা দুজন।

বলাই এসে সামনে দাঁড়াল শরতের, 'এই ধর্মপুত্তুর, ছেড়ে দিলি কেন মাগীরে। কত নিয়েছিস বার কর। ভাগ দে।'

শরৎ অবাক হয়ে বলল, 'এ তুমি কি বলছ বলাই, ভাগ আবার কিসের দেব। ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, এক পয়সাও আমি নিইনি ওর কাছ থেকে।'

'অমনিই ছেড়ে দিলি ?'

বলাইয়ের কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগল সন্দেহ কুটিল।

শরৎ বলল, 'অমনি ছাড়া কি, বাড়ির অবস্থার কথা শুনে, দেহের অবস্থা দেখে মায়া হল।'

বলাই বলল, 'হুঁ তাত হবেই, ফর্সাপানা চাঁদমুখ দেখেছ কিনা ? কেবল কি মায়া কেবল কি মমতা সঙ্গে সঙ্গে কি রসের সাগরও উথলে উঠেনি। কেমন রসরাজ রসিক পুরুষ তুমি আমিও দেখে নিচ্ছি। তুমি বলাই নন্দীকে ধমকাও। ওসি-এসি-ডিসি-রা বলাইকে ধমকাতে সাহস পায় না আর তুমি ধমকাও ? তোমার যুধিষ্ঠিরগিরি আমি বার করছি দাঁড়াও।'

সেই দিনই বলাই আর রামবিলাস ব্যাপারটা রিপোর্ট করল ওপরওয়ালার কাছে। তিনি রেফার করলেন আরো ওপরে।

দিন কয়েক বাদে ইনস্পেক্টার শরৎকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে।

বিনীত ভঙ্গিতে শরৎ এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। মুখখানা ম্লান শান্ত, বুকখানা অস্থির।

ইনস্পেক্টার তার চেহারার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার নাম শরৎ দাস ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'তোমার নামে এসব কি নালিস শুনতে পাচ্ছি, তুমি না কি ব্লাক মার্কেটিংকে প্রশ্রয় দিচ্ছ, তুমি নাকি হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ এক ব্লাক-মার্কেটিয়ারকে ?'

শরৎ বলল, 'আজ্ঞে না।'

ইনস্পেক্টার ধমকে উঠলেন, 'না ? তবু বলছ না। আমি যথেষ্ট খোঁজ খবর নিয়েছি তা জানো ? কেবল বলাই আর রামবিলাস নয়, বাজারের লোক পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী আছে। তুমি ভেবেছ মিথ্যে বলে পার পেয়ে যাবে, না ?'

শরৎ বলল, 'আজ্ঞে মিথ্যে আমি বলিনি হুজুর। দয়া করে ঘটনাটা শুনুন।'

'আচ্ছা বল।'

শরতের মুখে ঘটনাটা সব শুনে ইনস্পেকটার বললেন, 'তাতেই বা কি, দয়া দেখাবার তুমি কে, তাকে নিয়ে আসতে এখানে। তারপর কতখানি সে দয়ার যোগ্য তা দেখা যেত। ধরা পড়লে ওরা অনেক কারসাজি করতে জানে। পরের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেয়। স্বামী না থাকলেও স্বামী একজনকে বানিয়ে তোলে। ফিকির ফন্দি আট ঘাঁট ওরা যে কি জানে, আর কি না জানে তা তুমি ভাবতেও পার না, তোমাকে ওরা এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচতে পারে। দয়া মায়া দেখাবার তুমি কে ? সব সময় মনে রাখবে আইন হল ন্যায়। তার কাছে দয়া নেই, মায়া নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই। যত ছোট চাকরিই কর তুমি সরকারের প্রতিনিধি। যারা আইন রক্ষা করে অন্যায়কে দণ্ড দেয় তুমি তাদের প্রতিনিধি। বুঝতে পেরেছ ?'

শরৎ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ইনস্পেক্টার দেয়ালের দিকে আঙুল বাড়ালেন, 'জানো ওঁকে ? চেন ওঁকে ?'

দেয়ালে সুবৃহৎ একখানা ফটো, খোলা গা হাতে একখানা লাঠি।

শরৎ জোড় হাতে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আজ্ঞে চিনি, মহাত্মা গান্ধী।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'হ্যাঁ মহাত্মা, মনে রেখো এ রাজ্য ওঁর। এ রাজ্য ওঁর নামে চলছে। তিনি ছিলেন সততা, সারল্য আর ন্যায়ের প্রতীক, তিনি বেঁচে থাকলে—'

'ক্রীং ক্রীং—'

ইনস্পেক্টার হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা ধরলেন। হেড কোয়ার্টারিসের ফোন। কি ছিল সেই ফোনের মধ্যে কে জানে। শুনতে শুনতে ইনস্পেক্টারের মুখ গম্ভীর হল। তিনি শরৎকে বিদায় দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা যাও।'

দিন পনের বাদে শরতের ওপর হুকুম হল তাকে ট্রাফিক পুলিশ হতে হবে। এসব চোর বাটপাড় ধরার কাজ তার নয়, এর জন্যে চৌকস লোক চাই। তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজন গাড়ি ঘোড়ার চলা-ফেরা নিয়ন্ত্রণ করুক শরৎ। মোড়ে বসে বসে পাহারা দিক, তাতে হাঙ্গামা হুজ্জৎ

অনেক কম।

শরৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আজ্ঞে কোন দোষে আমাকে এমন করে নামিয়ে দেওয়া হল।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'এতে ওঠা নামার কি আছে। যে কাজ তুমি পারবে, তোমাকে সেই কাজ দেওয়া হচ্ছে। তোমার মাইনে তো ঠিকই থাকল।

শরৎ বলল, 'আজ্ঞে মাইনেই তো সব নয় ; সম্মান— ।' ইনস্পেক্টার একটু হাসলেন, 'ও সম্মান। তা সম্মান তোমার ও-কাজেও নেহাৎ কম হবে না। যেখানে যে সার্ভিসই তুমি দাও না কেন, দেশের কাজ করছ এ কথা মনে রাখবে। তুমি কেউকেটা নও। তুমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি।'

বলে নিজের মনেই একটু হাসলেন ইনস্পেক্টার।

শরৎ বলল, 'তবু আমার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন বড়বাবু। আমাকে অফিসে ফিরিয়ে আনবেন। ফের চোর ধরবার কাজ দেবেন আমাকে। এবার আর আমার কোন গাফিলতি হবে না, দয়া মায়ায় দুর্বল হব না আমি।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'আচ্ছা। চোর ধরবার দায়িত্ব তোমার এখনও আছে। তা কেড়ে নিচ্ছে কে। চোর তো তোমার শুধু ওই ছোট বাজারটুকুর মধ্যে নেই, এই ভবের বাজারই যে চোর বদমাসে ভরা। চোর তোমার বাড়ির মধ্যে, তাদের ধরো, তাদের শায়েস্তা করো শরৎ।'

সদুপদেশে স্ফীত হলো শরৎ, নত হয়ে ইনস্পেক্টারকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল।

ট্রেনিং-এর পরও কোন বড় রাস্তার ভার পেল না শরৎ, ছোট রাস্তার মোড়ে দাঁড়াল চৌকিদার হয়ে।

বলাই একদিন যেতে যেতে বলল, 'কি ধর্মপুত্তুর, তোমার ধর্মরাজ্য কেমন চলছে আজকাল ?'

শরৎ কোন জবাব দিল না।

কিন্তু বস্তীর কানাই শীল আর জগৎ সরকারেরও একদিন চোখে পড়ে গেল, 'আরে তুমি যে এখানে !'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ এখানে ট্রান্স্ফার হয়েছি।'

কানাই বলল, 'বেশ বেশ। বদলির জায়গাটি ভালো।'

জগৎ কিছু বলল না। শুধু মুখ টিপে হাসল।

সেইদিনই সমস্ত বস্তীটার মধ্যে রটে গেল চাকরিতে শরতের অবনতি হয়েছে।

সুখলতা স্বামীকে আড়ালে নিয়ে গেল। যাতে ছেলে পুলেদের কানে না যায় তার জন্যে ফিস ফিস করে বলল, 'হ্যাঁ গো, এসব কি শুনছি। তোমাকে নাকি নামিয়ে দিয়েছে।'

শরৎ বলল, 'কে বলল ?'

সুখলতা বলল, 'সবাই বলছে। কেবল তুমিই এতদিন বলনি, আমার কাছে গোপন করে গেছ। হ্যাঁ গো কেন গোপন করলে। কেন লজ্জা করলে। আমি কি কেবল তোমার মান সম্মানের ভাগী, দুঃখ অপমানেরও সমান ভাগী নই ? আমার কাছে খুলে বল সব শুনি।'

সবই খুলে বলল শরৎ। বলল, এতে মান অপমানের কিছুই নেই, ওঠা নামারও কিছু নেই, এ কেবল এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে বদলী, সব কাজই দেশের কাজ, সব কাজই স্বদেশী সরকারের কাজ।

সুখলতা একটু হাসল, 'তবু তুমি গোপন করছ, তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। আচ্ছা গোড়ার ব্যাপারটা কি বল দেখি, গোড়ার দোষটা কার।'

শরৎ বলল, 'দোষটা তোর, দোষটা তোর ওই মুখের আদলের। তোর জন্যেই তো এই সর্বনাশটা হোল।'

'হেঁয়ালী রেখে সোজা কথায় বল না গো ব্যাপারটা কি।'

শরৎ তখন সোজা ভাষায় বাজারের ঘটনাটা বর্ণনা করল। শেষে বলল সেই চোর মেয়েটার মুখে সুখলতার আদল দেখতে পেয়েই এই গোলমালটা ঘটেছে। সুখলতা হেসে বলল, 'সর্বনাশ, রাজ্যশুদ্ধ বউঝির মুখে তুমি যদি আমার মুখের আদল দেখে বেড়াও তাহলেই গেছি আর কি।

বাইরে একপাল সতীন নিয়ে আমি ঘরে তাহলে স্থির হয়ে কি করে থাকব গো। আমি তো তোমাকে এর পর থেকে আর বাইরে যেতে দেব না।'

শরৎ বলল, 'বেশ তো।'

সুখলতা বলল, 'আর কি তোমার পছন্দ! সেই গরীব দুঃখী চোর মাগীর মুখটা হবে কেন আমার মুখের মত। কোন রাজরানীর মুখের সঙ্গে বুঝি আমার মিল থাকতে পারে না?'

শরৎ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। রোগা, চোয়ালের হাড় লাগা মুখ। নাকটা থ্যাবড়া, ঠোঁট পুরু, চোখ দুটো ছোট ছোট। তবু এ মুখ রাজরানীরই। শরৎ স্বীকার করে বলল, 'পারে।'

ছেলেমেয়েরা এসে পড়ায় দাম্পত্যালাপ বন্ধ রাখতে হলো তখনকার মত।

বস্তীর লোকেরা একটু তাচ্ছিল্য করলেও শরৎ টলল না। কর্তব্যে অটল থাকবে সে। শরৎ যত ছোটই হোক যত ছোট চাকরিই করুক সে রাজ সরকারের প্রতিনিধি। ন্যায়ধর্মের প্রতীক। তার চোখের সামনে কোন অন্যায়কে সে সহ্য করবে না, কোন চুরি জোচ্চুরি বদমায়সি, দুর্নীতিকে বরদাস্ত করবে না। সে বাড়িকে পবিত্র রাখবে, ঘরকে পবিত্র রাখবে, নিজেকে পবিত্র রাখবে। মহাত্মার আদর্শে গড়ে তুলবে এই মহাভারতকে।

সারা বস্তীটার মধ্যে শরৎ চৌকি দিয়ে বেড়াতে লাগল। কোথায় চোর, কোথায় বদমাস, কোথায় কালোবাজার।

ইনস্পেক্টার ঠিকই বলেছেন। ঘরে ঘরেই তারা, ঘরে ঘরে ক্লেদ, ঘরে ঘরে ক্লিন্নতা।

বস্তীর সামনে ছোট একটা মিষ্টির দোকান আছে হরিপদ সা'র। খোঁজ নিয়ে দেখল সব মিষ্টিতে ভেজাল। ঘির নামে যা তা তেল দিয়ে ভাজে। টাটকা বলে তিনদিনের বাসি মাছি পড়া খাবারগুলি বিক্রি করে।

শরৎ বলল, 'এসব চলবে না সা মশাই।'

হরিপদ বলল, 'এতকাল চলে এল আর আজ চলবে না? এইগুলিই এখানে ভালো চলে। এর চেয়ে ভালো মাল অচল।'

শরৎ বলল, 'না চলবে না। এতকাল চললেও আর চলবে না, আমি এসব চালাতে দেব না।'

হরিপদ এবার বিরক্ত হলো, 'আচ্ছা না দাও না দেবে। তাই বলে যা ভেবেছ তা হবে না। একটি পাই পয়সাও তোমাকে আমি দেব না। এটা তোমার এলাকাও নয়, এক্তিয়ারও নয়। যাদের দেবার তাদের দিয়েছি। বলে হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল। উনি এসেছেন খবরদারী করতে। ভেজাল কোথায় নেই শুনি, তোমরা নিজেরা কি, তোমরা নিজেরাও তো আগাগোড়া এই ভেজাল ঘিয়ে ভাজা। নিজেদের কর্তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলো।'

শরৎ ধমক দিল, 'যা তা বলো না, সরকারের নিন্দা করো না, এ সরকার কংগ্রেসের আর কংগ্রেস ছিল মহাত্মা গান্ধীর। তাঁর নাম শুনেছ?' হরিপদ বলল, 'খুব শুনেছি। এখন ওই নামটুকুইতো শোনাচ্ছ তোমরা, সেই নামাবলীখানাই গায়ে জড়িয়ে রেখেছ। আর কি রাখতে পেরেছ তা ছাড়া? ধরতে হয় আগে বড় বড় রাঘব বোয়ালকে ধরো। আমাদের মত চুনোপুঁটিকে মেরে লাভ কি।'

শরৎ বলল, 'চুনো পুঁটিরাই পরে বড় হয়ে রাঘব বোয়াল হয় সা মশাই।'

সেদিনকার মত চলে এল শরৎ। কিন্তু ভাবনা ধরল মনে। রাঘব বোয়ালদের কি করে ধরবে। সে সাধ্য তার নাই। এই ক'মাস ধরে কান খোলা রেখে অনেক সে শুনতে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে বুঝে দেখতে। পড়ছে এ দলের সে দলের খবরের কাগজ। সব বুঝতে পারেনি। বোঝা শক্ত। সব তো চোখের সামনে হয় না। চোখের আড়ালে আড়ালে কাজ চলে। হৃদয় দিয়ে ছোঁয়া যায় না, বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, বড়ই জটিল এই সংসারের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু এটা মাঝে মাঝে টের পাওয়া যায় রাঘব বোয়ালেরা আছে। জলের তলে তাদের রাজত্ব। তারাই নাড়ছে কলকাঠি। তাদের ধরবে কে?

মাথা গুলিয়ে যায় শরতের, বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। ভেবে যেন আর কুল কিনারা পায় না। বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহাত্মার মূর্তি। কোথায় তাঁর রাজ্য, কোথায় তাঁর মাহাত্ম্য? এ দুনিয়ায়

শুধু কি তাঁর নামটুকু থাকবে আর কিছু থাকবে না ?

একদিন সুখলতা বলল, 'অত কি ভাবছ ? সদাই আনমনা, এত ভাববার কি আছে ?'

শরৎ পরম বিজ্ঞের মত একটু হাসল, 'ভাববার নেই ? তুমি কিচ্ছু টের পাচ্ছ না সুখো, কিছু বুঝতে পারছ না। যদি পেতে তাহলে ও কথা বলতে না।'

সুখলতা বলল, 'আচ্ছা, তোমার সরকারী ভাবনার কথা না হয় নাই বুঝলুম। কিন্তু ঘরে যে ছেলেটা জ্বরে জ্বরে সারা হয়ে গেল, সেদিকে তোমার চোখ পড়বে না ?'

শরৎ বলল, 'পড়বে না কেন। পরশু না গিয়েছিলে ওঘরের যতীনকে নিয়ে হাসপাতালে ? কি হোল ?'

শরতের সময় হয় না বলে অন্য ঘরের একটি ছেলেকে সাধ্য সাধনা করে সুখলতা রোগা ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। অল্প কয়েকজন ডাক্তার, অনেক রোগী। সবাইকে ভালো করে দেখবার তাদের সময় নেই, সময় নেই রোগের বিবরণ ধৈর্য ধরে শুনবার। তারা শুধু একবার তাকায় আর ওষুধের নাম লেখে। যে সব রোগা ছেলের মা দেখতে ভালো দামী দামী শাড়ি গয়না পরা তাদেরই বেশি যত্ন করে। হাসপাতাল গরীবদের জন্যে নয়, হাসপাতাল বড় লোকদের জন্যে।

সুখলতা সব বর্ণনা করে শেষে বলল, 'ও সব সরকারী হাসপাতালেব বিনা পয়সার ওষুধে কিছু হবে না। ছেলেকে যদি বাঁচাতে হয়, পয়সা খরচ করে ভালো ডাক্তার দেখাও।'

বড় জ্বালা সুখলতার গলায়।

শরৎ একটুকাল চুপ করে রইল। সকলের মুখে একই কথা। অসাধুতা অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। দেখে শুনে ঘাবড়ে যায় শরৎ। বুদ্ধিতে যেন কিছু বেড় পাওয়া যায় না।

সুখলতা বলল, 'কি কথাটা কানে গেল আমার, না গেল না ?'

শরৎ বলল, 'গেছে গেছে। মাসের এই ক'টা দিন যাক। মাইনে পাই তারপর দেখাব ডাক্তার। এখন টাকা কোথায় পাব। চুরি করতে যাব না কি ?'

সুখলতা বলল, 'তুমি যাবে কেন আমি যেতে পারব।'

স্ত্রীর সঙ্গে আর ঝগড়া না করে শরৎ বেরিয়ে পড়ল। না, ঘাবড়ে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। তার যতটুকু সাধ্য সে করবে। বড় বড় রাঘব বোয়ালদের ধরা যদি তার শক্তিতে না কুলোয় চুনোপুটিকেও সে ছেড়ে দেবে না। ছোট সাপও সাপ। ছোট অন্যায়ও অন্যায়। প্রাণ দিয়ে সেই অন্যায়কে সে রোধ করবে। আর কিছু না পারুক নিজের আফিসখানা পরিষ্কার রাখবে, ঘরখানাকে রাখবে পবিত্র নির্মল করে। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন এখানে পা রাখতে কোন সঙ্কোচ করতেন না। এ কথা যেন সগর্বে সবাইকে বলতে পারে শরৎ।

দিন দুই বাদে শরৎ কাজে বেরুচ্ছে হঠাৎ দেখল উত্তর-পুব কোণের ঘরের হরকান্ত রাহার মেয়ে মঙ্গলা এক পাঁজা রেশন কার্ড হাতে রেশনেব দোকানে যাচ্ছে।

শরৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'অতগুলি কার্ড কাদের রে ?' তের চৌদ্দ বছর হয়েছে মঙ্গলার বয়স। বাড়ন্ত গড়ন। তবু শাড়ির অভাবে এখনো ওকে ফ্রক পরে থাকতে হয়। খুব চালাক মেয়ে মঙ্গলা। চোখে মুখে কথা বলে।

মঙ্গলা কার্ডগুলি আড়াল করে বলল, 'কাদের আবার, সব আমাদের।'

শরৎ বলল, 'কিন্তু লোক তো তোরা মাত্র চারজন। অতগুলি কার্ড এল কি করে। নিশ্চয়ই জাল কার্ড সব, দেখি।

বলে এগিয়ে গেল শরৎ।

সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা চীৎকার করে উঠল, 'বাবা, দেখ এসে। আমাদের সব কার্ড কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

হরকান্ত বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'কে রে কে কেড়ে নিচ্ছে কার্ড ?'

মঙ্গলাকে কিছু বলতে হল না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারল হরকান্ত। ধমক দিয়ে বলল, 'আমার অত বড় বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাচ্ছ, তোমার লজ্জা করে না শরৎ ? সরে

এসো, এসো বলছি।'

শরৎ দু পা পিছিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু কার্ডগুলি স্খাল কিনা আমি দেখব।'

হরকান্ত গর্জে উঠল, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না, তোমাকে আমি কার্ড দেখতে দেব না। তোমার কোন রাইট নেই আমাদের কার্ড দেখবার। যা করবার রেশনের আফিসে করবে, রেশনের দোকানে করবে, তুমি কে, তোমার মত অমন ঢের পুলিশ দেখেছি আমরা।'

ততক্ষণে আরো দু'চারখানা ঘরের লোক উঠানে নেমে এসেছে। একজন মন্তব্য করল, 'দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে না কেবল জাল আর জাল। লোকে কি না খেয়ে মরবে ? ভাত কাপড়ের কেউ নয়, কিলোবার গোঁসাই।'

ফটিক পোদ্দার বলল, 'আর বলো না। লোকটাকে নিয়ে যা জ্বালা হয়েছে। প্রত্যেকের পিছনে উনি খোঁচা দিয়ে দিয়ে বেড়াবেন। আর বাঘের ঘরে যে ঘোঘে বাসা বেঁধেছে, সেখানে যে পুরোদমে ব্লাক মার্কেটিং চলেছে সে বেলায় দুটি চোখ যেন বোঁজা।'

শরৎও গর্জে উঠল এবার, 'কি কি বললে। আমার ঘরে ব্লাক মার্কেটিং কক্ষনো না, কক্ষনো না। সব মিথ্যে কথা।'

ফটিক বলল, 'মিথ্যে না সত্যি জিজ্ঞেস করো হরি সা'কে। তোমার বউ কালও তার কাছে পাঁচ সিকে করে দু' সের চিনি বিক্রি করেছে। উনি আবার সাধুগিরি ফলাতে আসছেন এখানে।'

শরৎ এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'সা মশাই সত্যি ?'

হরিপদ ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, 'যাকগে, যেতে দাও, যেতে দাও। যা বাজার পড়েছে তাতে কালো বাজারে সবাইকেই নেমে আসতে হবে, বাকি থাকবে কে ?'

কিন্তু শরৎ হরি সা'র উপদেশ শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। এক লাফে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। গোলমাল শুনে সুখলতাও দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ততক্ষণে শরৎ এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

'এসব কি শুনছি, তুই না কি ব্লাক মার্কেটের দরে চিনি বিক্রি করেছিস ?'

সুখলতা বুঝিয়ে বলতে গেল, 'আগে শোনই কথাটা।'

শরৎ বলল, 'শুনব আবার কি, হ্যাঁ কি, না তাই বল।'

সুখলতারও রাগ হলো এবার, বেশ জেদের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ করেছি। ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরে যাচ্ছে বলে করেছি। ওই টাকা দিয়ে আমি ডাক্তার আনব। একটু একটু করে ওই চিনি আমি দু মাস ধরে জমিয়েছি। ভেবে ছিলাম ওদের রস-বড়া করে খাওয়াব। তা ভগবান করতে দিলেন না, এখন ওষুধ খেয়ে তো বাঁচুক। ভালো ডাক্তার এসে তো একবার দেখে যাক।'

কিন্তু কোন কথা শরতের কানে গেল না। ও শুধু খানিকক্ষণ নিষ্পলক হয়ে দেখল তার স্ত্রীর মুখে সেই ছলনাময়ী চোর মেয়েটার মুখ, যাকে দয়া করতে গিয়ে চাকরিতে অবনতি হয়েছে শরতের, অপমান হয়েছে সকলের কাছে।

হঠাৎ ঠাস ঠাস করে গোটা কয়েক চড় বসিয়ে দিল শরৎ স্ত্রীর গালে, 'হারামজাদী, আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মরে তো মরুক। তাতে তোর কি, তোর বাবার কিরে হারামজাদী, তুই কেন ব্লাক মার্কেটিং করতে গেলি ?' চড়ের পর চড় পড়তে লাগল সুখলতার গালে। ন্যায়ের কাছে স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ঠিক বলেছেন ইনস্পেক্টার।

সুখলতার শরীর ভালো যাচ্ছিল না। আগের দিন সাবিত্রী ব্রতের উপোস গেছে। বেশিক্ষণ আর সহ্য করতে পারল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। পড়েই জ্ঞান হারাল।

রোগা ছেলেটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার মাকে মেরে ফেলল।'

উঠান থেকে পাঁচ সাতজন পুরুষ এসে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল শরৎকে। মেয়েরা সুখলতার পরিচর্যা শুরু করল। তাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবীণা বৃদ্ধা পিসী বলল, 'আহাহা বউটাকে খুন করে ফেলেছে গো, খুন করে ফেলেছে। ও আবার পুলিশ। ও আবার সরকারী চাকরি করে। ওকে তোমরা জেলে দাও, শিগগির জেলে দাও।'

হরকান্ত ঘাড় ধরে শরৎকে ঘর থেকে বার করতে করতে বলল, 'তাই দেওয়া উচিত। তোকে

জেলেই দেওয়া উচিত। তোর বড় বাড় বেড়েছে হারামজাদা।' আরো কয়েকটা কিল ঘুসি পড়ল শরতের বুকে পিঠে।

লাল পাগড়ী খুলে গিয়ে উঠানের ধুলোয় পড়ল। নোংরা ময়লা হয়ে গেল সাদা কোট। বুট-জুতো কোথায় ছিটকে পড়েছে তার আর ঠিক নেই।

কিন্তু সে-সব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না শরৎ। সম্বিৎহারা স্ত্রীর দিকে এতক্ষণে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ধরা গলায় বলল, 'তাই দাও। তোমরা জেলেই দাও আমাকে। সরকারী চাকুরির আমি যোগ্য নই, সরকারী গারদই আমার ঠিক জায়গা।'

ভাদ্র ১৩৫৮

বিভ্রম

কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিল অরুণ। পাঁচটায় ব্যাঙ্কের চাকরি শেষ হয়েছে। পার্টটাইমের ছোট কাজটুকু বাকি। ধর্মতলা ন্যাশনাল স্টোর্সে হরেক রকমের চিঠিপত্রের জবাব লিখে টাইপ করতে করতে রাত নটা। তারপর ছুটি। আজ একটু সকাল সকালই বেরুতে পেরেছে ব্যাঙ্ক থেকে। ন্যাশনাল স্টোর্সের কাজটুকু কোন রকমে সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, ইচ্ছেটা তাই। কিন্তু কি হয়েছে আজ শ্যামবাজার ডিপোতে। মিনিট দশেক হতে চলল, না এল একটা ট্রাম, না কোন বাস। অরুণের বিরক্তি ক্রমেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

'মাস্টারমশাই না?'

নারীকণ্ঠে একটু চমকে উঠে অরুণ চোখ তুলে তাকাল। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ফর্সাপানা দোহারা চেহারার একটি মেয়ে কাছে এগুতে এগুতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে একটু পিছিয়ে গেল। মেয়েটি সুন্দরী। বেশেবাসে খুব পারিপাট্য না থাকলেও পরিচ্ছন্নতা আছে। চওড়া কালোপেড়ে একখানা তাঁতের শাড়ি পরনে, কানে লাল পাথর বসানো দুল। হাতে দু'গাছি মোটা চুড়। মাথায় আঁচল নেই, কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুরের আভাস দেখা যাচ্ছে। ঠিক চিনতে না পারলেও মেয়েটি যে তার পুরনো ছাত্রীদেরই একজন তা অনুমান করতে অরুণের দেরি হল না। সেও সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এই যে, ভালো আছ?'

অনেকদিন আগে দেখা পরিচিত লোকের মুখ ভুলে যাওয়া অরুণের এক রোগ। তার জন্যে অনেকবার অনেক জায়গায় অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। দাম্ভিক বলে মনে করেছে লোকে। এই প্রাক্তন ছাত্রীটিকে তেমন ভুল ধারণা করবার সুযোগ সে দিতে চায় না।

বছর দশেক আগে অরুণ দিনরাত প্রাণপণে টিউশানি করত। চাকরিবাকরি কিছু ছিল না। বছর কয়েক ধরে ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যাদানই ছিল একমাত্র জীবিকা। দুপুরবেলায় চাকরির চেষ্টা করে বেড়াত আর সকাল সন্ধ্যায় ছিল টিউশানি। টালা থেকে টালীগঞ্জ আর পাথুরেঘাটা থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে অন্তত দু মাসের জন্যেও অরুণ মুখুজ্যে গৃহ-শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত হয়নি।

মেয়েটি বলল, 'আপনি চিনতে পেরেছেন?'

অবশ্য তখনো মেয়েটির নাম, কি মুখ, অরুণ স্পষ্ট মনে আনতে পারেনি। কিন্তু সেকথা বলে মেয়েটিকে ক্ষুণ্ণ করতে তার বাধল। ওর কথার জবাবে অরুণ তাই হেসে বলল, 'বাঃ চিনব না কেন, অতদিন ধরে তোমাকে পড়ালাম আর চিনতে পারব না? তুমিই বরং চিনিনে চিনিনে করে চলে যাচ্ছিলে।'

মেয়েটি মৃদু হাসল, 'উল্টে আমাকেই দোষ দিচ্ছেন! আমিই তো প্রথমে চিনলাম, প্রথমে ডাকলাম আপনাকে। আপনারই তো চিনতে বেশি সময় লেগেছে।'

অরুণ একটু হাসল, 'তা লেগেছে। তোমার এত অদলবদল হয়েছে যে দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক চিনে ওঠা শক্ত।' একটু থেমে অরুণ আবার হেসে বলল, 'বিয়ে হয়েছে কতদিন?'

মেয়েটি অরুণের দিকে একবার তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে নিল, 'তা বছর ছয়েক

হয়ে গেল। ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ঢুকেছিলাম, বাবা আর পড়তে দিলেন না।'

অরুণ কৌতুকের সুরে বলল, 'একেবারে বিয়ে দিলেন—না ? বেশ বেশ, এই তো ভালো হয়েছে। তা কোথায় আজকাল আছ তোমরা ? বাসা কোথায় ?'

প'রম পরিচিত আর অন্তরঙ্গ সুরে অরুণ জিজ্ঞেস করল। মেয়েটিকে চিনতে সে এখনো পারেনি। এতক্ষণে চিনবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি তার অগণিত ছাত্রীদের মধ্যে একজন, আপাতত এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। তারপর ধীরে ধীরে সব বেরুবে। নাম-ধাম জ্ঞাতি-গোত্র মেয়েটির মুখ থেকেই পরে সব বের করে নিতে পারবে। এত তাড়া কিসের ?

মেয়েটি বলল, 'বাসা কাছেই, এই একটু এগিয়ে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে।'

অরুণ বলল, 'তা হলে তো খুবই কাছে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখে আসব তোমাদের গৃহস্থালী। আপত্তি নেইতো ?'

মেয়েটি বলল, 'বাঃ আপত্তি কিসের ? আজই আসুন না, এলে সত্যিই ভারী খুশি হব। আজই চলুন।'

অরুণের ভারী অবাক লাগছিল। বড় একটানা একঘেয়ে জীবনযাত্রা। সকালে উঠেই বাজারে ছুটতে হয়। তারপর মাথায় দু-ঘটি জল ঢেলে তাড়াতাড়ি নাকেমুখে কিছু গুঁজে অফিসে বেরুনো, রাত নটা পর্যন্ত খেটে ক্লান্ত দেহে বাসায় ফেরা। কোন রকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শ্রান্ত দেহকে গড়িয়ে দেয় বিছানায়।

স্ত্রীর একটানা অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি আরম্ভ হবার আগেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। এই বাঁধা রুটিনের নাগরিক জীবন। কোন দিক দিয়ে যে ঋতু পরিবর্তন হয়, পৃথিবীর রঙ বদলায় তার কিছু টের পাওয়ার জো নেই, কিন্তু আজকের বিকেলে ভুলে যাওয়া এই তন্বী ছাত্রীটির আন্তরিক আমন্ত্রণে অরুণের মনে হল বহুকাল বহুযুগ বাদে হঠাৎ যেন বৈচিত্র্যের আমেজ লেগেছে। অভ্যস্ত বিবর্ণ জীবনে লেগেছে এক ছিটে রং।

এতক্ষণে এস্‌প্লানেডগামী ট্রাম আর বাস দুই-ই এসে দাঁড়িয়েছে। মেযেটির কাছে বিদায় নিয়ে যে কোন একটায় উঠে পড়লেই হয়। কিন্তু অরুণ কোনটিতেই উঠল না। আজ না হয় খানিকক্ষণ দেরি করেই যাবে ন্যাশনাল স্টোর্সে। মেয়েটির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আজই যেতে বলছ ?'

মেয়েটি আরও আগ্রহের সুরে বলল, 'এলে সত্যি ভারী খুশি হব।'

অরুণ মন স্থির করে ফেলল, 'আচ্ছা চল, দেখেই আসা যাক তোমাদের বাসা।'

মেয়েটি বলল, 'চলুন।'

দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগল।

পথচারীদের কেউ কেউ আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে গেল।

অরুণ মনে মনে একটু হাসল, দুজনের সম্পর্ক যে ছাত্রী-মাস্টারের তা হয়তো ওরা কেউ অনুমানই করছে না, হয়তো অন্যরকম কিছু আন্দাজ করছে। মেয়েটির ভাবভঙ্গিও ঠিক একেবারে ছাত্রীজনোচিত নয়। যদিও বয়সে অরুণের চেয়ে অন্তত সাত আট বছরের ছোট হবে, তবু কথাবার্তায় চালচলনে মেয়েটি সেই বয়সের ব্যবধান যেন অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। ও তো এখন আর অরুণের ছোট ছাত্রীটি নেই। এখন ও আর-একটি সংসারের গৃহিণী—কর্ত্রী। জীবন সম্বন্ধে ওরও নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। পুরনো মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে খানিকটা সমবয়সী বন্ধুর মত ব্যবহার ও করবে বইকি।

হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি আলাপ করতে করতে চলল। কোথায় বাসা অরুণের, কোথায় চাকরি, কতদিন ধরে আছে ওই অফিসে। কোন স্কুল-কলেজের, কি পুরনো দিনের পড়াশুনার কথা ওর বোধ হয় আর পাড়বার ইচ্ছে নেই, সে যুগ তো পার হয়ে এসেছে।

খানিকটা এগিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নিতে হল। তারপর একটা ব্যারাকবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলল, 'আসুন, দোতলায় আমাদের ঘর। সিঁড়িতে আলো নেই, আপনার ভারী অসুবিধে হবে।'

অরুণ বলল, 'না না, অসুবিধার কি আছে।'

অরুণের আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মেয়েটি গলা নামিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, 'এমন কৃপণ বাড়িওয়ালা আমি আর দুটি দেখিনি। এত বলা-কওয়া, তবু কিছুতেই সিঁড়িতে একটা আলোর ব্যবস্থা করবে না।'

সিঁড়ির ডানদিকে পাশাপাশি দুখানা ঘর। তার একখানার সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটি কড়া নাড়ল। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা দরজা খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে একটু সরে দাঁড়ালেন, অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'ইনি কে বউমা।'

মেয়েটিও এবার মাথায় আঁচল তুলে দিল, তারপর দুজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার শাশুড়ী। আর ইনি আমার মাস্টারমশাই। পথে আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।'

মহিলা বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

আমন্ত্রণ জানিয়ে মহিলাটি কিন্তু আর দাঁড়ালেন না, আরো ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি একটি গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন।'

বেশ বোঝা যায় ঘরখানা চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের একটি বৈঠকখানা। উঁচু-নিচু খানকয়েক চেয়ার। একধারে লম্বা একটি বইয়ের র‍্যাক। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বড় একখানি ফোটো, জানলা-দরজায় রঙিন পর্দা।

ভারী ভালো লাগল অরুণের। অতি চেনা, অতি পরিচিত পরিবেশ, তবু ঠিক যেন একেবারে পরিচিত নয়। এরই মধ্যে বেশ একটু নতুনত্ব আছে, বৈচিত্র্য আছে। বন্ধু-বান্ধবের এমন আরো অনেক বাড়িতে অরুণ হয়তো বহুবার গেছে। কিন্তু ঠিক এই বাড়িটিতে এর আগে সে তো একবারও আসেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য, মেয়েটির সঙ্গে এখনো সেই অপরিচয়ের রহস্য জড়িয়ে রয়েছে। তার ছাত্রী তাকে চিনেছে। কিন্তু অরুণ এখনো ওকে চিনতে পারেনি। অদ্ভুত ওর ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু কোথায় পড়িয়েছে মেয়েটিকে! ওর নামই বা কি। একবার মনে হচ্ছে রেণু। আবার মনে হচ্ছে সুধা। তারপর মনে হচ্ছে এর কোনটাই নয়, অন্য নাম। জায়গাটার কথাও ঠিক মনে পড়ছে না। একবার মনে হচ্ছে, পার্কসার্কাসের সেই প্রগলভা ছাত্রীটি, আর একবার মনে হচ্ছে, না শ্যামবাজারে সেবার টেস্টের পর যে দুটি বোনকে একসঙ্গে মাস তিনেক পড়িয়েছিল বোধ হয় তাদেরই একজন। আশ্চর্য, কিছুতেই ঠিকমত মনে আনতে পারছে না। টিউশানির দিনগুলি মোটেই সুখকর ছিল না। হয়তো সেই জন্যেই ভুলে গিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু এতখানি আলাপ-পরিচয়ের পর সে কথা আর বলা চলে না। কিছুতেই ওকে বুঝতে দেওয়া যায় না যে অরুণ এখনো ওকে চিনতে পারেনি কি মনে আনতে পারেনি নাম। মেয়েটি কি ভাববে। বরং অরুণ আরও অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে আলাপ আরম্ভ করল, 'তুমি তো বেশ সুগৃহিণী দেখছি।'

মেয়েটি মৃদু হাসল, 'কেন। গৃহিণীপনার কি এমন দেখলেন।'

অরুণ বলল, 'ঘরখানা বেশ চমৎকার করে গুছিয়েছ।'

মেয়েটি তেমনি হেসে বলল, 'ইস ভারী তো গুছোন। আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।'

বলে মেয়েটি পাশের ঘরে চলে গেল। তারপর চার-পাঁচ বছরের একটি সুন্দর ছেলের হাত ধরে এনে অরুণের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'ভারী লাজুক। ও ঘর থেকে আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করছে, কে মা, কে। কে আমি বলব কেন। নিজে এসে আলাপ পরিচয় করো।'

ছেলের দিকে হাসিমুখে তাকাল তার মা। ছেলে তখন মুখ ফিরিয়েছে। ছেলের মা এবার মৃদু ধমক দিল, 'ছিঃ হাবুল, অমন করে নাকি, নমস্কার করো মাস্টারমশাইকে।'

হাবুল এগিয়ে আসতেই অরুণ তাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল, 'বেশ ছেলে, ভারী লক্ষ্মী ছেলে। তোমার নাম শুনলুম, তোমার বাবার নাম কি বলতো?'

হাবুল বলল, 'শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়।'

কিন্তু মার নাম তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না। তা ছাড়া হাবুল আর কোন জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগই দিল না অরুণকে। একটু বাদেই তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাল।

মেয়েটি আবার বলল, 'ভারী লাজুক। আপনি বসুন একটু। অন্যদিন এতক্ষণ বাসায় চলে

আসেন। আজ. কোথায় গেছেন কে জানে। এলে আলাপ পরিচয় হত। বসুন, আমি আসছি এক্ষুনি।'

বলে মেয়েটি আবার ভিতরে চলে গেল। অরুণ উঠে গিয়ে র‍্যাকের বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। বই দেখাটা উদ্দেশ্য নয়, কোথাও মেয়েটির নাম লেখা আছে কি না অরুণ তাই খুঁজে বের করতে চায়, হয়তো নামের সঙ্গে সঙ্গে সব মনে পড়বে। কিন্তু বেশির ভাগ বইয়ের পাতায় নাম রয়েছে বাইরের বন্ধুবান্ধবদের, না হয় কোন লাইব্রেরীর। দু-চারখানায় মাত্র গৃহস্বামীর নাম লেখা আছে।

হতাশ হয়ে অরুণ এসে ফের নিজের চেয়ারে বসল। একটু বাদেই মেয়েটি আবার এসে ঘরে ঢুকল। চা আর ডিমের অমলেট করে নিয়ে এসেছে প্লেটে করে। ছোট একখানা টুল নিজেই ঘরের কোণ থেকে টেনে নিয়ে তার ওপর সযত্নে রেখে দিল খাবার।

অরুণ বলল, 'আবার এসব কেন।'

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, 'কি আর এমন, নিন।'

বলে টুলটা আর একটু সামনে এগিয়ে দিল অরুণের।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভারী তৃপ্তি বোধ করল অরুণ। বেশ সুরভিত দামী চা। অনেকদিন এমন স্বাদ আর গন্ধ যেন ভাগ্যে জোটেনি। কাজ থেকে চুরি করে নেওয়া অপূর্ব একটি সন্ধ্যাকে দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের ভিতর থেকে অরুণ যেন খুঁড়ে বের করেছে। এর মাধুর্যের শেষ নেই, রহস্যেরও অবধি নেই।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অরুণ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

একটু ইতস্তত করে আর একখানা চেয়ার কাছে এগিয়ে এনে মেয়েটি এবার তাতে বসে পড়ল।

অরুণ বলল, 'দেখ, আজকে তোমাদের এখানে এসে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।'

মেয়েটি বলল, 'কি কথা।

অরুণ বলল, 'পড়াশুনার পাট চুকবার পরই মাস্টারমশাইর সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর ঠিক সৌহৃদ্য হয়। তোমাকে সত্যি কথা বলি, দিনরাত প্রাণের দায়ে টিউশানি করে গেছি। তাতে না পেয়েছি নিজে আনন্দ না খুশি করতে পেরেছি তোমাদের। বিদ্যেদান করতে করতে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। বিরক্তির আর সীমা থাকেনি। মাস্টারমশাইর সম্বন্ধে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো ধারণা হয়নি।'

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, 'কিন্তু আমাদের ধারণাও তো বদলাতে পারে, অন্তত আমার তো বদলেছে। যখন নিজে ছাত্রী ছিলাম ভাবতাম সব দোষ মাস্টারমশাইদের। তাঁরাই অকারণে বিরক্ত হন, বকাবকি করেন, এমন কি ফাঁকি দেন, এখন নিজে মাস্টারি নিয়ে বুঝতে পারছি অবস্থাটা। বুঝতে পারছি সময় সময় কত অবিচার করেছি, কত অন্যায় ব্যবহার করেছি তাঁদের সঙ্গে।'

অরুণ বলল, 'তুমি নিজেও মাস্টারি নিয়েছ না কি ? কই বলনি তো এতক্ষণ। কোথায়, কোন স্কুলে ?'

মেয়েটি একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'এই কাছেই, বউবাজার বিদ্যাপীঠে। নতুন স্কুল, মাইনেও কম। তবু নিলাম। কিছুতেই যেন কুলিয়ে ওঠা যায় না। বসে থাকার চাইতে যেটুকু সাহায্য করতে পারি—'

অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

অরুণ আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কি করেন ? চাকরি ?'

মেয়েটি একটু হাসল, 'আবার কি।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আর লেখেন মাঝে মাঝে।'

অরুণ উৎসাহের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই নাকি ? বইটই আছে ?'

মেয়েটি বলল, 'এবার বেরিয়েছে প্রথম উপন্যাস। দেখবেন ?'

অরুণ পিঠ চাপড়ানোর সুরে বলল, 'নিশ্চয়ই, তোমার স্বামী বই লিখেছেন আর আমি দেখব না ? শিগগির নিয়ে এসো।'

মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একখানা বই নিয়ে এল।

'কি নাম ?' অরুণ জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটি বলল, 'কালস্রোত।'

তারপর অরুণের দিকে এগিয়ে দিল বইখানা।

অরুণ উল্টেপাল্টে দেখল খানিকক্ষণ। আজকাল গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে তার আর বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু মেয়েটিকে খুব উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'শুধু দেখে কি লাভ ? পড়তে পারলে তো হতো।'

লজ্জিত মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে পাশের ঘরে ছুটলো। ছোট্ট একটি ফাউন্টেনপেন নিয়ে এসেছে এবার। তারপর বইয়ের প্রথম পাতায় কি লিখতে গিয়ে লজ্জিতভাবে তাকাল অরুণের মুখের দিকে।

অরুণ হাসিমুখে বলল, 'কি ব্যাপার ? একেবারে প্রেজেন্ট করতে চাও নাকি ? বেশ, বেশ।'

মেয়েটি বলল, 'আমার অবশ্য প্রেজেন্ট করবার কথা নয়। কিন্তু উনি তো এসে পৌঁছুলেন না। তা ছাড়া ফিরতে ফিরতে আজ হয়তো ওঁর অনেক রাত হয়ে যাবে।'

অরুণ বলল, 'না না, তুমি দাও। ওঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই, পরিচয় তোমার সঙ্গে, সম্পর্ক তোমার সঙ্গে। দেওয়ার যোগ্য অধিকারিণী তো তুমিই।'

বলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অরুণ ফের একটু হাসল।

মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু লিখতে গিয়ে ফের ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটি। তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে আরক্ত মুখে হঠাৎ বলল, 'কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই, আপনার নামটি যেন কি। নামটি ঠিক মনে আনতে পারছিনে।'

এবার বিস্মিত আর আহত হওয়ার পালা অরুণের। মুহূর্তকাল সে কোন কথা বলতে পারল না।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি রাগ করলেন ? আমি কিছুতেই মনে আনতে পারছিনে। বাবা এত ঘন ঘন মাস্টার বদলাতেন—'

অরুণ মুখে হাসি টেনে বলল, 'শুধু নাম কেন, মাস্টারমশাইদের মুখও তোমার পক্ষে মনে রাখা শক্ত। তাই না ? কিন্তু নাম দিয়ে কি হবে ? লিখে দাও মাস্টারমশাইকে।'

মেয়েটি বলল, 'শুধু তাই লিখব ?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, আর তোমার নাম।'

বলে অরুণ অদ্ভুত একটু হাসল।

মেয়েটি ভ্রূকুঞ্চিত করে চোখ তুলে অরুণের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, একটু যেন কি ভাবল, তারপর গোটা গোটা অক্ষরে মাস্টারমশাইর নিচে নামটিও স্বাক্ষর করল।

অরুণ বইটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা, আজ চলি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তার আলোয় অরুণ এবার নামটা পড়ল, 'নীতা।'

তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনদিনই যে মাস্টার-ছাত্রীর সম্পর্ক ছিল না, পরিচয়মাত্র ছিল না, অরুণের মত মেয়েটিরও নিশ্চয় তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তার মত মেয়েটিও নিশ্চয়ই এতক্ষণ ধরে কেবল অভিনয় করছিল। আর শুধু তাই নয়, অরুণের অভিনয়ও তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের হয়তো টের পেতে বাকি থাকেনি। কিন্তু এই নামটি ? এটি কি ? সব বুঝে সব টের পেয়েও একজন অপরিচিত, অশোভন চরিত্রের পুরুষকে তার নিজের নাম সত্যিই কি মেয়েটি জানতে দিয়েছে ? না এ নামটাও বানানো ? সে কথা কোনদিনই জানা যাবে না।

পৌষ ১৩৫৮

বিলম্বিত লয়

আমার সহকর্মী সুব্রত চক্রবর্তী সেদিন তার শিল্পী বন্ধু মৃগাঙ্ক চাটুয্যের বাড়িতে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য নিছক বেড়ানটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এই বছর কয়েকের মধ্যে শিল্পী হিসেবে মৃগাঙ্কবাবুর খুব খ্যাতি হয়েছে। পাবলিশারের ইচ্ছা আমার নতুন বইয়ের মলাট তাঁকে দিয়ে আঁকিয়ে নিই। লেখকের ললাট নাকি আজকাল মলাটের ওপরই বেশি নির্ভর করে। অবশ্য শুনেছি ইদানীং কমার্সিয়াল লাইন মৃগাঙ্কবাবু প্রায়ই ছেড়েই দিয়েছেন। তিনি ফিরে গেছেন তাঁর ফাইন আর্টস-এ। খুব যত্ন করে সময় নিয়ে বছরে তিন চারখানা ছবিই তিনি আঁকেন। সেসব ছবি যে খুব বেশি দামে বিক্রি হয় তা নয়, তবু নিজেদের খরচ কমিয়ে স্বল্প আয়েই সন্তুষ্ট থাকেন মৃগাঙ্কবাবু। বইটইয়ের কাজ বড় বেশি একটা আর করেন না। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে হয়ত সম্মত হন। মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে আমার সামান্যই পরিচয়। কিন্তু সুব্রতদার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা।

ভবানীপুরের ক্লার্ক লেনে ওঁদের বাড়ি। বাস স্টপেজ থেকে মিনিট পাঁচ ছয়ের বেশি হাঁটতে হল না। ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়তেই একটি মহিলা এসে দোর খুলে দিলেন। ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় তাঁকে বেশ সুন্দরীই মনে হল। তবে তেমন স্বাস্থ্যবতী নন। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে বলে মনে হল। পরনে শাদা খোলের কালো পেড়ে মিলের শাড়ি। তবে পাড়টা চওড়া, জমিটা মিহি। হাতে দু'গাছি চুড়ি আর গলায় সরু এক চিলতে হার ছাড়া দেহে অন্য কোন আভরণ নেই। সমস্ত চেহারায় বেশে-বাসে রুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতাটুকু আমার বেশ ভালো লাগে। সুব্রতদাকে দেখে তিনি একটু হাসলেন, 'এই যে এসো এসো, কতদিন ধরে তোমার দেখা সাক্ষাৎ নেই। এপথ তো ভুলেই গেছ।' সুব্রতদা স্মিত মুখে বললেন, 'তোমাদের মত তো আর নয়, চাকরিবাকরি করে খেতে হয়, সময় পাইনে। এসো আলাপ করিয়ে দেই। আমার সহকর্মী বন্ধু কল্যাণ রায়, আর ইনি সুবিখ্যাত গায়িকা অদিতি দেবী, অদিতি চ্যাটার্জি।' আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নমস্কার বিনিময় করলাম। মৃদু হেসে বললাম, 'ও, রেডিও রেকর্ডে আপনার গান অনেক শুনেছি। এতদিনে চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হল।'

অদিতি দেবীও একটু হাসলেন, 'সে তো উভয়ত। আসুন।'

সুব্রতদা বললেন, 'মৃগাঙ্ক বাড়ি আছে তো ?'

'অদিতি দেবী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আছেন।'

তারপর আমরা দুজনে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। ছোট ছোট ঘর। রাস্তার দিকের ঘরখানাতেই ড্রয়িং রুম করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনী কয়েকটি বেতের চেয়ার, একটি কমদামী সোফা। মাঝখানে নিচু একটি বাঁশের বেতির টেবিল। দক্ষিণ দিকে ছোট একটি কাঁচের আলমারিতে কিছু বইপত্র, দেওয়ালে দু'তিনখানা ল্যান্ডস্কেপ। খুব স্বচ্ছল অবস্থার গৃহস্থ বলে মনে হয় না। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক আসবাবের মধ্যেও এঁদের পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচিটা বেশ চোখে পড়ে।

অদিতি দেবী আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনারা বসুন। আমি ওঁকে খবর দিচ্ছি।'

একটু বাদেই মৃগাঙ্কবাবুপাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে বয়স। রঙটা শ্যাম। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। দোহারা গড়ন। চেহারায় তেমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গেও নমস্কার বিনিময় হল।

তিনি বললেন, 'বসুন। বহুদিন পরে দেখা।'

সুব্রতদা অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'ঘরে বসে বসে এই বিকেল বেলায় করছিলে কি ? ছবি আঁকছিলে নাকি ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তোমাদের ধারণা সব সময়েই বুঝি ছবি আঁকা যায় ? সব সময়েই বুঝি ছবি আঁকি ?'

সুব্রতদা বললেন, 'তবে কি করছিলে ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'সে কিছু না।'

অদিতি দেবীও এসে দাঁড়িয়েছিলেন, হেসে বললেন, 'কিছু না কেন ? বলব ? মৃগাঙ্ক আধুনিক আর ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একটা তুলনামূলক আলোচনা করে প্রবন্ধ লিখছিল। 'সঙ্গীত ও সমাজ' পত্রিকা ধরে বসেছে একটা আর্টিকেল তাঁদের দিতেই হবে। আমি তাঁদের বলেছি, গানের তত্ত্বালোচনার মত বিদ্যে আমার নেই, তাই মৃগাঙ্ক সে ভার নিয়েছে।'

সুব্রতদা বললেন, 'বিনয় করো না, তুমি যে আবার অন্যদিকে বিদ্যা অর্জনের চেষ্টা করছ, তা আমার জানা আছে।' আমার দিকে তাকালেন সুব্রতদা। 'জানো কল্যাণ, চিত্রশিল্পের ইতিহাস আর ব্যাকরণ অদিতির আজকাল কণ্ঠস্থ।'

অদিতি দেবী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'কি যে বলো। তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। তুমি একটি মূর্তিমান অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, ছবি তো নিজে আঁকতে পারিনে, আর্ট সম্বন্ধে এক আধখানা বইপত্র মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করেই সাধ মেটাই।'

আমি আর কিছু বললাম না।

হঠাৎ ভিতর থেকে দুটি ছেলেমেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল। ছেলেটি অদিতির আঁচল ধরে টানতে টানতে বলল, 'মা মা শোন ও বাড়ির মিলুরা কত বড় একটা কুকুর এনেছে দেখে যাও।'

অদিতি হেসে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, একটু বাদে দেখব।'

আমি ছেলে মেয়েদেব দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য, ভাইবোনের চেহারায় গায়ের রঙে মুখ চোখের ধরনে একটুও যেন মিল নেই, অদিতি দেবী তো অত ফর্সা, কিন্তু মেয়েটির রঙ খুব কালো। মৃগাঙ্কবাবুর চেয়েও অনেক বেশি ময়লা। ঠিক ময়লা বলা চলে না। কালো পাথরের মত উজ্জ্বল মসৃণ, মুখ চোখের গড়নও মা বাপের মত নয়। লম্বাটে ধরনের মুখ। বড় কালো কালো চোখ। বছর সাতেক বয়স হবে মেয়েটির। আর ছেলেটির মুখখানা গোলগাল। রঙটা ফর্সা। কিন্তু মায়ের মত অমন গৌর নয়, একটু ফ্যাকাসে ধরনের। ছেলেটির বয়সও বছর সাতেক হবে।

আমি ওদের দুজনকে কাছে ডেকে আলাপ করতে চেষ্টা করলাম।

'এসো খুকি, তোমার নাম কি।'

'কৃষ্ণকলি চট্টোপাধ্যায়।'

'বাঃ, সুন্দর নাম। আর তোমার ?' ছেলেটির দিকে তাকালাম আমি।

'আমার নাম আনন্দ।'

আমি হেসে বললাম, 'আনন্দ কি? তুমি বুঝি পদবী ব্যবহার করো না ?'

আনন্দ এবার কোন জবাব না দিয়ে মার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল।

একটু বাদে অদিতি দেবী চায়ের ব্যবস্থা করলেন। নিজে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে এলেন। তারপর আমার হয়ে সুব্রতদাই বইয়ের প্রচ্ছদপটের কথা পাড়লেন।

কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কোন জবাব দেবার আগেই অদিতি দেবী বলে উঠলেন, 'কিন্তু ওর তো মোটেই এখন সময় নেই সুব্রত। নতুন ক্যানভাসটা নিয়ে এত ব্যস্ত—'

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'তাহলে থাক, তাহলে থাক।'

মৃগাঙ্কবাবু পরম সৌজন্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। দেখি যদি ছবিটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, যদি কোন রকমে সময় করে উঠতে পারি, আপনাকে আমি নিশ্চয়ই জানাব। কিছু মনে করবেন না।'

বললাম, 'না না তাতে কি হয়েছে। কিছু মনে করবার কি আছে এর মধ্যে।'

অদিতি দেবী বললেন, 'তবু আপনি অনেক কষ্ট করে এলেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ তা এসেছি। কিন্তু কষ্ট সার্থক করবার ভার আপনাদের হাতে। যদি দু একটা গান শুনে যেতে পারি, তাহলে আর কোন ক্ষোভ থাকবে না।'

অদিতি দেবী মৃদু হেসে বললেন, 'আর একদিন, সে আর একদিন হবে। গলাটা কদিন ধরে বড় খারাপ যাচ্ছে। চাপা সর্দিতে বড় ট্রাবল দিচ্ছে। গলাটা একটু শোধরালে আপনাকে আমি নিজেই খবর দেব।'

মৃগাঙ্কবাবুও বললেন, 'হ্যাঁ গলা নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছে কদিন ধরে। আচ্ছা ওর নতুন রেকর্ডখানা শুনেছেন ? দু'খানা ভজন ?'

বললাম, 'না।'

'তাহলে শুনুন।'

অদিতি দেবী বাধা দিতে লাগলেন, 'কি যে কর তুমি।'

কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু আমাদের আপ্যায়ন করবার জন্যে নিজেই গ্রামোফোন আর রেকর্ডখানা নিয়ে এলেন। বেশ মিষ্টি গলা, শুনতে আমাদের ভালোই লাগল। যতক্ষণ রেকর্ড বাজল, অদিতি দেবী টুক টাক সাংসারিক কাজকর্ম করতে লাগলেন। রেকর্ড শেষ হতে তিনি বললেন, 'ওর যত পাগলামি।'

আমরা বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম, অদিতি দেবী বললেন, 'ভালো কথা সুব্রত, ওর নতুন ল্যান্ডস্কেপখানা দেখেছ ?'

সুব্রতদা বললেন, 'না দেখালে কি করে দেখব ? আমাদের তো আর পয়সা দিয়ে ছবি কেনার শক্তি নেই।'

অদিতি দেবী হেসে বললেন, 'পয়সা দিয়ে যেন তোমরা রেকর্ডই খুব কেন।'

ড্রয়িং রুমের লাগা আর একখানা ঘর। দরজায় নীল পর্দায় আধখানা ঢাকা ; বাকি আধখানা দিয়ে একখানা খাট চোখে পড়ল। শাদা চাদরে ঢাকা দুটি বালিশ। ডানদিকে তাকের ওপর কাঁচের ফুলদানিতে কয়েকটি রজনীগন্ধা। দেয়ালে টাঙানো সবুজ রঙের ঢাকনিতে ঢাকা একটি তানপুরা। সে ঘরের পাশ দিয়ে আমরা আর একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দক্ষিণ মুখী ছোট্ট একখানা ঘর। দক্ষিণ দিকেই দুটি জানালা আছে। মৃগাঙ্কবাবুর স্টুডিও। রঙের বাক্স, গোটা কয়েক তুলি ইতস্তত ছড়ানো। কোণের দিকে একখানা ইজেল। ওপরে কালো রঙের একখানা কাপড়ের আচ্ছাদন। অদিতি দেবী ঘরের দিকে তাকিয়ে মৃদু তিরস্কারের সুরে বললেন, 'তোমার আগোছার অভ্যেস আর গেল না। এই মিনিট পনের আগেই না ঘর গুছিয়ে দিয়ে গেছি। আর এরই মধ্যে সব উলটে পালটে—'

মৃগাঙ্কবাবু স্মিত মুখে স্ত্রীর এই মধুর গঞ্জনাটুকু উপভোগ করলেন। কিন্তু অদিতি দেবী যখন ক্যানভাসের ঢাকনি খুলে ফেললেন, মৃগাঙ্কবাবু আর সে ঘরে রইলেন না।

রৌদ্রদগ্ধ একখণ্ড মাঠ। দিগন্তে তাল আর খেজুরের ইশারা। মাঠখানাকে ঠিক বাঙলা দেশের মাঠ বলে মনে হল না। অন্য কোন দেশের মাঠ আমার দেখা নেই। তাই এ প্রান্তরের দেশকাল নির্ণয় করতে পারলাম না।

অদিতি দেবী আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল ?'

বললাম, 'বেশ।'

অদিতি দেবী বোধ হয় আরো কিছু প্রশংসা আশা করেছিলেন। আমার কার্পণ্য দেখে চুপ করে গেলেন। তারপর সুব্রতদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভেবেছি এটা আমরা একজিবিশনে পাঠাব। আচ্ছা, এবার শীতের সময় একটা ওয়ান ম্যান শো করলে কেমন হয়। মৃগাঙ্ক অবশ্য মোটেই গা করে না। কিন্তু আমার তো মনে হয় ইট ইজ হাই টাইম—তোমাদের বন্ধুদেরই তো এসব ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত।'

সুব্রতদা সায় দিয়ে বললেন, 'তা ঠিক।'

সদর দরজা পর্যন্ত ওঁরা আমাদের এগিয়ে দিলেন। আমরা বিদায় নেওয়ার আগে মৃগাঙ্কবাবু যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'কেমন লাগল।'

বললাম, 'ভালো, বেশ ভালো।'

গলায় যতখানি উৎসাহ আনতে চেষ্টা করলাম, ততখানি যেন এল না।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অদিতির রেকর্ড যত ভালো লেগেছে, তেমন বোধ হয়—'

অদিতি দেবী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। কানের চেয়ে মানুষের চোখের শিক্ষার দেরি হয় বেশি। ওঁরা তোমার আরো ছবি দেখুন, তখন ওসব কথা জিজ্ঞেস করো।

সদুত্তর পাবে।'

অদিতি দেবী হাত তুলে বিদায় নমস্কার জানিয়ে স্মিত সৌজন্যে বললেন, 'আর একদিন আসবেন, অবশ্যই আসবেন কিন্তু।'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে এবং নমস্কার বিনিময় করে এবার সত্যিই বিদায় নিলাম আমরা।

পথে নেমে সুব্রতদা বললেন, 'কেমন লাগল ?'

বললাম, 'কিসের কথা বলছেন ? ছবি, গান, না পরিবারটিকে ?'

সুব্রতদা বললেন, 'ছবি আর গান সম্বন্ধে তোমার মতামতের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। পরিবারটির কথাই জিজ্ঞেস করছি।'

বললাম, 'খুব ভালো। কিন্তু একটু যেন বেশি রকমের ভালো।'

সুব্রতদা হেসে বললেন, 'কি রকম ?'

বললাম, 'দাম্পত্য প্রেম খুবই ভালো জিনিস। কিন্তু বাড়াবাড়ি হলেই অন্যের চোখে লাগে।'

সুব্রতদা একটু হাসলেন, 'বাড়াবাড়ি ? কিন্তু এর আগে যা বাড়াবাড়ি ওরা করেছে তার তুলনায় এতো কিছুই নয়।'

বললাম, 'কি রকম ? একটু যেন গল্পের গন্ধ পাচ্ছি।'

সুব্রতদা বললেন, 'গল্প আবার কোথায়। তোমার নাকেরই দোষ।

পণ্ডিতিয়া প্লেসে ওর একটু কাজ ছিল। তা সেরে নিয়ে আমরা দুজন ত্রিকোণী পার্কের একটা বেঞ্চ দখল করে বসলাম। রাত প্রায় আটটা, আকাশে মেঘ। বাদলা হাওয়ায় বেশ একটু শীত শীত করছে।

সুব্রতদা বললেন, 'গল্পটি বলতে পারি কিন্তু দুটি সর্ত।

বললাম, 'কি কি।'

'এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো। এই ঠাণ্ডায় সিগারেট ছাড়া মানুষ জমে যায়, গল্প জমে না।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে এলাম।

সুব্রতদা বললেন, 'দ্বিতীয় শর্ত এ গল্প তুমি লিখতে পারবে না। ওঁরা দুজন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

বললাম, 'কলম ছুঁয়ে শপথ করছি সুব্রতদা আপনার বলা গল্প আমি কক্ষণো না—'

সুব্রতদা বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক অত কঠিন প্রতিজ্ঞা তোমার আর করে কাজ নেই। দিনকাল ভালো না। কলমটা শেষে পকেটমারের পেটে যাবে। তোমাদের লেখকদের আমার চেনা আছে। আর তোমাদের প্রতিজ্ঞার দৌড় তো পূজা সংখ্যাগুলি পর্যন্ত। যাক্‌গে শোন।' সিগারেট ধরিয়ে সুব্রতদা এরপর শুরু করলেন।—

মৃগাঙ্ক চাটুয্যে আমার কলেজের বন্ধু। স্কটিশে আমরা বছর দুই একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা না দিয়েই সরাসরি ও গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হল। না ভর্তি হয়ে কি করবে। কলেজে যতদিন ছিল পিছনের বেঞ্চে বসে ও প্রফেসর আর ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ এঁকেছে। বক্তৃতার এক বর্ণও শোনেনি। শুধু চেয়ে চেয়ে তাঁদের মুখভঙ্গি আর অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করেছে। তাই পরীক্ষার আগে আগেই ও পালাল। ওর বাবা অবশ্য খুব দুঃখ পেলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল মৃগাঙ্ক এম· এ· বি-এল হবে। কারণ, তিনি বি· এ· বি-এল। তাঁর ইচ্ছা ছিল মৃগাঙ্ক হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করবে। কারণ, তিনি আলিপুর কোর্টে কোনরকমে টিঁকে আছেন। কিন্তু মৃগাঙ্ক তা করল না। তুলি আর রঙের বাক্স কিনে ও গেল সরকারি আর্ট স্কুলে। আমাদের দেশের পটুয়া ছেলের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওর বাবা খুবই রাগারাগি করলেন, খরচ বন্ধ করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখালেন, কিন্তু মৃগাঙ্ক নাছোড়বান্দা।

তারপর বছর পাঁচ ছয় বাদে কোনরকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে নানা আকারের নানা ধরনের অফিসের চৌকাঠে আমি যখন কেবলই হোঁচট খেয়ে বেড়াচ্ছি মৃগাঙ্ক লাল ফিতেয় বাঁধা সোনার.মেডাল পকেটে নিয়ে এল আমাদের পটলডাঙা স্ট্রীটের বাসায়। কলেজ বদল হলেও ওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়নি। কারণ, ওর সেই প্রফেসরদের স্কেচগুলির আমিই সবচেয়ে বেশি

প্রশংসা করতাম। আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার মন্ত্রণাও আমিই দিয়েছিলাম।

মৃগাঙ্ক শুধু তার সোনার মেডালই আমাকে দেখাল না। সেই সঙ্গে আরো কিছু দেখাল। পোস্টকার্ড সাইজের একখানি ফটো আমার চোখের সামনে ধরে বলল, 'দেখ তো কেমন।'

অষ্টাদশী একটি সুন্দরী তন্বী মেয়ের প্রতিকৃতি।

বললাম, 'বাঃ বেশ তো দেখতে। কে এ।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'অদিতি দত্ত। শুধু দেখতেই বেশ নয়, শুনতেও চমৎকার। ভারি সুন্দর গায়। আলাপ করবে নাকি ?'

বললাম, 'তার আগে পরিচয়টা আরো শুনি।'

আস্তে আস্তে সব কথাই ভেঙে বলল মৃগাঙ্ক। অদিতি তাঁদের নতুন প্রফেসর অবনী দত্তের মেয়ে। বছর দুই হল তাদের আর্ট স্কুলে এসেছেন। আর এই দুই বছরের মধ্যেই ওঁদের সঙ্গে মৃগাঙ্কর বেশ হৃদ্যতা জন্মে গেছে।

বললাম, 'ওঁদের মানে তো উনি। গৌরবে বহুবচন। কিন্তু এ যে ঘোরতর অসবর্ণ। তোমার বাবা যে রকম গোঁড়া ব্রাহ্মণ তাতে শুনলেই তো চোখ রক্তবর্ণ করবেন। এসব ভেবেচিন্তে হৃদ্যতার পথে আর না এগুনোই তো ভালো।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আরো কথা আছে। শুধু বর্ণেই তে ওরা অসম তাই নয়, ধর্মেও ক্রিশ্চিয়ান।'

বললাম, 'তাহলে তো একেবারে চূড়োর ওপর ময়ূর পাখা। ওপথ আর মাড়িয়ে দরকার নেই। স্কুল কলেজের আমল যখন শেষ করে ফেলেছ, প্রফেসর আর তাঁর তনয়ার মায়াও কাটাও।'

কিন্তু মৃগাঙ্ক আমার সুপরামর্শ নিল না। বছর দুই বাদে অদিতি দত্তকে সে বিয়ে করে ফেলল। অদিতি ততদিনে শুধু যে ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট হয়েছে তাই নয়, দেহে মনে সত্যিই পরিণত হয়ে উঠেছে। সুগায়িকা হিসেবেও তখন থেকেই তার খ্যাতি ছড়াতে আরম্ভ করেছে। অদিতির জন্যে মৃগাঙ্কর চেয়ে বহুগুণ ধনী, শিক্ষিত রূপবান পাত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু অদিতি তো রূপবানকে চায় না রূপস্রষ্টাকে চায়।

দুই পক্ষের অভিভাবকদের তরফ থেকেই বাধা এল। মৃগাঙ্কর মা নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করলেন. মৃগাঙ্কর বাবা ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবার ভয় দেখালেন কিন্তু মৃগাঙ্ক নাছোড়বান্দা। অদিতির মাও কান্নাকাটি করলেন, ওর বাবা নানাভাবে ওকে বোঝালেন কিন্তু অদিতিও বেপরোয়া। বিয়ে ওরা করবেই, বিয়ে ওরা করলও।

আমি বললাম, 'মৃগাঙ্ক, শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ের জন্যে কুলধর্ম ত্যাগ করবে ?' মৃগাঙ্ক বলল, 'কে বলল ত্যাগ করব ? আমার হিন্দুধর্মও নেই, খৃষ্টান ধর্মও নেই, আমার ধর্ম শিল্পীর ধর্ম। খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী, ইহুদী আমি যাকে খুশি বিয়ে করি।' মৃগাঙ্কর ইচ্ছে ছিল কোন ধর্মমতেই ওদের বিশ্বাস নেই সেই কথাই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে কবুল করে। কিন্তু অদিতির মনে দ্বিধা দেখা গেল। ধর্মানুষ্ঠানে তারও যে অনুরাগ আছে তা নয়, কিন্তু কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের আশ্রয় সে একেবারে ত্যাগ করতে চায় না।'

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, 'মেয়েরা আসলে রক্ষণশীল। আচ্ছা রাখতে হয় তুমিই রাখ তোমার ধর্ম। আমি আমার টিকি পৈতে ছাড়লাম।'

টিকি পৈতে অবশ্য অনেক আগেই ছিঁড়ে ফেলেছিল মৃগাঙ্ক, নতুন করে ছিঁড়বার কিছু ছিল না। কিন্তু ওর এই অসামাজিক বিবাহ-বন্ধনে আত্মীয়স্বজনের সব বাঁধন আলগা হয়ে গেল। মৃগাঙ্কর ছোট ভাই বোন কয়েকটি ছিল। তাদের সে ভালোই বাসত। তারা মৃগাঙ্ককে ত্যাগ করল বলেই মৃগাঙ্ক দুঃখ পেল বেশি। অদিতিও বাবা মার একমাত্র সন্তান নয়। দুটি বড় ভাই আছে তার। কিন্তু তাদের সঙ্গে অদিতির সম্পর্ক কোনদিনই খুব দৃঢ় ছিল না। এই ব্যাপারে তা আরো শিথিল হয়ে গেল।

কিন্তু সবাই ছেড়ে গেলেও আমি ওদের ছাড়লাম না। আমার টিকি না থাকলেও পৈতে আছে। বাইরে নিষিদ্ধ মাংস আর নিষিদ্ধ পেয়ালায় মাঝে মাঝে ঠোঁট ছোঁয়ালেও ঘরে নিষ্ঠাবতী দুই ছেলের মা ব্রাহ্মণী আছে। তার কাছ থেকে মাঝে মাঝে অনুযোগ অভিযোগ শুনতে হয় : 'ওই খৃষ্টানী মেয়েটার কাছে তুমি অত ঘন ঘন যাও কেন। আমার কপালে যে কি আছে ভগবান জানেন। তুমি

যে কি কোন্‌দিন ঘটিয়ে বস—'

আমি হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, 'কিচ্ছু ভেব না, নিজের জীবনে কোন কিছু ঘটাবার সাধ্য তো আমার নেইই এমন কি অন্যের জন্যে ঘটকালি করতেও আমি জানিনে। আমি পারি যা ঘটে শুধু তাই রটিয়ে বেড়াতে। বিশ্বনাট্যে আমার ওই একনম্বর ভূমিকা।'

আমি ওদের বিয়েতে শুধু যে সাক্ষী হলাম তাই নয়, একটা তানপুরার সঙ্গে গোটা কয়েক তুলিকে একটি রঙীন সুতোয় বেঁধে ওদের উপহার দিলাম।

অদিতি বলল, 'এ কি।'

বললাম, 'এ বিয়ে যে চিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতের, শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর তারই একটু ছোট্ট নিদর্শন।'

অদিতি হেসে বলল, 'আপনি কবিতা লেখেন না কেন।' বললাম, 'আমি কবিতা লিখি না, কবিতা দেখি। এই যেমন আমার সামনে দুটি পংক্তিকে দেখতে পাচ্ছি।' মৃগাঙ্ক বলল, 'দেখ, সুব্রত, তুমি আমাকে বলবে তুমি, আর আমার বউকে বলবে আপনি, তা হতে পারে না। তোমরাও দু'জনে তুমি হয়ে যাও।'

থিয়েটার রোডে তিনখানা ঘরওয়ালা একটি ফ্ল্যাট নিল মৃগাঙ্ক, বাড়ি থেকে সে কিছু না পেলেও, অদিতি হাজার পাঁচেক টাকার চেক তার বাপ মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। এসব ব্যাপারে মেয়েদের বুদ্ধি বিবেচনা বেশি। সংসাব যে শুধু সুরে আর রঙে চলে না, চাল ডালেরও দরকার হয়, সে হিসেব অদিতির ছিল। কিন্তু প্রথম প্রেমের বন্যায় মৃগাঙ্ক সব হিসেবের খাতা ভাসিয়ে দিল। নবাব বাদশার মত সে ঘর সাজাল। দামী দামী ফার্নিচার কিনল, দেশী বিদেশী আর্টিস্টদের ছবির ভালো ভালো প্রিন্ট কিনে বাঁধিয়ে রাখল। নিত্য নতুন রঙের পর্দা, নিত্য নতুন নামের ফুল আনল হগ মার্কেট থেকে, তার অনেক ফুলেরই গন্ধ নেই, শুধু রঙ আছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'সুব্রত, জীবনে রঙটাই সব।'

স্টুডিওতে কাজ করবার সময় সে কড়া চুরুট ঠোঁটে চেপে চড়া রঙের বাটি নিয়ে বসে। আর কিছুতে তার মন ওঠে না।

আমি বললাম, 'মৃগাঙ্ক বিয়েতে বউকে উপহার টুপহার কিছু দিয়েছ?'

মৃগাঙ্ক স্ত্রীর একখানা বড় অয়েল পেন্টিং দেখাল। সেই পোস্টকার্ড আকৃতির ফটোখানাকে এনলার্জ করেছে। মৃগাঙ্ক বলল, 'রঙ ছাড়া আমার ওকে কিছু দেওয়ার নেই। সুর ছাড়া আমি ওর কাছ থেকে কিছু চাইনে।'

অদিতি কিছু বলল না। নীরবে আমাদের কাপে চা ঢালতে লাগল। আর ওর সেই মৌন গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল মৃগাঙ্ক ভুল করেছে। অদিতির আরো কিছু চাইবার ছিল, অদিতির আরো কিছু চাইবার আছে।

তারপর বছর খানেকের মধ্যে ভোজবাজির মত সেই পাঁচ হাজার টাকা ওদের উবে গেল। শেষে এমন হল যে, ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, বাড়ি ভাড়ার জন্যে দরোয়ান এসে অপমান করে যায়। শেষে আমার কাছে পর্যন্ত ওদের হাত পাততে হল। আমি হাত পাতলাম গিন্নীর কাছে, দু'চার জন বন্ধুর কাছে। যা জোগাড় করতে পারলাম ওদের ধরে দিলাম।

অদিতিকে বললাম, 'তুমি তো মেয়ে, তুমি তো গৃহিণী, তুমি কেন রাশ টেনে ধরলে না। তুমি কেন নিজের মুখ বন্ধ রেখে থলির মুখ খুলে দিলে।'

অদিতি বলল, 'নিষেধ কি আমি করিনি সুব্রত, যথেষ্ট করেছি। কিন্তু অসুবিধে কি জানো। টাকাটা যে আমার, টাকাটা যে আমার বাপের বাড়ি থেকে আনা। ও আমার জন্যে এত ছাড়ল, আর আমি সামান্য পাঁচ হাজার টাকা ছাড়তে পারব না।'

থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাট মৃগাঙ্ককে ছেড়ে আসতে হল। সেই সঙ্গে দামী দামী কতকগুলি ফার্নিচারও গেল। বউবাজার স্ট্রীটে চল্লিশ টাকা ভাড়ার ছোট একটি ফ্ল্যাট আমিই ওদের ঠিক করে দিলাম। দুখানা ঘর আছে। আলাদা কিচেন, বাথরুম আছে। রাস্তার ধারে এক ফালি বারান্দাও রয়েছে দাঁড়াবার, বসবার। কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মৃগাঙ্কদের অবস্থা তো জানি। রাজ

রাজড়ার ঘরে ও জন্মায়নি। মধ্যবিত্ত উকিলের ছেলে। ওর পক্ষে এইসব বাড়িই মানায়। কেন যে হঠাৎ ও এমন আমিরী চালে চলতে গেল তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ভালোবেসে বিয়ে তো আজকাল অনেকেই করে, কিন্তু এমন চড়া গলায় প্রেমালাপ করে কে। আমার মনে হয়, বিয়ে করার পর থেকেই মৃগাঙ্ক ক্লান্তি বোধ করছিল। কবুতর কবুতরীর মত স্বামী-স্ত্রীর যে সংসার তা তার পোষাচ্ছিল না। হাজার হোক হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। মা-বাপ, কাকা-কাকীমা, একদল আপন আর খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাইবোনের মধ্যে মানুষ হয়েছে মৃগাঙ্ক। তাদের ছেড়ে এসে ভিতেরে ভিতরে ও বোধ হয় নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। ব্যক্তির অভাব মেটাতে চাইছিল বস্তু দিয়ে।

মাঝে মাঝে যখন আমার কাছে মন খুলত মৃগাঙ্ক, ওর সেই ভিতরের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গকামী মানুষটি বেরিয়ে আসত। মৃগাঙ্ক বলত, 'আর কারো জন্যে নয় সুব্রত, আমার সেই খুড়তুতো বোন বুড়ির কথাটা মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে। ছেলেবেলায় ওকে আমি নিজের হাতে লেখাপড়া শিখিয়েছি। কাক এঁকে, খরগোস গরু এঁকে অক্ষর পরিচয় করিয়েছি। বইয়ের আঁকা ছবি ওর পছন্দ হত না। রঙীন পেনসিল দিয়ে রাঙাদার নিজের হাতে এঁকে দেওয়া চাই।'

আবার বলত, 'সুব্রত এত রান্না খেলাম, কিন্তু আমার জেঠীমা ডাঁটা আর কাঁঠালের আঁঠি দিয়ে যে নিরামিষ তরকারি রাঁধতেন তার স্বাদ কোথাও পেলাম না। তা যেন আমার মুখে আজও লেগে রয়েছে।'

আমি বলতাম, 'চল যাই আমাদের বাড়িতে। আমার মাও নিরামিষ তরকারি মন্দ রাঁধেন না।'

কিন্তু আমার মা আর স্ত্রীর অনুদার শুচিবায়ুতার কথা ওর জানা ছিল। ও বলত, 'না সুব্রত থাক। ওঁদের আর বিব্রত করে কাজ নেই।'

সেই ডাঁটার ঝোলের স্বাদ যখন জীবন থেকে একেবারে উঠে গেছে, তখন চালাও কোর্মা-কালিয়া, কারি-কাবাব। সেই একান্ত স্নেহভাজন ভাইবোনদের যখন আর সাড়া মিলবে না, ছোঁয়া মিলবে না,. তখন আসবাবপত্রে ঘর বোঝাই কর, হৃদয়ের দোর জানলা ঢেকে দাও পুরু পর্দায়।

ওরা দুজনে উঠে এল বউবাজার স্ট্রীটের সেই ছোট ফ্ল্যাটে। ঠিক দুজনে নয়, বলতে ভুলে গেছি আরো একজন ছিল। কিন্তু সে এতই আড়ালে আড়ালে থাকত, যে বহুদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি, আলাপই হয়নি, আলাপ করবার ইচ্ছাই জাগেনি। তাছাড়া কোন পরিবারের কথা বলতে গিয়ে কেউ কি তার ঝি চাকরের কথা মনে রাখে, না হিসেব রাখে। এডিথও ওদের ঝি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঝি তে ঝি, চাকরে চাকর, রান্নাবান্নার কাজ বেশির ভাগ সেই দেখত। নামটা ইংরেজী হলেও এডিথ জাতে ইংরেজ ছিল না, এ্যাংলো ইন্ডিয়ানও নয়, একেবারে খাস বাঙ্গালী। কোন একটা অর্ফানেজ থেকে অদিতির বাবা ওকে কুড়িয়ে এনে বাড়ির পরিচারিকার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বয়স অদিতিরই মত কি দু' এক বছরের ছোট বড় হতে পারে। ঘরকন্নার কাজে খুব পাকা বলে মেয়ের সঙ্গে অবনীবাবু ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এডিথের রঙ ছিল ঘোর কালো অনেকটা সাঁওতালদের মত। মুখের আদলটাও তাই। তবে নাক চোখ টানাটানা থাকায় শ্রীটুকু নেহাৎ মন্দ ছিল না। যখন মুখ বদলাবার দরকার হত মৃগাঙ্কর, ইচ্ছে হত প্রোলেটারিয়েট কোন মেয়ের ছবি আঁকবার মৃগাঙ্ক এডিথকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করত।

নতুন বাড়িতে মাত্র দু'খানা ঘর থাকায় সমস্যা উঠল এডিথ শোবে কোথায়। একখানা তো শোয়ার ঘর, আর যেখানা বসবার সেখানায় কখন যে মৃগাঙ্ক ছবি আঁকতে বসবে তার কিছু ঠিক নেই। কোন দিন হয়ত রাত ভোর করেই ফেলল। আবার কোন দিন বা সারারাত ঘুমিয়ে ঠিক ভোর সময় বসে গেল কাজে।

সমস্যার সমাধান এডিথ নিজেই করে নিল, বলল, 'আমার জন্যে ভাবনা কি, ঘুমুনো নিয়ে তো কথা। রান্নাঘরের সামনে যে বাড়তি জায়গাটুকু আছে, আমি সেখানেই বেশ ঘুমোতে পারব।'

ওদের সঞ্চয় ফুরিয়ে গিয়েছিল। খরচ চালাবার জন্যে এবার রোজগারের দিকে মন দিতে হল।

মৃগাঙ্ক ভেবেছিল ছবি বেচেই সে খরচ তুলতে পারবে। কিন্তু ওর একখানা ছবিও বিক্রি হল না। প্রথম প্রথম তাতে মোটেই ঘাবড়াল না মৃগাঙ্ক, বলল, 'ইউরোপেও ঠিক এই রকমই হয়েছে। সিজান, পল গঁগা, ভ্যানগগেরও এই ইতিহাস। সত্যিকারের যারা শিল্পী তারা যতদিন বাঁচে, ততদিন মরে থাকে, তাদের জন্ম হয় মরবার পরে।'

ইউরোপের সেই উনিশ শতকীয় মাস্টার আর্টিস্টদের অঙ্কন ধারায় আর জীবন ধারায় চলতে চাইত মৃগাঙ্ক, কিন্তু দেশটা তো ইউরোপ নয়, বাংলা। শতকটা তো উনিশ নয়, বিশের। এ যুগের রসায়নে অমৃতের চেয়ে বিষের মাত্রা বেশি। তাছাড়া নিজের সম্বন্ধে মৃগাঙ্কর ধারণা যাই থাক, আমি ওর ওজন নিতে ভুল করিনি। সাধারণ একজন মিডিওকার ছাড়া মৃগাঙ্ক কিছুই নয়। হয়ত বা তারও নিচে। তবু ওকে আমি সহ্য করতাম। ওর সমস্ত অতিশয়োক্তি, সমস্ত দম্ভোক্তি বসে বসে শুনতাম। যাদের রক্তের ভিতরে দু'এক ফোঁটা রঙ, কি দু'এক ছিটে কালি গিয়ে পড়েছে, কল্যাণ, তারা অমন একটু ছটফট করেই। তারা ঠিক একেবারে সুতোর ওপর দিয়ে চলতে পারে না, হাঁটতে পারে না আল বাঁধা পথে। না পারার শাস্তি তারা নিজেরাই ভোগ করে। সমাজের কাছ থেকে শাস্তি পায়, সংসারের কাছ থেকে দণ্ড ভোগ করে, অন্তর্দ্বন্দ্বে দিনরাত ক্ষত-বিক্ষত হয়। তাদের সেই কাটা ঘায়ে আমরা বন্ধুরাও যদি নুন ছিটাই, ওরা যায় কোথায়।'

আমি বললাম, 'মৃগাঙ্ক একটু বস্তু জগতের দিকে তাকাও অতটা হাওয়ায় চড়া কি ভালো। বেশ তো, তোমার ছবিগুলি না হয় তোমার মরবার পরেই জীবন্ত হয়ে নড়ে চড়ে বেড়াবে কিন্তু দেহের তো তা বলা চলে না। ঘরের দেহিনী গৃহিণীর বেলায়ও নয়। কোন অফিস-টপিসে চাকরি-বাকরির খোঁজ কর। হাতে বাকি সময় যেটুকু থাকে নিজের কাজ করে যাও।'

দিন কয়েক ভেবেচিন্তে আপোষ করতে রাজী হল। মৃগাঙ্ক বলল, 'দেখ, তুমি যা বলছ, সেসব কিছু করব না। নক্সা আঁকা কি তেলের ছবির বিজ্ঞাপনের কাজ আমার দ্বারা চলবে না। তুলিটা আমার আর কলমটা তোমাদের, কলম দিয়ে আমাকে যা খুশি তাই করাতে পার।'

তাতো পারি। কিন্তু কলমের ডিগ্রী তো মৃগাঙ্কর নেই, আর্ট স্কুলের ডিগ্রীতে অফিস আদালতে সে কি কাজ করবে। কিন্তু মৃগাঙ্ক নাছোড়বান্দা। তুলিকে সে কমার্শিয়াল কাজে খাটাবে না। নিউ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হেড অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার একটু জানাশোনা ছিল। তাঁকে বলে কয়ে মৃগাঙ্ককে ঢুকিয়ে দিলাম সেখানে। সবশুদ্ধ পঞ্চাশ টাকা পাবে। চল্লিশ টাকা মাইনে আট দশ টাকা ভাতা। অফিসের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু চেয়ার আর সবচেয়ে নিচু পদ। লেজার কীপারের চাকরি।

বললাম, 'মৃগাঙ্ক এর চেয়ে ভালো কিছু তো আপাতত জোটানো গেল না।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। ব্যাঙ্কে আমি ঝাড়ুদার হতেও রাজী আছি। আমার আসল পরিচয় তো লেজারের খাতায় থাকবে না। যেখানে থাকবার সেখানে তা রাখতে পারলেই হল। আমি মরবার পর সারা দেশের লোক এই লেজারের খাতার ফটো নিতে যাবে, আমার দুর্লভ হাতের লেখার কপি রাখবার জন্যে।'

বলল বটে, কিন্তু এর ভিতরকার অসামান্য দম্ভের সঙ্গে সেই সামান্য চাকরির প্রতিদিন ঠোক্কর লাগতে লাগল। ভুলভ্রান্তি, কামাই, দেরি করে যাওয়া, সুপীরিয়রদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, চাকরি থাকে কি থাকে না এই অবস্থা।

স্বামী ওই সামান্য চাকরি নেওয়ায় অদিতিও অসন্তুষ্ট হল। তার সম্মানে লাগল। শত হলেও সে সুন্দরী উচ্চ শিক্ষিতা। সমাজে তার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। স্বামীর এই আচরণে সেই মর্যাদা বার বার ঘা খেতে লাগল। আর আমি মৃগাঙ্কর উপদেষ্টা বলে আমার ওপরও অসন্তুষ্ট হল অদিতি। গেলে কথা না বলে নিজের হাতে চা না দিয়ে তার সেই আক্রোশ প্রকাশ করল।

মৃগাঙ্কর পঞ্চাশ টাকার চাকরির ভরসায় অদিতিও বসে রইল না। ষাট টাকা মাইনের একটা মাস্টারি ও পেয়ে গেল। পদটা এসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস। সুবিধে এই ওর বি· এ· ডিগ্রীটা আছে।

যাই হোক, আমি ভাবলাম এই একশ দশ টাকায় ওদের টেনেমেনে চলে যাবে। যদি একটু হিসেব করে চলে তাহলে মুটামুটি শান্তিতেই থাকতে পারবে ওরা। কারণ ওরা তো আমাদের মত নয়, যে

থাকা খাওয়াটাই সব। বরং থাকা খাওয়াটা ওদের উপলক্ষ্য, লক্ষ্যটা আলাদা, একজনের ছবি, একজনের গান। একজনের রঙ, আর একজনের সুর। দুজনে যখন শিল্পী তখন শিল্পীর মতই থাকবে শিল্পীর মতই মিলবে। কিন্তু তা হল না। বরং শিল্পই হল ওদের কাল।

মৃগাঙ্ক বুঝতে পেরেছিল লেজারকীপারি করে তার দিন যাবে না। তাকে আর্টিস্ট হতেই হবে। ছবি তাকে এঁকে যেতেই হবে। আর জীবদ্দশায় দু'চার লাখ দু'চার হাজার না হোক অন্তত দু'চার জন দর্শক তার চাই যারা সেই ভাবীকালের প্রতিভূ। তাদের খুশি করবার জন্যে মৃগাঙ্ককে সব দিতে হবে সব ছাড়তে হবে, কারণ যারা মৃগাঙ্কর ছবি ভালোবাসে, ভালোবাসবে তারা তো পর নয়, তারা যে পরমাত্মীয়। তারা যে তার নিজেরই দ্বিতীয় সত্তা। তার শিল্প সাম্রাজ্যের সেই স্বল্প কটি প্রজানুরঞ্জনের জন্যে মৃগাঙ্ক সব ছাড়তে পারে এমনকি সীতাকে পর্যন্ত।

অদিতি বুঝতে পেরেছিল, মাস্টারী করে তার দিন কাটবে না, তাকে সত্যিকারের গায়িকা হতেই হবে। সেই সাধনার পথে যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন, যেকোন ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে তাকে।

আর বছর খানেক দাম্পত্য জীবনের পরেই তারা টের পেয়েছিল যে স্ত্রী পুরুষের প্রেম জীবনের সবখানি নয়। তাতে সব বাসনা সব কামনার নিবৃত্তি হয় না। অদিতি বুঝেছিল মৃগাঙ্কর ভালোবাসায় তার সব সাধ মিটবে না। মিটত যদি সে শুধু ঘরণী হয়ে থাকতে পারত। মিটত যদি সে শুধু মৃগাঙ্করা স্টুডিওর মডেল হয়ে থকতে চাইত। কিন্তু তাতো নয় সে শুধু একজনের সৃষ্টির উপাদান কি একজনের সৃষ্টির প্রেরণা হয়েই থাকতে চায় না, সে নিজেও স্রষ্টা হতে চায়। সে শুধু একজন তরুণ আর্টিস্টের স্ত্রী নয়, সে নিজেও আর্টিস্ট।

সংসারের দায় বাড়বে বলে কেউ অসময়ে বাপ মা হতে রাজী হল না। শিশু সন্তান দুটি তো আছেই। শিল্প আর সঙ্গীত। তারা আগে বড় হোক, তারা আগে মানুষ হোক। তারপর তৃতীয়টিকে তারা ঘরে আনবে।

মৃগাঙ্ক তার রঙ আর ক্যানভাসের জন্য ঘরের ফার্নিচারগুলি বেচে দিল, নামজাদা আর্টিস্টদের ভালো ভালো ছবির দামী দামী প্রিন্টগুলি বিক্রি করে ফেলল। বিলাসিতার সময় এখন নয়, এখন কৃচ্ছ্রসাধনের পালা। মাইনের প্রায় সব টাকা সে তার নিজের রঙের পিছনে ব্যয় করতে লাগল।

আর ওদিকে অদিতি পিছিয়ে রইল না। সে তিরিশ টাকা দিয়ে গানের এক মাঝারি খ্যাতির ওস্তাদ রাখল। সপ্তাহে একদিন করে তিনি গান শিখিয়ে যাবেন। অন্য জায়গায় তিনি পঞ্চাশ টাকা নেন। কুড়ি টাকার ঘাটতি অদিতি তাকে আদর আপ্যায়ন পানদোক্তা, চা, জল খাবারে পুষিয়ে দিতে লাগল।

মাস ছয়েকের মধ্যে সংসারের এমন হাল হল যে ডাল আর আলু ভাতের বেশি কিছু জোটে না। ছেঁড়া ধুতী পাঞ্জাবী পরে মৃগাঙ্ককে অফিসে বেরোতে হয়। অদিতির বাইরের শাড়িখানা অবশ্য আস্ত আর ফসাই থাকে, কিন্তু ঘরের শাড়িতে সেলাই আর গিট পড়তে দেখা যায়।

তারপর মৃগাঙ্কর জুতোয় আর জামায় যত তালি পড়তে লাগল, অদিতির ছেঁড়া শাড়ির গিটের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল ওদের দাম্পত্যের গ্রন্থি ভিতরে ভিতরে তত শিথিল হতে লাগল।

একদিন তো আমার সামনেই ওরা দারুণ ঝগড়া করল দুজনে। অনেকদিন বাদে একটু চিত্তবিনোদনের আশায় সন্ধ্যা বেলায় ওদের বাসায় গেছি, ভেবেছি মৃগাঙ্কর সঙ্গে শিল্প সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব, আর দু'একখানা গান শুনব অদিতির। কিন্তু গিয়ে দেখি দুজনে প্রাণপণে কথা কাটাকাটি করছে। আমি বললাম, 'থাম থাম, দাম্পত্য কলহটা এতক্ষণ ধরে চালালে যে তৃতীয় ব্যক্তির কান ঝালাপালা হয়ে যায়। অদিতি তোমার গলা গানের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। ঝগড়ার জন্যে নয়, আজ এমন বেতালা, বেসুরো ব্যাপার কেন। তুমি না সুরশিল্পী।'

কিন্তু অদিতি এ রসিকতায় কান দিল না, বলল, 'মৃগাঙ্ক আমার ওস্তাদকে অপমান করেছে সুব্রত, আর তাকে অপমান করে আমাকে অপমান করেছে। ওকে ক্ষমা চাইতে হবে নইলে আমি ছাড়ব না।'

মৃগাঙ্ক চেঁচিয়ে বলল, 'কক্ষণো না, ওই লোকটার কাছে যাব আমি ক্ষমা চাইতে ?—কক্ষণো না।

পানের পিক ফেলে ও আমার স্টুডিও নষ্ট করে দিয়ে গেছে, ওকে আমি খুন যে করিনি তাই তো যথেষ্ট।'

এডিথ হেসে দরজার কাছে দাঁড়াল। ওর হাতে হলুদের ছোপ। রান্নার জন্যে বাটনা করতে বসেছিল, আমার সাড়া পেয়ে উঠে এসেছে। এডিথ কাতর স্বরে বলল, 'আপনি এসেছেন ভালোই হয়েছে মিঃ চক্রবর্তী। এবার আপনি দয়া করে থামান। আমি কিছুতেই পারলাম না। ছি ছি ছি ভদ্রলোকে কি এমন ঝগড়া করে ? এমন খারাপ ভাষায় গালাগাল দেয় ? কি কাণ্ড দেখুন তো।'

ওদের ঝগড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি মোটামুটি বিবরণটা জেনে নিলাম। বিকেলের দিকে অদিতির ওস্তাদ মন্তাজ আলি খাঁ তাকে গান শেখাতে এসেছিলেন। সঙ্গে তবলচীও ছিল। মৃগাঙ্ক তখন বাড়ি ছিল না। সাধারণত শোয়ার ঘরেই অদিতি তার ওস্তাদকে নিয়ে বসায়, মেজেয় শতরঞ্চি পেতে তার ওপর গান বাজনা চলে। কিন্তু আজ শোবার ঘরখানা এডিথ ধুয়ে পরিষ্কার করছিল বলে ওস্তাদকে নিয়ে মৃগাঙ্কর স্টুডিওতে ঢুকেছিল অদিতি। দু'তিন দিন ধরে মৃগাঙ্ক কোন কাজ করছে না। চুপ চাপ শুয়ে বসে সময় নষ্ট করে কাটাচ্ছে। অদিতি ভেবেছে আজও বুঝি তাই করবে।

তারপর মন্তাজ আলি সবে মাত্র একখানা বৃন্দাবনী সারং ধরেছেন এই সময় মৃগাঙ্ক এসে হাজির। তার স্টুডিওতে ওস্তাদকে দেখামাত্র তার চোখ পারাপার জ্বলে উঠল, বলল, 'এ ঘরে আপনাকে কে আসতে বলেছে।' প্রৌঢ় ওস্তাদ বললেন, 'বাবুজী আমি অদিতির কাছে এসেছি অদিতির ঘরে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এ ঘর অদিতির নয়, এ ঘর আমার। যান বাইরে যান আপনি। আমি এখানে কাজ করব।'

হঠাৎ দক্ষিণদিকের দেয়ালের গোড়ায় তার ইজেলের বাঁ পাশটার দিকে চোখ পড়ল মৃগাঙ্কর, বলল, 'ওকি ওখানে পানের পিক ফেলছেন কেন ?'

মন্তাজ আলি অপ্রতিভভাবে একটু হাসলেন।

মৃগাঙ্ক গর্জে উঠল, 'হাসলে চলবে না। তোমার ওই দাড়ি দিয়ে পানের পিক মোছ আগে তারপরে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে এসো, ওস্তাদির আর জায়গা পাওনি ? ভুঁড়িওয়ালা কালো মোষ কোথাকার।'

অদিতি বলল, 'খবরদার, আমার ওস্তাদকে তোমার অপমান করবার কোন অধিকার নেই।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'না নেই ? আমার ঘরে কেন পানের পিক ফেলবে।'

অদিতি বলল, 'ফেলুক, তাতে কি হয়েছে। তুমি যে বাড়ি ভরে যেখানে সেখানে রঙের পিক ফেল।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'রঙের সঙ্গে পানের পিকের তুলনা !'

অদিতি বলল, 'কেন নয় ? ওস্তাদের পানের পিক আমার কাছে তোমার হাজার রঙের চেয়ে দামী, হাজার রঙের চেয়ে রঙীন। তুমি ক্ষমা চাও ওস্তাদজীর কাছে।'

মৃগাঙ্ক বললো, 'কক্ষণো না। আগে পানের পিক মুছে দিক। তারপর ক্ষমা চাওয়ার কথা।'

রকম সুবিধে নয় দেখে ওস্তাদ তবলচীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদায় নিয়েছেন। তারপর সেই থেকে দুজনের মধ্যে চলেছে ঝগড়া।

আমি বললাম, 'তোমারই তো অন্যায় মৃগাঙ্ক।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'অন্যায় ? এক মুহূর্ত মন স্থির করে এ বাড়িতে কাজ করবার জো নেই। আমি তুলি ধরেছি কি ও ঘরে সারেগামা শুরু হল। এভাবে কেউ কাজ করতে পারে ?'

অদিতি বলল, 'না করতে পারলে কি করব। তুমি মুখ বুজে ছবি আঁকতে পার, কিন্তু আমি তো মুখ বুজে গলা সাধতে পারিনে। তোমার যদি সহ্য না হয় তুমি দুই কানে দুই রসুন গুঁজে বসে থাকলেই পার। আমি যদি তোমার উপদ্রব অত্যাচার সহ্য করতে পারি, তাহলে তোমাকেও সইতে হবে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কক্ষণো না। আমার সাধনার পথে যারা বিঘ্ন তাদের আমি কক্ষণো সইব না।'

অদিতি বলল, 'তোমার সাধনা আর আমার বুঝি সাধনা নয়। তুমি যা করে তুলছ তাতে এক বাড়িতে থাকা চলে না।'

মৃগাঙ্ক বলল, ''বেশ তো, ভিন্ন বাড়িতে গিয়ে থাকলেই হয়।'

অদিতি বলল, 'থাকতে হয় তুমি গিয়ে থাক। আমি কেন যাব। এখনো বাড়ি ভাড়ার বেশির ভাগ টাকা, প্রায় সব টাকা আমার হাত দিয়েই আসে।'

অতি কষ্টে ঝগড়া থামিয়ে আমি কোন রকমে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছাড়লাম। দুই শিল্পীর জীবনযাত্রা মোটেই শিল্পসম্মত নয়।

মোড় থেকে শ্যামবাজারের ট্রামে উঠতে যাচ্ছি, পেছন থেকে মৃগাঙ্ক বলল, 'দাঁড়াও।'

ও আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

বললাম, 'কি ব্যাপার, তুমি চলে এলে যে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ভিতরে থাকা গেল না বলে। চল একটু চা খাই, পয়সাটা অবশ্য তোমাকেই দিতে হবে। আমার পকেটে কিছু নেই।'

বললাম, 'আচ্ছা, তা না হয় দেওয়া যাবে। এসো।'

সামনের রেস্টুরেন্টটায় ঢুকে দুজনে বসলাম মুখোমুখি। চায়ের কাপে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে মৃগাঙ্ক বলল, 'বড় ভুল করেছি সুব্রত। আর্টিস্টের অন্তত যে আর্টিস্ট হতে চায় তার কোন হবু আর্টিস্টকে বিয়ে করতে নেই। তার ফল ভালো হয় না।'

বললাম, 'এই সাময়িক ঝগড়ার জন্যেই তোমার এই কথা মনে হচ্ছে।'

মৃগাঙ্ক উত্তেজিত হয়ে বলল, 'না না, মোটেই সাময়িক নয়, এটা স্থায়ী ব্যাপার। কোন আর্টিস্ট-এর কাছে তার আর্টিস্ট বন্ধুই দুঃসহ, আর সব সময়কার আর্টিস্ট বউকে সে সহ্য করবে কি করে ? আর্টিস্টের একটি নিরক্ষরা সাদাসিধে স্ত্রী থাকাই ভালো। যৌন তাগিদ মিটাবার জন্যেই তার প্রয়োজন। আর কিছু শিল্পীর পক্ষে অবান্তর। তার সাধনার বাধা।'

আমি হেসে বললাম, 'একথা তো অদিতিও বলতে পারে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'বলতে পারে কি, বলেই তো। বলে এর চেয়ে সাধারণ একজন কেরানী এমন কি দারোয়ান ড্রাইভারের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া ভালো ছিল।'

আমি সুপরামর্শ দিয়ে বললাম, 'একটু বুঝে সুজে চল। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেল।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ঝগড়া মিটাব কি। আসলে সম্পর্কটাই তো ঝগড়ার। আমার মনে হয় কি জানো ! নারী আর পুরুষের মধ্যে কেবল একটি মাত্র সম্পর্কই আছে। সে সম্পর্ক সংগ্রামের।'

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, 'তা বটে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। রাতের রতি-সংগ্রাম নয়, আমি দিনরাতের, বিরতিহীন সংগ্রামের কথা বলছি। সেই সংগ্রামই একমাত্র সত্য।'

বলে মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

সে ঝড় সহজে থামল না।

আমি মাঝখানে আর একদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম অদিতি তার ওস্তাদের বাড়িতেই গান শেখার ব্যবস্থা করেছে। তবু দুজনের বিরোধ মিটছে না। অদিতি বাড়িতে কখন আসে কখন যায় তার ঠিক নেই। দাম্পত্য জীবনের অশান্তি, অতৃপ্তি সে শুধু সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ভুলে যেতে চায়। এক ওস্তাদের কাছ থেকে আর এক ওস্তাদের কাছে যায়। কে তার সেই চির আরাধ্য সুর গুরু। এই বেতালা বেসুরো জীবনকে কে বাঁধবে সুরে লয়ে।

মৃগাঙ্কও বাইরে বাইরে বেড়ায়। সেও রূপের সন্ধানী। রূপময়ী নারী ঘরেই আছে। কিন্তু সে তো তার সাধনার সঙ্গিনী নয়। তার রূপ তার দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা তো তার তুলিতে ধরা দেয় না, ভাব-ধারায় গলে পড়ে না ক্যানভাসে, প্রেম ধারায় সিক্ত করে না জীবন। তাকে দিয়ে মৃগাঙ্ক কি করবে।

মাস কয়েক পরে চৌরঙ্গী টেরাসের ছোট একটা একজিবিশনে রিনি পালিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঘুরতে দেখলাম মৃগাঙ্ককে। দুজনে মিলে ছবি দেখছে। আর রিনি আর্ট সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামত খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে যাচ্ছে মৃগাঙ্কর কাছে।

স্কটিশে রিনি আমাদের বছর খানেকের জুনিয়ার ছিল। অবস্থাটা এক সময় সচ্ছলই ছিল ওদের। কিন্তু ওর বাবার ব্যাঙ্কের টাকা আর চালানি কারবার দুইই একসঙ্গে ফেল পড়ায় অবস্থাটা খুবই পড়ে গেছে। রিনি এক সময় সুন্দরীই ছিল। কিন্তু অমিতাচারের ফলে এখন তার দেহের আর কিছু নেই। বিয়ে আজও হয়নি, প্রথমে লক্ষ্য ছিল জজ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে। তারপর ডেপুটির দিকে চোখ নামাল। কিন্তু রিনির স্বভাবের দোষেই হোক, আর ভাগ্যের দোষেই হোক সামান্য একজন অধ্যাপকও জুটল না। ততদিনে জোয়ার সরে গেছে, শুরু হয়েছে ভাঁটার টান। কিন্তু রিনি তা বুঝতে দিতে চায় না। চোখের কোলে নিপুণ হাতে সুর্মা টানে, ভ্রূ কামিয়ে নিজে এঁকে নেয়। পাউডারের পুরু প্রলেপে চোয়ালের-হাড় ঢাকতে চায়, ওষ্ঠের বিবর্ণতা ঢাকতে চায় চড়া লিপস্টিকে। কিন্তু যে কোন সাধারণ একজন পুরুষের চেখে ওর ছলাকলা ধরা পড়ে। অন্তরের রিক্ততা গোপন থাকে না।

একজিবিশন থেকে বেড়িয়ে এসে আমি মৃগাঙ্ককে বললাম, 'তুমি আবার ওর সঙ্গে ভিড়েছ কেন। জানো বদনাম ছাড়া ওর আর অবশিষ্ট কিছু নেই।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কিছু আছে কি না আছে সেটা যে দেখে তার ওপর নির্ভর করে।'

বললাম, 'কি জানি ভাই, সাদা চোখে আমি তো ওর মধ্যে শূন্যতা ছাড়া কিছু আর দেখতে পাচ্ছিনে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ক্যানভাস তো প্রথমে শূন্যই থাকে সুব্রত। তার রূপ তুলির মুখে। দেখো, আমি ওকে কি করে তুলি।'

আমি বললাম, 'দরকার নেই মৃগাঙ্ক, দরকার নেই, তোমার ক্যানভাস না থাকে ধার করে আমি তার টাকা জোগাব। কিন্তু রিনি পালিতের ওপর তুলি বুলোতে যেয়ো না। আগুন নিয়ে খেল তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ছাই-এর গাদায় মুখ ডুবিয়ে ভূত সেজে লাভ কি।'

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, 'যেখানে দেখিবে ছাই কুড়াইয়া দেখ তাই পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন। সুব্রত, আমি তোমার মত যজমানী বামুন নই, আমার জাত আলাদা। আমার হাতে শালগ্রামশীলা থাকে না, থাকে অন্য পাথর। মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশ পাথর হাতে আছে যার তার কিছুতে ভয় নেই।'

দিন কয়েক মৃগাঙ্কর আর দেখা পাওয়া গেল না, শুনলাম সে নতুন একখানা ছবি আঁকায় ব্যস্ত। সাংসারিক ঝামেলায় আমিও সুস্থ ছিলাম না। মাসখানেক বাদে দেখতে গেলাম মৃগাঙ্কর ছবি।

ভিতর পর্যন্ত যেতে হল না। বাইরে থেকেই কিছুটা নমুনা চোখে পড়ল। মৃগাঙ্কদের বাড়িটার দক্ষিণ দিকে যে সরু একটা গলি আছে তার মধ্যে পড়ে রয়েছে একটা ভাঙা তানপুরা, ইতস্তত ছড়ানো গোটা কয়েক তুলি, দুটি তুলি ড্রেনের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। আর টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া একটা ক্যানভাস।

বুঝতে আমার আর কিছু বাকি রইল না। তবু আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলাম। ওদের ফ্ল্যাটের ঘর দুটি বাইরে থেকে ভেজানো। কেউ নেই। শুধু আছে এডিথ। রান্নাঘরের সামনে সেই সঙ্কীর্ণ খোলা জায়গাটুকুতে মাদুর পেতে একটি কালো পাথরের মূর্তি স্থির হয়ে বসে আছে। সামনে একখানা বাংলা বাইবেল খোলা। দেয়ালে ছোট কুলুঙ্গিতে ক্রুশবিদ্ধ যীশু।

পায়ের শব্দে ওর ধ্যান ভাঙল না। দুবার নাম ধরে ডাকবার পর ও মুখ ফেরাল। লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন মিঃ চক্রবর্তী। মিস্টার আর মিসেস দুজনেই বেরিয়ে গেছেন।'

বললাম 'তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো। আজকের এই খণ্ড প্রলয়ের কারণটা কি। তানপুরা আর তুলিগুলি গলিতে লুটোচ্ছে।'

সমস্ত লজ্জাটা যেন ওর নিজের। তেমনি অপরাধী ভঙ্গিতে এডিথ বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড। আমি তক্ষুণি তুলে আনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু অদিতিদি আমাকে মেরীর দিব্যি দিয়ে বারণ করে গেছেন। কি করি বলুন তো।' বললাম, 'তুমি আর কি করবে কিন্তু ব্যাপারটা কি, আজ আবার কি হল ওদের।'

এডিথ আস্তে আস্তে সব কথাই খুলে বলল। শুধু আজ নয়। অনেক দিন ধরেই ব্যাপারটা

হচ্ছিল। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই যখন তখন রিনি পালিত মৃগাঙ্কর স্টুডিওতে এসে বসে। তার সঙ্গে হাসি গল্প করে। তারপর ওকে সামনে রেখে মৃগাঙ্ক ছবি আঁকতে বসে। অদিতি অনেক দিন বলেছে, 'ও মেয়েটাকে তুমি আমার বাড়িতে এনো না। বাইরে যা খুশি তাই করো, কিন্তু বাড়িতে নয়। ওকে দেখলেই আমার সুর কেটে যায়, তাল বন্ধ হয়। ওকে আমি সইতে পারিনে।'

কিন্তু মৃগাঙ্কর কাছে রিনি পরম সহনীয়। ওরই ছবি সে আঁকছে ক্যানভাসে। অনেক কাল বাদে তার তুলির মুখ খুলেছে, রঙের ভাঁজ মিলেছে।

এই নিয়ে রোজ ঝগড়া, রোজ কথা কাটাকাটি। তারপর আজ ঘটেছে একেবারে চূড়ান্ত প্রলয়। সেদিন অদিতির ওস্তাদকে যেমন অপমান করেছিল মৃগাঙ্ক, তেমনি অদিতি রিনিকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, ঝগড়াটা সেইখানেই থামেনি। মৃগাঙ্ক লাথি দিয়ে অদিতির হারমোনিয়াম ভেঙেছে, তানপুরার তারগুলি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে রাস্তায়। অদিতিও শোধ নিতে ছাড়েনি। তারপর প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। এডিথ না থাকলে ওরা খুনোখুনি হয়ে মরত। কিন্তু থেকেই বা সেই খুনোখুনিকে আটকে রাখতে পারবে!

এডিথ আমার দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে বলল, 'এদের বিয়ে না করাই ভালো ছিল মিঃ চক্রবর্তী।'

বললাম, 'তুমিও এই কথা বলছ!'

এডিথ বলল, 'বড় দুঃখে বলতে হচ্ছে মিঃ চক্রবর্তী। আপনি তো রাত-দিন থাকেন না, আপনি তো দেখেন না সব। আমার মনে হয় ওরা আর বেশিদিন একসঙ্গে থাকলে হয় দুজনেই দুজনকে খুন করবে, আর না হয় একজন মরবে, আর একজন ফাঁসি যাবে। ওরা কেউ বাঁচবে না। আপনি তো ওদের বন্ধু মিঃ চক্রবর্তী। আপনি ওদের বাঁচান। আমার তো কিছুই সাধ্য নেই। আমি কি করব, আমি কি করতে পারি। যীশুর মনে কি আছে তিনিই জানেন।'

এডিথের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাকে চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না এডিথ। খেয়ে দেখলাম চা ও অদিতির চেয়ে ভালোই করে।

ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেলাম না।

কিন্তু দুদিন বাদে ওরা নিজেরাই উপায় খুঁজে বার করল। সেদিন টিফিনের সময় আমার অফিসে হানা দিয়ে মৃগাঙ্ক বলল, 'তোমার কোন জানাশোনা উকিল আছে সুব্রত?'

বললাম, 'কেন উকিল দিয়ে কি হবে?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমরা ডিভোর্স করব ঠিক করেছি। সস্তায় কাজ সেরে দিতে হবে।'

আমি অনেক বোঝালাম, অনেক রকম যুক্তিতর্ক দিলাম। কিন্তু মৃগাঙ্ক অটল।

আমি অবশেষে বললাম, 'তুমি অদিতিকে কি দোষে ত্যাগ করতে চাও?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দোষ! যে আমার ছবি ছিঁড়ে ফেলেছে তাকে ত্যাগ করা তো ভালো, তাকে আমি খুন করতে পারি।'

বললাম, 'তুমি তো ওর হারমোনিয়াম ভেঙেছ, তানপুরা ছিঁড়েছ। শোধ-বোধ গেছে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'না, শোধবোধ যায়নি। তবলা আর তানপুরা বাজারে হাজার হাজার কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার ছবি তো শুধু বাজারের রঙ নয়, আমার জীবন নিংড়ানো রস। সেই রস ও নর্দমায় ঢেলেছে। এর শোধ যায় গলা কাটলে, এর শোধ যায় শুধু রক্তে।'

এডিথের কথা আমার মনে পড়ল। আমি আর কিছু বললাম না।

কিন্তু ডিভোর্স মামলায় শুধু উকিল হলেই তো চলে না। উপযুক্ত কারণও চাই। আসলে পাগল হয়েও দুজনের কেউ পাগল বলে নিজেকে স্বীকার করতে রাজী নয়, ক্লীব বলে সাব্যস্ত হতে রাজী নয়। ব্যাভিচারের দোষটাও নিজের ঘাড়ে নিতে সহজে কেউ রাজী হয় না। অথচ দুজনেই বিবাহিত জীবনের পূর্ণচ্ছেদ চায়। এই চাওয়াটাই আসলে যথেষ্ট। কিন্তু আদালতের আইন অন্যরকম।

মৃগাঙ্ক বলল, 'বেশ। মিথ্যা দোষটা আমিই নেব। আমি তোমাদের ধর্মও মানিনে, ভুয়ো

এথিকসেরও ধার ধারিনে। আমি মানি শুধু আমার শিল্পকে। তার পথে যা বাধা তাকে আমি ছলে বলে কৌশলে যেভাবে পারি সরাব।'

কিন্তু দোষের আর একজন ভাগীদাব চাই। মৃগাঙ্ক ছুটল রিনি পালিতের কাছে। বলল, 'রিনি, তুমি রাজি হও, ছবিতে ছবিতে আমি তোমার ঘর ভরে দেব।'

রিনি হেসে বলল, 'আর্টিস্ট, আমার হাতে তখন কোন কাজ ছিল না, সাথে কোন রঙ ছিল না, তাই তোমাব পাগলামি বসে বসে দেখেছি আব হেসেছি। তা ছাড়া নিজের দু' একখানা কার্টুন দেখতে মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। কিন্তু একবাশ কার্টুন দিয়ে কে ঘর সাজাতে যায় বলো। তবে তুমি বিপদে পড়েছ তোমাকে আমি তরাতে পারি। বেশি কিছু নয়, মাত্র হাজার দশেক টাকা দাও। আমার সাগর পাড়ি দেবার পারানি। আমি তোমাকে পার কবি, তুমি আমাকে পার কর। জানো তো এসব ব্যাপারে যে কালি লাগবে সাগবেব জল ছাড়া তা উঠবে না।'

মুখ কালো করে বাড়িতে এল মৃগাঙ্ক। সিঁড়িতে মুখোমুখি হল এডিথের সঙ্গে। তার পথ আগলে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল মৃগাঙ্ক।

এডিথ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি কি কিছু বলবেন?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

এডিথ বলল, 'দুটো ডিম আনতে যাচ্ছি। ঘরে কোন খাবাব নেই।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দরকার নেই খাবারের, দরকাব নেই ডিমের। তুমি ঘবে এসো।'

ঘরে নিয়ে গিয়ে মৃগাঙ্ক তাকে সব খুলে বলল, বলল, 'তুমি বাজী হও এডিথ, তুমি যা চাও তাই দেব।'

এডিথ মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে জিভ কেটে বলল, 'আমি, এ আপনি কি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জি।'

কিন্তু শুধু মিঃ চ্যাটার্জিই নয়, মিসেস চ্যাটার্জিবও সেই কথা। অদিতি ওব দু'হাত ধরে বলল, 'তুই আমার আপন বোনের চেয়েও বড়। তুই আমাকে বাঁচা। আমাব বাঁচবাব আব কোন পথ নেই। তোর কোন পাপ হবে না। আমি সব পাপেব ভাব নেব।'

এডিথ ম্লান হেসে বলল, 'একজনের পাপের ভার কি আর একজনে নিতে পারে অদিতিদি।'

পরক্ষণে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের সেই ছোট ছবিটিব দিকে চোখ পড়ল এডিথেব। হ্যাঁ, একজন নিয়েছিলেন। একজন জগতের সব পাপের ভার ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। সেই নেওয়ার পালা আজও শেষ হয়নি। আজও তিনি একজনেব মধ্যে থেকে আর একজনকে নেন। আজও তিনি একজনের মধ্যে বসে আর একজনের জন্যে কাঁদেন।

এডিথ বলল, 'তোমরা কি সত্যিই এই চাও? এতে কি তোমরা সুখী হবে?'

অদিতি বলল, 'সুখ তুচ্ছ, তার চেয়ে বড় বেঁচে থাকা। এভাবে থাকলে আমরা দুজনেই মরব।'

সারাদিন এডিথ নাইল না, খেল না। সারা রাতের মধ্যে ঘুমোল না। শুধু কাজেব ফাঁকে ফাঁকে বাইবেল পড়তে লাগল আর বুকের ওপর আঁকতে লাগল ক্রুশ চিহ্ন। পাল্লাব একদিকে দুজনের জীবন আর একদিকে নিজের ক্ষুদ্র মান-সম্মান। জীবনই বড়, জীবনই ভারি। তার জন্যে সব করা যায়, তার জন্যে সব ছাড়া যায়।

পরদিন রাজী হল এডিথ। তারপর খুব বেশি ঝামেলা পোহাতে হল না। কোর্টে মৃগাঙ্ক আর এডিথ দুজনে কবুল করল তারা পরস্পরের প্রণয়ী, তারা পরস্পরকে চায়।

ফিরে এসে মৃগাঙ্ক একখানা একশ টাকার নোট এডিথের হাতে গুঁজে দিল।

এডিথ বলল, 'এ কি মিঃ চ্যাটার্জী।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এর চেয়ে বেশি কিছু দেওয়ার সাধ্য আজ আর আমার নেই এডিথ। আমি যথাসর্বস্ব বেচে এই টাকা সংগ্রহ করেছি। পারি তো আরো কিছু পরে দেব। না, এ টাকা তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এ তোমাকে নিতেই হবে?'

নোটখানা মেলে ধরল এডিথ, বলল, 'নিতেই হবে?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ।—তুমি এত দিলে আর কিছুই নেবে না তাই কি হয়।'

তা হয় না। কেবল দিলেই হয় না, নিতেও হয়।

এডিথ বলল, 'তবে নিলুম মিঃ চ্যাটার্জী, তবে নিলুম।'

ওর দু'চোখের জল সেই একশ টাকার নোটের উপর গড়িয়ে পড়ল।

তারপর বউবাজারের ফ্ল্যাট রাখবার আর কোন প্রয়োজন হল না। মৃগাঙ্ক মির্জাপুরের একটা সস্তা মেসে গিয়ে উঠল। অদিতি বিডন স্ট্রিটের যে মিশনারী স্কুলটায় মাস্টারি করত তারই বোর্ডিংয়ে একটা সীট পেল। আর এডিথ ক্রীক রোয়ে একটি মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান পবিবারে আয়ার কাজে নিযুক্ত হল।

মাস কয়েক আমি আর ওদের কোন খোঁজ-খবর রাখতে পারলাম না। নেওয়ার যে তেমন চেষ্টা করলাম তাও নয়। কিন্তু মৃগাঙ্কই নিল খোঁজ। সে-ই একদিন এসে হাজির হল আমাদের অফিসে। বলল, 'সুব্রত, আমি বিলাত যাচ্ছি।'

আমি তো অবাক! বললাম 'বল কি হে। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সময় হাজার কয়েক মেরে সবে পড়েছিলে নাকি?'

মৃগাঙ্ক হেসে ঘাড় নাড়ল। না, অন্যেব টাকা তাকে মারতে হয়নি। তার বাবাই মরবার আগে হাজার চারেক টাকা ভাগের ভাগ তার নামে রেখে গেছেন। স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে বড় ছেলেকে একেবারে বঞ্চিত করে যেতে পারেননি। কৃপণ হিসেবী লোক ছিলেন যোগেনবাবু। ছেঁড়া গাউন ছাড়া তাঁর পরনে আর কিছু আমরা দেখিনি। কিন্তু মরবার পর দেখা গেল হাজার বার টাকা জমিয়ে গেছেন। ইন্সিওর আছে হাজার দশেক টাকা। তার ওয়ারিশ করেছেন অবশ্য স্ত্রীকে।

মৃগাঙ্কর মা ছেলেকে দেখে বললেন, 'যাক পেত্নী ঘাড় থেকে নেমে গেছে বেঁচেছি। কোষ্টিতে তোর রাহুর দশা আছে। এরকম হবেই। তোর দোষ নেই সব আমার ভাগ্যের দোষ। যাক এখন কালীঘাটে গিয়ে হিন্দু মিশনে শুদ্ধি করে, এবাব ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়। কর্তার এগার দিনের শ্রাদ্ধ তো করতে পারলিনে। কিন্তু বছরকিটা কর।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'করব মা। তার আগে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।' মা প্রথমে কিছুতেই রাজী হতে চান না। ভাইদেরও অমত। বিলাত থেকে কি ডিগ্রী নিয়ে আসবে মৃগাঙ্ক? ওর কি যোগ্যতা আছে। কিন্তু ডিগ্রী নেওয়া তো মৃগাঙ্কর উদ্দেশ্য নয়। ওর ইচ্ছা নানা যুগের শিল্পীদের যে তীর্থ স্থান রোম আর প্যারিস, নিজের চোখে তা দেখে আসা। আর যদি কোন শিল্পী গুরু জুটে যায় তো ভালোই। মৃগাঙ্কর মেজোভাই শশাঙ্ক দিল্লীতে ভালো সরকারি চাকরি করে। সেই চেষ্টা চরিত্র করে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিল। মৃগাঙ্ক চলে গেল আমাদের চোখের আড়ালে। দূরদেশ যাত্রী পুরনো বন্ধুকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত তুলে দিয়ে এলাম। কিছুক্ষণেব জন্যে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল, বললাম, 'চিঠি দিয়ো।'

মৃগাঙ্ক ঘাড় নেড়ে প্রতিশ্রুতি দিল।

লন্ডনে পৌঁছে মৃগাঙ্ক চিঠি একটা দিয়েছিল। কিন্তু তার পর আর কোন সাড়াশব্দ পেলাম না, মাস কয়েক বাদে ওর ছোট ভাই হেমাঙ্গর কাছে যে খবর পেলাম তা ভারি নৈরাশ্যকর। মৃগাঙ্ক যেখানে সেখানে খুশি মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা তা করে টাকাগুলি নষ্ট করছে। তার নিজের সঞ্চয় তো গেছেই মার পুঁজিতেও টান পড়েছে। অথচ সব টাকা এমন খাম-খেয়ালে খরচ করলে চলবে কি করে। মৃগাঙ্কর দুটি বোন আছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে। অল্প কদিনের মধ্যে পারিবারিক সহানভুতি হারিয়ে ফেলল মৃগাঙ্ক। মার স্নেহ পর্যন্ত গেল।

অদিতির খবর যা কানে আসতে লাগল তাও ভালো নয়। তারও বাবা মারা গেছেন। কিন্তু ছেলে মেয়ে কারো জন্যেই কিছু রেখে যেতে পারেননি। ভাইদের সঙ্গেও অদিতির আর কোন যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ খবর মিশনারী স্কুল আর বোর্ডিং থেকে অদিতি বিতাড়িত হয়েছে। এই স্কুলের আর একজন টিচার মিস কর গুপ্তর সঙ্গে আমার জানাশোনা ছিল। তাঁর কাছেই শুনলাম এসব খবর। অদিতি কি স্কুলের কি বোর্ডিং-এর কোন নিয়মই মেনে চলতে পারেনি। সঙ্গীত

সাধনাকে উপলক্ষ করে নানা জাতের নানা চরিত্রের লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করেছে। তাদের অনেকেরই বাজারে দুর্নাম আছে। মিশন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বার দুই অদিতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তৃতীয়বারে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। শুনে ভারি দুঃখই লাগল মেয়েটির জন্যে। অমন একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে। তার এই পরিণতি ঠিক যেন সহ্য করা যায় না। বিবাহিত জীবন সকলের হয়ত পোষায় না। কিন্তু জীবনযাপনের অন্য ভদ্র শোভন উপায়ও তো আছে। মেয়েটি ভালো গায়। তার চেয়েও গানকে বেশি ভালোবাসে। স্বামী প্রেম ওর না হয় নাই রইল। সেই সঙ্গীত প্রেমই তো ওকে রক্ষা করতে পারত। সমস্ত শিল্প সাধনাই রসের সাধনা. সেই রস যে কখন গেঁজে তাড়ি হয়ে ওঠে, সাধনার পথ থেকে শিল্পীকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তা অনেক সময়ই টের পাওয়া যায় না। যখন টের পাওয়া যায়, তখন আর ফিরবার পথ থাকে না। কারণ রসের নেশার চেয়ে তাড়ির নেশায় মাদকতা বেশি।

এই কথাগুলি আমার নতুন করে মনে হল আরো মাস ছয়েক বাদে শ্যামবাজার অঞ্চলের একটি সিনেমা হাউসে অদিতির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার পর। সিনেমা আমি কদাচিৎ দেখি। বিশেষ করে বাংলা আর হিন্দী ছবি প্রায় দেখাই পড়ে না। কিন্তু একজন বন্ধুর অনুরোধে সেদিন যেতে হল। তিনি বক্সের দুখানা পাশ জোগাড় করেছেন। যিনি পাশে বসবেন কথা দিয়েছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত আসেননি। তাই আমাকে নিয়ে টানাটানি। আমি বললাম,'দুধের সাধ কি ঘোলে মিটবে।' তিনি বললেন, 'মিটবে।'

পাশের বক্সেই দেখলাম অদিতিকে। দেখে প্রথমটা তো চিনতেই পারিনে। পরনে জমকালো শাড়ি, গা-ভরা গয়না। এ কী ব্যাপার। ইতিমধ্যে দু একটা জলসায় অদিতি গান গেয়েছে। দু একটি ছবিতে প্লে ব্যাক করেছে বলেও শুনেছি। কিন্তু তাতে তো এত ঐশ্বর্য হওয়ার কথা নয়।

আমাকে দেখে অদিতি প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর দ্বিগুণ সপ্রতিভতায় সেই চমকানিকে ঢেকে দিয়ে লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে হাসির ঝিলিক এনে বলল, 'এই যে সুব্রত, তুমি এখানে?'

বললাম, 'ভাগ্যে এসেছিলাম, তাই দেখা হল।'

আমার শ্লেষটুকু অদিতিকে বিঁধল। কিন্তু সে তা গোপন করবার চেষ্টা করে বলল, 'আমারও ভাগ্য। একটা বাজে ছবি দেখতে এসে একজন কাজের বন্ধুকে পেয়ে গেলাম। এসো এখানে।' বলে আমাকে তার পাশে ডাকল অদিতি. আমার বন্ধু বার বার ঈর্ষাকুটিল চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

অদিতিকে বললাম, 'ওখানে বসবার যোগ্যতা কি আমার আছে। হয়ত একটু বাদে যথার্থ অধিকারী এসে ঘাড় ধরে তুলে দেবেন।'

অদিতি বলল, 'অধিকারী আজ আর আসবেন না। তুমি নির্ভয়ে এসো।'

আমি তবু ইতস্তত করছি দেখে বলল, 'আহা এসোই না, বাড়িতে যাওয়ার আগে না হয় গঙ্গায় ডুব দিয়ে যেয়ো।'

এবার উঠে গিয়ে বসলাম অদিতির পাশে। তখন আসল ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে। অদিতি খানিকক্ষণ চুপ চাপ দেখতে চেষ্টা করল। তারপর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'নাঃ, একেবারে বাজে। চল উঠি। চল একটু চা খাই।'

বললাম, 'চা?'

অদিতি বলল, 'হ্যাঁ চা, মারাত্মক কিছু না। তোমাকে এত দিন এত চা করে খাইয়েছি, আর তুমি এক কাপ চা খাওয়াতে আজ কার্পণ্য করছ?'

বললাম, 'চল।'

বাইরে এসে সামনের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে গিয়েও অদিতি ঢুকল না। বলল, 'যা চেহারা ইচ্ছে করে না ঢুকতে। অনর্থক তোমার পকেটের পয়সা নষ্ট করে কি হবে। তার চেয়ে আমার বাসায় এসো, আমিই চা খাওয়াব। যদি তাতে অবশ্য তোমার জাত না যায়।'

বললাম, 'জাত তো গেছেই। চল। কোথায় তোমার বাসা।'

অদিতি বলল, 'এই তো কাছেই।'

ওর পিছনে পিছনে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাট বাড়ির তেতলায় উঠে এলাম। রাত তখন গোটা দশেক। মনে মনে ভাবলাম, চা খাওয়ার সময়টির নির্বাচন ঠিক হয়নি। হিংসুক বন্ধুটি যদি আমাদের বাড়িতে গিয়ে এসব কথা রটায়, কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে।

বেশ প্রশস্ত, সাজানোগুছানো দুখানি ঘর। বউবাজারের ফ্ল্যাটের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। সোফা কউচ ড্রেসিং টেবিল সবই আছে। আর একধারে বাঁয়া তবলা, তানপুরা, সেতার।

খাটের ওপর পুরু গদিতে শাদা ধবধবে চাদর বিছানো। তার নিচে দু জোড়া বালিশের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমি একটু ভ্রূ-কুঁচকে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

বললাম, 'ফ্ল্যাটটা তো ভালোই পেয়েছ।'

অদিতি বলল, 'তা পেয়েছি।'

খাটের নিচে একটি দামী গড়গড়ার দিকে আমার চোখ পড়ল। বললাম, 'ওটা কার ?'

অদিতি বলল, 'আমার ওস্তাদের।'

বললাম,'ওস্তাদ ছাড়া আর কেউ নেই এখানে ?'

অদিতি একটু আরক্ত হয়ে বলল, 'সুব্রত তোমার কৌতূহলটা একেবারেই গোয়েন্দা পুলিশের মত। ডিসেন্‌সির সীমা ছাড়িয়ে যায়।'

বললাম, 'তা ছাড়াক, কিন্তু ডিসেন্ট না শোনালেও আজ তোমাকে আমি গোটা কয়েক কথা বলব অদিতি।'

'বল।'

বললাম, 'এসব কি শুরু করেছ। তোমার মত মেয়ের এমন পাঁকে নামবার কি কোন প্রয়োজন ছিল ?'

অদিতি একটু হাসল, 'সুব্রত, এই বুঝি তোমার ব্রত কথা শুরু হল ? পাঁকে না নামলে কি পঙ্কজকে তোলা যায় ? তা ছাড়া একে আমি পাঁক মনে করিনে।'

বললাম, 'তবে কি মনে করো।'

অদিতি বলল, 'মনে করাকরির কি আছে। এ পাঁকও নয়, চন্দনও নয়, এ যা তাই। দেহ যেমন আছে তার নানা রকম দাবীও আছে। নানারকম প্রয়োজনও আছে। সে প্রয়োজনকে সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আমি সন্ন্যাসিনী তপস্বিনী হয়ে থাকতে চাইনে। আমি শাড়ি গয়না ভোগ সুখ যশ প্রতিপত্তি সবই চাই। এই কৃপণ দেশ আর সমাজের কাছ থেকে যেভাবে যতটুকু আদায় করে নিতে পারি, তাই লাভ।'

যে রিনি পালিতকে অদিতি অত ঘৃণা করত, তার মুখের আদল আমি ওর মুখে দেখতে পেলাম, তার স্বর শুনলাম ওর গলায়।

কথায় কথায় মৃগাঙ্কর কথা উঠল। আমি বললাম, 'তার খবর রাখ ?'

অদিতি মুচকি হেসে বলল,'রাখি বইকি। সেও এই চালেই চলছে। আমরা যত দূরেই থাকি আমাদের আলাপের সুর একই। সেহানবীশের বন্ধু মহলানবীশের সঙ্গে প্যারিস-এর এক বারে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

বললাম, 'সেহানবীশ কে ?'

অদিতি বলল,'নব ভারত পিকচার্স-এর একজন ডিরেক্টর। তাঁর বইতেই তো আমি এখন কাজ করছি।'

বললাম, 'ও, তা তোমার গানটান কেমন চলছে। গানের সুযোগ সুবিধে পাচ্ছ তো ?'

অদিতি বলল, 'নিশ্চয়ই, সেই জন্যেই তো আছি।'

ডিরেক্টর-এর ওপর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অদিতি বলল সেহানবীশ শহরের সবচেয়ে বড় ওস্তাদকে রেখে দিয়েছেন অদিতির জন্যে। সঙ্গীত চর্চার এত সুযোগ সে এর আগে কল্পনাও করতে পারত না। সেহানবীশের অনেক দোষ আছে। কিন্তু গানকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর গায়িকাকে ?'

রাগে কি অনুরাগে বুঝতে পারলাম না অদিতির গাল দুটি লাল হয়ে উঠল। একটু বাদে হেসে

বলল, 'তুমি এত অভদ্র যে তোমার কান মলে নেওয়া উচিত।'

বিদায় দেওয়ার জন্যে অদিতি দোর পর্যন্ত এসেছে, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনতে পেলাম, দামী ছাই রঙের স্যুট পরা বেশ ফর্সা লম্বা বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশের এক ভদ্রলোক চুরুট মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। তারপর অদিতির দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি তোমার খোঁজে গিয়ে শুনি তুমি উঠে এসেছ।'

অদিতি বলল, 'হ্যাঁ। যা একখানা ছবি। দেখতে দেখতে মাথা ধরে গেল। আর গানের সুরগুলি তো অশ্রাব্য। তাতে মাথা ধরা আরো বাড়ে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ইনি কি মাথার রোগ বিশেষজ্ঞ তোমার কোন ডাক্তার বন্ধু।'

অদিতি মধুর ভঙ্গিতে খিল খিল করে হেসে উঠল, 'চেহারা আর বেশবাসেএকে কি ডাক্তার বলে মনে হয় তোমার ? বড় জোর কম্পাউন্ডার বলে আন্দাজ করা উচিত ছিল। না, ডাক্তারও নয় কম্পাউন্ডারও নয়। এ আমাদের একজন হিন্দু পাদ্রী। মিঃ চক্রবর্তী, মিঃ সেহানবীশ।'

অদিতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর আমরা দুজনে নমস্কার বিনিময় করলাম, আর সেই নমস্কারই আমাদের বিদায় নমস্কার হল।

বছরখানেক বাদে চৌরঙ্গীর একটা রেস্টুরেন্টে আমাদের আর একজন কমন ফ্রেন্ড নৃত্যশিল্পী বরুণ চৌধুরীর সঙ্গে মৃগাঙ্কর কথা নিয়ে আলাপ করছিলাম। কথায় কথায় বলাম, 'সেই যে সে সাগরপাড়ি দিয়েছে, তার আর কোন খবরই নেই।'

বরুণ বলল, 'কে বলল নেই, সাগর সে কবে সাঁতরে চলে এসেছে, তা জানো না বুঝি ?'

অবাক হয়ে বললাম, 'সাঁতরে এসেছে ?'

বরুণ বলল, 'প্রায় সেইরকমই। অনেক নাকানি চুবানি খেয়ে গ্যালন গ্যালন নোনা জল গিলে তারপর পারে এসে উঠেছে। সব নষ্ট করেছে এমনকি স্বাস্থ্যটি শুদ্ধু।' আলঙ্কারিক ভাষা ছেড়ে এবার নিরলঙ্কার হল বরুণ।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'করছে কি ? আছে কোথায় ?'

বরুণ বলল, 'কিছুই করছে না। আছে ডিকসন লেনে। সেভেনটিন সি না ডি ওই রকমই কাছাকাছি একটা নম্বর।'

বললাম, 'চলছে কি করে ?'

বরুণ বলল, 'ওর তো কোন বাদ বিচার নেই জানই। শুনেছি নিচু শ্রেণীর একটি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েকে নাকি জুটিয়ে নিয়েছে। সেই করে কর্মে খাওয়াচ্ছে। তা এ একরকম মন্দ নয়। আমরা তো অরক্ষিত হয়েই আছি। ও তবু একজনের রক্ষিত হয়ে প্রাণরক্ষা করছে।'

মৃগাঙ্কর এই রুচিবিকৃতি আর দুর্দশার কথা শুনে দুঃখ বোধ করলাম। কিন্তু ওর ওপর যত বিতৃষ্ণাই আসুক, একবার খোঁজ না নিয়ে পারলাম না। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে অফিস ছুটি। স্ত্রীকে বাজার টাজার সেরে দিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম।

কানা গলির মধ্যে খুঁজে পেতে একটু কষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত পেলাম বাড়িটা। দোতলা পুরোন বাড়ি। ওপরে কয়েক ঘর এ্যাংলো ইন্ডিয়ান থাকে। মৃগাঙ্কর নাম করতে আর বর্ণনা দিতে এক সাহেব বিরক্ত হয়ে একতলার কোণের দিকের একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কড়া নাড়লাম। 'কে', বলে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম এডিথ। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়েছে। একটু হেসে বলল, 'মিঃ চক্রবর্তী আসুন।'

বললাম, 'তুমি এখানে !'

এডিথ চোখ নত করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি এখানেই আছি।'

বললাম, 'মৃগাঙ্ক কোথায় ?'

এডিথ বলল, 'তিনিও এখানেই। আসুন, ভিতরে আসুন।'

ছোট একখানা ঘর। পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একখানি তক্তাপোশ পাতা। সামনের দিকে খুব ছোট একটি জানালা। তার সামনে বসে মৃগাঙ্ক এক মনে কাগজ পেনসিলে স্কেচ করে চলেছিল।

এডিথ ডেকে ওর ওর ধ্যান ভাঙাল, 'ফিরে দেখ কে এসেছেন।' ভ্রুকুঞ্চিত করে ফিরে তাকাল মৃগাঙ্ক, তারপর আমাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, 'ও তুমি! এস, বস এসে।'

তক্তাপোশের ওপর একটা পুরোন মাদুর পাতা, সেখানে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল মৃগাঙ্ক।

আমি ওর পাশে বসে পড়ে বললাম, 'তোমার কাজের ক্ষতি করলাম।' মৃগাঙ্ক বলল, 'তা তো করেইছ। এখন আর ভদ্রতা কোরো না। কেমন আছ তাই বল। আমি কেমন আছি তা তো দেখতেই পাচ্ছো। তোমার কুশল সংবাদ এবার শুনি।'

খানিকক্ষণ অভিযোগ অনুযোগের পর বললাম, 'এই গর্তের মধ্যে কেন রয়েছ? একি কৃচ্ছ্রতা বিলাস?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'বিলাস নয় সুব্রত, বিশ্বাস কর। এর চেয়ে বেশি ভালো থাকবার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

চেয়ে দেখলাম ওর চেহারাও খারাপ হয়ে গেছে। পরনে একটা আধ ময়লা পাজামা। গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জির ভিতর থেকে গলার হার দেখা যায়। ঘবে আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছু নেই। পশ্চিম দিকে একটি দড়ির আলনা, তার ওপর আর একটা পাজামা আধ ময়লা একটা জামা কোঁচানো নীল পেড়ে একখানা শাড়ি, একটা সাদা সেমিজ। তার নিচে কোণের দিকে এনা'মেলের ছোট একটা হাড়ি আব খান দুই বাসন, রান্নাবান্নার সাজসরঞ্জাম। কিন্তু তক্তাপোশের তলায় আরো কিছু গৃহস্থালীর আসবাব আ'ছে। হামাগুড়ি দিয়ে তাব ভিতর থেকে চায়ের সরঞ্জাম বেব করল এডিথ। তারপর সরে এসে মেজের ওপর চা করতে বসল।

বললাম, 'আবার ওসব কেন?'

এডিথ বলল, 'খান। শুধু এক কাপ চা-ই তো।'

চাযের পর্ব শেষে হলে এডিথ বলল, 'আমি তাহলে একটু বেরুচ্ছি। না ফেরা পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও যেয়ো না।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কিন্তু আজ তুমি না বেরোলেই পারতে। শবীবটা যখন এত খাবাপ।'

বললাম, 'কেন কি হয়েছে এডিথের।'

দুজনেই চুপ করে রইল। এডিথের দিকে তাকাতে সে লজ্জিত ভঙ্গিতে নিচু করল চোখ। এবার আমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম এডিথ অন্তঃসত্ত্বা।

একটু বাদে এডিথ বেরিয়ে গেল।'আর একদিন আসবেন মিঃ চক্রবর্তী। অবশ্য আসবেন।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি মৃগাঙ্ককে বললাম, 'বরুণ বলছিল একটি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে নাকি—'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এডিথের নামটা তো ওই রকমই শোনায়। কিন্তু আসলে ও খাঁটি ইন্ডিয়ান।'

একটু চুপ কবে থেকে বললাম, 'তোমাদের এই অপূর্ব যোগাযোগ হল কি করে?' মৃগাঙ্ক সংক্ষেপে তখন ব্যাপারটি জানাল।

ইউরোপ থেকে ঘুবে আসবার পর দেশকে বিদেশ বলে মনে হতে লাগল মৃগাঙ্কর। হাতে একটি পয়সা নেই। কোন বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাবার জো নেই। মাস কয়েকের মধ্যে এমন দশা হল যে মাঝে মাঝে অভুক্ত থাকতে হয়। ছবি আঁকার খেয়াল আর তখন নেই মৃগাঙ্কর। ও তখন বুঝতে পেরেছে নিজের দৌড়। বুঝতে পেরেছে ভুল পথে এসেছে। এখন কোন একটা চাকরি বাকরি পেলেই হয়। কিন্তু কোথায় সে চাকরি। এই সময় কানে গেল অদিতিব কথা। সে নাকি কোন এক ডিরেক্টবের উপপত্নী হয়ে বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই আছে। ছোটখাট জলসা টলসায় ডাক পড়ছে মাঝে মাঝে। দু-একখানা গানের রেকর্ডও নাকি হয়েছে। এদিক থেকে চিত্রশিল্পীর চেয়ে গীত শিল্পীর ভাগ্য ভালো। মৃগাঙ্ক একবার ভাবল যাবে নাকি ভিখারি শিব হয়ে অন্নপূর্ণার কাছে। কিন্তু সে তো আর অন্নপূর্ণা নয়, সে উর্বশী। তার কাছে আর হাত পাতবার জো নেই। তা ছাড়া আত্মসম্মানেও বাধল মৃগাঙ্কর।

কিন্তু অন্নপূর্ণা নিজেই এসে হাজির হল একদিন। মীর্জাপুরের সেই মেসটায় পুরোন এক

রুমমেটের খালি সীটে তখন অস্থায়ী ভাবে আছে মৃগাঙ্ক। খায় পাইস হোটেলে। অবশ্য যেদিন পয়সা পকেটে থাকে। একদিন দুপুর বেলায় চাকর এসে খবর দিল একটি মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মৃগাঙ্ক বলল, 'নিয়ে এসো।'

চাকরটির পিছনে পিছনে ঘরে এসে ঢুকল এডিথ।

চাকরটি চলে যাওয়ার পর মৃগাঙ্ক বলল, 'তুমি।'

এডিথ বলল, 'হ্যাঁ মিঃ চ্যাটার্জি।'

ঘরে রুমমেটরা কেউ নেই। সবাই কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে।

মৃগাঙ্ক তাকে তক্তাপোশের পাশে বসতে বলল।

'তুমি কি করে আমার খোঁজ পেলে।'

এডিথ বলল যে, দূর থেকে একদিন সে মৃগাঙ্ককে দেখতে পেয়েছিল। তারপর তার এক পুরোন বন্ধুর কাছে খোঁজ খবর আর ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে এসেছে।

এডিথ বলল, 'আমি সবই শুনেছি মিঃ চ্যাটার্জি। আপনার চাকরি-বাকরি নেই।'

মৃগাঙ্ক অদ্ভুত একটু হাসল, 'হোটেল খরচটাও নেই পকেটে, তাও শুনেছ নিশ্চয়ই।'

এডিথ বলল, 'তাতে দুঃখ করবেন না মিঃ চ্যাটার্জি। টাকা পয়সাব নিয়মই এই। কখনো থাকে, কখনো থাকে না, এখন গেছে আবার হবে, আপনি ভাববেন না।'

তারপর আস্তে আস্তে আচলেব গিঁট খুলতে লাগল এডিথ। গিঁট খুলে বার করল একখানা নোট। দু টাকা এক টাকার নয়। একশ টাকার।—'নিন মিঃ চ্যাটার্জি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ওকি।'

এডিথ বলল, 'আপনাব সেই নোট। আপনি তখন যথাসর্বস্ব বেচে দিয়েছিলেন, শত অভাব অনটনেও সে টাকা আমি খরচ করিনি। এ টাকা আজ নিন আপনি। না মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। সে দিন তো আমি ফিরিয়ে দেইনি। সেদিন তো আমি নিযেছিলাম। আজ আপনিও নিন।'

সেদিন এই নোটখানাব ওপর এডিথের চোখের জল পডেছিল আজ বুঝি মৃগাঙ্কর চোখের জলও গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মৃগাঙ্ক পড়তে দিল না। সে তো মেয়ে নয়। অন্যমনস্ক হবার জন্যে অন্য কথা পাড়ল। 'তুমি কোথায় আছ এডিথ, বিয়ে থা করেছ।'

এডিথ একটুকাল চুপ কবে থেকে বলল, 'বিয়ে তো আমার অনেক আগেই হয়ে গেছে মিঃ চ্যাটার্জি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তাই নাকি? কবে কোথায় কার সঙ্গে?'

চোখ নিচু করে মৃদু গলায় তিনটি প্রশ্নের কেবল একটি জবাব দিল এডিথ—'সেই কোর্টে।'

দুজনেই একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ মৃগাঙ্ক সেই তক্তাপোশ থেকে উঠে এডিথের সামনে এসে তাকে বুকে চেপে ধরল। এডিথ রুদ্ধ শ্বাসে বলল, 'ছাড়ুন, মিঃ চ্যাটার্জি, ছাড়ুন। এ তো আমি চাইনি, এ তো আমি চাইনে।'

মৃগাঙ্ক ওর দুই ঠোঁটে চুম্বন করল, 'আমি চাই এডিথ, আমি চাই।'

জানলা দিয়ে একটু হাসির শব্দ শোনা গল। মৃগাঙ্ক সেদিকে তাকাতেই সবে গেল মেসের চাকরটি। ও বোধ হয এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেছে। দেখুক সাক্ষী থাকুক। তাদের এই গান্ধর্ব বিবাহের ওই হোক একমাত্র পুরোহিত।

ডিকসন লেনের এই বাসাটা এডিথের আগে থেকেই ছিল। এখান থেকে তার কাজের জায়গা কাছে পড়ে। এ বাসা ছেড়ে দেওয়ার এখনো কারণ ঘটেনি, এখনো সামর্থ্য হয়নি মৃগাঙ্কদের।

তারপর আমি সময় পেলে মাঝ মাঝে যেতাম। খুব ঘন ঘন নয়। মাসে দুই একদিন। এডিথ তার সেই অবস্থা নিয়েই অন্য দুটি বাড়িতে আয়ার কাজ করত। ছোট ছেলেমেয়ে রাখত স্বচ্ছল গৃহস্থের। তাছাড়াও বেশি টাকার জন্যে অন্য কাজকর্ম করতে হত। আমি বলতাম, 'এডিথ এত

খাটুনী কি তোমার শরীরে কুলোবে ?'

এডিথ লজ্জিত হাসি হেসে বলল, 'কুলোবে মিঃ চক্রবর্তী, আমার দ্বিগুণ শক্তি বেড়ে গেছে। আপনি তো জানেন না।'

এডিথের কষ্ট দেখে মৃগাঙ্কও বসে রইল না। সেও বেরোল কাজের চেষ্টায়, কিন্তু কাজ তো সব সময় চেষ্টা করলেই মেলে না।

জাত শিল্পীর দেমাক ছেড়ে ও পণ্যশিল্পেও হাত দিল। বইয়ের ওপরের মলাট, ভিতরের ইলাসট্রেশন, মাথার তেল আর দাঁতের মাজনের ছবি আঁকবার জন্যে এগিয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমি ভেবে দেখেছি সুব্রত, সব আর্টই একই সঙ্গে ফাইন আর কমার্শিয়াল। এদের জাতিভেদ নেই। এরা মূলত এক।'

কিন্তু ওর ভেবে দেখাটাই তো সব নয়। যারা ওব হাতের কাজ দেখল তারা পছন্দ করল না, তাদের দরকারের উপযোগী বলে মনে কবল না। রাগ করে মৃগাঙ্ক ফের ওর সেই দুর্বোধ্য ছবি নিয়ে বসল।

মাস তিনেকের মধ্যে এডিথের মেয়ে হল একটি। ঠিক একেবারে এডিথের চেহাবা। কিন্তু মেয়ে হওয়ার পরে ওর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ল। জটিল জরায়ুর রোগ এমন ভাবেই ওকে চেপে ধরল যে ও আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। আমরা সাধ্যমত ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। এমনকি সার্পেন্টাইন লেনের আর একটু ভালো বাড়িতে আর একটু ভালো ঘরে সরিয়ে আনলাম ওকে।

এডিথ বলল, 'আমার জন্যে কেন এত কষ্ট করছেন মিঃ চক্রবর্তী, কেন এত খরচ করছেন। ওর কাজের কত ক্ষতি হচ্ছে। রঙ কেনার পয়সা জুটছে না।'

বলতাম, 'তুমি সেরে ওঠ তারপর সবই জুটবে।'

একটু দূরে শোযানো কালো রোগা মেয়েটাব দিকে মাঝ মাঝে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত এডিথ। অপলকে তাকিয়ে থাকত।

একদিন বললাম, 'মেয়ে খুব সুন্দর হয়েছে এডিথ।'

এডিথ লজ্জিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল, 'কি যে বলেন মিঃ চক্রবর্তী। তবে যত্ন নিতে পারলে শরীরটা ওর শুধরাতো। এত লোকের এত ছেলে মেয়েকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলাম, কিন্তু নিজের বেবিকে নিজে প্রাণভরে কোলে নিতে পারলাম না। আদর করতে পারলাম না—মিঃ চক্রবর্তী।'

আমি কি একটা সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এডিথ সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুকের ওপর ক্রস চিহ্ন এঁকে বলল, 'ছি ছি ছি কি ছোট মন আমার। লর্ড আমাকে ক্ষমা করুন। সেই সব ছেলেমেয়ে তো আমার পর নয়, মিঃ চক্রবর্তী। আমি যে তাদের আই মা। আমার বেবির ছোঁয়া তো আগে আমি ওদের মধ্যেই পেয়েছি।'

মেয়ে হওয়ার মাস দুই বাদে এডিথ মারা গেল। মৃত্যুর আগে পাদ্রী ডেকে সে খৃষ্টান মতে আত্মদোষ স্বীকার করে গেল। কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলেছিল এই তার সব চেয়ে বড় পাপ। সে পাপ যেন প্রভু ক্ষমা করেন। আর মৃগাঙ্ককে দুটি অন্তিম ইচ্ছা জানাল এডিথ। তাদের বেবিকে যেন মৃগাঙ্ক অরফানেজে না পাঠায়, যেন নিজের কাছে রেখে যত্ন করে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করে। আর দ্বিতীয় অনুরোধ পার্কসার্কাসের বড় কবরখানার এক কোণে তার জন্যে যেন একটু স্থান হয়।

স্থান পাওয়া সহজ হল না। চার্চ থেকে নানারকম আপত্তি উঠল। মৃগাঙ্ক ঠিক খৃষ্টান নয়, যথার্থ খৃষ্টানের রীতি-নীতি সে মানেনি। চার্চে যায়নি। কিন্তু তখন মানেনি, এখন মানল, তখন যায়নি, এখন গেল। তাছাড়া ধার করে কিছু টাকাও এর জন্যে ব্যয় করল মৃগাঙ্ক। শেষ পর্যন্ত পাদ্রীদের হৃদয় গলল।

আমি বললাম, 'মৃগাঙ্ক, তুমি তাহলে এতদিনে সত্যিই খৃষ্টান হলে। আস্তিক হলে। অদিতি যা করতে পারেনি, এডিথ তোমাকে তাই করে গেল।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ তা করল। কিন্তু তুমি যে অর্থে বলছ সে অর্থে নয়, তুমি যে চোখে দেখছ সে চোখে নয়। সমস্ত ধর্ম আর সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি আজ একই শিল্পরূপ দেখতে পাচ্ছি সুব্রত। সেই রূপের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করছি। শুধু সেই অর্থেই আমি আস্তিক।'

এর বোধ হয় বছর খানেক কি বছর দেড়েক পরে অদিতির সঙ্গে আমার এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখা হয়ে গেল। তার আগে থেকেই কিছু কিছু দুরবস্থার কথা আমার কানে আসছিল। বছরে পর পর দু'খানা ছবিতে মার খেয়ে নবভারত পিকচার্স তালা বন্ধ করেছে,কয়েকটা মামলা চলছে তার নামে। আর ডিরেক্টর মিঃ সেহানবীশ নানাজনের তাগিদে অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত বোম্বে গেছেন ভাগ্যান্বেষণে। যাওয়ার সময় অদিতির সঙ্গে শুধু তাঁর ঝগড়া নয়, সম্পর্কচ্ছেদও হয়ে গেছে। তিনি নাকি রাগ করে বলেছেন, অদিতিব মত এমন একটি অপয়া মেয়ে তিনি নাকি আর কখনো দেখেননি। তার দোষেই মিঃ সেহানবীশের সব লোকসান হয়েছে। অদিতির ওপরের ওই চামড়াটাই একটু সাদা, ভিতরে বস্তু বলে কিছু নেই। অদিতির জন্যে তিনি যত টাকা ঢেলেছেন, সবই তাঁর জলে গেছে। ক্যামেরায় অদিতিব রূপ ভালো করে ধরা পড়েনি। রেকর্ডে তার গলা নাকি কান্নাব মত শুনিয়েছে। কাগজওয়ালাবা পঞ্চমুখে গাল দিয়েছে। দশ বছবের মধ্যে মিঃ সেহানবীশেব আব কোন চান্স পাওয়ার আশা নেই।

অদিতিও রূঢ় ভাষায় জবাব দিতে ছাড়েনি। সেহানবীশ এখন অদিতির দোষ দিচ্ছে বটে। কিন্তু আসল দোষটা তার নিজের। স্যুটিং-এর সময় সে মন দিয়ে কাজ করেনি। ড্রিঙ্ক করে বেশির ভাগ দিনই সে বেসামাল হয়ে রয়েছে। যেদিন মদ একটু কম পড়েছে, সেদিন নতুন তরুণী আর্টিস্টদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেছে বেশি। অদিতির ঘাড়ে এখন দোষ চাপালে কি হবে, সব দায়িত্ব সেহানবীশের নিজের, সব দায় তার।

কিন্তু এই ঝগড়াটাই ওদের ছাড়াছাড়ির আসল কারণ নয়। আসল কারণ যে কি তা পরে টের পেলাম। অফিসে বসে একদিন ফোন পেলাম অদিতির। বিডন রোয়ে তাব নতুন ঠিকানা। আমি যেন অফিসের পরই তার সঙ্গে দেখা করি। বিশেষ জরুরী দরকার আছে।

পাঁচটার পর গেলাম বিডন রোয়ের সেই বাড়িতে। এরই মধ্যে তেতলা থেকে একতলায় নেমে এসেছে অদিতি। পাড়াটা ভালো নয়, বাড়িটাও জীর্ণ। ছোট ছোট দু'খানি ঘর নিয়ে সে আছে। সেই আগেকার আসবাবপত্রগুলি কিছুই নেই। শুধু সুরযন্ত্রগুলি ছাড়া। চেহারা আর বেশবাসেও দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। প্রায়ই সেই বউবাজারের ফ্ল্যাটের অবস্থা। আধবয়সী একটি ঝি আছে সঙ্গে। সেই এসে প্রথমে দরজা খুলে দিল।

অল্প দামী কাঠের একটা চেয়ার দেখিয়ে অদিতি আমাকে বসতে বলল।

বললাম, 'ব্যাপার কি। তোমার অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি।' অদিতি একটু হাসল, 'শরীর থাকলে তার সুখও আছে, অসুখও আছে। দেহটা সত্যিই তেমন ভালো যাচ্ছে না সুব্রত। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে খবর দিইনি। খবর দিয়েছি ওর জন্যে।' বলে আঙুল দিয়ে কোণের দিকে দোলনাটিকে দেখিয়ে দিল অদিতি।

আমি একটু যেন চমকে উঠলাম, একটু আঘাতও পেলাম। খানিক সময় নিয়ে বললাম, 'ও কবে হল! কত দিন?'

অদিতি একটু চুপ করে বলল, 'তিন মাস এগার দিন।'

বললাম, 'ছেলে না মেয়ে?'

অদিতি বলল, 'ছেলে।' তারপর একটু হাসল, 'এবার বোধ হয় জিজ্ঞেস করবে কালো না ফর্সা। কিন্তু তুমি কি শুধু শুনবেই? চলনা একবার দেখবে। ওর শরীর ভারি খারাপ। তোমার তো একজন নাম করা চাইল্ড স্পেশালিস্ট বন্ধু আছেন। তোমার ছেলেকে তো একবার দেখিয়েছিলে। আমি ভেবেছি তোমার থ্রুতে তাঁকে দেখাব। টাকা আমি তাঁকে পুরোই দেব। তবে তুমি বলেটলে দিলে হয়ত যত্ন নিয়ে দেখতে পারেন।'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'আচ্ছা। ফোনে আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে তাঁর সঙ্গে, তাঁর

বাড়িতেই নিয়ে যাবে তো ?'

অদিতি বলল, 'তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।' তারপর একটু হেসে বলল, 'ভয় করবে নাকি খুব ?'

বললাম, 'খুব না হলেও অল্পস্বল্প তো করবেই। চল, তোমার ছেলে দেখি গিয়ে। দেখবার মত সোনা গিনি অবশ্য কিছু সঙ্গে আনিনি। আগে তো জানাওনি।'

আমার পরিহাসে অদিতি একটুকাল আরক্ত হয়ে রইল, আড়ষ্ট হয়ে রইল। মনে মনে লজ্জিত হলাম। ছিঃ অমন নিষ্ঠুর শ্লেষটা না করলেই পারতাম। খানিক বাদে অদিতি বলল, 'না এনেছ তাতে কি হয়েছে সুব্রত। তোমার মত বন্ধুর মুখই যথেষ্ট।'

দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ছেলেকে। মৃগাঙ্কর মেয়ের মত কালো হয়নি, বেশ ফর্সাই হয়েছে। নাক চোখের গড়নও বেশ সুন্দর। কিন্তু ভারি রোগা। হাতের পাতায় আর পায়ের তলায় কি রকমের যেন লালচে দাগ।

বললাম, 'ওর কি অসুখ অদিতি।'

অদিতি বলল, 'তা ডাক্তারই বলতে পারবেন, এসো এবার।'

গিয়ে ফের সেই চেয়ারটায় বসলাম। অদিতি বসল সামনের তক্তাপোশটায়।

বললাম, 'ওর নাম কি রেখেছ ?'

অদিতি বলল,'নাম ? নাম রেখেছি আনন্দ। ও বড় অনাহূত, বড় অবাঞ্ছিত। কিন্তু তা যেন বড় হয়ে ও না বুঝতে পারে।'

আমি ওর পিতৃ পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বললাম, 'ওর পুরো নাম তো আনন্দ সেহানবীশ ?'

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে অদিতি ফের আরক্ত হয়ে উঠল। তারপর রূঢ়, কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, 'না সেহানবীশ খোসনবীশ কিছু নয়। ও আনন্দ আদিত্য। সেহানবীশ যখন ওর দায়িত্ব অস্বীকার করেছে সুব্রত, আমিও কোন দায় তার ঘাড়ে চাপাতে চাইনে।'

আমি মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কি।'

অদিতিও আস্তে আস্তে সবই খুলে বলল।

আনন্দকে নিয়েই গোলমালটা দুজনের মধ্যে বাধে। সম্ভাবনাতেই সেহানবীশ বাধা দিতে চেয়েছিলেন, বিরক্ত বিমর্ষ হয়ে বলেছিলেন, 'মহা মুশকিলে ফেললে তো। তোমার ফিগার ভারি খারাপ হয়ে যাবে। ছবি বিশ্রি দেখাবে। শিগগির যাও ডাক্তারের ক্লিনিকে।'

কিন্তু ডাক্তার তাকে গোপনে পরামর্শ দিলেন যে, এমন অবস্থায় এসে অদিতি পৌঁছেছে যে, এখন কিছু করা অদিতির স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভালো না, এমনকি প্রাণের পক্ষেও আশঙ্কাজনক। শুনে আতঙ্কে পিছিয়ে এল অদিতি। তখন পর্যন্ত যে দ্বিতীয় প্রাণ তার ভিতরে একটু একটু করে স্পন্দিত হচ্ছে তার জন্যে মমতা জন্মেনি, নিজের প্রাণের ওপরই তার মায়া।

কিন্তু সব শুনে সেহানবীশ আরো চটে উঠলেন, বললেন, 'ও সব ডাক্তারের কারসাজী, আরো টাকা নেওয়ার ফন্দি। চল তোমাকে আর এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

কিন্তু অদিতি কিছুতেই রাজী হল না। আর এই নিয়ে রোজ মন কষাকষি, ঝগড়াঝাটি চলতে লাগল।

সেহানবীশ রাগ ক'রে বললেন, 'এ সব তোমার চালাকি। আমাকে জব্দ করবার, আমার কাছ থেকে জীবনভর টাকা আদায় করবার ফন্দি। কিন্তু তা তুমি কিছুতেই পারবে না।'

একথা শুনে অদিতি বিবর্ণ মুখে চুপ ক'রে রইল।

কিন্তু চুপ করে থাকলেই সমস্যার সমাধান হয় না। মনের জ্বালা মেটে না। এদিকে সেহানবীশেরও জ্বালা কম নয়। বাড়িতে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তার ওপর আবার নতুন একি ফ্যাসাদ। শেষে সেহানবীশ মরীয়া হয়ে বললেন, 'এর জন্যে যে আমি একাই দায়ী তার প্রমাণ কি। বিমান, সুজন এরাও তো আসত।'

এরা দুজন তরুণ অভিনেতা। সেহানবীশের বন্ধু। সেই সুবাদে অদিতিরও। সেহানবীশের শেষ

কথাটা অদিতির আর সহ্য হল না। সে কাচের গ্লাস ছুঁড়ে মারল সেহানবীশের দিকে। সে গ্লাস অবশ্য সেহানবীশের গায়ে লাগল না। কিন্তু তার দু'মাস বাদে ভাগ্যলক্ষ্মী যে পা ছুঁড়লেন তা মাথায় লাগল। সেহানবীশ কলকাতা ছাড়লেন, সেই সঙ্গে অদিতি আর আনন্দকেও।

নানা গোলমালে অদিতির আরো সর্বনাশ হয়ে গেল। একদিন মনের ভুলে দরজা খোলা রেখে কোথায় বেরিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে চোর গয়নাগাঁটি সবই নিয়ে পালিয়েছে, রেখে গেছে শুধু আনন্দকে।

নিদারুণ ক্রোধে আর নৈরাশ্যে ঘুমন্ত মাংসের পুঁটলিটাকে অদিতি বাঁ পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল মেঝের ওপর, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'ওই সঙ্গে তুইও কেন গেলিনে, তুই কেন রইলি।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই মাংসের পুঁটুলির ভিতর থেকে এক অদ্ভুত শব্দ বেরুল। প্রথমে মনে হল যেন এক ঝঙ্কার দিয়ে সেতারের সমস্ত তারগুলি ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু সেতার ছিঁড়লে তো আর বাজে না। কিন্তু মাংসের পুঁটলির ভিতর থেকে অবিরাম কান্না তখনো বেজে চলল। সে কি কান্না না গান? কি নাম রাগিনীর? ইমনকল্যাণ? আর অদিতির বুকের মধ্যে সারা দেহের শিরায় শিরায় সেই সুরের অনুরণন চলতে লাগল। সেতার ছেঁড়েনি। ছেঁড়েনি। শুধু ঝঙ্কার লেগেছে। ছুটে এসে তাড়াতাড়ি ছেলেকে বুকে তুলে নিল অদিতি।

ওর মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে গেল 'সোনা আমার, মণি আমার, আমার মাণিক্য।'

ব্লাউসের বোতাম খুলে পরিপুষ্ট একটি স্তন গুঁজে দিল ওর মুখে। তারপর অপলকে চেয়ে রইল শিশুর পরিতৃপ্ত দুটি চোখের দিকে।

একা একা অত দামী ফ্ল্যাটে থাকা অদিতির আর পোষাল না। বুড়ো ড্রেসমেকার ছানু মিঞার সাহায্যে এই বাসার খোঁজ পেয়ে এখানে উঠে এল।

আসবার সময় গলির মোড় পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এল অদিতি। আর একবার অনুরোধ করল আনন্দকে ডাক্তার দেখানোর কথা যেন আমি না ভুলে যাই।

আমি ওব মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না ভুলব না।'

অদিতি কিছুই বলল না। শুধু চোখের দুটি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি আমার দিকে তুলে ধরল।

ওর মুখে সেদিন রিনি পালিতের মুখ দেখেছিলাম। আজ অবিকল দেখলাম এডিথের মুখ। কে জানে ঋতুতে ঋতুতে রিনি পালিতেরও হয়ত এমনি ক'রে মুখের বদল হয়। যার চোখে ধরা পড়ে সেই শুধু বোঝে, সেই শুধু চেনে সেই শুধু দাঁড়াতে পারে তার মুখোমুখি।

ডাক্তার বন্ধু শিশুকে পরীক্ষা করে গম্ভীবভাবে বললেন, 'রোগটা ভালো নয় হে। তবে খরচ-পত্র করলে সেরে যাবে।'

অদিতি তার শেষ গয়না পর্যন্ত বিক্রি করে ছেলের রোগ সারাল।

তারপব কাটল বছর দুই। এর মধ্যে নানা সাংসারিক ঝামেলায় আমি জড়িয়ে পড়লাম। ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়। অদিতির সঙ্গেও যে না হয় তা নয়। মৃগাঙ্ক জীবিকার জন্যে পণ্যশিল্পের জোগান দেয়, অদিতিরও দু' একখানা রেকর্ড অল্পস্বল্প চলে, দু'একবার প্লে ব্যাক করবার চানস পায় দু'একটা সিনেমা কোম্পানিতে। জানো তো আমার পেটে কথা থাকে না। বলব না বলব না করেও ওদের দু'জনকে আমি মোটামুটি সবই জানিয়েছিলাম। এডিথের গর্ভে মৃগাঙ্কর মেয়ে হয়েছে শুনে অদিতি খুশি হয়নি, বলেছিল, 'ছি ছি ছি শেষ পর্যন্ত এডিথকে—'

পরে যখন বললাম, 'এডিথ মারা গেছে, তখন অবশ্য অদিতি চুপ করে রইল। কিন্তু তার মৃত্যু যে সব বিদ্বেষ ওর মন থেকে মুছে দিয়েছে তা মনে হল না।

অদিতির সঙ্গে যদিও আর কোন সম্পর্ক নেই, তবু তার পুত্রলাভের খবর মৃগাঙ্ক খুব প্রসন্ন মনে নিতে পারল না। ব্যঙ্গ করে হেসে বলল 'ভালোই তো, আশীর্বাদ করি শত পুত্রবতী হোক, এক সেহানবীশ গেছে আরো কত সেহানবীশ জুটবে। তার ছেলের বাপের অভাব হবে না।'

প্রথম দিকের তীব্রতাটা কেটে যাওয়ার পর ওরা অবশ্য দুজনেই একে অন্যের প্রসঙ্গে চুপ থাকত, যেন কেউ কাউকে চেনে না, কারো সম্পর্কে কারো কোন কৌতূহল নেই ঔৎসুক্য নেই। তাদের

যৌথ জীবনের যে একটা অধ্যায় ছিল পুঁথি থেকে কে যেন তা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। চুকে বুকে শেষ হয়ে গেছে সব। থাকার মধ্যে শুধু ছেঁড়া দাগটা।

বহুদিন ওদের আর কোন খোঁজখবর নিতে পারিনি। নেওয়ার কোন দরকারও হয়নি। সেদিন সকাল বেলায় বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি মৃগাঙ্ক এসে আমাদের বাসায় হাজির। খুশি হয়ে বললাম, 'এসো এসো। কি ভাগ্য। রোজ দুধওয়ালার মুখ দেখে ঘুম ভাঙে। আজ একবারে রঙওয়ালা এসে উপস্থিত।'

দিনটা ছিল হোলির। পাড়ার ছেলেরা সকাল থেকেই পিচকারি নিয়ে বেরিয়েছে। খৃষ্টান বলে মৃগাঙ্ককে ছেড়ে দেয়নি। জামা কাপড় আবীর জলে ভিজিয়ে দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'আর বোলো না, তোমাদের যা একখানা পাড়া।' বললাম,'ওদের দোষ দিয়ো না, তুমি রোজ কাগজ রাঙাও, ওরা একদিন কাপড় রাঙিয়েছে। তারপর ব্যাপার কি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ব্যাপার একটু আছে। আমি ফেব বিয়ে করছি। কালই তারিখ। তোমাকে কষ্ট করে আবার একটু দৌড়তে হবে রেজেস্ট্রি অফিসে।'

বললাম, 'দৌড়াব বলছ কিহে। আমি তো উড়ে যাব। কনেটি কে? চেনাশোনার মধ্যে কেউ নাকি?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, চেনাশোনার মধ্যেই। অদিতি।'

'বল কি। তুমি কি ঠাট্টা করছ?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'না, ঠাট্টা নয় সত্যিই।'

জিজ্ঞাসাবাদের পর ঘটনাটা ওর মুখ থেকে পুরোপুরি জানতে পারলাম। —

প্রথমে দেখা হয় ধর্মতলা স্ট্রীটে জয়শ্রী সিনেমা কোম্পানীর অফিসে। স্থির চিত্রে কোন আর আশা নেই দেখে মৃগাঙ্কও চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছে। দৃশ্যপট আঁকে পোস্টার আঁকে। যখন যে কাজ হাতে আসে তাই করে। কিন্তু টাকা বড় একটা হাতে আসে না। জয়শ্রী কোম্পানীর টাকাটা একেবারেই এল না। তাগিদ দেওয়ার জন্যে মৃগাঙ্ক গিয়ে হাজির হল কোম্পানীর অফিসে। ছবি তোলার আগে, ছবি তোলার সময় অফিস ঘরে বসবার জায়গা থাকত না। কিন্তু ছবি ফ্লপ করবার পর ঘরে জায়গা আছে বসবার লোক নেই। দেয়ালে লটকানো আগেকার ছবিখানাব খানকয়েক পোস্টার। মৃগাঙ্করই হাতের আঁকা। দক্ষিণ দিকে মুখ করে একটি ছোকরা একখানা শূন্য টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে। মৃগাঙ্ক বলল, 'সুধীরবাবু, ডিরেক্টর কখন আসবেন?'

সুধীর বলল, 'বলে গেছেন তো তিনটায়। কখন আসবেন তিনিই জানেন।'

'আপনাকে তিনটায় বলেছিলেন নাকি, আমাকে বলেছিলেন বারটায়।'

সুধীর বলল,'তিনি ওই রকমই বলেন। বসুন সুস্থ হয়ে।' আরো কদিন এসে ফিরে গেছে। আজ আর ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বসে রইল।

মাঝখানে আরো কয়েকজন পাওনাদার এল গেল। হঠাৎ সুধীরের আমন্ত্রণ শুনে চমকে উঠল মৃগাঙ্ক। এতক্ষণ সুধীরের ঠোঁট ছিল শুকনো, এবার সে ঠোঁট হাসিতে ভিজে উঠল, 'আসুন অদিতি দেবী।'

অদিতি ঘরে ঢুকল, শুধু শুনে নয় দেখেও চমকাল মৃগাঙ্ক। অদিতি ঘরে ঢুকেছে। পরনে অল্প দামের একখানা তাঁতের শাড়ি। হাতে দু'গাছি চুড়ি ছাড়া গায়ে আর কোন গয়না নেই। পায়ে পুরোন স্যান্ডাল। অদিতিও একটু চমকে উঠল। মৃগাঙ্কর গায়ে ছেঁড়া পাঞ্জাবী। মুখে ছ'দিনের দাড়ি। চুলে তেল নেই। তবু যেন কাউকে চেনে না তেমনি ভঙ্গিতে অদিতি গিয়ে আর একটা চেয়ারে বসল। কিন্তু আশ্চর্য দূরে বসতে গিয়ে একেবারে সামনা-সামনি মুখোমুখি বসেছে। তবু দুজনে কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

সুধীর বলল, 'আপনাদের বুঝি আলাপ পরিচয় নেই? ইনি আমাদের পোস্টার আর্টিস্ট মৃগাঙ্ক চাটুয্যে আর ইনি অদিতি দেবী, হিরোইনের দুখানা গান প্লে ব্যাক করেছেন।'

পাছে সুধীর মনে করে তারা শিষ্টাচার জানে না তাই দুজনে পরস্পরের দিকে অল্প একটু হাত তুলে নমস্কারও জানাল, তারপর ফের রইল মুখ ফিরিয়ে।

সুধীর ভদ্রতা করে দু'কাপ চা আনাল। কিন্তু ডিরেক্টরের আর আসবার নাম নেই। তিনটে থেকে পাঁচটা বাজল। অদিতিও ছটফট করে, মৃগাঙ্কও ছটফট করে। কিন্তু কেউ ওঠে না। দুজনেই অনেক দিন এসে ঘুরে গেছে। দুজনেরই আজ বিশেষ টাকার দরকার, শেষ পর্যন্ত ছটার সময় সুধীরও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আজ আর বোধ হয় উনি এলেন না। আপনাদের কি খুবই দরকার।'

অদিতি বলল, 'দরকার না থাকলে কি সারা দিন চুপ করে বসে রইলাম ?'

সুধীর বলল, 'তাহলে এক কাজ করুন। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে আমাদের যে আর একটা অফিস আছে সেখানে যান। সেখানে বোধহয় পাবেন।' ঘরের তালাচাবি বন্ধ করল সুধীর।

ওরা এসে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দুজনেই ইতস্তত করতে লাগল যাবে কি যাবে না। গিয়ে হয়ত লাভ হবে না। কিন্তু না গেলে যদি লোকসান হয়।

মৃগাঙ্কই কথা বলল প্রথম, বলল, 'কি করবে ?'

অদিতি বলল, 'তুমি কি করবে ?'

তারপর দুজনেই ঠিক করল একবার চানস নেওয়াই ভালো। তারপর একটা যাত্রীবহুল বাসে ওরা উঠে পড়ল। কারোরই বসবার জায়গা নেই। দাঁড়াতে হল গা ঘেঁষাঘেষি করে। বাসের ঝাঁকুনিতে বার বার ছোঁয়াছুঁয়ি হতে লাগল। একজন গিয়ে পড়তে লাগল আর একজনের গায়ে—মৃগাঙ্কই দুখানা টিকেট করল। অদিতি আপত্তি করতে যাচ্ছিল মৃগাঙ্ক বলল, 'ফেরার সময় তুমি নিয়ো দুখানা, তাহলেই হবে।'

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের অফিসে গিয়েও ঘণ্টা দেড়েক বসে রইল ওরা দুজনে। অনেক লোকজন এল গেল। ডিরেক্টরের কোন দেখা নেই। রাত যখন প্রায় আটটা ওরা ফিরতি ট্রামে উঠল। মৃগাঙ্ক অন্য জায়গায় বসতে যাচ্ছিল অদিতি কি ভেবে যেন বলল, 'এখানেই বোসো।'

মৃগাঙ্ক পাশে গিয়ে বসল। এবার অদিতিই দু'খানা টিকেট নিল। দু'চারটে কথা যা হল তার সবই ডিরেক্টর আর সিনেমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে। মৌলালীতে এসে দুজনে নেমে পড়ল, দুজনে দুই রাস্তা নিল।

কিন্তু জয়শ্রী অফিসের রাস্তায় প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে প্রথম দিনের আড়ষ্টতা আর রইল না। চতুর্থ দিনে সুধীর আর চা খাওয়াল না ওদের। ওরা নিজেরাই কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খেল। শুধু তৃষ্ণা নয় ক্ষিদেও পেয়েছিল। কিন্তু পকেটে পয়সার প্রাচুর্য নেই। একজন দিল দুখানা টোস্টের দাম আর একজন দিল দু' কাপ চায়ের।

টাকাটা কিছুতেই আদায় হল না। শেষ পর্যন্ত আর্টিস্টরা সবাই মিলে কেস করল কোম্পানীর নামে। মৃগাঙ্ক আর অদিতিও উকিলের ফিস দিল, সাক্ষ্য দিল। ডিক্রী পেল কিন্তু নীলাম করবার মত কোন জিনিস পেল না।

শূন্য অফিস থেকে শূন্য হাতে বেরিয়ে আসছে, রাস্তার যে মোড়টা থেকে দুজনে দুদিকে যাবে সেখানে এসে অদিতি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে এখন, বাসায় ?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ, তুমি ?'

অদিতি একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমার একটা জলসায় আজ নিমন্ত্রণ আছে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'খুব বড় রকমের কিছু নাকি ?'

অদিতি বলল, 'না বড় কিছু নয়। সাধারণ একটা চ্যারিটি শো। টাকাটা আসাম আর্থকোয়েক রিলিফ ফান্ডে যাবে। যা অবস্থা তাতে আর্থকোয়েকে আমিও ফেটে চৌচির হয়ে গেছি। আমারই এখন চ্যারিটির দরকার। কিন্তু উদ্যোগীরা যখন মনে করে ডেকেছে না যাওয়াটা ভালো দেখায় না। কি বল ?'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তা ঠিক। কোথায় হবে ফাংশন।'

অদিতি বলল, 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'কখন !'

অদিতি বলল, 'সাতটায় তো আরম্ভ করার কথা। কেন, তুমি যাবে নাকি ?'
শেষ কথাটা বলে অদিতি একটু অপ্রস্তুত হল।
মৃগাঙ্ক বলল, 'না, আমি গানের কি বুঝি। তা ছাড়া আমার কাজ আছে।'
বলে মৃগাঙ্ক বাসায় ফিরে গেল।
মেয়েকে দেখবার জন্যে একটি বুড়ি আয়াকে রেখে নিয়েছে মৃগাঙ্ক। এডিথের সঙ্গে বুড়ির জানাশোনা ছিল। মাসী বোনঝি সম্পর্ক পাতিয়েছিল দুজনে।
মৃগাঙ্ক বাসায় ফিরে দেখল, মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুড়ি আয়া বলল, 'তোমার খাবার কি এখন দেব ?'
মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রাখ। আমি পরে খাব।'
বুড়ি পাশের ঘরে চলে গেল। নিজের ঘরে তক্তাপোশের ওপর ছবি আঁকতে বসল মৃগাঙ্ক। কিন্তু কাজে কিছুতেই মন বসল না। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল মৃগাঙ্ক। পকেট হাতড়ে দেখল গোটা তিনেক টাকা আছে। বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কোথায় যায়, কোথায় যায়। হঠাৎ দেখে একেবারে ইনস্টিটিউটের সামনে এসে পড়েছে। ভিতর থেকে গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বাইরে উদ্যোক্তা তরুণদের ভিড়। মৃগাঙ্ক একটু ইতস্তত করে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'টিকেট আর আছে ?'
টিকেট ছিল। তিনটে টাকা বিক্রেতার হাতে তুলে দিয়ে মৃগাঙ্ক ভিতরে ঢুকল। গিয়ে বসল পিছনের সারিতে।
একজন গায়কের গানের মাঝামাঝি গিয়ে পড়েছিল মৃগাঙ্ক। তাঁর গান শেষ হলে ঘোষণা শোনা গেল, 'এবার অদিতি দেবী একখানা ইমনকল্যাণ আলাপ করবেন।'
অদিতি মাইকের সামনে এসে আরম্ভ করল, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে।'
জলসায় অদিতি আজকাল আর বাংলা গান গায় না। রবীন্দ্রসঙ্গীত তো একেবারেই না, কিন্তু সেদিন গাইল। এ শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতই নয়। অদিতির মুখে মৃগাঙ্কর শোনা প্রথম সঙ্গীত। অবনীবাবুর ড্রয়িংরুমে পিয়ানো বাজিয়ে গেয়েছিল অদিতি। আজ সেই গানের শুধু স্থান কালই বদলায়নি। গলাও বদলে গেছে, এই ক' বছরে অনেক নৈপুণ্য অর্জন করেছে অদিতি। অনুশীলন আর অধ্যবসায়ের ছাপ আছে ওর গলায়। এত শিক্ষা ও কোত্থেকে পেল, কিসের বিনিময়ে পেল সেই মুহূর্তে সে সব কথার কিছুই মনে পড়ল না মৃগাঙ্কর। শুধু মুগ্ধ হয়ে রইল। আর গান শুনতে শুনতে বহু কাল বাদে ও ছবি আঁকার তাগিদ অনুভব করল ভিতরে। তেলের বিজ্ঞাপন নয়, সিনেমার পোস্টার নয়, অন্য কিছু, অন্য ছবি যা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব, অথচ যার সবটুকুই অন্যের জন্যে।
গান শেষ হতেই উঠে দাঁড়াল মৃগাঙ্ক। হাততালির শব্দে হলঘর ভরে উঠেছে। একপাশ দিয়ে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে এল। যারা টিকেট বিক্রি করেছিল তাদের একজন বলল, 'সে কি দাদা এরই মধ্যে চললেন। অদিতি দেবীর আরো একখানা গান আছে। উনি জীবনে এত ভালো করে,এত প্রাণ দিয়ে আর গাননি। শুনে যান আর একখানা।'
মৃগাঙ্ক বলল, 'যেতে যেতে শুনব।'
ইজেলের সামনে বসে বহুদিন বাদে একটি রাত ভোর করল মৃগাঙ্ক।
তারপর ভোর ভোর সময় বেরিয়ে পড়ল পথে।
কড়ানাড়ার শব্দে অদিতিই এসে দোর খুলে দিল। খানিকক্ষণ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল মৃগাঙ্কর দিকে। আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ! তোমার কি অসুখ করেছে।'
মৃগাঙ্কর চোখের ভিতরটা লাল, চোখের কণ্ঠায় কালি। চুলগুলি খাড়া খাড়া।
মৃগাঙ্ক বলল, 'না অদিতি আমি আজ পরম সুখে আছি। পুরো এক বছর বাদে আমি কাল রাত্রে সত্যিই একখানা ছবি শেষ করেছি। তোমার গান শোনার পরই গিয়ে বসেছি, আর এই উঠে এলাম।'
অদিতি লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমার গান শুনতে তুমি গিয়েছিলে নাকি ? সত্যি শুনেছিলে ?'
মৃগাঙ্ক বলল, 'হ্যাঁ। না শুনলে আঁকলাম কি করে।'

অদিতি বলল, 'এসো ভিতরে।'

তক্তাপোশের একধারে বছর আড়াইর একটি সুন্দর শিশু তখনো ঘুমুচ্ছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'ওই বুঝি ছেলে ?'

অদিতি চোখ নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

মৃগাঙ্ক একটু কাল চুপ করে রইল। কাছে গেল না। দূর থেকেই আর একবার 'তাকাল ঘুমন্ত শিশুর দিকে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমি এবার যাই।'

অদিতি বলল, 'না বস আর একটু।'

হাতমুখ ধুয়ে চা টা খেয়ে তবে মৃগাঙ্ক ছাড়া পেল।

আসার সময় মৃগাঙ্ক বলল, 'আমি তোমার গান শুনলুম, তুমি আমার নতুন ছবি দেখতে যাবে না ?'

অদিতি বলল, 'তুমি যদি বল তো যাব বই কি। কবে যাব বল।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আজও সারাদিন, সারারাত ওর পিছনে খাটতে হবে। কালকের দুপুরটাও হাতে রাখি। কাল বিকেলে এস, ঠিক পাঁচটায়।'

অদিতি বলল, 'আচ্ছা।'

মৃগাঙ্ক গিয়ে বসল রিটাচ করতে। অদ্ভুত আনন্দ লাগছে কাজে। দিন গেল, রাত গেল, পরদিন দুপুর কাটল ; বিকেল ঠিক পাঁচটায় শেষ হল ছবি। এবার সে আসবে দেখতে।

কিন্তু তার আগে ঘরে ঢুকল বুড়ি আয়া, বলল, 'বাড়িওয়ালা ভাড়ার জন্যে তাগিদ দিচ্ছিল। আজ ফেব্রুয়ারীর সতেরই। জানুয়ারীর ভাড়াটা এখনো দেওয়া হয়নি।'

কিন্তু শেষ কথাটা কানে তুলল না মৃগাঙ্ক, বলল, 'আজ কতই ফেব্রুয়ারী বললে ?'

বুড়ি আয়া বলল, 'কেন সতেরই।'

সতেরই ফেব্রুয়ারী এডিথের মৃত্যুর তারিখ। মৃগাঙ্কর মনে পড়ল। চোখে পড়ল দেয়ালের ক্যালেন্ডারে তারিখটার নিচে নীল তুলির একটি দাগ। পাছে ভুলে যায় তাই কদিন আগে তারিখটিকে সে চিহ্নিত করে রেখেছে। অসুখের মধ্যে শেষের দিকে এডিথ প্রায়ই বলত, 'আর কিছু না, বছরে একটি করে ফুল আমাকে দিয়ো। আমি ফুল বড় ভালোবাসি।'

ফুল ভালোবাসে। কিন্তু জীবনে ফুল কিনবার পয়সা তার জোটেনি। কোনদিন তার শয্যা ফুলশয্যা হয়নি। আজ একটি ফুল কি তাকে না দিলে চলে !

জামাটা গায়ে দিয়ে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে পড়ল। আয়া বলল, 'সে কি, কোথায় যাচ্ছ তুমি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'বাইরে দরকার আছে আমার।'

আয়া বলল, 'কে যেন আসবে বলেছিলে যে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'তার আসবার সময় চলে গেছে। এখন সাড়ে পাঁচটা।'

লোয়ার সার্কুলারের মোড়ে দেখা হল অদিতির সঙ্গে। ট্রাম থেকে নেমে সে এদিকেই আসছে।

মৃগাঙ্ককে দেখে বলল, 'একি তুমি বেরুচ্ছ। আমার অবশ্য একটু দেরি হয়ে গেছে। ট্রামের ট্রলি কেটে গিয়েছিল। চল তোমার ছবি দেখি গিয়ে।'

একটু আগ্রহের সুর ফুটে উঠল অদিতির গলায়।

মৃগাঙ্ক বলল, 'আজ আর তা হয় না অদিতি। আজ একটু অন্য কাজ আছে।'

অদিতি বলল, 'কি কাজ।'

মৃগাঙ্ক একটু ইতস্তত করে বলল,'তোমাকে খুলেই বলি। এডিথের আজ মৃত্যুর তারিখ। আমি সেমিটারিতে যাচ্ছি। সময় বেশি নেই। ছটায় ওরা সব বন্ধ ক'রে দেবে।'

একটা তীর যেন বিঁধল অদিতির বুকে। মৃত্যুর কাছে হার হল প্রাণের। ম্লান মুখে বলল, 'আচ্ছা যাও।'

কিন্তু মৃগাঙ্ক দু'পা এগুতেই অদিতি ফের এল পিছনে পিছনে। বলল, 'চল,আমিওযাই। বাবার গ্রেভে ফুল দিয়ে আসি। তিনিও তো ওখানেই রয়েছেন।'

কবরখানার সামনে কয়েকটি মালী ডালিভরা ফুল নিয়ে বসে রয়েছে। ওরা দুজনেই নিজের নিজের আলাদা পয়সা দিয়ে ফুল কিনল। কিন্তু ফুলের জাত আলাদা নয়। একই মালীর কাছ থেকে দুজনে কিনল দু'ডজন রজনীগন্ধা। তারপর, ঢুকল সেমিটারির মধ্যে।

বাইরে থেকে যারা এসেছিলে তারা ফিরে যাচ্ছে। সেমিটারি বন্ধ হওয়ার আর মাত্র মিনিট দশেক সময় আছে। দ্রুতপায়ে হেঁটে চলল দুজনে।

দুদিকে নতুন পুরোন ছোট বড় মার্বেল ফলকের সারি। তাতে খোদিত আছে মৃতের নাম ধাম। আর জীবিতের শোকোচ্ছ্বাস। কোনটি গদ্যে, কোনটি পদ্যে, কোনটি ইংরেজীতে, কোনটি বাংলায়। কোন কোন মার্বেল ফলকের ওপর ফুলের সাজি উপুড় করে ঢেলে দেওয়া রয়েছে। একটি কবরের সামনে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসল অদিতি। অবনীবাবুর কবরের বড় একটি মার্বেল পাথরের বেদী। তাতে তাঁর নাম আর জন্ম মৃত্যুর তারিখ খোদাই করা রয়েছে। আর অনেকখানি জুড়ে আছে শোকজ্ঞাপক একটি ইংরেজী কবিতা। অদিতির বড়দার নিজের রচনা। অদিতি নিজের রজনীগন্ধার তোড়াটি নিবেদন করল বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল।

মৃগাঙ্ক এগিয়ে যাচ্ছিল—অদিতির ডাকে পিছন ফিরে তাকাল।

অদিতি বলল, 'চল, এডিথের গ্রেভটা আমিও দেখে আসি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'চল।'

'পুব-দক্ষিণ কোণে অল্প একটু জায়গা জুটেছে এডিথের জন্যে। চারপাশ দিয়ে শ্যামল ঘাস গজিয়েছে। মাঝখানে ছোট একটুকরো সাদা পাথর। তার ওপর লেখা শুধু একটি কথা, 'এডিথ।'

পাশাপাশি দুজনে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। মৃগাঙ্ক নিঃশব্দে সেই পাথর খণ্ডটির ওপর তার ফুলগুলি বিছিয়ে দিল।

ধারে কাছে আর কেউ নেই। শুধু তারা দুজনে। আর সামনে এডিথের কবর।

দেখে দেখে হঠাৎ অদিতিব মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'ও অনেক ভাগ্যবতী। ওর বদলে আমি যদি এখানে থাকতাম। এমনি করে আমি যদি ফুল পেতাম কারো হাতেব।' এডিথেব কবরের ওপর দু ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল অদিতির।

মৃগাঙ্ক ওর দিকে ফিরে তাকাল। অদিতির জীবনের একটি দুর্বল মুহূর্ত। কিন্তু মৃগাঙ্কর মনে হল কালসমুদ্রে একটি বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল বুদ্বুদ।

মৃগাঙ্ক আস্তে আস্তে কবর থেকে একটি ফুল তুলে নিল। নিয়ে গুঁজে দিল অদিতির খোঁপায়।

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল অদিতির। মৃগাঙ্কর দিকে তাকিয়ে জলভরা চোখে বলল, 'এ তুমি কি করলে। আজকের দিনে এ তুমি কি করলে। এ কার ফুল কাকে দিলে তুমি।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'আমি ঠিকই দিয়েছি অদিতি। আমি তার মধ্যে দিয়ে তোমাকে দিয়েছি, তোমার মধ্যে দিয়ে তাকে। চল, ঘরে চল।'

কাহিনী শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন সুব্রতদা। হাত বাড়ালেন—বোধ হয় সিগারেটের জন্যে। সিগারেট আর ছিল না। আমি খালি হাতটাই তাঁব দিকে এগিয়ে দিলাম।

ভাদ্র ১৩৫৯

এই প্রথম

ক্লাসের একঘর মেয়ের সামনে বাঙলার টিচার মণিকা দত্ত একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'বাঃ চমৎকার হয়েছে। বসন্ত ঋতু সম্বন্ধে এমন সুন্দর প্রবন্ধ ফার্স্ট ক্লাসের কোন মেয়েও লিখতে পারেনি। আমি তাদেরও এই বসন্তের উপরেই লিখতে বলেছিলাম। কিন্তু মঞ্জুর মত এত ভালো লেখা, এমন নিখুঁত বর্ণনা কারোরই হয়নি। তোমাদের সকলের উচিত, ওর এই প্রবন্ধটা একবার করে পড়া। সবটাই তো তোমার লেখা মঞ্জু ? না কি কারো সাহায্য নিয়েছ !' মিসেস দত্ত একটু

হাসলেন।

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না দিদিমণি, সব আমার নিজের। কারো কাছ থেকে কোন হেল্প নিইনি। কোটেশনগুলি নিয়েছি শুধু রবীন্দ্রনাথ থেকে।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'তাঁর কাছ থেকে সবাইকেই নিতে হয়। তোমার কোটেশনগুলিও খুব এ্যাপ্ট হয়েছে। ভারি চমৎকার হয়েছে প্রবন্ধটি। বোসো।'

সহাধ্যায়িনীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে মঞ্জু বসে পড়ল। আত্মপ্রসাদে ওর কোমল সুন্দর মুখখানা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই প্রশংসা আজ নতুন নয়। প্রায় রোজ প্রত্যেক পিরিয়ডে ইংরেজি, বাঙলা, অঙ্ক, সংস্কৃত সব বিষয়ের টিচারদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু প্রশংসা পায় মঞ্জু। কিন্তু কোনদিন একঘেয়ে লাগে না। যত শোনে, ততই নতুন মনে হয়।

চৌদ্দ উৎরে সবে পনেরয় পা দিয়েছে মঞ্জু। এখনো ষোড়শী হয়নি, কিন্তু ভুবনেশ্বরী হয়েছে। নিজের ছোট জগতে মঞ্জুর একান্ত আধিপত্য। বীণাপাণি বিদ্যাপীঠের এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই মঞ্জু যে শুধু অদ্বিতীয়া তাই নয়, সারা স্কুলর মধ্যে ওর একটি বিশেষ স্থান আছে। টিচাররা সবাই ওকে স্নেহ করেন। হেডমিস্ট্রেস আশা করেন, মঞ্জু জেনারেল স্কলারশিপ পেয়ে স্কুলের গৌরব বাড়াবে। দেখা হলেই পড়াশুনো সম্বন্ধে তিনি ওকে খুব উৎসাহ দেন।

শুধু যে ক্লাসের আর টিচার্সরুমে মঞ্জুর গুণপণা নিয়ে আলোচনা হয়, তাই নয়,—ক্লাসের প্রতিষ্ঠা দিবস, পুরস্কার বিতরণের দিন, আরো সব ছোট ফাংশনে গান আর আবৃত্তির জন্য ডাক পড়ে মঞ্জুশ্রী রায়ের। সেখানেও হাততালি আর বাছা বাছা পুরস্কারগুলি তার জন্যে বাঁধা থাকে।

সাধারণত পড়াশুনোয় যারা ভালো হয়, দেখতে তারা হয় কালো কুশ্রী। কিন্তু মঞ্জু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ওর গায়ের রঙ গৌর, মুখের ডৌল আর দেহের গড়ন সুন্দর। স্কুলের উৎসব-অনুষ্ঠানে, ছোট ছোট নাটকের অভিনয়ে মঞ্জুশ্রীই অবিসংবাদী নায়িকা।

সবুজ মলাটের মোটা এক্সারসাইজ বইটা মঞ্জুর হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে মিসেস দত্ত বললেন, 'প্রবন্ধ তো হল, কিন্তু তোমাদের পত্রিকার খবর কি ? 'উন্মেষ'-এর বসন্ত সংখ্যা কবে বেরোবে। ফাল্গুন গেছে, চৈত্রেরও আধাআধি হল, এর পর তো দারুণ গ্রীষ্ম। কলকাতায় বসন্ত আর ক'দিন।'

জীবনেও বসন্ত খুব বেশি দিনের নয়। মিসেস দত্ত তিরিশ পেরিয়ে গেছেন। বোধহয়, সে কথাটাও তাঁর মনে পড়ল।

মঞ্জুরা একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করে—নামটা মিসেস দত্তই ঠিক করে দিয়েছিলেন, 'উন্মেষ'। ঋতুতে ঋতুতে মঞ্জুদের 'উন্মেষ' বেরোয়, ঋতুতে ঋতুতে প্রচ্ছদপটের রঙ বদলায়। এ-পত্রিকারও সম্পাদিকা মঞ্জুশ্রী রায়। লেখাগুলি মণিকাদিই মোটামুটি দেখে শুনে দেন। এসব কাজে তাঁর ভারি উৎসাহ।

মঞ্জু বলল, 'লেখাগুলি সবই খাতায় তোলা হয়ে গেছে। শুধু মলাটের ছবি আঁকাই বাকি। এবারও আর্টিস্ট সুরজিৎ সেন ছবি এঁকে দেবেন। খাতাটা তাঁর বাড়িতেই পড়ে আছে।'

মিসেস দত্ত বললেন, 'তাগিদ দিয়ে বের করে আন। আর্টিস্টদের মত কুঁড়ে মানুষ আর দুটি নেই। তাঁরা নিজেরা কাজ করেন না, কাজ তাঁদের দিয়ে করিয়ে নিতে হয়।'

মঞ্জু বলল, 'আমি আজই করিয়ে আনব।'

স্কুল ছুটি হল সাড়ে চারটেয়। এর মধ্যে অনেকবারই উন্মেষ আর সুরজিৎ সেনের কথা মঞ্জুর মনে পড়েছে। সত্যি অনেক দিন ধরে পড়ে আছে খাতাটা ওঁর কাছে। দিই দিই করে আর দিচ্ছেন না। ভারি অলস, ভারি কুঁড়ে মানুষ সুরজিৎদা। নাছোড়বান্দা হয়ে ওঁর পিছনে লেগে না থাকলে ওঁকে দিয়ে ছবি তো ভালো, একটা লাইন পর্যন্ত টানানো যায় না। হেমন্ত আর শীত সংখ্যার বেলাতেও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে মঞ্জুশ্রীর। আর্টিস্টের কুঁড়েমি ভাঙতে কি কম হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে মঞ্জুর ?

রত্না দাস পত্রিকার সহ-সম্পাদিকা। বয়সে মঞ্জুর চেয়ে বছর খানেকের বড়। কিন্তু পদগৌরবে ছোট বলে মঞ্জু তার ওপর খুবই প্রভুত্ব করে। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে মঞ্জু বলল, 'চল রত্নাদি, খাতাটা নিয়ে আসি সুরজিৎদার কাছ থেকে।'

রত্না বলল, 'না ভাই, আমার কাজ আছে। তিন দিন ধরে মা গেছেন শিশুমঙ্গলে। ফিরে গিয়ে বিকেলের সব কাজ সেরে রান্না করতে হবে। স্কুলে যে আসতে পারছি এই ঢের।'

মঞ্জু ধমকের সুরে বলল, 'না, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। আজ শিশুমঙ্গল, কাল তমুকমঙ্গল। একটা-না-একটা অজুহাত লেগেই আছে। এমন করলে ক্লাবই বা চলবে কিভাবে, কাগজই বা বেরোবে কি করে!'

রত্না বলল, 'কি করব ভাই, আজকাল আমাকেই সব দেখতে হয়। পড়াশুনোর পর্যন্ত সময় পাইনে। তুমি বরং অমিয়া কি সুজাতা ওদের কাউকে নিয়ে যাও।'

মঞ্জুশ্রী বলল, 'তোমাদের কাউকেই লাগবে না, আমি একাই যেতে পারব।'

বান্ধবীদের বিদায় দিয়ে হাজরা রোডের মোড়ে এসে মঞ্জু মুহূর্তকাল ভাবল। এখনই সুরজিৎদার ওখানে যাবে না বাড়িতে বইগুলি রেখে তারপর যাবে। হাতে একরাশ বই। এ্যালজেবরা, ব্যাকরণ কৌমুদী আর প্রবেশিকা-ভূগোলে বোঝা বেশ ভারি হয়েছে। এগুলি বাড়িতে রেখে আসাই ভালো। বইয়ের রাশ হাতে দেখলে সুরজিৎদা ভারি ঠাট্টা করেন, 'এই যে মূর্তিমতী সরস্বতী ঠাকরুণ, আজ গোটা কলেজ স্ট্রীটটা বগলে নিয়ে চলেছ, কিন্তু দু' বছর বাদে যখন কলেজে ঢুকবে, দুই আঙুলের টিপে পাতলা একখানা খাতা ছাড়া কি কিছু আর তখন শোভা পাবে?'

এমন মজার মজার কথাও বলতে পারেন সুরজিৎদা। ভারি চমৎকার মানুষ, ভারি অদ্ভুত মানুষ।

সদানন্দ রোডের লাল রঙের ফ্ল্যাট বাড়িটার তেতলায় তিনখানা ঘর নিয়ে মঞ্জুরা থাকে। বাবা মা দাদা বউদি আব সে। দুই দিদির আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। তাই ছোট ঘরখানা মঞ্জুর ভাগেই পড়েছে। পুরো একখানা ঘবেরই সে মালিক। এ ঘরখানাব ওপর দাদার লোভ ছিল। এ ঘরে সে পড়বে, বন্ধুরা কেউ এলে তাদের এখানে বসিয়ে গল্প করবে। কিন্তু দাদার অবুঝ আবদার মা কি বাবা কেউ মানেননি। তাঁরা দুজনেই বলেছেন, 'না না না। মঞ্জুর একখানা আলাদা ঘরের দরকার বই কি। ও বড় হয়ে উঠছে না, তাছাড়া পড়াশুনো আছে না ওর?'

দাদা একটু আপত্তি করলে মা বলেছেন, 'ঘর তো তোমার পাওয়ার কথা নয়। সুমিতা আছে তাই ঘর একখানা তাকে দিয়েছি নইলে তোমার আবার ঘরের কি দরকার। কতক্ষণই বা বাড়িতে থাক। নেহাৎই কয়েক ঘণ্টা অফিসে থাকতে হয় তাই, নইলে চব্বিশ ঘণ্টাই বন্ধুদের বাড়ি আড্ডা দিতে পারলে তোমার ভালো হয়। তোমার আবার বাড়ি ঘরের কোন দরকার আছে নাকি অমল?'

দাদা হেসে বলেছে, 'দরকার থাকলেও কি আব পাব? মঞ্জু যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিনী সেখানে, কারোরই জয়ের আশা নেই।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়িগুলি ডিঙিয়ে মঞ্জু এসে নিজেদের পাঁচ নম্বব ফ্ল্যাটটার সামনে দাঁড়াল। তারপর কড়া নাড়ল জোরে জোরে।

বউদি সুমিতা এসে দোর খুলে দিল। একুশ-বাইশ বছরের তরুণী বধূ। ছোট ননদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ব্যাপার কি, কড়া দুটি কি ভেঙে ফেলবে নাকি?'

মঞ্জু বলল, 'নইলে কি তোমার ঘুম ভাঙবে? আর ঘুমিও না বউদি। যথেষ্ট মোটা হয়েছে। নাও এবার ধর তো বইগুলি।'

সুমিতা বলল, 'ইস আমার দায় পড়েছে। স্কুলে পড়বে তুমি, আর বইয়ের বোঝা বুঝি বয়ে বেড়াব আমি।'

বইয়ের বোঝা দু' বছর আগেও সুমিতা বয়েছে। যে বছর বি· এ· দিয়েছে, সেবারই বিয়ে দিয়েছেন বাবা। আর বোঝা বইতে হয় না।

মঞ্জু অবশ্য বইগুলি সত্যি সত্যিই বউদির হাতে পৌঁছে দিল না। নিচের মোটা খাতাটা কাঁধে ঠেকিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

মেয়ের সাড়া পেয়ে ঘর থেকে সরোজিনী বেরিয়ে এলেন। বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে। পরনে চওড়া লালপেড়ে মিহি শাড়ি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। ঠোঁট দুটি পান আর দোক্তার রঙে রঞ্জিত। গায়ের রঙ এঁরও উজ্জ্বল। স্থূলাঙ্গী হলেও এখনো সুন্দরী বলা যায়। দেখলেই বোঝা যায়

বেশ একটি সুখী স্বচ্ছল সংসারের গৃহিনী। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাঁপাচ্ছিস যে। ছুটতে ছুটতে এলি বুঝি, রোদে শুকিয়ে মুখের কি ছিরি হয়েছে দেখ।'

মঞ্জু হেসে বলল, 'মোটেই শুকোয়নি মা। আর আজ তেমন রোদ কোথায়, কেমন মেঘলা মেঘলা দিন দেখছ না।'

সরোজিনী বললেন, 'দেখেছি বাপু দেখেছি। এবার বইগুলি আমার হাতে দাও। আমি রেখে দিচ্ছি। নাত্তির চেয়ে পুতরা ভারি। একরত্তি মেয়ে, বই চেপেছে একরাশ। কি যে হয়েছে আজকালকার স্কুলগুলি।'

মায়ের পাশ কাটিয়ে নিজের ছোট ঘরে এবার ঢুকে পড়ল মঞ্জু। নিজের পছন্দ মত এ ঘরখানাকে সে সাজিয়েছে। জানলায় দরজায় নীল পর্দা। এক পাশে ছোট খাট। খাটের ওপর সাদা ধবধবে বিছানা। গেরুয়া রঙের শান্তিনিকেতনী বেড-কভারে আবৃত। মাথার কাছে ছোট বইয়ের সেলফ। ওপরের তাকে প্রাইজ পাওয়া গল্প আর কবিতার বই। নিচের তাকগুলি স্কুলের বই আর খাতায় বোঝাই। ঘরের কোণায় ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি সেতার। সপ্তাহে দু দিন গানের স্কুলে যায় মঞ্জু। ডান দিকে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে হলদে রঙের গুটিকয়েক সুন্দর সুন্দর ফাইল আর বাঁধানো খাতা। উন্মেষের সম্পাদিকার দপ্তর। মনোনীত আর অমনোনীত লেখা সবই সযত্নে সাজিয়ে নীল ফিতেয় বেঁধে রেখেছে মঞ্জু। অমনোনীত লেখার একটা ফাইল রাখা দস্তুর, তাই রাখতে হয়েছে। নইলে কিছুই মঞ্জুর অমনোনীত নয়, সমস্ত জীবনটাই পরম মনের মত।

বাবা কাজ করেন কাস্টমস-এ, দাদা ইনকাম ট্যাকসে। দুজনই অফিসার গ্রেডে। তাঁরাই মঞ্জুর এসব সখের প্রশ্রয় দিয়েছেন—ফাইল, রঙীন পেন্সিল আর কাগজচাপা কিনে দিয়ে খেলনা অফিস সাজিয়ে দিয়েছেন মঞ্জুর। দাদা বলেছেন, 'একটা কলিং বেল কিনে দিতে হবে তোকে। যখন টিপবি আমিই না হয় বেয়ারার বেশে এসে হাজির হব। আর একটা পদ বাড়বে আমার। উন্মেষ অফিসের হেড বেয়ারা।'

মঞ্জু হেসে বলেছে, 'আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে। সত্যিই কিন্তু উন্মেষ অফিস একদিন আমাদের হবে। ছাপা হয়ে বেরোবে কাগজ, ছাপার অক্ষরে বেরোবে আমাদের সকলের নাম।'

এ স্বপ্ন মঞ্জু প্রায় রোজই দেখে। কলেজে একবার ঢুকতে পারলেই উন্মেষকে সে ছেপে বার করবে। সে হবে তখন সত্যিকারের কাগজের সম্পাদিকা।

কিন্তু সুরজিৎদার বাড়িতে আজই যেতে হবে, এখনই যেতে হবে মঞ্জুকে। উন্মেষেব বসন্ত সংখ্যা কাল বার না করতে পারলে, মণিকাদির কাছে, মিতালী সঙ্ঘের সভ্যদের কাছে তার মান থাকবে না। উন্মেষকে কেন্দ্র করে ছোট একটি ক্লাবও গড়ে উঠেছে মঞ্জুর—ক্লাসের বন্ধুরা যারা কাছাকাছি থাকে তারাই এ ক্লাবের সদস্য। সপ্তাহে একবার করে অধিবেশন বসে। গান হয়, আবৃত্তি হয়। তারপরে হয় চা আর জলযোগ। দু চার আনা করে চাঁদা ক্লাবের সভ্যরা দেয়; কিন্তু তাতে খরচ কুলোয় না। সেজন্যে ভাবনা নেই মঞ্জুর। স্থায়ী পৃষ্ঠপোষক আছেন বাবা আর দাদা—আছেন মা আর বউদি। বাড়ির সবচেয়ে ছোট মেয়ে মঞ্জু। সে আজকাল আর পুতুল খেলে না, ক্লাব আব পত্রিকা নিয়ে খেলে। সে খেলায় অভিভাবকদেরও আনন্দ।

বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে স্কুলের শাড়ি বদলে পাটভেঙে আর একখানা আকাশনীল শাড়ি পড়ল মঞ্জু। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিল আর একবার। আলগোছে পাউডারের পাফটা মুখে বুলিয়ে নিল।

সরোজিনী এসে ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, বিস্মিত হয়ে বললেন।

'ওকি এখনই আবার কোথায় যাচ্ছিস মঞ্জু।'

'যাচ্ছি না, এক্ষুণি চলে আসছি মা।'

সরোজিনী ধমক দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, কি তোরা হয়েছিস বল তো। স্কুল থেকে এই তো এলি। এক্ষুণি আবার হুট করে বেরোচ্ছিস। আচ্ছা তোর কি ক্ষিদে তেষ্টাও পায় না? এমন করলে শরীর টিকবে?'

মঞ্জু বলল, 'আমি একটু ক্লাবের কাজে বেরোচ্ছি মা। সুরজিৎদার ওখান থেকে ম্যাগাজিনটা

আনতে যাচ্ছি। যাব আর চলে আসব। এসে খাব, এসে তোমার সব কথা শুনব। লক্ষ্মী মা।'

সরোজিনী শাসনের সুরে বললেন, 'থাক থাক আর আহ্লাদে দরকার নেই। আমার কথা না শুনলে ক্লাব-ট্যাব সব আমি তুলে দেব বলে রাখছি। দয়া করে অন্তত এক কাপ দুধ খেয়ে যাও কথা শোন আমার।'

পরম অনিচ্ছায় বড় এক কাপ দুধ আর দুটি সন্দেশ খেতেই হোল মঞ্জুকে। তারপর রুমালে মুখ মুছে আর কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে গেল নিচে।

সুরজিৎদা কাছেই থাকেন, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে। জায়গাটা অবশ্য ভালো নয়, বড় ঘিঞ্জি নোংরা গলি। বাড়িটাও খারাপ। পুরনো, নোনাধরা। একতলায় যে ছোট ছোট দু খানি ঘর নিয়ে সুরজিৎদারা থাকেন সে ঘর দুখানাও ভালো নয়। ভারি স্যাঁতসেঁতে কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। এই নিয়ে দাদার কাছে অভিযোগও করেছিল মঞ্জু, 'আচ্ছা দাদা, তোমার বন্ধু অমন কেন। একটু ভালো বাড়িতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে পারেন না।'

অমলেন্দু হেসে বলেছিল, 'পারে বইকি।'

মঞ্জু বলেছিল, 'তবে থাকেন না কেন ?'

অমলেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'ইচ্ছা করেই থাকে না। ছবির মত বাড়িতে যারা থাকে, তাদের দিয়ে ছবি আঁকা হয় না।'

মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন হয় না ?'

অমলেন্দু বলেছিল, 'না, এত যদি কেন কেন করিস, আমি কেন, আমার ঠাকুরদাও সব জবাব দিতে পারবে না। আগে বড় হয়ে ওঠ, তারপর সব 'কেন'র জবাব একটা একটা করে নিজেই খুঁজে নিতে পারবি।'

ঢের বড় হয়েছে মঞ্জু। বুঝতে তার কিছু বাকি নেই। দাদা গোপন করলে কি হবে, সে টের পেয়েছে সুরজিৎদারা গরীব, খুবই গরীব। প্রথম প্রথম এই নিয়ে একটু মন খারাপ হয়েছিল, এখন আর হয় না। এখন বরং মনে হয়, ওই বাড়ি, ওই ঘর, ওই ছেঁড়া পাঞ্জাবি আর ময়লা পায়জামা ছাড়া যেন সুরজিৎদাকে মানায় না। সুরজিৎদা যদি ভালো বাড়িতে, ভালো সাজপোশাকে থাকতেন, তাহলে তিনি আর্টিস্ট না হয়ে দাদার মত ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হতেন। তা যে হননি, ভালোই হয়েছে। তাহলে মঞ্জুর ম্যাগাজিনের মলাট এঁকে দিত কে ?

মাস ছয়েক আগে দাদাই একদিন সুরজিৎদার বাসায় সঙ্গে করে নিয়ে আলাপ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এঁকে চিনতে পারছ তো সুরজিৎ ? উন্মেষ পত্রিকার সম্পাদিকা। এঁর কাগজকে সচিত্র করবার ভার তোমার ওপর।'

সুরজিৎদা মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বেশ তো।'

ঘর-বাড়ি যেমন সুন্দর নয়, সুরজিৎদাকেও তেমনি সুপুরুষ বলা চলে না। বয়সে দাদার চেয়েও বড়। বত্রিশ তেত্রিশ অন্তত হবে। শ্যামবর্ণ, রোগা ছিপছিপে চেহারা। প্রথমে একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল মনটা। কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে সয়ে গেছে। আর্টিস্টকে ওইরকম অসুন্দরই হতে হয়। সে যদি রূপবান হতো, তাহলে তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দিনরাত নিজের মুখ দেখলেই চলত। তাহলে তো সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকবার কথা তার মনেই হতো না।

এসব যুক্তিও দাদার মুখেই শুনেছে মঞ্জু। দাদা বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার বন্ধু সুরজিৎদা অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁকে। সে ছবি মঞ্জু বুঝতে পারে না। কিন্তু বুঝতে না পারার মধ্যেই তো মজা ! অঙ্কের প্রশ্ন যত শক্ত হয় ততই ভালো, ততই মঞ্জুর হয় আনন্দ। সহজ প্রশ্ন যারা সাধারণ মেয়ে, যারা অঙ্কে কাঁচা তাদের জন্যে। ছবির বেলায়ও সেই কথা।

সেই থেকে সুরজিৎদার সঙ্গে মঞ্জুর ভাব। দাদার সঙ্গে তার এই বন্ধুর দেখা সাক্ষাৎ কদাচিৎ হয়। কিন্তু মঞ্জু যখনই ফুরসৎ পায় সুরজিৎদার বাসায় গিয়ে ঢোকে। এ যেন এক আলাদা দেশে বেড়িয়ে আসার আনন্দ।

সুরজিৎদা একা থাকেন না। তাঁর স্ত্রী আছে আর দুটি ছেলেমেয়েও আছে। বউদি দেখতে সুন্দরী

নন। তেমন আলাপী কি মিশুকও নন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। সুধা বউদির সঙ্গে তেমন দেখা সাক্ষাৎই হয় না মঞ্জুর। তিনি আবার কি একটা অফিসে টাইপিস্টের কাজ করেন। যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, ততক্ষণও ঘর-সংসার, আর ছেলেমেয়েকে নাওয়ানো খাওয়ানো নিয়ে থাকেন। মঞ্জু বসে বসে সুরজিৎদার সঙ্গে গল্প করে। হাতের কাজ থাকলেও সে কাজ রেখে সুরজিৎদা যে তার মত মেয়ের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মত গল্প করতে বসেন, এতে ভারি খুশি হয় মঞ্জু। ওর আত্মসম্মান যেন অনেকখানি বেড়ে যায়।

পরশু বিকেলেও পার্কের কাছে সুরজিৎদার সঙ্গে মঞ্জুর দেখা হয়েছিল। দেখা হতেই তাগিদ দিয়ে বলেছিল, 'কই, আমার ছবির কি হলো ?'

সুরজিৎদা বলেছিলেন: 'হচ্ছে।'

মঞ্জু হেসে বলেছিল, 'হচ্ছে হচ্ছে তো কতদিন ধরে করছেন। আর কিন্তু দেরি করতে পারব না।'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'তাই নাকি ?'

মঞ্জু বলেছিল, 'তা ছাড়া কি ? আপনার জন্যে আমাদের কাগজ বেরোতে দেরি হয়ে যাচ্ছে যে। আর কোন কথা শুনব না আপনার, আমি কালই যাচ্ছি।'

সুরজিৎদা একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, 'না না কাল নয়, পরশু এসো।'

মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল, 'পরশু কখন ?'

'বিকেলে।'

'বিকেলে বেড়াতে বেরোবেন না তো !'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'আমি বিকেলে বেড়াই না, দুপুরে বেড়াই। যখন সবাই কাজ করে আমি তখন টোটো করি। তুমি যদি যাও অবশ্যই থাকব।'

মঞ্জু বলেছিল, 'আমি নিশ্চয়ই যাব। ছবি তৈরি থাকে যেন।'

সুরজিৎদা বলেছিলেন, 'থাকবে।'

পুরনো বিবর্ণ বাড়িটির সামনে এসে মঞ্জু কড়া নাড়ল। একটি আধ বুড়ো ঝি এসে দোর খুলে বলল, 'এই যে তুমি। কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই।' 'সুরজিৎদা বাসায় নেই, কালীর মা ? তুমি ঠিক দেখেছ তো ?'

কালীর মা একথায় চটে উঠে রুক্ষ গলায় বলল, 'দেখেছি বাপু দেখেছি। বুড়ো হয়েছি বলে তো আর অন্ধ হইনি। না দেখতে পেলে করে কম্মে খাচ্ছি কি করে।'

মঞ্জু মনে মনে হাসল, 'ঝি চাকরেরা একটু বেশি বকে। তাদের বাড়িতেও ঠিক এমনি।'

মঞ্জু বলল, 'তাতো ঠিকই। আচ্ছা আমি একটু বাইরের ঘরটায় বসছি। ওঁরা আসুন ততক্ষণে। আমার বিশেষ দরকার।' কালীর মা বলল, 'দরকার হয় বসতে পারো। কিন্তু কে কখন ফিরবেন তা আমি বলতে পারব না বাপু। যা মেজাজ নিয়ে আজ বেরিয়েছেন দুজনে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর কিছু বলতে হবে না।'

মঞ্জু দোর ঠেলে সুরজিৎদার ঘরে এসে বসল। আজ যেন ঘরটা বড় বেশি অগোছালো। মেঝেয় বইপত্র ছড়ানো, তক্তাপোশের ওপর কয়েকটা অসমাপ্ত পেন্সিল স্কেচ। খানকয়েক কাগজ টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া। সুধা বউদি কি ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখতেও পারেন না। আর সুরজিৎদারও আক্কেল দেখ। বললেন থাকবেন, অথচ এখন আর পাত্তা নেই। কিন্তু মঞ্জুও ছাড়বার মেয়ে নয়। যত রাতই হোক, সুরজিৎদাকে ফিরতেই হবে বাসায়। মঞ্জু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। তারপর ছবি আঁকিয়ে নিয়ে তবে বিদায় হবে এখান থেকে। তার আগে একটি পাও নড়বে না। কালকের মধ্যে বসন্ত সংখ্যা বার করাই চাই মঞ্জুর।

ভিতরের উঠানে কালীর মা বাসন মাজছে আর সুধা বউদির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বক বক করছে। মঞ্জু একা একা বসে থাকতে থাকতে একবার ভাবল উঠে যায় ওদিকে। কিন্তু কেমন যেন সংকোচ বোধ করল। সুধা বউদি নেই, তাঁর ঘরের ভিতর দিয়ে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে।

ঘরের এক কোণায় একটা নেড়া টেবিল পড়ে আছে। ওপরে কোন ঢাকনির বালাই নেই। সুধা

বউদি যেন কি। একটা টেবিল ক্লথও করে দিতে পারেন না। এর পরে যেদিন আসবে মঞ্জু একটা সুন্দর ঢাকনি করে নিয়ে আসবে। এই টেবিলের দুটি দেরাজের মধ্যে সুরজিৎদার তুলি আর রঙের বাক্স-টাক্স থাকে। অনেক দিন তাঁর সামনে মঞ্জু এসব দেরাজ ঘেঁটে দেখেছে। তিনি রাগ করেননি, বরং খুশিই হয়েছেন। খোলা দেরাজ। চাবিটাবির বালাই নেই। আজও মঞ্জু দেখবে নাকি খুলে। যদি সুরজিৎদা কোন ছবিটবি রেখে গিয়ে থাকেন তার জন্যে? তাদের ম্যাগাজিনটা বা কোথায়? সেটাও কি দেরাজের মধ্যে রেখে গেছেন? মঞ্জুর ভারি লোভ হোল দেরাজটা খুলে দেখে। কিন্তু খুলতে গিয়ে কেমন একটা সংকোচও বোধ করল। ছি ছি ছি ওঁরা কেউ বাড়ি নেই, কাজটা কি ভালো হবে!

কৌতূহল আর ভদ্রতার সঙ্গে এ দ্বন্দ্ব বেশিক্ষণ চালাতে হোল না, মিনিট পনের বাদেই সুধা বউদি ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই একটু যেন চমকে উঠলেন, 'কে? কে অন্ধকারে বসে?'

সুধা সুইচ টিপে আলো জ্বালাল ঘরের, 'ও তুমি?'

মঞ্জু বলল, 'হ্যাঁ বউদি, আমি। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি।'

সুধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে তাকাল, 'একাই বসে আছ? তিনি ছিলেন না? তিনি কোথায় গেলেন? আমার পায়ের সাড়া পেয়ে পালালেন নাকি?

সুধা অদ্ভুত একটু হাসল।

মঞ্জু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সুরজিৎদার কথা জিজ্ঞেস করছেন বউদি। তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি। তাঁর জন্যেই তো অপেক্ষা করছি।'

সুধা রুক্ষ, শুকনো গলায় বলে উঠল, 'তা আমি জানি। তুমি যে কার জন্যে অপেক্ষা করছ তা আমার জানতে বাকি নেই।'

মঞ্জু অবাক হয়ে সুধা বউদির দিকে তাকাল। দেখতে আরো যেন রোগা হয়েছেন বউদি, আরো কালো, আরো বিশ্রী। আর কি খরখরে গলা। হঠাৎ কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগল মঞ্জুর। তক্তাপোশ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,'আমাদের ম্যাগাজিনের ছবিটা কি আঁকা হয়ে গেছে বউদি? হয়ে থাকলে দিন। আমি নিয়ে চলে যাই।'

সুধা বলল, 'সে কি কথা। এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলে, দেখা না করেই যাবে? আরো খানিকক্ষণ বোসো। সে আসুক। দুজনকে পাশাপাশি দেখে নয়ন জুড়াই তারপরে যেয়ো।'

মঞ্জু অস্ফুট, কাঁপা গলায় বলল, 'বউদি, এসব কি বলছেন? অমি যাই, আমাকে যেতে দিন।'

কিন্তু হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে সুধা দোর আগলে দাঁড়াল। ওর মাথায় আঁচল নেই, কোটরের ভিতর থেকে চোখ দুটো জ্বলছে, 'না না, শোন, আজ তোমাকে সব শুনে যেতে হবে।'

মঞ্জু অসহায় ভঙ্গিতে বলল, 'কি শুনব। আপনি এসব বলছেনই বা কি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে!'

সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'ন্যাকা, বদমাস মেয়ে! তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারছ না! তুমি কচি খুকি আছ, না? তুমি কিচ্ছু জানো না, না? আমি সব জানি, আমি সব শুনেছি। কালীর মার কাছ থেকে আমার কিচ্ছু শুনতে বাকি নেই। আর অন্যের কাছে আমার শোনাশুনিরই বা কি আছে। আমি নিজেই কি সব দেখতে পাচ্ছিনে, নিজেই কি সব টের পাচ্ছিনে?'

নির্বাক বিমূঢ় মঞ্জু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। সুধা বলে চলল, 'আজ সাত আট দিন ধরে ঘরে একটি টাকা নেই। কোন রকমে ধার করে রেশন এনেছি। সারাদিন টাইপ করতে করতে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল। আর উনি আছেন ওঁর আর্ট নিয়ে আর তোমাকে নিয়ে। যাতে দুটি পয়সা আসবে, ছেলেমেয়ে দুটি খেয়ে বাঁচবে তার নামে দেখা নেই, উনি ম্যাগাজিনের মলাট আঁকছেন, ষোড়শী সুন্দরীর ধ্যান করছেন। এই নাও তোমার ম্যাগাজিন।'

তাকের ওপর থেকে উন্মেষের বসন্ত সংখ্যা নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল সুধা, 'যাও চলে যাও। মলাট আঁকাতে হয়, অন্য জায়গায় গিয়ে আঁকিও। কত পার্ক আছে, গার্ডেন আছে, আঁকবার জায়গার অভাব কি, মেলবার জায়গার অভাব কি। কিন্তু আমার চোখের ওপরে নয়, আমার চোখের ওপরে নয়।'

ঘর থেকে এবার নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে এল মঞ্জু। ধুলো মাখা খাতাটা তুলে নিল হাতে। পুরোপুরি ছবিটা আঁকা হয়নি। কেবল ফুলে পল্লবে ভরা বসন্ত ঋতুর অস্পষ্ট একটা আভাস পেন্সিলের দাগে দাগে ফুটে উঠেছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলল মঞ্জু। সুধা বউদির কথাগুলি বিকটমূর্তি ধরে যেন পিছনে পিছনে তাড়া করে আসছে। তার পালিয়ে যাওয়া চাই। কিন্তু চোখের জলে সামনের পথ ঝাপসা হয়ে আসছে মঞ্জুর, কিছু দেখতে পাচ্ছে না যে।

কবিতায় ভরা বসন্তকালের প্রবন্ধ, মণিকাদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, ফুল আর ছবি, ক্লাব আর ম্যাগাজিনের মধ্যে হঠাৎ কতকগুলি বিশ্রী কটু শব্দ এসে জড়ো হয়েছে। আর আশ্চর্য, অভিধান ছাড়াই প্রত্যেকটি শব্দের মানে বুঝতে পেরেছে মঞ্জু। কেন পারবে না ? সে তো আর সত্যিই খুকি নেই। সে আজ বড় হয়েছে। বড় হওয়ার কি যে মানে, বড় হওয়াব কি যে জ্বালা তা আজ প্রথম টেব পেয়েছে মঞ্জু।

চৈত্র১৩৫৯

জামা

ভিড় ঠেলে বাস থেকে নামবার সময় কোনো এক অসাবধান সহযাত্রীর হাত লেগে কাঁধের কাছ দিয়ে জামাটা অনেকখানি ছিঁড়ে গেল যতীনের। রাস্তায় নেমে যাত্রীভরা বাসটার দিকে ফিরে তাকিয়ে যাকে সামনে দেখলো তাকে লক্ষ্য করেই যতীন অভিযোগের সুরে বলে উঠলো, 'দিলেন তো মশাই জামাটা ছিঁড়ে ? একটু দেখে শুনে চলতে পারেন না ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে বলছেন কেন ? আমি ছিঁড়েছি ?'

তা ঠিক। তিনিই যে ছিঁড়েছেন একথা যতীন জোর দিয়ে বলতে পারবে না। সে তো নিজের চোখে কাউকে ছিঁড়তে দেখেনি। যতীন দ্বিতীয় কোনো কথা বলতে না বলতেই বাসটা ছেড়ে দিল। বাসের ভিতর থেকে বোধ হয় এই ব্যাপার নিয়েই কারো একটু হাসি, ক'জনের একটু কলগুঞ্জন যেন ভেসে এল। নিষ্ফল আক্রোশে বিমূঢ়ভাবে যতীন মুহূর্তকাল সেই চলন্ত বাসটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু আগে যারা ছিল সহযাত্রী তারা এখন সবাই শত্রু। সত্যি কাউকে দোষ দিতে পারে না যতীন। কাউকে সে ছিঁড়তে দেখেনি। যে অদৃশ্য নির্মম হাত তাকে দিনরাত টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ছে সেই হাতই তার জামাটাকে অমন করে ফেঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

মোড়ের ছোট্ট দোকানটিতে নীল রঙের লুঙ্গি পরা একটি আধবয়সী মুসলমান বিড়ির পাতা কাটছিল। সে যতীনের দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে বললো, 'ভেবে আর কি করবেন মশাই। যখন যাবার তখন অমনিই যায়। আপনার জামাটা পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। নিন মশাই, বিড়ি নিন একটা।'

যতীনের দুঃখ দেখে, তার চেহারা দেখে বিড়িওয়ালার বোধ হয় আরও একটু মমত্ব জেগেছে। বিড়িওয়ালার দানকে প্রত্যাখান করলো না যতীন। বিড়িটা হাত পেতে নিল। তারপর পকেটের সর্বশেষ দুটি পয়সা বের করে দিয়ে বললো, 'আরো গোটা কয়েক দাও সাহেব।'

সুরেশ সরকার রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে আরো দু'পা এগিয়ে বাঁ হাতে দেব লেনের মোড়ে এসে বিড়ি টানতে টানতে যতীন মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ভাবলো। সতীদের ওখানে যাবে কি যাবে না। এমন একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে কি কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে ওঠা যায়। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি। অন্তত গুটি-তিনেক টাকা না ধার করলেই আজ আর নয় যতীনের। মাসের শেষে সংসার একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আবার ছোট ছেলেটা টাইফয়েড থেকে ভুগে উঠলো। স্ত্রী ললিতা বলে দিয়েছে, 'যেমন করে পার অন্তত অর্ধেক রেশনের ব্যবস্থাটা করে এনো। নইলে ছেলেমেয়েগুলি সব শুকিয়ে মরবে। ঘরে একটা ক্ষুদও কিন্তু নেই।'

তাই সকালেই ধারের চেষ্টায় বেরিয়েছে যতীন। কাদাপাড়ায় কারো কাছে হাত পাতবার জো

নেই। চেনা-পরিচিত যারা আছে সকলেই কিছু-না-কিছু পাবে। দেনা শোধ দিয়ে সাউকারি রাখতে পারেনি যতীন। বাজারের যে ছোট্ট মুদি দোকানটায় যতীন কাজ করে, ছেলের অসুখের সময় সেখান থেকেও আগাম টাকা নিয়ে সে ভেঙেছে। চাইলেও নকড়ি বন্দী আর দেবে না'। গাঁয়ের পরিচিত লোক যারা কলকাতায় আছে তাদের মধ্যে সতীদের অবস্থাই সব চেয়ে ভালো। তার স্বামী প্রফুল্ল বোসকে চাকরি করতে হয় না। বউবাজারে তার পৈতৃক ফার্নিচারের বড় দোকান আছে। দেব লেনে নিজেদের কেনা বাড়িতে তারা থাকে। ভাড়া দিতে হয় না। ধার করবার মতো এমন ভালো জায়গা যতীনের আর জানা নেই।

কিন্তু জায়গা ভালো হলেও কি এমন একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে সেখানে ওঠা ভালো দেখায়? শত হলেও গাঁয়ের জামাই। এক হিসেবে কুটুম্বের মতো। তবু না গিয়েই বা উপায় কি। খালি হাতে তো আজ আর বাসায় ফিরতে পারবে না যতীন। তাহলে ললিতা ঝাঁটা নিয়ে আসবে। কি কুক্ষণেই যে এই তেত্রিশ নম্বর বাসটায় আজ উঠতে গিয়েছিল যতীন। সে তো জানে এ বাসে সব সময় ভিড় থাকে। কত জনের পকেট কাটা যায়। কিন্তু যাওয়ার মতো পকেট তো আর তাব নেই। তাই গোটা জামাটাই গেছে। কিন্তু বাসে আজ সাধ করে ওঠেনি যতীন। এই দুঃসময়ে চারটে পয়সা ইচ্ছা করে খরচ করেনি। গতকাল নিজের স্যান্ডেলটা ছিঁড়ে যাওয়ায় পাশের বাসার সুবল দাসের পামশুটা পায়ে দিয়ে বেরিয়েছিল যতীন। সুবল নিজেই বলেছিল, 'আজ আর আমি কোথাও বেরোব না, আমার শু-টা আপনি নিতে পারেন।'

কিন্তু সুবলের পা যে মেয়েদের মতো অত ছোট তা কি যতীন জানে। পরের জুতো তাব পায়ে সয়নি। দুপায়ে ফোসকা পড়েছে। বাঁ পায়ের ফোসকাটা ফেটে গিয়ে এই একদিনের মধ্যেই ঘা হয়ে গেছে। এখন নিজের জুতোকেই পরেব জুতো বলে মনে হয়। তবু এই জখমওয়ালা পা নিয়েই কাদাপাড়া থেকে শেয়ালদ' পর্যন্ত হেঁটে এসেছিল যতীন। তারপর শিয়ালদ'র মোড়ে এসে তেত্রিশ নম্বর বাসটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিরকম যেন লোভ লেগে গেল। ভাবলো পা-টাকে একটু আসান দেয়! কিন্তু পা-কে বাঁচাতে গিয়ে এমন অভাবিতভাবে জামাটা যে যাবে তা তো আর সে ধারণা করেনি। অথচ এই একটি মাত্র জামা-ই এখন সম্বল হয়েছে যতীনের।

নতুন চুনকাম করা সুন্দর দোতলা বাড়ি। কড়া নাড়তে গিয়ে যতীনের আঙুলের ডগায় দবজার একটু সবুজ কাঁচা রঙ লেগে গেল। একটু বাদেই সাবান মাখা মুখ নিয়ে প্রফুল্ল এসে দাঁড়াল। বছর বত্রিশ তেত্রিশ বয়স প্রফুল্লর। যতীনের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট। কিন্তু সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য এমন টলমল করছে যে মনে হয় প্রফুল্ল এখনো যেন পঁচিশ ছাব্বিশ পার হয়নি।

'আরে আপনি! আসুন, আসনু।' প্রফুল্ল হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলো। পরনে দামী লুঙ্গি, কাঁধে দুধের মতো সাদা টার্কিশ তোয়ালে, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে প্রফুল্লকে। যেন মহামান্য অতিথিকে আহ্বান করছে। এমন সৌজন্য, এমন বিনয়। নিজের বেশবাসের কথা ভেবে আর একবার ভারি কুণ্ঠা বোধ করলো যতীন।

ঘরের ভিতর তাকে নিয়ে এসে প্রফুল্ল একটু উঁচু গলায় ডাক দিল, 'দেখ এসে সতী, কে এসেছেন।'

স্ত্রীকে সকলের সামনে আধুনিক কায়দায় নাম ধরেই ডাকে প্রফুল্ল। দোকানদার হলে কি হবে, এম· এ· পাস। আর কোনো চাকরির চেষ্টা না করে, বাপ মারা যাওয়ার পর নিজেদের ব্যবসা দেখছে। কিন্তু দোকান আর বাড়ি-ঘরের চেহারা ধরন-ধারন এবং নিজেদের চালচলন আদব-কায়দা সব বদলে দিয়েছে প্রফুল্ল। সবাই যেন তার বাপের আমল থেকে তার আমলের পবিবর্তনটা বুঝতে পারে। যেন কেউ ধারণা না করে যে সে সরকারি চাকরি করে না বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষাদীক্ষা রুচি-রীতি সব বিসর্জন দিয়েছে।

সতী রান্নাঘরে রাঁধুনীকে কি সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। স্বামীর ডাক শুনে ঘরে এসে দাঁড়ালো, বাইরের লোককে দেখে একটু আঁচল তুলে দিল মাথায়। তারপর যতীনকে চিনতে পেরে বললো, 'ও মা যতুদা তুমি! আমি ভাবলাম কে না কে, এ কি বেশ ধরে এসেছ।'

ঘরের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের পাশে দামী কাঁচ বসানো আলমারি। সেই আয়নায় নিজের চেহারাখানাও এবার চোখে পড়েছে যতীনের। রোগা হ্যাংলা চেহারা, দু-তিন দিনের জমানো একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এরই মধ্যে দু-এক গাছ পাকতেও শুরু করেছে। পরনের কাপড়খানা আধময়লা। পায়ের স্যান্ডেল জোড়া দু'বছরের পুরোনো। ছেঁড়া জামাটা এই বেশের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। বরং ওটা আস্ত থাকলেই যেন কিছুটা বেমানান দেখাতো।

সতী আর একবার জিজ্ঞাসা করলো, 'করেছ কি যতুদা ?'

যতীন একটু হাসতে চেষ্টা করে বললো, 'আর বলো না, বাসে আসতে আসতে এক ভদ্রলোক জামাটা এমন ভাবে টান মেরে ছিঁড়ে দিলেন—'

কথাটা শেষ করার আগেই যতীন লক্ষ্য করলো স্বামী-স্ত্রী দু-জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছে। সত্যি, জামাটা এমনই জীর্ণ হয়েছে যে কেউ ওটাকে টান মেরে ছিঁড়েছে একথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। সস্তা কাপড়ের একটা রঙীন শার্ট। হকারের কাছ থেকে হাসকা কেনা। এক বছরের ওপর এই একটি জামাকেই ব্যবহার করছে যতীন। এ জামা স্বাভাবিক ভাবে ছেঁড়েনি, আর একজন টান মেরে ছিঁড়েছে, এ কথা লোকে যদি বিশ্বাস না করে তো দোষ দেওয়া যায় না।

প্রফুল্ল বললো, 'সত্যি, যা বলেছেন, ভিড়ের জন্যে আজকাল ট্রাম বাসে আর ওঠা যায় না। আমি বরং ট্যাক্সিতে—' স্ত্রীর চোখের ইশারায় তাড়াতাড়ি থেমে গেল প্রফুল্ল।

সতী প্রসঙ্গ পাল্টে গদি আঁটা নরম চেয়ারটা যতীনকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'বসো যতুদা। তারপর বউদি ভালো আছেন ? ছেলেমেয়েরা সব ভালো ?'

চেয়ারে বসলে সামনাসামনি আয়নাটা আর দেখা যায় না। তাই যতীন একটু সরে গিয়ে সতীর অনুরোধ রক্ষা করে বললো, 'ভালো আর কই। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। এই তো ছোট ছেলেটা মাসখানেক টাইফয়েডে ভুগে উঠলো। আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমরা সব কে কেমন আছ বলো। মেয়ে দুটি কই ? তাদের দেখছিনে যে।'

সতী মৃদু হেসে বললো, 'স্কুলে গেছে যতুদা।'

যতীন বললো, 'বলো কি, ছোটটিকেও স্কুলে দিয়েছ ? ওর বয়স তো বোধ হয় চার বছরও হয়নি।'

সতী তেমনি হেসে একটু কৈফিয়তের সুরে বললো, 'কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিয়েছি। স্কুলের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। কি করবো বল, বাড়িতে বড় বিরক্ত করে।'

যতীনের মনে পড়লো নিজের ছেলেমেয়েগুলির কোনটিরই আজ পর্যন্ত পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে পারেনি। বড়টির বয়স তো বছর দশেক হলো। বাড়িতেই যা স্লেট পেনসিল নিয়ে এক আধ সময় বসে।

যতীন লক্ষ্য করলো প্রফুল্লর মতো সতীকেও বয়সের তুলনায় অনেক কম দেখায়। ওর যে আট বছরের মেয়ে আছে তা মনেই হয় না। সতী দেখতে খুব সুন্দরী। সৌন্দর্যের জন্যেই ও এমন ধনী আর বিদ্বান বর পেয়েছে। বিয়ের পরও নিজের সৌন্দর্যকে, তারুণ্যকে কুমারী মেয়ের মতই সতী যেন বেঁধে রেখেছে। একটু মোটা হয়েছে এই যা। কিন্তু এইটুকু পুষ্টতা ধনীর ঘরের বউকে মানায়। পাশাপাশি নিজের স্ত্রীর চেহারাটাও একবার মনে পড়লো যতীনের। বয়সে ললিতা হয়ত সতীর চেয়ে দু-এক বছরের বড়। কিন্তু চার চারটি ছেলেমেয়ে হওয়ার পর ললিতার শরীর এমন ভেঙে পড়েছে যে সতীর প্রায় মা-র বয়সী মনে হয় তাকে।

স্ত্রীর মুখের সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো যতীনের। প্রফুল্লর দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার দিকে চেয়ে বললো, 'ভাই প্রফুল্ল, গুটি তিনেক টাকা হবে ? বড় ঠেকে পড়েছি।'

খুবই সামান্য প্রার্থনা। প্রফুল্ল একটু অপ্রতিভ ভাবে বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে। বসুন চা-টা খান। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন।'

মুখ ধুয়ে এসে প্রফুল্ল আলনা থেকে জামাকাপড় নিয়ে পরতে শুরু করলো।

যতীন হেসে বললো, 'আমি ব্যস্ত হচ্ছি, না, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ। এত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছ কোথায় ?'

প্রফুল্ল স্মিতমুখে বললো, 'একটু দরকারি কাজে বেরোতে হচ্ছে যতীনদা। মনে কিছু করবেন না।

আপনার সঙ্গে বসে দুটো কথাও বলতে পারলাম না। কিন্তু আপনাদের আপন জন তো বাড়িতেই রইলেন। কথা বলবার মানুষের অসুবিধা হবে না। সতী, শিব এসেছেন অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারীর বেশে। তাকে কি দেবে না দেবে তুমিই জানো। আমরা নন্দীভৃঙ্গীর দল এবার পালাই।'

বলে, প্রফুল্ল হাসতে লাগলো।

সতী আরক্তমুখে বললো, 'শুনছ যতুদা ? মুখে কিছু আর আটকায় না।'

প্রফুল্ল এ কথার কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে সিল্কের পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম আটকাতে লাগলো।

খানিক বাদে সে বেরিয়ে গেলে সতী বললো, 'এ্যকটা সরকারী অফিসের কনট্রাক্ট পাওয়ার কথা আছে, তাই আর দেরি করতে পারলেন না। জানতো কম্পিটিশনের মার্কেট।'

যতীন বললো, 'তা তো ঠিকই।'

সতী বললো, 'বসো এক্ষুনি আসছি।'

একটু আগে প্রফুল্ল ঠাট্টা করে গেছে সেই কথাটা ফের মনে পড়লো। তাই ভেবেই কি সতী তার সামনে একা একা বসে থাকতে লজ্জা পাচ্ছিল ? বড়ই মারাত্মক পরিহাস করেছে প্রফুল্ল। যতীনের ভিখারীর বেশটা মোটেই ছদ্মবেশ নয়, আসলে বেশ, সেকথা জানে বলেই কি প্রফুল্ল অমন লাগসই ঠাট্টাটা করে গেল ? যতীন আর সতী শুধু একই গাঁয়ের নয়, একই পাড়ার। ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে বরকনে সাজতো। রাধাকৃষ্ণ শিবদুর্গাও অনেকবার হয়েছে। হয়ত ছেলেবেলাব সেই খেলার কথা স্বামীর কাছে গল্প করে থাকবে সতী। যতীনকে দেখে সেই কথাই মনে পড়ে গেল প্রফুল্লর। ছেলেবেলায় সতীর সঙ্গে সত্যিই খুব ভাব ছিল যতীনের। কতদিন যে স্কুল পালিয়ে সতীকে পেয়ারা পেড়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। ফল দেওয়ার বয়স পার হয়ে ফুল দেওয়ার বয়সে যখন যতীন এসে পৌঁছলো, সতীর মা বাবা সাবধান হয়ে গেলেন। কারণ দুই পরিবারের আর্থিক সামাজিক অবস্থার বড় বেশী তারতম্য। সতী কলকাতায় চলে এল। মামার বাসায় থেকে স্কুলে পড়বে, আর এদিকে বিয়ের সম্বন্ধের চেষ্টা চলবে। তার আগেই যতীনের বাবা মারা গেছেন। পাঁচ সাত বিঘা জমি যা ছিল দেনার দায়ে তা আগেই গিয়েছিল। থার্ড ক্লাসে বছর দুই ফেল করে পড়াটা তারও আগে ছেড়ে দিয়েছিল যতীন। কিন্তু সে যেন আর এক জন্মের কথা। এ জন্মে তখনকার সেই দুঃখ লজ্জা দাহ জ্বালা কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নইলে কি তিনটে টাকা ধার চাইবার জন্যে সতীর স্বামী প্রফুল্লর কাছে আসতে পারে যতীন। সে-সব জন্ম-জন্মান্তরের কথা।

থালা ভরে লুচি হালুয়া নিয়ে এল সতী।

যতীন বললো, 'এই বুঝি চা ?'

সতী হেসে বললো, 'এ চা হবে কেন, চা আসছে।'

চায়ের সরঞ্জাম আর একটি মেয়ে নিয়ে এল। দেখেই বুঝতে পারলো যতীন। বাড়ির ঝি। বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বিধবা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কালো ফিতে পেড়ে ধুতি পরনে। দেহের বাঁধুনি বেশ আঁটসাট।

সতী বললো, 'যাও বিমলা, তুমি রান্নাটা এবার দেখ গিয়ে। আমি একটু বাদেই আসছি।'

চা-টা নিজের হাতেই কাপে ঢেলে দিল সতী। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে যতুদা ?'

যতীন বললো, 'সব কি আর মনে থাকে ?'

সতী বললো, 'আমার কিন্তু আছে। সেই কাঁচা পেয়ারা আর কচি শসার স্বাদ জীবনে ভুলবো না।'

"বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে।" একটু আগে বিখ্যাত গ্রন্থকারের এই অতিবিখ্যাত লাইনটি মনে পড়ছিল যতীনের। কিন্তু এখন সতীর এই যত্ন দেখে, তার কথা শুনে যতীনের মনে হতে লাগলো সবটুকুই বুঝি অভিশাপ নয়।

এবেলাটা এখানে থেকে খেয়ে দেয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক অনুরোধ করলো সতী, কিন্তু যতীন রাজী হলো না, তার অনেক কাজ আছে। এখান থেকে টাকা নিয়ে যাবে, তবে রেশন ধরবে। কথাটা

সতীকে এবার নিঃসংকোচে বলেই ফেললো যতীন। সতী আর কোন পীড়াপীড়ি করলো না। আলমারি খুলে পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে দিল সতী।

যতীন বললো, 'আমার কাছে তো খুচরো নেই।'

সতী বললো, 'আহা নাও না, পরে দিলেই হবে।'

যতীন চলে যাচ্ছিল, সতী বললো, 'দাঁড়াও আর একটা কথা আছে।'

আলমারি থেকে বেছে বেছে মিহি খদ্দরের একটা পাঞ্জাবি বের করলো সতী। বললো, 'ওই ছেঁড়া জামাটা ফেলে দিয়ে এইটা পরে যাও। ওটা পরে কি ক'রে রাস্তা দিয়ে যাবে।'

মাত্র এইটুকু আদর। তাতেই যেন যতীনের চোখ দুটো ছলছল করে উঠতে চাইল। নিজেকে সংযত করে নিয়ে যতীন বললো, 'বাসায় আমার আরো জামা আছে সতী।'

সতী বললো, 'আমি কি বলছি যে নেই ? এটা দিচ্ছি—রাস্তায় পরবার জন্যে। নতুন জামা। আমার নিজের হাতের সেলাই। উনি মাত্র এক ধোপ পরেছেন। তারপর ধুয়ে এনে রেখে দিয়েছি। তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।'

যতীন বললো, 'আমি সেজন্যে সংকোচ করছিনে।'

সতী বললো, 'তবে আর কি। গায়ে তোমার এক রকম করে মানিয়ে যাবে। লম্বায় তো তোমরা প্রায় দু-জনেই সমান।'

তিনটে সাদা বোতামও বের করে দিল সতী। যতীনকে অগত্যা জামাটা পরতেই হলো।'

সতী বললো, 'বোতামগুলোভালো করে আটকে নাও। নাকি তাও আমাকে লাগিয়ে দিতে হবে ?'

নিজের কথায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো সতী। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললো, 'ভালো কথা, নৃপেন দত্তের মেয়ে রীতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে জানো ?'

নৃপেন দত্ত যতীনদেরই গাঁয়ের লোক। হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস করে। ডিকসন লেনে বাসা। এখনো বাড়ি করেনি। কসবায় জায়গা কিনে রেখেছে। নৃপেনবাবুর ওখানে যতীন মাঝে মাঝে যায়। কখনও চাকরির অনুরোধ করে, কখনও পাঁচ দশ টাকা ধার চায়।

যতীন বললো, 'হ্যাঁ, জানি। এই সাতাশে আষাঢ়ই তো বিয়ে। আর সপ্তাহ খানেক আছে। আমাকে বিশেষ করে যেতে বলেছেন। তোমরাও যাবে তো ?'

সতী হেসে বলল, 'না গেলে কি আর ছাড়বেন ? সব ফার্নিচার আমরাই দিচ্ছি। ওঁকে বলেছি বাজার দর থেকে কিছু সস্তা করে দিতে। চেনা জানা মানুষ।'

যতীন বললো, 'তা তো ঠিকই। যাই এবার, অনেক বেলা হয়ে গেল।'

সতী বললো, 'আচ্ছা এসো। কিন্তু ওই ছেঁড়া জামাটা বগলে করে আবার নিয়ে যাচ্ছ কেন ?'

যতীন বললো, 'নিয়ে যাই বাসায় কাজে লাগবে।'

সতী মৃদু হেসে বললো, 'বউদির আবার হবে টবে নাকি ?'

যতীন বললো, 'না-না, সে-সব কিছু নয়।'

বাসায় এসে স্ত্রীর কাছে সবিস্তারে সতীর গল্প করলো যতীন।

ললিতা কোপের ভান করে বললো, সতী তো নয়, আমার সতীন। দিব্যি বসে খেলে, গল্প করলে, আবার জামাও পেলে একটা। তোমারই তো পোয়া বার, আমার কি !'

ছেঁড়া জামা আর ভালো জামা দুটোই তুলে রাখতে রাখতে ললিতা বললো, 'মন্দ হয়নি ব্যাপারটা। কাল আবার ওই ছেঁড়া জামা পরে আর এক সতীর কাছে যেয়ো। কিছু না কিছু মিলবে। এর আগেও তো সতীদের ওখানে গেছ। কই এমন যত্ন আত্তি তো করেনি। সব ওই ছেঁড়া জামার মাহাত্ম্য।'

যতীন বিড়ি ধরিয়ে হাসতে লাগলো।

বড় ছেলে মণ্টুকে সঙ্গে করে রেশন নিয়ে এল যতীন। টাকাটাক খরচ করে বাজার করলো। দিনটা ভারি আনন্দে কাটলো। বস্তির ঘরখানা যেন হঠাৎ প্রাসাদ হয়ে উঠেছে। যে ছেলেমেয়েগুলিকে সর্বদা দূর দূর করে, আজ তাদের কাছে ডেকে আদর করলো যতীন। ঘরের

দাওয়ায় রান্নার ব্যবস্থা। ছোট জলচৌকিখানা টেনে নিয়ে স্ত্রীর পিছনে বসে এটা ওটা নিয়ে খানিকক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গে খোশ মেজাজে গল্প করলো।

ললিতা তরকারি রাঁধতে রাঁধতে একবার মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আজ হলো কি তোমার বলো তো। কাজ কামাই করলে, বসে বসে কেবল গল্পই করছো। হয়েছে কি তোমার ?' তারপর নিজেই একটু মুচকি হেসে বললো, 'কি যে হয়েছে, তা আমি জানি।'

পরদিন ভোরে উঠে সতীর দেওয়া জামাটা গায়ে দিয়ে কেবল বেরোতে যাবে যতীন, পাশের ঘর থেকে সুবল এসে হাজির, 'বাঃ নতুন জামা করলেন নাকি যতীনদা ?'

যতীন গম্ভীরভাবে বললো, 'হুঁ।'

'কত পড়লো ?'

যতীন বললো, 'টাকা ছয়েক।'

সুবল বললো, 'বেশ। তা হলে তো খুব সস্তাই হয়েছে।'

আরো দিন পাঁচেক বাদে সুবল ফের এসে উপস্থিত। 'জামাটা এক বেলার জন্যে আমাকে ধার দিতে হবে যে যতীনদা।'

যতীন বিস্মিত হয়ে বললো, 'সে কি, এ জামা দিয়ে তুমি কি করবে ?'

সুবল বললো, 'হেস্টিংস স্ট্রিটে আমার একটা ইন্টারভিউ আছে আজ দশটার সময়। কিন্তু ভালো একটা জামা নেই ঘরে। আপনার জামাটা দিতেই হবে।'

আই· এ· পাস করে বছর তিনেক যাবৎ বেকার আছে ছোকরা। মাঝে মাঝে মরীয়া হয়ে চাকরির চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে ওঠে না। গায়ের জামাটা যতীন ওকে আস্তে আস্তে খুলে দিল। খুব যে খুশী হয়ে দিল তা নয়। না দিলে চলে না বলেই দিল। পাড়াপড়শী মানুষ। এই সেদিনও ও স্বেচ্ছায় যতীনকে জুতো জোড়া ধার দিয়েছে। যতীনের ছেলেদের মাঝে মাঝে পড়াশুনো দেখিয়ে দেয়। বস্তির ছেলেমেয়েদের জড়ো করে শখের স্কুল খুলে বসে। কিন্তু সংসারের অভাব অনটনের মাত্রাটা বাড়লে সেই শখ আর বেশিদিন টেকে না। তা ছাড়া চাকরি-বাকরিব ব্যাপাব। মানুষের জীবনমরণ সমস্যা। এ সময় একটা জামা চাইলে মানুষ মানুষকে না দিয়ে পারে ?

জামাটা সঙ্গে সঙ্গেই গায়ে দিল সুবল। হেসে বললো, 'কেমন মানিয়েছে দেখুন তো।'

একটু আগে যতীনের মনে যে খুঁতখুঁতি ছিল সুবলের হাসি দেখে সেটুকু আর রইল না।

যতীনও হেসে বললো, 'হ্যাঁ, চমৎকার মানিয়েছে।'

নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়লো যতীনের। ও বয়সে সবই মানায়। ও বয়সে তার সঙ্গেও সতীকে মানাতো।

যতীন বললো, 'জমাটা এই ক-দিনে আধময়লা হয়ে গেছে যে।'

সুবল বললো, 'তাতে কিছু হবে না। আমি এক্ষুনি সাবান দিয়ে কেচে শুকিয়ে নেব।'

সন্ধ্যার পরে সুবল এসে খবর দিয়ে গেল, ইন্টারভিউ খুব ভালো দিয়েছে। হেসে বললো, 'আপনার জামার গুণ আছে যতীনদা।'

জামাটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল না সুবল। যতীনের চাইতে লজ্জা করলো। ভাবলো কাল চেয়ে নেবে। কাল নৃপেন দত্তের মেয়ের বিয়ের তারিখ। কাল তার জামাটা অবশ্যই চাই।

কিন্তু ভোরে উঠে সুবলের আর দেখা মিললো না। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে সে নাকি শেষরাত্রে যতীনের জামাটা গায়ে দিয়েই কাঁচড়াপাড়ায় কোন এক বন্ধুব বাড়ি চলে গেছে। চাকরি-বাকরি নিয়ে বাপ-মা দু-জনেই তাকে খোঁটা দিয়েছিলেন।

যতীন তো মাথায় হাত দিয়ে বসলো, আজ যে ওই জামা তার না হলে চলবেই না। আজ যে তাকে বিয়েয় যেতেই হবে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে গিয়ে সুবলের বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করে এল। এ কি রকম কাণ্ড তাদের ছেলের। পরের জামা নিয়ে দু'দিন ধরে আটকে রেখেছে। কোনো একটা দায়িত্ব নেই। এমন বে-আক্কেলে ছেলে কে কার বাপের জন্মে দেখেছে।

সুবলের বাবা মা দু'জনে ছেলের পক্ষ নিয়েই ঝগড়া করলেন। ধার তো সুবল কেবল একাই নেয় না। তার জুতো, ছাতা, ইস্তক চার পয়সা দামের একখানা ব্লেড পর্যন্ত যতীন মাঝে মাঝে ধার নিয়ে দাড়ি কামায়। তার আবার অত খোঁটা কিসের।

মজা দেখবার জন্যে বস্তির লোকজন এসে ভিড় করছিল। স্ত্রীকে নিয়ে যতীন ঘরে ফিরে এল।

সুবল এই ফেরে এই ফেরে আশায় আশায় সারাদিন কাটালো যতীন। কিন্তু সুবল ফিরে এল না। সে কোন্ চুলোয় গেছে তার ঠিক কি।

যতীন আর একটা ভালো জামার জন্যে সারা বস্তি খুঁজে বেড়ালো, পাড়ার লন্ড্রির মালিককে পর্যন্ত দু আনা কবুল করলো, তবু বিয়েবাড়িতে যাওয়ার মতো একটা জামা জোটাতে পারল না।

লন্ড্রির হীরেন সরকার বললো, 'না ভাই তোমাদের বস্তির লোককে দিয়ে বিশ্বাস নেই। আমার অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে।'

বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণে যাবে কি যাবে না বসে বসে খানিকক্ষণ ভাবলো যতীন।

ললিতা বললো, 'না যাওয়া কি ভালো দেখাবে। নৃপেনবাবু তোমাকে নিজের মুখে বলেছেন। না গেলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন। সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে তো গিয়ে হাত পাততে হয়। আমি তো বলি যাও গিয়ে।'

যতীন বললো, 'যাব যে, কি পরে যাব।'

হাতে কাচা একখানা ধুতি আর সেই ছিটের শার্টটা বের করলো ললিতা, বিকেলের মধ্যে সেলাই করে কেচে শুকিয়ে ঠিক করে রেখেছে। সামনের দিকে দু-তিন জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। নিজের হাতে রিপু করে দিয়েছে ললিতা। তবু জামাটার জীর্ণতা ঢাকা পড়েনি। বিশেষ করে কাঁধের কাছে আর পিঠের কাছে ধারা সেলাইটা বড় স্পষ্ট চোখে পড়ে।

যতীন একটু বসে কি চিন্তা করে বললো, 'আচ্ছা দাও, ওইটা পরেই যাই।'

ললিতা বললো, 'তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি তো আর বরযাত্রী সেজে যাচ্ছ না, কনে পক্ষের লোক হিসেবেই যাচ্ছ। তোমার আবার অত সাজগোজের কি দরকার।'

স্ত্রীর যুক্তি দেখে যতীন হেসে বললো, 'তা ঠিক।'

ছোট দুটি ছেলে মেয়ে নিমু আর টেপি এসে যতীনকে জড়িয়ে ধরলো, 'বাবা আমাদের নেমন্তন্নে নিয়ে যাবে না?'

যতীন একটু অপ্রস্তুত হলো—নৃপেনবাবু আর কাউকে বলেননি।

এ তো গাঁয়ের বাড়ি নয়, কলকাতা। গোনা গাঁথা মানুষের ব্যাপার। বিনা নিমন্ত্রণে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়।

যতীন ছেলে-মেয়েদের আশ্বাস দিয়ে বললো, 'তোমাদের আর একদিন নিয়ে যাব।'

ললিতা তাদের ধমক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আজ আর হেঁটে গেল না যতীন। ছ'টি পয়সা ভাড়া দিয়ে কাদাপাড়া থেকেই বাসে উঠে বসলো। ললিতা ঠিকই বলেছে, সে তো কনেপক্ষ। তার জামা কাপড়ের অত বাহার না হলেও চলবে। গিয়েই জামা আর গেঞ্জি দুই-ই খুলে ফেলবে যতীন। হ্যাঁ, গেঞ্জিটাও খুলে ফেলতে হবে। জামার মতো ওটাও বড্ড বেশি ছেঁড়া। বিয়েবাড়িতে গিয়ে দুটোই খুলে ফেলে ভাঁড়ারে গিয়ে একেবারে মিষ্টির বালতি হাতে নেবে যতীন। কোমরে গামছা জড়িয়ে নেবে। নৃপেনবাবু দেখে খুশী হবেন। আর বাইরের লোকে তাকে ভাববে দত্তদেরই আত্মীয়।

বাসটা আরো খানিক দূর এগিয়ে যেতে আলো-ঝলমল আর একটি বিয়েবাড়ি চোখে পড়লো যতীনের। ব্যতিব্যস্ত একটি সুন্দরী সুসজ্জিতা বধূকে দেখা গেল জানালা দিয়ে। অনেকটা সতীর মতো। যতীনের মনে পড়লো এই বিয়েতে সতীও আসবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা অকারণ অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো যতীনের। সে নৃপেন দত্তের বাড়িতে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে যেখানে সতী আসবে সেইখানে। এ পর্যন্ত কোনো বিয়েবাড়িতে সতীকে দেখা যতীনের ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। সতীর বিয়ে কলকাতায় হয়, তখন সে ছিল দেশে। আর যতীনের নিজের বিয়ে হয় গাঁয়ের বাড়িতে,

তখন সতী ছিল কলকাতায়। অন্য কোনো বিয়ের আসরেও তারা দু-জন এক সঙ্গে উপস্থিত থাকেনি। আজ এই প্রথম থাকবে। সারা মনে এক অদ্ভুত আনন্দ আর উল্লাস অনুভব করল যতীন। তার বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে। নতুন তারুণ্যের জোয়ার এসেছে দেহে মনে।

কিন্তু বিয়েবাড়ির সামনে এসে যতীন যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেল। পুবে পশ্চিমে দুদিকে মোটর গাড়ির সার। ভিতরে উজ্জ্বল আলো, লোকজন, হৈ চৈ। মেরাপ বাঁধা ছাতে বরযাত্রীদের বৈঠক বসেছে। লুচির ঝাঁকা, মাংসের বালতি, সন্দেশের থালা হাতে পরিবেশকের দল সিঁড়ি বেয়ে উঠছে নামছে, ছুটছে, থামছে। কারো চোখে চশমা, কারো হাতে সোনার ঘড়ি।

ঘুরতে ঘুরতে নৃপেনবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল যতীনের। আজ আর পরনে কোট প্যান্ট নেই। খাটো ধুতি, গায়ে সাদা হাফ শার্ট, খালি পা, মাথায় টাক, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক—বিনয়নম্র কনের বাপ।

যতীনকে দেখে স্মিতমুখে বললেন, 'এই যে যতু এসেছ। বসো বসো। আবে পাত পেতে এব জায়গায় বসে যাও না কেন। নিজেদের বাড়িতে এসেছ। ওহে যতুকে তোমরা কোথাও বসিয়ে দাও না।'

নৃপেনবাবু কাদের উদ্দেশে যে কথাটা বললেন ঠিক বোঝা গেল না। কারণ ধারে কাছে পরিবেশনকারী ছেলেরা কেউ ছিল না।

যতীন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'আমার বসবাব জন্যে কি হয়েছে। আমি তো বাড়ির লোক।'

নৃপেনবাবু বললেন, 'বেশ তা হলে পরে বসবে।'

বলে, চলে যাচ্ছিলেন, যতীন তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে থামালো।

'আর একটি কথা। প্রফুল্লবাবুবা কি এসেছেন?'

'কোন্ প্রফুল্লবাবু?' নৃপেনবাবু একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন।

'আজ্ঞে ওই যে বউবাজারে ফার্নিচারেব দোকান আছে।'

'ও হ্যাঁ, তাঁবা এসেছেন।'

'তাঁব স্ত্রী—'

বেশ একটু লজ্জিত ভঙ্গিতেই কথাটা উচ্চারণ করলো যতীন।

নৃপেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব এসেছে।'

ব্যস্ত ভাবে তিনি কোথায় চলে গেলেন।

যাক, সতী তা হলে এসেছে। মনটা ফের উৎফুল্ল হয়ে উঠলো যতীনেব। কিন্তু কি করে তার সঙ্গে দেখা করা যায়। এই প্রমীলামহল থেকে কি করে খুঁজে তাকে বেব কববে যতীন। এই নিষিদ্ধ দুর্গে সে ঢুকবে কি করে। শুধু ববযাত্রীদেব পবিত্যক্ত বাইবেব ঘরখানা ছাড়া কোথাও তাব যাওয়াব জো নেই।

প্রথমে দু'একটি ছেলেকে হাতের ইশারায় ডাকলো যতীন। কিন্তু তারা কেউ কাছে এগোলো না।

অবশেষে ফ্রক পরা আট ন-বছরেব একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে যতীন তার কাছে গিয়ে বললো, 'খুকি একটা কথা শুনবে?'

'বলুন।'

'প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী সতী দেবী, সতী বসু কোন ঘবে আছেন তুমি জানো? তুমি তাঁকে একটু ডেকে দিতে পাববে?'

মেয়েটি বললো, 'ও আপনি সতী মাসীব কথা বলছেন? খুব পাববো, আপনি আমাব সঙ্গে আসুন।'

যতীন একটু ইতস্তত কবে বললো, 'আমি বরং এখানে দাঁড়াই।'

মেয়েটি হেসে বললো, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আসুন না, আমি আপনাকে চিনিয়ে নিয়ে যাব। ওঁরা সব দোতলায় আছেন। দিদিকে যেখানে সাজাচ্ছে, সেইখানে।'

যতীন আর কোনো দিকে না তাকিয়ে মেয়েটির পিছনে পিছনে দোতলায় উঠে এল। তারপর

একটা সরু লম্বা বারান্দায় অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন জায়গায় তাকে দাঁড় করিয়ে মেয়েটি বললো, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।'

একটু বাদে সতী এসে দাঁড়ালো, একেবারে রাজরাজেশ্বরীর মূর্তি। পরনে দামী বেনারসী। সারা গায়ে গয়না। মাথায় আঁচল নেই, সুন্দর পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপা। সিঁথিতে সিঁদুরের আভাস, আছে কি নেই বোঝা যায় না। সতী নিজেই যেন এ বাড়ির বিয়ের কনে। মুগ্ধ বিস্মিত চোখে যতীন মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে রইল। আর যেন কিছু আজ বলবার নেই। সে তো কিছু আজ চাইতে আসেনি, শুধু চেয়ে থাকতে এসেছে।

যতীনকে দেখে সতী একটু বিস্মিত হলো, বললো, 'তুমি! আমি ভাবলাম বুঝি—'

যতীন হেসে পাদপূরণ করে বললো, 'কে না কে!'

সতী বললো, 'না, ঠিক তা নয়।'

তাবপর যতীনের গাযের জামাটার দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠলো, 'ও কি তুমি ফের সেই ছেঁড়া শার্টটা প'রে এসেছ যে, পাঞ্জাবিটা কি হলো ?

নিজের ছেঁড়া জামার কথা এতক্ষণে যতীনের খেয়াল হলো। জামাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে লজ্জিতভাবে কৈফিয়তের সুবে বললো, 'আর বলো না। চাকরিব ইন্টারভিউ দেবে বলে পাশের বাড়ির এক নাছোডবান্দা ছোকরা জমাটা নিয়ে গেছে। এমন কবে ধরলো যে না দিয়ে পারলাম না।'

সতী স্থির দৃষ্টিতে যতীনেব দিকে একটুকাল তাকিযে রইল, মুখের ভাব একটু যেন কঠিন হলো। কিন্তু সেলাই করা জামাটাব দিকে আর একবাব তাব চোখ পডতেই সতীর ঠোঁটে ফের একটু হাসি ফুটে উঠলো।

সতী চপল কৌতুক মেশানো সুরে বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা সে গল্প আর একদিন শুনবো। আজ বড ব্যস্ত আছি। ওঁদের এখনো মেয়ে সাজানো হয়নি। যাই।'

লীলায়িত ভঙ্গিতে সতী পাশের ঘরে গিযে ঢুকলো। একটু বাদে একদল তরুণীর খিল খিল হাসিব শব্দ শোনা গেল।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যতীন। তারপর দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল। ভিড়ের সঙ্গে মিশে সেই আলোর মালায় সাজানো বিয়েবাড়ির ফটক পার হয়ে গেল। সতীর কথা, সতীর হাসি সহস্র বিষাক্ত সূচেব মতো যতীনকে এবার বিদ্ধ করতে লাগলো। সতী তাব কথা বিশ্বাস করেনি। সেই প্রথম দিনও না, আজও নয়। ওবা দান কবে, দয়া করে, কিন্তু গবীবেব মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করে না। সতীব কাছে সে ভিখাবী শিব নয় ; শুধু ভিখাবী, শুধু ভিখারী।

আশ্বিন ১৩৬০

ছদ্মনাম

যাদুঘরে নিখিল ভারত শিল্প-প্রদর্শনীতে নানা বয়সী নানা শ্রেণীর নরনারীর সঙ্গে এই কাহিনীর নায়িকা নমিতা মৈত্র ছবি দেখে বেড়াচ্ছিল। তার বয়স বছর বাইশেক। গায়ের রং শ্যামলা, ছিপছিপে দোহারা গড়ন, একটু লম্বাটে ধরনের মুখ, নাকটি তীক্ষ্ণ, চোখ দুটি বড় বড় আর কালো। জানি না এই রূপ-বর্ণনায় মেয়েটির মুখ পাঠকের কল্পচোখে কতখানি বাস্তব হয়ে উঠবে। তবে ভরসা এই বাঙ্গালী মেয়ের এই ধরনের চেহারা, এই ধরনের মুখের সঙ্গে কমবেশি অনেকেরই পরিচয় আছে। সেই পরিচিতাদের সঙ্গে এই অপরিচিতা নায়িকাকে তাঁরা মিলিয়ে নিতে পারবেন।

নমিতার মুখে শুধু করুণ গাম্ভীর্য নয় ক্লান্তির ছাপও ছিল। হয়ত অফিসের খাটুনির পরে এই প্রদর্শনীতে এসেছে বলেই তাকে এমন দেখাচ্ছিল। ওর হাতে প্রদর্শনীর একটা ক্যাটালগ। কিন্তু তালিকার সঙ্গে ছবির নম্বর মিলিয়ে চিত্র-পরিচয় জানবার তার যেন তেমন আগ্রহ কি উৎসাহ ছিল না, তালিকাটি বন্ধ করেই সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পেইনটিং, স্কেচ,

এচিং—চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগগুলি সে ঘুরে ঘুরে দেখল। কত নামজাদা, কত অখ্যাতনামা তরুণ শিল্পীর ছবির সামনে নমিতা থেমে থেমে দাঁড়াল, কিন্তু কিছুই যেন তার চোখকে মুগ্ধ, মনকে আকর্ষণ করল না।

তরুণবয়স্ক দুজন দর্শক তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ছবি দেখছিল। তারা কখনো পাশে দাঁড়াচ্ছিল, কখনো পিছনে।

এক সময় সেই দুই বন্ধুর মৃদু আলাপ নমিতার কানে গেল।

'সবাই কি ছবি দেখতে আসে। কতজনের কত উদ্দেশ্য থাকে। কেউ দেখাতে আসে, কেউ বা দেখা করতে। একজিবিশনে আসাটা ফ্যাশান বলেই কাউকে কাউকে বাধ্য হয়ে আসতে হয়।'

'আস্তে হে আস্তে, শুনতে পাবে। তোমার ছবি মন দিয়ে দেখেনি বলেই তো তোমার এই বিদ্বেষ। কিন্তু আর্টিস্টকে অবিচল থাকতে হয়। মা ফলেষু কদাচন। কে তোমার ছবির নিন্দা করলে কে বন্দনা গাইলে, কে চোখ মেলে দেখল, কে দেখল না তা নিয়ে শিল্পীকে ভাবলে চলে না। তোমার যা দেখবার দেখে নাও। একটি ভালো প্রফাইল লক্ষ্য করেছ ?'

'করেছি। আমি ভাবছি সিঁথিতে সিঁদুর দেব কি দেব না। দিলেই ভালো মানাবে, নাকি যেমন সাদা আছে তেমনিই থাকবে ? তোমার কি মত।'

এর পর নমিতা তরুণ শিল্পী আর শিল্পীর বন্ধুর সঙ্গ এড়িয়ে প্রদর্শনী ঘরের বাইরে দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং ধরে এসে দাঁড়াল। কম্পাউন্ডের ওধারে নাম-না-জানা বড় বড় পাতাওয়ালা একটি গাছ সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। সবুজ পাতায় সূর্যাস্তের রঙ। নমিতা কিছুক্ষণ এই নতুন ছবিটির দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল।

এ ছবি নতুন আবার এ ছবি পুরনো। গত দু বছর ধরে প্রদর্শনী ঘর থেকে বেরিয়ে ঠিক এই রেলিংটিতে ভর করে পাতার সবুজে সূর্যাস্তের ছিটে দেখেছে নমিতা। তবু গত দু বছরের সঙ্গে এ বছরের একটু প্রভেদ আছে। আজ আর একজন তার পাশে দাঁড়ান নেই। এ প্রভেদ একটু নয়, অনেকখানি। আজ সে নমিতার পাশে নেই, কাছে নেই, এই কলকাতা শহরের পাশাপাশি অফিসে থেকেও সে অনেক দূরে চলে গেছে। একই পাড়ায় বাস করেও যেন সাত সমুদ্র তের নদীর দুই পারে চলে গেছে তারা।

দু বছর আগে এই প্রদর্শনীতেই তার সঙ্গে নমিতার আলাপ হয়েছিল. উদ্বোধনের পর দিন দুই গেছে। সেদিনও খুব ভিড়, ইনচার্জকে বলে অফিস থেকে একটু সকাল-সকালই বেরিয়েছে নমিতা। আরো দুটি বান্ধবীর আসার কথা ছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়নি। স্থির চিত্রের চেয়ে চলচ্চিত্রে তাদের আগ্রহ বেশি, কিন্তু স্থিরও যে কত অস্থির হতে পারে নমিতা সেই দৃশ্যই একখানি ছবির মধ্যে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ছবিখানির নাম 'সমুদ্রে ঝড়'। নমিতার একজন প্রিয় শিল্পীর আঁকা, বর্ণবিলাস আর বিচিত্র রঙের সমারোহে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন।

দেখতে দেখতে খেয়াল ছিল না। হাত থেকে অসাবধানে ক্যাটালগখানা পড়ে গিয়ে একটু শব্দ হলো। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি যুবকও সেই 'ঝড়' দেখছিল। তাড়াতাড়ি ক্যাটালগখানা তুলে নিয়ে নমিতার দিকে এগিয়ে দিল।

নমিতা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'

যুবকটি হেসে বলল, 'অনুবাদটুকু ভালো নয়। আমি হলে বলতাম, ধন্য। বাদটুকু একেবারে বাদ দিতাম।'

নমিতাও এবার হাসল, 'এত বেশি অনুপ্রাসই কি ভালো ?'

দুজনে ছবি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল।

যুবকটি বলল, 'আপনাকে আমি চিনি। আপনি তো ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ করেন।'

নমিতা বলল, 'হ্যাঁ। আপনাকেও পাশের এ জি বেঙ্গলে রোজ ঢুকতে দেখি।'

সে বলল, 'আপনি তো কালীঘাট থেকে নটা-বিশের ট্রামে আসেন।' নমিতা স্মিতমুখে বলল, 'হ্যাঁ, আপনাকেও তো ওই ট্রামে মাঝে মাঝে দেখতে পাই।'

'মাঝে মাঝে নয়। আমার পক্ষে রোজ এলেই সুবিধে, মানে অফিসে লেট হতে হয় না। কিন্তু রোজ ওই ট্রামটা ধরতে পারিনে। আমি চিরকালের লেট-লতিফ।'

খানিক বাদে সে প্রস্তাব করল, 'চলুন না, ওই বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়াই। এত ভিড়েব মধ্যে ছবি দেখে সুবিধে হবে না।'

নমিতা বলল, 'চলুন।'

তারপর দুজনে এসে এই রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিন খুব কাছাকাছি নয়। মাঝখানে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখেছিল তারা।

সে একটু বাদে বলল, 'দেখুন, এত ঘন ঘন আমাদের দেখা হয়, তবু আলাপ-পরিচয় হয় না। সভ্য শহরের কি অদ্ভুত নিয়ম, আমি বলব অসভ্য নিয়ম। ভাগ্যিস ক্যাটালগটা আপনাব হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

নমিতা স্মিতমুখে বলল, 'একে আপনি ভাগ্য বললেন!'

সে হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই, দৈবের অনুগ্রহ। অবশ্য আমার একজন বাস্তববাদী লেখক বন্ধু আছেন তিনি দৈব মানেন না। তিনি যদি আমাদের নিয়ে গল্প লেখেন, নিশ্চযই লিখবেন আপনি ইচ্ছে করেই বইটা ফেলে দিয়েছেন।'

নমিতা লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদের সুরে বলল, 'মোটেই না। তিনি আমাদের নিযে গল্প লিখতে যাবেন কেন।'

সে বলল, 'আমরা বললেই তিনি লিখবেন। চেনা মানুষকে নিয়ে তাঁব গল্প লেখা অভ্যাস।'

নমিতা বলল, 'কি সাংঘাতিক। ভারি অসভ্য তো।'

তারপর একটু মুচকি হেসে নমিতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিই সেই লেখক নন তো!'

সে বলল, 'না না। আমি পাঠক, কথক, সমালোচক। লেখক ছাড়া সবই, আব যারা লেখক তারা লেখক ছাড়া আর কিছুই না।'

একটু বাদে সে বলল, 'আমিই শুধু কথা বলছি। আপনি কিছুই বলছেন না। এতখানি আলাপই যখন হল, আমরা এবার আমাদের নাম-ধাম জিজ্ঞেস করে নিতে পারি।'

নমিতা মৃদুস্বরে নিজের নাম বলল।

সে বলল, 'দেখুন, আপনার কাছে আমার নাম বলতে বড় লজ্জা হচ্ছে। আমাব নামটা আপনার মত অত বিনয়নম্র নয়।'

'তা নাই বা হল, বলুন না।'

'আমার নাম রাজ্যেশ্বর দত্ত। এই গণতন্ত্রের যুগে এ-নাম মোটেই বলবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমাকে দোষ দেবেন না। নামটা আমার বাবার দেওয়া।'

সেই প্রথম দিনের পরিচয় দ্বিতীয় দিন থেকেই প্রায় দৈনন্দিন আলাপে গিয়ে পৌঁছল। আলাপ আর আলোচনা। অফিস ছুটির পর সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব। অফিস ছুটির পর গার্ডেন, লেক, গঙ্গার ধার, শহরের খ্যাত অখ্যাত রেস্টুরেন্ট।

বছর ঘুরে আবার এল প্রদর্শনী। ছবি দেখা শেষ করে আবার তারা দাঁড়াল রেলিং ধরে। একদিন নয়, রোজ। কত পুরনো শিল্পীকে যে তারা নাকচ করল কত নতুন শিল্পীকে তুলে ধরল তার ঠিক নেই।

রাজ্যেশ্বর একদিন বলল, 'আজ আর নিজের নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে না।'

নমিতা বলল, 'কেন।'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'এমন একটি দেশের সন্ধান পেয়েছি, যেখানে আজও রাজতন্ত্র আছে।'

নমিতা বুঝেও না-বোঝার ভান করে বলল, 'তেমন দেশের অভাব কি। গণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্র এখনো বেশির ভাগ দেশে চালু।'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন। আমি সে দেশের কথা বলছি না, এদেশের কথাও না। আমি একটি বিশেষ দেশের কথাই বলছি।'

নমিতা বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি বড় অসভ্য।'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'আমাকে শেষ করতে দাও। তার নাম হৃদয় দেশ। সেখানে গণতন্ত্র নেই, আছে মনতন্ত্র। সে রাজ্যে শুধু রাজা আর রানী। প্রজা বলে কোন পদার্থ নেই।'

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রাজ্যেশ্বর হঠাৎ বলল, 'নমিতা, আর কতদিন আমরা অপেক্ষা করব।'

এ যেন আব এক মানুষ। বাকপটু রাজ্যেশ্বরের কথা নয়। তার ভাষায় আবেগ, ভঙ্গীতে কাতরতা।

নমিতা একটু হেসে বলল, 'এবার বুঝি আর তোমার অনুপ্রাসে কুলালো না।'

রাজ্যেশ্বব হাসল না, বলল, 'আমার কথার জবাব দাও।'

নমিতা মৃদুস্বরে বলল, 'আমি তো তোমাকে সব বলেছি।'

তা ঠিক। এই বছব ধবে তারা শুধু সাহিত্য আর শিল্পের আলোচনাই করেনি ; নিজেদের সংসারের কথা, পরিবার-পরিজনের কথাও দুজনে দুজনকে জানিয়েছে।

নমিতার বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। নেহাৎ অভাব অনটনে পড়েছেন বলে মেয়েকে বি-এ পাশ করিয়ে চাকরিতে দিয়েছেন। তাই বলে মেয়ের অসবর্ণ বিয়ে তিনি মোটেই অনুমোদন কববেন না। নমিতা তার বাবার সঙ্গে রাজ্যেশ্বরের আলাপ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মেয়ের এই বন্ধুটিকে মোটেই তাঁর ভালো লাগেনি। শুধু কায়স্থ বলে নয় ; কায়েতের মধ্যে কি ভালো লোক নেই ? ভালো ছেলে নেই ? কিন্তু রাজ্যেশ্বর বড় দাম্ভিক, বড় আত্মম্ভরী, সবজান্তা ধবনেব ছেলে। চালচলন থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদের আরো অনেক ত্রুটির কথা তিনি বলেছেন। নমিতা যদিও জানে কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যেশ্বরকে সে এত পছন্দ করেছে বলেই তার বাবাব তাকে এত অপছন্দ তবু জোর করে সে কথাটা বাবাকে বলতে পারছে না। তিনি হৃদরোগে ভুগছেন। ডাক্তার মোটেই ভরসা দিচ্ছেন না। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নমিতার মা নেই। বাবা তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। নমিতা যদি তাঁর অমতে বিয়ে করে তিনি তাঁর আরো তিনটি নাবালক ছেলে-মেয়ে নিয়ে বরং না খেয়ে মরবেন, তবু নমিতার দেওয়া একটি পয়সা ছোঁবেন না। সেও এক আশঙ্কা। এখন নমিতার আয়েই সংসার চলে।

এদিকে রাজ্যেশ্বরের সমস্যাও কম নয়। তাব বাবা মাও দরিদ্র। ঘরে বিধবা বউদি আর ভাইপো ভাইঝি আছে। আর আছে একটি অনূঢ়া বোন। বয়সে সে নমিতার চেয়েও বছব খানেকেব বড়। দেখতে আরো কালো, মুখশ্রীও নমিতার মত সুন্দর নয়। তাছাড়া সে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে। থার্ড-ক্লাস অবধি বিদ্যা। নমিতার মত চাকরিবাকবি করে খাবে, কি নিজে পছন্দমত বব জুটিয়ে নেবে এমন সাধ্য তার নেই। তার তো সব ছেলেকেই পছন্দ। কিন্তু ছেলেরা তাকে পছন্দ কবে কই ! রাজ্যেশ্বরের বাবা বলেছেন, 'তুমি বিয়ে কবে সেই টাকায় বোনেব বিয়ে দাও।' নিতানতুন সম্বন্ধও তিনি নিয়ে এসেছেন। রাজ্যেশ্বর ঘাড় কাত করলেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা না হোক, সাত-আটশ টাকা পণ, পনর-কুড়ি ভরি সোনার সঙ্গে সুন্দরী, শিক্ষিতা বউ ঘরে আনতে পারেন। রাজ্যেশ্বরের যখনই বিয়ের আলোচনা হয়, তার বোনেব চোখ উল্লাসে ভরে ওঠে, দাদা যতবার 'না' করে ততবার সেই চোখ দুটি নৈরাশ্যে এমন বিবর্ণ হয়ে যায় যে এক অদ্ভুত ব্যাথ্যায় রাজ্যেশ্বরের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। নমিতার সঙ্গে তার বোনের কোন মিল নেই। কিন্তু চোখ দুটির সঙ্গে ভারি সাদৃশ্য আছে। তার চোখও তেমনি কালো, অমনি শান্ত, অমনি মমতায় ভরা।

বিনা পণ যৌতুকে নমিতাকে বিয়ে করলে রাজ্যেশ্বরের বাবাও অবশ্য হতাশ আর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু সে তাঁকে বোঝাতে পারবে যে নগদ সাতশত টাকা পণ পাচ্ছে না বটে কিন্তু দেড়শ টাকা মাইনের চাকরি করা বউকে ঘরে আনছে, পাঁচ—ছ মাস যদি বউয়ের মাইনের টাকা জমানো যায় তা হলেই বোনের বিয়ের পণ জোগাড় হয়ে যাবে। অবশ্য টাকাটা সত্যি সত্যিই নমিতার কাছ থেকে নেবে না রাজ্যেশ্বর, নিলে নমিতার বাবা আর ভাই বোনেদের চলবে কি করে। শুধু নিজের বাবা মাকে বুঝ দেওয়ার জন্যেই ওসব কথা বলবে। তারপর বিয়ে হয়ে গেলে দুজনে পার্ট টাইম চাকরি করবে, ট্যুইশন করবে, রাত জেগে নোট লিখবে। অর্থ রোজগারের কত উপায় আছে। মাসকয়েক কি বড় জোর বছরখানেক খাটলেই রাজ্যেশ্বরের বোনের বিয়ে দিতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

নমিতা বলেছে, 'সেভাবে টাকা রোজগার তো এখনো করা যায়। তার জন্যে তাড়াতাড়ি বিয়ের কি দরকার।'

একথা শুনে আহত রাজ্যেশ্বর একটুকাল চুপ করে থেকে বলেছে, 'কিন্তু বাবা যে দিনরাত তাগিদ দিয়ে দিয়ে আমার মন বিষাক্ত করে তুলেছেন।'

নমিতা জবাব দিয়েছে, 'কিন্তু আমার বাবা যে সহ্য করতে পারবেন না। তিনি আর কদিনই বা আছেন ? যা অবস্থা তাঁর শরীরের।'

রাজ্যেশ্বর আর কিছু বলেনি।

তারপর এই মাস ছয়েক আগের কথা। অফিস ছুটির পর রাজ্যেশ্বর সেদিন গম্ভীর মুখে নমিতাকে ডেকে নিয়ে গেল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

নমিতা মনে মনে হাসল, কথা যেন কোন দিনই থাকে না। গড়ের মাঠের অনেকখানি পাড়ি দিয়ে এক নির্জন জায়গায় বসে পড়ল রাজ্যেশ্বর। তারপর বিনা ভূমিকায় বলল, 'গীতা কি করেছে জানো ?'

নমিতা বলল, 'না।'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'পাড়ার বকাটে ছোকরা গোবিন্দ শীলের সঙ্গে নাকি চিঠি লেখালেখি করছিল। ধরা পড়ে গেছে। ভাড়াটে বাড়ি। আরো পাঁচ ঘর বাসিন্দা আছে। সবাই হাসাহাসি করছে। বাবা তো রেগে আগুন। বলছেন, ভাই যে পথ নিয়েছে বোনও সেই পথ নেবে, ওর দোষ কি।'

নমিতা আস্তে আস্তে বলল, 'ছেলেটি কেমন ?'

রাজ্যেশ্বর বলল, 'কোন কাজকর্ম করে না। মদ গাঁজা সবই চলে। গুণের অবধি নেই।'

নমিতা বলল, 'বড়ই লজ্জার কথা। ভারি দুঃখ হচ্ছে শুনে।'

রাজ্যেশ্বর উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মোটেই না। তোমার মোটেই দুঃখ হয়নি। আমাদের পরিবারের মান-সম্মানের দিকে তোমার মোটেই দৃষ্টি নেই। তা যদি থাকত তাহলে তুমি আমার কথা শুনতে।'

নমিতা কাতরভাবে বলল, 'কি করে শুনি বল। বাবা যে কিছুতেই—'

রাজ্যেশ্বরের আর ধৈর্য রইল না, বলে উঠল, 'কেবল বাবা আর বাবা। সেই বে-আক্কেল নির্বোধ বুড়ো কতকাল আর তোমাকে আগলে রাখবে ?'

নমিতা স্থির দৃষ্টিতে এবার রাজ্যেশ্বরের দিকে তাকাল। তার কালো চোখে আগুনের ঝলক দেখা দিল। তীব্র ঝাঁঝাল গলায় নমিতা বলল, 'তোমার মত স্বার্থপর পশুর হাত থেকে যতকাল আগলে রাখতে পারেন ততই ভালো।'

এর পর দুজনে নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে এল। সারাটা পথ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গেল কেউ কারো কাছে ক্ষমা চাইল না। ট্রামে-বাসে এখনও মাঝে মাঝে তাদের দেখা হয়। কিন্তু তারা আগের মতই—না আগের চেয়েও বেশি পরস্পরের কাছে অপরিচিত। সম্পর্কের স্বাভাবিক ছেদ তারা মেনে নিয়েছে। রাজ্যেশ্বরের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু নমিতা তাতে কান দিচ্ছে না। বিলাত-ফেরত ডাক্তার সুধীর লাহিড়ীর সঙ্গে নমিতার সম্বন্ধ এসেছে। তিনি ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাঁকে নিকট আত্মীয় করবার জন্যে নমিতার বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। লাহিড়ী উদার স্বভাব, মিতভাষী। নমিতাকে দেখে তাঁর পছন্দ হয়েছে। কিন্তু নমিতা তাঁর কাছ থেকে কিছু দিন সময় নিয়েছে।

উর্দিপরা বেয়ারা এসে বলল, 'মাইজী, ঘর বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। বাবু রাগ করছেন।'

নমিতার চমক ভাঙল। এতক্ষণ কোথায় ছিল সে। কার কথা ভাবছিল। ছি ছি ছি। লজ্জিত হয়ে বলল, 'চল যাচ্ছি।'

প্রদর্শনীর হল ঘরগুলি প্রায় শূন্য। দু-একজন চাকর-বেয়ারা ছাড়া আর কেউ নেই। আর আছেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। বড় একখানা টেবিলের সামনে বসে তিনি খাতা-পত্র গোছাচ্ছেন। নমিতাকে দেখে কালো রঙের লম্বা খাতাটা তার দিকে ঠেলে দিয়ে বিরক্তভাবে বললেন, 'নিন সই

করুন। আপনারা তো ছবি দেখতে আসেন না—'

নমিতা লজ্জিতভাবে খাতাটা নিজের দিকে টেনে নিল। যারা প্রদর্শনী দেখতে আসে, নিজেদের নাম ঠিকানা এই খাতায় লিখে দিয়ে যায়। গত দু বছর রাজ্যেশ্বর আর নমিতাও লিখেছে। পর পর দুজনের নাম। কিন্তু এবার একা-একাই নাম সই করতে হবে নমিতার। সেও একা একা এসেছিল ? সেই উদ্বোধনের দিন থেকে তিন দিনের কয়েকটি পাতায় তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেল নমিতা। না, সে নাম কোন পৃষ্ঠায় নেই। নমিতার নাম থেকেই বা তাহলে কি হবে !

চশমা-পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক ফের তাড়া দিলেন, 'কি দেখছেন অত ! নামটা লিখতে হয় লিখে ফেলুন না।'

কি হবে নিজের নাম সই করে ? নমিতা যে তার খোঁজে এসেছিল, কি হবে সেই পরাজয়ের চিহ্ন রেখে ? একটুকাল কি যেন চিন্তা করল নমিতা। তারপর নিজের নামের বদলে নমিতা অফিসের আর একটি মেয়ের নাম বসিয়ে দিল—শিবানী রায়।

ভদ্রলোক খাতাটা বন্ধ করে বললেন, 'বাঁচালেন। আশ্চর্য কাণ্ড আপনাদের। কালও এক কোট-প্যান্ট-পরা দেশী সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা খাতাটার নাম মুখস্থ করছিলেন। আমি চোখ কটমট করে তাকাতেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন. শেষ পর্যন্ত নিজের নামটা আর লিখে যাননি। কত রকমের লোকই যে আসে এখানে।'

নমিতা সাগ্রহে বলে উঠল, 'সত্যি ? কি রকম চেহারা বলুন তো ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাপ করবেন, চেহারা কি আমি মুখস্থ করে রেখেছি, একজিবিশনে রোজ হাজার হাজার লোক আসে যায়। সকলের চেহারার বর্ণনা দিতে হলেই হয়েছে।'

বেয়ারাকে জানলা-দরজা বন্ধ করার ইঙ্গিত দিলেন ভদ্রলোক।

নমিতা একা একা সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। তাহলে কি সেও এসেছিল ? সেও কি নমিতার মত প্রতি মুহূর্তে আর একজনের খোঁজ করছিল ! খাতায় একটি নাম খুঁজেছিল আতিপাতি করে ? কোন প্রমাণ অবশ্য নেই। কিন্তু নমিতা যে এসেছিল তারও কি কোন প্রমাণ রইল !

আশ্বিন ১৩৬০

ছায়া

বিদায় নেওয়ার ঠিক মিনিটখানেক আগে মহিলাটি হঠাৎ বললেন, 'জানেন কল্যাণবাবু, আমারও এক সময় লেখার অভ্যাস ছিল, আমিও লিখতুম।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাই নাকি !' আমার তাকাবার ভঙ্গিতে গলার স্বরে একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুক বোধ ছিল, সেটা তাঁর চোখ-কান এড়াল না।

তিনি বললেন, 'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?'

এবার আমার অপ্রস্তুত হওয়ার পালা, বিনীত সৌজন্যে তাড়াতাড়ি বললাম, 'সে কি কথা. এর মধ্যে অবিশ্বাসের কি আছে ? বরং সাহিত্যকে আপনি যে ভাবে ভালোবাসেন, শুধু ভালোবাসা না, আপনার যে বিচারবোধের পরিচয় পেয়েছি—'

মহিলাটি বাধা দিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না কল্যাণবাবু, আমি বড়ই লজ্জা পাচ্ছি।'

'কেন, আত্মপ্রশংসা শুনে ?'

'না না, ও প্রশংসা তো আমার নয়, ওসব আপনার বানানো কথা। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলে আমি সত্যিই বড় লজ্জিত।'

আমি আমার সদ্য পরিচিতা পাঠিকাটির দিকে আর একবার তাকালাম। তাঁর বয়স চল্লিশের দু এক বছর বেশি ছাড়া কম হবে না। স্থূলাঙ্গী। গায়ের রঙ ফরসা। যৌবনে মোটামুটি সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। পান দোক্তা খাওয়ার অভ্যাস আছে। শাড়িতে গয়নায় তিনি যে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহিণী তা সহজেই অনুমান করা চলে। ওঁর স্বামী আসামের গোয়ালপাড়ায় একটি

চা-বাগানের সহকারী ম্যানেজার। ওঁরা ছেলেপুলে নিয়ে সেখানেই থাকেন। সম্প্রতি দিন পনেরর ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রভা দেবীর খুবই আগ্রহ আর অনুরাগ আছে, আর সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কৌতূহল। এই ক'দিন তিনি নিজেই যেচে কয়েকজন তরুণ-সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছেন। তাঁদের বই কিনেছেন। সেই কেনা বইয়ের পাতায় লেখকদের স্বাক্ষর নিয়েছেন।

কলকাতায় তাঁর একজন আত্মীয় আছেন। তিনিও সাহিত্যানুরাগী, আমার বন্ধুস্থানীয়। সেই প্রভাতবাবুকে সঙ্গে নিয়েই তিনি আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহিলাটি বেশ আলাপী। আমার স্ত্রীর সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। দেখলাম সাহিত্যে আর সংসারে তাঁর অনুরাগ প্রায় সমান। একই সময়ে আমার সঙ্গে সাহিত্যালাপ আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক আলোচনা তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে গেলেন। চা খেয়ে তাঁদের বাসায় চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার র‍্যাক থেকে খান দুই বই হাতে নিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়ল, 'আমিও এক সময় লিখতুম।'

আমরা তাঁকে ফের একটুকাল বসে যেতে অনুরোধ করলাম। তিনি অনুরোধ রাখলেন। যে ছোট্ট গোল টেবিলটা ঘিরে বসে আমরা চা খেয়েছি, তিনি সেই টেবিলের সামনে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। আমি এবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, 'লেখা কেন ছেড়ে দিলেন?'

চিত্রা বলল, 'সংসারের ঝামেলায় মেয়েদের অনেক শখই ছাড়তে হয়, ওঁর পাঁচটি ছেলে-মেয়ে।'

মহিলাটি একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না, সেজন্যে কিছু নয়। আমার ছেলেমেয়ে, স্বামী কি সংসারের কাজকর্মের জন্যে আমার লেখার কোন ব্যাঘাত হয়নি। বরং তাঁদের সকলের কাছ থেকে খুবই উৎসাহ পেয়েছি।' একটু থেমে মহিলাটি মৃদুস্বরে বললেন, 'আমাকে লেখা ছাড়তে হলো একটি মেয়ের জন্যে।'

বললাম, 'সে কি কথা।'

মহিলাটি একটুকাল চুপ করে রইলেন।

বললাম, 'আপনার যদি বিশেষ আপত্তি থাকে তাহলে আর কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'না আপত্তি আর কি। নিজের দোষের কথা গোপন করে কিইবা লাভ হবে। গোড়া থেকেই বলি।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু যেন অনুমতি চাইলেন তিনি। অনুরোধের সুরে বললাম, 'হ্যাঁ, তাই বলুন।'

সুপ্রভা দেবী বলতে লাগলেন।

সে অনেক দিনের কথা। প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল। আমরা তখন কলকাতায় থাকতাম। হরিশ মুখার্জি রোডে একটি ছোট দোতলা বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম। তখন বাড়ি খুব পাওয়া যেত। আর ভাড়াও বেশ শস্তা ছিল। আমার স্বামী কলকাতারই একটি বিলাতী মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন। শ্বশুর কোর্টে বেরোতেন। সংসারের অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল।

লেখার অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকেই। আমি থার্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলাম। তারপরই ঠাকুরদা স্কুল ছাড়িয়ে আনলেন। আমি কান্নাকাটি করায় তিনি বললেন, 'তুমি আমার পাঠশালায় পড়।' সাহিত্যের পাঠ আমি তাঁর কাছ থেকেই নিতে শুরু করেছিলাম। তিনি ইংরেজি ভাষা জানতেন না—তবে বাংলা আর সংস্কৃতে তাঁর খুবই দখল ছিল। কিন্তু তাঁর কাছেও আমার পড়াশুনো বেশিদিন হয়ে উঠল না। বিয়ে হয়ে গেল।

পড়াশুনো আমি ভালোবাসি, তা ছাড়া একটু আধটু লেখারও আমার অভ্যাস আছে এ কথা জেনে আমার শ্বশুর আর স্বামী দুজনেই খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আমার সেই কাঁচা কাঁচা কবিতা আর গল্পগুলো ওঁরা নিজেরা তো পড়লেনই, ওঁদের বন্ধুবান্ধবকে পর্যন্ত পড়ে শোনাতে লাগলেন। আমি লজ্জিত হলুম। অবশ্য তখনকার লজ্জার মধ্যে গর্ব আর আনন্দের অংশই বেশি ছিল। কিন্তু এখন সেসব দিনের কথা ভেবে শুধুই লজ্জা পাই।

দোতলায় একটি দক্ষিণ-খোলা ছোট ঘর ছিল, আমার স্বামী টেবিল চেয়ার বইয়ের আলমারিতে সাজিয়ে সেটিকে লেখার ঘর করে দিলেন। দামী দামী খাতা আর কলম কিনে আনলেন। বছর দুয়েকের মধ্যেই আমি যে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী হতে পারব সে সম্বন্ধে আমাদের তিনজনের কারো মনেই কোন সন্দেহ রইল না।

কিন্তু আমার সাহিত্য-চর্চায় মাঝে মাঝে কিছু ব্যাঘাত হতে লাগল। আমার শাশুড়ী আমার বিয়ের অনেককাল আগেই মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুরের এক বিধবা মাসতুতো বোন তার আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে ছিলেন আমাদের সংসারে। আমার সেই পিসশাশুড়ীই ঘরসংসারের কাজ দেখতেন। আমি শুধু লেখাপড়া নিয়ে থাকতাম বলে আমার ওপর তাঁর খুব সুনজর ছিল না। আড়ালে আবডালে বলতেন, 'বিবি বউ' লেখাপড়া করেন। আপিসে আদালতে গিয়ে বসলেই হয়।'

আমি তাঁর কথায় কান দিতাম না। ভাবতাম, তিনি সংসারের কে। যাঁরা আমার আপনজন তাঁরা তো আমার দাম বোঝেন। তাঁরা তো আমাকে আদর করেন। কিন্তু আমার সেই পিসশাশুড়ীর চেয়েও তাঁর মেয়ে ফুলির উৎপাত আমার কাছে বড়ই অসহ্য লাগতে লাগল।

মেয়েটি প্রায় আমারই বয়সী। কি হয়ত দু-এক বছরের ছোট হবে। এত বয়স অবধিও ফুলির বিয়ে হয়নি, সে দেখতেও খারাপ, বুদ্ধিতেও তেমনি হাবা। সাংসারিক কাজ মোটামুটি জানলেও লেখাপড়া কিছুই জানে না। অনেক চেষ্টা করেও ওকে শেখানো যায়নি। সেলাই-ফোঁড়াই কি আর কোন শখের কাজও ওর মাথায় ঢোকেনি! ওকে নিয়ে আমার শ্বশুর মহা দুর্বিপাকে পড়েছিলেন। যারা ওকে দেখতে আসে, তারাই অপছন্দ করে চলে যায়। তিনি তাঁর বোনকে বলতেন, 'টাকা আমি খরচ করতে পারি চারু, কিন্তু তাতে কি হবে। দু'দিনের বেশি তিনদিনও স্বামীর ঘর করতে পারবে না। তারা ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। তার চেয়ে ও আমার সংসারেই থাক।' তাঁর বোন নিঃশ্বাস চেপে বলতেন, 'আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন।'

আমার শ্বশুর বলতেন, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। যদি বেশি বয়সে বুদ্ধিশুদ্ধি হয় তখন যা হোক করা যাবে।'

আমি আসা অবধি ফুলি আমাকে বড় হিংসে করতে লাগল। এর আগে আমার স্বামী ওকে ফুট ফরমাশ খাটাতেন, মাঝে মাঝে এটা-ওটা শখের জিনিস এনে দিতেন, কিন্তু আমি আসবার পর তাঁর সমস্ত মনোযোগ আমার ওপর গিয়ে পড়ল। সেই থেকে ফুলির হিংসে শুরু হলো। ও আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, 'আমি কেন একা একা বাসন মাজব, জল তুলব, রান্না ঘরের কাজ করব। ও রয়েছে কি জন্যে। ওরই তো ঘর সংসার, ওরই তো স্বামী, আমার কি—।' তার মা তাকে ধমক দিয়ে বলতেন, 'চুপ, চুপ।'

আমার শ্বশুরের কানে এসব কথা গেলে তিনি তাঁর বোনকে ডেকে হেসে বলতেন, 'চারু তোমার মেয়ের সুজ্ঞান হয়নি, কিন্তু কুজ্ঞানটুকু বেশ হয়েছে।'

আমার সেই পিসশাশুড়ী লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করে বলতেন, 'দাদা, আমি ওকে শাসন করে দিয়েছি, আর বলবে না।'

কিন্তু শাসন সত্ত্বেও ফুলি প্রায়ই ওসব কথা বলত। তার খোঁটায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে আমি মাঝে মাঝে সংসারের কাজে হাত দিতে গেলে আমার স্বামী নিষেধ করতেন, 'ও সব কাজের জন্যে তো আলাদা লোকই আছে।'

আমার পিসশাশুড়ীও আমার হাত থেকে তাড়াতাড়ি কাপ কেড়ে নিয়ে বলতেন, 'আমরা আছি কি জন্যে।'

আমি একটু লজ্জা পেতাম, কিন্তু সেই সঙ্গে গর্বও হোত। সংসারে সব কাজ সকলের জন্যে নয়। মোটা কাজের জন্যে পৃথিবীতে আলাদা লোক আছে। আর যারা কলম ধরবে তাদের হাত আলাদা, পাতও ভিন্ন।

আমি ফের এসে বসতাম আমার উপন্যাস নিয়ে। ফুলি মাঝে মাঝে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াত। ওর আটপৌরে শাড়িতে লঙ্কা হলুদের দাগ। হাতটাও বেশির ভাগ সময় ময়লা থাকত। সেই নোংরা হাতে ও আমার দামী টেবিলক্লথ চেপে ধরে, বাঁধানো খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে

বলত, 'বউদি, দাদাকে চিঠি লিখছ নাকি ? এই তো খেয়ে দেয়ে আপিসে বেরোলেন। এইটুকু চোখের আড়াল সহ্য হচ্ছে না ! অমনি চিঠি লিখতে বসে গেছ ?'

আমি বলতাম, 'হ্যাঁ চিঠি লিখছি। তুমি যাও এখান থেকে।' ও চলে যেতে যেতে বলত, 'বাবারে বাবা ! একটু দেখতেও দেবে না। বিয়ে একদিন আমারও হবে। মা কৌটোর মধ্যে টাকা জমাচ্ছে। এখানে আমি আর বেশিদিন পড়ে থাকব না। নিজের সংসারে গিয়ে চুল খুলে দিয়ে রানীর মত আমিও টেবিল চেয়ারে একদিন বসব।'

বলতে বলতে সে চলে গেল।

আমি মনে মনে হাসতাম। এ চিঠি যে আমি কার কাছে লিখছি তা ফুলি কি করে বুঝবে ! এ আমার ভাবী পাঠকদের কাছে চিঠি। তাদের বিরহ আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আমার দু'একটি গল্প আমার স্বামী তাঁর সম্পাদক বন্ধুদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখে শুনে তাঁরা ফেরত দিয়েছেন। বলেছেন, 'লেখা আর একটু পাকুক, তখন ছাপবো।'

আমার স্বামী আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন আমার প্রথম উপন্যাস তিনি নিজের টাকায় প্রকাশ করবেন। আর কারো দ্বারস্থ হতে যাবেন না। তা শুনে আমি দ্বিগুণ উৎসাহে উপন্যাসটি শেষ করার চেষ্টা করছি।

এই সময় সেই নিদারুণ কাণ্ডটি ঘটে গেল। সেদিন ছিল রবিবার। আমার স্বামী বাজার থেকে টাটকা কচি পাঁঠার মাংস নিয়ে এসেছেন। আমি রান্নাঘরে গিয়ে বললাম, 'মাংস আমি রাঁধব।'

ফুলি ফোঁস করে উঠল, 'ইস, বাজে ডাল তরকারি রাঁধবার বেলায় আমরা, আর মাংস রাঁধবার বেলায় উনি এগিয়ে এসেছেন। কেন, মাংস বুঝি আমি রাঁধতে জানিনে ?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'বেশ, তুমিই রাঁধ।'

পিসশাশুড়ী একটু হেসে বললেন, 'রাগ কোরো না বউমা। তুমি ওকে বলে-কয়ে দাও। ও হাতা-খুন্তি নাড়ুক, তুমি আর এক রবিবার রেঁধ। ফুলি কিন্তু মাংস মন্দ রাঁধে না।'

'তা আমি জানি।' বলে আমি মুখ ভার করে ওপরে এসে ফের উপন্যাস লিখতে বসলাম। কিন্তু লেখায় তেমন মন বসল না।

খানিক পরে দেখি ছোট একটি বাটিতে করে খানিকটা ঝোল আর একটুকরো মাংস নিয়ে ফুলি এসে হাজির হয়েছে। 'বউদি চেখে দেখতো নুন ঝাল সব ঠিক আছে কিনা।'

আমি প্রথমে বললাম, 'আমি চাখতে জানিনে।'

কিন্তু ও আমাকে এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত আমাকে চেখে দেখতেই হলো। আমি একটু ঝোল মুখে দিয়ে বললাম, 'নুনে কম হয়েছে।'

ফুলি ফের নিচে গিয়ে আমার জন্যে এক গ্লাস জল আর খানিকটা নুন হাতে করে নিয়ে এল। আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এতটা দেব ?'

আমি লিখতে লিখতে বললাম, 'দাও।'

আমার শ্বশুর আর স্বামী খেতে বসে বললেন, 'মাংস মুখে দেওয়া যায় না। নুনে একেবারে পুড়ে গেছে।'

ফুলি প্রথমটায় মুখ চুন করে রইল, তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'ওই হিংসুটে বউ ইচ্ছে করে আমার মাংস নুনে পুড়িয়ে দিয়েছে।'

ফুলির মা তাকে জোরে ধমক দিলেন। কিন্তু ফুলি রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। ওর আর সবই কম ছিল, কিন্তু রাগ ছিল প্রচণ্ড।

খাওয়াটা খারাপ হওয়ায় আমার স্বামী আমাকেও অনুযোগ দিলেন। আমি সারা দুপুর আর বিকাল অভিমান করে রইলাম। মান ভাঙাবার জন্যে তিনি সন্ধ্যেবেলায় আমাকে থিয়েটারে নিয়ে গেলেন।

রাত্রে ফিরে এসে আমি আর টেবিলের দিকে তাকালাম না। তাকাবার সময় পেলাম না। কিন্তু ভোরে উঠে উপন্যাসের খাতা খুলেই আমি চীৎকার করে উঠলাম। খাতার গোড়ার দিকের পাঁচ-সাতটা পাতা কে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে রেখেছে। এ যে কার কাজ তা আমার বুঝতে

বাকি রইল না। আমার স্বামীও বুঝতে পারলেন। তিনি আর কোন কথা না বলে নেমে গেলেন নিচে। সরাসরি পিসীমাকে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের জ্বালায় আমরা কি বাড়ি ছেড়ে পালাব ?'

'কেন কি হয়েছে ?'

কি হয়েছে সবিস্তারে আমার স্বামী তাঁকে শোনালেন।

আমি নিচে নেমে এসে কান্নাভরা গলায় বললাম, 'আজই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব। ও যেখানে আছে আমি সেখানে কিছুতেই থাকতে পারব না।'

রান্নাঘরে উনুনের ছাই ফেলছিল ফুলি, তার মা সেখান থেকে চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে বার করলেন। তারপর খান দুই চেলা কাঠ ভাঙলেন তার পিঠের উপর। আমরা গিয়ে থামাতে না থামাতে গিয়ে দেখি ফুলির সর্বাঙ্গে কালশিরা পড়েছে।

সেই দিন রাত্রেই ফুলির জ্বর এল। চারদিন পরে জ্বরবিকারে সে মারা গেল। বিকারের ঘোরে সে বারকয়েক বলেছিল, 'বউদি, আমি আর করব না, ছেঁড়া পাতাগুলো তুমি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে লিখে নিয়ো। আমি আর ছিঁড়ব না।'

কিন্তু সেই ছেঁড়া পাতাগুলি আর আমার লেখা হয়নি। তারপর থেকে আমার সব পাতাই সাদা পড়ে রয়েছে। বানিয়ে লেখার বিদ্যা সে আমার চুরি করে নিয়েছে। চরম শোধ নিয়েছে সে।

তারপর যতবার কাগজ কলম নিয়ে গিয়ে বসেছি দু'চার লাইন লিখতে না লিখতেই একটি ছায়া এসে আমার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তার হাতে আর শাড়িতে কয়লার ধোঁয়া আর লঙ্কা হলুদের দাগ, তার সারা গায়ে কালশিরা।

সুপ্রভা দেবী থামলেন।

খানিকক্ষণ আমরা সবাই চুপ করে রইলাম।

একটু পরে আমি বললাম, 'অন্তত এ কাহিনীটিতো লিখতে পারতেন।'

তাঁর চোখ ছল ছল করছিল। এবার আমার দিকে তাকিয়ে সেই জলভরা চোখেই মৃদু হাসলেন, বললেন, 'আমাকে দিয়ে আর হবে না, আপনি লিখুন।'

তিনি যা লিখতেন আমি তার কতটুকুই বা লিখতে পারলাম। আর একজনের সারা জীবনের না-লিখতে-পারার বেদনাকে লিখে জানাতে পারব এমন সাধ্য আমার নেই।

আশ্বিন ১৩৬০

বসন্তপঞ্চম

কলেজ স্ট্রীটের ন্যাশনাল স্টোর্সে কলমের জন্যে আমার সপ্তাহে দু'বার-একবার করে না গেলে চলে না, তার মানে এই নয় যে, আমি সপ্তাহে দু-বার করে কলম বদলাই। আমার কলম-বিশেষজ্ঞ বন্ধু বিজয় সেনের হাতে পুরনো কলমটা তুলে দিয়ে অপেক্ষা করি। তিনি ফ্লো কমান বাড়ান, নিবের অবস্থানটি একটু নেড়ে-চেড়ে ঠিক করে দেন। তারপর আমাকে কলমটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এবার লিখে দেখুন', তখনকার মতো বেশ লেখা পড়ে ; কিন্তু দু-চার দিন বাদে আবার যা তাই।

বিজয়বাবু নানারকম মন্তব্য করেন, 'দোষটা কলমের নয়', কোনোদিন বলেন, 'ফাউন্টেন পেন বাদ দিয়ে আপনার খাগের কি পাখের কলমেই লেখা ভালো।'

কোনোদিন বা বলেন, 'আপনার ম্যানিয়া হয়েছে মশাই, কলমের কিছু হয়নি।'

দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে আমরা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক পার হয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তাই তাঁর ঠাট্টায় আমি রাগ করিনে। আর আমি তাঁর খুব ব্যস্ততার মুহূর্তে গিয়ে হাজির হলেও তিনি বিরক্ত হন না। স্মিতমুখে মাথা নাড়েন। হাতের কাজ সেরে শুধু কুশল প্রশ্ন নয়, দু-চার মিনিট সুখ-দুঃখের গল্পও করেন।

বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের। একটু লম্বা বড়ো বড়ো চুল রাখতে

ভালোবাসেন। সেই নিবিড় কালো ঘন চুলের মধ্যে আজকাল রুপালি রেখা বেশ চোখে পড়ে। শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে চেহারার সৌম্যদর্শন মানুষটি। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মিষ্ট ভাষায় শিষ্টাচারে সেলস্‌ম্যানের পক্ষে একেবারে আদর্শ। তাঁর কাউন্টারের সামনে ক্রেতাদের ভিড় লেগেই থাকে। পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের এবং তাদের মধ্যে আবার স্কুল-কলেজের কিশোরী তরুণী ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। কলম সম্বন্ধে ছাত্রীদের ভারী কৌতূহল। নানারকম কলমের দর-দাম থেকে শুরু করে তাদের উপযোগিতা উৎকর্ষ অপকর্ষের কথা বিজয়বাবুকে বুঝিয়ে বলতে হয়।

আমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। লক্ষ্মীদের পায়ের ধূলি আর কারো ঘরে এত পড়ে না।'

বিজয়বাবু একটু হাসলেন, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'ঘরেতে এলো না সে তো কাউন্টারে নিত্য আসা-যাওয়া।'

তাঁর কৌতুকের সঙ্গে এমন একটু বিষণ্ণতার সুর মিশে রইল যে আমি ভারী অপ্রস্তুত হলাম। তিনি অবিবাহিত সেকথা আমার জানা ছিল।

আমার ভাবান্তর দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'দিন, আপনার কলম দিন। কি হয়েছে দেখি।'

সেদিন কলম দেখাবার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু আজ দরকারের সময় এসে দেখি তিনি নেই। গ্লাস-কেসে নানা রঙের নানা নামের নানা দামের ফাউন্টেন পেন। তার পিছনে বিজয়বাবুর ছোটো টুলটি শূন্য। তাঁর সহকারী বলাই জন দুই ক্রেতার সঙ্গে কথা বলছে।

'বিজয়বাবু কোথায় গেছেন?' বলাইকে জিজ্ঞাসা করলাম।

বলাই আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললো, 'তিনি আর-একজনের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বাইরে গেছেন। তাঁর ফিরতে খুব—খুব দেরি হবে। কলমটা আজ আমাকে দিয়েই পরীক্ষা করিয়ে নিন, কল্যাণবাবু।'

বললাম, 'তা না-হয় নিলুম। কিন্তু তুমি অত হাসছো কেন? ব্যাপার কি?'

বলাই হেসে বললো, 'বিজয়বাবুর এতদিনে বিয়ের ফুল ফুটেছে।'

দোকানে আর-কোনো বাইরের লোক ছিল না। কিন্তু আমিও তো ভিতরের লোক নই। তাই হোসিয়ারী ডিপার্টমেন্টের চারুবাবু, বুড়ো-ক্যাশিয়ার প্রমথবাবু, স্টেশনারী ডিপার্টমেন্টের বিনোদবাবু সবাই প্রায় একসঙ্গে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ও কি হচ্ছে, ফাজিল বকাটে ছেলে কোথাকার। বিজয়বাবু তোমার কত সিনিয়র। আর তুমি—'

বলাইয়ের বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। টুইলের হাফ-শার্টে আর ব্যাকব্রাস-করা-চুলে খুব স্মার্ট দেখায় বলাইকে। কিন্তু একসঙ্গে এত লোকের ধমক খেয়ে বলাই একেবারে থ' বনে গেলো। হোসিয়ারীর চারুবাবু মুখ নিচু করে সাদা গোঁফের মধ্যে হাসি লুকোলেন, তা আমার চোখ এড়ালো না।

'আচ্ছা, আমি আর-একদিন আসবো।'

বলাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তা পার হতেই বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা। শুধু তিনি নন, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আর-একজন ভদ্রমহিলা। মাথায় প্রায় বিজয়বাবুরই সমান। বরং মনে হয় যেন বিজয়বাবুর চেয়েও একটু বেশি লম্বা। দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ফুটের কম হবেন না তিনি। প্রস্থ সেই অনুযায়ী না হলেও বেশ পুষ্টাঙ্গী বলা চলে। গায়ের রং গৌর। মুখখানা বেশ ভরাট, চেহারায় খানিকটা রাশভারি ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের কম হবে না। পরনে সাদা খোলের শান্তিপুরী শাড়ি। পাড় বেশ চওড়া। রংটিও কাঁচা সবুজ। আভরণ খুব অল্প। গলায় চিক্‌চিকে একটি হার। বাঁ-হাতে কালো ফিতেয় একটি সোনার ঘড়ি। আর-কোথাও কিছু নেই। হাতে শান্তিনিকেতনী একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ আর দু-খানা মলাটে-ঢাকা মোটা বই। লক্ষ্য করলাম সিঁথির রেখাটি সাদা। আমাকে দেখে বিজয়বাবু একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু আমি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তাড়াতাড়ি আমাকে কাছে ডাকলেন, 'ওকি, চলে যাচ্ছেন কেন কল্যাণবাবু, আসুন আলাপ করিয়ে দিই। কল্যাণকুমার রায়। সাহিত্যিক। আর শ্রীমতী সুমিতা দাশগুপ্ত। অধ্যাপিকা।'

আমরা নমস্কার বিনিময় করলাম।

শ্রীমতী দাশগুপ্ত স্মিতমুখে বললেন, 'ও'।

আর আমি সেটুকুও না বলে শুধু স্মিতমুখ হয়ে রইলাম।

এরই মধ্যে দক্ষিণগামী ডবলডেকার স্টেট-বাসটি এসে পড়লো। তিনি হাত উঁচু করে বাসটাকে থামিয়ে তাতে ওঠবার আগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাই। আজ বড়ো তাড়া আছে।'

বিজয়বাবু বললেন, 'এই বাসেই যাবে?'

সুমিতা বললেন, 'হ্যাঁ, বিজয়, যাই। কল্যাণবাবুকে নিয়ে একদিন যেয়ো-না আমাদের ওখানে। আলাপ করবো। দয়া করে যাবেন একদিন।'

আমি স্মিত সৌজন্যে ঘাড় নাড়লাম।

সুমিতা দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। তবে তাঁর কাহিনী বিজয়বাবু একদিন বলেছিলেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের শ্রীমন্ত কেবিনের নিরালা কোণে আমরা বসে চা খাচ্ছিলাম। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। আকাশে পুরু মেঘ থাকায় দুপুরকে আর দুপুর বলে মনে হচ্ছিলো না। বিজয়বাবুর পকেটে একটি লেডিজ সেফার্স পেন দেখে কৌতূহলটা আবার আমার মনে জেগে উঠলো। বললাম, 'এমন দিনে শুধু তারে নয়, আমাকেও সব কথা বলা যায়। বলুন বিজয়বাবু।'

বিজয়বাবু আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, 'আপনি কিছুকাল থেকেই এ-ধরনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আর আমাদের দোকানের কলিগ্‌রা, এমনকি ছোকরা বলাই পর্যন্ত হাসি-তামাশায় আমাকে অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, বলবাব বেশি-কিছু নেই কল্যাণবাবু।'

বললাম, 'বেশ, বেশি-কিছু না বলতে চান অল্প-কিছুই বলুন।'

আরো-একটু ওজর-আপত্তির পর বিজয়বাবু মুখ খুললেন, মন খুললেন।

আমি কেন যে বিয়ে করিনি তা আপনাকে আকারে-ইঙ্গিতে আরো কয়েকবার বলেছি। যে-চাকরি করি আর যা মাইনে পাই তাতে বিয়ে করা চলে না। দোকানের সেলসম্যানরা কি বিয়ে করে না? করবে না কেন, আমাদের দোকানের এক বলাই ছাড়া সবাই বিবাহিত। প্রত্যেকেরই ছেলে-মেয়ে এমনকি নাতি-নাতনী পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু আমার সেভাবে বিয়ে করবার জো ছিলো না। আমাদের পরিবারে আমার কাকাদের মধ্যে ভাইদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়াব, কেউ প্রফেসার, কেউ বড়ো সরকারী চাকুরে। আর আমি হংস মধ্যে বক। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রোজগারে সবচেয়ে অধম। আমার আবার বিয়ে! আমি তো জানি, বাড়িতে ওরই মধ্যে যার রোজগার কম, যার ক্ষমতা কম তার বউয়ের কি দশা। সব সময় নিচু হ'য়ে তাকে থাকতে হয়। আর সেই তুলনায় আমার বউকে তো একেবারে ঝি হ'য়ে থাকতে হবে। তাই বিয়ে আমি করবো না এটা প্রথম বয়সেই ঠিক করে ফেলেছিলাম। দিব্যি আছি। কাকিমাদের, বউদিদের ফাইফরমায়েস খাটি। আর অবসরমতো বই-টই পড়ি। সেই অবসর কতটুকুই বা জোটে। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হয়, আর কাজকর্ম সব সেরে ফিরি রাত দশটা সাড়ে-দশটায়। তাতেও তো কোম্পানির সেক্রেটারী ম্যানেজারের মন ওঠে না। নিজের কথা ভাববারই সময় নেই তো বউয়ের ভাবনা। তবু আমার ছোটো ভাই ইঞ্জিনীয়ার অজয়ের যখন গ্রাজুয়েট আর গীতশ্রী উপাধি-পাওয়া সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো, মনটায় যে একেবারে নাড়াচাড়া লাগেনি এ-কথা হলফ করে বলতে পারবো না। অবশ্য তার বিয়ের আগে মা অনেক রাত্রে আমার ঘরে এসে আমার হাত ধরে কেঁদে পড়েছিলেন, 'আমার কথা শোন বিজু, ওর আগে তুই বিয়ে কর। তুই হলি বড়ো। তোর আগে ও বিয়ে করবে, না এ কি স্লেচ্ছপনা শুরু হয়েছে এ-সংসারে।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'স্লেচ্ছপনা হবে কেন মা, আজকাল তো এরকম হচ্ছে। তাছাড়া আমি তো সম্মতিই দিয়েছি। কোনোদিনই বিয়ে করবো না।' মা রাগ করে বলেছিলেন, 'কেন করবি নে শুনি। তোর যোগ্য মেয়ে বিয়ে কর তুই। গরিবের ঘরের অল্প লেখাপড়া জানা মেয়ে। তেমন সম্বন্ধ তো আমার হাতে আছে। বেশ, এ-বাড়িতে থাকতে তোর লজ্জা করে তুই আলাদা বাসা করে থাক। আমি তোর কাছে বছরে ছ-মাস গিয়ে থাকবো।'

বলেছিলাম, 'তার কি দরকার মা, তার চেয়ে আমি তোমার কাছে সারা-বছর থাকবো সেই ভালো।'

অল্প মাইনেয় আলাদা বাসা করে স্ত্রী আর বেশি ছেলেপুলে নিয়ে কি দুর্দশায় ভুগতে হয় তা আমি বিনোদ দাসের বাসায় গিয়ে একবার দেখেছিলাম।

তার চেয়ে বেশ আছি। মাস অন্তে যা পাই হাত-খরচটা রেখে মা-র হাতে সব ধরে দিই। আর-কোনো ঝামেলা-ঝক্কি নেই।

তারপর সেই মা-ও একদিন গেলেন। আমি বাঁচলুম। আর বিয়ের তাগিদ শুনতে হয় না। কাকারা যাঁরা আছেন সবাই যুক্তিমার্গী মানুষ। আমার যুক্তির পথে কেউ বাধা দিতে আসেন না। তাঁদের সময়ই বা কই, বছরে কতটুকুই বা তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, মাদ্রাজে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। কলকাতায়ও কেউ কেউ আলাদা বাড়ি-গাড়ি করেছেন। যাঁরা তা পারেননি তাঁরাই শুধু পৈতৃক বাড়ি আগলে পড়ে আছেন।

আর আছি আমি। বেশ আছি। এতদিন বাদে ছাদের ওপর একখানা ঘর পেয়েছি! একজোড়া টেবিল-চেয়ার আর একটি বইয়ের র‍্যাক। ইংরেজি বিদ্যে তত নেই, আপনাদের ওই বাংলা গল্প-উপন্যাসই পড়ি। সব যে বুঝি, সব যে ভালো লাগে তা নয়, তবু পাতা উলটে যাই। পড়তে-পড়তে যেদিন বড্ডো ঘুম পায় বই বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ি। আর যে-রাত্রে একেবারেই ঘুম আসে না জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। গরাদের ফাঁক দিয়ে কখনো বা চাঁদ দেখা যায়, কখনো বা দুটি-একটি তারা। ভাবি, একজন মানুষের পক্ষে এই তো যথেষ্ট, এর চেয়ে বেশি আর কি দরকার।

কোনো দরকারই ছিলো না। তবু একদিন—মানে বছর তিনেক আগে সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। নতুন কলম কিনতে এসেছে। সেই সঙ্গে পুরনো কলমটাও নিয়ে এসেছে রিপেয়ার করাবার জন্যে। আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কলম বাছতে বাছতে দাম জিগ্যেস করতে-কবতে ও হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকায়, 'আরে, বিজু না, তুমি যে এখানে!'

হেসে বললাম, 'আমি এখানে না থাকলে তুমি কলম কিনতে কার কাছ থেকে!'

সুমিতা হেসে বললো, 'তা বটে। রাজসাহীর কথা তোমার মনে আছে?'

রাজসাহীতে সুমিতার বাবা ছিলেন সিভিলসার্জন, আর আমার বাবা সাবজজ। বাড়ি ছিলো পাশাপাশি। দুই পরিবারের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো। তখন সুমিতার বয়স দশ আর আমার বারো। আমি ওকে উঁচু ডাল থেকে কাঁচা পেয়ারা পেড়ে দিতাম, আর ও আমাকে আচার, জেলি আর নিষিদ্ধ বই জোগাতো। ওর সঙ্গে আমারই ভাব ছিলো সবচেয়ে বেশি। আমার দাদারা এ নিয়ে আমাকে হিংসে করতেন। তারপরও বড়ো হয়ে সুমিতার সঙ্গে দু-একবার এই কলকাতাতেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু ও তখন কলেজে-পড়া রূপসী, বিদুষী মেয়ে। ক্লাসের ছাত্ররা থেকে আরম্ভ করে তরুণ প্রফেসররা পর্যন্ত ওর অনুরক্ত, আর আমি পাড়ার আকাটমূর্খ বকাটে ছোকরা। আমি কেন ওর কাছে পাত্তা পাবো। পাত্তা পাওয়ার জন্যে আমার যে আগ্রহ ছিলো তাও না। শুধু চাল-চলনে, আচার-আচরণে নয়, মনের দিক থেকেও আমি নিচের সিঁড়িতে নেমে এসেছিলাম।

আশ্চর্য, এতদিন বাদে সত্যিই তাহলে ও আমাকে চিনতে পারলো। চিনতে যখন পেরেছে আমিই বা অকৃতজ্ঞ হবো কেন, আমিও আগের পরিচয় স্বীকার করলাম। যত বেশি পারা যায় কমিশন বাদ দিয়ে দাম নিলাম ওর কাছ থেকে। স্টকে যা ছিল তার মধ্যে বেছে সবচেয়ে ভালো কলমটাই দিলাম। এক কৌটো কালি এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এর দাম লাগবে না', মানে দামটা আমি নিজের পকেট থেকে দিলাম! পুরনো কলমটা ও রেখে গেলো মেরামত করাবার জন্যে। বললাম, 'দিন দুই পরে এসে নিয়ে যেয়ো।'

দ্বিতীয় দিনে কলমের খবর নেওয়ার জন্যে সুমিতা আমাকে কলেজ থেকে ফোন করলো, 'দ্যাখো, আমি গিয়ে উঠতে পারবো না। বড্ডো কাজের চাপ। তুমি কলমটা আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দাও।'

বললাম, 'দিতে পারতাম। কিন্তু আমার যাঁরা মালিক তাঁরা যে ছুটি দেবেন না। আমারই বা সময়

কই।'

ফোনের ভিতর দিয়ে হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, 'বুঝতে পেরেছি। তাহলে, যেদিন ছুটি আছে সেইদিনই এসো। রবিবার সকালে। অবিশ্যি এসো, একসঙ্গে বসে চা খাবো।'

কলমটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে অগত্যা যেতেই হলো। সত্যেন দত্ত রোডের ওপর বিরাট তেতলা বাড়ি। আমি এসেছি শুনে ও একতলার ঘরে নেমে এলো। বড়ো বসবার ঘরখানায় ওর ব্যারিস্টার দাদাব মক্কেলরা ভিড় করে রয়েছেন। ও আমাকে সেই ভিড়েব ভিতর থেকে তুলে পাশের ছোট্টো আর-একখানা ঘরে নিয়ে এলো। সে-ঘর থেকে সবুজ ঘাসেব লন দেখা যায়। চোখে পড়ে নির্গন্ধ মবসুমী ফুলের টব। মাঝখানে ছোটো একটি টেবিল' তার দু-দিকে দু-জনে মুখোমুখি বসলাম।

সুমিতা প্রথমেই বললো, 'সত্যিই খুব ভালো কলম তোমার। কি চমৎকার লেখা পডছে দেখবে?'

বললাম, 'কই দেখি।'

সুমিতা চাকরকে ডেকে ওপব থেকে একটা লম্বা-মতো খাতা আনিয়ে নিলো। তাবপব পাতা খুলে আমাকে দেখালো। ছোটো-ছোটো ইংরেজি অক্ষরে পাতা ভরতি।

সুমিতা হেসে বললো, 'থিসিস তৈরি করছি।'

কী সাবজেক্টে তা আমিও জিগ্যেস করলাম না, সুমিতাও বললে না।

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, ফ্লো তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। কি মজার কাণ্ড দ্যাখো। আমবা দু-জনেই কলমের কারবারী। যত অমিলই থাকুক, এই মিলটুকু আমাদের মধ্যে আছে।'

সুমিতা একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেলো। তারপর খাতাটা ফেরত পাঠিয়ে চায়ের সেট আনতে হুকুম দিলো। নিজেই চা করলো, চা ঢাললো কাপে।

দু-জনে দু-জনের পরিবাবের আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নিলাম।

তাবপব আমি বললাম, 'তোমার স্বামীব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না তো?'

সুমিতা বললো, 'স্বামী কোথায় যে আলাপ করিয়ে দেবো! তোমার খবব কি? তোমাব ছেলেপুলে ক'টি?'

হেসে বললাম, 'সেই মহাভারতের যুগ আব নেই। এ-যুগে ছেলেপুলে চাইলে বিয়ে করতে হয়।'

সুমিতা বললো, 'তা বটে। কিন্তু বিয়ে কেন করোনি?'

সত্যি কথাই বললাম।

জিগ্যেস করলাম, 'আর তুমি? তুমি কেন বিয়ে করলে না?'

সুমিতা একটু হাসলো, 'বব জুটলো না ব'লে।'

বুঝতে পাবলাম কথাটা এড়িয়ে গেলো সুমিতা। কথাটা আমার মতো অত সহজ নয়।

রিপেয়ার-করা কলমটা পকেট থেকে বেব করে ওর হাতে দিলাম। ও সেই কলম দিয়ে একটু লিখে বললো, 'বাঃ, একেবাবে নতুন কলমের মতো লেখা পড়ছে যে, কত খরচ পড়লো বলো।'

বললাম, 'অতি সামান্য। সে-হিসেব আর-একদিন করা যাবে। আজ উঠি।'

সেই কলম মেরামতের খরচটা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে দিনকয়েক বাদেই সুমিতা ফের একদিন আমাদের দোকানে এসে হাজিব হ'লো। আমি সেদিনও দাম নিলাম না। দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

তারপর প্রায়ই সে আসতে লাগল। আপনার মতো তাব কলমও মাঝে-মাঝে বিগড়ায়। তা ঠিক ক'রে নিতে হয়। তা ছাড়া টুকিটাকি আরো জিনিসপত্তরও সুমিতা আমাদেব দোকান থেকে কেনে। কলিগরা গা টেপাটেপি করে। কোনো মেয়ের সঙ্গে আমাব যে এত আলাপ আছে তা ওবা ধারণাও করতে পারেনি। আব এ-মেয়ে কী যে-সে মেয়ে? একেবারে রাজেন্দ্রাণী। বিনোদবাবু পর্যন্ত হাসি-ঠাট্টা করেন। বলেন, 'আপনি বুঝি এই জন্যেই বিয়ে করেননি বিজয়বাবু। তা ও-মেয়ের জন্যে এক জন্ম কেন, একান্ন জন্মও অপেক্ষা করে থাকা যায়।'

আমি জবাব দিই, 'ছি-ছি-ছি, কি যে বলেন। জানেন ওরা কত বড়োলোক! আর দেশী বিদেশী

কতগুলো ডিগ্রী ওর নামের সঙ্গে জুড়ে আছে ! আমি তো ওর চাকর হওয়ারও যোগ্য নই । আমি কলম সারাই, আর ও সেই কলমে লেখে, আমাদের মধ্যে শুধু এইটুকুই সম্পর্ক ।'

মাস ছয়েক ধ'রে এমনি দেখা-সাক্ষাৎ চললো । তারপর ও হঠাৎ একদিন এসে বলল, 'বিজু, পুরী যাবে ?'

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'পুরী ?'

সুমিতা বললো, 'হ্যাঁ, চলো না, বেড়িয়ে আসি,দাদা—বউদিরা শিলং যাচ্ছেন । ওঁদের সঙ্গে যেতে আমার ইচ্ছে নেই । পাহাড়ের চেয়ে আমার সমুদ্রই বেশি ভালো লাগে ।'

বললাম, 'কিন্তু আমি তো ছুটি পাবো না ।'

ও বললো, 'একা-একা যেতে ইচ্ছে করছে না । অন্তত দু-তিন দিনের জন্যেও যেতে পারো না ? তুমি শুধু আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে ।'

বললাম, 'তা হয়তো পারি ।'

ও আমার আপত্তি মোটেই শুনলো না । আমার গাড়িভাড়াটা ও-ই দিলো । সেকেন্ড ক্লাসের টিকিটই কাটলো দু-খানা ।

হোটেল-নির্বাচনও ওর পছন্দমতোই করতে হ'লো । সমুদ্রের ধারে দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘরই আমরা পেলাম । ঠিক তিনদিনে ফিরে আসতে পারলাম না । সপ্তাহখানেক লাগলো । ক'টা দিন খুব হৈহৈ ক'রে কাটলো । সকাল সন্ধ্যা দু-বেলা বেড়ানো, দুপুরে স্নান । মনে হলো, বয়স যেন দু-জনেরই বিশ বছর করে কমে গেছে । তারপর অনেক রাত অবধি অন্ধকারে বালির মধ্যে সমুদ্রকে সামনে রেখে ব'সে থাকা । আকাশে তারা । আমার সেই জানলার দুটি-একটি তারা নয়, অসংখ্য । অগুনতি তারা আর অগুনতি তরঙ্গের মাঝখানে ব'সে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি একদিন জিগ্যেস করলাম, 'এবার বলো, সুমিতা, কেন তুমি বিয়ে করোনি । তোমার এত রূপ, এত বিদ্যা, এত সম্পদ— । আমার মতো অভাজন তো তুমি নয় । কেন তবু তুমি বিয়ে করলে না ?'

সুমিতা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললো, 'দ্যাখো, এ-প্রশ্নের জবাবে প্রথম বয়সে একেক জনকে একেক কথা বলতাম । আজ আব একটি কথাও খুঁজে পাইনে । সব যেন মন থেকে হারিয়ে গেছে । যতটা মনে পড়ছে, কারো ভালোবাসা পেলাম না ব'লেই আমার বিয়ে করা হ'লো না ।'

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'এ-কথা কি বিশ্বাস করতে বলো ? তোমার মতো মেয়ে—'

সুমিতা বাধা দিয়ে হেসে বললো, 'যার এত রূপ, এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, তাই না ? কিন্তু জানো বিজু, ভালোবাসা রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না । যে পাবার সে ও-সব না থাকলেও পায় । যে পায় না, সে সব থাকলেও পায় না ।'

আমি চুপ করে রইলাম ।

সুমিতা বলতে লাগলো, 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না ? ভালোবাসা আসেনি । তবে অনেক সম্বন্ধ এসেছিলো । বড়ো-বড়ো সম্বন্ধ । দাদারা ভাবতেন আরো বড়ো আসুক । আমিও হয়তো তাই ভাবতাম । এমনি ভাবতে-ভাবতেই দিন চলে গেলো । আমার অবশ্য আরো ভাবনা ছিলো । নিজের কেরিয়ারের ভাবনা, কেরিয়ারের সাধনা । ভাবলাম তাতেই বেশ ডুবে থাকা যাবে । কিন্তু জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার মতো শক্তি ক'জনের থাকে ! আমার যে তা নেই, সেই জ্ঞান যখন হ'লো তখন সময় গেছে ।'

বললাম, 'সময় গেছে এ-কথা কেন বলছো সুমি, সময় হয়তো এখনো আছে ।'

সুমিতা হঠাৎ আমার হাত চেপে ধ'রে বললো, 'আছে ! সত্যিই তুমি এ-কথা বিশ্বাস করো বিজু ! একটু আগে রূপ, সম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধির কথা বলছিলে । কিন্তু ও-সব অনেক সময় অনেকের বেলায় বাধা । অন্যের কাছে বাধা, নিজের কাছেও বাধা । কিন্তু এমন ঢেউ কি নেই যা সব ভাসিয়ে নিতে পারে !'

কতক্ষণ বসে ছিলাম ঠিক নেই । হঠাৎ হোটেলের চাকরের ডাকে আমাদের চমক ভাঙলো । দেরি দেখে সে আমাদের খুঁজতে এসেছে ।

পরদিনই আমরা কলকাতায় চলে এলাম । আসার সময় সুমিতার যেমন বেশি গরজ ছিলো,

ফেরার গরজটাও তেমনি ওরই বেশি দেখলাম। আমার মনে হলো ও লজ্জা পেয়েছে, ভয় পেয়েছে। অন্ধকার সমুদ্রতীরে দ্বিতীয় রাত সুমিতা আর কাটাতে চায় না। আমিই বা কেন কাটাতে যাবো। আমারও চাকরির টান আছে।

বিজয়বাবু থামলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর ?'

বিজয়বাবু একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'তারপর আর কি। আপনাদের কার যেন একখানা উপন্যাসে পড়েছিলাম, কলকাতাও সমুদ্র, জন-সমুদ্র। কিন্তু সেই অন্ধকার নির্জন সমুদ্র থেকে এ-সমুদ্র অনেক আলাদা। এখানে আমরা কেউ অসম্ভব স্বপ্ন দেখিনে, অসম্ভব আশা করিনে। এ অতি বাস্তবের রাজ্য।'

বললাম, 'তাই নাকি !'

বিজয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এখানেও কাজের ফাঁকে, কি কাজে ফাঁকি দিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে আমরা মাঝে-মাঝে দাঁড়াই। কত লোক যায়, কত লোক আসে। কত ঢেউ ওঠে, কত ঢেউ পড়ে। কিন্তু সেদিন যে-কথা হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো তা আর ফের শুরু করা হয় না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন হয় না ?'

বিজয়বাবু বললেন, 'কি করে হবে ! বয়স হয়েছে, বুদ্ধি বেড়েছে, চুলে পাক ধরেছে যে। এখন হঠাৎ কিছু করা তো ভালো কল্পনা করবারও সাহস নেই। এতকাল আইবুড়ো থেকে সুমিতার মতো মেয়ে কি সাধারণ একজন সেলস্‌ম্যানকে বিয়ে করতে পারে ! লোকে ছি-ছি করবে যে। আর আমি স্বামী হতে পারলাম না সেই দুঃখে কেন এক অধ্যাপিকার বেয়ারা হয়ে থাকবো। হলোই বা সে যশস্বিনী। আমার অন্তরাত্মা যে অনুক্ষণ ধিক্কার দেবে। তার চেয়ে এই কলম সারাবার চাকরি অনেক ভালো।'

রেস্টুরেন্টের বয় এসে দাঁড়াতে বিজয়বাবু জোর করে চা-টোস্টের দাম চুকিয়ে দিলেন। আমাকে কিছুতেই দিতে দিলেন না।

বেরোতে গিয়েও আমরা ঠিক সঙ্গে-সঙ্গে বেরোতে পারলাম না। তখনো সমানে বৃষ্টি পড়ছিলো।

ভাদ্র ১৩৬১

সুহাসিনী তরল আলতা

'চাই সুহাসিনী তরল আলতা, চাই সুহাসিনী তরল আলতা—'

ছুটির দিনে বিকেলে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম, হকার এসে জানলার ধারে দাঁড়াল, 'আলতা নেবেন বাবু ?'

আমি একটু বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

হকার নাছোড়বান্দা। জানলার শিক শক্ত করে ধরে হকার নরম অনুনয়ের সুরে বলল, 'এক শিশি আলতা মা-লক্ষ্মীর জন্যে নিন না কর্তা। খুব ভালো আলতা। পায়ের হাজা ফাটা নষ্ট হয়—'

বললাম, 'আলতার গুণাগুণ আমার জানা আছে। কিন্তু এখন কোন দরকার নেই। তুমি সামনে এগিয়ে দেখ।'

লোকটি বলল, 'নিন না বাবু, বাজারের চেয়ে সস্তা দিচ্ছি। বার আনা করে শিশি। মা-লক্ষ্মী শখ করে যেদিন পরবেন দেখবেন ঠিক একেবারে পদ্মফুলটি ফুটে রয়েছে। কথায় আছে না বাবু চরণকমল। মা জননীরা যখন আলতা পরেন তখন তা বোঝা যায়। জুতো বলুন, স্যান্ডেল বলুন, আর কিছুতে তা হয় না বাবু।'

লোকটির কবিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বললাম, 'আচ্ছা দাও এক শিশি।'

'ফটিক, আলতা ফিরি করতে তুমি এই পাইকপাড়ার দিকেও আস নাকি আজকাল ?'

আমার বন্ধুর কথায় লোকটি চমকে উঠে বলল, 'কে ? কে কথা বলছেন ওখানে ?'

বললাম, 'আমার বন্ধু বিমল মুখুজ্যে। বিমল, তুমি ওকে চেন নাকি ?'

আলতাওয়ালা এতক্ষণ বিমলকে দেখেনি। যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে ইজিচেয়ারে আধ শোওয়া বিমলকে দেখবার জো ছিল না। কিন্তু সে এবার সোজা হয়ে বসতে দু'জনের চোখাচোখি হল।

ফটিক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ছোটকর্তা, আপনি এখানে ?'

বিমল বলল, 'আমি এদিকে মাঝে মাঝে আসি। তোমারও এদিকে যাতায়াত আছে দেখছি। তা তোমার আলতা কেমন চলছে ? নাম সেই সুহাসিনীই আছে, না ?'

ফটিক বলল, 'আর কেন লজ্জা দেন কর্তা ?'

বিমল এবার অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না না, লজ্জার কি আছে। আমি সেসব ভেবে ও-কথা বলিনি ফটিক। তুমি কিছু মনে করো না।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটি বের করে বিমল ফটিকের হাতে দিতে গেল। ফটিক খুশি হয়ে বলল, 'আমরা কি সিগারেট খাওয়ার মানুষ কর্তা। একটা বিড়ি থাকে তো দিন।'

বিমল বলল, 'হয়েছে হয়েছে, নাও।'

এবার আমি লোকটির দিকে তাকালাম। বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে বয়স। রোগা চেহারা, রংটা খুবই কালো। গায়ে একটা ছিটের হাফ শার্ট। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে আলতার শিশি, সাবান, স্নো, পাউডারের কৌটো। যেমন আরো পাঁচজন ফিরিওয়ালার থাকে তেমনি। লোকটির চেহারার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমার মনে হল না। কিন্তু বিমলের সঙ্গে ওর কথা বলার ভঙ্গিতে এক গোপন রহস্যের আভাস পেলাম।

আলতার দাম নিয়ে লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি। তুমি ওকে চেন নাকি ?'

বিমল বলল, 'বাঃ চিনব না কেন, ফটিক দাস আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। পার্টিশনের পরে একই সঙ্গে আমরা দেশ ছেড়েছি। এখন ও অবশ্য পাতিপুকুর কলোনীতে আছে। আর আমি কালীঘাটের মনোহরপুকুরে। তা হলেও ওর সব খবরই আমি রাখি। জানো কল্যাণ, এই সুহাসিনী তরল আলতার মধ্যে একটি গল্প আছে। আলতা তরল হলেও গল্পটি একেবারে তরল নয়।'

'কিসের গল্প বিমলবাবু ?'

ট্রেতে করে দু'কাপ চা নিয়ে রেখা ঘরে এসে ঢুকল।

বিমল বলল, 'আপনার জন্যে এক শিশি আলতা রাখলুম আমরা ; সেই গল্প। শিশির আলতা আপনার, কিন্তু শিশির গল্পটি কল্যাণের। তা আপনার শোনবার যোগ্য নয় বউদি।'

রেখা হেসে বলল, 'আপনারা যদি বলতেই পারলেন আমার শোনায় কি দোষ।'

বলে রেখা তক্তপোশের এক কোণে বসে পড়ল। বিমলকে ইতস্তত করতে দেখে আমি বললাম, 'তুমি বলে যাও। রেখা না হয় মনে মনে কানে আঙুল দিয়ে থাকবে।'

আর একটু অনুরোধ উপরোধের পর বিমল বলতে শুরু করল।

ফটিকের বাড়ি ছিল আমাদের পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরে। ওর বাবা ধোপার ব্যবসা করত। নাম লিখত সুবল ধুপী। কিন্তু ফটিক বোর্ড স্কুলে ঢুকেই নিজের পদবী পাল্‌টে লিখতে লাগল 'দাস'। বোর্ড স্কুল থেকে পাশ করে এম ই স্কুলেও ঢুকেছিল। কিন্তু বছর দুই বাদে ওর বাবা মারা যাওয়ায় ওকে পড়া ছাড়তে হ'ল। সবাই বলল, 'জাত ব্যবসা' ধরো। কিন্তু বাপের পদবীর মত বাপের পেশাও ফটিকের মনঃপূত হল না। ও ভবঘুরে হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গাঁয়ের লাগা যে গঞ্জ আছে সেখানেও মাঝে মাঝে ও থাকে। তবে ওর জীবিকার কিছু ঠিক থাকে না। কখনো দেখি লতিফ সিকদারের দর্জির দোকানে ও মেশিন চালাচ্ছে, কখনো বা শশী দত্তের মুদিখানায় নারকেল তেল ওজন করছে। ওর মতির স্থির নেই, গতির স্থির নেই, গাঁয়ে গঞ্জে সবাই ওর নিন্দে করে। শোনা যায়, ওর স্বভাবচরিত্রও বিগড়েছে।

পার্টিশনের পরে আমি যেবার সপরিবারে কলকাতায় এলাম দেখি ফটিকও আমাদের গাড়িতে উঠেছে। একা নয়, সস্ত্রীক। ওর স্ত্রীর সঙ্গে অবশ্য আমার স্ত্রীই আলাপ পরিচয় করল। তার কাছে শুনলাম, ফটিকের স্ত্রী বেশ সুন্দরী। বয়স খুব অল্প। চৌদ্দ পনেরর বেশি নয়। কি বয়সে, কি চেহারায় ফটিকের সঙ্গে ওকে মোটেই মানায়নি। আমার স্ত্রী একটি চলতি উপমার উল্লেখ করে বলল, 'বাঁদরের গলায় মুক্তার হার।'

এ ক্যাম্প সে ক্যাম্প ঘুরে ফটিক গিয়ে ঘর বাঁধল পাতিপুকুরের কলোনীতে। ওই কলোনীতে বিষ্ণুপদ মিত্র নামে আমার এক বন্ধুও থাকে। তার বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা আছে। সেই সূত্রেই ফটিকের সঙ্গে আমার ফের দেখা-সাক্ষাৎ হল। একদিন ফটিক আমাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। ছোট্ট ঘর। টিনের চাল। বাঁশের বাখারির বেড়া। মাটির ভিত, সামনে এক ফালি বারান্দা। বারান্দার নীচে ছোট উঠোন। এক পাশে বেশ গাঁদা ফুল ফুটেছে। খানিকটা দূরে একটি তুলসী গাছ। ঘোমটা টানা একটি বউ এসে সেখানে একটি মাটির দীপ জেলে দিয়ে গেল।

বারান্দায় একটি টুল পেতে বসে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আমি ফটিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। বললাম, 'যাক, তুমি এতদিনে তা'হলে সত্যিই গৃহস্থ হয়েছ ফটিক। করছ কি আজকাল। চাকরি বাকরি কিছু— ।' ফটিক হেসে বলল, 'চাকরি কোথায় পাব কর্তা, নিজেই একটা আলতা বের করেছি। ওগো, এক শিশি আলতা নিয়ে এসো দেখি। আর কর্তাকে একটু চা-টা করে দাও।'

হ্যারিকেনের আলোয় আলতার শিশিটা নেড়ে চেড়ে দেখে বললাম, 'বাঃ বেশ নামটি রেখেছ তো। সুহাসিনী তরল আলতা। সুহাসিনী নামটি কার।' ফটিক লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, 'আমার পরিবারের। সবাই এই নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। কিন্তু তামাশা করলে হবে কি কর্তা, ওর পয় আছে, আলতাটা চলেছে ভালো।'

শুনলাম আলতাটা নিজের বাড়িতেই তৈরি করে ফটিক। তার কাজে সাহায্য করে সুহাসিনী। শিশির মধ্যে আলতা ঢালে, ছিপি লাগায়, লেবেল লাগায়। আর ফটিক শহরের দোকানে দোকানে সেই আলতার শিশি পৌঁছে দিয়ে আসে। মাঝে মাঝে থলিতে ভরে নিজেও ফিরি করে বেড়ায়।

'ফটিকদা আছ নাকি,ফটিকদা— ?'

চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবক উঠোনে এসে দাঁড়াল। আলাপে বাধা পড়ায় ফটিক যেন একটু অপ্রসন্ন হ'ল। বলল, 'আছি। আমরা একটা কথায় আছি পবন।' পবন তার অপ্রসন্নতা গ্রাহ্য না করে এগিয়ে এসে বলল, 'আমিও একটা কথা বলতেই এসেছি ফটিকদা। আমাদের আলতাটা বউবাজার স্টোর্সে এ মাস থেকে পাইকারীভাবে নেবে। বলে এসেছি, পরশু বেলা দশটায় একশ শিশি ডেলিভারী দেব। আজ রাত থেকে সবাই মিলে হাত না লাগালে—'

ফটিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, পরে এসে হাত লাগাস। এখন যা ঘুরে আয়। বললাম যে, একটা কথায় আছি— ।'

পবন হেসে বলল, 'আচ্ছা, তুমি তা হলে ওঁর সঙ্গে দরকারী কথাটা সেরে নাও। আমি ততক্ষণ বউদিকে সুখবরটা দিয়ে আসি।'

আর কোনদিকে না তাকিয়ে পবন সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকল। ফটিক বলল, 'হ্যারিকেনটা ঘরে নিয়ে যাও। এখানে আর আলোর দরকার হবে না। চাঁদের আলোতেই সব দেখা যাচ্ছে, কি বলেন কর্তা ?'

ফটিক নিজেই গিয়ে দোরের সামনে হ্যারিকেনটা রেখে এল।

পবন অবশ্য বেশিক্ষণ দেরি করল না। খানিক বাদেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'আমি ঘুরে আসছি।'

ও চলে গেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেটি কে ?'

ফটিক বলল, 'পবন চক্রবর্তী। এই কলোনীতেই থাকে। দেশের ঘরদোর বিক্রি করে শ' কয়েক টাকা সঙ্গে এনেছে। কিন্তু নিজে এখনো ঘর তোলেনি, এখানে মাসী-বাড়িতে আছে। ওর ইচ্ছে আমার কারবারে অংশীদার হয়। কিন্তু আমি ওসব অংশ-টংশের মধ্যে নেই। টাকা তুমি ধার দিয়েছ। সুদ সমেত ফেরত দেব। ব্যস ফুরিয়ে গেল। কিন্তু পবন নাছোড়বান্দা। লজ্জা শরম মান

অপমান বোধ নেই। না ডাকলেও আসে।'

ডাকটা ফটিকের কাছ থেকে না এলেও অন্য কোন দিক থেকে যে আসে না তা আমার মনে হলো না। কারণ পবন বেশ স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। বেশেবাসে শৌখিনতার ছাপও দেখলাম। গায়ে তেরছি কলার পাঞ্জাবি, ঠোঁটের ওপর বাটারফ্লাই গোঁফ। ও যতক্ষণ ঘরে ছিল লজ্জাবতী সুহাসিনীর মৃদু মধুর হাসি আর কথা আমার কানে যাচ্ছিল।

আসবার সময় আমিও ফটিককে পরামর্শ দিয়ে এলাম। ভাগের কারবারে যেন সে না যায়।

ফটিক বলল, 'আমাকে শেখাতে হবে না কর্তা। আমি খুব সাবধান আছি।'

কিন্তু সাবধান থেকেও বিশেষ সুবিধে করতে পারল না ফটিক। বছর দেড়েক বাদে বিষ্ণুপদর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, মাস দুই আগে পবন সুহাসিনীকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সেদিনের ভাব-ভঙ্গি দেখে আমি এই রকমই খানিকটা আশঙ্কা করেছিলাম। বিষ্ণুপদ বলল, 'বউটা হয়ত একেবারে পালিয়ে যেত না। কিন্তু শেষের দিকে ফটিক ওকে বড়ই জ্বালাযন্ত্রণা দিত। মারধরও করত বলে শুনেছি। তাছাড়া ফটিকেরও গোড়া থেকেই দোষ ছিল। জাত ভাঁড়িয়ে ও কায়েতের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সুহাসিনী নিজের মুখেই স্বীকার করেছে।'

বললাম, 'ওসব কথা রেখে দাও। ফটিক না হয় জাতই ভাঁড়িয়েছিল। নিজের চেহারা, বয়স, বিদ্যা-বুদ্ধি তো আর ভাঁড়াতে পারেনি। গোড়াতে সুহাসিনী কি দেখে ভুলল।'

বিষ্ণুপদ বলল, 'তা বলতে পারব না। ভোলবার যখন বয়স আসে, তখন কিছু না দেখেও মেয়েরা ভোলে। তারপর ভুল ধরা পড়লে ফের ভুলতে ভোলাতে সাধ যায়।'

শুনলাম ঘর তালাবন্ধ করে ফটিক বিবাগী হয়েছে। আরো মাস কয়েক বাদে বিষ্ণুপদর সঙ্গে দেখা হতে সে নতুন খবর শোনাল। ফটিক আবার বিয়ে করে ঘরের তালা খুলেছে। এবার আর অসবর্ণা নয়, স্বজাতের একটি মেয়েকেই বিয়ে করেছে ফটিক। রানাঘাটের ক্যাম্পে আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে মরছিল সুখদা। ফটিক তাকে নিয়ে এসেছে। বয়স সাতাশ আঠাশ। সুখদার আগেও একবার বিয়ে হয়েছিল। গুটি দুই ছেলে মেয়েও হয়েছিল। কিন্তু তারা সব গেছে। ফটিকের এই অনাচারে কলোনীসুদ্ধ লোক ক্ষেপে উঠেছিল। কিন্তু সেক্রেটারী বিষ্ণুপদ মিত্র আর তার কমিটি সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করেছে! কালীঘাটে হিন্দু মিশনে গিয়ে বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে বিধবা বিবাহ করেছে ফটিক। বিষ্ণুপদ নিজে তার সাক্ষী আছে।

মাস ছয় বাদে একদিন বিষ্ণুপদর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সে বাসায় নেই। কলোনীতে দু নম্বর চেনা মানুষ ফটিক। ভাবলাম, তার একবার খবর নিয়ে যাই।

আমাকে দেখে ফটিক সাদর সংবর্ধনা জানাল, 'আসুন ছোটকর্তা, আসুন, আপনি আপনার বন্ধুর বাড়িতে আসেন যান, কিন্তু আমার এখানে ভুলেও একবার পায়ের ধুলো দেন না। শত হলেও দেশ-দেশী মানুষ। চোখের দেখা দেখতে প্রাণ তো আমারও চায় কর্তা।'

বললাম, 'সময় ছিল না ফটিক। না হলে সেদিনই আসতাম।'

ফটিক বলল, 'আমি আরো ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি ঘেন্নায়—'

বললাম, 'দূর দূর। ঘেন্নার কি আছে। তুমি তো ভালো কাজই করেছ।'

ফটিক উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আপনিই বলুন, ভালো কাজ করিনি ? যে বউ ইচ্ছা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আমি যদি তার জন্যে বিবাগী হয়ে বেড়াতাম, কি সেই কুকুরটার সঙ্গে কামড়াকামড়ি করতাম, তা কি বুদ্ধিমানের কাজ হত ! তার চেয়ে কলোনীসুদ্দু লোক জানুক, ফটিক মরদের বাচ্চা। সে এক বউ পালালে আর এক বউ ঘরে আনতে জানে। ঝড়ে যদি ঘর উড়িয়ে নিয়ে যায়, মানুষ বাঁদরের মত গাছে চড়ে থাকে না, আবার মাটিতেই সুখের ঘর বাঁধে কর্তা।'

বললাম, 'তা তো ঠিকই। তা তোমার এ বউ কাজকর্মে বেশ—'

ফটিক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'বেশ ভালো, বেশ ভালো কর্তা। আগেরটা ছিল বাবু। কেবল নিজের শাড়ি-চুড়ি, তেল-সিঁদুরের দিকে লক্ষ্য। কিন্তু এটি একেবারে পাকা গিন্নী। সংসার করতে জানে। এক সংসার করে এসেছে তো।'

বলতে বলতে প্রসঙ্গ পালটে ফেলল ফটিক। বলল, 'দেখুন বাড়িঘরের চেহারা। কি রকম

কুমড়ো ফলিয়েছে দেখুন। ওগো, বউঠাকরুণের জন্যে ভালো দেখে একটা কুমড়ো কেটে দাও তো ছোটকর্তার হাতে।'

চেয়ে দেখলাম, উঠোনের চারদিক জুড়ে কুমড়োর মাচা। তাতে ছোট-বড় কয়েকটি কুমড়ো ঝুলছে।

স্বামীর আদেশে একটি কালো বেঁটে মোটাসোটা বউ ঘোমটা টেনে দা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফটিক তার হাত থেকে দা'খানা নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমিই কেটে দিচ্ছি, তোমার নাগাল পেতে কষ্ট হবে। তুমি ছোটকর্তাকে এক গ্লাস চা করে দাও। চা করা শিখিয়ে নিয়েছি কর্তা। একদিনের বেশি সময় লাগেনি। সব পারে। ভারি বুদ্ধিমতী।'

এত প্রশংসায় লজ্জা পেয়েই বোধ হয় বউটি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোল।

একটু বাদে কুমড়ো পেড়ে নিয়ে এল ফটিক। সুখদা শাড়ির আঁচল দিয়ে গরম চায়ের গ্লাস ধরে আমার সামনে রেখে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, আগের চেয়ে ঘরদোর বেশি পরিপাটি হয়েছে ফটিকের। উঠোনটি গোবর দিয়ে নিকোন। বারান্দাটিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পাতায় ঢাকা তুলসী গাছটি আগের চেয়ে বেশি সতেজ। সুখদা ফটিককে সুখেই রেখেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বললাম, 'তোমার সেই আলতার ব্যবসা আছে নাকি ফটিক ?'

ফটিক বলল, 'আছে কর্তা। না থাকলে খাই কি। ভুলেই গিয়েছিলাম। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন। ওগো এক শিশি স্যাম্পল দাও দেখি কর্তাকে।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না না।'

ফটিক বলল, 'ভালো আলতা। নিয়ে যান কর্তা। বউঠাকরুণ পরে খুশি হবেন।'

সুখদা এক শিশি আলতা বারান্দায় নামিয়ে রেখে চলে গেল।

আমি শিশিটির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, 'সেই নামই রেখেছ দেখছি। সেই সুহাসিনী তরল আলতাই রয়ে গেছে।'

ফটিক লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল। একটু বাদে আমার দিকে ফের তাকিয়ে করুণ সুরে বলল, 'আমার দুঃখের কথা আর বলবেন না কর্তা।'

কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কি রকম ?'

ফটিক বলল, 'আমার কপালে লেখা আছে কর্তা, নিত্য তিরিশ দিন একটা নষ্ট মেয়েমানুষের নাম নিয়ে আমাকে পেটের খোরাক জোগাতে হবে। নইলে এমন হয় ? সে হারামজাদী পালিয়ে যাওয় পর আলতাটার নাম পালটে প্রথমে দিয়েছিলাম লক্ষ্মী আলতা। ঠাকুর দেবতার নাম ; কি আলতাটা চলল না। পাইকারের দোকানে সবগুলি শিশি পড়ে রইল। আবার লেবেল পাল... আমার সতীসাধ্বী বউয়ের নাম দিলাম। করলাম সুখদা আলতা। পাইকার তো কর্তা রেগেই আগুন। বলে, খেলা পেয়েছ ? জালজুয়াচুরি পেয়েছ ?'

হেসে বললাম, 'তারপর ?'

ফটিক বলল, 'তাকে তো সব কথা খুলে বলা যায় না কর্তা। কিল খেয়ে কিল হজম করলাম। কিন্তু খালি পেটে কিল কর্তা ক'দিন সয় বলুন তো ! আলতার শিশিগুলি সব যখন ফেরত দিল পাইকার, আমাকে বাধ্য হয়ে ফের সেই নষ্ট মেয়েমানুষটার নাম বসিয়ে দিতে হল। পাইকার খুশি হয়ে বলল, তোমার মালটা আবার চলছে হে। তোমার সুহাসিনী নামের পয় আছে। কাণ্ড দেখুন কর্তা, এই সতী-সাবিত্রীর দেশে পয় হল কি না—।'

আলতার শিশিটি জোর করেই আমার পকেটে ভরে দিল ফটিক। কিছুতেই দাম নিল না। কুমড়োটা হাতে নিয়ে সে আমাকে রাস্তার মোড়ে বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা সুহাসিনীরা কোথায় গেল। তুমি বোধ হয় আর খবর-টবর কিছু জানো না ?'

ফটিক বলল, 'জানব না কেন কর্তা, সব জানি, সব খবরই রাখি। বেলেঘাটার ফুলবাগান বস্তীতে আছে দু'জনে। পবন এ-ব্যবসা সে-ব্যবসা করে সব খুইয়ে শেষে একটা চামড়ার কারখানায়

ঢুকেছে। জাতে বামুন হলে হবে কি, যেমন মতি তেমন তো গতি হবে ছোটকর্তা।'

বললাম, 'তা তো ঠিকই। আলতার ব্যবসা আর করেনি, না?'

ফটিক বলল, 'ও নাকি করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুহাসিনী বাধা দিয়েছে। বলেছে, ওসব আলতা-টালতার মধ্যে আমি আর নেই। আমাদের এই কলোনীর পটল সরকার পবনের বন্ধু। তার যাতায়াত আছে সেখানে। তার কাছে একটা খবর পেলাম কর্তা।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি খবর?'

ফটিক বলল, 'সত্যিই কর্তা, পটল মানুষটি খাঁটি। তাছাড়া সে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলেছে, মা কালীর নামে দিব্যি করে বলেছে। তার কথা অবিশ্বাস করতে পারিনে কর্তা। পবন নাকি অন্য আলতা কিনে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে হারামজাদী বলেছে, আমার নামের আলতা যখন বাজারে চলছে, আমি সেই আলতাই পরব। পবন তো পায়ের জুতো হয়ে আছে কর্তা। তার কি আর অন্য কিছু করবার জো আছে?'

বাস এসে দাঁড়াল। ফটিক কুমড়োটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'কাণ্ড দেখুন কর্তা। হারামজাদী সিঁদুরের সম্পর্ক মুছে ফেলে আলতার সম্পর্কটুকু বজায় রেখেছে।'

কপালের ঘাম মুছবাব ছলে ভিজে চোখ দুটিও মুছে ফেলল ফটিক। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাসের হ্যান্ডেল ধরলাম।

গল্প শেষ করে বিমল রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেবে দেখুন, এ আলতা এখন পরবেন কি পরবেন না।'

রেখা টেবিলের ওপর থেকে চায়ের কাপ আর আলতার শিশি তুলে নিয়ে ভিতরে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'যান।'

আমরা সিগারেট ধরালাম।

আশ্বিন ১৩৬১

অঙ্গীকার

রাত একটা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সব শেষ হয়ে গেছে। কেওড়াতলার শ্মশান থেকে ফিরে এসেছেন অজয়দার আত্মীয় বন্ধু গুণগ্রাহীর দল। যতদূর জানি, তাঁর শবযাত্রায় বেশি ভিড় হয়নি। ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা তো বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর ছিল না। অমিশুক, অসামাজিক মানুষ। কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে জানতেন না, করলেও রাখতে জানতেন না। আরো এক কারণে বেশি কেউ যায়নি তাঁর শ্মশানে। অজয়দার মৃত্যু তো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, গৌরবের মৃত্যুও নয়। শিল্পী হিসাবে যে সামান্য সুনামটুকু তাঁর হয়েছিল, মৃত্যুতে তা তিনি মুছে দিয়ে গেছেন। আমার তো মনে হয় তাঁর বন্ধুর দল তাঁর জন্যে শোকসভা ডাকতে লজ্জা পাবে। তাঁর কথা কাগজে ছাপা হবে না। কারণ সে বড় কলঙ্কের কথা, অপমানের কথা। তাঁর বন্ধুরা ভাববেন সে কথা কাগজে না ওঠাই ভালো। তবু হয়ত দু'এক দিন বাদে দু'এক লাইনে বেরোবে তাঁর আত্মহত্যার খবর। আর দিল্লীতে বসে সে খবর তুমি পড়বে। বুঝতে পারছিনে পড়বার পর তোমার মনের অবস্থা কি হবে। তুমি কতটুকু দুঃখ পাবে, কতটুকুই বা স্বস্তি পাবে আমার পক্ষে তা অনুমান করা সহজ নয়।

কিন্তু তোমার মনের অবস্থার কথা আজ নাই বা ভাবলাম। এই মুহূর্তে তুমি আশা করি আরামে ঘুমোচ্ছ। কোন দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্ন তোমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। এক অভিশপ্ত রাত্রির প্রতিটি প্রহর জেগে কাটাতে হচ্ছে না, জ্বলে কাটাতে হচ্ছে না তোমাকে।

প্রথমে ডায়েরি নিয়ে বসেছিলাম। জানো তো মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখার বাতিক আমার আছে। আজও তাই লিখছিলাম। কিন্তু দু'চার লাইন লেখার পর মনে হল, দূর ছাই, নিজের মনে বসে বসে কেন মিছে বক বক করব,-তাতো প্রায় রোজই করি। তার চেয়ে তোমাকে চিঠি লিখি।

কয়েকদিন আগের একটা চিঠির জবাব পাওনা আছে তোমার। চিঠির প্যাড নেই। ডায়েরির পাতায় সেই জবাব দিচ্ছি। তাই নিজের কাছে লেখা আর তোমার কাছে লেখা এক হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। জড়াক। তুমিও যা আমিও তাই। তাই তুমি আর আমি অভিন্ন হৃদয়। মনে আছে সেই বিয়ের মন্ত্র ?

তুমি আমার স্বামী। কতদিন বাদে আজ রাত জেগে জেগে তোমাকে চিঠি লিখছি। তবু তোমার আমার কথায় ভরা এ ঠিক আগেকার দিনের দাম্পত্যপত্র নয়। এতে আছে আরো একজনের কথা। একজন পরপুরুষের প্রসঙ্গ। সে পুরুষ আজ মৃত। মৃতের সঙ্গে নাকি মানুষের কোন বিরোধ নেই। মিথ্যে কথা। মৃত্যুর সঙ্গে কি সব জ্বালা মেটে ? সব দুঃখ সব অশান্তি সব সমস্যার শেষ হয় ?

নিজের কথা লিখতে বসেছি। কিন্তু কোত্থেকে শুরু করি বলতো। প্রায় সব কথাই তো তোমার জানা। কিন্তু তুমি তার বেশিরভাগই ভুলে গেছ। অনেক কথারই মানে বোঝনি। আজ একখানা চিঠিতে যে তোমাকে সব কথা বোঝাতে পারব, বিশ্বাস করাতে পারব, আমার না আছে তেমন বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড়, না তেমন মনের জোর। তা ছাড়া, সে চেষ্টা করেই বা লাভ কি। তার চেয়ে দেখি নিজে কতটুকু বুঝেছি, নিজে কতটুকু চিনেছি নিজেকে। অন্যের চোখ দিয়ে নিজের সেই আত্মপরিচয়কে যাচাই করে নিই। নিজের মন দিয়ে অন্যের চোখকে যাচাই করি।

তুমি যে আমাকে বিয়ে করে সুখী হওনি এ কথা কিন্তু আমি মাস তিনেকের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম। মাস তিনেক কেন বোধ হয় দিন তিনেকের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে সাহস পাইনি। বাইরের কারো কাছে না, তোমার কাছে না, নিজের কাছে স্বীকার করতে সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল। ভয় আর লজ্জা। অথচ সবাই জানে তুমি আমাকে নিজে দেখে শুনে ভালোবেসে বিয়ে করেছ। আমাদের পরিবারে এ ধরনের বিয়ে এই প্রথম। এই নিয়ে আমার দাদা, বউদি, দিদি, ভগ্নীপতি আর ছোট বোনেদের মধ্যে কত ঠাট্টা তামাসাই চলেছে। তোমাদের ভবানীপুরের বাড়িতেও তাই। তখন কি জানতাম ব্যাপারটা আগাগোড়া এমন ঠাট্টাই হয়ে থাকবে ?

মনে আছে সাত বছর আগের আমাদের সেই প্রথম পরিচয়ের কথা ? পুরীর সমুদ্র তীরে সেই সূর্যোদয় ? সেদিন সূর্যের সঙ্গে তোমাকে অভিন্ন করে দেখেছিলাম। তুমি একা একা অন্যমনস্কভাবে বেড়াচ্ছিলে, ছোড়দা দূর থেকেই তোমাকে চিনতে পারল। জোর পায়ে হেঁটে গিয়ে ধরল তোমাকে। আমি কি ছোড়দার সঙ্গে হেঁটে পারি ? কিন্তু তাই বলে পিছনে পড়ে থাকবার মত মেয়েও আমি নই। প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে ধরলাম তোমাদের। ছোড়দা পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু সুপ্রিয়, আর নীলা আমার বোন।' নমস্কার বিনিময় করে আমি তোমার দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। তখনো আমি হাঁফাচ্ছিলাম। তুমি তা লক্ষ্য করে ছোড়দাকে বললে, 'দিলীপ, তুমি বড় অন্যায় করেছ, দাদার কর্তব্য করনি।'

ছোড়দা অবাক হয়ে বলল, 'কেন ?'

তুমি বললে, 'আমাকে ওখান থেকে ডাকলেই পারতে। অনর্থক ওকে ছোটালে কেন। দেখতো কি কষ্ট হচ্ছে।'

আমি লজ্জায় মরে গেলাম। সেই লজ্জা ছোড়দা আরো বাড়িয়ে দিল। হেসে বলল, 'তুমি আমাকে মিছামিছি নিন্দা করছ সুপ্রিয়। আমি তো নীলাকে অমন করে ছুটতে বলিনি। ও নিজের গরজেই ছুটে এসেছে।'

শুনে তুমি মৃদু একটু হাসলে। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'এত বাজে কথাও বলতে পার ছোড়দা। তুমি না বলে কয়ে চলে এলে আর আমি বুঝি একা একা দাঁড়িয়ে থাকব ?'

ছোড়দা হেসে বলল, 'না থেকে বুদ্ধিমতীর কাজই করেছিস।'

অতি সাধারণ ঘটনা। তুমি বোধ হয় ভুলেই গেছ। কিন্তু আমার কি রকম মনে রয়ে গেছে দেখ। আজ ভাবি বুদ্ধিমতীর কাজ নয়, ভুলই করেছিলাম সেদিন। নির্লজ্জের মত আমিই তোমার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়েছিলাম। তোমাকে ছুটে আসবার অবসর দিইনি। তার ফলে আমার ছোটা কোনদিন শেষ হয়নি। জীবন ভরে আমি যত ছুটেছি তুমি তত দূরে সরে গেছ।

সেদিন কিন্তু তুমি কাছে কাছে ছিলে, পাশে পাশে ছিলে। ছোড়দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলে। সে দৃষ্টির মুগ্ধতা বার বছরের মেয়েও বুঝতে পারে। আমি তখন আঠেরতে পড়েছি। আমার তো না বুঝতে পারার কথা নয়।

প্রথম দিন সরাসরি কথা আমাদের প্রায় হয়নি। ছোড়দার সঙ্গেই তুমি সব কথা বলছিলে। বেশির ভাগই তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের কথা। আমার তাতে কোন উৎসাহ থাকবার কথা নয়। তবু আমি উৎকর্ণ হয়েছিলাম। একটি কথাও যেন বাদ না যায়। বুঝি বা না বুঝি তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার বলবার ভঙ্গি, তোমার গলার স্বরই আমার কাছে যথেষ্ট। দাদা আর ছোড়দার আরো কত বন্ধুকে তো দেখেছি কিন্তু তোমার মত অত লম্বা, অত ফর্সা আর কেউ নয়। অমন চমৎকার করে কথা বলতে পারে না। কিন্তু মেয়ে হয়ে আমি যে নির্লজ্জ লুব্ধের মত তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি, পাছে তা তুমি দেখে ফেল, পাছে ছোড়দার তা চোখে পড়ে সেই ভয়ে আমি বার বার নিচু হয়ে সমুদ্রের ঝিনুক কুড়োচ্ছিলাম। যেন ঝিনুক কুড়োন ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই আর কোন লক্ষ্য নেই আমার। কিন্তু আর কোনদিকে দৃষ্টি না থাকলেও এটুকু দেখে নিচ্ছিলাম, তুমি কথা বলতে বলতে কি ভাবে থেমে যাচ্ছ। নীল সমুদ্র দেখার ছলে দেখে নিচ্ছ সমুদ্রতীরের তুচ্ছ এক ঝিনুক কুড়োনীকে।

রোদ উঠল। সময় হল ফেরবার। তুমি ঠিকানা দিলে তোমার চক্রতীর্থের হোটেলের, ছোড়দা দিল স্বর্গদ্বারের বাসার। যাওয়ার সময় তুমি আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমরা শুধু এতক্ষণ ধরে মিথ্যে বকবক করে মরেছি। লাভ হল আপনার।'

বললাম 'কেন ?'

তুমি বললে, 'আপনি আঁচলভরে রঙ-বেরঙের ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে চললেন আর আমরা ফিরছি খালি হাতে।'

বললাম, 'খালি হাতে ফিরবেন কেন, এগুলি নিন না।'

ছোড়দা বলল, 'নিয়ে নাও, নিয়ে নাও সুপ্রিয়। আমরা কেউ ওর মত ঝিনুক কুড়োতে পারিনে। ভালো ভালো ঝিনুকগুলি যেন নীলার আঁচলে ওঠবার জন্যেই বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকে।'

তুমি পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে রুমাল বের করলে, 'দিন।'

আমি আমার আঁচলের সব ঝিনুক তোমার রুমালে ঢেলে দিলাম।

তুমি বললে, 'একি সব দিয়ে দিলেন যে।'

হেসে বললাম, 'নিন না, আমাদের আরো আছে। রোজই তো কুড়োই।'

তখন কি জানি, অমন করে দিতে নেই। একবার চাইলেই একেবারে উজাড় করে দিতে নেই। তখন কি জানি, সব দিলেই সব পাওয়া যায় না।

এবার বোধ হয় তোমার মনে পড়েছে। মনে পড়েছে একটা মাস কি আনন্দেই না আমাদের কেটেছিল। পুরী হয়ে উঠেছিল আনন্দপুরী। বাসায় আমার মা, ছোড়দা আর আমি। আর পুরীতে তুমি একা এসেছ বেড়াতে। নাম-করা বড় হোটেলে পুরো একটা ঘর নিয়ে আছ।

দু'একদিন বাদে ছোড়দা বলল, 'একা একা কেন থাকবে, এস দুই বন্ধু এক জায়গায় থাকি।'

তুমি তাতে রাজী হলে না। তবু দিনের বেশির ভাগ সময়, রাত্রিরও অনেকখানি আমাদের সঙ্গেই তোমার কাটতে লাগল। আমরা একসঙ্গে ভুবনেশ্বরে গেলাম, কোনারকের সূর্যমন্দির দেখলাম। পথের মধ্যে একদিন বাস দুর্ঘটনায় সারাদিন আটকে রইলাম, আর একদিন পড়লাম ঝড়ে। কিন্তু কোন বিপদই বিপদ নয়, সব অ্যাডভেঞ্চার ফুলের মালা গাঁথবার জন্যে, এগুলি সূচের ফোঁড় মাত্র। তুমি আমাদের বাসায় রইলে না। ইচ্ছা করেই কিছুটা ব্যবধান রাখলে। আমার সেই ফাঁকটুকু ভরে রইল তোমার চিন্তায়, তোমার কথায়। তোমার হোটেল আর আমাদের বাসার মাঝখানের পথটুকু ভরে উঠল আমাদের পায়ের চিহ্নে।

পুরীতে যে অসম্ভবের আশা করেছিলাম কলকাতায় এসে তা যে এত তাড়াতাড়ি সার্থক হয়ে উঠবে সে কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি বললে মিছে বলা হবে। ভেবেছিলাম বই কি। শুধু রাত্রির স্বপ্নে নয়, দিবা স্বপ্নেও। ঘুঁটে কুড়োনী কি রাজরানী হবার স্বপ্ন দেখে না ?

দু'তিনবার এলে তুমি আমাদের সিমলা স্ট্রীটের বাসায়। আমার দাদা-বৌদির সঙ্গে আলাপ করলে। মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বললে, ছোড়দার সঙ্গে দাবা খেললে। তোমার অমায়িকতা দেখে সবাই মুগ্ধ। তোমার মত বড়লোকের ছেলে, তোমার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান পুরুষকে এমন অনাড়ম্বর সরল আর বিনয়ী হতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। তারপর বিয়ের প্রস্তাব করে তুমি তাঁদের আরো অবাক করে দিলে। একদিন ছাদের চিলেকোঠায় আমার হাতখানা তোমার মুঠির মধ্যে নিয়ে বললে, 'তোমার কোন আপত্তি নেই তো নীলা ?'

আপত্তি ! এ যে আমার প্রত্যাশার অতীত। বললাম, 'আমি কি তোমার যোগ্য ?' তুমি বললে, 'অযোগ্য কিসে ?'

বললাম, 'আমি তো দেখতে সুন্দরী নই।' তুমি বললে, 'আমার চোখে সুন্দর, আমি বিয়ে করছি আমার নিজে চোখে দেখে। আর পাঁচজনের চোখ কি চশমা আমার ধার করবার ইচ্ছে নেই।' বললাম 'আমি তো তেমন লেখাপড়া জানিনে।'

তুমি বললে, 'আমি তো কোন স্কুলের হেডমিস্ট্রেসকে বিয়ে করছিনে, তা ছাড়া লেখাপড়া জানাটাই সংসারে বড় জানা নয়।'

বললাম, 'তবে ?'

তুমি বললে, 'ভালোবাসতে জানাটা তার চেয়ে বড়। সবচেয়ে বড়।'

আজ তুমি নিশ্চয়ই এ সব কথা ভুলে গেছ, আজ তুমি এমন কথা নিশ্চয়ই আর স্বীকার কর না। কিন্তু সেদিন করেছিলে। তুমি অতগুলি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছ, তোমার কত ধীশক্তি, স্মৃতিশক্তি। আমি মিথ্যে কথা বলছি এমন অপবাদ তুমি নিশ্চয়ই দেবে না। আমি সেদিনের শোনা কথাগুলিই তোমাকে আজ শোনালাম। কথাগুলি শুধু তো আমি মুখস্থ করে রাখিনি হৃদয়স্থও করেছিলাম যে।

আমাদের বাড়িতেও মৃদু আপত্তি উঠল। মা আর দাদা বউদি বললেন, 'অত বড়লোক। ওদের সঙ্গে কি আমরা তাল রেখে চলতে পারব ?'

ছোড়দা বলল, 'আমরা তাল রাখব কেন ? তাল রাখবে নীলা।'

বউদি হেসে বলল, 'জগঝম্পের সঙ্গে মন্দিরার তাল।'

ছোড়দা রাগ করে বলল, 'তা হোক। বড়লোকের ঘর থেকে মেয়ে আনার সময় হিসেব করে আনবে। কিন্তু তাদের ঘরে মেয়ে দেওয়ার বেলায় অত হিসেব না করলেও চলে।'

বউদির বাপের বাড়ির অবস্থা আমাদের চেয়ে ঢের ভালো। আমাদের সংসারে এসে নিজের হাতে রান্নাবান্নার কাজ করতে হয় বলে তাঁর অসন্তুষ্টির শেষ ছিল না। এই নিয়ে ছোড়দা মাঝে মাঝে তাকে খোঁচা দিতে ছাড়ত না।

আমি জানি তোমাদের বাড়িতে শুধু আপত্তি নয়, বড় ঝড় উঠেছিল। তোমার বাবা, মা, দাদা, বউদিরা কেউ এ বিয়েতে মত দেননি। কি করে দেবেন ? জাতে যদিও আমরাও বৈদ্য কিন্তু তোমাদের মত অভিজাত তো নই। আমার বাবা ছোট আদালতে ওকালতি করতেন আর তোমার বাবা হাইকোর্টের নামকরা এ্যাডভোকেট। আমরা পুরোন ভাড়াটে বাড়িতে থাকি আর তোমরা একডালিয়া রোডে নিজেদের তেতলা বাড়ির অধিবাসী। তোমার তিন দাদার একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার, আর দুজন ইঞ্জিনীয়ার। ছোট ভাইও মাইনিং-এর ভালো ছাত্র। আর আমার দুই দাদাই সাধারণ কেরাণী। একজনের মাইনে দু'শ, আর একজনের দেড়শ। তোমার বউদিদের মধ্যে একজন এম-এ, একজন ডবল এম-এ। আর একজনের ডিগ্রীর কথা আজও জানিনে, তবে তিনি যে লন্ডন প্রবাসিনী হল্যান্ডের মেয়ে তা জানি।

কিন্তু বিদেশিনীকে ঘরে আনতেও বোধ হয় তোমাদের বাড়িতে এত আপত্তি হয়নি, যেমন হয়েছিল আমার মত স্বজাতীয়া, স্বদেশিনীর বেলায়।

কারণ শুধু আমাদের বাড়ির অবস্থাই তো নয়, আমার নিজের অবস্থাই বা কি। আমি বিদ্যায় ম্যাট্রিক পাশ, আমার গায়ের রং শ্যামলা। গুণের মধ্যে কেবল রাঁধতে বাড়তে জানি। আর বড়জোর দু'একখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গুনগুন করে গাই। তাঁরা আপত্তি না করবেন কেন ?

কিন্তু তুমি সব আপত্তি অগ্রাহ্য করলে। সকলের অসম্মতি অনিচ্ছার বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে। উদ্ধতভাবে তোমার বাবাকে বললে, 'বেশ, সেজদা যেমন তার ডাচ স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে আছে আমিও তাই থাকব। তাতে তো তোমাদের প্রেস্টিজের হানি হবে না।'

ছেলে হিসেবে তুমি তো কারো চেয়ে অযোগ্য নও! ব্যাঙ্কিং-এ তোমারও বিদেশী ডিগ্রী আছে। অল্প বয়সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অফিসার গ্রেডে মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে ঢুকেছ। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে দাম না দেবে কে।

তোমার মা শেষে হার মেনে বললেন, 'দরকার নেই বাপু তোমার আলাদা বাড়িতে উঠে। তুমি বিয়ে করে এখানেই এস। সে আর যাই হোক কানাও নয় খোঁড়াও নয়, ভিন দেশের ভিন জাতের মেয়েও নয়। আমাদের বাঙালী গেরস্থ ঘরেরই মেয়ে। আমি খুবই মানিয়ে নিতে পারব।'

তবু আমি আপত্তি করেছিলাম, 'তোমাদের বাড়ির সবারই যখন অমত—'

তুমি জবাব দিয়েছিলে, 'তাতে কিছু এসে যায় না। তোমার অমত আছে কিনা তাই বল। যদি থাকেও তাতেও আমি পিছিয়ে যাব না। তোমাকে আমি জোর করে হরণ করে নেব।'

আমি হেসে বললাম, 'আমাকে আর নতুন করে কি হরণ করবে। আমি তো হৃতা হয়েই আছি।'

বউ হয়ে ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম তোমাদের বাড়িতে। যেন এক দুরধিগম্য দুর্গে প্রবেশ করেছি। তোমার বাবা গম্ভীর মুখে আশীর্বাদ করে নিজের লাইব্রেরী ঘরে চলে গেলেন। তোমার বউদি আর বোনের দল খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন আমার মধ্যে তুমি কী দেখতে পেয়েছ। তোমার মা শুধু এসে সস্নেহে ডেকে বললেন, 'এসো মা।'

কিন্তু দুদিন পরেই দেখলাম আমি সত্যিই বেমানান হয়ে গেছি। আমি রেফ্রিজারেটরের ব্যবহার জানিনে, তোমাদের বড় পিয়ানোটার কাছে যেতে আমার ভয় হয়; তোমাদের বাগানের বিদেশী ফুলগুলির নাম মনে রাখতে পারিনে। একটা বলতে আর একটা নাম বলি। তাও উচ্চারণে ভুল হয়। আর সে কথা শুনে তোমাদের বাগানের দু'জন মালী পর্যন্ত হাসাহাসি করে। ফুলের মত এত সুন্দর, এত তৃপ্তিকর তো কিছু নেই। কিন্তু তা আমার কাছে এক বিভীষিকার বস্তু হয়ে উঠল।

পদে পদে অপদস্থ হতে লাগলাম। আমি টেবিলে বসে খেতে জানিনে। টেবল ম্যানার্সে একেবারেই অজ্ঞ। খেতে খেতে গল্প করতে হয়, হাসতে হয়, হাসাতে হয়, সাহিত্য শিল্প রাজনীতির সঙ্গে পরিচর্যাকে মিশিয়ে কি করে সুস্বাদু ককটেল তৈরি করতে হয় আমি কিছু জানিনে। আমার কথাবার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ সারা বাড়িতে অফুরন্ত হাস্যরস জোগাতে লাগল। কেউ মুখে আঁচল দিয়ে হাসে, কেউ আড়ালে গিয়ে খিলখিল করে। শুনেছি তোমার বোন অনীতার সেই হাসি দেখেই উদাসীন নিস্পৃহ হার্টস্পেশালিস্ট দিব্যেন্দু সেন তার প্রেমে পড়েছিল।

সবাই হাসলেও তোমার মুখ দিনের পর দিন গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। তা দেখে তোমার বউদি আর বোনেরা ভরসা দিয়ে বলল, 'ভেব না, ওকে আমরা ঘষেমেজে ঠিক করে নেব। তোমার নীলা হবে নীলকান্তমণি।'

কিন্তু সবাইকে এড়িয়ে আমি নিজের ঘরে আশ্রয় নিলাম। নিজেদের ঘরে। লক্ষ্য করতে লাগলাম সে ঘরে তোমার যাতায়াত কমতে লাগল। খুব বেশি রাত্রে ছাড়া তুমি সে ঘরে আস না। দিনের বেলায় আমাদের শোয়ার ঘরে ঢুকতে, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে। সারাদিন অফিসে থাক, তারপর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দাও, গল্প কর। তারপর বিছানায় আসতে না আসতেই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়। একদিন আমি ধরে ফেললাম তা ঘুম নয়, ঘুমের ভান। অবশ্য অনেক আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু তোমাকে বুঝতে দিতে সাহস ছিল না। তবু সেদিন আর না বলে পারলাম না; একটু রাগ করেই বললাম, 'আমাকে পাশে নিয়ে শুতে তোমার যদি এতই ঘেন্না, আলাদা একখানা খাটের ব্যবস্থা করলেই হয়। ঘরের মধ্যে জায়গা তো কম নেই।'

তুমি এতটা নির্লজ্জতা, এতটা অবিনয় বোধ হয় আশা করনি। তোমার মুখের ভাব দেখেই তা বুঝতে পারলাম। কিন্তু পরক্ষণেই রাগ আর বিরক্তিকে তুমি মধুর মিথ্যে, মধুর হাসিতে ঢেকে দিয়ে বললে, 'ঘৃণা করব কেন নীলা! তুমি নিজেকে এত ছোট ভাব কেন। ছোট ভেবে ভেবে মানুষ নিজেকে ছোট করে।'

আমি তোমার বুকে মুখ গুঁজে কেঁদে বললাম, 'আমি যে সত্যিই ছোট।'

তুমি সে কথার কোন প্রতিবাদ না করে বললে, 'তোমার বিরুদ্ধে অনেক নালিশ আছে।'

বললাম, 'কি নালিশ বল।'

তুমি বললে, 'তুমি বউদিদের সঙ্গে, অনীতা, অমিতাদের সঙ্গে মিশতে চাও না, তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চল, তাদের কারো কথা শোন না। এমন হলে তুমি শিখবে কি করে। আমাদের বাড়ির সঙ্গে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবে কি করে। আমার মা-ও তো লেখাপড়া বেশি জানেন না। কিন্তু কথায়-বার্তায়, আদব-কায়দায় যে কোন গ্রাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন।'

আমি বললাম, 'ওরা আমাকে মেজে-ঘষে ঝকঝকে করে তুলতে চান। কিন্তু মানুষ তো আর বাসন নয় যে, তাকে অমন করে মাজা যাবে।'

তুমি চটে উঠে বললে, 'উপমাটা তোমার মুখে ঠিকই মানিয়েছে। দুনিয়ায় বাসন মাজা ছাড়া তো আর কিছু জানো না। বাড়ির ঝি-চাকবদের সঙ্গে তোমার যত মেলামেশা, আত্মীয়তা। তোমার মনের কথা বলবার লোক কি এ বাড়িতে আব কেউ নেই?'

আমি জবাব দিলাম, 'যদি থাকবেই তা হলে ঝি-চাকরদের সঙ্গে মিশতে যাব কেন?'

আমি চাইনি তোমার মুখে মুখে তর্ক করতে। আমি জানতাম আমার মত অশিক্ষিতা নির্গুণ মেয়ের পক্ষে তা সাজে না। কিন্তু আমি না চাইলে কি হবে, আমার ভিতর থেকে যত তিক্ততা, যত রুক্ষতা সব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসত। আর তো কারো সঙ্গে তেমন কথা বলতাম না। তোমাকে সামনে পেলে তাই মুখরা হয়ে উঠতাম। তাতে তুমি আমাকে আরো অপছন্দ করতে লাগলে। তোমার ভালোবাসায় যত ঘাটতি পড়ল আমাব ভিতরের জ্বালাও তত বেড়ে চলল।

অকৃতজ্ঞ হব না। তুমি কর্তব্যের ত্রুটি করনি। তুমি আমার পড়াশুনোর ব্যবস্থা করলে। কলেজে পড়লে আই এ পরীক্ষা দিতে দু বছর লাগে। এত বেশি বয়সে আমারও কলেজে যেতে সংকোচ। তাই বাড়িতেই পড়তে লাগলাম। রীণাদি, রীতাদি, অনীতা, অমিতা তোমার মুখের দিকে চেয়ে সবাই আমাকে পাশ করাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু কারোরই মুখ রাখতে পারলাম না। যে ইংরেজীর চর্চা তোমাদের বাড়িতে সবচেয়ে বেশি, তাতেই ফেল করে বসলাম।

এক বছরের মধ্যেই তোমার বাবা-মা মারা গেলেন। দাদারা চলে গেলেন ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে। সে সব বাড়ি তাঁদের নিজেদের রোজগারে নিজেদের পছন্দমত তৈরি। তোমার তখনও তত ক্ষমতা হয়নি। নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ছোট ভাই সুশান্তের সঙ্গে তুমি এ বাড়িতেই রয়ে গেল। তোমার কাছে গোপন করব না, আমি অনেকটা স্বস্তি পেলাম। এবার আর বাড়িতে ভিড় নেই। আমার সঙ্গে মিশলে, আমার সঙ্গে কথা বললে কারো কাছে তোমাকে উপহাসের পাত্র হতে হবে না। কিন্তু বৃথাই সে আশা করেছিলাম। আমার সেই জা আর ননদের দল নিজেরা চলে গেলে কি হবে তাদের মন্তব্য আর সমালোচনা যে তোমার মনের মধ্যে গেঁথে রেখে গেছে।

একদিন বিকেলে একতলার বিশুবাবুর বাচ্চা ছেলেটাকে আদর করছিলাম, তোমার চোখে পড়ায় তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে।

একটুকাল চেয়ে চেয়ে কি দেখলে, তারপর আমাকে কাছে ডেকে বললে, 'নীলা, শোন।'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বিল্টুকে তার মার কোলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়ে তোমার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

তুমি বললে, 'ছেলেপুলে তোমার খুব ভালো লাগে তাই না?'

আমি হেসে বললাম, 'কার না লাগে?'

তুমি কিন্তু হাসলে না। গম্ভীর মুখে বললে, 'তুমি কি এক্ষুণি ছেলেপুলে চাও?'

আমি মুখ নিচু করে বললাম, 'তুমি যখন চাও না, আমি কেন চাইব।'

তুমি বললে, 'না চাইনে। যতদিন মা হওয়ার যোগ্য না হতে পার, ততদিন তোমারও চাওয়া উচিত নয়!'

আমি এবার হেসে বললাম, 'তুমি বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করছ। আমি কি বলি যে চাওয়া উচিত? আমি কি সত্যিই চেয়েছি?'

সেদিন রাত্রে তুমি আমাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলে, বললে, 'তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী নীলা, খুবই বুদ্ধিমতী।'

আমি হেসে বললাম, 'এ আর এমন বেশি বুদ্ধির কথা কি ? বিয়ের দু-এক বছরের মধ্যে ছেলেপুলে হতে দিলে একেবারেই যে জড়িয়ে পড়তে হয়, কোন কাজকর্ম করবার শক্তি থাকে না, একথা নিতান্ত নির্বোধেও বোঝে।'

তুমি বললে, 'কাজকর্ম সত্যিই তুমি তাহলে কিছু করতে চাও নীলা ?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে আর পরীক্ষা-টরীক্ষা দিতে বল না। সেবার এক সাবজেক্টে গিয়েছিল, আবার পরীক্ষা দিলে সব সাবজেক্টে যাবে।'

তুমি বললে, 'আমারই ভুল হয়েছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কিছু হয় না। পড়াশুনো নয়, অন্য কিছু শেখ। টেকনিক্যাল কিছু শিখবে ? সর্টহ্যান্ড, টাইপরাইটিং, কি নার্সিং ?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'ওসব আমাকে দিয়ে হবে না।'

তুমি বললে, 'তবে ? গানবাজনার দিকে যাবে ?'

আমি বললাম, 'গানের মত গলা কই। বাজনাও আমার আসে না।'

তুমি বললে, 'তাহলে ?'

আমি একটু ভেবে হাসতে হাসতে বললাম, 'সেদিন সুশান্তর একটা কার্টুন এঁকেছিলাম। আমি ভাবলাম ও বুঝি রাগ করবে। ও কিন্তু উল্টে তারিফ করে বলল, ছোট বউদি তুমি আর্ট স্কুলে ভর্তি হও। তোমার এমব্রয়ডারির কাজ এত ভালো, তুমি এত ভালো আলপনা দিতে পার। তোমার ড্রয়িংও চমৎকার। যত মনভোলানো বানানো কথা।'

তুমি খুশি হয়ে বললে, 'ঠিক ঠিক। সত্যিই তো। অনেক আগেই তো আমার এটা চোখে পড়া উচিত ছিল। তোমার ওদিকে একটু ন্যাক আছে।'

হঠাৎ তুমি আমার হাতখানা তুলে নিলে। আমার হাতের আঙুলগুলির দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললে, 'চাঁপার রঙ না থাকলেও চাঁপার কলির গড়ন আছে। তোমার আঙুল আর্টিস্টের আঙুল।'

এত আদর তোমার কাছ থেকে অনেক দিন পাইনি। এত মিষ্টি কথা অনেক দিন শুনিনি তোমার মুখে। আমার চোখ ফেটে জল এল। বললাম, 'অমন করে বল না। আমি অতো ভালোবাসার যোগ্য নই।'

তুমি সেদিন প্রতিবাদ করলে না। আগেকার মত বললে না—ভালোবাসার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি ? বললে না, প্রেম অযোগ্যকে যোগ্য করে, অপূর্ণকে পূর্ণতা দেয়। বেশ মনে আছে তুমি সেদিন অন্য কথা বলেছিলে, 'যোগ্যতা নিয়ে কেউ জন্মায় না নীলা ! যোগ্যতা প্রত্যেককে অর্জন করতে হয়, তার জন্যে সাধনা করতে হয়। প্রেমের কোন আলাদা মূল্য নেই। মানুষের মূল্যেই তার মূল্য। নিঃস্ব ভিখারীকে আমরা যা দিই তা প্রেম নয়, আবার ভিখারী হয়ে যা পাই, তাও প্রেম নয়, অনুকম্পা। আমি দেব কোত্থেকে যদি আমার দেওয়ার ভাণ্ডার না বাড়াতে পারি। তাই সংসারের চোখে, সমাজের চোখে নিজেকে যত মূল্যবান করতে পারব আমার প্রেম তত মূল্যবান হবে।'

এসব কথার অর্থ আমার কাছে মোটেই অস্পষ্ট ছিল না। তবু বললাম, 'সমাজের চোখে তুমি যথেষ্ট মূল্যবান। আর তোমার দামেই আমার দাম।'

তুমি জোর দিয়ে বললে, 'না, মোটেই তা নয়। অন্তত আমি সে কথা মানিনে। তোমরা শুধু স্বামীর স্ত্রী আর সন্তানের মা হবে আর কিছু হতে পারবে না, আর কিছু হতে চাইবে না—এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনে। তাকে আরো কিছু হতে হবে। এখনকার দিনে সে শুধু ঘরের নয়, সে বাইরেরও। স্বামীর নামে নয়, সন্তানের নামে নয়, নিজের নামে তার নাম, নিজের দামে তার দাম। সব দিক থেকে সে হবে স্বাবলম্বিনী। তবেই তার ভালোবাসা মর্যাদা পাবে, অবলম্বন পাবে। বায়ুভূত নিরাশ্রয় নিরবলম্ব প্রেমের কোন মানে নেই।'

তোমার কথাগুলিতে আমি যেমন উৎসাহ পেলাম, তেমনি নৈরাশ্যও বোধ করলাম। এ জন্মে

আমার ভালোবাসা অর্থহীন হয়েই রইল। নিজের মূল্য বাড়িয়ে তাকে মূল্য দিতে পারলাম না। হাহাকার এল, আক্ষেপ এল মনে। একথা আগে বললে না কেন। তাহলে তো কিছুতেই বিয়ে করতে চাইতাম না। চিরকুমারী হয়ে থাকতাম। মনে মনে বেশ বুঝতে পারলাম, পুরীর সমুদ্রপারে সেদিনের ঝিনুক কুড়ানীব কোন মূল্যই আর তোমার চোখে নেই। তুচ্ছ ছোট ছোট ঝিনুকগুলির মতই সে মূল্যহীন হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে, চুরমার হয়ে ধুলোয় মিশে গেছে। ঝিনুকের রঙে যে মোহ তোমার চোখে লেগেছিল তা ধুয়ে যেতে এক বছরের বেশি সময় লাগেনি। এমন ভাগ্য হবে যদি জানত তাহলে আঁচলভরা ঝিনুক নিয়ে সেইদিনই সেই হতভাগিনী সমুদ্রে ঝাঁপ দিত। উঠে আসত না, ফিরে আসত না। সংসারে নিজের অযোগ্যতার কথা আমি নতুন করে অনুভব করলাম। এতো শুধু আই এ ফেল করা নয়, সংসারে আরো বড় পরীক্ষায় আমি ফেল করেছি। আমার স্বামীর মনোনীতা হতে পারিনি, মনোরমা হওয়া তো দূরের কথা! কী করে পারব। আমার যে কোন যোগ্যতাই নেই। রান্নাবান্না, ঘর-সংসারের কাজ, ঝাড়াপোছা, সাজানো-গুছানো, আত্মীয়-স্বজনের সেবাযত্ন—এতকাল ধরে যা কিছু শিখেছি, যা কিছু জেনেছি তার কোন দাম নেই। তাতে আমার মূল্যও বাড়ে না, আমার প্রেমের মূল্যও বাড়ে না।

ভর্তি হলাম সরকারী আর্ট কলেজে। তুমি নিজে সঙ্গে করে ভর্তি করে দিয়ে এলে। দেখলাম শুধু ছেলেরাই না, আমার মত অনেক মেয়েও এসেছে ছবি আঁকা শিখতে। তবে দু-একজন ছাড়া কেউ সিঁথিতে সিঁদুর পরে আসেনি। আমার মত এক পরীক্ষায় ফেল করে আর এক পরীক্ষার পড়া পড়তে আসেনি। তাদের মনে কত উৎসাহ, কত উদ্যম, কত আকাঙ্ক্ষা, কত স্বপ্ন। আর আমার মনে কেবল ভয়, 'আমি কি পারব? আমি কি পারব?'

প্রথম প্রথম আমার শিল্পচর্চায় তোমার খুব উৎসাহ দেখা গেল। বইপত্র কিনে দিলে, তুলি আর রঙ উজাড় করে আনলে। তারপর দক্ষিণ খোলা সবচেয়ে ভালো ঘরখানা ছেড়ে দিলে আমার স্টুডিওর জন্যে। জানালায় দরজায় রঙীন পর্দা ঝুলল, দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবির প্রিন্টগুলি দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙানো হল দেয়ালে দেয়ালে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একটি সাধারণ ছাত্রীর জন্যে যে স্টুডিও তুমি সাজিয়ে দিলে কলকাতার খুব কম আর্টিস্টেরই তেমন স্টুডিও আছে।

কিন্তু ঘর তুমি শুধু সাজিয়েই দিলে, সে ঘরে নিজে এলে না। সারাদিন তোমার অফিসের কাজে কাটে, সন্ধ্যার পর কাটে ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে। সে দলে শুধু বন্ধুরাই নয়, বিদুষী বান্ধবীরাও দু-একজন থাকেন। তাঁদের সঙ্গে যদিও তোমার শুধু বন্ধুত্বেরই সম্পর্ক তবু আমি ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে মরতাম। তোমাকেও কম জ্বালাতাম না। এসব নিয়ে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেছি, ইতর ভাষায় ঝগড়া করেছি। আজ সে জন্যে লজ্জা পাই, ক্ষমা চাই তোমার কাছে।

তোমাকে আমি যত আঁকড়ে ধরতে চাইলাম, তুমি তত বিরক্ত হতে লাগলে, তোমার বিরূপতা তত বাড়তে লাগল। বাইরে থেকে আমি যত বাঁধতে চেষ্টা করলাম ভিতর থেকে তোমার বাঁধন তত আলগা হতে লাগল। আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। ছুটির দিন। তোমারও ছুটি, আমারও ছুটি। কিন্তু তুমি কি একটা কাজের অছিলায় বেরিয়ে গেলে। সারা দিনের মধ্যে আর ফিরলে না। আমার ইচ্ছা হ'তে লাগল তোমার সাজানো ওই স্টুডিওতে আগুন ধরিয়ে দিই, ভেঙে চুরে সব ছারখার করে ফেলি। কিন্তু কিছুই করলাম না। শুধু নিজেই জ্বলে পুড়ে খাক হতে লাগলাম।

তুমি এলে রাত এগারোটায়। কী উল্লাস কী উৎসাহ তুমি সঙ্গে এনেছ। চেষ্টা করেও তুমি তা গোপন করতে পারলে না। কিন্তু আমার দিকে চেয়ে তুমি একটু যেন কুণ্ঠিত হলে, লজ্জিত হলে, দুঃখিতও হলে। আমার কাছে এসে অনুতপ্ত সুরে বললে, 'নীলা, আমাকে ক্ষমা কোরো? সত্যি, তোমার আজ ভারি কষ্ট হয়েছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম তোমার তো সামনেই পরীক্ষা তুমি বোধ হয় তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।'

আমি জ্বলে উঠে বললাম, 'থাক থাক তোমাকে আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। খবরদার কাছে এসো না, ছুঁয়ো না আমাকে।' কিন্তু তুমি সে নিষেধ মানলে না। আমাকে আদর করবার জন্যে এগিয়ে এলে। আমার মাথায়ও খুন চেপে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে তোমাকে ঠেলে

ফেললাম। তুমি টাল সামলাতে না পেরে দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়লে।

চেঁচামেচি শুনে সুশান্ত ছুটে এল পাশের ঘর থেকে। ব্যাপারটা বুঝতে তার এক মুহূর্তও দেরি হল না। সে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন তিরস্কারের সুরে বলল, 'ছিঃ বউদি, মেয়েছেলে হয়ে তুমি এমন কাণ্ড করতে পার তা আমার ধারণা ছিল না। এর চেয়ে তোমরা আলাদা বাড়িতে, আলাদা হয়ে থাক না কেন। ছিঃ।'

তুমি সুশান্তকে বললে, 'তুই যা এখান থেকে।'

ব্যাপারটা সবাই জেনে গেল। ঝি, চাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার কারো কাছেই কিছু গোপন রইল না। আমি লজ্জায় মরে রইলাম। ভাবলাম এর পরে কি করে মুখ দেখাব। আরো অনেক রাত্রে তোমার কাছে গিয়ে বললাম, 'আমাকে ক্ষমা কর। দেখি কোথায় লেগেছে।'

তুমি পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে, 'থাক, যেখানে লেগেছে সে জায়গা চোখে দেখা যায় না।'

সবই বুঝতে পারলাম (আঘাতটা শুধু তোমার মাথায় নয় পৌরুষে লেগেছে। কিন্তু এমন অদৃশ্য আঘাত তুমি কি হাজারবার আমার নারীত্বকে করনি ?) কিন্তু আমি সে তুলনার কথা বললাম না। আমি বার বার ক্ষমা চাইলাম, তোমার পায়ের ওপর আমার ভিজে মুখ রাখলাম, তুমি পাশ ফিরলে, ফিরে তাকালে না।

আলাদা ঘরে না গেলেও আলাদা খাটের ব্যবস্থা হল। আমাদের দুজনের সম্মতি রইল তাতে। একদিন শেষ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে তুমি নিজে থেকেই সন্ধি করতে এলে, 'এসো নীলা উঠে এসো।'

আমি বললাম, 'না।'

তুমি বললে, 'না কেন।'

আমি বললাম, 'দিনের বেলায় তুমি একবার আমাকে ভুলেও ডেকে জিজ্ঞেস করো না। আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার লজ্জা, আমাকে ছুঁয়ে দেখতেও বোধ হয় তোমার ঘেন্না করে। রাত্রের অন্ধকারে সেই লজ্জা আর ঘেন্না তোমার ঢাকা পড়তে পারে, আমার ঢাকে না। তুমি যাও এখান থেকে।'

তুমি স্তব্ধ হয়ে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলে। আমার আশঙ্কা হতে লাগল, তুমি এই অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না। হিংস্র জন্তুর মত তুমি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে। তোমার হাতের সেই শাস্তির জন্যে, মৃত্যুর জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু তুমি একটি শব্দ পর্যন্ত করলে না। আস্তে আস্তে চলে গেলে নিজের বিছানায়। আমার বহুবার ইচ্ছা করতে লাগল নিজেই উঠে যাই তোমার কাছে। কিন্তু কিসের একটা জেদ অতিকায় পেরেকের মত আমাকে খাটের সঙ্গে বিঁধে রাখল। মনে মনে ভাবলাম, ঢের ছুটেছি, আর কত ছুটব।

বাইরের শোভনতা শালীনতার একটুও ত্রুটি হল না। স্বজন বন্ধুদের সামনে আমরা তেমনি হাসিমুখে বেরোলাম, তাদের চায়ে ডাকলাম, বিবাহ বার্ষিকীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালাম। এ অভিনয়ে তোমারও আনন্দ, আমারও আনন্দ। আমরা যেন নিজেদের ঠকাচ্ছি না, শুধু পরকেই প্রবঞ্চিত করছি।

আমার ক্লাসের দুই বন্ধু উমা আর সুমিতা একদিন আমাদের বাড়িতে এল বেড়াতে। দামী দামী আসবাবপত্র দেখে, সাজানো গুছানো বড় স্টুডিয়োটা দেখে অবাক হয়ে গেল তারা।

উমা বলল, 'ভাই নীলা, তোমার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নেই। সত্যি ভদ্রলোক তোমার কি যত্নই করেন।'

সুমিতা বলল, 'করবেন না ? ওঁদের যে প্রেমজ বিয়ে। সত্যি নীলাদি, তোমার মত এত বড় আর এত সুন্দর একটা স্টুডিও পেলে আমি রাতারাতি একজন বড় আর্টিস্ট হয়ে যেতে পারতাম।'

আমি বললাম, 'আর্টিস্ট হওয়ার আগেই যারা বড় স্টুডিও পায় তারা কিছুই হতে পারে না।'

সুমিতা বলল, 'ওরে বাবা, মানুষ না পেয়ে দুঃখ পায় আর তোমার এত পেয়েও আফসোস যায় না।'

তুমি বাড়ি ছিলে না। ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম সুশান্তর। প্রথম আলাপেই সুমিতা

মুগ্ধ। আমি মনে মনে হাসলাম। এই মুগ্ধতার পরিণাম যে কি তা আমিই জানি। ভাবলাম আগে থেকেই সুমিতাকে সাবধান করে দেব। কেউ যেন প্রেমে বিশ্বাস না করে। কেউ যেন ভালোবাসার কাছ থেকে কিছু আশা না করে। কিন্তু বলি বলি করেও কিছু বলতে পারলাম না, কখনো সাক্ষাতে কখনো অসাক্ষাতে ওদের আলাপ পরিচয় এগিয়ে চলল। সে পরিচয় বিয়েতে গিয়ে মধুর সমাপ্তি পেয়েছে তা তুমি জানো। সুমিতার ভাগ্য যে আমার মত হয়নি, বড় স্টুডিও না পেলেও স্বামী-সন্তান নিয়ে ও যে সুখের সংসার পেতেছে তার জন্যে আমি ওকে ঈর্ষা করিনে। আমার মন অত ছোট নয়। তবে তুলনাটা মনে পড়ত বইকি।

অবশ্য ওদের শুভ পরিণয়ের আগেই তোমার আমার মধ্যে অশুভ সম্পর্ক আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। তুমি দিল্লীতে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে বড় চাকরি পেলে। শুনতে পেলাম তোমার নিজের উদ্যম উদ্যোগের জন্যেই এমন হয়েছে। এতো শুভ সংবাদ। শুধু তদ্বির নয়, যোগ্যতা, কৃতিত্বও তোমার আছে বইকি! তোমার ভাষায় তোমার মূল্য অনেক বেড়ে গেল! তুমি বললে, 'আর তো মাত্র গোটা তিনেক বছর বাকি। কোর্সটা কলকাতাতেই শেষ কর।'

আমি বললাম, 'শুরু যখন করেছি, নিশ্চয়ই শেষ করব।' তুমি বুঝি ভেবেছিলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাইব। হ্যাংলার মত ছুটব তোমার পিছনে পিছনে। সেই লজ্জাহীনা অতিলোভী ঝিনুক কুড়ানীর বহুদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে, তা কি তুমি জানো না?

তুমি বললে, 'এখন একটু কষ্ট হলেও ভবিষ্যতে এতে তোমার ভালোই হবে। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই তোমাব জন্যে এ ব্যবস্থা করেছি। টাকার জন্যে ভেব না। যত টাকা লাগে আমি দেব। কলেজে যাওয়া ছাড়াও তুমি যদি আর কোন বড় আর্টিস্টের কাছে কাজ শিখতে চাও তারও ব্যবস্থা করতে পার। আর আমার মনে হয় তোমার কমার্শিয়াল আর্ট নেওয়াই উচিত ছিল। ফাইন আর্ট নিয়ে কি হবে? অর্থকরী দিকটাও তো দেখা উচিত।'

বললাম, 'ভেবে দেখি।'

তুমি চলে গেলে। দিন কয়েক এসে রইলাম মা আর দাদাদের সঙ্গে। এর আগেও মাঝে মাঝে গিয়ে থেকেছি। কিন্তু স্থির হয়ে থাকতে পারিনি। মনটা কেবলই ছটফট করছে। কেন, সে কথা আজ আর নাইবা বললাম।

তোমার সঙ্গে আমি জোর করে গেলাম না দেখে মা খুব রাগ করতে লাগলেন। বললেন, 'নিজের পায়ে তুই নিজে কুড়াল মারলি। কার সাধ্য তোর ভালো করে। ঝগড়াঝাটি কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয় না? তাই বলে কি এমন করে একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকে?'

আমি বললাম, 'সেজন্য নয় মা। ওর যে নতুন চাকরি। তা ছাড়া আমার যে কলেজ আছে।'

মা রাগ করে বললেন, 'ছাই কলেজ। ও সব আঁকিবুকি করে কি হবে তোর। যত সব ছেলেমানুষি। আর সময় নষ্ট।'

মার কথার প্রতিবাদ করবার জন্যে আমি আরো মন দিলাম কাজে। পড়ে রইলাম নিজের রঙ তুলি নিয়ে। বিবর্ণ জীবনকে যদি রঙীন করে তুলতে না পারল শিল্প আছে কি জন্যে? জীবনের শূন্যতাকে ভরে তুলবার জন্যেই তো শিল্প। এ ছাড়া আর কি মূল্য আছে তার?

কিন্তু মাকে এড়ালেও ছোড়দাকে এড়াতে পারলাম না। যে চিলেকোঠার মধ্যে তুমি আমার হাত চেপে ধরেছিলে সেই ছোট ঘরেই এখন তার আস্তানা। নিচের ঘরগুলি দাদা বউদি আর তাদের ছেলে-মেয়েরা দখল করেছে। ছোড়দা আমাকে একদিন কাছে ডেকে নিয়ে বলল, 'তোদের কি হয়েছে নীলা, আমাকে সত্যি করে বলতো।'

হেসে বললাম, 'কি আবার হবে!'

ছোড়দা বলল, 'উঁহু, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। আমি যতদিন তোদের বাড়িতে গেছি অস্বস্তি বোধ করেছি। কিসের যেন একটা দম আটকানো ভাব। সেই সুপ্রিয় আর নেই। যেন এক আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। লুকোস্‌নে, কি হয়েছে তোদের আমাকে বুঝিয়ে বল।'

আমি ধরা দিলাম না, তেমনি হাসতে লাগলাম, বললাম, 'বোঝালেই কি তুমি বুঝবে ছোড়দা।

এত বয়স হল কিছুতেই বিয়ে থা করলে না। এ সব ব্যাপার আইবুড়োদের বোধগম্য নয়।'

তারপর একদিন ছোড়দার পীড়াপীড়িতে তার সঙ্গে গেলাম একজিবিসন দেখতে। মিউজিয়ামের যে দিকটায় বছর বছর চিত্র-প্রদর্শনী হয় এ বছরও সেখানেই আয়োজন হয়েছিল। আর এই প্রদর্শনীতেই প্রথম পরিচয় হল আর্টিস্ট অজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে। পুরীর সমুদ্রের মতই আমরা আর এক সমুদ্রের সামনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। সে সমুদ্র আরো বিক্ষুব্ধ আরো উত্তাল আরও বর্ণাঢ্য। অস্থির আর অশান্ত সেই ঝড়ের সমুদ্রের মধ্যে আমি যেন নিজের মনের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ভালো লাগতে লাগল আমার।

হঠাৎ একজনের গলার শব্দে আমি পিছন ফিরে তাকালাম। কালো মত রোগাটে এক ভদ্রলোক ছোড়দার সঙ্গে কথা বলছেন। 'আরে দিলীপ যে! তুমি আবার ছবির ভক্ত হলে কবে। এ সব জায়গায় তো তোমাকে এর আগে দেখিনি।'

ছোড়দা বলল, 'আগে না দেখলেও যে এখন দেখবে না তার কোন মানে আছে নাকি? আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি হে, আমার এই বোনের পাল্লায় পড়ে আসতে হল। নীলাও তোমাব পথের পথিক হতে যাচ্ছে। এতক্ষণ আমরা তো তোমার ছবিই দেখছিলাম। বেশ হয়েছে তোমার সমুদ্রের ঝড়।'

অজয়বাবু খুশি হয়ে বললেন, 'সত্যি?' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার ভালো লাগল?'

আমি বললাম, 'খুব।'

ছোড়দা বলল, 'মজা দেখ। এতক্ষণ তোমার সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। একবারও একটা ঢেউ এসে পা ভিজিয়ে দিল না। সত্যিকারের সমুদ্র হলে কি আর কথা ছিল? এতক্ষণে গ্রাস করে ফেলত।'

অজয়বাবু হেসে বললেন, 'ওইটুকুই তো লাভ। এ সমুদ্র তোমাকে ডুবিয়ে মারে না। শুধু ডুবে মববার অভিজ্ঞতাটুকু দিয়ে দেয়। মৃত্যুর স্বাদ নিয়েও তুমি বেঁচে থাকতে পার। আর সেই স্বাদ তোমার জীবনকে সমৃদ্ধ করে।'

ছোড়দা বলল, 'দরকার নেই ভাই অত স্বাদের। তার চেয়ে একটু চা-টা খাওয়াও তাই বরং ভালো। নীলার সঙ্গে এই ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরে ঘুরে আমার পা দুটো আর নেই।'

অজয়বাবু হেসে বললেন, 'চল। চায়ের ব্যবস্থা বাইরে আছে।' তারপর আমাব দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি মনে হয়?'

আমি বললাম, 'আমি আপনার কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'তার মানে কথাগুলি আপনার পছন্দ হয়নি!'

বললাম, 'যদি কিছু মনে না করেন, অনেকটা তাই। আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট আর যন্ত্রণার কি অভাব আছে যে সে অভিজ্ঞতা আমরা আর্টের কাছে নিতে যাব?'

তিনি আমার দিকে বিস্মিত হয়ে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তাকিয়ে কি দেখলেন তারপর বললেন, 'আচ্ছা এ নিয়ে আর একদিন আলাপ করা যাবে।'

সেদিন রেস্টুরেন্টে আমরা বেশি সময় ছিলাম না। অজয়বাবু আর ছোড়দা দুইজনেরই তাড়া ছিল।

ফেরার পথে বাসে যেতে যেতে ছোড়দা হঠাৎ বলল, 'ভালো হল কি মন্দ হল কে জানে।'

আমি বললাম, 'কিসের ভালো-মন্দ ছোড়দা?'

ছোড়দা বলল, 'অজয়ের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিয়ে ভালো করলাম কি না কে জানে। আমার বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত তোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমার ভয় নেই ছোড়দা। আমার সঙ্গে কেউ আর শত্রুতা করে এঁটে উঠতে পারবে না।' মনে মনে ভাবলাম আমার ভিতরে বাইরে লোহার বর্ম আঁটা। পঞ্চশরের আর সাধ্য নেই আমার বর্ম ভেদ করে।

তোমার চিঠিপত্র মাঝে মাঝে আসে। তাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব নেই। আমি যাতে স্বাধীন

স্বাবলম্বিনী এমন কি যশস্বিনী হতে পারি তাই তোমার উদ্দেশ্য।

সেসব চিঠিতে তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথাও থাকে। কলকাতার মত দিল্লীতেও তোমার দক্ষতার পরিচয় সবাই পেতে শুরু করেছে। সহকর্মীদের মধ্যে তোমার খ্যাতি বাড়ছে, প্রতিপত্তি বাড়ছে, পদোন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তোমার। তুমি লিখতে, দরকার হলেই আমি যেন টাকা চেয়ে পাঠাই। যেন কোনরকম কার্পণ্য না করি। কার্পণ্য করব কেন! তুমি তো আমার নামে মোটা টাকার অ্যাকাউন্ট খুলে রেখে গেছ ব্যাঙ্কে। মাসে মাসে আরো টাকা দিচ্ছ সেখানে। বলতে গেলে মাইনের অর্ধেক টাকাই পাঠাচ্ছ। এদিক থেকে আমি সত্যিই তোমার অর্ধাংশভাগিনী। আমার আপত্তি করবারও কিছু নেই, অভিযোগ করবারও কিছু নেই, তবু তখন থেকেই তোমার টাকা ব্যয় করতে আমার সঙ্কোচ হত। যত পারি কম করে খরচ করতাম। তখন থেকেই মনে মনে আমার সঙ্কল্প ছিল—আমি দান নিচ্ছিনে, ঋণ নিচ্ছি। যেমন করে পারি এ ঋণ আমি শোধ করব। তাতে যদি সারা জীবন লাগে লাগুক।

অজয়বাবুর সঙ্গে আরো আলাপ হল। প্রথম প্রথম একজিবিসনেই দেখা হত। তারপর একদিন তিনি তাঁর বাড়িতে ডাকলেন। প্রথম দিন ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম বেড়াতে। শিল্পী হিসাবে তাঁর নাম আমাদের কানে পৌঁছে ছিল। যদিও তাঁর অনেক ছবিই আমাদের চোখে ভালো লাগেনি। কারণ মানে বুঝিনি। শিল্পী হিসাবে তিনি ছিলেন বামপন্থী। রাজনৈতিক অর্থে বাম নয়। বরং বামপন্থী রাজনীতিবিদরা তাঁকে বলবেন দক্ষিণ। আবার দক্ষিণীরাও পাত্তা দেবেন না! কারণ তাঁর রঙে আর রেখায় কোন দাক্ষিণ্য নেই, প্রসাদগুণও নেই। তাঁর সাধনা জীবনের প্রতিকূলে, সমাজের প্রতিকূলে, শিল্পের তরণী তিনি শান্ত স্বচ্ছ নদীর কূলে কূলে বেয়ে যাননি।

প্রথম প্রথম তাঁর এই বামাচার চোখের ওপর, মনের ওপর অত্যাচার বলে মনে হত। কিন্তু আমার মনের তখনকার অবস্থায় সেবারের ছবিগুলি আমাকে বিশেষভাবে টানল। দেখতে গেলাম কোথায় তিনি থাকেন, সেখানকার পরিবেশ কি রকম, কেমন করে সাজিয়েছেন তিনি তাঁর স্টুডিওকে।

তুমি বোধহয় ওদিকটায় কোনদিন যাওনি। বণ্ডেল রোড ছাড়িয়ে রেল লাইন পার হয়ে আরো পুবদিকে অনেকখানি হেঁটে গেলে বেদিয়াডাঙ্গা। আশেপাশে কতকগুলি বস্তি। তাঁর বাড়িটা ঠিক বস্তির মধ্যে না হলেও বস্তির মত। জীর্ণ একতলা পড়ো-পড়ো বাড়ি। খানতিনেক ঘর। সামনের ঘরটায় একটা ন্যাড়া তক্তপোষের ওপর উপুড় হয়ে বসে তিনি ছবি আঁকছিলেন। দরজার একটা পাল্লা খোলা। আমরা বিনা আমন্ত্রণেই ঘরে ঢুকলাম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পরে তাঁর ধ্যান ভাঙল। মৃদু হেসে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও তোমরা! এসো।'

ছবি-টবি সরিয়ে রেখে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা যে সত্যিই এত কষ্ট করে আসবে আমি ভাবতে পারিনি।'

ছোড়দা বলল, 'আরো স্পষ্ট করে বল না কেন আমরা যে আসি তা তুমি চাওনি।'

অজয়বাবু হার মেনে হাসতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'গ্রীনরুমের মধ্যে বাইরের দর্শকদের না নিয়ে আসাই ভালো।'

আমি বললাম, 'কিন্তু গ্রীনরুমটাই কি কম দর্শনীয়? আপনার স্টুডিও দেখতে এলাম।'

তিনি বললেন, 'তা হলে আপনাকে হতাশ হতে হবে। এই ঘরই আমার শোবার ঘর, বসবার ঘর—'

ছোড়দা পাদপূরণ করে বলল, 'এবং আঁকবার ঘর, থাকবার ঘর।'

তিনি হেসে বললেন, 'তুমি কি আজকাল কবিতা লেখ নাকি দিলীপ?'

ছোড়দা বলল, 'না আজকাল আর লিখিনে। মুখে মুখে বানাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর ওদিকের ঘরগুলিতে কারা থাকেন?'

তিনি বললেন, 'আমার বিধবা বোন আর চারটি ভাগ্নে-ভাগ্নী। চলুন তাদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

আমি একটু বিব্রত হয়ে বললাম, 'এখন থাক না। ওঁদের বিরক্ত করে লাভ কি।'

'না না বিরক্ত আবার কিসের। ও লক্ষ্মী, ও টুলু, বুলু একটু চা-টা করে দে এঁদের। কোথায় গেলি সব।'

বলতে বলতে তিনি পশ্চিম দিকের আর একটা দরজা ঠেলে ভিতরে চলে গেলেন।

আমি তাঁর ঘরের চারদিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম। দেয়ালে কোথাও কোন ছবি নেই। একপাশে একটা সস্তা দামের ইজেল দাঁড় করানো রয়েছে। চারখানা ইঁটের ওপর একটা ভাঙা স্যুটকেশ। পরে জেনেছিলাম তাঁর অবিক্রীত ছবির রাশে সেটা বোঝাই হয়ে আছে।

একটু বাদে ফিতেপেড়ে সাদাখোলের শাড়ি পরা আমারই বয়সী একটি বিধবা মেয়ে ঘরে ঢুকলেন—মৃদু হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'চলুন, ভিতরে চলুন।'

সেদিন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা আর হল না। অজয়বাবুর বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। দাঙ্গায় মারা গেছেন লক্ষ্মীদির স্বামী। চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দাদার ঘাড়ে পড়েছেন। বড় মেয়ে টুলু ম্যাট্রিক পাশ করে কনভেন্ট রোডের এক বিলাতী ওষুধের ফার্মে ঢুকেছে। রাত্রে কলেজে পড়ে। পনের ষোল বছরের একটি শান্ত কৃশাঙ্গী মেয়ে। ডেকে আলাপ করলাম। বেশ ভালো লাগল দেখতে। চোখ জুড়িয়ে গেল। মনে হল যেন নিজের সেই ফেলে আসা কৈশোরে ফিরে গেছি।

মোড়ের দোকানের তেলেভাজা সিঙ্গারার সঙ্গে অতি সস্তাদামের চা খেতে হল। কষ্ট হল খেতে। তোমাদের বাড়িতে থেকে ক'বছরের মধ্যে কবে যে-অভ্যাস একেবারে ফিরে গেছে টেরও পাইনি। রাজাকে না পেলেও অসনে বসনে একেবারে রাজরানী হয়ে বসেছি।

আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছোট ছোট। ছেঁড়া প্যান্ট আর জীর্ণ ফ্রকে কোনরকমে নগ্নতা ঢেকেছে।

এতদিন ধারণা ছিল, আমার মত দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই। স্বামীর প্রেম না পাওয়ার মত বড় দুঃখ নেই পৃথিবীতে। এখন দেখলাম দুঃখের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র স্বাদ। সব দুঃখই বিস্বাদে ভরা।

এই পরিবারটির সঙ্গে আমি আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়লাম। যেন এক নতুন দুনিয়া আমি আবিষ্কার করেছি। একটি নয়, কয়েকটি। এক একটি হৃদয় তো নয় এক একটি জগৎ। সে জগতে রসের শেষ নেই, রহস্যেরও শেষ নেই।

প্রথম প্রথম আমি কিছু খাবার, বইপত্র, কি খেলনা নিয়ে গেলে ওরা ভারি আপত্তি করত। ভারি কুণ্ঠিত হত টুলু বুলু পণ্টুর দল। কিন্তু আমি বলতাম, 'মাসীর হাত থেকে নিতে তোমাদের লজ্জা কিসের! তোমরা যদি কিছু না নাও, আমি আর কোনদিন এখানে আসব না।' তখন তারা আমাকে ঘিরে ধরত, 'আমরা নেব, আমরা নেব। তুমি এস।'

অজয়বাবুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হল। বাবু বাদ দিয়ে অজয়দা বলে ডাকতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, 'হঠাৎ অজয়দা কেন?'

আমি বললাম, 'আপনি একদিন তুমি বলে, পরদিন ভুলে গিয়ে আবার আপনি শুরু করেন। আপনার মুখে তুমিটা যাতে স্থায়ী হয় সেইজন্য।'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা।'

তারপর আমি ধরে বসলাম, 'আমাকে ছবি আঁকা শিখিয়ে দিন।'

তিনি বললেন, 'মাপ করো। জাতে বামুন হলেও গুরুপুরুতগিরি আমার আসে না। আমি নিজে কোনদিন স্কুল কলেজে ছবি আঁকা শিখিনি, ধরাবাঁধা গুরু বলে কাউকে বরণও করিনি। এদিক থেকে আমি যেমন অছাত্র, তেমনি অশিক্ষিত।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সবাই তো আর আপনার মত নয়।'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়। তুমি তোমার মত পথে চলবে। আমার কোন কিছু যদি তোমার ভালো লাগে তা হলে রঙ আপনিই লাগবে, রেখা আপনিই ফুটবে। তোমায় চেষ্টা করে কিছু নিতে হবে না।'

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, 'আপনার কাছে শিখতে চাই বলে আপনার নকল করতে চাই তা

ভাববেন না।'

তিনি হেসে বললেন, 'তা কেন ভাবব। দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে নিলে কি নকল করা হয়? চুরি করা হয়? তুমি দেশলাইর বাক্সটি চুরি করতে পার, সোনার প্রদীপটি চুরি করে নিতে পার, কিন্তু আগুনের গুণ এই, তা হাতে করে নেওয়া যায় না, অন্তরে ভরে নিয়ে যেতে হয়। আর তা যদি নিতে পার সে আগুন আমার আগুন নয়—সে আগুন তোমার আগুন। তার জ্বালাও তোমার, তার আলোও তোমার।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ঋণ স্বীকারের কি কোন দরকার নেই?'

তিনি বললেন, 'স্বীকার করলেও হয়, না করলেও হয়। ঋণ স্বীকারের একমাত্র পথ হল অঋণী হওয়া। শিল্পের সাধনা মানেই স্বকীয়তার সাধনা। সেই সাধনায় যতদিন সিদ্ধি না আসবে ততদিন ঋণ স্বীকার করলেও লোকে তোমাকে বাহাদুরী দেবে না, আর না করলে তো দুয়ো দেবেই। সাধারণ গৃহস্থকে ফাঁকি দিলেও গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়বে।'

বললাম,'স্বকীয়তার মানে কি সম্পূর্ণ নতুন কিছু করা?' তিনি বললেন,'সম্পূর্ণ নতুন মানে তো উদ্ভট কিছু। যাঁরা স্বকীয়তা সম্বন্ধে অতি সচেতন তাঁরা সেই উদ্ভট সাগরের উপকূলের মানুষ। দেখ নীলা, তুমি যে ভাষায় কথা বল সে ভাষা তোমার একার নয়, যে ভঙ্গিতে কথা বল তাও আর পাঁচজনের। ভাবের বেলায়ও সেই কথা। তবু তুমি যে আমার সামনে বসে কথা বলছ তার মধ্যে শুধু তুমিই আছ আর কেউ নেই। আমার মনে হয় মৌলিকতাও তাই। সিন্ধুতে বিন্দুর মত মৌলিকতা আছে শুধু তোমার উপলব্ধির মধ্যে। তোমার মুখের বলার মধ্যে, আমার কানের শোনার মধ্যে। আর কোথাও নেই।'

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'ঋণের কথা বলছিলে। ঋণ তো আছেই। ঋণে শুধু আকণ্ঠ নয়, আপাদমস্তক ডুবে আছি। সে ঋণ আমার সূর্যের কাছে, পৃথিবীর কাছে, বাপের কাছে, মায়ের কাছে—প্রতিটি মানুষের কাছে। সে ঋণ কার কাছে নেই? তবু শিল্পের মধ্যে আমার অঋণী হবার অহংকার। তাতে আমার অনুভূতির রঙ, উপলব্ধির রেখা। তা আমার বাসনা বেদনার প্রতিরূপ।'

তোমার কাছে স্বীকার করছি এসব আলোচনা একদিনে হয়নি। আমাদের অনেক সকাল, অনেক দুপুর, অনেক সন্ধ্যা এসব শিল্পতত্ত্বে ভরে উঠেছে। আমি বসে বসে শুনেছি, কখনো সায় দিয়েছি, কখনো প্রতিবাদ করেছি। শোনার সময় নতুন মনে হলেও পরে ভেবে দেখেছি বিশেষ কিছু নতুন নয়; বরং বেশিরভাগই পুরনো। অনেক জায়গায় ভাষা পর্যন্ত ধার করা। তবু মনে হত তাঁর বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে ব্যক্তিটি ফুটে বেরোচ্ছে, সে সম্পূর্ণ নতুন; জগতে যেন সে এই প্রথম ব্যক্তি হল, নিজেকে প্রথম ব্যক্ত করল।

আমাদের আলোচনার মাঝখানে লক্ষ্মীদি মাঝে মাঝে এসে ধমক দিতেন, 'অত যদি কথাই বল দাদা, তা হলে ছবি আঁকবে কখন? বক্তৃতা দেওয়াই যদি বড় কাজ মনে কর, একটা ইস্কুল-টিস্কুল খুলে মাস্টারী শুরু করে দাও।'

অজয়দা হেসে বলতেন, 'যত মাস্টারীই করি তোর মত হেডমিস্ট্রেস হতে পারব না। লক্ষ্মীর ধমকের বহর দেখেছ নীলা?'

ধমকটা শুধু যেন অজয়দাকেই নয়। তাঁর সঙ্গে আরো কেউ জড়িয়ে থাকত। আমি লজ্জিত হয়ে পড়তাম। কিসের একটা অস্বস্তি যেন কাঁটার মত বিঁধত।

তারপর ধমকটা শুধু লক্ষ্মীদির মুখেই সীমাবদ্ধ রইল না—তোমার দাদা-বউদির দল, আমার দাদা-বউদি, এমন কি বউদির বউদিদিদের কানে গিয়েও খবরটা পৌঁছল, অজয়দার সঙ্গে আমি বড় বেশি মেলামেশা করছি। ছোট-বড় প্রত্যেক ছবির এক্‌জিবিশনে আমাদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে, দুজনকে একসঙ্গে স্কেচ করতে দেখেছে কেউ কেউ মাঠে, ময়দানে, পার্কে, গঙ্গার ধারে। প্রথমে হাসি-পরিহাস, তারপর বন্ধু-বান্ধবদের ঠোঁটে বাঁকা বিদ্রূপ চোখে পড়ল। এমন কি আমার আগেকার বন্ধু এবং এখনকার ছোটজা সুমিতাও ঠাট্টা করতে ছাড়ল না। খবরটা তোমার কানে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। আমি অপেক্ষায় রইলাম। তুমি কিছুই লিখলে না। বরং

জানালে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। বন্ধু নির্বাচনে, সঙ্গী নির্বাচনেও আমার সেই স্বাধীনতা আছে।

একবার এসে তুমি কলকাতা থেকে ঘুরেও গেলে। আমি বললাম, 'অজয়দাকে একদিন ডাকি বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।' তুমি বললে, 'না থাক। আমার সময় হবে না।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'যাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে লোকে আমার এত দুর্নাম ছড়াচ্ছে, তাকে তুমি একবার চোখের দেখাও দেখবে না?'

তুমি বললে, 'কি হবে চোখের দেখা দেখে? তাঁর রূপগুণের বর্ণনা কানে যেটুকু শুনেছি তাই যথেষ্ট। প্রেমের দেবতা অন্ধ নয়, কানা। সে এক চোখ দিয়ে দেখে। তুমি এক চোখে যা দেখেছ, আমি দু চোখে তা দেখতে পাব না।'

আমি এগিয়ে এসে তোমার হাত জড়িয়ে ধরলাম, ব্যাকুল হয়ে বললাম, 'তুমি তা হলে ওই সব কথা সত্যিই বিশ্বাস করেছ?'

তুমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললে, 'পুরোপুরি করিনি। কিন্তু বিশ্বাস্য যদি কোনদিন হযও, তাতেও দুঃখের কিছু থাকবে না। আমি তোমাকে শুধু যে জীবিকা বেছে নেওয়ার বেলায় স্বাধীনতা দিয়েছি তাই নয়, পছন্দমত সঙ্গী তুমি খুঁজে নাও তাও চেয়েছি।'

তোমার কথাগুলি আমার বুকে সহস্রমুখ বিষাক্ত তীরের মত বিঁধল। গোড়া থেকেই তুমি তা হলে তাই চেয়েছ? শুরুতেই তোমার এই উদ্দেশ্য ছিল? আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঈর্ষায়—অন্তত অপমানে জ্বলবে। তোমার স্ত্রী অন্যের অনুরক্তা হয়েছে, তাতে তোমার পৌরুষে ঘা লাগবে। কিন্তু কোন জ্বালার চিহ্ন দেখতে পেলাম না তোমার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাষায়। শুধু আমি নিজে জ্বলতে লাগলাম, আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। আমার আর সন্দেহ রইল না, তুমি দিল্লীতে আর কোন মেয়েকে ভালোবাস। তার নাম আমি জানিনে, তার রূপ আমি দেখিনি। তবু সে আছে। আমার মনে হতে লাগল—পৃথিবীর সব মেয়েকে তুমি ভালোবাস, শুধু আমাকে ছাড়া। পৃথিবীর সব মেয়ে আমার সতীন। আমার বুঝতে বাকি রইল না, তুমি নিজে মুক্তি চাও। তুমি চাও আমি আগে অন্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে তোমার মুক্তির পথ সহজ করে দিই। সেই মুহূর্তে আমি কি চেয়েছিলাম জানো? আমার হাতের তুলি ধারালো ছোরা হোক। সেই ছোরায় দু'জনে একই সঙ্গে বিদ্ধ হয়ে মরি।

দু'দিন বাদে তুমি দিল্লীতে ফিরে গেলে। তৃতীয় দিনে আমার পরীক্ষার ফল বেরোল। ফাইনালে আমি ভালোভাবে পাশ করেছি। অন্যবারের চেয়ে অনেক ভালো রেজাল্ট হয়েছে এবার। ওয়েস্টার্ন আর্টে সেকেন্ড হয়েছি আমি। তোমাকে খবরটা টেলিগ্রাম করে জানালাম। হাজার হোক তুমিই তো খরচ দিয়ে পড়িয়েছ। সঙ্গে সঙ্গে তুমি দীর্ঘ চিঠিতে অভিনন্দন জানালে। সে প্রেমপত্র নয়, মুক্তিপত্র। তুমি লিখলে, 'আমি এই চেয়েছিলাম নীলা। ভুল করেছি বুঝতে পেরে আমি সেই ভুলের জের টেনে চলিনি। প্রাণপণে ভুল শোধরাবার চেষ্টা করেছি। তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছি যাতে স্বাধীনভাবে কিছু করতে পার তার চেষ্টা করেছি। আমি তোমাকে সংস্কার দিয়ে বাঁধিনি, আসক্তি দিয়ে বাঁধিনি। অবাঞ্ছিত সন্তান এনে তোমার চলবার পথে বাধা ঘটাইনি। তোমার সব দিক আমি খোলা রেখেছি। অবশ্য এখনো তোমার উপার্জনের ক্ষমতা হয়নি, এখনো তুমি আরো দু একটা বিষয়ে মন স্থির করতে পারোনি। যতদিন তা না পার, আমি অপেক্ষা করব—আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, তোমাকে তৈরি হতে হবে। নিজের পথ, নিজের ঘর তোমাকে বেছে নিতে হবে।'

আমি তোমার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললাম। আজ ভাবছি দলিল হিসেবে রেখে দিলেও হোত। কিন্তু কি দরকার। তুমি তো আর তোমার চিঠি অস্বীকার করবে না। তা ছাড়া ও কথা তো একবার নয়, কখনো ভাষায়, কখনো ভঙ্গিতে এই ক'বছরে তুমি বহুবার বলেছ। তোমার সে চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। আজ দিতে বসেছি।

রাত শেষ হয়ে এল। এবার শেষের ঘটনার কথা বলে আমার চিঠিও শেষ করি।

তোমার চিঠি পড়বার পর ক'দিন কেবল নিজের মধ্যে নিজে জ্বলে মরলাম, পুড়ে মরলাম।

তারপর ভাবলাম তুমি যা বলছ তাই করব। আত্মনিবেদন করব দ্বিতীয় পুরুষের কাছে। তিনি যে আমার জন্যে উৎসুক, তিনি যে আমাকে চান, তাঁর সমস্ত শিল্প আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে, আমার তো তা বুঝতে বাকি নেই। সেই চাওয়া তাঁর চোখে দেখেছি, তাঁর মুখের ভাষায় শুনেছি, তুলির টানে আমার যেসব প্রতিকৃতি তিনি এঁকেছেন, তাতেও তাঁর বাসনা বহুবর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে আর ভাবনা কি। তবে আর দ্বিধা কেন! তবু ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই যেতে পারলাম না। আমি গেলাম না দেখে তিনি এলেন। তিনি এলেন তোমার সেই নিজের হাতে সাজানো স্টুডিওতে। নিজের হাতে সাজানো। কিন্তু ভাবছি সেই হাতে হৃদয়ের স্পর্শ কতটুকু ছিল।

সুমিত্রা গেছে মনোহরপুকুর রোডে তার বাপের বাড়িতে। সুশান্ত বেরিয়েছে অফিসে।' ঝি-চাকরেরা ঘুমাচ্ছে। সেই নিরালা নিস্তব্ধ দুপুরে অজয়দা এসে উপস্থিত হলেন। এর আগে কতদিন নিমন্ত্রণ করেছি, তিনি আসেননি। বলেছি, 'আমার স্টুডিও আপনি ব্যবহার করুন না। ওটা তো পড়েই থাকে।'

তিনি হেসে বলেছেন, 'অন্যের স্টুডিওতে বসে আমি ঠিক কাজ করতে পারিনে।'

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছি, 'অত পর পর কেন ভাবেন? আমি কি আপনার কাছ থেকে কিছুই নিইনি যে আপনার নিতে অত সংকোচ?'

এতদিন আসেননি, কিন্তু সেদিন এলেন। সেদিন আর শিল্পতত্ত্ব নয়, শিল্পের আলোচনা নয়, এসে সরাসরি অভিযোগের সুরে অভিমানের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গেলে না কেন? তোমার পাশের খবর আমাকে অন্যের কাছে শুনতে হল।'

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, 'খবরটা কি এমনই শোনাবার মত?'

তিনি বললেন, 'শোনাবার মত ঠিকই। তবে হয়ত আমাকে শোনাবার মত নয়।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি যে স্তরের আর্টিস্ট, তাতে এই তুচ্ছ পাশ-ফেলের খবর আপনার কাছে কোন খবর নয়। আপনার কাছে পরীক্ষা দিলে হয়ত পাশের নম্বর পেতাম না।'

তিনি একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে জানিয়েছো?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'জবাব দিয়েছেন তিনি? কি লিখেছেন? খুশি হয়েছেন নিশ্চয়ই?'

তোমার সেই চিঠির কথাগুলি আমার মনে পড়ে গেল। আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'সে কথা আপনাকে আর একদিন বলব।'

তিনি চুপ করে বসে রইলেন। বসে বসে দেখতে লাগলেন—স্টুডিও নয়, আমাকে। যার মধ্যে তুমি কিছুই দেখতে পাওনি, কিছুই দেখতে চাওনি। তবু আমি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। একটু বাদে আমি বললাম, 'যাই, আপনার জন্যে এক কাপ চা করে নিয়ে আসি।'

তিনি আপত্তি করে বললেন, 'না না ওসব থাক।'

বললাম, 'তা হলে অন্য কিছু খাবেন?'

তিনি অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন, 'না কিচ্ছু না, কিছু না। আমি আজ চলি।'

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি কবে যাবে?'

আমি বললাম, 'আপনি যেদিন বলবেন।'

তিনি বললেন, 'আমি বলব?' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'তা হলে পরশু এসো। পরশু বিকেল।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

তিনি বললেন, 'অবশ্য এসো। তোমার সব কথা শুনব, আমার সব কথা বলব।'

আমার মনে হল, বলবার আর শোনবার কিছু বাকি নেই। দু'দিন ধরে কেবলই ভাবলাম, যাব কি যাব না, দেরি করতে করতে যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন আর বিকেল নেই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ওঁর ঘরের দিকে এগোতে লাগলাম। কিন্তু দোর পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারলাম না। হঠাৎ আমার মনে হল, অন্ধকার ঘরে যে লোকটি ভূতের মত বসে আছে, সে আর যাই হোক, আমার

ভবিষ্যৎ নয়। শুধু ভয় নয়, সংস্কার নয়, এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আমাকে পেয়ে বসল। আমার মনে হল আমি অজয়দার কথা ভালোবাসি, ছবি ভালোবাসি কিন্তু আর কিছু আমি ওঁর ভালোবাসিনে। এই রূপস্রষ্টা কিন্তু রূপহীন মানুষটি আমার মনে কোন আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেননি—যে আগুনে আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারি, ঝাঁপ দিয়ে মরতে পারি। সেই চরম মুহূর্তে সে কথা বুঝতে পেরে আমি বিমূঢ় হয়ে রইলাম।

ছুটে পালিয়ে আসতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বড়ই দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে তিনি এসে আমার হাত ধরে ফেলেছেন।

তিনি বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চল ঘরে চল।'

আমি বললাম, 'না। আমাকে ছেড়ে দিন।'

অন্ধকারে তিনি আমার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই আমার ঘৃণাকে ভাবলেন দ্বিধা, ভাবলেন লজ্জা।

তিনি বললেন, 'চল।'

ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন আমাকে।

বললাম, 'আলো জ্বালুন।'

তিনি বললেন, 'না। যে কথা এতদিন আলোর মধ্যে বলতে পারিনি, আজ অন্ধকারে বলব।'

আমি বললাম, 'আপনি বললেও আমি তা শুনতে পারব না।'

তিনি মরিয়া হয়ে বললেন, 'এতদিন তো শুনেছ, আমিও শুনেছি তোমার সব কথা। তুমি জীবনে যা পাওনি আমি জীবন ভরে তাই দেব। আমাদের দুজনের হৃদয় তাতে ভরে উঠবে। শূন্য হৃদয় নিয়ে কোন সাধনাই হয় না নীলা।'

বলতে বলতে তিনি জোর করে আমাকে বুকে চেপে ধরলেন, চুমু খেলেন ঠোঁটে।

মনে আছে এমনি অবস্থায় তোমাকে একদিন ঠেলে দেয়ালের ওপর ফেলে দিয়েছিলাম ? তাঁরও সেই গতি হল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে অতি কুৎসিত দু'টি কথা বেরিয়ে পড়ল, 'লম্পট, বদমাস !'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে আলো জ্বলল, বারান্দায় আলো জ্বলল। লক্ষ্মীদিরা পাড়ায় এক বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের আগে টুলু যে ফিরে এসে তার নিজের ঘরে ঢুকেছে তা আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি, সেই শান্ত স্নিগ্ধ কিশোরী মেয়েটি আমাদের দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। শুধু চোখ নয় তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে।

পরম ঘৃণায় টুলু বলল, 'কি হয়েছে ?'

আমি বললাম, 'কি হয়েছে তোমার মামাকে জিজ্ঞেস কর।'

তারপর ছুটে চলে এলাম বাইরে।

সেই মুহূর্তে আমি যেন তোমার দুঃখ পুরোপুরি বুঝতে পারলাম। যাকে চাই তাকে না পাওয়ার চেয়ে যাকে চাইনে তাকে পাওয়ার বিড়ম্বনা কম নয়।

সেই দিনই রাত্রে ট্রেনের তলায় পড়ে অজয়দা মারা যান। তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা একে দুর্ঘটনা বলে ঢাকতে চেষ্টা করলেও এ যে আত্মহত্যা পুলিশ তা প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রমাণ করতে পেরেওছে। আমার ঘরে তারা এসে হানা দিয়েছিল। জবানবন্দী নিয়ে গেছে আমার। জানিনে কতটুকু তার থেকে বুঝতে পেরেছে তারা।

কলঙ্কে কেলেঙ্কারিতে আমার আর মুখ দেখাবার যো রইল না। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে সে কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছি একটি কলঙ্কমলিন মৃত্যুর কথা। পৃথিবীতে কত মহৎ মৃত্যুর কথা শুনেছি, পড়েছি। দেশের জন্যে আত্মদান দশের জন্যে আত্মদান, আদর্শের জন্যে আত্মদানে মানুষের জীবন মহত্তর হয়েছে। কিন্তু এ মৃত্যু সে মৃত্যু নয় ! সব দিক থেকে এ অপমৃত্যু। এ মৃত্যু অসামাজিক, অবৈধ, অশ্লীল। অজয়দা কেন এমন মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। তোমার মত তিনিও তো কোন সংস্কার মানতেন না। তবু প্রচলিত পাপবোধের কাছে তিনি মাথা নোয়ালেন কেন ? তিনি কাকে ভয় করলেন ? কাকে দেখে লজ্জা পেলেন ? আমাকে না তাঁর সেই শ্রদ্ধাবতী ভক্তিমতী কিশোরী

ভাগ্নীটিকে ? '

অনেক কথাই আমার মনে হচ্ছে। কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে। দরকার নেই উত্তরের। এক একবার মনে হচ্ছে কালকের ঘটনা উপলক্ষ মাত্র। মৃত্যু কামনা তাঁর মনে অনেকদিন আগে থেকেই ছিল। অনেকদিন তাঁকে বলতে শুনেছি, 'পছন্দ হল না নীল, পছন্দ হল না।'

'কী পছন্দ হল না ?'

তিনি বলতেন, 'নিজেকেও না, নিজের সৃষ্টিকেও না।'

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন ?'

তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার শিল্প আর জীবনকে আলাদাভাবে দেখতে চেয়েছিলাম। সম্পূর্ণ আলাদা করে ভোগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তা হচ্ছে কই। সব যে একাকাব হয়ে যাচ্ছে।'

তারপর একটু থেমে ফের বলেছিলেন, 'নিজের অনেক ছবি যেমন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি, নিজেকেও তেমনি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে বাঁচতাম। নিজেকেও অমন করে ছিঁড়ে ফেলবার অধিকার আমার আছে। কারণ আমি তো আমার নিজেরই সৃষ্টি।'

তবু আজ সব অনাসৃষ্টির মূলে যে আমি এ কথা ভুলতে পারছিনে। আমার স্পর্শে বিষ আছে। সেই বিষের জ্বালায় তুমি দূরে সরে গেছ।

আমার ঠোঁটের বিষ আরো অমোঘ। তাতে আব একজন আরো দূরে চলে গেল।

কিন্তু শুধু বিষ নয়, আমি অমৃতও দেখেছি। দেখেছি বেদিয়াডাঙ্গার সেই ক'টি ছেলেমেয়েব মধ্যে। দেখেছি সেই কিশোরী মেয়েটির মধ্যে। আমিও একদিন তার মত ছিলাম।

এখন নয়, আরো কিছুদিন বাদে আমি ফের যাব ওদের মধ্যে। জানি প্রথমে ওরা আমাকে সহ্য করতে পারবে না। ঘৃণা করবে, তাড়িয়ে দেবে। আমি তবু যাব। বার বার যাব। নিজে রোজগাব করে যা পাব সব দেব ওদের। প্রথমে ওরা নিতে চাইবে না। তারপর আস্তে আস্তে নেবে। বলব, বলব কি জানো   বলব, 'তোমরা তোমাদের মাসীর হাত থেকে নিচ্ছ, নিতে লজ্জা কি

সব লজ্জা, সব কলঙ্ক, সব দায় আমি মাথায় করে নেব

আশ্বিন ১৩৬২

পরিচালক

রূপছায়া পিকচার্সের সঙ্গে আমার একটি বইয়ের কনট্রাকট হওয়ার প্রায এক মাস পরে হরগোপাল বিশ্বাস একদিন সকাল বেলায় আমার বাসায় এলেন। আমি তখন লিন্টন স্ট্রিটের একটি বস্তিতে থাকি। রাস্তার দিকে বাইরের ঘরটিতে বসে নতুন গল্পের তরুণী নায়িকাব রূপ কল্পনা করছি, দরজার কড়া নড়ে উঠল। গল্পটা আসি আসি করছিল, এই সময়ে বাধা পেয়ে আমি একটু বিরক্ত হলাম। উঠে গিয়ে দোর খুলে দেখি এক অপরিচিত আগন্তুক। বয়স পঞ্চান্নর কম হবে না। বরং একটু বেশিই দেখায়। পরনে সস্তা স্যুট। মাথায় একটা টুপিও আছে। হাতে সিগারেট। পোশাক থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যে একটি অপরিচ্ছন্ন ভাব। পোশাক সম্বন্ধে আমার কোন গোঁড়ামি নেই। ওটা যে জাতীয় হতেই হবে, এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনে। ধুতি, লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট আমি সবই সমর্থন করি। তবে সেই সঙ্গে স্থান কাল পাত্র ভেদটা মানি। যে কোন কারণেই হোক আমার সেদিন মনে হল এই জীর্ণ বিদেশী বেশ দেশী মানুষটিকে ঠিক মানাচ্ছে না। এর চেয়ে ধুতি পাঞ্জাবি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে একটু স্নিগ্ধতা দিত। দারিদ্র্যকে এমন প্রকট করে তুলত না। কারণ ব্রিটিশ যুগে আমাদের ধারণা রয়ে গেছে যে সাহেব মানেই বড়সাহেব, তাতো এত অল্পদিনেই যাওয়ার নয়। ওঁর হাতের সিগারেটের ধোঁয়া আমার নাকে যাচ্ছিল। তাতেও আমি প্রীত বোধ করলাম না। ভ্রূ কুঁচকে বললাম, 'কি চাই ?'

তিনি বললেন, 'গুড মর্নিং স্যার। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামই কি কল্যাণকুমার রায় ?'

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কি চাই আপনার ?'

ভদ্রলোক তাঁর কালো দাঁতগুলি বার করে একটু হেসে বললেন, 'বলছি। যাক সত্যি সত্যিই তা হলে আপনার ঠিকানা খুঁজে পেলাম। আজকের সকালে এ একটা এ্যাচিভমেন্ট বলতে হবে। মশাই, কি ঘোরাটাই ঘুরেছি আপনি ভাবতে পারবেন না। কেউ বলতে পারে না, কেউ চেনে না আপনাকে ! একটা বস্তি বাড়ির ঠিকানা খুঁজে পাওয়া কি একজন নতুন লোকের পক্ষে সোজা ? কিন্তু আমার টেনাসিটি আছে। আমি অল্পেতে দমে যাওয়ার মত লোক নই।'

আমি বললাম, 'ভিতরে এসে বসুন। আপনার পরিচয়টা তো জানা হল না।'

ভদ্রলোক রহস্য-ঘন ভঙ্গীতে একটু হাসলেন, তারপর আমার পরিত্যক্ত চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাতে নিঃসংকোচে বসে পড়ে পরম অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'আমি আপনার ডিরেক্টর।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ডিরেক্টর মানে ?'

'ডিরেক্টর মানে আপনার গল্পের ডিরেক্টর। আমার নাম হরগোপাল বিশ্বাস। আমি রূপছায়া কোম্পানিতে অনেকদিন ধরে আছি। 'দ্বিধা' গল্পটির লেখক তো আপনিই ?'

আমি বললাম, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ও গল্পটার ডিরেকসন তো অন্য কেউ দেবেন শুনেছিলাম।'

আমি বিখ্যাত ডিরেক্টরদের নাম আর ওঁর সামনে করলাম না। শত হলেও পেশাগত ঈর্ষা থাকা স্বাভাবিক।

হরগোপালবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকেই চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিস্টার সেহানবীশ আমাকেই দিলেন বইটা। আমার এই প্রথম বই। খেটে-খুটে যত্ন নিয়ে করব। আমি আরো পাঁচটা বইয়ের সঙ্গে দায়সারা কাজ করব না মশাই। মিস্টার সেহানবীশ তা বোঝেন।'

আমি খুব উৎসাহ বোধ করলাম না। তাঁরও প্রথম আমারও প্রথম। প্রথমে প্রথমে একেবারে শেষ না হয়ে যাই।

আমার মনের ভাব অনুমান করতে পেরে হরগোপালবাবু তাঁর যোগ্যতার নানারকম প্রমাণ দিতে লাগলেন। তাঁর নাম আমি না শুনতে পারি। আমার নাম ও তো তিনি এর আগে শোনেননি। তাতে কিছু এসে যায় না। মানুষের পরিচয় নামে নয় কাজে। ক্যামেরার কাজে তাঁর দক্ষতার কথা সবাই স্বীকার করে। তা ছাড়া ট্রেডের যে কোন লোক তাঁর নাম জানে। আমি একটু খোঁজ নিলেই তা টের পাব। তিনি আরো বললেন অন্য কোন ডিরেক্টর হলে অযাচিত ভাবে লেখকের সঙ্গে এ ভাবে আলাপ করতে আসতেন না। লেখকের ধারই তারা ধারতেন না।—আমার গল্প নিয়ে তাঁরা অন্য গল্প বানাতেন। কিন্তু হরগোপালবাবু তা করবেন না। সাধ্বী স্ত্রীর মতো তিনি আমার ওপর বিশ্বস্ত থাকবেন।

শেষ পর্যন্ত আমি খুশিই হলাম। স্ত্রীকে ডেকে বললাম, 'ভালো করে চা-টা কর। শুধু চা না খাবার-টাবারও আনিয়ে নাও।' ছোট ভাইকে ডেকে বললাম, 'যা ভালো দেখে সিগারেট নিয়ে আয়।'

আদর আপ্যায়ন করা দরকার। চিত্রজগতে ডিরেক্টরও যা ডিকটেটরও তাই।

খেতে খেতে ভদ্রলোক আমার গল্পটা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। বিধবা বিয়ে নিয়ে গল্প। একটি তরুণী বিধবার বালক পুত্রের সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! প্রেমের সঙ্গে বাৎসল্যের বিরোধ।

হরগোপালবাবু বললেন, 'বড় শক্ত বিষয় মশাই। লোকে কতখানি নেবে, কতখানি নেবে না বলা যায় না। প্রডিউসার তো গল্প পছন্দ করেই খালাস। তারপর যত ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয় ডিরেক্টরকে। আর এক কথা। আপনার এই আট পাতার গল্প। একে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বার হাজার ফুটে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সোজা কাজ মশাই ?'

আমি স্বীকার করলাম কাজটা সহজ নয়।

তিনি বললেন, 'আপনার সাহায্য চাই। আপনাকে ছাড়া আমি এক পাও এগোব না।'

আমি খুশি হয়ে বললাম, 'আমাকে যখন ডাকবেন তখনই যাব।'

তারপর চিত্রনাট্য রচনার কাজ শুরু হল। তিনি ও তাঁর সহকারী সুধাময় গুপ্ত আসতে লাগলেন। আমি নতুন গল্প লেখা ফেলে রেখে লেখা গল্পকে কি ভাবে টেনে বাড়ানো যায়, গল্পকে নাটক এবং নাটককে কি ভাবে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করা যায় সেই চিন্তায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলাম।

বৈঠক শুধু আমাদের বাসাতেই বসত না। প্রডিউসারের প্রাসাদে আমরা নিমন্ত্রিত হলাম। কারণ হরগোপালবাবুর সেখানেই সুবিধে, তাঁর বাসা থেকে জায়গাটা কাছে পড়ে। তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আর একটা কথা আছে, ওখানে খাওয়াটা ভালো হয়। বেশ হেভি টিফিনের ব্যবস্থা আছে।'

আমরা একসঙ্গে কাজ করতে লাগলাম। কাজ করা মানে বেশির ভাগ সময়ই ঝগড়া করা। তিনি যে বলেছিলেন আমার সঙ্গে অনুগতা স্ত্রীর মত ব্যবহার করবেন, কাজের বেলায় দেখলাম ঠিক উল্টো। অবশ্য নারী প্রকৃতিও তাই।

কোথায় তাঁর সেই বিনয়ী মূর্তি, কোথায় তাঁর সেই আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি। আমি তাঁর কোন কাজের প্রতিবাদ করলেই তিনি টেবিল চাপড়ে বলেন, 'এটা কাগজের ওপর গল্প লেখা নয় মশাই, সেলুলয়েডের উপর লেখা, এক লাখ সোয়া লাখ টাকা ব্যয়। আপনার সেন্টিমেন্টের চেয়ে আমার কাছে মাস সেন্টিমেন্ট অনেক বড়। আমাকে কমার্শিয়াল দিকটা দেখতে হবে, বক্স অফিসের কথা ভাবতে হবে। আপনার কথা মত চলে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে পারব না।'

আমি বললাম, 'মানে মারটা আমিই শুধু বসে বসে খাব?'

এমনি করে চলল প্রায় বছর খানেক। প্রডিউসার মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ান। হেসে বলেন, 'ব্যাপার কি? আপনাদের বনিবনাও হচ্ছে না বুঝি?' হরগোপালবাবু আমাকে চোখের ইশারা করেন। আমি অমনি চেপে যাই, মৃদু হেসে বলি, 'না না, তেমন কিছু নয়, তেমন কিছু নয়।'

হরগোপালবাবু আমাকে আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দাম্পত্য কলহ কি পারিবারিক কলহের কথা যেমন বাইরে প্রকাশ করতে নেই, তেমনি লেখক আর ডিরেক্টরের মতভেদের কথা জানতে পারলে প্রডিউসার বিগড়ে যাবেন, তাঁর মন ভেঙে যাবে। তিনি বই তোলা বন্ধ করে দেবেন।

হরগোপালবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'অমন কাজটিও করবেন না মশাই। বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। আমার সঙ্গে ঝগড়া করুন, দরকার হয় আমাকে হাতে করে মারুন কিন্তু ভাতে মারবেন না। জানেন অনেক কষ্টে অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর এতকাল বাদে আমি একটা চানস পেয়েছি। আমার মত বয়সে এই প্রথম চানস্। ভেবে দেখুন। কি কষ্টই যে গেছে দেহের ওপর দিয়ে, ফ্যামিলির ওপর দিয়ে তার ঠিক নেই। এ কোম্পানি থেকে সে কোম্পানি, এ স্টুডিও থেকে সে স্টুডিও কেবল ঘুরে বেড়িয়েছি। তবু এ লাইনে স্টিক করে আছি, এই আর্টকে নেহাৎ ভালোবাসি বলে ভেবেছি একবার না একবার চানস পাবই।'

বলতে বলতে হরগোপালবাবুর চোখ ছল ছল করে উঠল। আমি বললাম, 'ওসব কথা থাক। আসুন আমরা কাজ করি।'

তিনি বললেন, 'দাঁড়ান। আমাকে শেষ করতে দিন। হ্যাঁ, ভেবেছি একটা চানস্ পাবই। আর যদি পাই তা হলে দেখিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব আমি কি। আর আমি কি করতে পারি। সেই চানস্ এত কাল বাদে এসেছে। ওয়ান ক্রাউডেড আওয়ার অব গ্লোরী—পড়েছেন তো? আমি ট্রেডকে দেখিয়ে দেব আমি কি দিতে পারি। আর পছন্দমত গল্পও পেয়ে গেছি আপনার কাছ থেকে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু গল্পটা তো আপনার গোড়াতে পছন্দ হয়নি।'

তিনি বললেন, 'সে কথা ছেড়ে দিন, সে কথা ছেড়ে দিন। এখন আপনার গল্প আমার নিজের গল্প। আমার রক্ত মাংস. প্রাণ। আপনি ওই গল্প লেখার পর আরও এক শ লিখেছেন, অন্তত লেখার কথা ভেবেছেন। কিন্তু আমি ওই একটি নিয়ে পড়ে আছি, ওই একটি।'

আমি নরম হই! আপস করার দিকে ঝুঁকি। দু'দিন যেতে না যেতে আবার ঝগড়া বাধে। আবার তিনি টেবিল চাপড়ান। আর আমি তাঁকে সভ্য ভাষায় যা নয় তাই বলে গালাগাল করি।

প্রডিউসার মাঝে মাঝে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন। আর মৃদু মৃদু হাসেন। যেন ষাঁড় আর মোষের লড়াই দেখছেন।

শুধু স্ক্রিপট লেখাই নয়। আরো অনেক কাজ আছে হরগোপালবাবুর। অভিনেতা অভিনেত্রী নির্বাচন তার মধ্যে প্রধান কাজ। অবশ্য তাতে আমার কোন হাত নেই। আমার কোন সহযোগিতা তিনি এ ব্যাপারে চান না। স্টুডিওর অফিস ঘরে বসে তিনি আর তাঁর সহকারী এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আর মাঝে মাঝে আর্টিস্টদের ইনটারভিউ নেন। নতুন, অতি নতুন আবার অতি পুরনো অবসর পাওয়া জ্যোতি হারানো তারকারা সব আসেন তাঁর কাছে।

আমার সংলাপ লেখার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁদের সম্বন্ধে গল্প করেন। বলেন, 'জানেন কল্যাণবাবু, আগে যারা আমাকে পুঁছত না, দেখলে চিনতে পারত না, তারাও এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কাছে বসে থাকে। অফিসে যায়, বাসায় যায়। দুনিয়াব এই নিয়ম। কিন্তু আমি সহজে ভুলিনে। আমি খুব ফাস্টিডিয়াস। পুরনো আর্টিস্টদের মধ্যে যদি স্যুটেবল তেমন কাউকে না পাই আমি অডিয়েন্সকে নতুন মুখ দেখাব। নতুন তারা এনে দেব আপনাকে। হিরোইন নিয়েই হয়েছে যত মুশকিল। দিতে পারেন আমাকে একটি সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী মেয়ের সন্ধান? অভিনয়ের জন্য ভাববেন না। অভিনয় আমি জানি। যাত্রা থিয়েটার এ জীবনে অনেক করেছি। ফিল্মেও যে দু একবার নামিনি তা নয়। এ্যাকটিং আমি তাকে শিখিয়ে দিতে পারব। দিন না মশাই একটিকে খুঁজে পেতে। আপনাদের তো অনেক জানাশোনা আছে।'

অসহায় হয়ে বলি, 'কোথায় আর জানাশোনা। মেয়েদের সঙ্গে সত্যিই যদি পরিচয় থাকত তা হলে কি আর বানিয়ে বানিয়ে অত গল্প লিখতে যাই। আমাদের সব কল্প জগতের ব্যাপার।'

হরগোপালবাবু বললেন, 'কিন্তু আপনাদের গল্প তো শুনি মেয়েরাই পড়ে, মেয়েরাই বেশি ভালোবাসে। তাঁদের চোখে ফাঁকি ধরা পড়ে না?'

বললাম, 'পড়ে বই কি, তবে তাঁরা অনেক সময় ক্ষমা-ঘেন্না করে নেন। তা ছাড়া লেখকদের কলম থেকে নিজেদের সম্বন্ধে তাঁরা মিথ্যে কথা শুনতে ভালোবাসেন। আমাদের যেমন তাঁদের মুখের অনৃতও অমৃতের মত লাগে।'

হরগোপালবাবু একটু হাসলেন। টেবিলের দুই দিকে দুই চেয়ার নিয়ে আমরা মুখোমুখি বসে কাজ করছিলাম। তাঁর ফরমায়েস মত পাত্র পাত্রীর মুখে কথা বসাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তিনি বললেন, 'দেখেছেন কি সুন্দর রামধনু। এতক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছিল, কখন যে থেমে রামধনু উঠেছে টেরই পাইনি। ঝড়বৃষ্টিকে ভয় পাবেন না। আমাদের আকাশেও রামধনু উঠবে মশাই, নিশ্চয়ই উঠবে। ডিস্ট্রিবিউটর ঠিক হয়ে গেছে আমাদের।' তারপর ফের একটু মৃদু হাসলেন হরগোপালবাবু,' বললেন, 'একটি মেয়েকে আমি জানি। নিজের মুখে বলতে নেই। তবে সত্যিই সুন্দরী। আমি তাকে বলি, তোমাকে মানাবে, অনীতার রোলে তোমাকে মানাবে। তুমি নেমে পড়। আমার জীবনে ফের একটা চান্স আসে কি না আসে তুমি নেমে যাও।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েটি কে?'

তিনি বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

আমি এবার বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম।

হরগোপালবাবু বললেন, 'অমন করছেন কেন মশাই? আপনি ভাবছেন সে বুঝি আমার মত বুড়ি আর কালো কুচ্ছিৎ? মোটেই না মোটেই না। আমার প্রায় মেয়ের বয়সী, আর দেখতে কি আর বলব? নিজের মুখে বলতে নেই। সতীকে খুবই মানাত। কিন্তু এ কথা শুনলে ও তেড়ে আসে। বলে তোমার ভীমরতি হয়েছে।'

তারপর একটু হেসে বললেন, 'আপনার গল্পের ওপর ওর খুব রাগ।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কেন?'

তিনি একটু হাসলেন। 'সতী নিজেও বিধবা ছিল যে।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সে কথা তো এর আগে বলেননি।'

হরগোপালবাবু আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তাঁর হাসিতে গূঢ় রহস্যের ব্যঞ্জনা। তিনি বললেন,

'আপনি বিধবার মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমার সঙ্গে কি তর্কই না করেছেন। আমি শুনেছি আর মনে মনে হেসেছি। অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবার মন যে কি বস্তু তা আপনি আমার চেয়ে বেশি কি করে জানবেন।'

তারপর আস্তে আস্তে নিজের বিয়ের কথা বললেন হরগোপালবাবু। তাঁরও দ্বিতীয় পক্ষেরই বিয়ে। এক দরিদ্র দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তাঁর বিধবা মেয়েকে নিয়ে হরগোপালবাবুর আশ্রয়ে এসেছিলেন। মা মারা যাওয়ায় মেয়েটি বড়ই বিপদে পড়ে। হরগোপালবাবুরও গৃহ শূন্য। শেষ পর্যন্ত এক দুর্বল মুহূর্তে বিয়ে করে বসেন। মেয়েটিও আর কোন উপায় না দেখে রাজি হয়ে যায়। এই নিয়ে নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হরগোপালবাবুর বিরোধ হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে তাঁদের তেমন সদ্ভাব নেই।

স্ত্রী হরগোপালবাবুর খুবই অনুগত। কৃতজ্ঞতা আছে মনে। ছেলেপুলে হয়নি। মোটামুটি লেখাপড়া জানেন। কর্পোরেশন স্কুলে টিচারি করেন। তাই কোন রকমে খেয়ে পরে আছেন হরগোপালবাবু। নইলে সংসারের অবস্থা অচল হয়ে যেত।

স্ত্রীর উপর মাঝে মাঝে ভারি মায়া হয় হরগোপালবাবুর। আহা বেচারা তো আর কিছুই পেল না। দরিদ্র স্বামীর কাছ থেকে দামী দামী শাড়ি নয় গয়না নয়। স্বামীর যৌবন পর্যন্ত এসে সে দেখতে পেল না। তাকে কিসের ভাগ দিতে পারেন হরগোপালবাবু! এক যশের ভাগ ছাড়া! তাঁর স্ত্রীরও এখন একমাত্র সাধ, একমাত্র স্বপ্ন—নাম করা ডিরেক্টরের স্ত্রী হবে। তাইতো হরগোপালবাবু এই ছবিটা শেষ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর আশা এটা শুধু হিট-পিকচার হবে না, প্রেস্টিজ পিকচারও হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেক কোম্পানি থেকে অনেক অফার পাবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। ঠিক বিনা মেঘে নয়। মেঘের আভাস এক একবার পাচ্ছিলাম। প্রডিউসার তিন তিনবার হরগোপালবাবুর স্ক্রিপ্ট ফেরত দিলেন, বললেন, 'নতুন করে লিখুন।'

চতুর্থ বার বললেন, 'আর লিখবেন না। ডিস্ট্রিবিউটার গল্প রিজেক্ট করেছে। যা বাজার ওসব থীম নিয়ে নামতে সাহস পাচ্ছে না।'

হরগোপালবাবু আমাকে বাড়ি বয়ে এসে অভিশাপ দিতে লাগলেন, 'কি অলুক্ষণে গল্পই লিখেছিলেন মশাই। লিখবার আর বিষয় পেলেন না। আমার সব পরিশ্রম পণ্ড হল। আপনার কি। আপনি তো আবার সধবা অধবা যাকে পাবেন তাকে নিয়ে লিখবেন। কিন্তু আমি কি করি। আমার যে সব গেল।'

অবশ্য তার পরেও হাল ছাড়লেন না হরগোপালবাবু। অন্য ডিস্ট্রিবিউটারের খোঁজ-খবর করতেও লাগলেন। আমাকে দিয়ে আরো একবার স্ক্রিপট সংশোধন করালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ফ্লোরে যাওয়ার আগেই বই বন্ধ হয়ে গেল।

প্রডিউসার মিস্টার সেহানবীশ অন্য পরিচালক দিয়ে অন্য বই শুরু করলেন।

তারপর মাস ছয়েকের মধ্যে হরগোপালবাবুর আর কোন খোঁজ-খবর পেলাম না। নিলামও না। কারণ তাঁর মতে আমি অপয়া। আমার মতে তিনি। আমাদের মুখ দেখাদেখি না হওয়াই ভালো।

তবু দেখা হল। মিস্টার সেহানবীশ তাঁর নতুন ছবি 'শাশ্বতীর' ট্রেড শোতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। ভাবলাম নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তা রক্ষা করাই ভালো। গিয়ে দেখি প্রেক্ষাগৃহে হরগোপালবাবুও এসে হাজির। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি কাছে ডাকলেন। পাশে বসতে বললেন। তাঁর বাঁ পাশে আর একটি ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। হরগোপালবাবু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

দেখলাম, হরগোপালবাবু মিথ্যা বলেননি। তাঁর স্ত্রী মোটামুটি সুন্দরী এবং বয়সও তিরিশের নীচে। আমার নাম শোনবার পরে তাঁর মুখে কিসের ছায়া পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই হেসে নমস্কার জানিয়ে সামনের দিকে তাকালেন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। এবার বই আরম্ভ হবে।

মিনিট কয়েক বাদেই আমি বললাম, 'আরে হরগোপালবাবু, এ যে আপনি। শাশ্বতীতে আপনিও

নেমেছেন তাতো জানা ছিল না।'

হরগোপালবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কি আর করি মশাই, বেকার বসেছিলাম। দু-পাঁচ টাকা যা আসে তাই লাভ। ডিরেক্টর সূর্যবাবুর অনুরোধে নিয়ে নিলাম রোলটা। ক'দিন বা আছি। হয়তো এ চান্সও আর পাব না।'

কথা বন্ধ করে ছবির গল্পটা বুঝবার চেষ্টা করলাম, আরে সূর্যবাবু যে হরগোপালবাবুকে একজন ডিরেক্টরের ভূমিকাই দিয়েছেন। খুব তো রসবোধ আছে তাঁর। ছবির মধ্যে আর একটি ছবির পরিচালনা করছেন হরগোপালবাবু। ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু হরগোপালবাবুর চেষ্টার ত্রুটি নেই। তাঁর সাধ্যমত ভালো অভিনয়ই করে যাচ্ছেন।

আমি একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তার পর তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, 'চমৎকার হচ্ছে, হরগোপালবাবু।'

তিনি একটু খুশি হয়ে বললেন, 'তাই নাকি? আমার স্ত্রী তো কিছুতেই আসবে না। ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি। বলেছি আমার অভিনয় তো তুমি দেখনি। চল একসঙ্গে বসে দেখি। বলা যায় না, হয়তো এটুকু সুযোগও আর আসবে না। পৃথিবীতে কোন কিছুর ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই মশাই।'

আমি বললাম, 'কি যে বলেন।'

হরগোপালবাবু একটু হেসে বললেন, 'আগে সংসারটাকে বলা হত স্টেজ। এখনকার মহাকবি বলবেন স্ক্রীন। এটা ফিল্মের এজ কিনা। সত্যি ভাবতে গেলে গোটা জীবনটাই একটা পর্দা। তার খানিকটা সামনে বাকিটা আড়ালে, কি বলেন কল্যাণবাবু?'

পিছন থেকে এক অপরিচিত ভদ্রলোক হরগোপালবাবুর পিঠে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'থামুন তো মশাই, আপনার বকবকানির জ্বালায় ছবিটা দেখতে পাচ্ছি নে।'

হরগোপালবাবু অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর ভঙ্গীতে বললেন, 'দেখুন, দেখুন।'

আমরা কথা থামিয়ে ফের ছবি দেখায় মন দিলাম।

আশ্বিন ১৩৬২

রূপ লাগি

ঠিক হল রেণু কালই কৃষ্ণনগরে তার বাবার কাছে চলে যাবে। কলকাতায় দিদির বাড়িতে বেড়াবার সাধ তার মিটেছে। আর নয়। একটানা তিন মাস দিদির সংসারে থেকে দুনিয়ার হালচাল বুঝতে তার আর কিছু বাকি রইল না। দিদি আর ভগ্নীপতির আদর আপ্যায়নের বহরও সে ভালো করেই টের পেয়ে গেল।

শেষের দিকে দুজনেই তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। রেণু যে এ সংসারে একজন বাড়তি লোক, অকারণে বিনা প্রয়োজনে বসে বসে ভগ্নীপতির অন্নধ্বংস করছে একথা তারা ঠিক সামনাসামনি মুখের ওপর না বললেও আকারে ইঙ্গিতে আড়ালে আবডালে বলতে ছাড়েনি। রেণু তো গোমূর্খ নয়। শহরের স্কুলে সেকেন্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। রেণু তো কচি খুকি নয়, কুড়ি পেরিয়ে গেছে তার বয়স। সে না বোঝে কি। অথচ দিদির চিঠি পেয়েই রেণু এসেছিল। দিদি থাকবে হাসপাতালে, কাচ্চাবাচ্চাগুলির অসুবিধে হবে, জামাইবাবু সময়মত অফিসের ভাত পাবেন না—এইসব বিবেচনা করেই রেণু এসেছিল বড়দিদির সিমলাই পাড়ার বাসায়।

তারপর অবশ্য মেয়ে কোলে হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসতে রমার সাত দিনও লাগেনি, আর দ্বিতীয় সপ্তাহ যেতে না যেতে সে নিজেই হাতাখুন্তি ধরেছে। ধরবে না তো কি করবে। আর কারো কাজ দিদির পছন্দ হয় না। দিনরাত কেবল খুঁত ধরলে কি কাজ করে সুখ পাওয়া যায়।

শোনা যায় ছোট শ্যালিকাদের ওপর জামাইবাবুর একটু দুর্বলতা থাকে। শালী-ভগ্নীপতিতে হাসিঠাট্টার বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু রেণুর বড় জামাইবাবু সুবোধ সিকদার একেবারে বিপরীত

মেজাজের মানুষ। বয়স সবে চল্লিশ পেরিয়েছে কিন্তু চালচলনে যেন যাট বছরের বুড়ো। ডিসপেপটিক রোগীর মতো চেহারা। তেমনি মেজাজ। যে সময়টুকু বাড়িতে থাকে খিটখিট লেগেই আছে।

রমা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'তুই যদি তেমন সুন্দরী হতিস তাহলে বোধ হয় ভদ্দরলোকের স্বভাবটা ফিরতো।'

কথাটা অবশ্য ঠাট্টাই। তবু খোঁচাটা রেণুর বুকে গিয়ে বেঁধে। পাঁচ বোনের মধ্যে রেণুই সবচেয়ে কুৎসিত। সেকথা ঠিক। পাড়ার আর দশজনে তো বলাবলি করেই, রেণুর নিজের বাপ-মাই আড়ালে এ নিয়ে আফশোস করতে ছাড়েন না। রেণুর মা বলেন, 'ভগবান ওকে সব দিক দিয়ে মেরে রেখেছেন।' বাবা বলেন, 'ওকে মারেননি, মেরেছেন আমাকে। এ মেয়ে যে কি করে পার হবে তাই ভাবি।'

রেণু যে সবচেয়ে কুরূপা, দেখতে কালো, মাথায় খাটো, চুলগুলি না গোছে বড়, না দীঘলে, বয়সের অনুপাতে তার যে দেহের পুষ্টি নেই এসব কথা শুনতে শুনতে রেণুর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। এখন সবই সয়।

কিন্তু নাই বা থাকল তার রূপ,নাই বা থাকল তার পড়াশুনো, বিদ্যেবুদ্ধি। যেমন বাপের সংসারে তেমনি দিদির সংসারে সে তো কম খাটেনি। পনের দিন কাটতে না কাটতেই জামাইবাবুর মুখ ভার হয়েছে. এক মাসের মাথায় দিদিও খিটখিট করতে শুরু করেছে। তাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাও কানে গেছে রেণুর।

কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়েছে। যাওয়ার ভাড়াটা হাতে না থাকায় সঙ্গে সঙ্গেই সে এখান থেকে বেরিয়ে ট্রেনের টিকিট কাটতে পারেনি।

বাবাকে চিঠির পর চিঠি লিখে ভাড়ার টাকাটা যখন হাতে এল, তখন এল এক নতুন বাধা। প্রথমে অবশ্য বাধা বলে মনে করেনি রেণু। এক মধুর বন্ধনের সম্ভাবনাতেই তার মন নেচে উঠেছিল। রেণুর বাবাই এক সম্বন্ধের খোঁজ পেয়ে কৃষ্ণনগর থেকে চিঠি লিখলেন। পাত্রপক্ষ থাকে বেলেঘাটায়। ছেলে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে। তারা দেখতে যাবে রেণুকে। মেয়ে পছন্দ হলে দাবিদাওয়া নাকি আটকাবে না। রমা যেন ছোটবোনকে ভালো করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেখায়। যারা দেখতে যাবে তাদের যেন বিশেষভাবে আদরযত্ন করে।

জলখাবারের প্লেট সাজিয়ে আদরযত্ন সাধ্যমত রমা করেছিল। নিজের শাড়ি-গয়নায় সাজিয়েও দিয়েছিল বোনকে। মৌখিক পরীক্ষায় কোন জবাবই রেণুর খারাপ হয়নি। ইংরেজি বাংলায় নাম ঠিকানাটাও যত্ন করেই লিখে দিয়েছিল। তবু ও পক্ষের কোন মতামত আজ পর্যন্ত মেলেনি।

শুধু তাই নয়, গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া। জামাইবাবু এই নিয়ে দিদিকে খোঁটাও দিলেন, 'কিছু হবে না আমি জানতাম। মিছামিছি আমার কটা টাকা দণ্ড গেল।'

এরপর দিদির এখানে পড়ে থাকবার আর কোন মানে হয় না। তবু একটা মাস প্রায় জোর করেই রেণু এখানে রয়ে গেল। ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করল যদি কাজ-কর্মের কোন একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

কিন্তু রেণুর উচ্চাকাঙ্খাকে দিদি কি জামাইবাবু কেউ প্রশ্রয় দেয়নি। কলকাতায় একজনের থাকা খাওয়ার খরচ কি কম। সে খরচ জোগাবে কে? জামাইবাবু বলেছেন, 'হুঁ, চাকরি পথে গড়াগড়ি যাচ্ছে কিনা, কুড়িয়ে নিলেই হয়।'

দিদি একটু নরম সুরে বলেছেন, এখানে এসে শরীরটা তো তোর ভালো হলো না রেণু, তুই বরং কিছুদিন কৃষ্ণনগর থেকে ঘুরেই আয়। মাস কয়েক বাদে আবার এসে থাকিস।

যাওয়ার আগের দিন সকাল থেকেই সব গোছগাছ শুরু করল রেণু। গুছাবার আর আছেই বা কি। একটি মাত্র স্যুটকেস। দুখানা শাড়ি ব্লাউস আর একটা সাবানের বাক্স গুঁজে রাখবার পরও তাতে অনেক জায়গা খালি পড়ে থাকে।

সেই ফাঁকা স্যুটকেসটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রেণু কি ভাবছিল হঠাৎ জামাইবাবু এসে সামনে

দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'বাড়ির নামে বাঙাল ধায়। মন বুঝি আজই ছুটে গিয়েছে?'

রেণু মুখ না তুলেই বলল, 'হুঁ।'

এই তিন মাসের মধ্যে ও মুখে কোন হাসি দেখেনি। আজ যাওয়ার কথা উঠেছে তাই হাসি।

জামাইবাবু হঠাৎ ঘড়ি-পকেট থেকে দুটাকার একখানা নোট বার করে বললেন, 'এই নাও রেণু।'

রেণু বলল, 'ও কি। টাকা দিয়ে কি হবে। ভাড়ার টাকা তো বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

জামাইবাবু বললেন, 'ভাড়ার টাকা নয়। সিনেমা দেখে এসো। দিদিকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো ম্যাটিনি শোয়ে।'

রেণু মুখভার করে বলল, 'আমার সিনেমা দেখে কাজ নেই জামাইবাবু। এমনিতেই কত দেখলাম।'

জামাইবাবু হেসে বললেন, 'ঈস মুখ তো নয় কথার তুবড়ি। এদিক থেকে একেবারে দিদির সহোদরা।'

টাকাটা জোর করেই রেণুর হাতে গুঁজে দিলেন জামাইবাবু। তারপর হেসে বললেন, 'তোমরাও বড় হলে আর আমিও বুড়ো হলাম। চিরকাল এমন ছিলাম না। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার দিদিকে।'

রেণু ভাবল কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। বউবাজার স্ট্রীটে এক কাপড়ের দোকানে সেলসম্যানের কাজ করেন জামাইবাবু। দিনরাত খাটেন। মাইনে যা পান তাতে মাসের পনের দিনও ভালো করে চলে না। এ অবস্থায় রঙ্গরস কতক্ষণ মনে থাকে।

সিনেমা দেখবার ইচ্ছা রেণুর ছিল না। কিন্তু দিদিই তাকে জোর করে পাঠাল।

রেণু বলল, 'তুমি যাবে না?'

'আমি কি করে যাই বল তো? গেলে তো এই গন্ধমাদন মাথায় করে নিয়ে যেতে হয়। এদের ফেলে আমার কি আর বেরোবার যো আছে?'

রেণু ভেবেছিল বোনঝিদের কাউকে সঙ্গে নেবে। কিন্তু নন্দা ছন্দা দুজনেই স্কুলে। পাশের বাড়ির যে একটি মেয়েব সঙ্গে ভাব হয়েছে তাকেও ডেকে পেল না।

রমা বলল, 'ভয় করবে নাকি? পারবিনে একা গিয়ে দেখে আসতে। এই তো এখান থেকে এখানে শ্যামবাজার।'

রেণু একটু হাসল, 'পারব না আর কেন?'

দু নম্বর বাস থেকে একেবারে সিনেমা হাউসের সামনে গিয়ে নামল রেণু। মেয়েদের জন্যে যে আলাদা ব্যবস্থা আছে সেদিকে গেল না। পাঁচসিকে দিয়ে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিটই কিনে বসল।

ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলতেই হঠাৎ রেণুর খেয়াল হল অন্ধকারে ঠিক তারই পাশের সীটে বসে আর এক ভদ্রলোক চুপ-চাপ ছবি দেখছেন। তার বয়স পঁচিশের বেশি হবে না। সিনেমার নায়কের মতোই রূপবান পুরুষ। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। হাতে দামি পাথর-বসানো আংটি। খুব সৌখিন। সখ মেটাবার মতো সামর্থ্যও নিশ্চয়ই আছে। রেণু লক্ষ্য করল ইন্টারভ্যালে ভদ্রলোক সিগারেট খাওয়ার জন্যে উঠে গেলেন না। উনি কি সিগারেট-টিগারেট খান না? নাকি ইচ্ছা করেই নেশাটা এখনকার মতো ত্যাগ করলেন? রেণু ভাবতে লাগল।

আলো নিভে আবার অন্ধকার হল। কিন্তু ছবির গল্পে রেণুর আর আগের মতো তন্ময়তা এল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল একটি জীবন্ত গল্প তার পাশে বসে রয়েছে। একজন পরম রূপবান পুরুষ তাকে সান্নিধ্য দিয়ে রেখেছেন। রেণুর নিজের কুরূপ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। কিন্তু রূপবানের রূপ তো ঢাকবার নয়। মনের আলোয় তা যেন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে।

শো ভাঙবার পর ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। সিনেমার রঙচঙে বইটা যেন মনের ভুলেই ফেলে যাচ্ছিলেন, রেণু সেদিকে তাকাতেই তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলেন। তারপর মৃদু স্বরে মৃদু হেসে বললেন, 'ধন্যবাদ।' রেণু দেখল কী সুন্দর দুটি ঠোঁট আর কত সুন্দর সেই ঠোঁটের হাসি।

বাসায় ফিরে এসে রেণু দিদির ছোট আয়নার সামনে দাঁড়াল। মায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেন রেণুর চোখ দুটি বড় সুন্দর। আর তার জোড়া ভ্রূরও তুলনা হয় না। অমন ভ্রূ নাকি তাঁর

কোন মেয়েই পায়নি।

দিদি বলল, 'কিরে আয়নার মধ্যে কাকে দেখছিস অমন করে? কেমন দেখলি বই?'

রেণু বলল, 'ভালো।'

জামাইবাবু ফিরে এসে একই কথা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলে ছবি?'

রেণু তার দিকে ফিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'খুব ভালো জামাইবাবু, খুব ভালো।'

এক শুকনো ঝরণা যেন আষাঢ়ের প্লাবনে হঠাৎ উথলে উঠেছে।

তারপর সারা রাত ধরে সিমলাইপাড়ার বস্তির ঘরে আধ ময়লা বিছানায় রেণু প্রায় জেগে কাটাল। এক অসামান্য অপরিসীম রূপের তরঙ্গ তার স্বপ্ন আর জাগরণ, বাস্তব আর কল্পনার সব সীমানা মুছে দিয়েছে।

পরদিন ভোরে উঠে রেণু বলল, 'বড়দি, আজ আর কৃষ্ণনগর যাব না।'

দিদির মুখ অমনি ভার হল, 'কেনরে?'

রেণু বলল, 'আজ শরীরটা ভালো লাগছে না। কাল যাব।' জামাইবাবু বললেন, 'কেন আজ কি অশ্লেষা না মঘা? একাদশী না অমাবস্যা?'

রেণু মনে মনে বলল, 'আজ পূর্ণিমা।'

তারপর ম্যাটিনি শোয়ের জন্যে আজও গোপনে গোপনে তৈরি হল রেণু। দিদিকে বলল, 'শ্যামবাজারে তার একটি চেনা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।'

সেজেগুজে বাস স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল রেণু। যেন অভিসারে বেরিয়েছে। জনবিরল পল্লী যেন খররোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে না, স্নিগ্ধশীতল জ্যোৎস্নাসাগরে ভাসছে।

ছন্দা স্কুল থেকে ফিরছিল। পথের মোড়ে তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ছোট মাসী, কোথায় যাচ্ছ তুমি?' রেণু বলল, 'কোথাও না।'

ছন্দা বলল, 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'তুই কোথায় যাবি?'

'তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেই কোথাও নয় জায়গায়।' মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল দশ বছরের মেয়ে।

ভারি দুষ্টু হয়েছে।

রেণুর হঠাৎ চমক ভাঙল। তাই তো সে কোথায় যাচ্ছে! তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যাকে দেখেছে আজও কি তাকে সে দেখবার আশা রাখে? রেণু কি পাগল না বোকা। যার নাম জানে না ধাম জানে না সেই হঠাৎ দেখা মানুষকে সে কি করে ফের খুঁজে বার করবে? তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। অনেককাল বাদে যদি অসম্ভব সম্ভবও হয়, পাঁচ দশ কি পনের বছর বাদে যদি এই শহরের ভীড়ে কোথাও তাদের দেখা হয়েই যায় কেউ কি কাউকে চিনতে পারবে? আর চিনেই বা কী লাভ হবে তখন?

চৈত্র ১৩৬৩

স্বত্ব

উপস্থিত বুদ্ধি সুভাষিণীর আছে একথা স্বীকার করতেই হবে। একঘর লোকের সামনে যেভাবে তিনি ছেলে আর ছেলের বউয়ের মান রক্ষা করলেন, তা ওরা ধারণায় আনতে পারত না।

উপলক্ষ ছিল প্রতুল আর মানসীর বিবাহ-বার্ষিকী। প্রথম দু বছরের মধ্যে ওরা ঐ অনুষ্ঠান করেনি। করবার মত মনের অবস্থা ছিল না। বিয়ের পর থেকে ভিতরের বাইরের নানা সংগ্রাম নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিন কেটেছে। এ বিয়েতে দু' চারজন বন্ধু যোগ দিলেও কোন পক্ষের আত্মীয় স্বজনই আসেনি। তা না আসে না আসুক। বহুদিন পর্যন্ত নিজেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছে প্রতুল। ভুগেছে

আর স্ত্রীকে ভুগিয়েছে।

প্রতুলের মা সুভাষিনীও এই বিয়ের জন্যেই ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিয়েছিলেন। গত দু' বছরের মধ্যে তিনি ছেলের কোন খোঁজ নেননি, চিঠিপত্র লেখেননি। কখনো মেয়ে জামাইয়ের কাছে, কখনো দূর সম্পর্কের খুড়তুতো ভাইয়ের সংসারে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু কোথাও যে শান্তিতে থাকেননি তা প্রতুলের অজানা ছিল না। তারপর ভগ্নীপতি আর মামা দুজনেই তাকে স্পষ্ট করে জানাতে শুরু করলেন, প্রতুলের মা মনের অশান্তিতে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। ভালো করে খান না দান না, লোকের সঙ্গে কথা বলেন না, কেবল গোপনে গোপনে কাঁদেন। একমাত্র ছেলেকে ফেলে এভাবে তাঁর পক্ষে থাকাও কষ্ট, অন্যলোকের রাখাও কষ্ট। যা তাঁরা স্পষ্ট করে লেখেন না তা হ'ল তাঁদের নিজেদের অসুবিধের কথা। সংসারে যদি বাইরের কেউ এসে স্থায়ী আসন পাততে চায় তাতে আজকালকার দিনে নানা রকমের অস্বস্তির কারণ ঘটে। কলকাতার বাসায় জায়গার টানাটানি তো লেগেই আছে। প্রতুল আর তার মার মনোমালিন্য, মান অভিমানের জন্যে অন্য আত্মীয় কুটুম্ব কেন কষ্ট পাবেন ? তাই নতুন পাড়ায় এসে নতুন বাসা বাঁধবার সময় যাদবপুর থেকে মাকে অনেক সাধাসাধি করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে প্রতুল। দু' বছর আগের সুভাষিনীর যে জেদ ছিল, যে বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ ছিল, তা অবশ্য এখন আর নেই। এই দু'বছরে তিনি অনেক নরম হয়েছেন, সংসারের হালচাল দেখে বুঝতে শিখেছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে তাঁর অবাধ্য হয়ে অনাচার কদাচার করলেও বিধবা মাকে বাধ্য হয়ে ছেলের আশ্রয়ে থাকতে হয়। রাগ করে অন্যের সংসারে চলে গেলে তাতে কেলেঙ্কারি বাড়ে, মান-সম্মান বজায় থাকে না।

ছেলে আর ছেলের বউয়ের সঙ্গে থাকতে রাজী হবার আগে সুভাষিনী দু তিনটি সর্তের কথা তুলেছেন : 'আমি নিজের হাতে রান্না করে খাব পিতু।'

প্রতুল বলেছে, 'এই বয়সে তোমার নিজের হাতে রান্না করে খেতে কষ্ট হবে মা।'

সুভাষিনী বলেছেন, 'তা হোক। সে কষ্টও আমার ভালো। তবু তোমার ওই বউয়ের ছোঁয়া আমি খেতে পারব না। আমার রাঁধবার জায়গা আলাদা করে দিতে হবে বাপু।'

প্রতুল তাতেই রাজী হয়ে বলেছে, 'আচ্ছা মা, তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই ব্যবস্থা করব।'

আর একটা সর্ত আরও কঠিন। সুভাষিনী বলেছেন, 'ওই পরের বাচ্চাটাকে কিন্তু আমি কোলে কাঁখে নিতে পারব না। সে তো সঙ্গে সঙ্গেই আছে।'

প্রতুল লজ্জিত হয়ে বলেছে, 'অতটুকু ছেলে আর কোথায় যাবে ? সে তার মার কাছেই আছে।'

সুভাষিনী নাক মুখ কুঁচকে বললেন, 'ছি-ছি-ছি, আমার ভাবতেও ঘেন্না করে। তোর কি করে এমন পিরবিত্তি হ'ল পিতু। বাচ্চা শুদ্ধু এক বিধবা মাগীকে তুই বিয়ে করে আনলি। তারপর সেই বাচ্চাকে আবার নিজের ছেলে বলে চালাচ্ছিস ?'

এ নিয়ে যুক্তিতর্ক বুঝানো সমঝানো অনেক হয়ে গেছে। এখন আর নতুন করে ওসব কথা তুলে লাভ নেই। প্রতুল তা তোলেওনি। বাধ্য ছেলের মতই বলেছে, 'বেশ তো মা, তুমি যা চাও তাই হবে। বাবলুকে কারো ধরতে ছুঁতে হয় না। ওর তো বছর চারেক বয়স হ'ল। নিজের খেলাধুলো নিয়ে ও নিজের মনে থাকে। কারো কোন অসুবিধা হয় না।'

অন্যের ছেলের ওপর নিজের ছেলের এই বাৎসল্যে সুভাষিনী ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছিলেন। রাগটা চাপতে গিয়েও চাপতে পারলেন না। মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'ঈস, আবার আদর করে নাম রাখা হয়েছে বাবলু। কে রেখেছে ও নাম ?'

প্রতুল বলেছিল, 'ওর মা-ই রেখেছে, আবার কে রাখবে।'

সুভাষিনী হঠাৎ বড় অশোভন প্রশ্ন করে বসেছিলেন, 'আচ্ছা, তোকে কী বলে ডাকে ?'

মা'র এই সরাসরি প্রশ্নে ভারি লজ্জিত হয়েছিল প্রতুল। জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলেছিল, 'ওসব আলোচনা এখন থাক মা। তুমি তাহলে কাপড় চোপড় গুছিয়ে নাও। আমি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি।'

মা আর বউকে একই বাসায় রাখতে হলে আরো অনেক অশান্তি ঝগড়া-ঝাটির ঝুঁকি নিতে হবে তা প্রতুল ধরেই রেখেছিল। একজন প্রায় নিরক্ষরা গোঁড়া হিন্দুঘরের ষাট বছরের বৃদ্ধা, আর একজন

হিন্দুয়ানীর সংস্কারমুক্ত আধুনিক কালের শহুরে তরুণী। এদের মধ্যে বনিবনাও হওয়াটাই বিস্ময়কর। তারপর দুজনের সম্পর্ক যদি শাশুড়ী-বউয়ের হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ও সম্পর্কের এডযাস্টমেণ্ট কোনকালে কোন দেশেই পুরোপুরি হয়নি। প্রতুল চূড়ান্ত অশান্তির জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। কিন্তু দেখা গেল বেলগাছিয়ার এই নূতন ফ্লাট বাড়িতে এসে তেমন কোন বিপর্যয় ঘটল না. প্রতুল মার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে দিল। পাকাবাড়িতে এমন খোলামেলা আলো হাওয়া লাগা ঘরে মা যে এর আগে থাকেননি তা প্রতুল জানে। ভাইয়ের বাসাতেই হোক আর জামাইয়ের বাসাতেই হোক তাঁকে অল্প জায়গার মধ্যে বেশ কষ্টেই থাকতে হয়েছে। কোন কোন সময় জামাইবাবু ঘরে জায়গা দিতে পারেননি, পর্দা টাঙিয়ে বারান্দায় প্রতুলের মার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেখানে গরমে কষ্ট পেয়েছেন, বর্ষার দিনে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজেছেন। শেষ পর্যন্ত প্রতুলের জয় হয়েছে। হাতে পায়ে ধরে মাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে নিজের সংসারে।

স্ত্রীকেও বুঝিয়ে বলেছে প্রতুল, 'কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থেকো। মা যদি কিছু বলেনও তুমি মুখে মুখে জবাব দিয়ো না।'

মানসী হেসে বলেছে. 'তোমাকে অত করে বলতে হবে না! শাশুড়ীর মন জুগিয়ে চলা আমার অভ্যেস আছে।'

স্ত্রীর এই পূর্ব অভিজ্ঞতার উল্লেখে প্রতুল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখানে আসবার আগে সে যে আর এক জায়গায় পাঁচ বছর ঘর সংসার করেছে সে কথা মানসী অবশ্য ভুলে থাকতেই চায়, আর প্রতুলেরও যাতে সে প্রসঙ্গ মনে না পড়ে মানসী যতদূর পারে সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকে। তবু অসাবধানে মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বেরিয়ে পড়ে। মানসীর চাল চলনে, সংসারের রীতিনীতি, কাজকর্মের অভিজ্ঞতায় সে যে নববধূ নয় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতুল এতে ক্ষুব্ধ হয়. মনের প্রসন্নতা সামান্য কারণে নষ্ট হয়ে যায়।

মানসী মিথ্যে বড়াই করেনি। সেবা যত্নে সত্যিই সে সুভাষিনীর মনের বিরূপতা কমিয়ে আনতে পেরেছে। রান্না খাওয়ার ব্যাপারে যে কড়া বিধিনিষেধ ছিল তাও শিথিল হয়েছে। আগে নিজের তবকারিপাতি নিজেই কুটে নিতেন সুভাষিনী, রান্নাব কোন জিনিষপত্র পুত্রবধূকে ছুঁতে দিতেন না। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই মানসীর অধিকারের সীমা প্রসারিত হয়েছে। সে শুধু শাশুড়ীর কুটনোই কুটে দেয় না. উনুনের ওপব ভাত তরকারি চাপিয়েও দেয়। সুভাষিনী কেবল ভাতের বোকনোটা নামিয়ে নেন। শাশুড়ীর কাপড় তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা সবই মানসী করে দেয়। সুভাষিনী আপত্তি করেন না। দু' নম্বর ফ্লাটের সত্যবাবুর মা হেমবালা সুভাষিনীর প্রায় সমবয়সী। তিনিও বিধবা, বামুনের মেয়ে। প্রতুলদের তিন নম্বর ফ্লাটে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন। সুভাষিনীব চালচলনেব সমালোচনা করে বলেন, 'ওকি দিদি, ওকি আদিখ্যেতা। রান্নাবান্না এখন আর নিজের হাতে করবেন কেন? এখন তো বউই এসেছে ঘরে।'

সুভাষিনী বলেন. 'যেই আসুক, নিজের কাজ নিজের হাতে করতেই আমার ভালো লাগে।'

হেমবালা বলেন, 'না দিদি, ওসব ভালো না। বউ যদি শাশুড়ীর ভাত না রাঁধে, তার সেবা যত্ন না করে, তাহলে কি সেই বউয়ের ওপর মায়া বসে? আপনি নাতিকে রাখবেন, নাতির তোয়াজ করবেন আর আপনার বউ করবে আপনার ছেলের পরিচর্যা। তবে তো সংসারের খেলা জমবে দিদি। এই তো নিয়ম দুনিয়ার।'

হেমলতার উপদেশেই হোক আর মানসীর দক্ষতা অভিজ্ঞতার গুণেই হোক সুভাষিনী শেষ পর্যন্ত পুত্রবধূর হাতে সংসারের প্রায় সব ভারই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাবলুর ভার সঙ্গে সঙ্গে নিলেন না। সে ঠাকুরমা ঠাকুরমা করে কাছে যায় কিন্তু সুভাষিনী তাকে তেমন আমল দেন না। তাকে নাওয়ানো খাওয়ানো তো দূরের কথা ছুঁয়েও দেখতে চান না তিনি। সে যেন অস্পৃশ্য জারজ সন্তান, এমনি ভাব সুভাষিনীর। শাশুড়ীর এই সঙ্কীর্ণতা মানসীর ভালো লাগে না। আড়ালে আবডালে স্বামীর কাছে সে মাঝে মাঝে অভিযোগ করে, 'যাই বল, মার মন পরিষ্কার নয়। শিশু তো নিষ্পাপ. ওর কি দোষ। কিন্তু উনি বাবলুকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।'

প্রতুল স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'পারবেন। আরো কিছুদিন যেতে দাও। সবই তো আস্তে আস্তে

হচ্ছে।'

মা যে আগের মত কাঁদাকাটি ঝগড়াঝাটি করেন না, বরং সংসারের দৈনন্দিন কাজে মানসীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাতেই প্রতুল খুশি। তার বিধবা বিয়েতে অন্তর থেকে সায় দেবেন, মানসীর ছেলেকে নিজের নাতির মত দেখবেন, এতখানি উদারতা তাঁর কাছে প্রতুল প্রত্যাশা করে না। সত্যি বলতে কি বাবলুকে সে কি নিজেই সব সময় সহ্য করতে পারে ? সে যতই 'বাবা বাবা' বলে ডাকুক, 'এটা আনো ওটা আনো' বলে আবদার করুক, থেকে থেকে যতই প্রতুলের কোলে পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ুক ছেলেটা, সব সময় প্রতুল খুব স্বস্তি বোধ করে না। তবে যতটা সাধ্য মানসীকে সে মনের অপ্রসন্নতা বুঝতে দেয় না। সুভাষিনীকে লুকিয়ে লুকিয়ে এবং মানসীকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে বরং বাবলুকে একটু বেশী আদর আহ্লাদই করে। মানসী তা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসে। চাপা গলায় বলে, 'বাবলুর ভাইবোন না এলে তোমার মনে সত্যিকারের মায়া মমতা আসবে না।'

স্ত্রীর কাছে নিজের ফাঁকি ধরা পড়ে যাওয়ায় প্রতুল মনে মনে লজ্জিত হয়।কিন্তু মুখে তীব্র প্রতিবাদ করে বলে, 'না আসবে না। তোমাকে বলেছে। নিজের ছেলে হলে আমি কি তাকে সোনা রূপায় মুড়ে রাখতাম ? হীরাপান্না খাওয়াতাম ? যা করছি তার চেয়ে এক রতিও বেশী করতাম না তা জেনে রেখ।'

মানসী আর প্রতিবাদ করে না। তার ইচ্ছা ছেলে হোক মেয়ে হোক আর একটি শিশু এ সংসারে এখনই আসুক। তাহলে বাবলুর সঙ্গে তার বয়সের ব্যবধান কম থাকবে। দুজনে একসঙ্গে মিলেমিশে বাড়তে পারবে, খেলতে পারবে। কিন্তু প্রতুল এত তাড়াতাড়ি আর কোন ছেলেমেয়ে চায় না। সে বলে, 'আড়াইশ' টাকা আয়ের গৃহীর পক্ষে আর পোষ্য বাড়িয়ে দরকার নেই। মাইনে টাইনে বাড়ুক তারপর ও সব হবে।'

মানসী বলে, 'অত ভাবছ কেন। আমিও না হয় মাস্টারিটাস্টারি কিছু একটা করব।'

প্রতুল জবাব দেয়, 'হুঁ, তুমি এখনই কত পারছ, এর পরে কোলে আরো একটা বাচ্চা এলে তোমাব টিকিটি দেখতে দেবে নাকি।'

মানসী হেসে বলে, 'তাহলে আসল কথা বল। তুমি ভাগীদার আর বাড়াতে চাও না।'

প্রতুল বলে, 'না, তা চাইনে।'

তারপর দুজনেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। প্রতুল আর মানসী প্রায় সমবয়সী। দুজনের বয়সই তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু স্ত্রীর মুখেব দিকে তাকিয়ে মনে হয় সাংসারিক অভিজ্ঞতায় মানসী যেন অনেক বড়। ওর কাছে কোন একটি কথা লুকোবার জো নেই। স্ত্রীর এই অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধিমত্তাই প্রতুলের কাছে অস্বস্তিকর লাগে। স্বাস্থ্যে আর সৌন্দর্যে নিজের বয়সকে অনেকখানি গোপন করতে পেরেছে মানসী, কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতা লুকোন অত সহজ নয়। প্রতুলের সঙ্গে বিয়ের আগে সে যে পাঁচ বছর ধরে আর একটি পুরুষের ঘর করেছে, তার সন্তান ধারণ করেছে, পালন করেছে, সে কথা মানসী যেন কিছুতেই ভুলতে পারে না, অন্তত প্রতুলকে ভোলাতে পারে না।

বিয়ের প্রথম দু বছর প্রতুল বিবাহ-বার্ষিকী করেনি। মায়ের সঙ্গে বিবাদ বিরোধে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে মানসিক শান্তি ছিল না তার। কিন্তু এই নতুন ফ্লাটবাড়ির বাসিন্দারা তাকে আর মানসীকে এবার পেয়ে বসে। তাদেরও বিবাহ-বার্ষিকী করতে হবে। কিছুদিন আগে দু' নম্বর ফ্লাটের সত্যবাবুরা নিজেদের ম্যারেজ এ্যানিভারসারি উপলক্ষে প্রতুলদের নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন এবং সেই সঙ্গে মানসীর কাছ থেকে তাদের বিয়ের দিনটিও জেনে নিয়েছেন। তাঁরা তাগিদ দিতে শুরু করলেন। গরজটা যেন ওঁদেরই বেশী। এক নম্বর ফ্লাটের রমেশবাবুও কম যান না। তিনি মানসীকে বলেছেন, 'আমরা সেকেলে বুড়ো মানুষ। ঘটকালি করে বিয়ে হয়েছে আমাদের, তবু এই পঁয়ত্রিশ বছরের একটি বছরও এ্যানিভারসারি বাদ দিইনি। আর তোমরা ভালোবেসে বিয়ে করেছ,তোমরা শুভদিন পালন করবে না, লোকজনকে ডাকবে না খাওয়াবে না, তা কি হয় ?'

মানসী লজ্জিত হয়ে বলেছে, 'মেসোমশাই, আপনি না গুরুজন ? আপনার কি ওসব বলা সাজে ?'

রমেশবাবু জবাব দিয়েছেন, 'আরে বাছা, গুরুজন বলেই তো হিতকর উপদেশ দিচ্ছি। খবরদার খবরদার, মেসোমশাইর কথা অমান্য কোরোনা, তাহলে মহিষ মশাই শিং উঁচিয়ে আসবে।'

শেষ পর্যন্ত মানসী প্রতুলকে অনুরোধ করেছে, 'সবাই যখন অত করে বলছেন। তাছাড়া প্রত্যেকের বাড়িতেই আমরা একবার করে খেয়েছি, এবার ওঁদের না বললে ভালো দেখায় না। ম্যারেজ এ্যানিভারসারি একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে এই সুযোগে পাঁচজনকে বলা।'

প্রতুল একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বলেছে, 'বেশ, বল তাহলে। কিন্তু বেশী জাঁকজমক করতে যেয়ো না। বাইরের আর কাউকে বলে দরকার নেই। বাড়ির মধ্যেই যাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে তাদের বললেই হবে।'

মানসীর বোধহয় আরো দু'একজন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করবার ইচ্ছা ছিল। প্রতিবেশীরা তো ঠিক বন্ধুর পর্যায়ে ওঠেনি। কিন্তু স্বামীব ইচ্ছার বিরোধিতা করল না মানসী। ভাবল সব ধীরে ধীরেই হোক।

উদ্যোগ আয়োজন দেখে সুভাষিনী মানসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ তোমাদের এখানে কি ব্যাপার বউমা?'

মানসী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ব্যাপার কিছু নয় মা, এই বাড়িরই কয়েকজন ভদ্রলোককে বিকেলে চা খেতে বলেছি। প্রত্যেকেই আমাদের দু' একবাব করে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন। আমরা যদি একবারও কাউকে না বলি, সে বড় বিশ্রী দেখায়।'

বাবলু পিছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল ; হঠাৎ সামনে এসে বলল, 'তুমি কিছু জানো না ঠাকুমা। মা আর বাবার আজকে বিয়ে।'

হি হি হি করে হেসে উঠল বাবলু, 'আমি সব শুনেছি।'

মানসী হাসি চেপে বলল, 'পাজি ছেলে কোথাকার।'

সুভাষিনী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'বিয়ে! তার মানে?'

মানসী লজ্জিত হয়ে বলল, 'ওর কথা শুনবেন না মা। ছেলেটা ভারি দুষ্টু হয়েছে।'

সুভাষিনী একটু থেমে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে বললেন, 'ও, তোমাদেব বিয়ের তাবিখ, তা আমার কাছে অত গোপন করবার কি আছে? আমি কি আর বাধা দিতাম? আগেই দিইনি আর এখন।'

মানসী প্রতিবাদ করল না। আগে বাধা দেওয়ার যথেষ্টই চেষ্টা করেছিলেন সুভাষিনী। কাঁদাকাটি, গালিগালাজ, শাপমান্যির কিছুই বাকি রাখেননি। কিন্তু অবাধ্য ছেলেকে কিছুতেই বশে আনতে পারেননি। সে পূর্বস্মৃতি মনে পড়লেও তার কোন কথা মুখে আনল না মানসী। হেসে বলল, 'বাধা দেবেন কেন মা? নিজের ছেলের সুখশান্তি কে না চায়?'

সেদিন আর অফিসে গেল না প্রতুল। বাজার টাজার সেরে ঘবদোব গুছানোর কাজে স্ত্রী আব মাকে সাহায্য করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর অতিথিরা এলেন। এক নম্বর ফ্লাটের অধ্যাপক রমেশ রায় সস্ত্রীক এসে হাজিব হলেন সব চেয়ে আগে। ঘরে ঢুকবার আগেই হাঁক দিয়ে বললেন, 'কই প্রতুলবাবু, সব চুপচাপ কেন? বাজি কই, বাদ্য কই?'

খুব রসিক মানুষ রমেশবাবু। বয়স হয়েছে। কিন্তু সেই বয়সের ওজন সব সময় বয়ে বেড়ান না। বরং অসমবয়সীদের সঙ্গেও হাসি গল্পে রসিকতায় নিজের গুরুত্ব লাঘব করে দেন।

প্রতুল এগিয়ে এসে তাঁদের আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে এল। মানসী ওঁদের দুজনেরই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল। রমেশবাবু তার হাতে রজনীগন্ধার তোড়া এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো মা।'

রমেশবাবুর স্ত্রী বিজনবালা চন্দনকাঠের সুন্দর একটি সিঁদুরকৌটো দিয়ে মানসীকে আশীর্বাদ করলেন।

তারপর দু' নম্বব ফ্লাট থেকে ব্যাঙ্কের একাউনটেন্ট সত্যময় দাস, তার তরুণী স্ত্রী সুপ্রীতি আর তার মেয়ে মিনু, চার নম্বর ফ্লাটের ওভারসিআর অনিল নাগ আর তার স্ত্রী স্কুলটিচার কেতকী এসে

ঢুকল। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু উপহার আছে। বই, কাস্‌কেট, ফুলের তোড়া।

গল্পে গুজবে আসর বেশ জমে উঠেছে, মানসী অতিথিদের জন্যে জলখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত, হঠাৎ রমেশবাবু সুভাষিনীকে ডেকে বললেন, 'ব্যাপার কি, আপনি অতি লজ্জাবতী বধূর মত আড়ালে আড়ালে বেড়াচ্ছেন কেন ? ভিতরে আসুন।'

সুভাষিনী একেবারে পাড়াগেঁয়ে নন। ক'বছর শহরে থেকে এখানকার আদব কায়দা কিছুটা রপ্তও করেছেন। এমনিতে থান কাপড় পরেন, মাথার কাঁচাপাকা চুল কদমছাঁটা না করে ফেললে তাঁর মনঃপুত হয় না, হিন্দু বিধবার আচার নিষ্ঠা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে বাইরের লোকজনের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করতেও জানেন সুভাষিনী। কেউ কথা বললে, আলাপ করলে নিরুত্তর থাকেন না, কি মাথায় আঁচল টেনে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান না। রমেশবাবুর কথার জবাবে তিনি বললেন, 'আমাদের তো আড়ালে থাকবারই বয়স বাবা। এসব জায়গায় কি আমাদের এখন মানায় ?'

রমেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'উঁহু, এ কথা আমি মানিনে। মানিয়ে নিতে পারলে সব জায়গাতেই আমরা মানাই। তাছাড়া আপনি আমার চেয়ে বয়সে খুব একটা বড় হবেন না। কত বয়স হ'ল আপনার, পঁয়ষট্টি ?'

সুভাষিনী বললেন, 'না, অত হয়নি।'

'তবেই দেখুন। আমিও তো প্রায় ষাট ধরধর হলাম। আপনার আমার বয়সের তফাৎ নিশ্চয়ই বেশী নয়। আপনার ছেলের বয়স কত ?'

সুভাষিনী বললেন, 'এই বৈশাখে তিরিশ পুরো হলো।'

রমেশবাবু বললেন, 'মাত্র ? তাহলে তো একেবারে ছেলেমানুষ। ওর বিয়ে দিয়েছেন ক'বছর হ'ল ?'

সুভাষিনী একটু চুপ করে বললেন, 'এই আষাঢ়ে তিন বছর।'

রমেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মাত্র ? আমি তো ভেবেছিলাম— ।'

কেতকী বলল, 'সেকি মাসিমা। মানসীদি আমাকে নিজে মুখে বলেছেন বাবলু চার উৎরে পাঁচে পড়েছে।'

এক মুহূর্ত সারা ঘরখানা নীরব হয়ে রইল। সবায়ের আড়ালে কেতকী আর সুপ্রীতি পরস্পরের দিকে ব্যঞ্জনাভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

রমেশবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনার হিসেবে ভুল হয়েছে।'

সুভাষিনী একটু হাসলেন, কিন্তু গলার স্বরে দৃঢ়তা ফুটিয়ে বললেন, 'হিসেব আমার ঠিকই আছে বাবা। এক আষাঢ়ে প্রতুলের বিয়ে দিয়েছি, মাঝখানে এক আষাঢ় গেছে, তারপর ফের এই আষাঢ়।'

রমেশবাবু বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'তাহলে বাবলু ?'

সুভাষিনী এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবলু প্রতুলের আগের পক্ষের। ওকে দেড় বছরের রেখে ওর মা মারা যায়। তারপর ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছি। নইলে ঘর সংসার কে দেখে বলুন। একা আমার কি সাধ্য আছে ?'

রমেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তাতো বটেই, তাতো বটেই। সাধ্য থাকলেই বা আপনি তা করতে যাবেন কেন ? আশ্চর্য, এই সহজ কথাটা এতক্ষণ কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকেনি ! আমি তো প্রায় পাজলড্ হয়ে গিয়েছিলাম।'

রমেশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'তোমার কথা আর বোলনা। সহজে কি তোমার মাথায় কিছু ঢোকে ?'

রমেশবাবু বললেন, 'ওকথা তো আমি আমার ছাত্রদের রোজ বলি। তুমি আবার তাই রিপিট্ করতে শুরু করলে ?'

অনিল নাগ বলল, 'আহা, আপনাদেরও যে বহুকালের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ তা ভুলে যান কেন ?'

সকলের হাসির শব্দে ঘর ভরে উঠল।

মানসী এসে বলল, 'দয়া করে আসুন এবার ওঘরে।'

পাশের ঘরখানা বড়। তার মেঝেয় আসন পেতে মানসী অতিথিদের জলযোগের ব্যবস্থা

করেছে। নামেই জলযোগ। আসলে পুরো খাবারের আয়োজন। লুচি, মাংস, দই, মিষ্টি—তারপর একটা করে সুমিষ্ট ল্যাংড়া আম। সবাই পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

সত্যময় বলল, 'এমন তো কথা ছিল না। এ যে একেবারে ভূরীভোজের বন্দোবস্ত করেছেন?'

রমেশবাবু বললেন, 'মা আমার সব ব্যাপারেই সাসপেন্স রাখতে ভালোবাসে।'

কেতকী বলল, 'সত্যি এতদিন ধরে মানসীদি আমাদের কি ধাপ্পাটাই দিয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। কোনদিন সে কথা আমাদের টের পেতে দেয়নি। সতীনকে একেবারে বেমালুম মুছে দিয়েছে। কি সাংঘাতিক মেয়ে, মাগো।'

বাবলু এক কোণে দাঁড়িয়ে একটা আমের আঁটিকে চাটতে চাটতে সাদা করে ফেলছিল, সুপ্রীতি তাকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আঃ থাম না কেতকী।'

স্মিতমুখে কিন্তু নিরুত্তরে মানসী তার সমবয়সী প্রতিবেশিনীদের হাসিঠাট্টা সয়ে যেতে লাগল। প্রতুলও এক আধবার হাঁ-হুঁ ছাড়া বেশী কথা বলল না। পাছে ধরা পড়ে যায়। তবে মায়ের উপস্থিত বুদ্ধির জোরটা স্বীকার করে মনে মনে হাসল প্রতুল। আগাগোড়া গল্পটা কি রকম সাজিয়ে বলেছেন। কোথাও কোন ফাঁক রাখেননি। কাজটা নেহাৎ মন্দ করেননি মা। প্রতুল বাচ্চা সমেত একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছে—এই রক্ষণশীল সমাজে সে কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করাব চেয়ে মা যে উল্টোটা প্রচার করেছেন সে এক রকম বুদ্ধিমতীর কাজই হয়েছে। নানারকম জল্পনা কল্পনার হাত থেকে প্রতুলরা কিছুদিনের মত রক্ষা পেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর আরো আধঘন্টা গল্পগুজবে কাটিয়ে প্রতিবেশীরা বিদায় নিলেন। ঘরে কাজকর্ম পড়ে থাকায় তাঁদের স্ত্রীরা আগেই উঠে গিয়েছিলেন।

ঠিকে ঝি মানদাকে আগেই বলে রেখেছিল মানসী। সে এসে হাতে হাতে ঘর বারান্দা পরিষ্কার করে দিল।

সুভাষিনী মানসীকে ডেকে বললেন, 'যাও বউমা, এবার তোমরা একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে এস। বাবলুকে আমিই রাখব এখন। তাছাড়া ওর তো এখন ঘুমোবারও সময় হয়েছে। সারাদিন এটা ওটা খেয়েছে, রাত্রে বোধহয় বেশী কিছু খাবেও না।'

মানসী শাশুড়ীর এই সস্নেহ ব্যবহারে বিস্মিত হ'ল। এর আগে এমন আদর করে তাকে তিনি ডাকেননি, কোন আনন্দ আহ্লাদের জায়গায় যেতেও বলেননি। নেহাৎই শুকনো কর্তব্য করে গেছেন। এক সঙ্গে থাকতে গেলে যেটুকু করতে হয় তার বেশী সহযোগিতা করেননি। কিন্তু আজ কি হ'ল সুভাষিনীর? তাঁর মনেও কি উৎসবের রঙ লাগল?

মানসী বলল, 'না মা, এত রাত্রে কোথায় আর যাব?'

প্রতুল বলল, 'চল না নাইট শো-তে একটা বইটই দেখা যাক।'

মানসী বলল, 'না, থাক গিয়ে। আর একদিন যাব।'

প্রতুল আর পীড়াপীড়ি করল না। মানসীর ওই এক দোষ, বড় একগুঁয়ে। একবার যদি কোন ব্যাপারে সে 'না' করল তাকে প্রাণ গেলেও 'হাঁ' করানো যাবে না। নিজের ইচ্ছায়, নিজের গরজে সে বিবাহ-বার্ষিকীর আয়োজন করেছে। তারই অনুরোধে প্রতুল একটা দিন বিনা নোটিশে আফিস কামাই করল, লোকজন খাওয়াবার জন্যে বিশ পঁচিশ টাকা খরচও হয়ে গেল। মানসীর জন্যে যে তিরিশ টাকা দিয়ে মুর্শিদাবাদী শাড়ি কিনেছে সে হিসেব না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক। শাড়ি এই উপলক্ষে প্রতুল প্রতি বছরই কেনে। কিন্তু এত করেও মানসীর মন পাওয়া যাচ্ছে না। মুখখানা ভার ভার। বার্ষিক উৎসবের উৎসাহ উদ্দীপনা এর মধ্যেই যেন নিভে গেছে। প্রতুল স্ত্রীর এই ভাবান্তরের কারণ খুঁজে না পেয়ে মনে মনে একটু বিরক্ত হ'ল। তারপর কী ভেবে বলল, 'মা যখন অত করে বলছেন, চলই না। বেশীদূর না যাও, পার্ক থেকে একটু ঘুরে আসি চল।'

মানসী বলল, 'এই অন্ধকার আর জলকাদার মধ্যে যাবে পার্কে। তুমিও যেমন।' তারপর একটু হেসে বলল, 'এখন খুব গরজ দেখাচ্ছ। কিন্তু ম্যারেজ এ্যানিভারসারি করবার ইচ্ছা ভিতরে ভিতরে তোমার ছিল না। আমিই জোর করে—'

প্রতুল একটু হাসল, 'আমার মনটা তুমি এত স্পষ্ট দেখতে পাও কি করে ?'

মানসী বলল, 'তোমার মন যে আমার আয়না ।'

প্রতুল বলল, 'ও, সেই জন্যেই বুঝি সব জিনিষ অমন উল্টো করে দেখ ।'

মানসী বলল, 'উল্টো না । আমি যা দেখবার সোজাই দেখি ।' স্বামীর সঙ্গে তর্ক না করে বাবলুকে খাওয়াবার জন্যে রান্নাঘরের দিকে গেল মানসী । গিয়ে দেখল সুভাষিনী তাকে আগেই খাওয়াতে বসে গেছেন । মানসী তো অবাক । এর আগে নাতির ওপর এমন স্নেহ, সুভাষিনীর আর দেখা যায়নি ।

মানসী বলল, 'মা, রাত্রিবেলায় আপনি আবার কষ্ট করে ওকে খাওয়াতে এলেন কেন ? আমিই তো খাইয়ে দিতাম ।'

সুভাষিনী বললেন,'তুমি যখন পিতুর সঙ্গে কথা বলছিলে ও খাবাব বাই তুলল । আমার হাতে তো বেশ ভালোই খাচ্ছে বউমা । খাবে না ! এমন লক্ষ্মী ছেলে এ-বাড়িতে আর দুটি আছে নাকি ?'

খেয়ে উঠে বাবলু বলল, 'মা, আমি আজ ঠাকুমার কাছে শোব । ঠাকুমা আমাকে কত গল্প বলবে । না ঠাকুমা ? সেই ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্পটা আবার বলবে তো ?'

সুভাষিনী খুশি হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই বলব । তোমাকে বলব না তো আর কাকে বলব, দাদু ?'

এ ব্যবস্থাও নতুন । এর আগে সুভাষিনী বাবলুকে নিজের কাছে শুতে ডাকেননি । তাই নিয়ে প্রতুল আর মানসীর অসন্তোষের অন্ত ছিল না । আজ সুভাষিনী নিজে যখন বাবলুকে নিয়ে শুতে চাইলেন প্রতুল আনন্দে এত উল্লসিত হ'ল যে মানসী আর কথাটি বলবার সুযোগ পেল না ।

প্রতুল বলল, 'যাক এতদিনে মার সুমতি হয়েছে । আমি তোমাকে বলেছি মানসী আস্তে আস্তে সব হবে । দুটো দিন শুধু ধৈর্য ধরে দেখ তুমি । কেমন আমার কথা ফলল কিনা ?'

বাবলু মহা আনন্দে ঠাকুমার সঙ্গে ঘুমোতে গেল । মার হৃদয় তো আগেই জয় করা হয়েছে । যাকে জয় করতে পারেনি সেই ঠাকুরমাকে অধিকার করার ইচ্ছাই বাবলুর মনে এখন প্রবল । মানসী তার দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল । খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে রাত প্রায় এগারোটা হ'ল । আরো কিছুক্ষণ বাদে নিজেদের শোবার ঘরে এল মানসী । প্রায় ফুলশয্যার মতই বিছানা সাজানো । নিমন্ত্রিতদের উপহার দেওয়া ফুলগুলি প্রতুল নিজেই আজ গুছিয়ে এনে ঘর সাজিয়েছে । আজই যেন তাদের প্রথম ফুলশয্যা ।

কিন্তু আলো নিবিয়ে দিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে প্রথমেই আজ একেবারে ভিন্ন সুরে কথা বলল মানসী, 'মা আজ কী কাণ্ডটা করলেন দেখলে তো ?'

প্রতুল বলল, 'কী করলেন ?'

মানসী বলল, 'সবাইর সামনে একটা বাজে মিথ্যে গল্প বানিয়ে বললেন । এখন আমাদের দুজনকে বোধহয় তারই জের টেনে চলতে হবে ।'

প্রতুল হেসে বলল, 'ও, তোমার সেই কল্পিত সতীনের কথা বলছ । কিন্তু তাকে তো মা জীইয়ে রাখেননি, মেরেই ফেলেছেন ।'

মানসী বলল, 'ফেললেই বা । কেন মিছিমিছি ওসব কথা বলতে গেলেন । তার চেয়ে বললেই হত পাঁচ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে ।'

প্রতুল বলল, 'সেটাও সত্য কথা হত না ।'

মানসী বলল, 'আহা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি নাই বা হ'ল । আমাদের জানাশোনা তো পাঁচ বছরেরও বেশী ।'

প্রতুল চুপ করে রইল । কথাটা ঠিক । জানাশোনা তাদের অনেক আগে থেকেই । বন্ধু হিরণ সেনের স্ত্রী হিসেবে মানসীর সঙ্গে প্রতুলের চেনাশোনা, তারপর সৌহৃদ্য । হিরণের আকস্মিক মৃত্যুর পর সমবেদনার ভিতর দিয়ে তারা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছে এবং ব্যাপারটা বেশী ঘুলিয়ে ওঠবার আগে তারা বিয়েও করেছে । দেড় বছরের বাবলুকে প্রথম পক্ষের শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে রেখে আসতে মানসীর মন সরেনি । প্রতুলের সম্মতি নিয়েই সঙ্গে এনেছে । ঘনিষ্ঠ দু'চারজন আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সবাই জানে বাবলু প্রতুলেরই ছেলে । এ ধারণার প্রতিবাদ কেউ কখনো করে না । মানসীও না,

প্রতুলও না। কিন্তু আজ প্রতুলের মা সুভাষিনী সামাজিক সুবিধার জন্য গল্পটাকে একটু উল্টে দিয়েছেন। এতে কারোরই কিছু যায় আসে না। যে তিন চার ঘর প্রতিবেশী এ কাহিনী শুনেছে তারা নিশ্চয়ই একথা মনে করে রাখবে না। দু'দিন বাদেই সব ভুলে যাবে। তাছাড়া ভাড়াটে বাড়ির এই অস্থায়ী প্রতিবেশীদের সঙ্গে কদিনই বা যোগাযোগ থাকবে প্রতুল আর মানসীর ? এই নিয়ে খুঁত খুঁত করবার কোন মানে খুঁজে পেল না প্রতুল, বিশেষ করে এমন একটা শুভ দিনে, যে দিন এই তিন বছরে প্রথম এসেছে।

প্রতুল মানসীকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'শোন, ওসব ভাবনা ছেড়ে দাও। বাবলু তো তার ঠাকুরমাকে পেয়ে খুব খুশি। আর মার এই সুমতি যদি বজায় থাকে, তিনি যদি তাঁর মা-মরা নাতিকে অন্তত লোকলজ্জার খাতিরেও লালন পালনের ভার নেন, আমাদের দায়িত্ব কমবে, তুমিও নিশ্চিন্ত হয়ে অন্য কাজকর্মে মন দিতে পারবে।'

মানসী স্বামীর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'সে তো ঠিকই।। তাহলে তো অনেক সুবিধেই হবে।'

খানিক বাদে স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকে মানসী অস্ফুট স্বরে বলল, 'কিন্তু একটা কথা।'

প্রতুল বলল, 'কিসের কথা বলছ ?'

মানসী বলল, 'দেখ আমার মনে হচ্ছে মা অত সহজে ছাড়বেন না। আমি যেমন তাঁর ছেলেকে কেড়ে নিয়েছি, তেমনি তিনিও আমার ছেলেকে কেড়ে নেবেন। বাবলুকে এখন থেকেই হয়তো শেখাতে থাকবেন, আমি ওর আসল মা নই, সৎ-মা।'

প্রতুল হেসে উঠে বলল, 'সেই থেকে কী যে যা তা বলতে শুরু করেছ তার ঠিক নেই। যত সব আজগুবি চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকে বসেছে। তাই কখনো হয় ? সত্যিকারের মাকে কেউ সৎ-মা বানিয়ে দিতে পারে ?'

মানসী বলল, 'তোমার মা সব পারেন। ওঁর অসাধ্য কোন কাজ নেই। দেখলে না, একদিনের মধ্যে বাবলুকে কিরকম বশ করে ফেলেছেন। আচ্ছা ধর যদি তাই হয়, বড় হয়ে বাবলু যদি ভুল বুঝে আমাকে তাই ভাবতে থাকে, আমাকে সৎ-মা বলেই ধরে নেয়, তাহলে আমি কী করে সইব ?'

প্রতুল এবার বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'যেমন করে আমি সইছি।'

হঠাৎ একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল মানসী। তারপর স্বামীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'ও, এতদিনে তোমার মনের আসল কথা বেরিয়ে পড়েছে, তুমি আমাদের দু'জনের কাউকেই সহ্য করতে পার না। কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যে, পাঁচজনের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসনি, আজও ভালোবাসো না। আমি তোমার কোন কথা আর বিশ্বাস করিনে। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি।'

বলতে বলতে স্বামীর দিকে পিছন ফিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মানসী।

আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করতে করতে ভারি বিরক্ত বোধ করল প্রতুল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে স্ত্রীকে সাংসারিক অভিজ্ঞতায় বড় বেশী ঝানু বলে মনে হয়েছিল, এখন তাকেই পরম বোকা আর অসহায় বলে দৃঢ় ধারণা হ'ল। অনুকম্পায় আর্দ্র হয়ে স্ত্রীর মাথায় পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিতে লাগল প্রতুল। আর মনে মনে ভাবল, মেয়েদের কান্না বড় অদ্ভুত জিনিস। তা কোনোদিন যুক্তির ধার ধারে না। ভাগ্যে ধারে না তাইতো পুরুষের সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য তার মধ্যে মুক্তি পায়।

জোর করে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে এনে তার ভিজে চোখে ঠোঁটে চুম্বন করতে করতে প্রতুল বলল, 'ভুলে যাচ্ছ কেন মানু, আজ যে আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী।'

মানসী অস্ফুট স্বরে বলল, 'ভুলিনি, কিচ্ছু ভুলিনি। আজ আমার সবই মনে পড়ছে।'

শ্রাবণ ১৩৬৪

সিগারেট

সকালে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিলাম। একটি গল্প আসি আসি করেও সশরীরে আবির্ভূত হচ্ছে না। যে দেহ সে নিতে চাইছে তা আমার মনঃপূত নয়। ফলে সে লেখার বদলে কাগজের ওপরে রেখাপাত করে চলেছিলাম, দরজা ঠেলে একজন অভ্যাগত ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম, "আরে বিজয়দা যে। আসুন আসুন।"

বিজয়দা আমার টেবিলের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে বললেন, "লিখছিলে নাকি? তাহলে থাক, আর বসব না। ডিস্টার্ব করব না তোমাকে।"

রেখাসঙ্কুল সাদা কাগজটা লুকোবার মত করে সরিয়ে রেখে আমি বললাম, "আরে না-না। বসুন বসুন। কতদিন পরে এলেন।"

বিজয়দা আর আপত্তি করলেন না। আমার পাশের ইজিচেয়ারটায় ঠেস দিয়ে বসে একটু হেসে বললেন, "তোমরাই বেশ আছ।"

আমি কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, "কি রকম?"

বিজয়দা বললেন "মানে তোমাদের পেশার কথাটা বলছি। বেশ মজার পেশা।"

হেসে বললাম, "কি করে?"

বিজয়দা বললেন, "এই ধর তোমার কারবারে ক্যাপিটালের চিন্তা নেই, পার্টনার পালাবার ভয় নেই। বেশ আছ।"

ওসব অসুবিধা না থাকলেও লেখকের বৃত্তিটা অবিমিশ্র সুখের কিনা তা নিয়ে তর্ক করলাম না। কিন্তু বিজয়দার ব্যবসায়িক পরিভাষাগুলি শুনে কিছু কৌতুক বোধ করলাম। আমি যতদূর জানি বাণিজ্য দিয়ে লক্ষ্মীকে বাঁধবার জন্যে বার তিনেক চেষ্টা করেছিলেন বিজয়দা। প্রথমে গিয়েছিলেন প্রেস আর পাবলিশিং-এর দিকে। অত টাকা কোত্থেকে জোটালেন তিনিই জানেন। খাড়া করলেন লিমিটেড কোম্পানী। নিজে হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সে ব্যবসা দু' বছরের বেশি টেকেনি। তারপর ও সব ছেড়ে একেবারে কাঁচা মালের দিকে নজর দিলেন। মাছের চাষ, মৎসাশী বাঙালীকে যদি মাছের লোভ দেখানো যায় লাভের টাকা গুণে শেষ করা যাবে না। কোম্পানী খুললেন, ভেড়ি কিনলেন গোটা কয়েক। তারপর দু-তিন বছরের মধ্যে সবই গেল। মাছের খোঁজ মিলল না। জলাশয়গুলি জলের দরে ছাড়তে হল। শুনেছি মহাজনেরা নাকি এখনো ওঁর পিছু ছাড়েননি। তৃতীয়বার বিজয়দা ফের ডাঙার দিকে তাকালেন। কলকাতার পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের কথাটা মাথায় এল তাঁর।

একটি বড় রকমের কলেজ খুলতে পারলে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সেখানে জায়গা হয়, নিজেদের হাতেও দু পয়সা আসে। কিন্তু প্ল্যানটা কাগজ-পত্রের গণ্ডী আর পার হতে পারেনি।

যে সব লোকের টাকা বিজয়দা নষ্ট করেছেন তাঁরা তাঁর নামে নানা ধরণের অপবাদ দিয়ে থাকেন। চোর, জোচ্চোর বলতেও দ্বিধা করেন না। কিন্তু আমি বিজয়দার পারিবারিক অবস্থার কথা জানি। তাঁর ঘরদোর, স্ত্রী-পুত্রের চেহারা দেখে অনুমান হয় না যে পরস্ব হরণ করে তিনি নিজের ব্যাঙ্কের একাউন্ট স্ফীত করেছেন। তাঁরও যথাসর্বস্বই গেছে। তাঁর চরিত্রে দোষের অভাব নেই। খামখেয়ালী, বদমেজাজী। যতখানি বাকপটু তাঁর সিকি পরিমাণও কর্মক্ষম নন। তাঁর মাথায় বড় বড় আইডিয়ার সম্পদ প্রায় সব সময় থাকে। বিপদ বাধে সেগুলিকে কাজে লাগাতে গিয়ে। তিনি হিসাব করতে ভালোবাসতেন না এবং ব্যয় বাহুল্যকে আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করতেন। ব্যবসায়ে নেমে তাঁর এই অতি ব্যয়ের অভ্যাস আরো বেড়ে গেল। অফিসের জন্য বড় বাড়ি ভাড়া করলেন, দামী দামী আসবাবপত্র এল। যেখানে একজন লোক রাখলে হয় সেখানে তিনজনকে লাগালেন। দরকার হল লেডি স্টেনোগ্রাফারের। দেখে-শুনে আমার তখনই মনে হয়েছিল বিজয়দা ব্যবসায়ে নামেননি, বিলাসিতায় মেতেছেন।

আমি বলেছিলাম, "বিজয়দা এত খরচ করছেন কেন?"

বিজয়দা জবাব দিয়েছিলেন, "তুমি বুঝবে না কল্যাণ, প্রেস্টিজটা হল বিজনেসের সেরা

ক্যাপিট্যাল। বাঙালীরা কোনদিন অ-বাঙালীর মত ভিখারী সেজে বিজনেস করতে পারবে না। বাঙালীদের জাত আলাদা, ধাত আলাদা, তাদের ব্যবসার টেকনিকও তাই ভিন্ন রকমের।"

টেকনিকের মধ্যে দেখতাম গাড়ি ছাড়া বিজয়দা চলেন না, দামী স্যুট ছাড়া পরেন না, আর অগ্নি-মুখ গোল্ড ফ্লেক তাঁর দু আঙুলের ফাঁকে অনির্বাণ জ্বলে।

তারপর গত দশ-পনের বছরের মধ্যে সবই গেছে, সবচেয়ে বেশি গেছে সুনাম। তাঁর বন্ধুর দল বিজয় চক্রবর্তীর নাম শুনতে পারেন না। দেখলে এগিয়ে যান। পাছে ধার চেয়ে বসেন বিজয়দা। ইদানীং ওই অভ্যাসটিও হয়েছে। যা ধার করেন তা আর শোধ দেন না। দু-একবার চাকরি-বাকরির চেষ্টা করেছিলেন। ঢুকেও ছিলেন কোন কোন অফিসে। কিন্তু দু-চার মাসের বেশি কোথাও টিঁকেছিলেন বলে জানিনে। এমনি করে পঞ্চাশ পার করে দিয়েছেন বয়স। দেখতে আরো বুড়ো দেখায়। যৌবনে সুপুরুষই ছিলেন। আকারে দীর্ঘ বর্ণে গৌর। সে চেহারার প্রায় কিছুই নেই। দু-পাটি থেকেই সামনের দিকে দু-তিনটি করে দাঁত পড়েছে। এখনো বাঁধিয়ে নেননি। তাঁর মত সৌখীন মানুষের এই বৈদান্তিক ঔদাসীন্য কেন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "আর দাঁত, নখই যখন গেছে, দাঁত দিয়ে আর কি হবে।"

বিজয়দা'র সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছেলেবেলা থেকে। একই মফঃস্বল সহরের আমরা বাসিন্দা ছিলাম। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল। তাঁর কোন কথাই দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছোট ছিল না। পৃথিবীর সব খোঁজ-খবর তিনি রাখেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখা থেকেই তিনি ফল আহরণ করেছেন। তাঁর কথা আমরা সবাই অবাক হয়ে শুনতাম। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরের সুদর্শন ছেলের মুখে কিছুই বেমানান লাগত না। স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবে তাঁর জুড়ি ছিল না। ম্যাট্রিকুলেশনে দশ টাকার একটা স্কলারশিপও পেয়েছিলেন। পরে অবশ্য ক্যারিয়ার আর তত ভালো হয়নি। কিন্তু ওঁর মধ্যে বড় হবার যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে সে কথা তিনি শুধু নিজেই বিশ্বাস করতেন না তাঁর বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মনেও তা সঞ্চারিত করতে জানতেন। তিনি পরীক্ষায় খারাপ করলে অসুখবিসুখ কি প্রতিকূল গ্রহ-উপগ্রহের দোহাই দেওয়া হত। ব্যবসা-বানিজ্যে লোকসান হলে দোষ চাপত পার্টনারের ঘাড়ে। বিজয়দা যেন কোন অন্যায় করতেও পারেন না, ভুল করতেও পারেন না। তাঁর চরিত্র নির্দোষ, বুদ্ধি নির্মল। হয়তো তাঁর অসাধারণ বাক বৈদগ্ধ্য এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে থাকবে। তাঁর চেহারা আর চাল-চলনের আভিজাত্যও তাঁকে সেই মোহ বিস্তারের কাজে অনেকখানি সাহায্য করেছিল। যতদিন জানি এখন আর সে সব নেই। সেই ইন্দ্রজাল টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে। বিজয়দার ভাইরা সব আলাদা হয়ে গেছেন, বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন। স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে নারকেলডাঙার ষষ্ঠীতলা লেনে পুরনো বাড়ির একতলায় দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে বিজয়দা সেখানে বাসা বেঁধেছেন। বড় ছেলে দুটির কলেজের পড়াশুনো চলতে চলতে বন্ধ হয়েছে। চাকরি-বাকরির কোন সুবিধা হয়নি। মেয়েটির এখন বিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু পণ-যৌতুকের সংস্থান নেই। আগে আগে বৌদির সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আমার আলাপ পরিচয় আলোচনা হত। উপন্যাস পড়া এবং তা নিয়ে সমালোচনা করায় তাঁর দারুণ উৎসাহ ছিল। এখন আর সে সব কিছুই নেই। এখন গেলেই নানা রকম অভাব, অনটন, অশান্তির অভিযোগের কথা ওঠে। আগে আগে স্বামীর দোষ চাপতে চেষ্টা করতেন বৌদি। এখন স্পষ্টই বলেন, "ওঁর জন্যই সব নষ্ট হল।"

বিজয়দার মত মানুষ যে এই বয়সে এই অবস্থায় এসে বিশ্ব সংসারের উপর বিরূপ হবেন, আর সাহিত্য, সভ্যতা সংস্কৃতি রাজনীতিকে বিদ্রূপ করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমি বিস্মিত হইনে, বিশেষ কোন বাদ-প্রতিবাদও করিনে। তাঁর কথা শুধু শুনে যাই, মাঝে মাঝে দু-একবার হাঁ-হু করি। বিজয়দার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তিনি নিজেই বাদী নিজেই প্রতিবাদী। বিপক্ষের সম্ভাব্য যুক্তিগুলি তিনি নিজেই খাড়া করেন। তারপর আরও ধারাল অস্ত্রে কচু গাছের মত সেগুলি কুচি কুচি করে কেটে দিগ্বিজয়ীর উল্লাস বোধ করেন। আমি শুধু তাঁকে বসবার আসন দিই, ফাঁকে ফাঁকে চা আর ধূমপানের ব্যবস্থা করি।

অবশ্য সিগারেটের প্যাকেট তাঁর প্রায় পকেটেই থাকে। এখনো তাঁর আধ ময়লা পাঞ্জাবীর

পকেটের ভিতর থেকে উজ্জ্বল গোল্ড ফ্লেকের বাক্স বেরিয়ে আসে। সব সময়েই যে তিনি দামী সিগারেট খান তা নয়। কম দামীও চলে। কিন্তু গোল্ড ফ্লেক যে এখনো কি করে জোটে তা ভেবে আমি মাঝে মাঝে অবাক হই।

বিজয়দা এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছোট টিপয়টা তাঁর সামনে টেনে দিলাম আর উঠে গিয়ে সংগ্রহ করে আনলাম ছাইদানিটি। এই বস্তুটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্কের দরকার নেই। বিজয়দারও যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তা তাঁর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয় না। কারণ ছাইদানি থাকুক আর না থাকুক তিনি আমার লেখার ঘরখানিকেই একটি ভস্মপাত্র মনে করে যত্রতত্র ছাই ছিটতে থাকেন। তিনি উঠে চলে যাওয়ার পর খালি প্যাকেট, সিগারেটের টুকরো আর ছাই জীবন আর জগৎ সংসারের অকিঞ্চিৎকরতার সাক্ষী হিসাবে পড়ে থাকে।

সব জেনেও অ্যাসট্রেটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড। চেইন স্মোকার বিজয়দা সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ধরালেন না। ছাই দানিটির দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলেন। যেন জাতিস্মর পূর্বজন্মের কোন স্মারক দ্রব্যকে দেখতে পেয়েছেন। বললাম, "কি ব্যাপার বিজয়দা ? সিগারেট ফুরিয়ে গেছে বুঝি ? আনিয়ে দেব ?"

তিনি বললেন, "না ভাই তার আর দরকার নেই।"

বললাম, "কেন বলুন তো। আজ হঠাৎ এত সংকোচ কিসের আপনার।"

বিজয়দা বললেন, "সংকোচ নয়, প্রয়োজনই ফুরিয়েছে। সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

আমি একটু কাল বিস্মিত হয়ে থেকে বললাম, "সে কি, আপনি শুনেছি, তের-চৌদ্দ বছর বয়সে সিগারেট ধরেছিলেন।"

তিনি বললেন, "ঠিকই শুনেছ।"

আমি বললাম, "তাহলে ছাড়লেন কেন ? ডাক্তার বারণ করেছেন ?"

বিজয়দা একটু হেসে বললেন, "মহাডাক্তারও আমার কিছু করতে পারত না যেমন মহামাষ্টার মানে হেডমাষ্টারও পারেননি। স্কুলে তখনও বেত মারা চালু ছিল। প্রথম যেদিন ধরা পড়ি, পিঠখানা একেবারে লাল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বুক তাতে দমেনি। মাষ্টারদের পর বাবা আর কাকাও আমার ধূমপানে কম বাধা দেননি। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। তারপর সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন তোমার বৌদি। গোড়ার দিকে সকলের মত আমাদেরও নতুন প্রেমে নতুন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু। মুখের কাছে মুখ এলেই সে তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে শুয়েছিল। বলেছিলাম 'কি হল ?'

সে আপত্তি জানিয়ে বলছিল, 'তোমার মুখে ভারি গন্ধ।'

'বলেছিলাম, মদের গন্ধ নয়, সিগারেটের গন্ধ।'

সে হেসে বলেছিল, 'জানি গো জানি। তা আর আমাকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু কেন অত সিগারেট খাও বল তো।'

জবাব দিয়েছিলাম, 'খাই মুখের আঁশটে গন্ধ ঢাকবে বলে। মদ যেমন খারাপ আসলে মুখমদও তেমনি। দেখতে ভালো শুনতে ভালো, শুঁকতে ভালো নয়।'

সে বলল, 'তার জন্যে পান খেলেই হয়।'

আমি বললাম, 'পানটা মেয়েদের জন্যে, তামাকটা পুরুষের। আমাদের ভোজ্য এক কিন্তু পেয় আলাদা। মেয়ে আর পুরুষের স্বভাবচরিত্র এত বিপরীত বলেই তাদের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিদের ভাষায় 'পীরিতি' এত বেশি।'

কথায় আমি কারো কাছে হারিনি আর স্ত্রীর কাছে হারব : অন্তত তখন হারতাম না।

তারপর আমার স্ত্রীর নাকেও সিগারেটের গন্ধ সহনীয় হল। ছাই ওড়ানো সয়ে গেল চোখে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম মদ খেয়ে যে মাতাল হয় না আর সিগারেট খেয়ে যে ঘর নোংরা করে না, বিছানার চাদর আর মশারি পোড়ায় না সে ঠিক জাত নেশাখোর নয়, তার নেশা সখের নেশা। সে নেশায় সুখ নেই। আসলে সিগারেটের আগুন পুরুষের প্রেমের আগুনের প্রতীক।

সে হেসে বলেছিল, 'আর সিগারেটের ছাই ?'

জবাব দিয়েছিলাম, 'সেগুলি শত্রুর মুখে দেওয়ার জন্যে।'

আমার স্ত্রী তখন আমার সব কথা মানত। কারণ আমার কথার অর্থগৌরব ছিল। শুধু কাঁচা টাকাই নয়, ভরি ভরি পাকা সোনাও দিয়েছি। তারপর আমিও দত্তাপহারী মধুসূদনের নকল করতে লাগলাম। যা দিয়েছিলাম তার সবই চেয়ে নিলাম, তার বেশি কেড়ে নিলাম। তারপর আর নেওয়ার মত কিছু বাকি রইল না। আমার দিক থেকে দেওয়ার মত ধন, মান, যৌবন, অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। শুধু মনকে আমার স্ত্রী আর গ্রহণযোগ্য মনে করল না। বাড়তে লাগল শুধু জন। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কিন্তু এসব পুরাকালের কথা বেশি বলে লাভ কি। এবার একালের কথায় আসি।

পঞ্চাশের আগেই আমি বনে ঢুকেছিলাম। সে বন আমার ঘর। সে বনের বাঘিনী আমার স্ত্রী। আর ব্যাঘ্রশাবকেরা আমাকে আস্ত একটি মোষ ছাড়া যে কিছু মনে করে না তা তাদের চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এখন বাঘে মোষে লেগে গেলেই হয় আর কি। আমি তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু পালাই বা কোথায়। ঘরেও পাওনাদার বাইরেও পাওনাদার। ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর। আমার দিন কাটে রাস্তায় রাস্তায়, সস্তা রেস্তোরার কোণে সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে। ঘরে ফিরি অনেক রাত্রে। শুধু ঘুমোবার জন্যে। সেখানে যে বিয়ের তৃতীয়দিনের মত আমার জন্যে ফুলশয্যা পাতা থাকে না তা তো বুঝতেই পার! ঝগড়া করে করে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত কারোরই ঘুম আসে না। ঘুমের যে এমন একটি মহৌষধ আছে কে জানত। ঘুম ভাঙবার পর আবার শুরু হয়। কিন্তু আলাপটা ভালো করে জমবার আগেই আমি পালাই।

সেদিন তোমার বৌদি কড়ি ছেড়ে হঠাৎ কোমল ধরল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'দেখ, তোমার কাছে কি গোটা তিনেক টাকা হবে।

একটু অবাক হলাম। ইদানীং সে আমার কাছে কিছু চায় না। দুটি ছেলের একটি টিউশনি ফিউশনি কি যেন করে। পঞ্চাশ ষাট টাকা বোধহয় হয়, কি তাও হয় না। সব টাকা সব মাসে আদায় করতে পারে না। ছোটটি অল্পদিন হল কলেজ স্ট্রীটের এক স্টেশনারী দোকানে সেলস-ম্যানের কাজ নিয়ে ঢুকেছে। এখনো শিক্ষানবিশীর পালা শেষ হয়নি। ট্রাম-বাসের খরচা বাদে বিশেষ কিছু যে ঘরে আনতে পারে মনে হয় না। টিউশনি করে মেয়েও পনের বিশ টাকা আনে। কিন্তু মাসের পনের দিন যেতে না যেতে বারিবিন্দুর মত সবই মিলিয়ে যায়।

আমি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'টাকার কি দরকার পড়ল?'

এমন একটি অসম্ভব প্রশ্নেও সে কিন্তু আজ চটলো না। শান্তভাবেই বলল, 'খুবই দরকার। ঘরে আজ কিছু বলতে কিছু নেই। মাছ তরকারির তো কোন কথাই ওঠে না, দু'সের চাল যে কিনব তার পর্যন্ত জো দেখছিনে। অমু-শ্যামুর কাছে যা ছিল সব ওরা ধরে দিয়েছে। হাত খরচা, বাসভাড়াটা পর্যন্ত। সব কাল ফুরিয়েছে। আজ আর কোন গতি নেই। হবে তোমার কাছে কিছু?'

'দেখি', বলে পকেটে হাত ঢুকালাম। একটি আধুলি আর একটি পুরো জিনিস বেরিয়ে এল। পুরনো সিগারেট কেসটা। নতুন একপার্টির সন্ধান পেয়ে আগের দিন বেশ একটু সাজসজ্জা করেই বেরিয়েছিলাম। সিগারেট ভরা কেসটি হেসে খুলে ধরেছিলাম সামনে। কিন্তু শিকার ধরতে পারিনি।

কেসে আরও কয়েকটা সিগারেট ছিল। সেগুলি বের করে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে কেসটা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললাম, 'দেখ এটা দিয়ে যদি কোন কাজ হয়।'

অনেকদিন পরে আমার স্ত্রীর মুখে এক ফোঁটা হাসি দেখলাম। ঠোঁট দুটি একেবারে শুকনো। কপালের সঙ্গে গাল-দুটোও যে এমনভাবে ভেঙেছে এতদিন চোখে পড়েনি।

আমার স্ত্রী বলল, 'পোড়া কপাল, তোমার এ সিগারেট কেস এখানে কে নেবে।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি কেউ নেয় কিনা।'

কেসটা তার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিগারেটগুলি আর ভরে নিলাম না। দু-তিন জায়গায় চেষ্টা করবার পর এক বন্ধুর কাছ থেকে দশ টাকা ধার পেলাম। কিন্তু সেও কেসটা বন্ধক রাখতে চাইল না। সে হেসে বলল, 'ওটা নিয়ে আর কী করব, ও তুমি নিয়ে যাও।'

কেসটা সোনার নয়। রোল্ড-গোল্ডের। সেটা আর ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম না। রাস্তায় ছুঁড়ে

ফেলে দিয়ে গেলাম।

রোজগার করা নয়, ধার করা দশটা টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। তার ভাব দেখে মনে হল সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে।

একটু বাদে আমার সেই ফেলে রাখা সিগারেটগুলি একখানি রুমালে করে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, 'নাও। এখনো বোধহয় নষ্ট হয়নি। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে রেখেছিলাম।'

আমি তার হাত থেকে সিগারেট শুদ্ধু রুমালখানা নিলাম। তারপর সে রান্নাবান্নার কাজে চলে গেলে সবাইকে লুকিয়ে জানলা দিয়ে সিগারেটগুলি খোলা ড্রেনে ফেলে দিলাম। আরো খানিকক্ষণ বাদে আমার স্ত্রী ফের এসে দাঁড়াল। আঁচলে ভিজে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ যে বেরোলে না। পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠল নাকি।'

আমি বললাম, 'উঠছে না অস্ত যাচ্ছে।'

সে বুঝতে না পেরে বলল, 'তোমার যা কথা। এই ভরদুপুরে অস্ত যাবে কি ? চুপচাপ বসে আছ। সিগারেটগুলি খেয়ে শেষ করেছ নাকি ?'

বললাম, 'হুঁ'।

সে বলল, 'স্মোকার বটে !' তারপর আরো কাছে এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'আমার আঁচলে খুচরো পয়সা আছে। আনিয়ে দেবো দুটো ?'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, এখন না। দরকার হলে তোমাকে পরে বলব।'

সন্ধ্যার পর ছেলেরা ঘরে এল। মেয়েরাও বসল কাছে ঘেঁষে। আমাকে এ সময় ওরা পায় না, কোন্ সময়েই বা পায় ?

হঠাৎ বড় মেয়ে বীথির চোখেই প্রথম ধরা পড়ল। সে বলল, 'বাবা তুমি সিগারেট খাচ্ছ না ?'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'না মা। সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

বীথি বলল, 'সে কি বাবা !'

বীথির মা বলল, 'তুমি কি রাগ করে— ।'

আমি বললাম, 'রাগের তো কোন কথা হয়নি।' এর আগে মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্য খোঁটা শুনেছি। পুড়িয়ে নাকি সব ছাই করে দিলাম। কিন্তু সেদিন তো সত্যিই ওকথা কেউ বলেনি। অমু আর শ্যামুও আপত্তি করে বলল, 'এতদিনের হ্যাবিট একেবারে হাঠৎ ছেড়ে দিলে অসুখ করবে যে ?'

ছোট দুই মেয়ে রিতা আর মিতা দাদাদের প্রতিধ্বনি করল, 'তোমার যে অসুখ করবে বাবা।'

অসুখ কথাটির মধ্যে যে এত সুখ ভরা কই এব আগে তো কোনদিন ধরা পড়েনি।

আজ সাতদিন ধরে সিগারেট খাচ্ছিনে। জীবনের কটা দিনও খাব না ঠিক করেছি।- প্রথম দু'একটা দিন একটু অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সে খুব সামান্য। সাঁইত্রিশ বছরের নেশা। সে তুলনায় অস্বস্তি প্রায় কিছুই হয়নি। সিগারেট খাওয়া আমি অনেক কমিয়ে এনেছিলাম। ইদানীং তো প্রায় চেয়ে চিন্তেই চলত। সিগারেটের বদলে কটা টাকাই বা বাঁচবে। নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যেই-এর চেয়ে বড় ত্যাগ বড় সংগ্রাম আমি করেছি।

কথাটা তা নয় কল্যাণ। সেদিন সেই সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের মধ্যে বসে যা আমি অনুভব করেছিলাম তার বর্ণনা করলে তুমি হাসবে। আমার সেদিন মনে হয়েছিল একটি সিগারেটের ফুলকি নিভে গিয়ে যেন আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ আশার দীপ জ্বলে উঠেছে। সেই দীপাবলী অবিচ্ছিন্ন অনির্বাণ। আমার মনে হয়েছিল যেন আমি আমার নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যে সামান্য একটি নেশার বস্তু ত্যাগ করিনি, যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি। অন্তত বিলিয়ে দিতে পারি, বিলিয়ে দেওয়া কঠিন নয়। আজ সেকথা শুনে তুমিও হাসবে, আমিও হাসি। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তটিকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই না।"

ছাইদানিটি টেনে নিলেন বিজয়দা। তারপর অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। একটু বাদে খেয়াল হওয়ায় নিজেই ফের হেসে উঠে বললেন, "দেখ কাণ্ড।"

আমি চেয়ে দেখলাম তাঁর চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল গোপনে কখন যেন এসে আসন নিয়েছে।

শ্রাবণ ১৩৬৫

সুধা হালদার ও সম্প্রদায়

কদিন ধরেই হাত টানাটানি যাচ্ছিল পরেশের। বাজার চড়া। জিনিসপত্রের দাম এত আক্রা যে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। বাজারে যাওয়ার আগে রোজই স্ত্রীর সঙ্গে এক চোট ঝগড়া করে পরেশ। বাজার থেকে যখন ফেরে মাছ তারকারির দাম দেখে আরও মাথা গরম হয়। পুঁজিপাটা যা ছিল তা প্রায় সবই শেষ হয়েছে। ঘরে বসে বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও শেষ হয়। আর এ তো পরেশ হালদার। যে পাশ পরীক্ষা দিয়ে কোন সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারেনি, অল্পস্বল্প গাইতে বাজাতে জানে, তাছাড়া কোন হাতের কাজ শেখেনি। নতুন করে কিছু শেখবার চেষ্টাও নেই। নতুন কোন কাজকর্মকে যেন যমের মত ভয় করে পরেশ। সংসারে কতজনে কত কাজ করে খায়। পেটের জন্যে চিন্তা যার আছে সে মাথা খাটায়। যে তা পারে না সে হাত পা খাটায়, দুখানি হাত দিয়ে মানুষ কত কাজ করে। পুরুষ ছেলের আবার কাজের অভাব আছে নাকি ? কিন্তু কোন কাজের কথা বললে পরেশ যেন জঙ্গলে পড়ে, জলে পড়ে। তাকে যেন বাঘে কুমীরে খেতে আসে, চোখ-মুখের এমনি দশা হয় তার। পুরুষ মানুষের এই ভয় দেখে সুধা আগে আগে হাসত। আজকাল আর হাসতে পারে না। এখন তো সে আর একা নয়। দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে। আরো একটি আসছে। এখন পরেশকে ভয় পেলে চলবে কেন ? এখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কতজনে বল ভরসা সাহস পাবে।

পাথুরিয়াঘাটার সরু গলির মধ্যে দুখানা মাত্র ঘর। তারই ভাড়া গুণতে হয় মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজকের এই কথান্তরটা ভাড়া নিয়েই শুরু হয়েছিল।

সুধা বলেছিল, 'কই, ভাড়া দিলে না। মাস যে শেষ হয়ে এল। বাড়িওয়ালা ব্রজবাবু এরই মধ্যে তিনদিন তাগিদ দিয়েছেন ?'

পরেশ বলেছিল, 'দিক গিয়ে। তার কি। সে তো তাগিদ দিয়েই খালাস।'

সুধা হেসে বলেছিল, 'ওরা ঘর ভাড়া দিয়েছে, ভাড়ার জন্যে তাগিদ দেবে না ? আমাদের মাসী যে মাসপয়লা দিনে গুণে গুণে ভাড়ার টাকাটা আদায় করে নিত।' বলে সুধা জিভ কেটে বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে। পূর্বস্মৃতি সে আজ মনে করতেও চায়নি, বলতেও যায়নি। মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। বাড়ি ঘর যারা ভাড়া দেয় তারা যে অমন কড়া তাগিদই দিয়ে থাকে, আর ভাড়াটেকে সে টাকা হাসিমুখে নিয়মিত জুগিয়েও যেতে হয় স্বামীকে এই তত্ত্বটা বুঝিয়ে বলবার জন্যেই দৃষ্টান্তটা হঠাৎ মুখের আগায় এসে পড়েছে সুধার। কিন্তু তাতে এমনই বা কোন দোষ হয়েছে। ঘরে তো পরেশ ছাড়া আর কেউ নেই। সে তো সব জানেই। নিজেই দেখেছে শুনেছে। কত মাসীকে দেওয়ার জন্যে কত বোনঝির বাড়িভাড়া নিজের হাতে জুগিয়েছে। পরেশের তো কিছু আর অজানা নেই। পরেশ ছাড়া ঘরে আছে আর দুটি ছেলেমেয়ে। কোলের দেড় বছরের ছেলেটি এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চার বছরের মেয়েটি সারা বাড়ি ভরে ঘুর ঘুর করছে আর নিজের মনে গাইছে, 'মন দিলে না বঁধু।'

ময়নার গলাটা ভালোই হবে। আর যখন যে গান শোনে তাই ও সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতে পারে। কিন্তু ও গান গাইলেও ওসব কথা বুঝবার কি আর তার বয়স হয়েছে। কম পক্ষে আরো ন দশ বছর লাগবে। ততদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে সুধার। জিভ আর মুখ আয়ত্তে আসবে। কোন বে-ফাঁস কথা আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসবে না।

কিন্তু কথাটা শুনেই পরেশ চোখ তুলে কটমট করে তাকিয়েছে স্ত্রীর দিকে। যেন এতক্ষণ পরে সে সুধাকে বাগে পেয়েছে।

পরেশ বলল, 'ফের ওই সব কথা ? লজ্জা করে না তোমার ? তিন সন্তানের মা হতে যাচ্ছ, তবু মুখের লবজ গেল না ?'

সুধা আরো লজ্জিত হল, একটু হেসে বলল, 'মাফ করো। ঘরে তো বাইরের কেউ নেই। তুমি ছাড়া আর তো কেউ শুনতে পায়নি।'

'নাই বা গেল। ভদ্রলোকের পাড়া। আমিও ভদ্রলোক। পাঁচ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হয়ে বাস করছি। তবু তুমি ওসব কথা তুলবে? ঘরের মঙ্গল অমঙ্গল ছেলে মেয়েদের ভালোমন্দ বিবেচনা করবে না?'

সুধা বলল, 'বললামই তো বাবা, আমার ঘাট হয়েছে। আর বলব না। নাও এবার বাড়িভাড়ার কি করবে তাই কর। আমি বলি কি, দুখানা ঘর রেখে আর দরকার কি। বাইরের ঘরখানা ছেড়ে দাও। পঁচিশ টাকা ভাড়া বাঁচবে।'

একথা সুধা অনেকদিন ধরেই বলে আসছে। ভাড়া দিতে যখন এত কষ্ট ও ঘরখানা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু পরেশ জানে—ও ঘরের শুধু এক নম্বর নয় তিন চার নম্বর দরকার আছে। প্রথম হল ভদ্রলোকের একখানা বসবার ঘর রাখতেই হয়। তার সদর অন্দরের মধ্যে একটা মোটা কাপড়ের গাঢ়রঙের পর্দা না টাঙিয়ে রাখলে চলে না। পর্দার ওপাশে গ্রীনরুম, পর্দার এপাশে স্টেজ। বন্ধুবান্ধব যারা আসে তাদের বসবার জন্যে বাইরের ঘরখানা, পুরোন চেয়ার আর কৌচ কিনে এনে ভালোভাবেই সাজিয়েছে পরেশ। একটা খবরের কাগজও সে রাখে। তাতে পাড়ায় তার মর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু শুধু বসবার, গল্প করবার, কাগজ পড়বার ঘরই নয়, এ ঘর একই সঙ্গে তার অফিস আর রিহার্সাল রুম। বাইরে 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' নামের ছোট সাইনবোর্ডটি এখনো দেয়ালের গায়ে আটকানো রয়েছে। চার পাঁচ মাস এই দলের কাজকর্ম এখানে বেশ চলে। দরকার মত এদলের রূপ বদলায়। কখনো হয় অপেরা পার্টি, কখনো নাচ, কখনো বা লঘু রাগসঙ্গীত আর আধুনিক সঙ্গীতের দল। যখন যে রকম মেয়ে পাওয়া যায়। দলের বেশির ভাগ মেয়ের যে ধরনের যোগ্যতা থাকে, সেই অনুযায়ীই দলকে বদলে নিতে হয়। তাতে দলের নামটা ঠিকই থাকে আর অধিকারীও বদল হয় না। আজকাল আর অধিকারী বলে না। পরেশও নিজেকে ম্যানেজারই বলে। সে একই সঙ্গে এই দলের ম্যানেজার প্রোপ্রাইটার ফাউণ্ডার—সব। এই দলের জন্যেই বাইরের ঘরখানাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সুধা বলে,'ওই ঘরেরও দরকার নেই। তুমি এসব ছেড়ে দাও, আমি যেমন সেসব ছেড়ে এসেছি তেমনি তুমিও তোমার পেশা বদলাও।'

কিন্তু বারবধূর পক্ষে কুলবধূ হওয়া যত সহজ, পুরুষের পক্ষে এক পেশা ছেড়ে আর এক পেশায় যাওয়া তত সহজ নয়। সব ব্যবসা সবাইর হাতে জমে না। আর চাকরি-বাকরি তো সবই পরের হাতে।

মাত্র চার পাঁচ মাসের মরশুম। বর্ধমান বীরভূম মেদিনীপুর জেলা থেকে শুরু করে উড়িষ্যা বিহারের ছোট ছোট শহরে গ্রামে পরেশ তার দলবল নিয়ে যায়। বাংলা দেশের চেয়ে বাংলার বাইরে থেকে যে সব বায়না আসে সেইগুলি রাখতেই বেশি আগ্রহ পরেশের। গাঁয়ের যোগী ভিখ পায় না। মান নেই মার কাছে, মান নেই গাঁর কাছে। দেশে প্রতিযোগিতা বেশি—টাকা কম—মানসম্মানও কম। কিন্তু বাইরে পরেশ বাঙালীর সংস্কৃতির, তার নৃত্য আর গীত শিল্পের ধারক বাহক বলে নিজের পরিচয় দেয়। আর এখানকার পচী পদী হারানী কুড়ানীকেও ঘষে-মেজে ওসব অঞ্চলে উর্বশী মেনকা বলে চালিয়ে দিতে পারে পরেশ। যতদিন থাকে তাদের আদরযত্নে পান-ভোজনে দিব্যি আরামে দিন আর রাতগুলি কাটিয়ে দিয়ে আসে। ফিরে এসে বছরের বাকি সময়টা প্রায় পায়ের ওপর পা তুলে খায়। শেষের দিকে অবশ্য টানাটানি পড়ে। তখন বন্ধুবান্ধব কি মহাজনের কাছে ধারকর্জের জন্যে ছুটতে হয়। প্রায় গত পনের বছর ধরে এই অনিশ্চিত জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে পরেশ। এই দীর্ঘকালের অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া কি সহজ? আর ছেড়ে দিলেই বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য জীবিকা তাকে কে দেবে?

পরেশ স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তুমি ভেব না, ভাড়ার টাকা আমি দু' একদিনের মধ্যেই জোগাড় করে আনব।'

সুধা বলল, 'আর খোরাকি?'

পরেশ বলল, 'হবে হবে, সব হবে। তুমি ভেব না।'

বাইরের ঘরে এসে কৌচে ঠেস দিয়ে বসল পরেশ। সুখাসন এখন নেই। জায়গায় জায়গায় ছিড়ে গেছে। পুরোন বাজার থেকে সস্তায় কিনেছিল জিনিসটা, এখন পস্তাচ্ছে।

পরেশ বসে বসে বিড়ি টানতে লাগল। ভাবনার আর শেষ নেই। অর্থ চিন্তাটাই প্রধান এবং একমাত্র। পেশা বদলাবার চেষ্টা সে যে একেবারে না করে দেখেছে তা নয়। বিনা মূলধনে যা করা যায় সেই দালালীও করেছে। জমির দালালী, আসবাবপত্রের দালালী, ইনসিওরেন্সের দালালী—সবই দু' একবার করে পরখ করেছে। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হয়নি। স্টেশনারি দোকান দিয়েছিল একবার। কিন্তু এমন লোকসান যেতে লাগল, আর যে লোকের হাতে বেচাকেনার ভার দিয়েছিল সে এমন দু'হাতে চুরি করতে লাগল যে পাঁচ ছ' মাসের মধ্যে দোকান তুলে দিয়ে তবে রেহাই পেল পরেশ। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মাথায় করে মোট ত্রো আর বইতে পারে না—কি রিক্সাও টানতে পারে না। যা স্বাস্থ্য তাতে বাস ট্রামের কণ্ডাক্টবি করবার জো-ও নেই। তাই পরেশ যা করে আসছে তাই তাকে করে যেতে হবে। কিন্তু একথা সুধা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

দোরের সামনে পিওন এসে দাঁড়াল। চিঠিটা সে বাকসে ফেলবার আগেই পরেশ তার হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল পোস্টকার্ডটা, বলল, 'দাও, হাতেই দাও।'

চিঠিটা আগাগোড়া পড়বার পর খুশিতে ভরে উঠল পরেশের মুখ। প্রত্যাশিত সুখবরই এসেছে। ভুবনেশ্বর থেকে তার এজেন্ট মুকুন্দ মহাপাত্র লিখেছে—পরেশ যেন দু-চার দিনের মধ্যেই তার দল নিয়ে রওনা হয়ে পথে আর কোথাও দেরি না করে একেবারে সরাসরি ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হয়। মুকুন্দ এত বায়না জোগাড় করেছে যে তিন চার মাস ভুবনেশ্বর, কটক আর পুরী এই তিন জেলার গ্রাম আর গঞ্জেই পরেশ কাটিয়ে দিতে পারবে। গতবার যে গাওনা করে গিয়েছিল, তাতে সুধা হালদার ও সম্প্রদায়ের বেশ নাম হয়েছে। চাহিদা আরও বেড়েছে। আর্টিস্টদের রূপ গুণ যেন দলের সেই মর্যাদা রাখতে পারে। যাতায়াত রাহা খরচা বাবদ একশ টাকা এম-ও করে পাঠাচ্ছে মুকুন্দ। পরেশ যেন রওনা হতে বেশি দেরি না করে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই। এসে পৌঁছলে খাই খরচা, বাসা ভাড়া বাবদ আরো টাকা পাবে।

মুকুন্দ মহাপাত্র খুব নির্ভরযোগ্য এজেন্ট। পরেশের কাছ থেকে সে টাকায় ছ' আনা কমিশন পায়। নিজের স্বার্থেই সে বায়নাপত্র জোগাড় করে। তাই তার কথায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। সমস্যার সমূহ নিরসন হল দেখে পরেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং স্ত্রীকে সুখবরটা দেওয়ার জন্যে ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু যার নামে দল, যার নামটা নানা উপলক্ষে দেশ-বিদেশের লোকের মুখে মুখে ফেরে সে খুশি হল কই।

খানিক আগে থলিতে করে যে অল্প-স্বল্প মাছ তরকারি এনে দিয়েছিল পরেশ, সে সব কুটে ধুয়ে সুধা ততক্ষণে রান্নার ব্যবস্থা করছে।

পরেশ এসে বলল, 'শুনছ, মুকুন্দ একশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, আর চিন্তা নেই।'

সুধা মুখ নাড়া দিয়ে বলল, 'একশ টাকা পাঠিয়েছে তবে আর কি, মহারাজা হয়ে গেছ! আমি তোমাকে হাজার বার বারণ করিনি ওই মাগীগুলিকে নিয়ে তুমি আর বেরোতে পারবে না? ও ব্যবসা তোমাকে ছাড়তে হবে। তবু তুমি গোপনে গোপনে মুকুন্দের সঙ্গে লেখালেখি করতে গেছ কোন আক্কেলে? আমার নাম ধুয়ে খাবে, কিন্তু আমার একটা কথাও কি কানে তুলবে না? আচ্ছা জ্বালায় পড়েছি।'

পরেশ হেসে বলল, 'যা বলেছিস সুধা। তোর নামের গুণেই তো আছি।'

মনে যখন বেশ স্ফূর্তি হয়, অকূল ভাবনার কিনারা পাওয়া যায়, তখন স্ত্রীকে তুমি ছেড়ে তুই বলেই ডাকে পরেশ। তাতে ওর সঙ্গে যেন আরো অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। তুমিটা যেন বড্ড পোশাকি। তুইটা আট-পৌরে, একেবারে দিলখোলা ডাক।

পরেশ মনের খুশিতে বলে চলল, 'সত্যিই তোর নামের গুণ আছে সুধা! তোর নামের গুণেই তো তরে যাচ্ছি। নইলে কি আর তরবার জো ছিল?'

বিড়ির শেষটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরেশ গুনগুনিয়ে গান ধরল, 'সখি তব নাম লয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে ঝাঁপ দিলাম আজি পরীক্ষা সাগরে।'

গান শুনে ময়না এসে বাপের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ছোট সাদা সাদা দাঁত কটি বার করে হেসে

বলল, 'বাবা, আমিও গাইতে পারি। গাইব ?'

পরেশ বলল, 'গা দেখি মা, গা তো।'

সুধা ধমক দিয়ে উঠল, 'থাক থাক। বাপ হয়ে মেয়েকে কি সব গানই শেখাচ্ছ। আর আমি কিছু বললে দোষ হয়, বাবুর তাতে জাত যায় অপমান হয়। এখন নিজে যে বেলেল্লাপনা করছ তার কি।'

পরেশ বলল, 'বেলেল্লাপনা নারে সুধা, একে বেলেল্লাপনা বলে না। ময়নার যা বয়স তাতে ওর কাছে সব নামই হরিনাম, সব গানই ভালো গান। সেই যে কথায় আছে না—আপ ভালো তো জগৎ ভালো। ময়না, আমার ময়না পাখি, পড়তো, আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

ময়না বাপের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করল, 'আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

সুধা কড়ায় ডাল চাপাতে চাপাতে বলল. 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কত যে ভালো তুমি—কত যে গুণধর পুরুষ—তা তো আমার জানতে বাকি নেই। বাইবে যাবার কথা শুনেই তোমার মন উড়ু উড়ু হয়েছে। গলা দিয়ে সুর বেরোচ্ছে। আনন্দের আর সীমা নেহ তোমার। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখতো, আমি কী নিয়ে থাকি।'

অভিমানে মুখখানা ভার ভার হল সুধার। বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে দেহের বাঁধুনি বেশ আঁটসাঁট আর মজবুতই আছে। সুন্দরী নয় সুধা। গায়ের রঙ কালো। নাক চোখ একেবারে নিখুঁৎ না হলেও মুখের ডৌলটা মন্দ নয়। কাজ চালাবার মত নাচ গান দুইই শিখেছিল। কিন্তু এখন দেহ ভারি হয়ে যাওয়ায়, ছেলেপুলে হওয়ায় পরেশ ওর নাচটা বন্ধ করে দিয়েছে। গানের গলা এখনো আছে। কিন্তু ঘরের বাইরে ওকে গাইতে দেয় না পরেশ। বলে, 'তুমি এখন ঘবের বউ, যা করবে ঘরে বসে কর।'

সুধার অভিমান-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশ একটু হাসল. 'কী নিয়ে থাকি মানে। ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেমেয়ে রয়েছে। মেয়েমানুষ যা নিয়ে থাকে তার সবই তো তোমার আছে সুধা ! সবই তো দিয়েছি। তবু ও কথা কেন বলছ।'

সুধা বলল, 'বলছি যে কেন তা তুমি কি করে বুঝবে। মেয়েমানুষের প্রাণ নিয়ে তোমবা ছিনিমিনি খেলে বেড়াও। তার প্রাণের যাতনা তোমরা কি বুঝবে ?'

সুধার মুখে এ ধরনের কথা শুনে পরেশ একটু অবাক হল। পাঁচ বছর আগেও সুধা যেভাবে জীবন কাটিয়েছে তাতে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ সুধার কম ছিল না, সাধারণ পুরুষের চেয়ে বরং বেশিই ছিল। সে সব খবর যে পরেশ একেবারে না রাখে তাও নয়। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর ধরে ঘর-সংসার করে সুধা যেন একেবারে চিরকালের কুলবধূ হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বজীবন যেমনই হোক না কোন মেয়ে যদি অমন কাতরভাবে প্রাণের যাতনার কথা বলে পুরুষের মন না গলে পারেনা, বিশেষ সে পুরুষ যদি স্বামী হয়, সুখেদুঃখে ঘর-সংসার করে ছেলেমেয়ের বাপ হয়—তাহলে কি আর তার মন না গলে পারে ! পরেশেরও মন গলল। ছোট জলচৌকিটা টেনে নিয়ে স্ত্রীর গাঁ ঘেঁষে বসে বলল, 'খুব বুঝি সুধা, খুব বুঝি। কিন্তু পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। সেই জ্বালাতেই যে ছুটে বেরোতে হয়। শুধু তো নিজেরা দুজন নয়, ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদেরও তো খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

সুধা বলল, 'তা কি আর জানিনে ? কিন্তু তোমাকে দু'দিনের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দিতে আমার ইচ্ছে হয় না। আর এ তো মাসের পর মাস। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে ফেলে মজা দেখছ। আমার পাখা দুটো কেটে নিজের পকেটে গুঁজেছ। কিন্তু তাই বলে তোমার ওড়া তো বন্ধ হয়নি। তোমার সঙ্গে এমন চুক্তি তো ছিল না। আমি একা ঘরে লক্ষ্মী বউ হয়ে থাকব, আর তুমি বেপরোয়া হয়ে আগের মতই একদল মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে—এমন শর্তে তো আমি রাজী হইনি, কোনদিন হবও না।'

পরেশ এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভালো জ্বালা ! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল ওই এক কথা। ও ছাড়া তোমার আর কি কোন কথা নেই ?'

সুধা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের রান্নায় মন দিল। স্বামীর কথার কোন জবাব দিল না।

পরেশও আর দেরি না করে ছিটের শার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার এখন অনেক কাজ।

পরেশের দলটা যে সারা বছর একটি শতদলের মত থাকে, তা নয়। বরং পাপড়িগুলি ইতস্তত কোথায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে—বছরের মরশুমের সময় ছাড়া অন্য সময় তার কোন আর খোঁজই মেলে না। মরশুমের শুরুতে পরেশ আবার এক একটি করে গাইয়ে জোগাড় করে, তাদের বহু টাকা রোজগারের লোভ দেখায়, নামযশের প্রলোভন সামনে তুলে ধরে। বেরোবার সময় দলের বন্ধনটা ঠিক থাকে, বিদেশে একই বাসায় একই হোটেলে আহার বাস এবং একই আসরে গান বাজনার ভিতর দিয়ে সেই সম্পর্কের বন্ধনটা আরো শক্ত হয়—কিন্তু কলকাতায় আসবার পর ফের আবার তা টুকরো টুকরো হয়ে ছিড়ে পড়ে। আবার তাদের কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড় করতে হয়। এমনি বছরের পর বছর চলছে। এতে কোন ক্লান্তি নেই পরেশের। প্রতি বছরই নিত্য-নতুন লোক, নিত্য-নতুন মেয়ে। দলের এই অদল বদলে আজকাল আর বিশেষ কোন আফশোস নেই পরেশের। দলের অনিত্যতাটাই নিত্য। যেমন জীবনের—ট্রাম-বাসে এক একদিন এক এক দল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তাই নিয়ে কি কেউ হা-হুতাশ করে? পরেশও তার এই দলের লোকদের কাজের যন্ত্র হিসাবেই দেখে। কাজের সম্পর্ক, টাকা-পয়সা লেন-দেন ভাগ-বখেরার সম্পর্ক ছাড়া তাদের সঙ্গে পরেশের আর সম্পর্ক থাকে না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্যতিক্রম হয়। যেমন সুধার বেলায় হয়েছিল। কাজের যন্ত্র মাঝে মাঝে তার-যন্ত্রের মত বাজে আবার তা কখনো কখনো অন্য রকম যন্ত্রণার কারণও হয়ে ওঠে। ভাবের সম্পর্ক রসের সম্পর্ক কখন যে আস্তে আস্তে শুধু নীরস দরকারের সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ায় টের পাওয়া যায় না। যখন টের পায় লোকে অবাক হয়ে থাকে।

লালবাজারের মোড়ে এসে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল পরেশ। খানিকটা এগোলেই ডান দিকে নিমাই সরকারের ফার্নিচারের দোকান। সরু এক ফালি ঘেরা জায়গা সুড়ঙ্গ পথের মত বহু দূর চলে গেছে। সেই তুলনায় ঘরখানার প্রস্থ নেই বললেই চলে। দোকানে ঢুকবার আগে বাইরে এক মুহূর্ত চুপ করে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলে পরেশ। বিড়িটা হাতে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। নিমাই নিজের হাতেই একমনে একটা খাটের পায়া পালিশ শুরু করেছে। পিছনের গুদামে খাট আলমারি চেয়ার টেবিল আরো অনেক জিনিস আছে। ডানদিকে ঠিক রাস্তার সামনে ছোট এক জোড়া চেয়ার টেবিল। গোটা দুই খাতা, দোয়াত-কলম। নিমাই যখন বাবু হয়ে বসে, খদ্দেরের অর্ডার নেয়, টাকা নিয়ে রিসিট লিখে দেয়, তখন ওই চেয়ার টেবিলের দরকার হয়। অন্য সময় নিচে বসে নিজের হাতেই কাজ করে নিমাই। সিরিষ কাগজ দিয়ে ফার্নিচার ঘসে, পালিশ করে। পরেশের মনে পড়ে নিমাইর বাবা নিকুঞ্জ সরকারও তাই করতেন। নিজের হাতে পালিশ, নিজের হাতে বেচা-কেনা করতেন তিনি। নিমাই সব দিক থেকেই একেবারে বাপকা বেটা হয়েছে। দেখতেও সেই রকম লম্বা। সেই চোয়াল, মুখ, নাক চোখ হাত পায়ের গড়নও একই রকম। নিজের চেহারায়, বেশে বাসে পেশায় মরা বাপকে বাঁচিয়ে রেখেছে নিমাই।

কিন্তু পরেশের বাবার চেহারা পরেশের নিজের মতই ছিল কিনা এখন আর তা তার মনে নেই। খুবই অল্প বয়সে তার বাবা মা মায়া কাটিয়েছেন। শোনা যায়, তাঁদের দুজনের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ছিল না। তবু বাবা ভদ্রলোকের জীবিকা—মার্চেন্ট অফিসের কেরানীগিরিই শেষ দিন পর্যন্ত করে গেছেন। সে পথ ধরবার মত বিদ্যাবুদ্ধি পরেশের হয়নি। বহুদিন তাই পথে পথেই কেটেছে। বাপের বৃত্তি না পেলেও প্রবৃত্তি যে একেবারে পায়নি পরেশ, সে কথা জোর করে বলা যায় না। হয়তো অফিসে বসে কলম পিষতে পিষতে তাঁর মন যে বাঁধন ছেঁড়া যাযাবরের স্বপ্ন দেখত পরেশের বাস্তব জীবন সেই স্বপ্নই খানিকটা সফল করেছে।

বিড়ির টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে পরেশ তার বন্ধু নিমাইর দোকানের ভিতরে ঢুকে তার মাথায় আলগোছে একটা চাঁটি মেরে বলল, 'কি রে খুব পালিশ-টালিশ করছিস যে। কার ফুলশয্যার খাট সাজাচ্ছিস রে নিমু? এই অঘ্রাণ মাসের মরশুমে কটা বিয়ের অর্ডার ধরলি?'

নিমাই একটু চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, তারপর পরেশকে দেখে হেসে বলল, 'ও তুই? বোস বোস। দে বিড়ি দে।'

মালিকের বসবার জন্য সেই হাতলহীন রাজসিংহাসনখানা ছাড়াও একটি টুল আছে বসবার। পরেশ সেই টুলটা টেনে নিয়ে বলল, 'বাঃ, মজা মন্দ না, এলাম তোর দোকানে—আর তুই বিড়ি চাচ্ছিস আমার কাছে।'

তারপর পকেট থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা বন্ধুর হাতে দিল পরেশ, আর একটা নিজে ধরাল।

নিমাই পালিশের কাজ ফেলে রেখে হেসে বলল, 'আরে ছোট বড় সব নেশার ব্যাপারে তুই-ই তো হলি মহাজন। আমরা কেবল পালিশ করে করেই গেলাম। আর ফুলশয্যার নিত্য-নতুন ফুলকুমারী কোলে করে তুই এক জীবন ভোর করে দিলি।'

পরেশও হাসল, 'যা বলেছিস। জীবনটা একটা ফুলশয্যার রাতই বটে। কিন্তু ফুলও একটা নয়, শয্যাও একখানা হলে চলে না। তবে তোর মুখে এ আফশোস কেন। তোরা শালা তো দু পুরুষ ধরে জীবনে উন্নতি করবার জন্যে আদা নুন খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছিস, দু' বেলা কাঁচকলা সেদ্ধ দিয়ে সাত্ত্বিক আহার করছিস, পঞ্জিকার দিনক্ষণ দেখে বউকে সোহাগ করছিস, আর ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কে হাত বুলাচ্ছিস। তোদের সঙ্গে কার তুলনা।' পিঠ চাপড়ে পরেশ বন্ধুকে একটু আদর করল তারপর একটু হেসে গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, 'আমাকে শ' দুই টাকার একটা বেয়ারার চেক লিখে দে তো নিমু। বড্ড দরকার।'

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলিস কি! টাকা কোথায় পাব। আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও তো দুশো টাকা বের হবে না।'

পরেশ বলল, 'আরে তা কি আর জানিনে? পকেটমারদের মত ধরা পড়লে টাকা তুই গিলে ফেলতে পারিস নে। টাকা যেখানে রাখবার সেখানেই রাখিস। কিছু ওঠে গয়না হয়ে বউয়ের হাতে গলায় কানে। আর বাকিটা ব্যাঙ্কে। সেই ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা তোকে তুলে দিতে হবে।'

নিমাই তার পালিশ মাখা হাত দুখানা জোড় করে বলল, 'মাফ করিস ভাই। এবার আর একটা পয়সাও আমি দিতে পারব না। আমার নিজেরই ভারি হাত টানাটানি যাচ্ছে। কাজ কারবার কিচ্ছু নেই। বেচা কেনা বন্ধ। শালার পালিশওয়ালা দু'দিন ধরে আসছে না। দৈনিক রেট নিয়ে ঝগড়া করে চলে গেছে। অথচ যে করেই হোক, মাল আমাকে পরশুর মধ্যে ডেলিভারি দিতে হবে। যা অশান্তি আর ঝামেলায় আছি, তা আর কহতব্য নয়। তোর কি মেয়ে নাচিয়ে পয়সা করে বেড়াচ্ছিস। বেছে বেছে বিয়ে করেছিস এক বাঈজীকে। সেও দু-হাত দু-পা দিয়ে রোজগার করছে। তোর পয়সার অভাব কিসে। তুই কেন টাকা চাইতে এসেছিস আমার কাছে?'

পরেশ রাগ করল না। হেসে নিমাইর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, 'এসেছি তুই আমার নেংটাকালের বন্ধু বলে। একই সঙ্গে স্কুল পালিয়েছি, অল্প বয়সে বিড়ি-সিগারেট মদ-মেয়েমানুষ ধরেছি। তারপর তুই শালা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে সব ছেড়ে দিলি, আর সবগুলি কুগ্রহ আমাকে জড়িয়ে রইল। তবু তুই আমার প্রাণের বন্ধু, একমাত্র দোসর। তোর বিপদ আপদে আমি আছি, আমার বিপদ আপদে তুই।'

নিমাই ফের আবার পালিশের কাজে হাত দিল। পরেশ বলতে লাগল, 'তাছাড়া আমি কবে সাউকারি রাখিনি তাই বল। টাকা যেদিন ফেরৎ দেব বলেছি তার দু'দিন আগে ছাড়া পরে দিইনি। তুই যদি এবার সুদ চাস, তাও স্পষ্ট করে বল সেই সুদই আমি দেব।'

নিমাই মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বাজে বকিসনে। আমি অত দিতে পারব না। তবে যা পারি তা দেব। কাল আসিস।'

পরেশ খুশি হয়ে উঠে নিমাইর মাথায় আর একটা চাঁটি মেরে বলল, 'এইতো চাই ওস্তাদ। সাবাস, আবার কি। তুই যা দিবি তাই ঢের। তুই হাত ঝাড়লেই আমার কাছে পর্বত। জানিস এবার আমার নারী বাহিনী নিয়ে প্রথমেই উড়িষ্যায় যাচ্ছি। এমন সব উর্বশীদের নিয়ে যাব—তাদের দেখে স্বয়ং কাঠের জগন্নাথের চিত্তও চঞ্চল হয়ে উঠবে। তুই শালা কাঠুরে, তোরই কিছু করতে পারলাম না। তোর ব্যবসা কাঠের, চেহারা কাঠের, প্রাণটা কাঠ দিয়ে তৈরি। তুই একটা জাত কাঠ-ঠোকরা। কাঠের ব্যবসায় তোর উন্নতি হবে না কেন?'

নিমাই হেসে বলল, 'বেশ আছিস। দে একটা বিড়ি দে।'

বিড়িটা এবার আর বন্ধুর হাতে দিল না পরেশ. তার দুই ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, 'খা যত পারিস বিড়ি খা। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ জয় করে যখন ফিরব, তখন এমনি ক'রে মিনিটে মিনিটে গোল্ডফ্লেক সিগারেট গুঁজে দেব।'

পরেশ এবার বন্ধুব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান ঘর থেকে ফুটপাতে নামল।

নিমাই ফের পালিশের কাজে লাগবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে পরেশের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর নিজের মনেই বলল, 'বেশ আছে।' চাপা একটা নিঃশ্বাস পড়ল নিমাইর। কেন তা সে নিজেই জানে না।

বেশ পরেশ ছিল না। কিন্তু মহাপাত্রের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও যেন মহাসমুদ্রের মত নেচে উঠেছে। এতক্ষণে নিজের কাজ খুঁজে পেয়েছে পরেশ। শুনতে পেয়েছে কর্ম সমুদ্রের ডাক। তাই এক মুহূর্তে সমস্ত অবসাদ আর নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটে চলেছে সামনের দিকে। যা তার পেশা তাই তার নেশা। বাকি পথটুকু পরেশ পায়ে হেঁটেই চলল। বেলা দশটা। 'ডালহৌসী' যাত্রী ট্রাম-বাসগুলিতে লোক বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুব-মুখো যানবাহনগুলিতে ভিড় নেই। তার কোন একটায় অনায়াসেই উঠে পড়তে পারে পরেশ। কিন্তু এখন তার হাঁটতেই ভালো লাগছে। বউবাজারের মোড়ে এসে উত্তরমুখী হয়ে কলেজ স্ট্রীটে পড়ল পরেশ। তারপর রাস্তা পার হয়ে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকের ছোট সরু গলি। কয়েকটি অচেনা বাড়ি ছাড়িয়ে একটি চেনা বাড়ির ভিতরে ঢুকে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে দোতলায় উঠে পড়ল পরেশ।

প্রথমেই মুখোমুখি হল স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে। বাথরুম থেকে স্নান করে চওড়া পেড়ে একখানা শাড়ি পরে মানদা নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, পরেশ অন্তরঙ্গ সুরে ডাকল, 'এই যে মাসী।'

মানদা হেসে বলল, 'বোনপো যে। তারপর কি খবর তোমার ?'

পরেশ বলল, 'এই তোমার খোঁজ-টোজ নিতে এলাম। বলি আছ কেমন ?'

মানদা বলল, 'আহা মাসীর জন্যে যে কত পরাণ কাঁদে তোমার, তা জানা আছে। কাঁদে যাদের জন্যে আমার সেই বোনঝিরা সবাই ঘুমে মবে আছে। কেউ ওঠেনি। কারো দেখাই এখন পাবে না।'

পরেশ বলল, 'মেজো সেজো কারোরই না ? মায়ার খবর কি ? যত রাত্রেই ঘুমোক, সে তো সকাল সকালই উঠত।'

মানদা বলল, 'তুমি আছ কোন রাজ্যে। মায়া কি আর এখানে পড়ে আছে না কি ? তার কপাল খুলে গেছে গো, কপাল খুলে গেছে। ঘরে এসো সব বলি।'

পরেশ মানদার পিছনে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁষে একখানা খাটপাতা। জোড়া বালিশ রঙীন একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। দেয়ালে কালী আর লক্ষ্মীর মূর্তি টাঙানো। আর একদিকে একটা দামী কাঁচের আলমারি। ওপরের তাকে কিছু মাটির পুতুল সাজিয়ে রেখেছে মানদা। নিচের তাকগুলিতে শাড়ি আর গরম কাপড়-চোপড় সযত্নে ভাঁজ করে রেখেছে।

পরেশ চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, 'মায়া কোথায় গেছে তাড়াতাড়ি বল, আমার সময় বেশি নেই।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মানদা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'বাব্বা, আমার বোনপো যে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। কিন্তু ঘোড়াতেই চড় আর গাড়িতেই চড় সে পাখি উড়েছে। উড়ো জাহাজে চড়লেও তার আর নাগাল পাবে না।'

পরেশ এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'আরে বলেই ফেল না ছাই কী হয়েছে, কোথায় গেছে। দয়া করে আর হেঁয়ালী কোরো না। আমার সত্যিই আজ তাড়া আছে।'

পরেশ একবার হাত ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে নিল।

মানদা তার ব্যস্ততা দেখে হাসল, 'তাড়া যদি থাকে চলে যাও না। আমি তো আর কাউকে বেঁধে রাখিনি। কাউকে বেঁধে রাখবার মত দড়ি-কাছি তো ভালো. একগাছা সুতোও আমার নেই।'

পরেশ অধীর হয়ে বলল, 'দোহাই গৌরচন্দ্রিকা বাড়িয়ো না। এই পঞ্চাশ বছরেও তোমার কিচ্ছু যায়নি, সব আছে। এখন মায়ার খবরটা বল।'

মানদা বলল, 'কেবল মায়া আর মায়া। মায়া যে সবাইকে কলা দেখিয়ে সরে পড়েছে গো—কতবার বলব। এক সিনেমার বাবু এসেছিল। কাঁচা বয়স। মায়াকে দেখে তার গান শুনে মুখচোখ ঘোরাবার ভঙ্গি দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে। মায়াকে বলেছে—তোমাকে সিনেমায় নামাব থিয়েটারে নামাব। অমুক করব, তমুক করব, গোটা কলকাতা শহরটা তোমার নামে লিখে দেব। ছুঁড়ী অমনি ভুলেছে। ভোলবারই যে বয়স, ভুলবে না কেন।'

পরেশ হতাশ ভাবে বলল, 'তারপর?'

মানদা বলল, 'তারপর আর কি। পালিয়েছে এখান থেকে। মিথ্যে বলব না। ভাড়া-টাড়া সব দিয়েই। এত করে বললাম, মায়া, অমন ভুল করিসনে। আজ যে মাথায় করে নিচ্ছে কাল সেই আবার নাথি মেরে তাড়াবে। কিন্তু মেয়ে কি শুনল। চোখে নেশা ধরে গেছে, পেটে বাচ্চা এসেছে। এদিকে সেই বাবু ভরসা দিয়েছে স্ত্রীর মত রাখবে। বলে অমন অনেকেই। কতজনে রাখে তা আমার জানা আছে। কিন্তু তোমাকে দেখেছে কিনা, চোখের ওপর সুধার সুখ দেখেছে কিনা—তাই সেই সুখের সন্ধানে গেছে মায়া। মুখপুড়ী আবার এল বলে।'

সব শুনে পরেশ স্তব্ধ হয়ে রইল। মানদা যাই বলুক পরেশের উড়িষ্যা যাত্রার আগে যে আসবে তার ভরসা নেই। উনিশ-কুড়ি বছরের বেশি বয়স ছিল না। বেশ স্বাস্থ্যবতী, দেখতে-টেখতে ভালোই ছিল। শিখিয়ে-পড়িয়ে তালিম দিয়ে মেয়েটাকে বেশ তৈরীও করে নিয়েছিল পরেশ। ওর ওপর অনেক ভরসা করেছিল। গেল মাথায় বাড়ি দিয়ে। 'অন্য ব্যবসা কর, অন্য কাজ-কর্ম কর' বলে সুধা এমন উত্যক্ত করেই তুলেছিল যে এদিকে আর খোঁজ-খবর নিতে পারেনি পরেশ। টাকা ধারের চেষ্টায় এখানে ওখানে ছুটে বেড়িয়েছে। নানা ফিকির ফন্দিতে দিনগুলি কেটে গেছে। আর সেই ফাঁকে তার দলের রত্ন মায়াকে আর একজন হাত ধরে নিয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল পরেশ। স্ত্রীর ওপর তার দারুণ রাগ আর আক্রোশ হতে লাগল।

মানদা তার ভাব-ভঙ্গি দেখে হেসে বলল, 'কি হল ম্যানেজার। তোমার ভাব-টাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘরের বউ পালিয়ে গেছে।'

পরেশ বলল, 'দলের সেরা মেয়ে বেহাত হয়ে গেলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ হয় মাসী। এখন আমি কি উপায় করি। তোমার বাড়িতে আর কোন ভালো মেয়ে-টেয়ে আছে নাকি। গান বাজনা জানে এমন মেয়ে দিতে পার দুটি একটি? মায়ার মত অত ভালো না হলেও কাজ চালিয়ে নেওয়ার মেয়ে।'

মানদা তার কালো কালো দাঁতগুলি বার করে হেসে বলল, 'কপাল আমার। এখন যেগুলি আছে সেগুলি একেবারে কাণাকড়ি আর অচল পয়সা। গান তো ভালো, গলা চিবে ফেললেও এক ছিটে সুর বেরোয় না। আর নাচের মধ্যে জানে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কেবল লাথি ছুঁড়তে। পেত্যয় না চাও সন্ধ্যার পর এসে নিজের হাতে বাজিয়ে দেখো। এখন তো সব ঘুমে অচেতন। এখন তো আর দেখা সাক্ষাৎ পাবে না।'

পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চলি মাসী।'

মানদা বলে, 'সে কিগো, চা-টা না খেয়েই উঠছ? বোসো বোসো চা আর সিঙ্গাড়া আনাই।'

কিন্তু পরেশ আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, 'এখন আর চা খাবার সময় নেই। সন্ধ্যার পর তো আসছিই, তখন এসে গল্প-টল্প করব। তুমি চান করে এসেছ, এবার সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নাও। আমিও আমার কাজ-কর্ম দেখি গিয়ে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরেশ এসে ফের রাস্তায় নামে। বড় ছেনাল মেয়েমানুষ মানদা। ওর বোধ হয় ইচ্ছা নয়—তার বাড়ি থেকে কোন মেয়েকে আর পরেশের দলের সঙ্গে যেতে দেওয়া। যদিও তার জন্যে মানদাকে কিছু সেলামি দেয় পরেশ, তবু সে খুশি নয়। এমনি করে ভালো ভালো

মেয়েগুলি পালালে তার বাড়ি কাণা হয়ে যাবে এই বোধ হয় তার আশঙ্কা। বাইরে গেলেই চোখ কান ফুটে যায়, চালাক চতুর হয়ে যায় মেয়েগুলি। পরেশ নিজেও তা লক্ষ্য করেছে। বাইরে বেরোলেই ওরা জীবনের উন্নতির সিঁড়িতে পা দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কেউ মনের মানুষ নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়, কেউ চলে যায় অন্য গানেব দলে, সিনেমা থিয়েটারে—যেখানে বেশি মাইনে, বেশি রোজগারের আশা আছে। সবাই উন্নতি চায় জীবনের। যেদিক দিয়ে পারে সে কয়েক ধাপ উপরে উঠতে চায়। পরেশ নিজের হাতে কত মেয়েকে গড়ল, সুযোগ সুবিধা দিল, তারপর তারা দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। পরেশকে কেউ আর পাত্তা দিল না। কেউ তার জীবনের উন্নতির দিকে তাকিয়ে দেখল না। প্রত্যেকেই যে যার নিজের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কারো দিকে তাকাবার মানুষের সময় কই ? একমাত্র ব্যতিক্রম সুধা ! তাকে আর যেতে দেয়নি পরেশ। কোথাও পালিয়ে যেতে দেয়নি। নিজের ঘরের মধ্যে সোনার শিকলে তাকে বেঁধে রেখেছে। ছেলে-মেয়ে সংসার সব দিয়েছে তাকে। কিন্তু অমন দেওয়া তো আর সবাইকে দেওয়া যায় না। ছিটে-ফোঁটা অনেককে দেওয়া যায়। কিন্তু ভরা পাত্র ধরে রাখতে হয় একজনের জন্যেই। সুধাকে যে কাঁধে করে রেখেছে, তেমন করে কটি মেয়েকেই বা রাখতে পারে পরেশ ? সুধাকেই কি পুরোপুরি রাখতে পেরেছে ? স্ত্রী হয়ে আছে সুধা—সন্তানের মা হয়ে আছে। কিন্তু সে এখন দলের আর কোন কাজে লাগে না। তার গলা মোটা ভারি হয়েছে, গান তেমন আর বেরোয় না। দেহ ভারি হয়ে গেছে। নাচতে আর সে পারবে না।পায়ের ঘুঙুর মিঠে বোল দেবে না কোন দিন। দেহের সেই সুঠাম গড়ন, তার সৌন্দর্য আর লাবণ্যও সুধাব যেতে বসেছে। সব চেয়ে যা মারাত্মক কথা—সুধা নিজেই এখন নিজের দলের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু সে দলের পক্ষে নিজেই অকেজো হয়ে গেছে, তাই দলকেও সে আর কাজ করতে দিতে চায় না। যেহেতু সে নিজে অকেজো হয়ে গেছে তাই দলকেও ভেঙে চুরমার করে ফেলতে চায়। মেয়েরা এমন হিংসুটেই হয় বটে। বীণা যেমন ছিল, সুধাও তেমনি হয়েছে। কিন্তু হাজার মেয়ে আত্মবলি দিলেও নিজের দলকে ভেঙে দিতে পারবে না পরেশ। দল শুধু তার জীবিকা নয়, তার মুক্তি। তার বাইরে বেরোবার ছাড়পত্র। যেমন করেই পারুক—দল সে রাখবেই। আর ভালো ভালো মেয়ে এনে দলের গৌরব বাড়াবে। তার জন্যে প্রাণ যদি পণ করতে হয় তাও করবে।

হাঁটতে হাঁটতে কানাই ধর লেনে এসে হাজির হল পরেশ। এখানে থাকে গোবিন্দ তালুকদার। দলের তবলচী। পরেশের অনেক দিনের পরিচিত মানুষ। গান বাজনার লাইনে বহুদিন ধরে আছে। একটি পুরোন দোতলা বাড়ির একতলায় সামনের দিকের ঘরগুলিতে দোকানপাট ! মনিহারি দোকান, ফটো বাঁধাবার দোকান, একটা লণ্ড্রি। মাঝখান দিয়ে সরু এক ফালি পথ। সেই পথে এগিয়ে গিয়ে দুখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকের তৃতীয় ঘবখানিতে গোবিন্দ থাকে। ভিতরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে তবলার বোলের শব্দে বোঝা গেল মালিক ঘবেই আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিতালটা শেষ না হল, পরেশ দরজাব বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কড়া নাড়ল না। তাহলে গোবিন্দের মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর ওর মেজাজ একবার বিগড়ালে আর কথা নেই। একেবারে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে বসে গোবিন্দ। মুখ খারাপ করে, হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই দু-একটি চড়-চাপড় বসিয়ে দেয়। ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ করে। মাথায় এখনো বেশ ছিট আছে গোবিন্দের।

তবলার শব্দ বন্ধ হতে পরেশ দরজায় টোকা দিয়ে ডাকল, 'গোবিন্দ।'

ভিতর থেকে সাড়া এল, 'কে ? পরেশ ? এসো এসো।'

দরজা খুলে গোবিন্দ তাকে ভিতরে ডেকে নিল।

ঘরের মেঝেয় একটা ছেঁড়া অপরিষ্কার মাদুর পাতা। তার ওপর জোড়া দুই বাঁয়া তবলা। এক কোণে একটা তানপুরা, পুরোন হারমনিয়ম।

একুশ বাইশ বছরের একটি সুদর্শন ছেলে বাঁয়া তবলা কোলের কাছে নিয়ে বসে ছিল। পরেশ তাকে চেনে। তার নাম মাণিক। গোবিন্দের ছাত্র। পরেশকে দেখে সে সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল।

পরেশ বলল, 'বোসো, বোসো।'

গোবিন্দ বলল, 'না ওর আর এখন বসে দরকার নেই। মাণিক ওর কাজে যাক। ওর আজকের

তালিম শেষ হয়েছে।'

মাণিক বলল, 'কি রকম দেখলেন ? আমার হবে তো গোবিন্দদা ?'

গোবিন্দ অভয় দিয়ে বলল, 'হবে হবে। লেগে থাকলেই হবে। তুই কিচ্ছু ভাবিসনে। শুধু কাজ করে যা।'

মানিক হেসে বলল, 'আপনাদের আশীর্বাদই তো সম্বল গোবিন্দদা।'

মানিক গোবিন্দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, আর গুরুর বন্ধু বলে পরেশকে প্রণাম করে গেল।

ছেলেই হোক মেয়েই হোক, কেউ যখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তখন পরেশের গাটা মাঝে মাঝে শির শির করে উঠে—আর মনটা ছম ছম করে। মনে হয় সত্যিই তার ভালো হওয়া উচিত ছিল, মানুষের মত মানুষ হওয়া উচিত ছিল, কম বয়সীদের প্রণামের উপযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই হল না পরেশের। কোন ভালো কাজ করল না, কোন ভালো কিছু শিখল না। গান বাজনার লাইনে থেকেও কোন একটা জিনিস আয়ত্ত করতে পারল না। সে শুধু ম্যানেজারি করল, মানে দালালি করে গেল। একজনের জিনিস আর একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়ে দু-পয়সা কমিশন পেয়েই সে সন্তুষ্ট রইল আজীবন। নিজের মূলধন বাড়াবার দিকে কোন দিনই চেষ্টা করল না। কেউ এসে প্রণাম করলে মাঝে মাঝে এই সব কথা মনে হয় পরেশের। শুধু ক্ষোভ নয়, আফশোস নয়, এই সব আচমকা প্রণাম মাঝে মাঝে তাকে চমকও দিয়ে যায়। মনে হয় এখনো বুঝি আশা আছে। এখনো চেষ্টা করলে নিজেকে খানিকটা তুলে নিতে পারবে, মরবার আগে অন্তত দু' একটা ছেলেমেয়ের দু' একবারের প্রণামের যোগ্য হবে। হঠাৎ কেউ এসে প্রণাম করলে মাঝে মাঝে মনের এই ধরনের এক অদ্ভুত অবস্থা হয়ে যায় পরেশের। এক এক সময় সে এমনও ভাবে—গোবিন্দের যেমন ভক্ত আছে ছাত্র আছে পরেশেরও যদি তেমন দু' একজন থাকত আর তারা পরেশকে রোজ এসে প্রণাম করত তাহলে বোধহয়, আর কিছু না হোক, চক্ষুলজ্জায় পড়ে পরেশ নিজের চেষ্টায় মানুষ হিসাবে দু' এক ধাপ ওপরে উঠত। কিন্তু তার ছাত্র হবে কে ? তার তেমন কোন গুণ নেই, বরং দোষে আগাগোড়া ভরতি।'

গোবিন্দ বলল, 'কি খবর ম্যানেজার, আজ যে একেবারে সকালেই বেরিয়ে পড়েছ ?'

পরেশের চেয়ে গোবিন্দ বেশ খানিকটা মাথায় লম্বা। পরেশ পাঁচ ফুটের ওপর ইঞ্চি দুয়েকের বেশি হবে না। গোবিন্দ তারও ওপর ছ' সাত ইঞ্চি বেশি। রোগাটে চেহারা বলে আরো লম্বা মনে হয়। আর মোটা সোটা বলে পরেশকে দেখায় বেঁটে। কিন্তু বেঁটে হলেও নির্গুণ হলেও প্রতাপ পরেশেরই বেশি। সে দলের ম্যানেজার আর গোবিন্দ তার সহকারী তবলচী মাত্র। গোবিন্দও সুপুরুষ নয়, মনে হয় যেন বাজপোড়া এক মরা তালগাছ। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চেহারা, লক্ষ্মীশ্রী কোথাও নেই। বিয়ে থা করেনি গোবিন্দ। শোনা যায় প্রথম বয়সে একটি মেয়েকে সে পছন্দ করেছিল, ভালোবেসেছিল। কিন্তু গান বাজনা নিয়ে আছে বলে সেই মেয়েটির বাপ মা গোবিন্দকে জামাই হিসাবে বরণ করতে চায়নি। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরেই সে মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তবু সে নাকি সুখী হয়নি। তার সেই সুখ না হওয়ার জন্যেই কি গোবিন্দের এমন শ্রীহারা চেহারা ? গোবিন্দ অবশ্য তা স্বীকার করে না। বিয়ে না করার জন্যে অন্য অজুহাত দেখায়। হেসে বলে, 'আমাদের বিয়ে করা সাজে না ভাই। আমাদের রোজগারের স্থিরতা নেই। চালচলন, শোয়া বসা, খানাপিনা কোনটাই গৃহস্থ ঘরের যোগ্য নয়। আমার পক্ষে একটা মেয়েকে ঘরে আনা মানে—চিরকালের জন্য একটা জীবনকে নষ্ট করে দেওয়া। তার কি দরকার পরেশ।

নষ্ট করবার মত, নিজের খেয়ালখুশি মেটাবার মত নিজের জীবনটাই তো আছে। অনাচার অত্যাচার তার ওপর দিয়েই যাক। কি দরকার তার সঙ্গে আর একটা জীবন জড়িয়ে। শুধু একটা কেন, সেই সঙ্গে আরো গোটাকত কচি জীবন হয় তো পুড়ে যাবে। একটা পচা আপেলের সঙ্গে রেখে আরো পাঁচটা ভালো আপেলকে পচিয়ে দেওয়ার কি দরকার। তার চেয়ে পচা আঙুর, পচা আপেল হওয়ার সুখ একাই ভোগ করি।'

কিছুতে ধরা দেয় না গোবিন্দ ! এমনি হেঁয়ালী রেখে কথা বলে। এতকাল একসঙ্গে আছে পরেশ, কিন্তু ওর দুঃখের কারণটা কিছুতেবুঝে উঠতে পারে না। ও নিজে মন খুলে কিছু বলে না বলে

লোকে নানারকম গল্প ওকে নিয়ে তৈরী করেছে। কেউ বলে ও ছিল কিন্নরকণ্ঠ। ভালো ওস্তাদের কাছে মার্গসঙ্গীত শিখেছিল। গায়ক হিসাবে নামও করেছিল। কিন্তু গোবিন্দের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ওকে ভুলিয়ে এক বাঈজীর কাছে নিয়ে যায়। সেই বাঈজী ওকে আদর করে কি সব খাওয়ায়। তাতে কিছুদিনের মত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল গোবিন্দের। মাথাটা পরে অনেকখানি ভালো হয়েছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা আর ফিরে আসেনি। ভাঙা ভাঙা গলা। সে গলায় গান গাওয়া যায় না। তাই যন্ত্র হাতে নিয়েছে গোবিন্দ। তার-যন্ত্র তার হাতে বিশেষ খুলল না বলে তবলা বাজায়। ওই স্থূল বাদ্যযন্ত্রটির ভিতর থেকে গোবিন্দ মাঝে মাঝে এমন মিঠে বোল বার করে আনে যে শুনে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু তবলচী হিসাবে পরিচিত হতে গোবিন্দের ইচ্ছা নেই। কোন আসরে কি বৈঠকে সে যায় না। নিজের গুণ নিয়ে নিজের মন নিয়ে সে লুকিয়ে থাকে। পরেশ পীড়াপীড়ি করলে তার সঙ্গে যায়, নিঃস্বার্থভাবে দলের জন্যে খাটে। নিতান্ত দরকার না হলে পরেশের কাছ থেকে কিছু নেয় না। পরেশ এ নিয়ে কিছু বললে গোবিন্দ হেসে জবাব দেয়, 'কত লাখ পঞ্চাশ যেন তোমার দলের আয় যে তুমি বাঁটোয়ারা করতে এসেছ। তুমি বউ ছেলে নিয়ে ঘর-সংসার করছ। আমার একটা পেট। তার জন্যে তো বেশি চিন্তা নেই। তা ভরাতে এমন কিছু বেগ পেতে হয় না।'

পরেশ গোবিন্দের এই ব্যবহারে, এ ধরনের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়। এত নির্লোভ, এত উদাসীন মানুষ হয় কি করে—পরেশ যেন ভেবে পায় না। কোন ধাতুতে গড়া এই মানুষটি। পরেশের মত কি শুধু রক্তমাংসেই তৈরী, না আরো অন্য কিছু আছে?

পরেশ মাঝে মাঝে বলে, 'গোবিন্দ, তুমি আমার চেয়ে শুধু মাথাতেই আধ হাত খানেক উঁচু নও—সব ব্যাপারেই উঁচু, সব ব্যাপারেই বড়। এমন দিল তুমি কোত্থেকে পেলে বল তো?'

গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বলে, 'কী যে বল। দিলের কী এমন পরিচয় পেয়েছ যে ও কথা বলছ?'

আজ পরেশের একটু চিন্তিত ভাব দেখে গোবিন্দ নিজেই আলাপ জুড়ে দিল, 'কি হে ম্যানেজার, কি হয়েছে তোমার? এসে অবধি যে মুখে সবা চাপা দিয়ে রইলে?'

পরেশ বলল, 'জানো গোবিন্দ, মায়া পালিয়েছে। কোন এক বাবুর সঙ্গে গিয়ে ঘর-সংসার করছে। সে আর এ লাইনে আসবে না। অন্তত আমাদের দলে থাকবে না। কি উপায় করি বলতো। এদিকে মহাপাত্র চিঠি লিখেছে, ওখানে শুরু হয়ে গেছে মরশুম। আমরা দলবল নিয়ে দু-চার দিনের মধ্যে যদি সেখানে গিয়ে না পড়তে পারি সব মাটি হবে।'

এ কথা শুনে গোবিন্দও চিন্তিত হয়ে পড়ল। মাদুরের ওপর বসে গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তাইতো ম্যানেজার, মহা মুসকিলেই ফেললে দেখছি। মায়াই যে দলের সবচেয়ে বড় আশা ভরসা ছিল। তোমাকে এত করে বললাম—সারা বছর দলটাকে চালু রাখবার ব্যবস্থা কর। তাতে দলের কাজও ভালো হয়। দেশের মধ্যে নাম যশও বাড়ে। সারা বছর ভরে দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ আর কাজ-কর্মের মধ্যে থাকলে মেয়েগুলিও এভাবে পালাতে পারে না।'

পরেশ বলল, 'আমারও তো তাই ইচ্ছা ছিল গোবিন্দ। কিন্তু বছর ভরে মাইনে দিয়ে একটা দলকে পোষা কি সোজা কথা। নিজেরই চলে না, তা আবার ওদের খরচ জোগাব! আর এই শহরে কি আশে-পাশে আমাদের কেই বা বায়না করবে, কেই বা অত টাকা দেবে।'

গোবিন্দ বলল, 'সে কথা ঠিক বলেছ। সমস্যায় পড়া গেল দেখছি।'

অন্তত একটি দুটি মেয়ে যদি খুব ভালো না হয়, তা হলে দলই কাণা হয়ে যাবে। যে সব মেয়ে এর আগে দলে কাজ করেছে কিংবা যাদের কাজ করবার সম্ভাবনা আছে তাদের মধ্যে গোবিন্দ কারো নাম করল, পরেশ কারো নাম করল। তাদের কারো খোঁজ পরেশ রাখে, কারো বা গোবিন্দ। খোঁজ-খবর বিনিময়ের পর দেখা গেল তাদের কাউকেই পাওয়া দুষ্কর। কেউ সিনেমায় সুযোগ পেয়েছে কেউ বা থিয়েটারে, কেউবা অন্য কিছু না পেয়ে নিজের রূপ যৌবনের সম্বলকেই বড় করে তুলেছে। সামান্য টাকায়, যৎসামান্যের প্রলোভনে তাদের কেউ কয়েক মাসের জন্যেও কলকাতার বাইরে যেতে চায় না। যাদের টেনে হিঁচড়ে ধরে নেওয়া যায় তাদের নিয়ে দলের কোন লাভ নেই।

গোটা কয়েক বিড়ি পোড়াবার পর হঠাৎ গোবিন্দ বলল, 'একটা পথ আছে। আশ্চর্য, কথাটা

এতক্ষণ মাথায় আসেনি।'

পরেশ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার ?'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দের উৎসাহ যেন নিভে গেল, তবে নিজের মনেই বলল, 'তবে মালার মা কি রাজী হবে ?'

পরেশ বলল, 'মালা ? ও তোমার সেই ছাত্রী ? তাকে পেলে তো কোন কথাই নেই। রূপে গুণে নাচতে গাইতে সব বিষয়েই সে ভালো। অমন মেয়ে আমাদের দলে আর আসেনি। তাকে পেলে তো কোন ভাবনাই থাকে না। তাকে পেলে মাথায় ক'রে নাচতে নাচতে নিয়ে চলে যাই। তাকে যদি বলে কয়ে নিয়ে আসতে পার, আমি তোমার চিরকালের গোলাম হয়ে থাকব।'

গোবিন্দ হেসে বলল, 'তা তো থাকবে, কিন্তু ওর মা কি রাজী হবে ? মেয়ে নিজেই কি রাজী হবে ? মেয়ের রূপ গুণ অবশ্য আছে, কিন্তু দেমাকখানাও তেমনি।'

পরেশ বলল, 'তা থাক। কমলের সঙ্গে কাঁটা থাকে গোবিন্দ। অমন দেমাক-ওয়ালীকে আমি অনেক দেখেছি।'

গোবিন্দ বলল, 'ছিঃ। মালা আমার ছাত্রী। মেয়ের মত। ওর মা এখন পর্যন্ত ওকে খারাপ পথে যেতে দেয়নি। কোন থিয়েটার-সিনেমাতেও নামতে দেয়নি। তবে আমাকে ওরা খুব মানে-গনে। আমার কথা না শুনে কিচ্ছু করে না। আমি যদি বলি—'

পরেশ গোবিন্দের দুখানা হাত জড়িয়ে ধরল, 'তোমাকে বলতেই হবে গোবিন্দ। যেমন করে পার, ওই মেয়েটিকে দলে আনতেই হবে। নইলে দল নিয়ে এবার আর আমি বেরোতে পারব না। দল তো একা আমার নয় গোবিন্দ, দল তো তোমারও। তুমি তার মান রাখ।'

গোবিন্দ বলল, 'কিন্তু ওদের যে বড় খুঁৎখুঁতি। মালার মা অবশ্য ওই পাত থেকেই এসেছে। সেও ধোয়া তুলসী গঙ্গাজল নয়। কিন্তু আজকাল নাকি সে সব ছেড়ে দিয়েছে। আর মেয়েটাকে সৎপথে রাখতে চায়।'

পরেশ বলল, 'আমাদের পথটা যে অসৎ, সে কথা তোমাকে কে বলল।'

গোবিন্দ হাসল. 'না, আমরা খুবই সৎসঙ্গের পথিক। কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে থা দিয়ে গেরস্থ করে, সুখী করে তাই ওর মার ইচ্ছা। শেষে যদি কিছু একটা হয়, মালার মা পদ্মমণির কাছে আমি কিন্তু মুখ দেখাতে পারব না। পদ্ম আমাকে দাদা বলে ডাকে। মা মেয়ে দুজনই আমাকে গুরুর মত ভক্তি করে।'

পরেশ বলল, 'তুমি তাহলে গুরুর কাজও কর, বন্ধুর কাজও কর। আমাকে বাঁচাও।'

গোবিন্দ বলল, 'তুমি তা হলে কথা দিচ্ছ ? মেয়েটার যাতে মান সম্মানের হানি হয়, তা তুমি কিছুতেই হতে দেবে না ?'

পরেশ বলল, 'বেশ তাই। কোন খারাপ কিছু হলে তুমিই তো গ্যারান্টি রইলে।'

গোবিন্দ বলল, 'শুধু আমি না, আমাদের বন্ধুত্ব আর তোমার প্রাণকেও গ্যারান্টি রাখতে হবে। জানো তো আমাকে ?'

পরেশ বলল, 'জানি ভাই জানি। সব জেনেই এ কথা বলছি। তুমি মালাকে আনবার ব্যবস্থা কর। কেউ তার হাত-পা তো ভালো, কেশ স্পর্শও করতে পারবে না—তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি।'

গোবিন্দ বলল, 'আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখি। কি হয় না হয়—সন্ধ্যার পর গিয়ে তোমাকে জানিয়ে আসব। তখন বাড়িতে থাকবে তো ?'

পরেশ বলল, 'তুমি যদি যাও তাহলে নিশ্চয়ই থাকব।'

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরেশ বাইরে চলে এল। মির্জাপুর স্ট্রীটে পড়ে কলুটোলার দিকে এগোতে এগোতে নিজের মনেই বলল, 'ঢং দেখলে গায়ে জ্বর আসে। কী সব সতী সাধ্বীরা এসেছেন। গানের দলে এসে পা থেকে চুণ খসলেই তাদের জাত যাবে। আর গোবিন্দটাও হয়েছে ন্যাকা। সব জেনে শুনেও ওদের কথা বিশ্বাস করবে। এমন ভাব করবে, যেন ওসব মানা না মানার সত্যিই কোন মানে আছে।

এসব হল দর বাড়াবার ছল। পরেশ কি আর তা বোঝে না ? খুবই বোঝে। তবে এখন বুঝেও না বোঝার ভান করে নরম হয়ে পায়ের কাদা হয়ে থাকতে হবে। তারপর কাজ হাঁসিল হয়ে গেলে উপযুক্ত সময় এলে পায়ের কাদাই হবে মাথার ইঁটপাটকেল।'

বাড়িতে ফেরবার আগে পরেশ রামবাগানের ঘাঁটিটাও ঘুরে গেল। ওখানে থাকে চাঁপা, মল্লিকা আর সুবাসিনী, তারা কেউ মূল নায়িকা নয়, সখী সহচরীর দল। দু'তিন বছর ধরেই তারা পরেশের সঙ্গে কাজ করছে। একটু তোয়াজ করে পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলতেই ওরা রাজী হয়ে গেল। বাইরে গেলে ওদেরই সব চেয়ে লাভ বেশি। অপ্সরী কিন্নরী বলে নিজেদের বেশ চালাতেও পারে, রোজগারও করে দু হাতে। তারা রাজী হবে না কেন ?

বাসায় ফিরে পরেশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'মনিঅর্ডার পিওন এসেছিল ?'

সুধা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না। এত সকালে কবে মনি-অর্ডার পিওন এসেছে। তোমার গরজ বেশি বলেই তো দুনিয়ার নিয়ম-কানুন সব উলটে যাবে না !'

পরেশ বলল, 'উলটে যাওয়ার কথা তো বলিনি। টাকা এলে বিটের পিওন এক আধ ঘণ্টা আগেও এদিকে আসতে পারে। সেটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সকাল থেকে কী তোমার হয়েছে বলতো ? রস নেই কস নেই—কেবল কট কট করছ তো করছই ?'

সুধা বলল, 'হুঁ, আমি একাই কট কট করি। আর তুমি দিনরাত মুখে মধু মেখে বসে আছ। তুমিই কম জ্বালাচ্ছ কিনা ? শান্তি কি রাখতে দিয়েছ মনের ? মিষ্টি কথা কোত্থেকে বেরোবে শুনি ?'

পরেশ আর কথা বাড়াল না। স্নান করে খেয়েদেয়ে নিল। ছেলেমেয়েগুলির খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল, সুধা তাদের ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখেছে। তাদের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল পরেশ। বিড়ি টানতে টানতে আড়-চোখে দেখতে লাগল সুধাকে আর তার গৃহস্থালীকে। সত্যিই ঘরের বউ হয়েছে সুধা। রান্নাবান্না করে ছেলেমেয়ে স্বামীকে খাওয়ায়। তারপরেও তার কাজের শেষ হয় না। ধোয়া-মোছা-নিকোনো চলতেই থাকে।

পরেশ মাঝে মাঝে তাগিদ দেয়, 'কত আর বেলা করবে ? খেয়ে নাও, খেয়ে নাও।'

সুধার ঘরকন্না দেখে পরেশের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। তার মাও এমনি করত। স্বামী পুত্র ঘর সংসারকে কি ভালোই না বাসত। রাগ করত, গালাগাল করত, চেঁচিয়ে, গলা ছেড়ে চীৎকার করে বলত, 'আর পারি না। আমার হাড়মাস এরা সব চিবিয়ে খেল।' কিন্তু তারপর সময়ে সবই করত, স্বামী আর সন্তানের যত্নে পারতপক্ষে অবহেলা করত না।

সুধাও তেমনি হয়েছে। অথচ পাঁচবছর আগেও সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের জীবন ছিল সুধার। মানদা মাসীর বোনঝিয়ের মতই তারও বেলা দশটার আগে ঘুম ভাঙত না। পরকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, নিজের খাবারটাও হোটেল থেকে আনিয়ে নিত। নিজের শরীর ছাড়া আর কোন কিছুর যত্ন করতে জানত না, করবার দরকার বোধ করত না। সেই সুধা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। নিজে সব চেয়ে পরে খায়, নিজের দেহের যত্ন সব চেয়ে পরে করে। অভাবের সংসারে খেটে খেটে ওর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। এখন আর ইচ্ছা করলেও সেই আগের পেশায় ফিরে যাওয়ার জো নেই সুধার। এখন আর কেউ তার দিকে তাকাবে না। এখন তাকাবে শুধু স্বামী আর ছেলেমেয়েরা। ভিন্ন ভিন্ন চোখে।

সুধাকে বিয়ে করে তাকে দিয়ে রান্নাবান্না করে খাচ্ছে শুনে নিমাই একদিন পরেশকে বলেছিল, 'অমন কাজও করিসনে পরেশ। রাঁধুনী রেখে দে, রাঁধুনী রেখে দে।'

পরেশ বলেছিল, 'কেন ?'

নিমাই বলেছিল, 'তা না করলে ওই বউ একদিন তোকেই রাঁধুনী করবে—না হয় রান্নার ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাবে।'

কিন্তু পাঁচ বছর তো গেছে। এর মধ্যে পালায়নি সুধা। এ ধরনের মেয়েদের যারা বিয়ে করে, তারা পত্নীকে উপপত্নীর মতই আদর যত্নে রাখে। কিন্তু সুধাকে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে পারেনি পরেশ। সুধা নিজেও তা চায়নি। এতদিন বসে বসে খেয়ে এখন নিজের হাতে করে কর্মে

আর খাওয়ানোতেই সুধা যেন বেশি সুখ পেয়েছে, নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। মানুষেই ইচ্ছা করলে কতবার তার অভ্যাস, চালচলন, স্বভাব বদলাতে পারে, এই একই জন্মে নতুন করে জন্মাতে পারে—চোখের ওপর সুধা তার প্রমাণ দিয়েছে।

স্ত্রীকে রান্নাঘরে নিঃশব্দে কাজ করে যেতে দেখে পরেশের মনটা একটু যেন কোমল হল, মায়া হল ওর ওপর। স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল, 'সুধা শোন।'

কাছে এগিয়ে এল না সুধা। রান্নাঘর নিকোতে নিকোতে মুখ তুলে সাড়া দিয়ে বলল, 'কি বলছ। অত মধুর ডাকে ডেকো না গো। মরে যাব। বাঁচব না।'

পরেশ হেসে বলল, 'ওসব সারা এখন থাক। খেয়ে নাও। বেলা একটা বাজল। মনি-অর্ডারের পিওন এই সময়েই তো আসে। এসে পড়লে ডেকে দিয়ো আমাকে।'

সুধা বলল, 'ডেকে দেব কেন, ফিরিয়ে দেব। আমি যে তোমার শত্তুর।'

পরেশ হাসতে লাগল, 'আরে না রে না। না রে না। তুই এখন সংসারে আমার একমাত্র মিতিন। গিন্নী-বান্নী সব।'

সুধা বলল, 'থাক থাক হয়েছে। তোমার দলের বায়না হয়ে গেছে, কত ফুর্তি তোমার মনে। এখন আর তোমাকে পায় কে। সারাটা সকাল আর দুপুর তো বাইরে বাইরেই কাটিয়ে এলে। নতুন নতুন সব সখিদের নিয়ে রং-তামাসা করলে, তোমার কি।'

পরেশ বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলে নিয়ে বলল, 'সখি, না ঘোড়ার ডিম। ওদের দিকে তাকানো যায় নাকি। নিতান্তই কাজের সম্পর্ক, তাই ডাক খোঁজ করতে হয়। কনট্রাকটররা যেমন মজুর কারিগর খাটায়, আমিও তেমনি। লোককে খাটাতে না পারলে আমার পয়সা কোত্থেকে আসবে, আর এই কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে কী খাইয়েই বা বাঁচিয়ে রাখব। অবুঝ হসনে সুধা। বুঝে কথা বল।'

সুধা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি আর কিছুতেই বাধা দেব না।'

পরেশের এবার ঘুম আসছে। সে পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'দোরের দিকে কান রেখো।'

৩

খাওয়া সেরে একটা পান মুখে দিয়ে সুধা তক্তপোষের দিকে তাকিয়ে দেখল—পরেশ আর ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। সুধা মুহূর্তকাল সেদিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি এতদিন কোথায় ছিল এরা? এদের তো আসবার কথা ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেরই যেন ভেবে অবাক লাগে সুধার। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছে। জেগে উঠে দেখবে সে মানদামাসীর ছোট ভাড়াটে ঘরে একা একা পড়ে আছে। কি বড়জোর একটা অচেনা লোক এক পাশে মদের নেশায় বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে। মেঝেয় দু' একটা খালি বোতল। এলোমেলো জিনিসপত্র। সারা রাত ঘরের মধ্যে ঝড় বয়ে যাওয়ার চিহ্ন।

এখন শান্তভাবে ভাতের নেশায় ঘুমোলে কি হবে, পরেশেরও তখন মদ ছাড়া ঘুম পেত না। ঢক ঢক করে বোতল শেষ করে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে তাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকতেই ভালোবাসত পরেশ। বলত, 'যারা ভালো লোক তারা বলে এখানে আসা মানে আত্মহত্যা করা। আমি তাই রোজ একবার করে এসে আত্মহত্যা করি। নিজেকে নিজে খুন করি কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়বার আগেই নিজেকে দিনের বেলায় ফের বাঁচিয়ে দিই। মরা মানুষ ফের নড়ে চড়ে ওঠে, হেঁটে চলে বেড়ায়। গোয়েন্দা পুলিশ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি রকম মজা তাই বলতো সুধা।'

সুধা পরেশের কথার ভঙ্গিতে হাসত, বলত, 'তোমাকে অমন মরতেই বা বলে কে, বাঁচতেই বা বলে কে?'

পরেশ বলত, 'সব তুই বলিস সুধা, তুই ছাড়া আর কে বলবে। তুই চোখ দিয়ে যা বলিস, নিজের মুখে তাই আবার না করিস, কোন কথা'ই তো তোর মনের কথা নয়। তাই কিছু মনে রাখতে পারিস নে।'

সুধা বলল, 'মন প্রাণ যেন তোমাদেরই কত আছে। আচ্ছা, তুমি যে এসব জায়গায় আস, তোমার বউ কষ্ট পায় না ?'

পরেশ বলত, 'পায় আবার না ? কষ্ট পাওয়াটাই তার স্বভাব। তার কষ্ট নেবে কে ? আমি তাকে ভাতও দিই কাপড়ও দিই, আদর করি সোহাগ করি, যখন তার কাছে থাকি তখন বার বার বলি, ওগো, তোমা বই কিছু জানি নে। কিন্তু সে কিছুতেই তা বিশ্বাস করে না। এটা বোঝে না যে বিশ্বাসে মিলয়ে কেষ্ট, আর অবিশ্বাসে মিলয়ে কষ্ট। বিশ্বাসেই সুখ, বিশ্বাসেই শান্তি। কিন্তু সে তা কিছুতেই মানতে চায় না।'

সুধা বুঝতে পারে মানুষটি নিষ্ঠুর, মানুষটি খুব সৎ নয়। কিন্তু সৎ লোক বিবেচক লোক সুধাদের কাছে যাবে কেন ? চোর জোচ্চোর খুনী বদমাস, সমাজ সংসার পরিবার থেকে তাড়া খাওয়া হাজার কারণে, হাজার বার ঘা খাওয়া মানুষের হৃদয়-ব্যথা, মনের কথা জানবার জন্যেই তো সুধারা আছে। পরেশের মত মানুষ কি একজন ? তার কাছে যারা আসে, তারা সবাই ওই রকম। উনিশ আর বিশ। তাছাড়া সবাই এক।

তবে পরেশ মানুষটা ওরই মধ্যে একটু অন্যরকম। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। কথাবার্তা চালাক-চতুরের মত। মনে হয় এত বড় একটা দুনিয়াকে ও কেবল হেসে আর ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতে পারে।

জিজ্ঞেস করে করে পরেশের বউয়ের গল্প শোনে সুধা। বউয়ের নাম বীণাপানি। মাগো, আজকাল আবার অমন পুরোন নাম থাকে নাকি ঘরের বউয়ের ?

পরেশ বলে, 'আমার কপালে সবই পুরোন। মানুষটাও একেবারে পুরোন আমলের। বউ তো নয়—যেন দিদিমা বুড়ি, যেমন শুচিবাইয়ে ভরা তেমনি ছিচকাঁদুনে। রাগ হলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

পরেশ বলে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে তার। বউ নাকি কথায় কথায় প্রায়ই বলে—তার বাপ মা না জেনে তাকে জলে ফেলে দিয়েছে। পরেশ জবাব দেয়, 'আমি যদি জল হতাম, তোমার মনের আগুন সব নিবে যেত। আমি জল নয় বাতাস। তার ছোঁয়ায় তোমার আগুনের হলকা আরো বাড়ে, আরো ছড়ায়। আমার সঙ্গে ঝগড়া করা মানে বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা। আগুন আর বাতাস কোনদিন ঝগড়া করে না। তুমি কর। কারণ তুমি নিজেকেও চেন না, তোমার সোয়ামীকেও চেন না।'

কিন্তু এসব ঠাট্টা তামাসায় বীণার মন ভেজে না। সে আরো রাগ করে ঝগড়াঝাটি করে অশান্তি বাড়ায়। তারপর রাগ করে ঘরের জিনিসপত্র ছত্রছান করে ফেলে দিয়ে চলে যায় হরতুকি বাগানে বাপের বাড়িতে। পরেশ সেখানে বউয়ের মান ভাঙাতে গিয়ে মুখ পায় না। বীণার ছোট ভাইরা ঘুষি বাগিয়ে আসে। বুড়ো বাপ পায়ের ছেঁড়া চটি খুলে তেড়ে এসে বলে,—'দূর হ, দূর হ, জামাই না যম। দূর হ।'

পরেশ তাড়া খেয়ে দুপ দুপ করে চলে আসে বউবাজারে। যেখানে বাজার ভরা বউ। যে রাস্তায় প্রেম আর চাঁদ গড়াগড়ি যায়।

পরেশ অবশ্য হাসতে হাসতেই এসব কথা বলে। কিন্তু সুধার কেমন যেন মানুষটার জন্যে বড় দুঃখ হয়। সুধার মনে হয় এ লোকটার বুকেও ব্যথা আছে। লোকটা একেবারে অকারণে অমন নিষ্ঠুর আর শঠ হয়ে যায়নি। পরেশ যখন মাঝে মাঝে আসে, সুধা তাকে একটু বেশি খাতির যত্নই করে। মদ খেয়ে বমি করলে পরিষ্কার করে, জামাটামা নষ্ট করে ফেললে ছাড়িয়ে নেয়। পরেশের জন্যে বারবার বিছানার চাদর বদলাতে হয় তাকে।

সুধা শোনে পরেশের বউ রাগ করে মাসের পর মাস বাপের বাড়িতে পড়ে থাকে। ন'মাস ছ'মাস বাদে যদিবা ফের আসে, দু-তিন দিন যেতে না যেতেই ফের ঝগড়াঝাটি লেগে যায়। নিজেও টিকতে পারে না, পরকেও টিকতে দেয় না। তাই কোনবার পরেশই আগে পালায়, কোনবার বউই আগে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়।

সুধা মনে মনে ভাবে, 'আহা, দুঃখ তো কারোই কম নয়।'

কিন্তু পরেশ যেন কোন দুঃখকেই আমল দিতে চায় না। ও যেন হেসেই সব উড়িয়ে দেবে, মদেই সব ভাসিয়ে দেবে।

তারপর একদিন পরেশ বলল, 'আমার একটা গান বাজনার দল আছে। আমি সেই দল নিয়ে মাঝে মাঝে দিগ্‌বিজয় করতে বেরোই। তুই আসবি আমার দলে? তুই তো গানও জানিস, আবার একটু একটু পা ছোঁড়াছুঁড়িও শিখেছিস।'

সুধা লোককে টানবার জন্যে ওস্তাদ রেখে কিছুদিন ধরে নাচগান অভ্যাস করেছিল। তার জন্যে মাসীর কাছে তার কদর ছিল বেশি। বাবুরাও আদর যত্ন করত। হিংসায় জ্বলত অন্য মেয়েরা। তারা বলত, 'তোর নাচ মানে তো কোমর দুলানি, আর গান মানে তো বেসুরো গলায় সিনেমার গানগুলি আউড়ে যাওয়া।'

সুধা বলত, 'যাই হোক। এরজন্যেই তোরা হিংসেয় ফেটে মরিস, এর জন্যেই সারা কলকাতা শহর আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। ওলো বিন্দি, আমার যা আছে তাই বা খায় কে? যা আছে তাই বা পায় কে?'

কিন্তু পরেশ যখন তাকে দলে যোগ দেওয়ার কথা বলল, একটু লজ্জা পেয়ে গেল সুধা। বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে দশজনের সামনে গাইবার কি নাচবার ক্ষমতা সুধার কি আছে? লোকে হাসবে যে।

পরেশ বলল, 'সেজন্যে ভাবিসনে। আমার হাতে এমন ওস্তাদ লোক আছে যে তোকে শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে ঠিক করে নিতে পারবে। তার চাঁটিতে বোবা তবলার বোল বেরোয়, বোবা মেয়ে গলা ছেড়ে গান করে, আর যে খোঁড়া সেও ময়ূরীর মত নাচে। যদি চাঁটি খেতে পারিস, গান-বাজনা তোকে আমরা শিখিয়ে নিতে পারব।'

একথা শুনে সুধার মন তখনই নেচে উঠল। সে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। এই অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে সে আলোর মুখ দেখবে, কত দেশবিদেশ, সমুদ্র আর পাহাড় পর্বত দেখবে। কত দেবদেবী, কত তীর্থস্থান সে দেখে আসতে পারবে।

পরেশ রাতের পর রাত তার কানে সেই মোহনমন্ত্র জপতে লাগল। কিন্তু বেশি জপবার আর দরকার ছিল না। সুধা দু-একবার শুনেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। কত আর বয়স হবে তখন, বছর উনিশেক। অবশ্য সংসারের হালচাল তার তের বছর বয়স থেকেই জানা। পুরুষরা কেমন মানুষ তা তার চিনতে বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু পরেশের প্রস্তাব তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হল। দূরের হাতছানি তার চোখকে মুগ্ধ করল। প্রায় এক কথায় রাজী হয়ে গেল সুধা। মাইনেপত্র নিয়ে কোনরকম দরকষাকষি করল না। মাসী অবশ্য সহজে ছাড়তে চায়নি। সে পরেশের সঙ্গে দরদাম করতে লাগল। আগাম কমিশন হিসাবে কিছু টাকা আদায় করে নিল। কিন্তু সুধার যেন ওসব কিছু দরকার ছিল না। সে যে ট্রেনে করে নানা জায়গায় ঘুরতে পারবে, নানা জিনিস দেখতে পারবে—তার চেয়ে বড় পাওয়া যেন আর নেই।

সুধা লক্ষ্য করল—তার উৎসাহ আর আগ্রহ দেখে পরেশও খুব খুশি হয়েছে। সে বলল, 'তোকে আমি সব সুযোগ সুবিধা দেব। দলের সেরা মেয়ে হবি তুই।'

পরেশ সুধাকে নিয়ে তুলল তার দরমাহাটার বাসায়। তখন ওখানেই থাকত পরেশ। বউ বেশিরভাগ সময় রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকে, আর সেই সুযোগে মেয়েদের নিয়ে রিহার্সেল দেয় পরেশ। অবশ্য বউয়ের সামনেও সে ওইসব মেয়ে নিয়ে হৈ হল্লা করতে পারত। পরেশের তো কোন লজ্জা সংকোচের বালাই নেই।

সেখানেই আলাপ হল গোবিন্দ তালুকদারের সঙ্গে। শুকনো কালো দড়ির মত পাকানো চেহারা। মাথার আধখানা জুড়ে টাক। প্রথমে দেখে সুধার তো মোটে ভক্তিই হয়নি। এমন লোক আবার কি শেখাবে। কিন্তু দু' চারদিন তালিম নিয়েই সুধা বুঝতে পারল—গোবিন্দ যে সে লোক নয়। মানুষটি একেবারে গুণের খনি। শুধু তবলাই বাজায় না। গানের রাজ্যের অনেক সন্ধান জানে। সুধাদের মত মেয়ে তার পায়ের তলায় বসে বারো বছর গান শিখতে পারে। কিন্তু গোবিন্দের উৎসাহ থাকলে কি হবে, সুধাকে বেশি কিছু শেখানো যেন পরেশের ইচ্ছা নয়। শুধু

দলের জন্য যেটুকু কাজে লাগবে সেইটুকু শিখতে পারলেই যথেষ্ট। পরেশ গোবিন্দকে প্রায়ই তাড়া লাগাত, 'হয়েছে হয়েছে। সুধা তুমি যেটুকু শিখেছ তাই ঢের। লোকে ওইটুকুই আগে হজম করুক দেখি। বেশি দেরি করবার সময় তো নেই। দলের বায়না হয়ে গেছে। এবার তল্পিতল্পা বেঁধে ফেল।'

গানকে যদিও ব্যবসা হিসাবেই নিয়েছে, তবু পরেশের বেশিরকম দোকানদারির ভাব সুধার যেন সব সময় ভালো লাগত না। পরেশের তাগিদ সত্ত্বেও গোবিন্দ সঙ্গত করে চলত, সুধা গাইতে থাকত। শুধু সস্তা হালকা গানই গোবিন্দের কাছে সে শেখেনি। কিছু কিছু খেয়ালেরও চর্চা করেছে। যদিও দলের কাজে তা লাগত না। কীর্তন, ভজন, খেমটা, গজলেরই চাহিদা ছিল বেশি। আর সুধারা তো সবসময় চাহিদা মেটাবার জন্যেই আছে।

সুধা প্রথম প্রথম গোবিন্দকে ওস্তাদজী বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, 'আমি কোন ওস্তাদের পায়ের নখেরও যোগ্য নই। তুমি আমাকে গোবিন্দদা বলে ডেকো।' সুধা বলেছিল, 'যদি শুধু দাদা বলি আপনি কি রাগ করবেন?'

গোবিন্দ হেসে বলেছিল, 'রাগ করব কেন, বরং খুব খুশি হব। তোমাদের মধ্যে একজন বোন পাওয়া তো সহজ নয়।'

সুধা হেসে বলেছিল, 'দোষ নেবেন না, আপনাদের মধ্যে ভাইই কি আমরা সহজে পাই?'

গোবিন্দের সঙ্গে ভাইবোনের ধর্ম-সম্পর্ক পাতিয়ে সেদিন বড় অদ্ভুত তৃপ্তি পেয়েছিল সুধা। তার জীবনে একজন দাদাকে পাওয়া সেই প্রথম। প্রথম প্রেমিককে পাওয়ার মত, প্রথম পুরুষের আদর পাওয়ার মত, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন ভাইকে পাওয়া কম কথা নয়। বিশেষ করে সুধাদের জীবনে ভাইতো আসে না, ভাইতো কেউ হতে চায় না। গৃহস্থ-ঘরের ঝি-বউদের পুরুষের সঙ্গে নানা সম্পর্ক। মুখে মুখে কত রকমের ডাক। কেউ বাবা, কেউ দাদা, কেউ ছোট ভাই, ভাইপো, বোনপো—আরো যে কত রকমের সম্পর্ক আছে তা জানে না সুধা। সে জানে শুধু দেহলোভী এক রকমের পুরুষকে। বাপের বয়সী যে আসে সেও প্রণয়ী, আবার ছোট ভাই কি ছেলের বয়সী যারা আসে তারাও তাই। সুধা লক্ষ্য করে দেখেছে—মাসী কি বেশি-বয়সী মেয়েদের কম বয়সীদের দিকেই লোভ বেশি। তাদের নিয়েই বেশি টানাটানি। ঘরের টাকা ব্যয় করেও পরের ছেলেদের তারা ধরে রাখতে চায়। ওই ভাবেই মা হবার সাধ তারা মিটায় কিনা কে জানে।

ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেও পরেশ কিন্তু গোবিন্দকে হিংসা করতে ছাড়েনি। ঠাট্টা করেছে, নানারকম চোখা চোখা কথা বলে খোঁচা দিয়েছে। পরেশের কাণ্ড দেখে লজ্জায় মরে গেছে সুধা। এই কত গভীর বন্ধুত্ব। একটু বাদেই বিশ্রী বিশ্রী কী সব কথা। একটা মানুষই যেন গোটা একটা চিড়িয়াখানা। ভিতরে জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই।

পরেশ হিংসা করে বলেছে, 'তুই আমার চেয়ে ওই গোবিন্দটাকে বেশি ভালোবাসিস।'

সুধা বলেছে, 'ছি ছি ছি—কী যে বল, দুই ভালোবাসা কি এক?'

পরেশ বলেছে, 'এক রকম ছাড়া তোরা আবার দু-তিন রকমের ভালোবাসা জানিস না কি?'

সুধা জবাব দিয়েছিল, 'আগে জানতুম না। তোমাদের দলে এসে শিখলুম। গোবিন্দদাকে আমি খুব ভক্তি করি।'

তার উত্তরে পরেশ বলেছিল, 'খুব সাবধান। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।'

সুধা মনে মনে হেসেছিল। পরেশ নিজে যে চুরি করে বউকে ঠকায় তাতে কোন দোষ নেই। আর চুরি জোচ্চুরি যার পেশা, তার জন্যেই যে লাইসেন্স নিয়েছে—তাকেই পরেশ বার বার হাতকড়ি পরাতে চায়।

পরেশের বাইরের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত রিহার্সেল হত। সুধা ছাড়াও আরো দুটি মেয়ে ছিল। তারাদাসী আর সিন্ধুবালা। সেকেলে নাম বলে পরেশ ওদের নাম দুটো বদলে রাখল ইরা আর বেলা।

সুধা বলল, 'আমার নাম বদলালে না?'

পরেশ বলল, 'দরকার নেই। তোর নাম এমনিতেই বেশ মিষ্টি।'

একথা শুনে ইরা আর বেলা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল, আর পরেশের অসাক্ষাতে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ইরা বলল, 'কিসের মত মিষ্টি লো সুধা। মধুর মত, না গুঁড়ের মত ?'

সুধা বলল, 'কি জানি ভাই। গোবিন্দদা বলেছেন, সুধা কথাটার মানেও নাকি মিষ্টি। তা নাকি দেবতারা খায়।'

বেলা হি হি করে হেসে উঠেছিল, 'খাবেই তো। তোর রূপ আছে, গুণ আছে, বয়স আছে, তোকে তো দেবতারাই খাবে। আমরা তো আর তেমন নই। আমাদের খেতে আসে যত রাক্ষস ভূত-প্রেত আর অপদেবতারা। তাও মধুর মত খায় না, কুইনাইনের মত গেলে।'

রিহার্সেল শেষ হলে ওরা চলে যেত। কিন্তু সুধাকে পরেশ সহজে ছেড়ে দিত না। বলত, 'এসো, আমার ভিতরের ঘরখানা একটু দেখে যাও, গুছিয়ে দিয়ে যাও।'

কিন্তু ভিতরে যেতে কেন যেন সুধার বড় গা কাঁপত। যদিও পরেশের বউ বীণা এখন বাড়িতে নেই, রাগ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে, তবু তার সেই ছেড়ে-যাওয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরেশের আদর নিতে নিতে সুধার বুকের ভিতরটা বড় কাঁপতে থাকত।

দেয়ালে টাঙানো পরেশের বউয়েরই একখানা আয়না। তার ফেলে-যাওয়া চিরুনি, সিঁদুর কৌটো, চুলের কাঁটা। হয়তো আলনায় ঝুলানো দু-একখানা পুরোন শাড়ি। তক্তাপোষের ওপর পাতা বিছানায় চাদরে ঢাকা পাশাপাশি দুজোড়া বালিশ। দেখে দেখে সারা গা শিউরে উঠত সুধার। পরেশকে বাধা দিয়ে বলত, 'না না এখানে না এখানে না। এটা তোমার বউয়ের ঘর।'

পরেশ হেসে উঠত, 'নাম লেখা আছে নাকি ঘরে ? আংটি তুমি কার ? যার হাতে আছি। ঘর তুমি কার ? যে বাস করে। মেয়ে তুমি কার ? যে আদর করে। মন তুমি কার ? যার ছোঁয়ায় নাচি। সে তো আমাকে ঘেন্না করে ছেড়েই চলে গেছে সুধা। সে তো আর আমার মুখ দেখে না। তবে তোর অত লজ্জা কিসের।'

সুধা বলত, 'লজ্জা নয় গো—ভয়। ভয়ে আমার বুক কাঁপে।'

পরেশ বলত, 'ভয়ই বা কিসের—সে তো আর মরে ভূত হয়নি, যে বাতাসে ভেসে চলে আসবে। কি জানালা দিয়ে মুখ বাড়াবে। অত যদি ভয়ই পেয়ে থাকিস আমার বুকের মধ্যে আয়, বুকে মুখ গুজে থাক, সেখানে কোন ভয় নেই।'

যে দেবতারা সুধা খান তাঁরা হয়তো ষোলআনাই দেবতা। কিন্তু যে মানুষগুলি সুধাদের মত মেয়েমানুষের কাছে আসে তারা বোধহয় কোনটাই পুরোপুরি নয়। না মানুষ, না দেবতা, না রাক্ষস, না পিশাচ। এরা যাই হোক—এদের নিয়েই সুধাদের সমাজ সংসাব, জীবনের সাধ আহ্লাদ, হাসি কান্না উৎসব আনন্দ। এদের বাদ দিয়েও সুধারা চলতে পারে না, এদের হাত থেকেও সুধাদের রেহাই নেই।

দল নিয়ে সেবারও প্রথমেই উড়িষ্যায় গিয়েছিল পরেশ। বাসা বেঁধেছিল ভুবনেশ্বর শহরের একপ্রান্তে। খান তিনেক ঘর। ভাড়া কলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা। জিনিসপত্রের দামও তাই। নানা রকমের রূপার গয়না, কত রঙ বেরঙের নক্সী পেড়ে শাড়ি। সুধার ইচ্ছা করত সব কিনে বাক্স বোঝাই করে।

ইরা আর বেলা হেসে বলত, 'অত হ্যাংলা কেনরে তুই। তোর ভাবনা কি। দলে ঢুকতে না ঢুকতেই রাণী হয়ে বসেছিস। এদেশেও রাজারাজড়ার অভাব নেই। তারা তোকে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে রাখবে। কিছুতেই আর কলকাতায় ফিরে যেতে দেবে না।'

শহরের একপ্রান্তে বাসা বাঁধলেও সুধারা শুধু শহরের মধ্যে গান গাইত তা নয়। পরেশ দলবল নিয়ে অনেক দূরে দূরে গাঁয়ের ভিতরও চলে যেত। সে সব গ্রামের খোলা-গা খাটো-ধুতিপরা লোকজন দেখে সুধা অবাক হয়ে ভাবত—এরা আবার গান শুনবে কি, এরা আবার পয়সা পাবে কোথায় ?

কিন্তু এইসব হাজার হাজার দীন দরিদ্রের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে দু'একজন বড়লোক বেরিয়ে

পড়ত। তাদের কারো পরণে দামী ধুতি পাঞ্জাবী—আবার কেউ বা খোদ সাহেব, মাথায় টুপি, মুখে পাইপ। কেউ বা বড় বড় সুন্দর সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা মোটর গাড়িতে। তাদের দেখে মনে হত না দেশটা এত গরীব, এখানে বেশিরভাগ লোক খেতে পায় না। এসব রাজারাজড়া জমিদার জোতদার ব্যবসাদারদের দেখে এদেশে যে কোন দুঃখ কষ্ট আছে তা মনে হত না সুধার। বিশেষ করে রাত্রে গানের আসরে, আলোয়, ফুলের মালায়, বাজনার বোলে, গানের সুরে দেশটাকে মনে হত পরীর দেশ বলে। মাঝে মাঝে পুরস্কার টুরস্কারও মিলত।

অবশ্য পরেশের মাইনের চেয়ে উপরি-রোজগারটাই বেশি হত ইরা আর বেলার। আসর শেষ হলে দু'একজন সমঝদার শ্রোতার সঙ্গে তারা বেড়াতে বেরোত। কেউ নিয়ে যেত বাগান বাড়িতে, কেউ বা হোটেলে টোটেলে। ফিরে আসত মুঠি মুঠি টাকা নিয়ে। যেদিন গান থাকত না, ইরা আর বেলা সেদিন বেড়িয়েই বেড়াত। আসরের কোন ক্ষতি না হলে পরেশ এ সব বিষয়ে কোন আপত্তি করত না। ওদের রোজগারের অংশও চাইত না।

একদিন ইরা বলল, 'কি ব্যাপার, তুই যে এসে অবধি ঘরের বউ হয়ে রয়েছিস। বেরোচ্ছিস না কেন? লোকজন এলে ঘরে নিচ্ছিস না কেন?'

সুধা বলল, 'না ভাই আমার কেমন ভয় করে। বিদেশে বিভুঁইয়ে শেষে কি হতে কি হবে।'

একথা শুনে ইরা আর বেলা হেসে গড়িয়ে পড়ত, 'শোন শোন, আমাদের কনে বউটির কথা শোন। বিদেশী পুরুষকে না কি ওর ভয় করে।'

বেলা বলত, 'আমাদের আবার দেশী বিদেশী কিলো। আমাদের ঘরে যে আসবে সেই আপন। কথা না বুঝলে ক্ষতি নেই। ভাবভঙ্গি ইশারাই যথেষ্ট। ওলো আমাদের আর কোন মিলেরই দরকার নেই। মনের মিলেরও না।'

কিন্তু সুধা কখনো মাথা ধরা, কখনো গা বমি বমি করার অজুহাত দিয়ে ওসব আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ এড়িয়ে যেত। কেন যেন বাইরে এসে তার মনটা একেবারে বদলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল দেবতার স্থানে এসব করা পাপ।

গোবিন্দ বলেছিল, 'ব্যবসা একেবারে না করে পারবে না। তোমাদের পক্ষে লোভ সামলানো কঠিন। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না। তাহলে আর গাইতে পারবে না। গান বাজনাটা সাধনার জিনিস, সংযমের জিনিস। গান নিজেই একটা বাড়াবাড়ি। যারা এই বাড়াবাড়ি নিয়ে মেতে উঠতে পারে, তাদের অন্য বাড়াবাড়ির দরকার হয় না।'

গোবিন্দের কথাগুলি মন দিয়ে শুনত সুধা। চোখের ওপর দেখত—একজন মানুষ শুধু একটা নেশা নিয়েই কি করে জীবন কাটিয়ে যেতে পারে। নিজেও দেখত—যখন গানের রেওয়াজ করে, রিহার্শেল দেয়, অনেক রাত পর্যন্ত আসরে মুজরো করে, তখন অন্য কোন রকম ক্ষুধাতৃষ্ণার সাধ-আহ্লাদের কথা যেন মনে থাকে না। এক গানের মধ্যেই সব যেন মিটে যায়।

বাইরের কেউ যখন সুধাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসত সে একটা না একটা অসুস্থতার অজুহাত খাড়া করত। ভাবখানা এই—গোবিন্দদাকে সে দেখিয়ে দেবে সংযম কাকে বলে। পরেশকে দেখাবে, সে কতখানি নির্লোভ হতে পারে।

কিন্তু একবার বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিল। জগৎ মহান্তি নামে ছোটখাট এক জমিদারের বাড়িতে সে রাত্রে গান গাচ্ছে। সুধার কীর্তন শুনে আর রাধা-নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন জগৎবাবু। নিজের হাতে মালা ছুঁড়ে দিলেন, সোনার মেডেলের কথা ঘোষণা করলেন। আর এক রাত্রের বায়নার টাকা আগাম দিয়ে দিলেন পরেশের হাতে গুঁজে, পরেশ তো মহাখুশি।

আসর ভাঙবার পর ডাক পড়ল সুধার। জগৎবাবু তার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এ আলাপের মানে যে কি তা সুধার বুঝতে বাকি নেই। তার মুখের হাসি আর চোখের তাকাবার ভঙ্গি দেখেই সুধা বুঝতে পেরেছে। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। অল্প বয়সের মত ওই বয়সটাও মারাত্মক। সুধা অমন অনেককে দেখেছে। কিন্তু তারই বা ভয় কি। সে তো আর কুলের বউ নয়। বরং ফিরে আসবার সময় তার দু'হাত ভরে দেবেন জগৎবাবু।

কিন্তু সুধা বলল, 'না যাব না। আমার শরীর ভালো না, মন ভালো না, যাব না আমি।'

পরেশ বলল, 'সে কিরে। না গেলে যে কত বড় লোকসান তা ভেবে দেখেছিস। কত বড় লোক, কত ক্ষমতা।'

সুধা তার মুখোমুখি দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে পরেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ম্যানেজার, তুমিও এই কথা বলছ। আমার ওপর এই তোমার মায়া মমতা আর দরদ? তুমি কি শুধু নিজের বউকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে সোহাগ করতে পার? আর বিদেশে এসে বাইরের একজন লোকের হাত থেকে তোমারই দলের একটা মেয়েকে রক্ষা করতে পার না? এই তোমার মুরোদ?'

ভাড়াটে মাটির বাসা। ঘরখানার মধ্যে তখন আর কেউ নেই। অবশ্য বাইরে এদিকে সেদিকে আড়ি পেতে রয়েছে। গোবিন্দদা নিজের মনে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছে। কেউ তাকে না ডাকলে এ সব ব্যাপারের মধ্যে সে বড় একটা আসতে চায় না।

সুধার বেশ মনে আছে তার কথা শুনে পরেশ তার দিকে এক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিল। সুধার পরণে তখনো ছিল রাধারাণীর বেশ। মুখে রাধারাণীর ওড়না।

পরেশ তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আচ্ছা তুই ঘরেই থাক, তোর আর যেতে হবে না। জগৎবাবুর কাছে যা বলবার আমিই বলে আসছি।'

অন্ধকারের মধ্যে পরেশ তখনই বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসতে আধঘণ্টার বেশি দেরি করেনি। এসে বলেছিল, 'ঠিক আছে। তোর আর কিছু ভাবতে হবে না।'

সুধা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কী বলে এলে জগৎবাবুকে?'

পরেশ বলল, 'সুধা আমার বিয়ে করা বউ। ওর পেটে আমার সন্তান। ও তাই নিয়ে মহারাজার কাছে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।'

সে কথা শুনে জগৎবাবু জিভ কেটে বলেছিলেন, 'ছি ছি ছি। তার আসতে হবে না আসতে হবে না। এ কথা তুমি আগে বলনি কেন?'

পরেশের কথা শুনে সুধাও লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল! 'ছি ছি ছি, ওকথা তুমি কেন বলতে গেলে?'

পরেশ বলল, 'না বললে উদ্ধার মিলত না।'

তখনও ময়না পেটে আসেনি। তার নামগন্ধও কোথাও নেই। তবু বানিয়ে বানিয়ে কত বড় একটা মিথ্যা কথা বলে এল পরেশ। মানুষটা সব পারে।

পরেশ আর গোবিন্দ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য বেরিয়ে গেলে ইরা, বেলা দুজনে এসে সুধাকে ঘিরে ধরল। কেউ উলু দেয়, কেউ হেসে গড়িয়ে পড়ে। দুজনেই বলল, 'আজ আমরা বাসর জাগব। বিয়ের খাওয়াটা কিন্তু ভালো করে খাওয়াতে হবে ভাই রাধারাণী। পোলাও মাংস ছাড়া আজ আর আমরা কিছু মুখে তুলছিনে।'

সুধা হেসে জবাব দিয়েছিল, 'বলগে তোদের ম্যানেজারের কাছে, আমি কি জানি।'

বেলা বলেছিল, 'আরে দিদি, আজ তো তুই ম্যানেজারনি। ম্যানেজারের গিন্নী।'

সেখান থেকে তারা যখন পুরীতে গেল পরেশ দলের নাম দিয়েছিল—সুধা হালদার ও সম্প্রদায়।

সুধা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও আবার কি নাম। আমার নামে দলের নাম রাখছ কেন?'

পরেশ বলল, 'রাখলাম তোর পয় ভালো বলে। তুই আসার পর থেকে দলের খুব লাভ হচ্ছে। নাম-ডাকও মন্দ হয়নি। আগে এতটা ছিল না।'

সুধা বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু আমি আবার হালদার হলাম কবে থেকে?'

পরেশ ঠাট্টার সুরে বলল, 'যবে থেকে তুই আমার বিয়ে-করা বউ হয়েছিস। যে সে মানুষ নয়, রাজাবাহাদুর জগৎ মহান্তি সাক্ষী আছে।'

গোবিন্দদার কিন্তু এসব ঠাট্টা তামাসা ভালো লাগেনি। সে তখনই পরেশকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোমার। ঘরে বউ রয়েছে। তার সঙ্গে আজই না হয় ঝগড়া। চিরকাল তো আর ঝগড়া থাকবে না। একদিন মিটমাট হয়েই যাবে। কথাটা কানে গেলে তার মনের অবস্থা কিরকম হবে বল তো।'

পরেশ বলেছিল, 'কিছুই হবে না। সে বরং বেঁচে যাবে। গোটাকয়েক ভগ্নীপতি আছে। তাদের

মধ্যে একটা উপপতি। তাকে পুরোপুরি পতি করে নেবে। তার টানেই তো বাপের বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকে। আমি কি আর তা জানিনে ? আমার সেই ভায়রা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সাক্ষাৎ এক ঋষি। আর তার শ্যালিকা সুন্দরীর ঋষিপত্নী হবার ভারি শখ। আমি সবই খবর রাখি।'

গোবিন্দ বলেছিল, 'ছি ছি ছি ! কি সব যা তা বলছ।'

পরেশের বউয়ের প্রসঙ্গ সুধারও ভালো লাগত না। তার কথা না উঠলেই সুধা সুখে থাকত, নিশ্চিন্তে থাকত। সেবার ফাঁকে ফাঁকে সুধাকে অনেক জায়গা, মন্দির, আর দেবদেবী দেখিয়েছিল পরেশ। পুরীর সমুদ্রে স্নান করিয়েছিল, জগন্নাথের মন্দির দেখিয়েছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দির তো আগেই দেখে এসেছে। পরেশের ভাব দেখে মনে হয়েছিল সে যেন গানের দল নিয়ে আসেনি, বেড়াতে এসেছে। বাসে করে কোনারক বলে আর একটা জায়গায় সুধাকে নিয়ে গিয়েছিল পরেশ, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়েছে মন্দিরটা। যুগযুগান্তর আগের নাকি জিনিস। ভাঙবে না ? তবু অনেক মূর্তিই আস্ত আছে। সুধার মনে হল যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এক এক জায়গায় মেয়ে-পুরুষের সে কি যুগলরূপ ! দেখলে সুধার মত মেয়েরও লজ্জা লাগে। চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছা হয়। সুধা হেসে বলেছিল, 'ছি ছি ছি, এত লোকের সামনে লজ্জাও করে না। দেবতার বেলায় লীলা খেলা, আর মানুষের বেলায় বুঝি দোষ ?'

পরেশ হেসে বলেছিল, 'দেবতা না রে, দেবতা নয়। ওরা আমাদের মতই মানুষ।'

সুধা অবাক হয়ে বলেছিল, 'মানুষ ! ওরা দলশুদ্ধ কার শাপে এমন পাষাণ হয়ে রয়েছে গো ?'

পরেশ জবাব দিতে পারেনি।

আর এক জায়গায় একটি মেয়ে খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে থেমে গেছে। পাষাণী হয়ে গেছে সেও। যত নাচিয়ে গাইয়ে সব পাষাণী।

সুধা এক একটা মূর্তির সামনে দাঁড়ায়, আর জোড় হাতে নমস্কার করে। আর একটি নাচিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুধা বলল, 'আচ্ছা, কারো শাপে আমিও যদি অমন পাষাণ হয়ে যাই কেমন হয় বল তো ?'

পরেশ বলল, 'ও কথা বলছিস কেন সুধা ? তুই পাষাণ হবি কোন দুঃখে ?'

সুধা বলল, 'আহা, মানুষ কি কেবল নিজের দুঃখেই পাষাণ হয় ? এখানে এসে তোমার বউয়ের কথাটা আমার বড্ড মনে পড়ছে। দেখ, এর আগে কত লোক আমার ঘরে এসেছে, আবার বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কেউ দুদিন, কেউ চারদিন, কেউ বড়জোর দু'মাস কি তিন মাস। কাউকে চিরকালের জন্যে ঘর-ছাড়া করিনি। তোমাকে নিয়ে এত যে পাপ করছি তা কি ধর্মে সইবে ? আমার বড় ভয় লাগে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দল থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে চলে যাই।'

এ কথা শুনে সেই পাথরের রাজ্যে, সেই পাথরের মেয়ে-পুরুষগুলির মধ্যে পরেশও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে—যেন পাথর বনে গিয়েছিল সেও। কথাগুলি বলে ফেলে সুধাও পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চল হয়ে রয়েছিল। শত শত পাথরের মূর্তির মধ্যে যেন আর এক জোড়া মূর্তি বাড়তি হয়ে পড়েছে। আর যে সব যাত্রী এসেছে তারা কেউ লক্ষ্য করছে না, তাই বুঝতেও পারছে না। পাথরের মূর্তিগুলিকে সহজেই পাথর বলে চেনা যায় কিন্তু মানুষ যখন ভিতর থেকে পাথর হয়ে থাকে—তখন কি কেউ তাকে অত তাড়াতাড়ি চিনতে পারে ?

একটু বাদে পরেশ তাড়া দিয়ে বলেছিল, 'চল চল, সন্ধ্যা হয়ে গেল, চল এবার।'

কলকাতায় ফিরে এসে সুধা আবার তার মানদামাসীর বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু মন আর সেখানে যেতে চাইছিল না। গানের দল থেকে পাওয়া টাকা কটা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিল। ঘরে আর কেউ আসতে চাইলে বলে দিচ্ছিল, 'শরীর খারাপ।'

মাসী তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'তোর কি হয়েছে বল তো ?'

'কিছুই হয়নি।'

মাসী বলেছিল, 'পেটে বাচ্চা এসেছে এইতো ? যখন সময় হবে আমিই সব বলে দেব। করে

কম্মে দেব। তোর কোন ভয় নেই। সোমত্ত মেয়ে। এই তো বয়স। এখনই যদি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবি, পরে কি করবি বলতো ?'

সুধা বলেছিল, 'পরে যা হয় হবে। তুমি এই কটা মাস আমাকে রেহাই দাও। আমার দেহে সয়না।'

মাসী তার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'আহাহা শরীল কি মাখন দিয়ে গড়েছিল নাকি লো ? ননীর পুতুল হয়েছিস ?'

কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই সেই কেলেঙ্কারি কাণ্ডটা ঘটে গেল। পরেশের বউ বীণা মরল গলায় ফাঁস লাগিয়ে। পরেশের ঘরে মরেনি। বাপের বাড়িতে গিয়েই মরেছিল। কিন্তু ঝগড়া করে গিয়েছিল পরেশের সঙ্গে। সুধাকে পরেশ বিয়ে করেছে—কি করে যেন এই খবর কানে গিয়েছিল বীণার। দলের কোন হিংসুটে মেয়েই এই সর্বনাশ করে থাকবে। সুধার নামের সঙ্গে পরেশ তার নিজের পদবী যোগ করে দেওয়ায়, সুধার নামে দলের নাম রাখায় বীণার সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সেই বিষের জ্বালায় বাপের বাড়িতে আর টিকতে পারেনি। ছুটে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

এ সব কথা পরেশই সুধাকে পরে বলেছে। সেই শেষ ঝগড়ার কথাও খুঁটে খুঁটে বর্ণনা করেছে। কিছুই গোপন করেনি।

পৃথিবীর মায়া কাটাবার আগে নিজের শোয়ার ঘরখানা বীণা শেষবারের মত দেখতে এসেছিল। তার সেই বিছানা আয়না চিরুনী সিঁদুর কৌটা, বাক্স তোরঙ্গ কিছুই তো সে নিয়ে যায়নি। শুধু নিজেই সরে গিয়েছিল। দখলী সত্ত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিল শুধু জিনিসপত্র দিয়ে। তা কি থাকে ?

বীণা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি নাকি বাজারের এক বেশ্যা মাগীকে বিয়ে করেছ ? আর সোহাগ করে গানের দল করেছ তার নামে ?'

পরেশ ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, 'না না না। ও সব কথা কে বলেছে তোমাকে ?'

বীণা বলেছিল, 'দেখ, যদি বাপের বেটা হও মিথ্যে কথা বল না। মিথ্যে বললে আমার পায়ের জুতো তোমার কপালে ছুঁড়ে মারব।'

মেয়েমানুষের এই স্পর্ধা পরেশের সহ্য হয়নি। সেও মরিয়া হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, করেছি, হাজার বার করেছি। শুধু বিয়ে নয়, তার পেটে আমার বাচ্চাও আছে। সে বেশ্যাই হোক, আর যাই হোক, সে তোমার মত বাঁজা মেয়েমানুষ নয়।'

বীণা একপলকের জন্য থ' হয়ে গিয়েছিল। তারপর চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আমি বাঁজা না তুমি বাঁজা ? ভালো করে হিসাব করে দেখ গিয়ে যাও। সে কার বাচ্চা, কার বলে চালাচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখ গিয়ে যাও। যেমন চোর, তেমনি বাটপাড়।'

পরেশ বলেছিল, 'চুপ ! আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ ? যাও, বেরিয়ে যাও।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে বীণা পা থেকে জুতো খুলে পরেশের দুই গালে ঘা মেরে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। আর মুখ দেখেনি, মুখ দেখায়নি। বাপের বাড়িতে গিয়ে সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়েছিল।

এসব ঘটনা পরেশের মুখেই শুনেছিল সুধা। পরেশ তাকে বলেছিল, 'চল আমার সঙ্গে।'

সুধা শিউরে উঠে বলেছিল, 'সে কিগো ! কি দিয়ে গড়া তোমার অঙ্গ ? লোহা না পাথরের ? একটা বউ এই দুঃখে আত্মঘাতী হল, আর আমি যাব সেখানে ? আমার কি প্রাণে ভয়-ডর কিছু নেই ?'

পরেশ বলল, 'ভয়ডর আছে বলেই তো বলছি। সে রোজ আমাকে জুতো নিয়ে তাড়া করে। আমি একা একা আর তার মার খেতে পারিনে সুধা। পাপ যখন দুজনে মিলে করেছি, এসো শাস্তিও দুজনে মিলে নিই, মরি তো দুজনে মিলেই মরি।'

একদিন ফিরিয়েছিল, দুদিন ফিরিয়েছিল, তিনদিনের দিন পরেশকে আর ফেরাতে পারল না

সুধা। তার দুঃখ দেখে মায়া হল। সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে মানষটা। তা দেখে সুধা অভয়া হল।

সুধা বলল, 'বেশ, যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু এই দবমাহাটার বাড়িতে আর না। তুমি অন্য বাসা দেখ।'

তারপর পাথুরেঘাটার বাসা ভাড়া করে পরেশ তাকে নিয়ে এল। সুধার মনের সন্দেহ ঘুচাবার জন্যে ময়না জন্মাবার মাসতিনেক আগে তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করল। মানুষটা একেবারে ভীতু নয়। সাহস আছে বটে। বন্ধুরা কত ঠাট্টা করল, টিটকিরি দিল, কিন্তু কিছুতেই দমেনি পরেশ। আর সুধাও সেই সাহসের মান রেখেছে। সব ছেড়ে দিয়ে দাসী হয়ে আছে পরেশের। একই হাতে করছে ঝি চাকর আর রাঁধুনির কাজ। যে বয়সে সে পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারত, সে বয়সে সে একটিমাত্র পুরুষের পায়ের তলায় পড়ে আছে। সে যদি কোনদিন পায়ে ঠেলে দুনিয়াতে কোথাও আর সুধার ঠাঁই হবে না। বীণার মতই তাকে দুনিয়ার বাইরে চলে যেতে হবে।

কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই সুধার। পরেশ তাকে অনেক দিয়েছে। সম্মান দিয়েছে। ছেলে মেয়ে ঘর সংসার দিয়েছে। কিন্তু এত দিনেও পরেশ যেন তার সবখানিক দেয়নি। সুধাকে দল ছাড়িয়েছে। দলটা এখনও সুধার নামে চলছে, কিন্তু সুধা তো আর দলের মধ্যে নেই। কী করে থাকবে। দু' বছর বাদেবাদেই তার কোলে ছেলে আসছে। একটি মাই ছাড়তে না ছাড়তে আর একটি এসে মাই ধরছে। সুধার আর নড়বার জো নেই। এদের ছেড়েও সে বেরোতে পারে না, সে বন্দিনী হয়ে আছে ঘরে। তার গানবাজানা সব বন্ধ।

কিন্তু পরেশের তো কিছু বন্ধ হয়নি। তার সব চলছে। তার দলও আছে, দলে নিত্যনতুন সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে আনাও শেষ হয়নি। দলের রাধাকে নিয়ে পরেশ কী যে করে, তা কি সুধা নিজে রাধা সেজে জেনে আসেনি ?

পরেশ যদিও বলে, 'দূর দূর। আমার সে সব অভ্যাস আর নেই।' কিন্তু সুধার সে কথা বিশ্বাস হয় না। সে বিশ্বাস করতে চায় কিন্তু পারে না।

যে কটা মাস পরেশ দল নিয়ে বাইরে কাটায় তখনকার দিনগুলি সুধার আর কাটতে চায় না। রাতগুলি আরো দুঃসহ হয়। চিন্তায় চিন্তায় শরীর শুকিয়ে ক্ষয় হয়ে যায় সুধার, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ছেলেমেয়েগুলি মার খায়। অসাবধানে চায়ের কাপ, কাঁচের গ্লাস, তেলের শিশিগুলি ভেঙে ভেঙে চুরমার হতে থাকে। সারাটা সংসারকে মনে হয় কাঁচের ঘব বলে—তাসের ঘর বলে। যে কোন মুহূর্তে যেন ভেঙে পড়তে পারে।

অথচ পরেশকে দল থেকে ছাড়িয়ে আনারও উপায় নেই। দল ভেঙে দেওয়ার জো নেই। তাহলেও সংসার ভাঙে। ছেলেমেয়েগুলি না খেয়ে মারা যায়। এক বছর জোর কবে পরেশকে ধরে রেখেছিল সুধা। কিন্তু সে যেন প্রাণহীন দেহকে ধরে বাখা। উপার্জনহীন পুরুষকে ঘবে বসিয়ে রেখে লাভ কি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পরেশ আর কোন কিছু করতে পারে না। রোজগারের একটিমাত্র পথই তার আছে। সে পথ শান্তির পথ নয়। তবু ওই পথে স্বামীকে ছেড়ে না দিয়ে উপায নেই সুধার। তাকে পথে বের করে না দিলে ঘরেও শান্তি থাকে না।

পরেশ দল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুধা প্রতিবার ছটফট করে। দিন আর রাতগুলি তার যেন বিষে ভরে ওঠে।

সুধার মাঝে মাঝে মনে হয় হিংসুটে বীণা অপঘাতে মরে আর কোথাও যায়নি. সুধার বুকের মধ্যেই এসে বাসা বেঁধেছে। দরমাহাটার সেই ঘর ছেড়ে এলে কি হবে---সুধার বুকের মধ্যে সেই ঘর অমর হয়ে আছে। সুধার নিস্তার নেই, কিছুতেই নিস্তার নেই।

মাঝে মাঝে সে স্বামীকে ভয় দেখায়, 'আমিও তোমার আগের বউয়ের মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

পরেশ হেসে বলে, 'মরেই দেখ না।'

সে জানে সুধার আর মরবার জো নেই। তার দু'বছর বাদে বাদে ছেলেমেয়ে হচ্ছে। একটার পর একটা গিট পড়ছে সংসারে।

ঠক ঠক, ঠক ঠক।

সদব দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

মনিঅর্ডাব পিওন বোধ হয় তাহলে সত্যিই এসে পড়ল।

সুধা সাড়া দিয়ে বলল, 'যাই।'

এবারও আর পরেশকে ধরে রাখা যাবে না। কড়া নাড়ার শব্দে এখুনি ও লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু তার আগে ছোট একটি কৌটো খুলে তার ভিতর থেকে একটা কবচ বাব করল সুধা। এবার গিয়ে কালীঘাটেব এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। পাঁচ টাকা সোয়া পাঁচ আনা পড়েছে খরচ। অব্যর্থ কবচ। এ কবচ পরে থাকলে খুবই ভালো। কেউ যদি জেদ করে না পবে, তাতেও ক্ষতি নেই। ঘুমন্ত মানুষকে শুধু একটু ছুঁইয়ে দিলেই যথেষ্ট। তাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি। এ কবচের ছোঁয়া যার গায়ে লাগবে অন্য কোন মেয়ে তার আর মন টানতে পাববে না, দেহ ছুঁতে পারবে না। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে কবচ হাতে করে যে প্রথম ছুঁয়েছে, পুরুষ চিরকালেব জন্য তাব হয়ে থাকবে।

সুধা আলগোছে পবেশের কপালে কবচটা ছুঁইয়ে দিল, তারপর সদরের কড়া নাড়ার শব্দে আর একবার সাড়া দিয়ে বলল, 'যাই।'

আশ্বিন ১৩৬৫

আগামীকাল

'একি আজই ফিফটিনথ ফেব্রুয়াবী।'

টেবিল ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন প্রিয়বঞ্জন মজুমদার। 'আজই ফিফটিনথ!' সঙ্গে সঙ্গে মন উল্লাসে উচ্ছল হয়ে উঠল। নতুন কবে চোখ পড়ল ক্যালেণ্ডারের কার্ডটির রঙ লাল, পুবের জানলা দিয়ে এই বেলা সাড়ে সাতটায় যে ভোবের রোদ এসে পড়েছে তাব রঙ আরক্ত, মনে পড়ল মাসটা ফাল্গুন, ঋতুব নাম বসন্ত। মনভ্রমরা তাব একবাব গুন গুন কবে উঠল, 'আজই ফিফটিনথ। আজই পনের তারিখ।' তিনি যদি আরো ভাষা জানতেন সেগুলিতে এই তারিখটির অনুবাদ করে নিতে পারতেন। অন্তরেব একটি কথা বাব বার ভাষা থেকে ভাষান্তরিত হত। ঢেউয়েব পরে ঢেউ, ঢেউয়েব পরে ঢেউ, একটি কথাকে হৃদযের কূলে এনে পৌঁছে দিত, 'আজ সে আসবে।'

শ্রীলতা পাশের ঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'বিড় বিড় করে পাগলের মত কী বকছ বলতো। একে তো এই বেলায় ঘুম থেকে উঠলে। তারপর হাত ধোয়া নেই মুখ ধোয়া নেই—আমরা কিন্তু চা টা সব খেয়ে নিয়েছি।'

অন্যদিন তাঁর আগে পরিজনেরা চা খেলে প্রিযরঞ্জন অসন্তুষ্ট হন। আজ তাঁর মুখে অসন্তোষের কোন ছাপ পড়ল না। হেসে বললেন, 'বেশ করেছ। কিন্তু তোমার দাঁত দুটো আজও কেন বাঁধিয়ে নিলে না বলতো। বড় বিশ্রী দেখায়। একেবারে সামনের দিকের দাঁত কিনা।'

শ্রীলতা বললেন, 'থাক। দাঁত বাঁধিয়ে নিলেই যেন তুমি আমাকে কত সুন্দর দেখবে। তাছাড়া তুমি তো বাঁধিয়ে একবার দিয়েইছিলে। অসাবধানভাবে আমিই ভেঙে ফেলেছি। তোমাব টাকা কত আর নষ্ট করব। আমার দাঁত বাঁধালেও যা, না বাঁধালেও তাই। তোমাকে তো আর আমি বেঁধে রাখতে পারব না।'

স্ত্রীব দিকে তাকিয়ে এবার একটু মায়া হল প্রিয়রঞ্জনের। শ্রীলতা গত বছর চল্লিশ পেরিয়েছেন। তিনি পেরিযেছেন আরো দশ বছর আগে। তবু তাঁর স্ত্রীর মুখে চুলে চোখের কোলে বয়সের ছাপ যেভাবে পড়েছে প্রিয়রঞ্জনের অঙ্গকে সেভাবে জরা স্পর্শ করতে পারেনি। মেয়েদের যৌবন যত দ্রুত আসে তত দ্রুত যায়। তাছাড়া চারটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে শ্রীলতা, তাদের লালন পালন করেছে। অসুখ বিসুখে পরিচর্যা করেছে। নিজেই যে কতবার অসুখে পড়েছে তার ঠিক নেই। তাছাড়া সংসারের উদ্বেগ অশান্তি ওর নিত্যসঙ্গী। দেহের কান্তি যে যাবে, লাবণ্য যে ক্ষয় হবে, এ

আর এমন বিচিত্র কথা কী। স্ত্রীর জন্যে ভারি মমতা বোধ করেন প্রিয়রঞ্জন। মুহূর্তের জন্যে লাল রঙের কার্ডখানির ওপর গৈরিক রঙের যবনিকা পড়ে।

প্রিয়রঞ্জন স্ত্রীর কথার জবাবে বললেন, 'কী যে বলো। আর কত বাঁধতে চাও। যে শক্ত আর মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধেছ— ।'

শ্রীলতা হেসে বললেন, 'ঠিকই বলেছো মোটা দড়ি দিয়েই বেঁধেছি! রঙনী-সুতো দিয়ে তো আর বাঁধতে পারিনি।'

প্রিয়রঞ্জন ভারি অপ্রস্তুত হলেন। ছি ছি ছি দড়ির কথাটা কেন বলতে গেলেন তিনি। অসতর্কভাবে নিজেই নিজের গলায় ফাঁস পরালেন। কী জুৎসই জবাব দিলে এ ফাঁস খুলবে স্থির করতে না করতে শ্রীলতা বললেন, 'যাই, আমার কাজ আছে।'

স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রক্তরঙা কার্ডখানি প্রিয়রঞ্জনের চোখের সামনে ভেসে উঠল। কী আশ্চর্য আজই পনের তারিখ। দিনটির কথা তিনি তো ভুলেই গিয়েছিলেন। দশ দিন আগে রীণা চিঠিতে জানিয়েছে সে পনেরই তারিখে এসে পৌঁছবে। প্রথম দু তিন দিন তারিখটির কথা মনে করে রেখেছিলেন প্রিয়রঞ্জন। তারপর ভুলে গেছেন। ভুলের আর দোষ কি। এই কদিন ধরে যা হাঙ্গামা চলেছে। নিজেদের অফিসের কাজের চাপ, বন্ধু সুবিমলের মেয়ের বিয়ে, মাসতুতো ভাই অরবিন্দের অপারেশন নিয়ে উদ্বেগ, পাড়ার মিতালী সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন এগিয়ে আসছে। তিনি তার স্থায়ী সভাপতি। দূর থেকে শুধু উপদেশ নির্দেশ দিলেই চলবে না। মোটা টাকার ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। এত ঝামেলার মধ্যে পনের তারিখটি হারিয়ে যেতে বসেছিল। ছি ছি, কী সাংঘাতিক কাণ্ড তাহলে হ'ত। অথচ নিজে তিনি রীণাকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে দিয়েছেন, 'এসো, আমি স্টেশনে থাকব।' ক্যালেণ্ডারের দিকে যদি তার চোখ না পড়ত তিনি আজ নির্ঘাৎ ভুলে যেতেন। রীণাকে এগিয়ে আনার জন্যে তিনি আর স্টেশনে যেতে পারতেন না, রীণা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকত, তার অভিমান হ'ত, দুঃখ হ'ত। কিন্তু সেইটাই বড় কথা নয়। তিনি এক অবর্ণনীয় আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেন। প্রিয়জনকে স্টেশনে গিয়ে এগিয়ে আনার মধ্যে আনন্দ আছে। আর সে প্রিয়জন যদি তরুণী হয়, সুন্দরী হয়, বান্ধবী হয়, তাহলে সে আনন্দের আর তুলনা হয় না।

ক্যালেণ্ডারের দিকে তার চোখ আজ না পড়তেও পারত। পড়ে না, সাধারণত পড়ে না। শুধু ক্যালেণ্ডার কেন, ঘরের কোন আসবাবপত্রের দিকেই তাঁর নজর পড়ে না। তেমনি নজর পড়ে না নিজের ছেলেমেয়েদের দিকে। বড়টি এখানকার পাঠ শেষ করে যন্ত্রবিদ্যা শিখতে বিদেশে গেছে মাঝখানে অনেকদিন ছেলেপুলে হয়নি। তারপর এসেছে দুটি মেয়ে। তারা এখনো স্কুলের ছাত্রী। সহপাঠিনীদের নিয়ে তারা স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলেছে।

সে জগৎকে মাঝে মাঝে তিনি দূর থেকে দেখেন। তারা এখনো ফ্রক পরে সপ্তাহে সপ্তাহে চুলের ফিতে বদলায়। কাছে ডেকে আদর করতে গেলে তাদের সংকোচের শেষ থাকে না। যেন বাপ নয়, অনাত্মীয় কোন পুরুষ তাদের স্পর্শ করেছে। শেষে ফের একটি ছেলে। গত বছর পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। সে এখনো মায়ের স্নেহশাসনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মাঝে মাঝে তাকে আবিষ্কার করেন প্রিয়রঞ্জন। বুকে টেনে নিয়ে আদর করেন, চুমো খান। নবনী-কোমল মোমের পুতুলের ওপর দিয়ে স্নেহের বন্যা বয়ে যায়। শেষে তার এমন দশা হয় যে সোহাগের কারাগার থেকে সে যেন ছাড়া পেয়ে গেলে বাঁচে। অবস্থা বুঝে ওকে ছেড়ে দেন প্রিয়রঞ্জন। ওকে বাঁচতে দেন। তারপর সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাস, তিনি আর ওদের কাউকে হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেন না। যেমন ছুঁয়ে দেখেন না বাড়ির কোন আসবাবপত্র। এসব যেন তাঁর জন্যে নয়। তাঁর হাত শুধু অর্থ রোজগারের জন্যে।

ক্যালেণ্ডারের তারিখটা তাঁর চোখে না পড়তেও পারত। কিন্তু পড়েছে। কী ভাগ্য যে পড়েছে। প্রসন্ন মনে বাথরুমে ঢুকলেন। দাঁত মাজতে মাজতে আয়নায় মুখ দেখলেন। পাকা দাড়ির রুপালি বিন্দু দুই গালে ভেসে উঠেছে। ছি ছি ছি। এরপর থেকে ওদের আর চব্বিশঘণ্টা জীবনের মেয়াদ দিলে চলবে না। বার ঘণ্টা পরপরই ওদের একবার করে নির্মূল করতে হবে। চুল এখনো অতটা

শত্রুতা করেনি। যে দু এক গাছি সাদা মুখ বাড়িয়ে তাদের এখনি গিয়ে তুলে ফেলবেন। সপ্তাহখানেক আগে হবে.. সেলুনে গিয়েছিলেন। তাই সনের সাহায্য নিতে হবে,ক্ষুদ্র শত্রুই সবচেয়ে মারাত্মক। চুল আর দাড়ির মত জরাকেও যদি মূল শুদ্ধ এমনি করে উপড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু তা যায় না, কিছুতেই যায় না। অনর্থক অহেতুক অসুন্দর জরা যৌবনকে এসে গ্রাস করে। প্রিয়রঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কী এর প্রয়োজন ছিল। এই জীবনে জরা একান্ত নিষ্প্রয়োজনে অনেকখানি জায়গা দখল করে রেখেছে। কৌমারং যৌবনং—তারপর জরা কেন। তারপরেই মৃত্যু হতে পারত। সে মৃত্যু অনেক সুন্দর। যৌবনে জীবন যেমন সুন্দর, যৌবনে মৃত্যুও তেমনি। জরার হাতে ধরা ছোঁয়া না দিয়ে নিজের যৌবনকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া। তরুণীরা যেমন করে পালায়। দু মিনিট দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কাজের অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ে। রীণাও ধরা দেয়নি। প্রিয়রঞ্জন হাসলেন। কিন্তু ধরা না দিলেও ছোঁয়া দিতে হয়েছে। রীণা একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেনি। এইভাবেই শোধ নিতে হয়। এ ছাড়া শোধ নেওয়ার কোন উপায় নেই। জরা যেমন তাকে ছোঁবে সেই স্পর্শের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি তেমনি যৌবনকে ছোঁবেন, ভাষা দিয়ে ছোবেন, হাত দিয়ে ছোবেন, মন দিয়ে ছোবেন। মন সব চেয়ে সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়। জরা সবচেয়ে পরে স্পর্শ করে। সবচেয়ে আগে নিলেই বোধ হয় জ্বালা জুড়াত।

রীণা সেবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি এপর্যন্ত কত মেয়েকে ভালোবেসেছেন ?' কত মেয়েকে আদর করেছেন ?'

প্রিয়রঞ্জন হেসে বলেছিলেন, 'কেবল কত আর কত। কেবল সংখ্যার দিকে তোমাদের লোভ। আমি গুণতে পারিনে।'

রীণা বলেছিল, 'মানে তারা অগুণতি ?'

প্রিয়রঞ্জন জবাব দিয়েছিলেন, 'তারা অনাগতা। স্বাগতা শুধু তুমিই।'

রীণা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে এর চেয়ে বড় সত্য কথা আর ছিল না। একটি মুহূর্তের সত্যই তো সবচেয়ে নিবিড় আর নির্ভরযোগ্য। পরের মুহূর্তে কে কোথায় থাকব তার ঠিক কি। আর এই মুহূর্তের মানুষের সঙ্গে তার পরমুহূর্তের যে মিল তা শুধু চেহারায়। আর কিছুতে নয়। বাক্যে নয়, মনে নয়, অনুভূতিতে নয়। একটি মুহূর্ত তার স্বাদ আর উপলব্ধিতে স্বকীয়। আর সেই মুহূর্তব্যাপী সত্তার সেখানেই শেষ। আমরা ক্ষণে ক্ষণে জন্মাই, ক্ষণে ক্ষণে মরি। শুধু এই অর্থেই আমরা ক্ষণজন্মা।

রীণা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু তর্কও করেনি। নিঃশব্দে তাঁরা দুজনে বসে চা খেয়েছিলেন। চায়ের কাপে ঝড় তোলেননি। শান্ত কোমল লাবণ্যভরা মুখ নিয়ে বীণা তাঁর সামনে চুপ করে বসেছিল। এই ধরণের মুখই তিনি পছন্দ করেন। তাঁর গলা মৃদু আর মিষ্টি। মিতভাষিণী আর স্মিতমুখী মেয়েকেই প্রিয়রঞ্জন বেশি ভালোবাসেন। রীণা প্রশান্ত কালো দুটি চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। সে চোখে ব্যঙ্গ ছিল না, বিদ্রূপ ছিল না। শুধু নির্ভরতা ছিল। কৃষ্ণ তারকার এই স্নিগ্ধতাই প্রিয়রঞ্জনের মনে সবচেয়ে স্নিগ্ধতা এনে দেয়। দেয়ালের আয়নায় নিজের মুখ কখন যে ঢাকা পড়ে গেল তার ঠিক নেই। তরুণী বান্ধবীর মুখচ্ছবি মনের আয়না জুড়ে রইল।

বাথরুমের দরজায় টোকা পড়ল।

'আজ কি সারাদিন ওখানেই কাটাবে নাকি ? আমার কি আর কোন কাজকর্ম নেই ?'

প্রিয়রঞ্জন সাড়া দিলেন, 'নিশ্চয়ই আছে। কাজকর্ম ছাড়া কি জগৎ চলে। আমি কর্মবীর না হতে পারি, তুমি তো বীরাঙ্গনা।'

শ্রীলতা বললেন, 'তোমার রঙ্গরস এখন রাখো। রান্নার নতুন লোক নিয়ে আমি যা নাকানি চুবানি খাচ্ছি তা আমি জানি।'

এই হয় সবচেয়ে মুস্কিল। প্রিয়রঞ্জন যখন তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসেন শ্রীলতা তখন নাকানি চুবানি খান, আবার শ্রীলতা যখন ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় সাঁতার কাটেন প্রিয়রঞ্জন তখন ভাঙা জাহাজেই চড়ে অতলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। দুজনের মিল হবে কী করে ?

বাথরুম থেকে এসে প্রিয়রঞ্জন ড্রয়িংরুমে বসে চা খেলেন। খবরের কাগজ উল্টে সবচেয়ে আগে

দেখলেন বিজ্ঞাপনের পাতা। নিজেদের পার্টির বিজ্ঞাপনগুলি ঠিকমত বেরিয়েছে কিনা একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন, অন্যদিন যেমন খুঁটিয়ে দেখেন আজ আর তেমন করে দেখলেন না। দেখতে ইচ্ছাই করল না। আজ কোন কাজ নয়। আজ শুধু রীণা রীণা রীণা। রীণা ছাড়া আজ আমি কিছুই জানি না। প্রিয়রঞ্জন মনে মনে হাসলেন। আজ আর তিনি অফিসে যাবেন না। একদিন না গেলে তাঁদের পাবলিসিটি অফিসের কোন ক্ষতি হবে না। অ্যাসিট্যান্টরা আছে। তারাই কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ যদি তিনি অফিসে যান তাহলেই ক্ষতি হবার আশঙ্কা বেশি। তাঁর মন মেজাজ ঠিক থাকবে না, কথায় কথায় চটে উঠবেন। কাজকর্মে ভুল হবে। ভিতরের লোকজনকে ধমকাবেন, বাইরের ভদ্রলোকের সঙ্গে শিষ্টাচারের ত্রুটি ঘটাবেন। তিনি আজ অফিসে গেলেই সবদিক থেকে ক্ষতি হবে। মনোজগৎ আর বহির্জগৎ তাতে কারোরই কোন লাভ নেই। মন আজ যার জন্যে উন্মনা একটি দিন অখণ্ডভাবে তাকেই আজ সমর্পণ করবেন প্রিয়রঞ্জন। তারপর কাজ তো আছেই। কাল আছে, পরশু আছে, তরশু আছে। কাজের শেষ নেই। তবু সাময়িক বিরতিকে মানতে হয়। সেই বিরাম কর্মশক্তিকে বাড়ায়, চিত্তের সেই বিনোদন সমস্ত ক্লান্তি আর অবসাদকে অপনোদিত করে। তাই ভাসাভাসা যাকে অপচয় বলে মনে হয় একটু তলিয়ে দেখলে তাকেই সঞ্চয় আর সংগ্রহ বলে চেনা যায়। বোঝা যায় এরই নাম উত্তাপ আর আলো। তাতে জীবনীশক্তি কর্মশক্তি বাড়ে। গ্রহণ আর দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

চায়ের পর্ব শেষ করে প্রিয়রঞ্জন দাড়ি কামাতে বসলেন। দুই গালে সুগন্ধ সাবানের পুরু প্রলেপ পড়ল। রেজারে নতুন ব্লেড পরিয়ে আয়নায় নিজের ফেনশুভ্র মুখের দিকে একবার তাকালেন প্রিয়রঞ্জন। না এখনো তত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি। এখনো গাল তোবড়ায়নি, কপালে কি নাকের দুপাশে কুটিল কাল তার নিষ্ঠুর আঙুলের ছাপ রেখে যায়নি, বিশ্বাসঘাতক যে কয়েকটি সাদা চুল মাঝে মাঝে মাথা জাগায় এখনো তারা অতিমাত্রায় সংখ্যালঘু,এখনো তাদের সমূলে উৎপাটন করা চলে। নিজের সুগৌর দীর্ঘ আকৃতির দিকে তাকিয়ে আর একবার আশ্বস্ত হলেন প্রিয়রঞ্জন। জরাসুরকে এখনো তিনি দূরে দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছেন।

'বয়স। বয়স একটা অ্যাকসিডেন্ট। পনের বিশ বছর পরে না জন্মিয়ে আগে জন্মানো। তার ওপর আমার কোন হাত নেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা আমার নিজের হাতে গড়া।'

প্রিয়রঞ্জন সেবার রীণাকে বলেছিলেন।

রীণা একটু হেসেছিল, 'ঠিক বলেছেন। শুধু হাতেই গড়া। এর মধ্যে হৃদয়ের কোন নামগন্ধ নেই।' তরুণী নারীর মুখে হৃদয় কথাটি বড় সুন্দর শোনায়। তার অভিমান অভিযোগের মধ্যেও কী মাধুর্য। ওর মুখে হৃদয়হীনতার অপবাদ উপভোগ করছিলেন প্রিয়রঞ্জন। হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'শুধু হাত দিয়ে কি কিছু গড়া যায়? হাতই বল, চোখই বল আর মুখই বল, সব করণ কারক। যে প্রেরণা দেয়, যে করায় তার নাম হৃদয়।'

রীণা তর্ক তুলেছিল, 'হৃদয়? আমি তো শুনেছি সে আমাদের মস্তিষ্ক। আমাদের নার্ভ সেণ্টার—।'

প্রিয়রঞ্জন হেসে বলেছিলেন, 'ও তোমার বৈজ্ঞানিকের ভাষা। আমার কাজকর্মের প্রেরণা নার্ভসেণ্টার থেকে আসে না, সব হৃদযন্ত্রে বাজে।'

খুব সতর্কভাবে সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন প্রিয়রঞ্জন। তাঁর কোন ব্যবহার যেন রীণার রুচিকে আঘাত না করে। যেন তাঁর আচরণে প্রৌঢ় পুরুষের বহুকালের অভিজ্ঞতা আর বর্বর লোভ প্রকাশ না পায়। তাহলেই সুতো ছিঁড়ে যাবে। রীণা সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কলেজের অধ্যাপনায় ঢুকেছে। বৃত্তিটাই এমন যাতে দেহসম্পর্কে মানুষকে নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন করে রাখে। সে আচ্ছাদন একটানে ছাড়াতে যেতে নেই। রয়ে সয়ে ধীরে সে আবরণ উন্মোচন করতে হয়। আবরণ পরানো যেমন শিল্পীর কাজ উন্মোচনের কাজও তারই। তিন বছর ধরে ওর সঙ্গে আলাপ। এই সময়ের মধ্যে অশোভন অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেননি প্রিয়রঞ্জন। ঠাট্টা তামাসা

কৌতুক ছাড়া এমন কিছু করে বসেননি যাতে নিজের কাছে নিজেকে জবাবদিহি করতে হয়। তিন বছরের আলাপ হলেও দেখা সাক্ষাৎ ওর সঙ্গে একুনে কদিনই বা হয়েছে। তিনমাসও হবে না বোধ হয়। না, সব মিলিয়ে নব্বই দিন কিছুতেই হবে না। বেশির ভাগ আলাপ চিঠিতে। সে চিঠিও খুব ঘন ঘন নয়। মাসে গড়ে দুখানার বেশি হবে না। তবু সেই চিঠিতে বন্ধুত্বের স্বাদ পেয়েছেন প্রিয়রঞ্জন। বোধ হয় দিতেও পেরেছেন। নইলে এই অসম সম্পর্ক এতদিন থাকবে কেন।

বন্ধুত্ব আর তারুণ্যের সান্নিধ্য। আর কিছু নয়। এর জন্যে স্ত্রীর কাছে গোপন করবার কিছু প্রয়োজন ছিল না। বললেই হত, 'বীণা আজ আসবে, ওকে আজ এখানে নিয়ে আসব।'

বার কয়েক চেষ্টা করলেন প্রিয়রঞ্জন, কিন্তু বলি বলি করে কিছুতেই বলতে পারলেন না। বলতে ইচ্ছে হল না। শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'আমার মধ্যে যে আরেক ইচ্ছাময় রয়েছে তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকলে আরো অনেক অনর্থ ঘটবে। মেজাজ ঠিক থাকবে না, কাজকর্মে খুঁতখুঁতি বাড়বে। তাতে কারোরই লোকসান ছাড়া লাভের আশা নেই। আর স্ত্রীর কাছে সামান্য এই লুকোচুরির মধ্যে দোষের চেয়ে মজা বেশি। যেমন মজা আছে এই অফিস পালানোয়। স্কুল আর কলেজ পালাবার সেই তারুণ্যের স্বাদ যেন ফিরে পাওয়া যায়। সেদিনের সেই স্বাদ আর গন্ধ। বাধাবন্ধহীন আনন্দধারা। বড় বড় অপরাধের প্রবৃত্তি দূর করবার জন্যে মানুষের ছোট ছোট দোষত্রুটি ঘটতে দিতে হয়। দু'একটি রন্ধ্রপথে ভিতরের ধোঁয়াকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া ভালো। কচুগাছ কাটতে কাটতে ডাকাত হল এ প্রবচন সব সময়ের জন্যে সিদ্ধ নয়। বরং ছোট ছোট ত্রুটিবিচ্যুতি না থাকলেই মানুষ বড় বড় অপরাধের দিকে ঝোঁকে। ডাকাতি করে রাহাজানি করে লোকের মাথায় বাড়ি দেয়। প্রিয়রঞ্জন যে কাজটুকু করতে যাচ্ছেন তাতে কারো মাথায় বাড়ি তো ভালো সামান্য ছড়ির আঘাতও পড়বে না। বলা যায় আঙুলের টোকাও লাগবে না।

তিনি স্টেশনে গিয়ে বীণা দত্তগুপ্তকে রিসিভ করবেন। তাকে ট্যাক্সিতে করে এনে নিউ আলীপুরে পৌঁছে দেবেন। বড়জোর পথে কোথাও নেমে একটু চা খাবেন, দু'টো সুখ দুঃখের কথা বলবেন, তারপর ফিরে চলে আসবেন। এইটুকুর জন্যে নিশ্চয়ই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এতে তাঁর পরিবারের কোন ক্ষতি হবে না, কারো মর্যাদার হানি হবে না, বরং জীবনে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে, একদিনের এক ফোঁটা আনন্দরস আরও কয়েকটি দিনকে সিঞ্চিত করে রাখবে। প্রিয়রঞ্জন দাড়ি কামানো শেষ করলেন, মাথায় যে কয়েকটি পাকা চুল ছিল পরম অধ্যবসায়ে সেগুলি তুলে ফেললেন।

শ্রীলতা এসে আরো একবার তাগিদ দিয়ে গেলেন, 'কী হচ্ছে শুনি? তোমার অফিসের বেলা হয় না? এরপর তো নাকেমুখে গুঁজে ছুটবে। ওসব ছুটির দিনে করলেও তো হয়।'

প্রিয়রঞ্জনের আজই যে ছুটির দিন সে কথা এখন আর বলবার জো নেই।

দাড়ি কামাবার পরে বাথরুমে ঢুকলেন প্রিয়রঞ্জন। সাবান মাখতে মাখতে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে ভালো করে তাকালেন। বড় এখনো ম্লান হয়নি। শরীরটা একটু মুটিয়ে যাচ্ছে। আবার লাইট একসারসাইজ শুরু করতে হবে। তাহলেই সেই কৃশতা ফিরে আসবে। ডায়েটিং-এর দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ডাক্তার বন্ধু বলেছেন মেদস্ফীতি কমাতে হলে ডায়েটিং অপরিহার্য। অল্পাহারী তো হতেই হবে একাহারী হলে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু শ্রীলতাকে সে কথা বলবার জো নেই। সে মার মার কাট কাট করে উঠবে। বলবে, 'তুমি যদি না খাও তাহলে আমিও কিছু খাব না।' তাকে একথা বোঝানো শক্ত আমরা খাওয়ার জন্যে বাঁচিনে, বাঁচবার জন্যে খাই। কম খেলে মানুষ মরে না, বরং মিতাহার শরীরকে ফিট রাখে, শক্ত এবং সোজা রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু একথা শুনলে শ্রীলতা ধমকাবে। বলবে, 'রাখো রাখো। তোমার শরীর কিসে ঠিক থাকে না থাকে তা যেন আমার জানতে কিছু বাকি আছে। দেহ দেহ করে তুমি পাগল হয়ে গেলে। এই এক রোগ, এক বাতিক। তুমি কি অ্যাক্টর যে না খেয়ে শরীর শুকিয়ে চিরদিনের মত তরুণ সেজে থাকবে? তোমার হিরোইনদের কি বয়স বাড়ে না? তারা কি বুড়ো হয় না?' প্রিয়রঞ্জন জানেন যে এক সঙ্গে সবাই বুড়ো হয় না। আর এই না হওয়াটা একই সঙ্গে আশীর্বাদ আর অভিশাপ। তাঁর তারুণ্য যাবে তবু পৃথিবীতে তরুণীরা

থাকবে। সবাইকে তিনি সহমরণে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন না।

খেতে বসে স্ত্রীর সঙ্গে এই খাওয়া নিয়ে ফের একটু কথা কাটাকাটি হল প্রিয়রঞ্জনের। এরই মধ্যে তিন চার পদ রেঁধে নামিয়েছেন শ্রীলতা।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'এত ভাত, এত মাছ তরকারি ক'জনের জন্যে বেড়েছ বলতো?'

শ্রীলতা বললেন, 'একজনের জন্যেই বেড়েছি। রোজই তো খাও। আজ কী হল তোমার। দিনের পর দিন কি বয়েস কমছে তোমার? নাকি খোকা হচ্ছ?'

প্রিয়রঞ্জন চটলেন না। আজ তিনি কিছুতেই মেজাজ খারাপ করবেন না। হেসে বললেন, 'খোকা হইনি। কিন্তু আমাকে ক্ষীর ননী খাইয়ে নতুন করে নাড়ুগোপাল করে রাখাই বোধ হয় তোমার ইচ্ছে।'

টেবিলের নীচে বিড়াল আর আশে পাশে আট বছরের ছেলে রন্টু ঘুর ঘুর করছিল। প্রিয়রঞ্জন বিড়ালকে মাছের কাঁটা আর ছেলেকে আস্ত একখানা ভাজা মাছ তুলে দিলেন। দু'টিতেই মৎস্যপ্রিয়।

শ্রীলতা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ও কি। ও আবার কী হ'ল। তোমাকে দিয়েছি তুমিই খাও। ওদের জন্যে আছে। তোমার অত বদান্যতার দরকার নেই।'

নতুন রাঁধুনী রাসমণি ফের ভাত নিয়ে আসছিল। প্রিয়রঞ্জন তাকে ধমক দিলেন, 'আঃ তোমরা কি আমাকে রাক্ষস ভেবেছ? তোমার মাঠাকরুণ বুঝি শিখিয়ে দিয়েছেন আমি খুব খাইয়ে মানুষ?'

সামনের চেয়ারে বসে শ্রীলতা তবু বললেন, 'এক হাতা নিলে পারতে।'

প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'মোটেই নয়, একটি হাতাও আর নয়।'

খেয়ে উঠে প্রিয়রঞ্জন মেয়েদের খোঁজ নিলেন একটু, 'দীপা নীপা বুঝি স্কুল থেকে এখনো ফেরেনি?'

শ্রীলতা হেসে বললেন, 'ওদের ফেরার সময় হয়েছে নাকি যে ফিরবে? মেয়েদের খুব যে তত্ত্বতালাস নেওয়া হচ্ছে। পানটান চাই নাকি?'

প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'না পানের আর দরকার নেই। আমার ধুতি পাঞ্জাবি বের করে দাও তো। আজ আর স্যুট পরে বেরোব না। বড্ড গরম পড়ে গেছে।' শ্রীলতা একটু ঠাট্টা করলেন, 'কই আমাদের তো তেমন গরম লাগছে না।'

আদ্দির বদলে শ্রীলতা সিল্কের পাঞ্জাবিটা বের করে দিলেন দেখে প্রিয়রঞ্জন খুশি হলেন। না দিলে মুখ ফুটে চাইতে লজ্জা করত। তবু বললেন, 'কেন, আদ্দির পাঞ্জাবিটা কী হল। সেটা দিলেই হত।'

শ্রীলতা বললেন, 'সেটা ধোপা বাড়ি থেকে ছিঁড়ে এসেছে। নতুন জামা না করালে আর গায়ে দিয়ে বেরোতে পারবে না।'

শেষ কথাটা প্রিয়রঞ্জনের কানে গেল না। তার আগেই তিনি মনে মনে ধোপাকে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করেছেন।

সিল্কের পাঞ্জাবিতে প্লাষ্টিকের বোতাম মানায় না। তাই সোনার বোতামের সেটই চেয়ে নিলেন প্রিয়রঞ্জন।

শ্রীলতা হেসে বললেন, 'তুমি না চাইলেও দিতাম। আমি কি জানিনে প্রেমরাধা সাজে অভিসার সাজে। এখানে রাধার বদলে শ্রীকৃষ্ণ। রাধা কোথায় বসে সাজছেন কে জানে।'

প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'কী যে বল। এই দিনদুপুরে আমি অভিসারে বেরোচ্ছি! আমার আর খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই। অফিসে একজন ভদ্রলোক আসবেন তাই—ও কি ও রন্টু ওখানে কী করছিস। আবার আমার টেবিলের কাছে গেলি কেন। আমার বইটইতে হাত দিয়ো না।'

রন্টু তাড়াতাড়ি সরে এসে বলল, 'না না, দেব না!'

ছেলেকে একটু আদর করে প্রিয়রঞ্জন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। সামনেই রাসবিহারী এভিনিয়ু। রাসবিহারী। শব্দটা তো মন্দ নয়। নামের অর্থটুকুও নতুন করে উপভোগ করলেন প্রিয়রঞ্জন।

একটু দুরে একটি মুচি বসে আছে। এগিয়ে গিয়ে জুতো জোড়া পালিশ করিয়ে নিলেন। পরশুদিন পালিশ করিয়ে ছিলেন। তাই বলে কি আজ করানো যায় না। দামি জুতো। মাঝে মাঝে পালিশ না করলে খারাপ হয়ে যায়।

পাশের গয়নার দোকানে কয়েকটি মেয়ে এসে ঢুকেছে। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন আজ মেয়েদের দেখলেন না। আয়নায় নিজের চেহারার দিকে একবার তাকালেন। মনে হল অন্তত বছর দশেক বয়েস তাঁর শরীর থেকে ঝরে গিয়ে তাঁর দেহকে লঘুভার করে দিয়েছে, অন্তরকে লঘুতর।

দোকানে ফোন আছে। একবার ভাবলেন অফিসে ফোন করে একটা খবর দেবেন কিনা। তারপর ভাবলেন কী দরকার। মিছামিছি পয়সা যাবে, দেরি হবে।

প্রিয়রঞ্জন জুয়েলারের দোকান ছাড়িয়ে বাসস্টপে এসে দাঁড়ালেন। দুটি দ্বিতল বাস মালের মত মানুষ বোঝাই করে তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি উঠলেন না। তিনি এই মুহূর্তে অফিসের কেউ নন। অফিসের নন, পরিবারের নন, সমাজের নন, সংসারের নন। তিনি আজ শুধু একজনের। সমস্ত জীবন সমস্ত সত্তা একটি উদ্দেশ্য, একটি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। সমস্ত জীবন এখন একটি মাত্র টুকরো। একটি হীরের টুকরো। প্রিয়রঞ্জন পাঁচ নম্বর বাসে উঠলেন। সেই বাস তাঁর মনোরথের মত অত দ্রুত নয়, তবু বেশ তাড়াতাড়ি তাঁকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিল। ব্রীজ পার হতে জলের দিকে তাকালেন প্রিয়রঞ্জন। বড় ভালো লাগল। জল যেন প্রাণরসের মত টল টল করছে। অনেকদিন পরে গঙ্গা দেখলেন। গঙ্গা। এ নদীর নাম আজ যমুনা হলেও ক্ষতি ছিল না। প্রেমযমুনার তীরে। প্রাণগঙ্গা, কিন্তু প্রেমযমুনা।

নদীর পরে সমুদ্র। জনসমুদ্র।এনকোয়ারি অফিসের সামনে গিয়ে বোম্বাই মেলের একবার খবর নিলেন প্রিয়রঞ্জন। না গাড়ি রাইট টাইমে আসছে না। বিরক্তির একশেষ। গাড়ি দেড়ঘণ্টা লেট। দেড়ঘণ্টা! শোন কথা। অতক্ষণ কি বাঁচব। নিজে আধঘণ্টা আগে চলে এসেছেন। সেই সঙ্গে আরো দেড়।

এই রোদের মধ্যে বাইরে টো টো করে ঘুরে কি হবে। তার চেয়ে এখানকার ওয়েটিংরুমে বসে থাকাই ভালো। এখানে থাকলে তার কাছে থাকা হবে। দেরিতে হলেও সে আসছে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আরো কাছে আসছে।

ওয়েটিংরুমে গিয়ে ঢুকবার আগে প্রিয়রঞ্জন সস্তা একখানা ইংরেজী ডিটেকটিভ উপন্যাস কিনে নিয়ে গেলেন। এখন গুরুতর কোন বিষয়ে মন বসবে না। কিন্তু লঘুচিত্তাকর্ষক রোমহর্ষক গল্পেও মন লাগল না। বিরক্ত হয়ে বইটা যতবার বন্ধ করলেন মলাটের লাস্যময়ী যৌবনবতী বিদেশিনীর প্রতিকৃতির দিকে ততবার চোখ পড়তে লাগল। রীণার সঙ্গে ঠিক মিল নেই। এই মেয়েটা বড় অভদ্র, অশিষ্ট, উদ্ধত। শুধু স্তনযুগেও নয়, স্বভাবেও রীণা একেবারে উল্টো। শান্ত শিষ্ট নম্র ভদ্র। এর সঙ্গে রীণার যে মিল আছে তা শুধু যৌবনের মিল। রীণার মুখে, মুখের হাসিতে কারুণ্য আর বিষাদ মিশে আছে। সেই বিষাদ ওর জীবনে গভীরতা এনেছে, স্বাদকে মধুরতর করেছে। অত গভীরতা এত কম বয়সে আসে না। কম বয়স নিয়ে জীবনসমুদ্রের গভীরে নেমেছে রীণা। সাঁতার কাটেনি, ডুব দিয়েছে, তলিয়ে গেছে। ডুবুরী হয়ে ওকে তুলে আনতে হবে। প্রিয়রঞ্জন বুঝতে পেরেছেন এই বয়সেই ও গভীর আঘাত পেয়েছে, সেই আঘাত কার হাতের কোন অস্ত্রের তা জেনে তাঁর দরকার নেই। রীণা তা জানায়নি। জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবেন না প্রিয়রঞ্জন। শুধু সেই ক্ষত স্থানে যদি হাত বুলিয়ে দিতে দেয়, যদি প্রীতির প্রলেপ লাগাতে দেয় তাহলেই যথেষ্ট। আর কিছু চান না প্রিয়রঞ্জন। রীণা বড় ভালো মেয়ে। বড় মিষ্টি শান্ত, যেন একটি গ্রামযমুনা। রীণা মোটেই এই বইয়ের ওপরের মলাটের মেয়ের মত উগ্র উচ্ছল উচ্ছৃঙ্খল নয়। রীণা সস্তা থ্রিলারের মলাটের ওপরের মেয়ে নয়, প্রাচীন পুঁথির ভিতরের মেয়ে, মধুর ধ্বনিবহ শব্দে শ্লোকে শ্লোকে গাঁথা। সে বাইরের কেউ না, অন্দরের মেয়ে, অন্তরের। তাঁর স্বভাব একেবারে উল্টো। তবু প্রিয়রঞ্জনের মাঝে মাঝে সাধ তাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পালটে নেন, পালটে দেখেন। ডুবুরীর মত সমুদ্রের তলা থেকে তুলে এনে তরঙ্গে ভাসিয়ে দেন। জীবন তরঙ্গ যৌবন তরঙ্গ। রীণা মাঝে মাঝে বলে ওর নাকি ডুবে মরতে ইচ্ছা করে। ডুবে মরবে বলেই কি অত দূরে সমুদ্রের ধারে

গিয়ে বাসা বেঁধেছে। কলেজ কি বাংলা দেশে নেই? প্রফেসরি কি এখানে কোথাও জুটত না? এবার রীণাকে তাই বলবেন প্রিয়রঞ্জন। বলবেন, এবার থেকে কোলকাতায় এসে থাকো। তোমার দাদা ননীমাধব বোম্বেতে বাস করতে চায় করুক। সে ফিল্ম ডিরেক্টর। তার পক্ষে বোম্বের মত জায়গা নেই। কিন্তু তুমি বাংলাদেশের মেয়ে, বাংলাদেশের নদী। তুমি এখানকারই কোন গ্রামে কি নগরে এসে বাস করো। কলকাতা ছাড়া আর সব নগরই তো গ্রামের মত। যেমন কোন্নগর। কোন্নগর। কোন্নগর বড় মিষ্টি নাম। বোম্বাই বন্দরের চেয়ে বড় মধুর। বন্ধু ননীমাধবের ইচ্ছা ছিল এদিকেই কাছাকাছি কোথাও বাড়ি করবে, কিন্তু এখন রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের দিকে তার কোন টান নেই। সে ভুলে গেছে। দেশকেও ভুলেছে, দেশের পুরোন বন্ধুদেরও ভুলেছে। কিন্তু তার সবচেয়ে ছোট বোন রীণা ভোলোনি। সে মনে করে রেখেছে। ননীমাধব দূরে সরে গেলেও রীণা এগিয়ে আসছে। বছরে একবার করে সে না এসে পারে না। রীণা একাই আসছে। তার সঙ্গে কোন আত্মীয় কি বন্ধু আসবে না সে জানিয়েছে। অন্য কোন আত্মীয় কি বন্ধু তার জন্যে স্টেশনে এসে থাকবে না সে কথাও রীণা আগে লিখে জানিয়েছে। সে কাউকে চায় না। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন যখন লিখলেন, আমি স্টেশনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, তখন রীণা কিন্তু বাধা দেয়নি। লেখেনি যে আসবেন না। প্রিয়রঞ্জন জানেন তা সে লিখতে পারে না। সেও চায় তার জন্যে কেউ আসুক। মুখে না বললেও চিঠিতে না লিখলেও মনে মনে চায়। প্রিয়রঞ্জন তাই এসেছেন। রীণা একাই আসছে, তিনিও একাই এসেছেন। একাই বসে আছেন। রীণা যখন এসে পৌঁছবে তখন শুধু দুজন হবেন। স্টেশনে শুধু তাঁরাই দুজন হবেন। আর সব জনতা।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন প্রিয়রঞ্জন। এবার সময় হয়েছে। আর পনের মিনিট। উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি প্লাটফর্মের টিকেট কাটলেন। ছুটলেন ভিতরে। আরো খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা। সেকেণ্ড যায় তো মিনিট যায় না। চোখের পাতা পড়ে তো, ঘড়ির কাঁটা নড়ে না। ঘড়ি কি বন্ধ? চাবি দিতে ভুলে গেছেন? চোখের বিশ্বাস নেই। তাড়াতাড়ি ঘড়িটা কানের কাছে তুলে ধরেন প্রিয়রঞ্জন। ঘড়ি ঠিকই চলছে। গাড়িও ঠিকই আসছে।

চলন্ত ট্রেন স্টেশনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। এবার যাত্রীদের চঞ্চল হবার পালা। কুলী কুলী শব্দে সবাই আকুল। নামবার জন্যে ব্যস্ততা। তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি। প্রিয়রঞ্জনও অস্থিরভাবে এগিয়ে গেলেন। সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাগুলি দেখলেন, কোনটিতে রীণা নেই। ফার্স্ট ক্লাস দেখলেন, থার্ড ক্লাস দেখলেন। রীণা কোথাও নেই। স্বর্গে নেই, পাতালে নেই, জীবনে নেই, ভুবনে নেই, রীণা কোথাও নেই। প্রত্যেক মেয়ের মুখের দিকে অভদ্রভাবে তাকিয়ে অনুসন্ধানী দুটি চোখ নিয়ে প্রিয়রঞ্জন রীণাকে খুজতে লাগলেন। কেউ কেউ রীণার বয়সী, কারো কারো মুখে রীণার আদল পর্যন্ত আসে। কিন্তু ওরা কেউ রীণা নয়। সে আসেনি। কেন আসেনি? রীণা তাকে ঠকাতে চেয়েছে বলেই আসেনি। রীণা তাকে চায় না বলেই আসেনি। বোম্বের মত জায়গায় এতদিনে নিশ্চয়ই আরো দু একজন বন্ধু রীণার দেহের সান্নিধ্য এবং মনের উত্তাপ পেয়ে চরিতার্থ হচ্ছে। তারা হয়তো বয়সে নবীন আর অগাধ অর্থবান। আজকাল অর্থই তো সামর্থ্য। সমস্ত গুণ আর যোগ্যতার প্রতীক। রীণা তাই আসেনি। সেইজন্যে ইদানীং তার চিঠিপত্রে এত শীতলতা অনুভব করেছেন প্রিয়রঞ্জন। হয়তো কারো সঙ্গে ঝগড়া করে ঝোঁকের মাথায় চিঠি দিয়েছিল আসবে, ঝগড়া মিটে যাওয়ার পর ঠিক করেছে আসবে না। আর তিনি তার একটি কথার ওপর নির্ভর করে এত কাণ্ড করলেন। এত বেশ এত ভূষণ, এত মিথ্যে এত ছলনা, আর এই কয়েক ঘন্টা ধরে নিমেষ গুণে গুণে অন্তহীন প্রতীক্ষা। কয়েক মুহূর্ত দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটল প্রিয়রঞ্জনের। তিনি যেন প্ল্যাটফর্মের ওপর নেই। তলায়, ট্রেনের তলায় চাপা পড়েছেন। আর এক বিরাট অতিকায় জন্তু তাঁর অস্থিমজ্জা পলে পলে চূর্ণ করে দিচ্ছে। সেই জন্তুর নাম প্যাসন, সেই যন্ত্রণার নাম বাসনা।

'আরে আপনি যে এখানে?'

প্রিয়রঞ্জন চমকে উঠলেন। কে আবার তাঁকে চিনে ফেলল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ট্রাউজার পরা সুদর্শন একটি ছেলে হাসি মুখে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ চেনা। কিন্তু নাম মনে পড়ল

না। কোথায় দেখেছেন কোথায় আলাপ হয়েছে তাও না। আজকাল এ রকম ভুল বড় বেশি হয়। তাঁকে লোকে চিনে ফেলে কিন্তু তিনি চিনতে পারেন না।

তিনি ধরা পড়ে যান কিন্তু তিনি ধরতে পারেন না! ছেলেটির লজ্জাবতী সঙ্গিনী একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই। হয়তো কাছাকাছি কোন স্টেশন থেকে উঠেছে।

কিছু একটা বলতে হয়। প্রিয়রঞ্জন তাই বললেন, 'তোমরা বুঝি এই ট্রেনেই এলে ?'

ছেলেটি বললে, 'হ্যাঁ। চলুন এবার এগোন যাক। আপনি কি কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন ?'

প্রিয়রঞ্জন হতাশভাবে বললেন, 'আর অপেক্ষা করে কী হবে।'

ছেলেটি গেটের দিকে এগোতে এগোতে সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কারো কি আসবার কথা ছিল ?'

প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'ছিল। লিখেছিল ফিফটিনথ নিশ্চয়ই এসে পৌঁছবে।'

প্রথমে বিস্মিত তারপরে স্মিতমুখে ছেলেটি তাঁর দিকে তাকাল, 'আপনার তাহলে ভুল হয়েছে। আজ চোদ্দ তারিখ। আগামী কাল ফিফটিনথ।'

প্রিয়রঞ্জন সেই আধচেনা নাম-পরিচয় ভুলে যাওয়া যুবকের আরো কাছে এগিয়ে এসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ঠিক বলছ ? কাল ফিফটিনথ, আজ নয় ?'

যুবক হেসে ফের সেই আশ্বাস দিল। প্রিয়রঞ্জন নিঃশব্দে ওদের পিছনে পিছনে এগোতে লাগলেন। তাহলে এই কাণ্ড হয়েছে ! তারিখ ভুল করেছেন তিনি। নিশ্চয়ই রণ্টুর কীর্তি। তাঁর টেবিলের বই-পত্র সেই ঘাটাঘাটি করে, ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলায়. সেই অনর্থক একটি দিন তার জন্যে এগিয়ে এনে দিয়েছে। তিনি ভুলটা ধরতে পারেননি। আশ্চর্য, কাল অ্যাটেনডেনস খাতায় তারিখ বসান খাতায় সই করছেন, তবু ভুলটা ধরা পড়েনি। শুধু রণ্টুই তো না, তাঁর গরজই কালকে আজ করেছে। গরজ যেমন দিনকে রাত করে।

কাল পনের তারিখ। পূর্ব প্রতিশ্রুতি নিয়ে আগামী কাল ফের আসছে। সে আসছে ! কিন্তু প্রিয়রঞ্জন নিজের মনে কোন ভরসা পেলেন না। সেই ফের অফিস কামাই করে ছলনা বঞ্চনার দীর্ঘ উদ্যোগপর্ব শেষ করে কাল কি আবার এসে তিনি এই যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে পারবেন ? যুদ্ধক্ষেত্র বইকি। সেই প্রতিনিমেষে আশার সঙ্গে হতাশার, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের, বাসনার সঙ্গে অনুশোচনার, নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম। এই রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে আবার কালই কি তিনি এখানে এসে পৌঁছতে পারবেন ? আজ তারিখ ভুল হয়েছে কাল আরো কত ভুল হতে পারে, অভাবিত কত বাধা, কত বিপত্তি এসে দুই পায়ে শিকল পরাতে পারে। এসব এড়িয়ে সব ছাড়িয়ে তাঁর পক্ষে ফের কি এখানে আসা সম্ভব হবে ?

গেটের কালপুরুষের হাতে বাকি আধ-খানা ছেঁড়া টিকিট সঁপে দিয়ে প্রিয়রঞ্জন আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন।

ফাল্গুন ১৩৬৬

অভিসার

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছন্দা চুলের বিনুনি করছিল, সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হল। পাশের খাটে ছোটবোন সীমা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। জ্বরে ভুগছে ক'দিন ধরে। ঝি আজ কাজে আসেনি। মা তাই নিয়ে গজগজ করছে আর বিকেলের কাজ সারছে। ছন্দা অনেকগুলি বাসন মেজে দিয়ে এসেছে, উনুনে আঁচ দিয়ে এসেছে, তবু মার বিরক্তির শেষ নেই। বাবা বাইরের ঘরে বসে জ্যোতিষ-চর্চা করছেন। এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁর মেয়ের ঠিকুজী করতে দিয়ে গেছেন। তাই নিয়ে মগ্ন। সদর দরজা কেউ ভেঙে ফেললেও তিনি আর উঠবেন না।

কিন্তু তিনি না উঠলেও, কিংবা সঙ্গে সঙ্গে আর কেউ গিয়ে দরজা খুলে না দিলেও, যে এসেছে সে ফিরে যাবে না। ছন্দা মুখ টিপে হাসল। আয়নায় সেই অতি-পরিচিত স্মিত মুখখানির দিকে

একটু তাকাল, তার এই সুগৌর সুডৌল মুখখানিকে সবাই সুন্দর বলে। মিথ্যা বলে না।—দরজার কড়াটা নড়েই চলেছে। এই কম্পনে দরজাও ভাঙবে না, কড়াও ভাঙবে না, সম্পর্কও টোল খাবে না—শুধু একটি প্রত্যাশা-মধুর অধীর অসহিষ্ণু শব্দ হতে থাকবে।

কিন্তু বাইরের ঘরে বাবা অস্থির হয়ে উঠেছেন, 'আঃ, দোরটা যে এদিকে ভেঙে ফেলল! কী করছিস খুকি, খুলে দে-না।'

'যাই।'

একই সঙ্গে বাবাকে আর আগন্তুককে সাড়া দিল ছন্দা। কণ্ঠস্বরে আশ্বাস দিল। তারপর চুল-বাঁধা অসম্পূর্ণ রেখেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু খুলে দিয়ে যার মুখ সে দেখল তাকে সে আশা করেনি। সরিৎ নয়, সুধাংশুদা। পঁচিশ বছরের সুদর্শন যুবক নয়, পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়। কবি নয়, ক্যানভাসার। বিদেশী বুক-কোম্পানির এজেন্ট। ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়,—পরিচিত হিতৈষী, আর ইদানীং ছন্দার একটি বেশি রকমের ন্যাওটা।

কিন্তু যত হতাশই হোক ছন্দা, অতিথিকে অভ্যর্থনা করতেই হল। মুখে হাসি টেনে ছন্দা বলল, 'আসুন, সুধাংশুদা।'

সুধাংশুর হাতে বড় একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ। পরনে ধূসর রঙের ট্রাউজার, গায়ে ছিটের শার্ট। মাথার চুল ব্যাক-ব্রাশ করা। ভিতর থেকে মাঝে মাঝে রুপালি রেখা ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

সুধাংশু হেসে বলল, 'এই যে ছন্দা, ভালো আছ তো?'

ছন্দা বলল, 'আছি। আসুন—'

বাইরেব ঘরখানায় জানলার ধারে একটি তক্তপোশ পেতে ছন্দার বাবা বসে আছেন। ঠিক চুপচাপ বসে নেই। বসে বসে জ্যোতিষীর বই ঘেঁটে যত-রাজ্যের ঠিকুজী-কোষ্ঠী তৈরি করছেন।

ছন্দাদের ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি ফিরে তাকালেন; ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কে?'

'আমি সুধাংশু।'

সদানন্দ এবার চশমাটা প'রে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও, তুমি! বোসো বোসো। অনেকদিন পরে এলে।'

সুধাংশু তক্তপোশের ধারে চেয়ারখানায় বসে ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে হাসল, 'আমি তো গত সপ্তাহেও এসেছিলাম, মেসোমশাই।'

সদানন্দ বললেন, 'এসেছিলে? আসবে বৈকি! বোসো বোসো। খুকি, সুধাংশুকে চা-টা দে।'

ছন্দা বলল, 'দিচ্ছি। তুমি কিন্তু আর চা পাবে না, বাবা। তুমি একটু আগে চা খেয়েছ।'

সদানন্দ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা। তোর আর সর্দারি করতে হবে না, চা কর।'

ছন্দা হাসল। চা খেতে নিষেধ করলেই বাবার রাগ হয়। কিন্তু বুড়ো মানুষ। দু'বছর আগে সত্তর পেরিয়েছেন। এই বয়সে বেশি চা খাওয়া কি ভালো? তারপর আবার অর্শেও ভোগেন মাঝে মাঝে।

'সুধাংশুদা, আপনি বসুন। আমি চুলটা বেঁধে নিই। তারপর আপনাকে চা ক'রে দেবো।'

সুধাংশু বলল, 'তাহলে তৈরি হয়ে নাও, আমারও বড় তাড়া আছে।'

ছন্দা ঘরে ঢুকে দরজার একখানা পাট ভেজিয়ে দিল, নইলে সুধাংশুদা বার বার এদিকে তাকাবেন। ওঁর যত তাড়াই থাকুক, ছন্দা জানে সে ইচ্ছা করলে ওঁকে আধঘণ্টা একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা যতক্ষণ খুশি বসিয়ে রাখতে পারে, চা না দিয়ে। শুধু 'আসছি' ব'লে আশায় রেখে। সুধাংশুদাকে তো পারেই, সরিৎকেও পারে। সরিৎ সেদিন বলেছিল, 'ওঃ প্রসাধনের সাধনায় এত সময় লাগল! তুমি আমার অনেক কাজ নষ্ট করে ফেললে। তবে পুষিয়েও দিয়েছ।'

দুটি চোখের মুগ্ধতা দিয়ে সরিৎ তাকে অভিনন্দিত করেছিল। রোজই করে। এই প্রৌঢ়ের দুটি চোখও মুগ্ধ হয়।

চুলের বিনুনি শেষ করে চোখে সুর্মা পরতে লাগল ছন্দা। ছোট বোন সীমা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, সবই বোঝে। ছন্দা ওর কাছে কিছু লুকোয় না। ছোট বোনকে সে বন্ধু করে নিয়েছে। বেচারা জ্বরে

কষ্ট পাচ্ছে নইলে ওকে দিয়ে চা করানো যেত।

শুয়ে থেকে থেকে সীমা জিজ্ঞাসা করল, 'সরিৎদা এসেছে রে নাকি দিদি ?'

ছন্দা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'না, না। সরিৎদা এলে বুঝতে পারতিস্‌নে ? সুধাংশুদা।'

সীমা নিবে গিয়ে বলল, 'ও, সুধাংশুদা ! উনি আবার কেন এসেছেন রে দিদি।'

ছন্দা একটু হেসে মুখে গলায় ঘাড়ে পাউডারের পাফ্‌ বুলাতে লাগল। কেন এসেছেন, চার বছরের ছোট বোনকে তা বলা যায় না, যদি সে নিজে না বোঝে।

কে না বোঝে ! সবাই বোঝে সুধাংশুদা মাসে কেন দু-তিনবার করে এখানে আসেন। যে আত্মীয়তাটুকু ওঁদের সঙ্গে আছে তা অনেক দূরের, কিন্তু ঘন ঘন যাতায়াতে সুধাংশুদা দূরের সেই প্রায়-পরলোকগত সম্পর্ককে অনেক নিকটবর্তী করে এনেছেন। তিন বছর আগে এসেছিলেন অবশ্য কাজের জন্যই। যে বই-ব্যবসায়ীদের তিনি প্রতিনিধি, তাঁদের দোকানের একটা সচিত্র ক্যাটালগ তিনি বাবাকে বসে বসে দেখাচ্ছিলেন। বুক অব নলেজ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয়, সাধারণের বিজ্ঞান, শিশুদের ভূচিত্রাবলী—সব রকম বই-ই তাঁদের আছে। এই বই ছন্দার বাবা কিনলে তাঁর খুব উপকার হবে। ঘরের ছেলেমেয়েদেরও কাজে লাগবে। টাকাটা একসঙ্গে দিতে হবে না। মাসে মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করলেই চলবে। দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ—বইয়ের দাম অনুযায়ী কিস্তির হার। বাবা বলেছিলেন, 'ওসব বই রাখবার জায়গা কই আমার ঘরে। ভাড়া-বাড়িতে থাকি। এই তো দুটি মাত্র ঘর। এই দামী দামী বই কোথায় রাখি বলো তো ?'

সুধাংশুদা বলেছিলেন, 'আপনি ভাববেন না। বই আপনি নিন। রাখবার ব্যবস্থা আমিই করে দেব। সস্তায় বুক-কেস কিনে দেবো একটা।'

বাবা বলেছিলেন, 'এই বুড়োবয়সে অন্নের জন্যে দিন-রাত খাটতে হয়। বেরোবার শক্তি নেই। ঘরে বসেই কাজ করি। না করে করবো কি বলো ? ছেলে আছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভে। কোয়ার্টার পেয়েছে। বউ আর ছেলে নিয়ে থাকে। যা পায় নিজেরই লেগে যায়। আর এই গুষ্ঠী চালাতে হয় আমাকে। নিজেরই কর্মফল। বই পড়বার আমার সময় কই সুধাংশু।'

সুধাংশুদা বলেছিলেন, 'একি বলছেন মেসোমশাই ! জ্ঞানের তৃষ্ণার কি শেষ আছে ? যতদিন আয়ু, ততদিন বই আমাদের সঙ্গী। বইয়ের মতো বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই। ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হলে সে আলাদা হয়ে চলে যায়, বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে সে মুখ দেখা বন্ধ করে। কিন্তু বই আপনার চিরদিনের সুহৃদ।'

তেলের বিজ্ঞাপনের মতো এত যে বইয়ের বিজ্ঞাপন, একখানা বইও কি সুধাংশুদা পড়ে দেখেছেন ?

মাস-তিনেক হাঁটাহাঁটির পর শেষপর্যন্ত 'বুক অব নলেজ'-এর একটা সেট তাদের গছিয়েই দিলেন। ছন্দাও সুপারিশ করেছিল, 'অত ঘুরছেন, কিছু না নিলে ভালো দেখায় না। বুক-অব-নলেজের একটা সেট নিয়ে নাও, বাবা।'

সে বইয়ের দাম কবে শোধ হয়ে গেছে, তবু এ-বাড়িতে সুধাংশুদার যাতায়াত শেষ হয়নি। যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জানতে চায়, কোষ্ঠী-ঠিকুজীর বিচার করাতে চায়, ছেলেমেয়ের বিয়েতে রাজযোটকের সন্ধান চায়, সুধাংশুদা তাদের এখানে ধরে নিয়ে আসেন। আর বাবাও ভাগ্যজিজ্ঞাসুদের ভিতর থেকে বেছে দু-চারজনের সঙ্গে সুধাংশুদার আলাপ করিয়ে দেন। তাঁদের বাড়িতে আর অফিসে সুধাংশুদার হাঁটাহাঁটি শুরু হয়ে যায়।

বাবা আর সুধাংশুদা এখন বাণিজ্যের সুতোয় বাঁধা। কিন্তু ছন্দা জানে, আরো একটি সূক্ষ্ম সুতো আছে। তা সাদা নয়, সাতরঙা।

'কি রে, চা এখনো দিতে পারলিনে ? দিনরাত কেবল সাজের ঘটা। কোথায় বেরোবি যে এত সাজসজ্জা করছিস ?

বাবা রাগ করতে শুরু করেছেন।

'আহা, সাজুক সাজুক। এই তো বয়স। আপনার নিজের বাইশ-তেইশ বছর বয়সের কথা মনে করে দেখুন, মেসোমশাই।'

সদানন্দ বললেন, 'আমি এখন যা তখনো তাই ছিলাম। অত সাজগোজের ধার ধারতাম না।'

দুটি ভুরুর মাঝখানে সন্তর্পণে কুমকুমের টিপ পরতে পরতে, হাসি পেলেও জোর করে তা চেপে রাখল ছন্দা। হাত কেঁপে গেলে বিভ্রাট হবে। কথা শোনো বাবার! উনি এই বাহাত্তরে যা বাইশেও নাকি তাই ছিলেন। এখন ওঁর মাথায় টাক, মুখে দাঁত নেই, চামড়া কুঁচকে গেছে, তনুদেহ ধনুর মতো বাঁকানো, তখনো নাকি উনি তাই ছিলেন। তখনো ওঁর মনে সাজবার বাসনা ছিল না, দেখবার বাসনা ছিল না, দেখাবার বাসনা ছিল না—বললেই যেন মানুষ বিশ্বাস করবে! ছন্দার ঠোঁটের হাসি লিপষ্টিকের আভাসে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সীমা বলল, 'হাসছিস যে দিদি? সরিৎদা যে এখনো এলেন না! তাঁরও তো এই পাঁচটায় আসবার কথা ছিল।'

ছন্দা হেসে বলল, 'বাব্বা! তোর দেখি সে-কথা একেবারে মুখস্থ। মনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট-বুকে লাল কালি দিয়ে দিনক্ষণ লিখে রেখেছিলি নাকি? আসবে আসবে। সে তো চিরকালই লেট লতিফ।'

আজ শনিবার। দুটোতেই সরিতের মার্চেন্ট অফিস ছুটি হয়ে যায়। তবু সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেখেছে পাঁচটায়। এই তিন ঘণ্টায় আরো বাজোর জরুরী কাজ সে সারবে। ক্লার্ক থেকে সম্প্রতি অফিসার হয়েছে। মনিবকে কাজ দেখানো তো চাই। মনে মনে হাসল ছন্দা। অন্য কোথাও দেখা করতে সে রাজী ছিল। কিন্তু সরিৎই বলেছে তাকে তাদের বাঞ্ছারাম লেন থেকেই সে তুলে নেবে। মিশন রো থেকে এইটুকু পথ আসতে ক'মিনিটই বা লাগবে!

সরিৎ মুখুজ্জো এ-বাড়ির অপরিচিত নয়, তার বাবা-মার অমনোনীতও নয়।

বাবা হাঁক দিলেন, 'চা না দিস তো না দিলি। তুই আয় এবার, সুধাংশু এখন উঠবে।'

ছন্দা মনে মনে হাসল। কেউ কি আর ওকে জোর করে ধরে রেখেছে। সন্ধ্যা উৎরে রাত হবে, রাত শেষ হলে আবার ভোরের আলো ঝিকমিক করবে, তবু ছন্দা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত সুধাংশু ভট্‌চায তার চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারবে না, সে কথা ছন্দা ভালো করেই জানে।

শাড়িটা বদলে ব্রাসিয়ারটা আর একটু ঠিক করে নিয়ে ছন্দা এবার হাসিমুখে বেরোল।

'সুধাংশুদা আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল।'

সুধাংশু বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে।'

ছন্দা জানে এ কথা ওঁকে বলতেই হবে। শুধু কি মুখ! দুটি চোখও তো সেই কথাই বলছে। আজ সবুজ ধানীরঙের শাড়ি পড়েছে ছন্দা। সবুজ কেন, গায়ের রঙে নিজে সে গৌরী ব'লে নীল পীত লোহিত—গাঢ়—ফিকে যে কোনো বরণের আবরণই তাকে মানায়।

সুধাংশুর উলটোদিকের চেয়ারটায় ছন্দা এসে বসল। হেসে বলল, 'আপনার কোনো ক্ষতি না হলেই হল।'

ছন্দার মা-ই শেষ পর্যন্ত কয়েক কাপ চা নিয়ে এলেন। অনেক বাদ-বিতণ্ডার পরে মা-মেয়েতে এইটুকু বোঝাপড়া হয়েছে। ছন্দা যখন সাজসজ্জা কি বন্ধুদের সঙ্গে গানটান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তখন মা চা করবেন, আবার মা যখন পুজো-আহ্নিক কি বাবার সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, তখন ছন্দা তাঁর সব কাজ করে দেবে।

সুধাংশু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল, 'আপনি আবার কেন এত কষ্ট করে—'

মা গম্ভীর বিরস মুখে বললেন, 'কষ্ট আর কি, বাবা। এক কাপ চা ছাড়া তো আর কিছু দিতে পারিনে।'

এক কাপ করে চা মা প্রত্যেকের হাতেই দিয়েছেন। সবার দিকেই একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে শেষে সুধাংশুকেই বললেন, 'যাই বাবা, মেয়েকে আবার পথ্য দিতে হবে।'

'সীমার জ্বর খুব বেশি নাকি মাসীমা?' সুধাংশুর কথায় উদ্বেগ।

ছন্দা মনে মনে হাসল। সীমার জ্বর নিয়ে যেন কতই ওঁর মাথা-ব্যথা!

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'না না, বেশি নয়। শোনো যা বলছিলাম। দ্যাখো সুধাংশু, যারা বলে কিছুই মানিনে, তারা কিছু না জেনে বলে। গায়ের জোরে, রক্তের জোরে বলে। সেই জোর যখন

কমে তখন মানুষের যুক্তির জোর বাড়ে, সত্যিকারের বুদ্ধিসুদ্ধি দেখা দেয়। এই সত্তর বছরের জীবনে সদানন্দ চক্রবর্তী তো কম দেখল না। কত গোঁয়ার দেখেছে, নাস্তিক দেখেছে। কিন্তু বয়সের জোর কমে এলে শেষ পর্যন্ত সবাইকেই স্বীকার করতে হয়েছে, হ্যাঁ, একটা-কিছু আছে—আর এই জগৎটা আমাদের হাতের আমলকী নয়। আমরা অনেক-কিছুই জানতে পারিনে, দেখতে পারিনে। সেই অজ্ঞেয় দুর্বোধ্য কালের নাম অদৃষ্ট। তার কাছে সেই ভবিষ্যতের কাছে—'

ছন্দা বাবার বক্তৃতা শুনছিল আর মুখ টিপে-টিপে হাসছিল। যাকে লক্ষ্য করে বক্তৃতা সেই শ্রোতার একটি কান বাবার মুখের দিকে ফেরানো আছে। কিন্তু তাঁর চোখ-জোড়া অন্যদিকে। সেই চোখ-দুটি একবার নিজের হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার তাকাচ্ছে সামনের দিকে। সেখানে ঘড়ি নেই, আছে কাগজে-আঁকা রেখাসঙ্কুল বড় একখানি হাত। সময়-সঙ্কেত নয়, অদৃষ্টের সঙ্কেত। সময়কে মানুষ কব্জিতে বেঁধে নিয়ে চলে, আর অদৃষ্টকে বয়ে নিয়ে বেড়ায় হাতের তালুতে। যে সেই ভাষা জানে, সে জানে অদৃষ্টের গতিবিধি। কিন্তু সুধাংশুদা যে সেই হাত দেখছেন না তা ছন্দা জানে। হাতের বদলে প্রায় পটে-আঁকা একখানা মুখের দিকে, একজোড়া চোখের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। কিসের সঙ্কেত তিনি জানতে চাইছেন ? সময়ের ? অদৃষ্টের ? না জীবনের ? ভাবতে ভাবতে ছন্দা মুখ টিপে-টিপে হাসছিল। সুধাংশুদা কী বিপদেই না পড়েছেন ! কলের বাক্সে পড়ে ইঁদুর যেমন ছটফট করে, তিনিও তাই করছেন। এদিকে ঘুরছেন, ওদিকে ফিরছেন, বেরোবার পথ আর পাচ্ছেন না। ছন্দা বেশ বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে জ্যোতিষীর হাতের টর্চে অন্ধকার ভবিষ্যতের আনাচ-কানাচ খানাখন্দ আগে থেকে দেখে নেবার তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। অতীতকেও তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন, স্ত্রী-পুত্র ঘরসংসারের কথা ভুলে গেছেন, বর্তমানের কয়েকটি মুহূর্তে ছাড়া তিনি আর কোথাও নেই। সেই মুহূর্ত কয়েকটিকে তিনি এক দুর্লভ আনন্দে ভরে তুলতে চান। সুধাংশুদার পক্ষে যা দুর্লভ, কিন্তু ছন্দার পক্ষে তা দেওয়া কত সহজ। নিরিবিলিতে দুটো কথা, একটু হাসি—তাই ওঁর পক্ষে যথেষ্ট। অন্তত যথেষ্ট বলে মানতে সুধাংশুদা বাধ্য হয়েছেন। এ তো বনের বাঘ নয়, যৌবনের বাঘ নয়, খাঁচায়-পোরা বুড়ো বাঘ। তাকে ছন্দা যা দেবে সে তাই খাবে। মাংসের বদলে মাসকলাইয়ের বড়াও সে পরম উপাদেয় মনে করবে !

বাবা উত্তেজিত ভাবে বলে যাচ্ছেন, 'মানবে যে না, তোমার হাতে কতটুকু ক্ষমতা ? এই সংসারে তুমি কার প্রভু বলতে পার ? অফিসে তুমি তোমার মনিবের দাস, বাড়িতে তুমি তোমার গৃহিণীর বশংবদ। তুমি ভেবেছ তুমি স্বাধীন, তাই না ? তোমার চারিদিকে যে অদৃশ্য সুতো তোমার সঙ্গে গাঁথা আছে তুমি তা চোখে দেখতে পাওনা বলেই ও-কথা ভাবতে পার। সেই সুতো তোমাকে একবার এদিকে টানে আর একবার ওদিকে টানে, একবার পিছনে টানে আর একবার সামনে টানে। এর নাম কর্মসূত্র। শুধু এ-জন্মের নয়, সেই সুতো তোমার জন্মজন্মান্তরের সঙ্গে জড়ানো। তাই তুমি একমুহূর্তের জন্যেও স্বাধীন নও। বৃত্তির দাস, আর প্রবৃত্তির দাস।'

ছন্দা ভাবল, প্রবৃত্তির কথাটা তুলে বাবা কি সুধাংশুদাকে একটু খোঁচা দিলেন ? আর সেই খোঁচা খেয়েই কি তিনি উঠে দাঁড়ালেন ?

'ইস, পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। যাই মেসোমশাই, আমার আর সময় নেই।'

সদানন্দ বললেন, 'আরে, বোসো বোসো। একেবারে সাহেবদের মতো পোশাক, সাহেবদের মতো পাংচুয়ালিটি ! আরে, এককালে সাহেব আমিও সেজেছি। সাহেব সেজেছি, মোসাহেব সেজেছি। ইওরোপিয়ান ফার্মে কাজ করেছি, নেটিভ স্টেটে ম্যানেজারি করেছি। সব করে দেখেছি, বুঝলে ? এখন দেখছি নিজের ইচ্ছেয় কিছুই হয় না।'

সুধাংশু বলল, 'উঠি, মেসোমশাই। সত্যিই আমার কাজ আছে। সময়টা আমার তাহলে ভালোই যাচ্ছে, আপনি তখন বলছিলেন—'

সদানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ, বেশ ভালো সময়। অষ্টোত্তরিচন্দ্রের দশা যাচ্ছে। যদি বুঝে-শুনে চলতে পার—'

ছন্দা ভাবল, ভালো সময় বলতে বাবা কী বোঝাতে চান ? ছন্দাকে জড়িয়ে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ করছেন নাকি ? সবই তো বোঝেন।

সুধাংশু আর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ছন্দার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'যাবে নাকি ? গলির মোড় পর্যন্ত একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে ?'

ছন্দাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। মৃদু হেসে বলল, 'কিন্তু সুধাংশুদা, আমার যে কাজ আছে।'

মনে মনে ভাবল, সরিৎটা কী। পাঁচটার কথা বলে পৌনে ছ'টাতেও দেখা নেই। ও কি ছ'টায় আসবে ? ঘড়ি কি একঘণ্টা স্লো করে রেখেছে ? কবি হলে কি এমনই কাণ্ডজ্ঞান হারাতে হয় ?

সুধাংশু আবার অনুনয় করল, 'এসোই না। কী ভাবছ অত ? দু'মিনিটে আর কী হবে।'

ছন্দা বলল, 'আচ্ছা দাঁড়ান, আসছি।'

ভিতরের ঘরে গেল ছন্দা। বটুয়াকৃতি ছোট্ট ব্যাগটা তুলে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনে কোনো খুঁত আছে কিনা আর একবার দেখল। তারপর বিছানায় শোয়া সীমার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'সরিৎদা যদি এসে পড়ে, বলিস আমি ওই পার্কের সামনেই আছি। ওই পথ দিয়েই তো আসবে। আমি যদি দেখতে পাই তাহলে তো ডেকেই নেব। সোজা এখানে এলে পাঠিয়ে দিস, লক্ষ্মীটি। কেমন ? এখান থেকে বেরোতে গেলেই বাবা দেরি করিয়ে দেবেন। ওর সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে। সেটা হয়ে গেলে আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যেই ফিরে আসব। বুঝেছিস ?'

সীমা সেই জ্বরের তাপে শুকিয়ে-যাওয়া ঠোঁটে একটু হাসল, 'আজ তোরা কোথায় যাবি দিদি ?'

'আরে, না না। কোথাও যাব না। শিগগিরই চলে আসব। আগে সুধাংশুদাকে তো বিদায় করি। বাব্বা, সেই থেকে বসে আছে তো আছেই।'

সীমা বলল, 'অমন করিস কেন দিদি, সুধাংশুদা বছরের গোড়াতেই তোকে কী সুন্দর একখানা বিলিতি ডায়েরি দিয়েছেন।'

ছন্দা হেসে বলল, 'আচ্ছা, সেখানা তুই নিস। আমি তার একটা পাতাও লিখিনি।'

আর সময় না নিয়ে ছন্দা এবার বেরিয়ে পড়ল। পিছন থেকে মা বললেন, 'বেশি যেন দেরি করিস্‌নে বাপু। ঘরে রোগী, আমি একা সব সামলাতে পারব না।'

ছন্দা বলল, 'না, মা, দেরি হবে না।'

বাবা বললেন, 'এই শনির শেষে কোথায় চললি ?'

ছন্দা তাঁর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, 'ওই মোড় পর্যন্ত। এক্ষুনি আসছি।'

বাইরে আসতেই সুধাংশু অভিমানের সুরে বলল, 'তুমি আবার দেরি করলে।'

ছন্দা হেসে বলল, 'ওঁদেব বলে আসতে হলো।'

সুধাংশু বলল, 'তোমাকে তো আজকাল পাওয়াই যায় না। সেদিন এসে শুনলাম কোথায় বেরিয়ে গেছ।'

ছন্দা বলল, 'আপনার না হয় বাঁধা কাজ আছে। আমাকে তো চাকরির জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়।'

সুধাংশু হেসে বলল, 'সাধ করে যদি ঘোরো, কে কি করবে ? তোমার তো ঘুরবার কথা নয়, ঘোরাবার কথা। আসবে আমাদের ফার্মে ? হবে আমাদের রিপ্রেজেনটেটিভ ?'

ছন্দা বলল, 'ওরে বাবা ! আমি অমন বই বগলে করে ঘুরে বেড়াতে পারব না। স্কুল-কলেজে যা ঘুরেছি— ঘুরেছি। তা ছাড়া আপনার কাজে ভাগ বসালে আপনার সঙ্গে রেষারেষি হবে। তাতে লাভ কি ?'

সুধাংশু বলল, 'বিরাট ফিল্ড। রেষারেষির কী আছে। আমি তোমাকে হেল্‌প করব। আমার কিছু কিছু পার্টিও না হয় তোমাকে—'

গলির মোড়ে পৌঁছতে তখনো খানিকটা পথ বাকি। কিন্তু অবাক কাণ্ড। ছন্দাকে ফেলে হঠাৎ সুধাংশু ছুটতে লাগল। ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে—'ট্যাক্‌সি, ট্যাক্‌সি, এই ট্যাক্‌সি—'

এই বিকেলবেলায় খালি-ট্যাক্‌সি তরুণী নারীর চেয়েও কি ওর কাছে দুর্লভ ?

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে এনেছে। সুধাংশু আর একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'ইস্‌, পাঁচটা পঞ্চান্ন। বড্ড দেরি হয়ে গেল, ছন্দা। আমি চলি।'

ছন্দা অবাক হয়ে বলল, 'কিসের দেরি ? এত তাড়া কিসের আপনার ?'

সুধাংশু দরজা খুলে ট্যাক্সির ভিতরে গিয়ে বসতে বসতে বলল, 'আর বোলো না। পার্ক-স্ট্রীটের এক বুড়ো ব্যারিস্টারকে পাকড়াও করেছি। আজ ছ'টা থেকে স'ছটার মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বুড়ো কি কম ঘুরিয়েছে ? আমাদের ওয়ার্ল্ডস গ্রেট থিঙ্কার্স সিরিজের একটা সেট নেবে। কতদিন ধরে ঘোরাচ্ছে। আজ কনট্রাক্ট-ফর্মে সই করবার কথা। চলি। সাহেবী মেজাজ। এক মিনিট দেরি হলেই হয়তো অন্য কোথাও সরে পড়বে। কি অছিলা পেয়ে বলবে আজ হবে না। চলি, ছন্দা। ড্রাইভার, জলদি জলদি। হ্যাঁ, ওয়েলেসলি দিয়ে বেরিয়ে যাও।'

মুহূর্তের মধ্যে সুধাংশুকে নিয়ে ট্যাক্সিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছন্দা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে ভাবল, 'কী মানুষ ! মাত্র এইটুকু সময় হাতে নিয়ে উনি রসালাপ করতে এসেছেন ! যাক্, ভালোই হল। কতক্ষণ জ্বালাতেন তার ঠিক নেই। হাড়-কেপ্পন মানুষ। হয়তো একটা বাজে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে যেতেন চা খাওয়াতে। তারপর সামনে নিয়ে বসে বক বক করতেন। কতবার এমন করেছেন। তার চেয়ে আজ যে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়েছেন তার জন্যে ছন্দা ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ, ওঁর ব্যারিস্টারসাহেবের কাছেও কৃতজ্ঞ।

এখন সরিৎ এসে পড়লেই হয়।

ছন্দা আর পার্ক পর্যন্ত এগোল না। গলি আর বড়-রাস্তার মোড়েই দাঁড়াল। বাস্ ট্রাম ট্যাক্সি—সরিৎ যে ক'রেই আসুক এই পথ দিয়েই যাবে। ছন্দা এখানেই আটকাতে পারবে তাকে। বাড়িতে ঢুকবার আর দরকার হবে না। পথই ভালো ; 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি'। কিন্তু একেবারে বন্ধনহীন নয়। সৌখ্যের বন্ধন সৌহৃদ্যের বন্ধন। যার মধ্যে মুক্তির স্বাদ সেই মধুর বন্ধন। কিন্তু আশ্চর্য, এত লেট করছে কেন সরিৎ ! ওর কি সময়-বোধ একেবারেই নেই ?

পাড়ার চেনা আর অচেনা ছেলেগুলি তাঁর দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। এখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ানো চলবে না। ছন্দা কয়েক পা এগিয়ে একেবারে পার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আশ্চর্য, সরিৎ এখনও আসেনি। হল কী তার ! এতক্ষণ নিশ্চয়ই অফিসে বসে নেই। কোথায় বেরিয়েছে কে জানে। কোথায় গিয়ে আবার কোন ফাঁদে পড়েছে। অল্পবয়সে ভালো চাকরি করে, দেখতে সুপুরুষ। ভালো কথা বলে, ভালো কবিতা লেখে। কলকাতা শহরে তার জন্যে ফাঁদের অভাব নেই।

ছন্দা অধীর হয়ে উঠল।

পুরো একটি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে, পায়চারি করে হঠাৎ ছন্দার মনে হল সরিৎ হয়তো বাড়িতে গিয়েই ব'সে আছে। পাওয়া মাত্র বাবা তাকে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়ে জাপটে ধরেছেন। কিছুতেই আর ছেড়ে দেননি।

দ্রুতপায়ে পথটুকু পার হয়ে ছন্দা বাড়িতে এসে ঢুকল।

না, ঘর শূন্য। দুটি চেয়ারই শূন্য। কেউ তার জন্যে ব'সে নেই। শুধু বাবা তক্তপোশের ওপর ধনুকের মতো বেঁকে, আলোটা সামনে টেনে এনে পরের মেয়ের ঠিকুজী দেখে তার বিয়ের যোটক মেলাচ্ছেন।

তক্তপোশ ভ'রে ছড়ানো জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথি, পুরোন পঞ্জিকা, আর হলুদ-রঙের গুটোনো গুটোনো ভাগ্য-জিজ্ঞাসু নারী-পুরুষের কোষ্ঠী। এই নিস্তব্ধ নির্জন ছোট্ট ঘরে আধা-আলো আধা-অন্ধকারে নিজের বুড়ো বিরূপদর্শন বাপকে অশুভজনক আতঙ্ককর নিষ্ঠুর রহস্যময় অদৃষ্টপুরুষ বলে মনে হ'তে লাগল ছন্দার।

পায়ের সাড়া পেয়ে তিনি ফিরে তাকালেন, তারপর রুক্ষ গলায় ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এত দেরি করলি যে ? এই আসি ব'লে সেই কখন বেরিয়েছিস !'

ছন্দা এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটু ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'কী করব বলো। সুধাংশুদা সহজে ছাড়লেন কই। তাঁর কথা কি আর ফুরোতে চায় !'

সদানন্দ বললেন, 'হুঁ। যত সব—'

তারপর ফের ঘাড় গুঁজে ঠিকুজীর দিকে মন দিলেন।

ছন্দা আর দেরি না করে ভিতরে চলে গেল।

সীমা শুয়ে শুয়ে ককাচ্ছে।

ছন্দা জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, জ্বর বেড়েছে নাকি ?'

সীমা বলল, 'কী জানি। মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

ছন্দা বলল, 'দাঁড়া, আসছি আমি।'

দামী শাড়ি পাল্‌টে, আটপৌরে আধময়লা পাড়ের দিকটা-ছেঁড়া শাড়িখানা ফের পরল ছন্দা। তারপর ছোটবোনের শিয়রের কাছে এসে বসল। আস্তে আস্তে তার চুলে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ওষুধ পথ্য খাওয়ানো হয়েছে কিনা একবার জিজ্ঞাসা করে নিল মাকে।

তিনি বললেন, 'সবই করেছি বাপু। ফেলে রাখব কার ভরসায় !'

মা ঘর থেকে চলে গেলে সীমা ফিসফিস করে সেই জ্বরের ঘোরেও জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে তো আসেননি। পথে দেখা হয়েছিল দিদি ?'

ছন্দা ক্লান্ত কিন্তু কোমল গলায় বলল, 'না, সীমা, কিচ্ছু হয়নি। তুই এবার ঘুমো।'

বাবা গুনছেন, আঁক কষছেন, যোটক মেলাচ্ছেন। অনেক রাত পর্যন্ত ও-ই করবেন। ছন্দা এইমাত্র যে-কথাটা ব'লে এল, তার সত্যাসত্য কি ওই মহাজ্যোতিষী গুনে ঠিক করতে পারবেন ?

ছন্দা জানে, তা পারবেন না।

সব কথা গুনে বলা যায় না। বললেও, মেলে না। গুনবার ইচ্ছাই হয় না।

সুধাংশুদা ফের এলে বাবা হয়ত কথায় কথায় আজকের দেরির কথাটা তাঁর কাছে তুলতে পারেন। কিন্তু তার আগেই সুধাংশুদাকে ছন্দা সাবধান করে দেবে। তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ছন্দার সঙ্গে একটি সন্ধ্যা তিনি সত্যিই কাটিয়ে গেছেন। এই মিথ্যা বলার মধুর দায়িত্ব তিনি পরম আনন্দে বহন করবেন। ছন্দা সুধাংশুদাকে জানে।

কিন্তু সরিৎকে ভালো করে জানে না। এই মুহূর্তে সে কী করছে, সত্যিই কোনো দরকারী কাজ করছে, না আর কোনো মেয়েকে নিয়ে হাসিগল্পে সময় কাটাচ্ছে তা জানবার উপায় নেই। কাল জানতে পারবে। সরিতের সঙ্গে দেখা হ'লে তার না-আসবার কারণটা জানতে পারবে ছন্দা। কিন্তু তার মধ্যে কতটুকু সত্য কতখানি মিথ্যা থাকবে, তা বুঝতে পারবে না। দরকার-মতো মিথ্যার শরণ সংসারে শুধু তো ছন্দাই নেয় না।

কালকের কথা কাল। আজ এই মুহূর্তে সব কথা যে জানতে ইচ্ছা করছে ছন্দার। না জেনে সে স্বস্তি পাচ্ছে না। এক অসহ্য যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছে।

অথচ ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী তো ও-ঘরেই বসে আছেন। ঘুমন্ত বোনকে রেখে পা টিপে-টিপে ছন্দা আবার বাইরের ঘরে এল।

বাবার মাথাটা সামনের দিকে আরো ঝুঁকে পড়েছে। তিনি কি জ্যোতিষ-বারিধিতে মগ্ন হয়ে আছেন, না-কি সারাদিনের খাটুনির পর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ছন্দার কেমন মায়া হল। সংসারের জন্যে এই বয়সেও বড় খাটতে হয় বাবাকে, বড় পরিশ্রম করতে হয়। ওঁর সব গণনা মেলে না, সব বিচার নির্ভুল হয় না, অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই নিষ্ফল হয়। তাই নিয়ে পার্টির কাছে কম কথা শুনতে হয় না, হাসি-টিটকিরি কম সহ্য করতে হয় না। কিন্তু কী ক'রে উনি সব বলতে পারবেন ? জ্যোতিষীও তো মানুষ। তিনি কী ক'রে সব বলবেন ? সব জানবেন ?

সব কথা জানা যায় না।

জানা তো দূরের কথা, সব কথা জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

ভাদ্র ১৩৬৭

কুশাঙ্কুর

দুই প্রৌঢ় বন্ধু সুখ দুঃখের গল্প করছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। অন্দরের দরজায় নীল রঙের পুরু পর্দা ঝুলছিল। বাইরের দরজাতেও অমরেশ সেন খিল তুলে দিয়ে এসেছিলেন। রেডিওতে একটু আগে যে রাগ সঙ্গীতের রেকর্ড বাজছিল তাও তিনি উঠে গিয়ে বন্ধ করে এলেন। অতিথি সতীকান্ত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, 'ওকি করছ। ভিতর থেকে কেউ হয়তো শুনছিলেন— ।' অমরেশ বললেন, 'আরে না না। অনেক সময় কেউ না শুনলেও ওটা বাজে। দোকানের রেডিওর মত ওটা সহজে বন্ধ হতে চায় না।'

গালে কপালে কয়েকটি কুঞ্চিত রেখায়, গলার স্বরে অমরেশের বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল। সতীকান্ত বন্ধুর এই রূঢ়তাটুকু লক্ষ্য করলেন। ভাবলেন এই বোধ হয় প্রৌঢ় বয়সের ধর্ম। কথায় বার্তায় চালচলনে সহজেই অসহিষ্ণুতা বেরিয়ে পড়ে। নিজের অজ্ঞাতে শরীরে মনে কর্কশতা এসে স্থায়ী আসন পাতলে মাথার চুল কটা হয়, দাড়ি কড়া হয়, পাক ধরে আর হৃদয়ও শক্ত হয়ে ওঠে। অমনিতে অমরেশ সেন ভালোই আছেন। ওকালতিতে পসার বেড়েছে। চেহারায় স্বাস্থ্য আর স্বচ্ছলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। পঞ্চাশ পার হয়ে গেলেও তা ধরবার জো নেই। কিন্তু চালচলনে ধরা পড়ে যৌবন বিগত। সেই কলেজ আমলের বন্ধুকে উত্তীর্ণ পঞ্চাশ প্রৌঢ়ের মধ্যে দেখতে পাওযার আশা করাই বৃথা। বরং বন্ধুর মুখে ইচ্ছা করলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পারেন সতীকান্ত সান্যাল। অমরেশের সমবয়সী হলেও মাথা জোড়া টাকের জন্যে তাঁকে আরও বয়স্ক দেখায়। তাঁর চেহারায় রুক্ষতা জীর্ণতার ছাপ বরং বেশি করেই পড়েছে। পড়া স্বাভাবিক। অমরেশের মত তাঁর আর্থিক সাফল্য হয়নি। বীমা অফিসের কেরানী। কিছুকাল আগে প্রমোশনের ফলে অফিসারের মর্যাদা জুটেছে। এদিকে অবসর নেওয়ার সময়ও তো হয়ে এল।

সতীকান্ত কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন নীল পর্দা একটু সরিয়ে একখানি কোমল কচি মুখ উঁকি দিয়েছে।

তিনি কিছু বলবার আগেই অমরেশ তাকে কাছে ডাকলেন, 'কে ? ঝণ্টু মহারাজ ? এসো এসো। আরে লজ্জা কি এসোই না।"

তাঁর গলার স্বরে শুধু অভয় নয় রীতিমত প্রশ্রয় ফুটে উঠল।

সতীকান্ত দেখলেন ছেলেটি এবার তাঁর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে অমরেশের কাছে গিয়ে তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। আট ন' বছর হবে বয়স। গায়ের রঙ ফুটফুটে ফরসা। পরণে নীল রঙের হাফ প্যাণ্ট, গায়ে সবুজ জাম্পার। মাথায় তামাটে চুল কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। ছেলেটি অমরেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন ফিসফিস করে বলল।

অমরেশ অক্ষমতার ভান করে বললেন, 'অত পারব না। গরীব মানুষ। ট্যাক্সটা একটু কমটম করে ধার্য কর ঝণ্টু। আচ্ছা আচ্ছা। আর মুখ ভার করতে হবে না। দিচ্ছি।"

পকেট থেকে একখানি সিকি বার করে অমরেশ ওর হাতে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওকে যেতে দিলেন না। ঝণ্টুর কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর কোমল গালে গাল ঘষতে লাগলেন। সতীকান্তের মনে হল স্নেহের তীব্রতায় দাঁতেও দাঁত ঘষলেন। কয়েক হাত দূরে উল্টো দিকের চেয়ারে বসে তিনি তাঁর বন্ধুর কাণ্ড দেখতে লাগলেন। এই মুহূর্তে বাৎসল্যের বন্যায় একেবারে ভেঙে গেছেন অমরেশ। তাঁর সমবয়সী আর একজন পুরুষ যে এ ঘরে উপস্থিত রয়েছেন সে কথা তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। সতীকান্ত লক্ষ্য করলেন অমরেশের রেখাসঙ্কুল প্রৌঢ় মুখের কাঠিন্য আর নেই, তার বদলে এক স্নেহকোমল আর্দ্রতা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্য লোকের চোখে এই একান্ত ব্যক্তিগত স্নেহের মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ যে একটু বিসদৃশ লাগতে পারে সে খেয়াল পর্যন্ত নেই অমরেশের।

তাঁর আদর কতক্ষণ চলত বলা যায় না, কিন্তু ছেলেটিই নিমেষের মধ্যে বিব্রত আর পীড়িত হয়ে উঠল। "উঃ জ্যেঠামুনি, ছাড়ো ছাড়ো। তোমার দাড়ি কী কড়া। আমার গাল জ্বলে গেল।"

অপ্রতিভ অমরেশ তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেটি যেন একই সঙ্গে স্নেহের বন্ধন মুক্তির আনন্দ অনুভব করে দুই পৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল। তারপর ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার অমরেশের লজ্জিত হবার পালা। তিনি হঠাৎ কী বলবেন ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

সতীকান্ত বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "কে ওটি!" অমরেশ বললেন, "আমার ভাইপো। বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে।"

সতীকান্ত বললেন, "তাই বুঝি সবচেয়ে আদরের। ও তোমার খুব বাধ্য দেখছি।"

অমরেশ বললেন, "আসলে আমিই খুব বাধ্য।"

তারপর অস্বস্তিটুকু কাটাবার জন্যে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও ধরাও। আসলে আমিই বাধ্য। আমিই আবদ্ধ। দেখ স্নেহ ভালবাসার যারা শুধু প্যাসিভ অবজেক্ট তারাই সুখী। যে অ্যাকটিভ পার্টনার তারই দুঃখের শেষ নেই।"

সতীকান্ত কোন মন্তব্য না করে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন।

অমরেশ বললেন, "ও আমাকে আরো ছোটবেলা থেকে জ্যেঠামুনি বলে ডাকে। আসল কথাটা মনি। আর সবাই ওর এই উচ্চারণের ভুলটা শুধরে দেয়। কিন্তু আমি শোধরাতে চাইনে। ওর মুখের ওই মুনি কথাটুকুই আমার দুই কানে অমৃত ঢেলে দেয়। আসলে আমরা কেউ মুনি ঋষি নই। কিন্তু কেউ বললে বড় ভালো লাগে, কেউ উপাধি দিলে বড় ভালো লাগে। আমরা যা নই তাই হতে ভালোবাসি। কে জানে কোন কোন মুহূর্তে কি মুহূর্তেরও এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশে তা হয়েও যাই।"

সতীকান্ত এবারও কোন মন্তব্য করলেন না। শুধু বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাঁর দেওয়া সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু উত্তরের প্রয়োজন নেই, মন্তব্যেরও দরকার নেই— নিজের ঝোঁকেই অমরেশ বলে যেতে লাগলেন, "একদিন হয়তো ওর এই উচ্চারণের ভুল ও শুধরে নেবে। ও যত বড় হবে, নিজেকে তত দূরে সরিয়ে নেবে। যেমন আমার ছেলেমেয়েরা নিয়েছে। তারা এখন ঢের বড় হয়ে গেছে। তাদের আমি আর কাছে পাইনে। হাতের কাছে নয়, বুকের কাছে নয়, মনে হয় মনের কাছেও না।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটু হাসলেন অমরেশ, "এ ব্যাপারে আমার একটা থিয়োরী আছে জানো?"

সতীকান্ত এবার একটু কৌতূহল দেখিয়ে বললেন, "কী থিয়োরী?"

অমরেশ বললেন, "স্নেহই বলো, ভালোবাসাই বলো দেহ ছাড়া কিছুই টেঁকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই দেহের স্বাদ আমরা পাই, দেহের স্বাদ আমরা নিই। দৃষ্টিতে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, বচনে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে কিসে পাই জানো? ত্বকে। স্পর্শন, আলিঙ্গন, চুম্বন সব এই ত্বকের কাজ। ভাই বলো, বন্ধু বলো, ছেলে বলো বেশি বয়সে এসে তারা আমাদের এই ত্বককে আর স্পর্শ করে না। এক বিজয়ার দিন ছাড়া বয়স্ক আত্মীয় বন্ধু আত্মজ—কাকেই বা আমি আমার আলিঙ্গনের মধ্যে পাই? পেতে লজ্জা পাই, তারাও লজ্জা পায়। কিন্তু যদি এই লজ্জা বোধ না থাকত, যদি সংস্কারের বাধা না থাকত তবে হয়তো আমি তাদের বেশি করে পেতাম, বেশি করে দিতে পারতাম। বেশি বয়সে আমাদের আবেগ যে শুকিয়ে আসে তার কারণ আমরা ত্বকের ব্যবহার ভুলে যাই, ত্বকের ব্যবহারে লজ্জা পাই।"

সতীকান্ত একবার সামনের দিকে তাকালেন। কাঁচের আলমারিগুলিতে বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে লেগেছে। সোনার জলে নাম লেখা বাঁধানো আইনের বইগুলি তার মধ্যে ঝকঝক করছে। এই আইনজীবী শক্ত কাঠখোট্টা বিষয়ী বন্ধুর মুখে বহুকাল তিনি এমন আবেগ উষ্ণ কথা শুনতে পাননি, এমন অকপট স্বীকৃতি শোনেননি, এমন অন্তরঙ্গতা অনুভব করেননি। যে বন্ধুত্ব ক্ষীণ হতে হতে সাধারণ সৌজন্য আর মামুলী পরিচয়ের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল সেই হৃত সৌহৃদ্যকে তিনি যেন নতুন করে ফিরে পেলেন। এই শীতের অপরাহ্ণে কিসের এক প্রবল প্রচণ্ড উত্তাপ বরফ গলাতে

লাগল। হৃদয়ের আগল খুলে দিয়ে সতীকান্ত বলতে লাগলেন, "তোমার পরম সৌভাগ্য অমরেশ, তোমার ছেলেমেয়েরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়েছে, আর বড় হয়ে দূরে সরে যেতে পেরেছে। তোমার স্নেহের আলিঙ্গনে তারা বদ্ধ থাকেনি এ তোমাব পরম সৌভাগ্য। আমার দুঃখ দুর্ভোগ তোমাকে ভোগ করতে হয়নি। বয়স হলেও বড় না হবার যে কী বিড়ম্বনা—।"

অমরেশ বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা তোমার ছেলেটি কেমন আছে সতী? গোড়ার দিকে একটু অ্যাবনর্মালিটি ছিল। এখন ভালো হয়ে গেছে বলেই তো শুনেছি। কে যেন বলছিল তোমার ছেলে আজকাল—।"

সতীকান্ত বললেন, "হ্যাঁ, অনেকের কাছেই আমি তাই বলি। বলি ভালো হয়ে গেছে। নিজের লজ্জা আর দুঃখের কথা অন্যকে মিছামিছি জানিয়ে লাভ কি বলো।"

অমরেশ একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "আমাকেও তো তুমি কিছু জানাওনি। যখনই কিছু জিজ্ঞেস করেছি তুমি এড়িয়ে গেছ। আমি আর জোর করিনি। তুমি যখন বলতে চাও না, তুমি যখন চেপে যেতেই চাও—"

সতীকান্ত বললেন, "যে দুঃখের কোন প্রতিকার নেই অমরেশ তার কথা বেশি বলে কী হবে। আজ বলছি শোন। আজ সেই পুরোন দুঃখের সঙ্গে নতুন এক দুর্ভোগ এসে জুটেছে। কিন্তু পুরোন কথাই আগে বলি।— তুমি তো সব জানো না। অবশ্য আমি যে তোমার তুলনায় একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলাম তা তুমি জানো। আগে থেকে আমাদের জানাশোনাও হয়েছিল; প্রথম তিন বছরের মধ্যে আমাদের কোন ছেলেপুলে হয়নি। আমি আমার স্ত্রীকে বলতাম, 'ধরো যদি আমাদের ছেলেপুলে কিছু নাই হয়।'

অসীমা বলত, 'বেশ হবে। আমরা যা খুসি তাই করব, যেখানে খুসি যাব, হাতে পায়ের কোন বন্ধন থাকবে না।'

কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর ওর শরীরেই শুধু পরিবর্তন এল না হাব-ভাব ধরন-ধারণ সবই বদলে গেল। তখন বুঝতে পারলাম এর আগে ও যা সব বলত তা শুধু মুখেরই কথা। ও যেন শুধু এরই প্রতীক্ষা করছিল, সন্তান ছাড়া ওর আর যেন কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। আমরা তখন গড়পারের একটা বাড়িতে থাকি। বাড়ি বলতে হবে বলেই তাকে বাড়ি বললাম। শুধু পুরোন নয় একেবারে জরাজীর্ণ। কোন শ্রীছাঁদও ছিল না। আমাদের একতলার দু'খানি ঘরে ভালো করে আলো বাতাস ঢুকত না। অসীমা যখন এ বাড়িতে প্রথম আসে সে কোন আপত্তি করেনি। সে আমার ক্ষমতার কথা জানে। সে আমার শক্তির সামান্যতাকেই স্বীকার করে নিয়েই স্বয়ম্বরা হয়েছে। অসীমা বলেছিল, 'এই আমার ঢের। এই আমার রাজপ্রাসাদ।'

রাজপ্রাসাদ না হোক মাথা গুঁজবার একটা আস্তানা তো মিলেছে। এতদিন আমরা দেখা করেছি পার্কে রেস্টুরেন্টে ইডেন গার্ডেনে গঙ্গার ধারে। আমাদের স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না। আমি থাকতাম একটা সস্তা মেসে। আর ও থাকত ওর দূর সম্পর্কের মামা বাড়িতে। তের চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই সেই আশ্রয় ছাড়বার জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

আমাদের ভাঙা ঘরকেই অসীমা মনের মত করে সাজিয়েছিল। ওর ধরনধারণ দেখে মনে হয়েছিল এই বাসা যেন আমাদের অল্পদিনের ভাড়াটে বাসা নয়, এখানে আমরা যেন সারা জীবনের মত বসবাস করবার জন্যেই এসেছি। কিন্তু এখন থেকে ও অন্য সুর ধরল। কেবলই বলতে লাগল, 'বাসাটা কিন্তু এবার তোমায় বদলাতে হবে।' আমি হেসে বলতাম, 'কেন তোমার রাজ অতিথির বুঝি এ প্রাসাদ পছন্দ হবে না?'

অসীমা লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে বলত, 'আহা।'

তারপর মুখ তুলে বলত, 'হবেই তো না। এই স্যাঁৎসেতে ঘর, আলো নেই বাতাস নেই। এখানে সে এসে কেন থাকবে শুনি।'

আমি বলতাম, 'তাই তো। দেখি চৌরঙ্গীতে তার জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে পারি কিনা।'

অ্যাডভানসড স্টেজে এসে অসীমার শরীরটা খারাপ যেতে লাগল। প্রায়ই শুয়ে থাকে, মাথা তুলতে পারে না। পেটে যন্ত্রণাও আছে। আমি ডাক্তার দেখালাম। তিনি বললেন, 'কোন ভয়

নেই। প্রথম প্রথম এরকম অনেকেরই হয়।'

অসীমা ওর মামা বাড়িতে যেতে চাইল না। ওর তবু দূর সম্পর্কের এক মামা আছে। দূর দিগন্তেও আমি কোন আত্মীয়স্বজনকে দেখলাম না যেখানে ওকে নিয়ে তুলতে পারি। তাই সেই বাসাতেই আমার সাধ্যমত ওর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলাম। ঠিকে ঝি ছিল, তার বদলে রাত দিনের লোক রাখলাম। শুধু অফিসের আয়ে সব খরচ কুলোয় না। ট্যুইশনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম।

হাসপাতালে যাওয়ার আগে অসীমা ঘর দোর আসবাবপত্রের দিকে পরম মমতাভরা চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে আমাকে আস্তে আস্তে বলল, 'ধরো আমি যদি মরে যাই?'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কী যে বলো। যারা এজন্যে হাসপাতালে যায় তারা বুঝি মরে? না কি আর একটি জীবন নিয়ে ফিরে আসে?'

অসীমা বলল, 'সবাই তো আর তা আসে না। ধরো এমন সঙ্কট যদি আসে দুজনের বাঁচবার আর কোন সম্ভাবনা নেই, ডাক্তার তোমাকে এসে বললেন, 'যে কোন একটিকে আপনি রাখতে পারেন। হয় মূল না হয় ফুল। আপনি কী রাখবেন বলুন। আমি তোমাকে বলে যাই তখন কিন্তু তুমি ফুলই রেখো। আমি সেই ফুলের মধ্যেই বেঁচে থাকব। তার মধ্যেই তুমি আমাকে পাবে।'

এসব প্রিমনিশন অসীমার কেন এসেছিল জানিনে। হাসপাতালে কোন অঘটন ঘটল না। তবে ঈজি ডেলিভারি হল না। ডাক্তারকে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য নিতে হল। আমি অবশ্য মূল আর ফুল বলা যায় লতা আর ফুল দুইই জীবন্ত পেলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ডাক্তার জানিয়ে দিলেন লতা আর দ্বিতীয়বার পুষ্পিতা হবে না। সেই ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিয়েই ডাক্তার ওকে ছেড়ে দিয়েছেন। একথা অবশ্য অসীমা অনেক পরে জেনেছিল।

মেয়ে নয় ছেলেই হয়েছে। সে ছেলে স্বাস্থ্যবান সুন্দর। রোগাটে হয়নি, ওজনে কম হয়নি। মাকে কষ্ট দিয়ে এসেছে বলে শিশুর মুখে কোন কুণ্ঠা সংকোচের ছাপ নেই। ডাক্তার আমাদের হাসিমুখে বিদায় দিলেন। আমিও স্ত্রী পুত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরলাম। কয়েক মাস পরে বাড়িও বদলালাম। চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাট অবশ্য নয়, সিমলা স্ট্রীটে দোতলার ওপরে দুখানা ভালো ঘর দেখে আমরা উঠে গেলাম। পুব দক্ষিণে দুটি করে জানলা আছে। আলো হাওয়ার কোন অভাব নেই। স্ত্রীকে বললাম, 'দেখতো রাজপুত্রের উপযুক্ত প্রাসাদ হয়েছে কিনা।'

অসীমা বলল, 'প্রাসাদ তো হল। কিন্তু তুমি চালাবে কী করে। এত খরচ বাড়িয়ে ফেললে। সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি বদলাবার কী দরকার ছিল।'

দোলনায় ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে আমি বলি, 'দরকার ছিল বই কি।'

ছোট একটি সংসার তো নয় এক সাম্রাজ্য। আমি আমার সমস্ত শক্তি সেই সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ করলাম। পার্টটাইম চাকরি, ট্যুইশন, মাঝে মাঝে কাগজে আর্টিকেল লেখা—উপার্জনের কোন পথই বাকি রাখলাম না। এই বৃহৎ বিশাল পৃথিবীতে আমরা আর কীই বা পারি। একটি ছোট্ট সংসারকে যদি সুন্দর সার্থক করে গড়ে তুলতে পারি তাই যথেষ্ট। আমার দেশকে সমাজকে একটি সুস্থ সবল, সুশিক্ষিত নাগরিক যদি আমি দিয়ে যেতে পারি সেই আমার শ্রেষ্ঠ দান। অন্যের ক্ষতি না করে কোন অসৎ পথে না গিয়ে কোন ছলনা বঞ্চনার আশ্রয় না নিয়ে তুমি যদি একটি সৎ সমর্থ উত্তর পুরুষ রেখে যেতে পার সে তোমার কম পৌরুষের কথা নয়।

পরিশ্রমে আমি ক্লান্ত হইনে। কারণ আমার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য স্থির আছে। যত শ্রান্ত হয়েই আমি ঘরে ফিরি বাচ্চুকে দেখলে আমার যেন কোন আর অবসাদ থাকে না। বহুকাল আমি খেলাধুলো ভুলে গিয়েছিলাম। আমি নতুন খেলার উৎসাহ আর বস্তু পেয়ে গেছি। আমি ওকে নিয়ে খেলি, আদর করি, কথা শেখাই। অসীমা অভিমানের ভান করে বলে, 'আমার চেয়ে ছেলেই তোমার বেশি আপন হল দেখছি। পুত্রার্থে ভার্যা। এখন আর আমাকে দিয়ে তোমার দরকার নেই।'

বাচ্চু বড় হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ির আর সব ভাড়াটের ঘরেও ওর খুব আদর। ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু এমন লাভলি চাইল্ড আর কারো ঘরে নেই।

হঠাৎ অসীমা একদিন আমাকে বলল, 'আচ্ছা, আমাদের বাচ্চুর কী হল বল দেখি।'

'কী হল।'

'ওর বয়সী সব ছেলেমেয়ে হাঁটছে, সাবা বাড়ি ভবে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু ও হাঁটতেও পারছে না, কথাও বলতে পারছে না।'

আমি বললাম, 'বোধ হয় একটু দেরিতে হবে। ওর বাবা হাঁটতে শিখেছিল চার বছরে। আর ওর মার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শেখেনি।'

অসীমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠাট্টা তামাসা রাখো। চলো ওকে আমরা ভালো কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। রকম সকম আমার যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমাদের কপালে কী আছে কে জানে।'

গেলাম ওকে নিয়ে স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে ভরসা দিয়ে বললেন, 'না, আপনার ছেলে খোঁড়া হবে না বোবাও হবে না। দেখছেন না ও সব শুনতে পাচ্ছে। কালা নয়।'

পাঁচ বছর বয়সে বাচ্চু হাঁটতেও পারল। ওকে আমরা কাছকাছি ভালো একটা স্কুল দেখে ভর্তি করে দিলাম। ফার্স্ট সেকেণ্ড না হলেও ও মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেই ক্লাস টু পর্যন্ত উঠল। তারপর আর পারল না। দু দুবার ফেল করল। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বোকা, জড়বুদ্ধি ছেলে। লজ্জায় দুঃখে আর বাঁচিনে। হেডমাস্টার বললেন, 'আসলে ওর কোন দোষ নেই। ও বুদ্ধিতেই বেড় পায় না। আপনারা ওকে স্পেশালিস্ট দেখান। মনে হয় গোড়া থেকে ভালো করে চিকিৎসা করলে সেরে যাবে।'

ছুটে গেলাম আর এক স্পেশালিস্টের কাছে। তিনি বাচ্চুর মার সামনে কিছু বললেন না। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এ একেবারে কনজেনিটাল ডেফিসিয়েন্সি। জন্মগত। ব্রেণের গ্রোথ একেবারে চেকড হয়ে গেছে। আর বাড়বে না। যদি বা বাড়ে খুবই আস্তে আস্তে বাড়বে।'

অসীমাকে আমি তখন আর কিছু বললাম না। কিন্তু পরে সবই খুলে বললাম। সুখের আশায় এক সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। দুঃখ দুর্ভোগও একসঙ্গেই ভুগব। লুকিয়ে লাভ কি।

ওর চিকিৎসার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। সঞ্চয় তো কিছু ছিল না। ধার দেনা করতে লাগলাম। স্ত্রীকে দু-চারখানা গয়না যা দিয়েছিলাম গেল। ঘরে দুটি একটি দামি আসবাবপত্র যা ছিল, রইল না। তবু যা চাইলাম তা আর হল কই। যে যাঁর নাম কবল তাঁর কাছেই গেলাম। স্পেশালিস্ট, ফিজিওলজিস্ট, সাইকোলজিস্ট সকলের কাছে ছুটোছুটি করলাম। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা হল, শ'য়ে শ'য়ে টাকা ব্যয় হল ; কিন্তু আর কিছুই হল না। ডাক্তাররা আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'ও ঠিক ইডিয়ট নয়, তবে— ।'

তবে যে কী তার অনেক বৈজ্ঞানিক টার্ম আছে, ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু কোন প্রতিষেধক নেই। এই জড়বুদ্ধি ছেলেটির জড়তা যে কবে ঘুচবে কিসে ঘুচবে তা তাঁরা বলতে পারলেন না। আমরা বুঝতে পারলাম কোনদিনই ঘুচবে না।

আশ্চর্য, অসীমা এই দুর্ভাগ্যকে সহজেই মেনে নিল। ছেলের আদর যত্ন যেমন করত তেমনি কবতে লাগল। যেন তার ছেলে আরো পাঁচজনের ছেলের মতই সুস্থ, স্বাভাবিক, আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা। কিন্তু আমি তা পারলাম না। দুর্বল সন্তানের ওপর মায়ের নাকি সবচেয়ে বেশি স্নেহ থাকে কিন্তু বাপের তেমন অবিমিশ্র স্নেহ থাকতে পারে না। ছেলের দৌর্বল্যের মধ্যে বাপ নিজের বিকৃত প্রতিকৃতিকে দেখে, নিজের পঙ্গুতা অক্ষমতা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়।

আমি যে আমার ছেলেকে মারধোর করি তা নয়, কোনদিনই করিনি। কিন্তু তেমন মমতাও বোধ করিনি। বরং এক নির্মম ঔদাসীন্য আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অসীমা ওকে যেমন শাসন করে তেমনি আদরও করে, জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। উনিশ উৎরে বিশে পা দিয়েছে বাচ্চু। বয়সে সে যুবক, আকৃতিতেও তো তাই। গোঁফ দাড়ি গজিয়ে গেছে। তবু ওর মা ওকে শিশুর মতই আদর করে। ওর মনের বয়স সাত আট বছরের বেশি বাড়েনি। ওর খেলাধুলো চালচলন সব বালকের মত। সাত আট বছরের ছেলেমেয়েরাই ওর সঙ্গী, তাদের সঙ্গে ও পুতুল খেলে, ছুটোছুটি করে।

পড়াশুনোও ওই বয়সী ছেলেদের মত। অনেকদিন আগেই আমি ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছি, প্রাইভেট টিউটরও ছাড়িয়ে দিয়েছি। কী হবে আর অর্থ ব্যয় করে।

কিন্তু আমি দূরে সরে থাকতে চাইলে কী হবে বাচ্চু আমাকে দূরে থাকতে দেয় না। আমাকে দেখলেই আমার গায়ের ওপর ও ঝাঁপিয়ে পড়ে, দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে, তুমি যেমন তোমার ভাইপোর গালে গাল ঘষছিলে, তেমনি ওর দাড়িওয়ালা গাল আমার গালের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে আদর করে। অবশ্য কচি দাড়ি তবু দাড়িই তো। আমার সর্বাঙ্গ অস্বস্তিতে ভরে যায়। ঘৃণা, লজ্জা, অসহায়তার মধ্যে আমি যেন তলিয়ে যেতে থাকি। আমি ওকে দু'হাতে দূরে সরিয়ে দিই। আমি ওর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে যতদূর পারি চলে যাই। তুমি ত্বকের ব্যবহারের কথা বলছিলে অমরেশ। শুধু ত্বকের কোন দাম নেই। যেমন শুধু দৃষ্টি মানে শূন্য দৃষ্টি, সুধাভরা দৃষ্টি নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনঃপূত করা চাই তবেই সব জীবন্ত হয়; নইলে মৃত। শুধু ত্বকের সঙ্গে ত্বকের মিলনে আমরা কী পাই। প্রায় কিছুই নয়। সেই সাময়িক সংলগ্নতার স্বাদ কি আমরা জীবন ভরে মনে রাখতে পারি? তাও না। তবু তুমি যা বলেছ এই ত্বকের জন্যেই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আমরা সবাই মাংসাশী। কাঁচা মাংস, নিত্য নতুন মাংস আমাদের লুব্ধ করে; পৃথিবী আমাদের চোখের সামনে নতুন মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এই জন্যেই কি পৃথিবীর নাম মেদিনী? সে মনোময়ী নয়, শুধু মেদময়ী।

অসীমার গুণ আছে, মনের বলও আছে। জড়বুদ্ধি ছেলের শোকে সে নিজে জড় হয়ে বসে রইল না। শুধু ঘর সংসারের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখল না। নিজের চেষ্টায় ঘরে বসে পড়াশুনো করে ও ম্যাট্রিকুলেশন, আই· এ· তারপর বি· এ· পাশ করল। নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করে পাড়ার হাই স্কুলে একটি টিচারিও নিল। যারা জড়বুদ্ধি নয়, সুস্থ-স্বাভাবিক তীক্ষ্ণধী, সেই সব মেয়েকে পড়িয়ে ওর আনন্দ। নিজের কাজে খানিকটা সুখ্যাতিও অসীমা পেল।

আর আমি কী করলাম জানো? অফিসের চাকরি ছাড়া আমার একমাত্র কাজ হল জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে পড়াশুনো, তথ্য সংগ্রহ। কোথায় কোন বইতে ওদের সম্বন্ধে কী লেখা আছে, কোন সাহেব কী অভিমত দিয়েছেন আমি তাই পড়ি, তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি। একবার একটি বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়লাম এসব ছেলেমেয়েকে ওখানকার এক গভর্ণর পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও নাকি করেছিলেন। কারণ যারা যোগ্য, সুস্থ সবল পৃথিবীতে শুধু তাদেরই জায়গা থাকা উচিত। যারা জড় বংশ জড়িয়ে তারা শুধু জড়তারই বিস্তার করবে।

অসীমাকে একথা বলায় সে আমার হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগ করে বলল, 'ছি ছি ছি, তুমি কি বাপ না জল্লাদ?' আমি বললাম, 'আমার ওপর কেন রাগ করছ? আমি তো আর ওকথা বলিনি। যিনি বলেছেন, সেই গভর্ণরকে তুমি ফাঁসী দাও।' অসীমা তারপর দু'দিন আমার সঙ্গে কোন কথাই বলল না।

আমি যে সত্যিই জল্লাদ নই ছেলের জন্যে খেলনা এনে দিয়ে, খাবার এনে দিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আমি তার প্রমাণ দিলাম।

পাড়াপড়শীদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের ছেলেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড় হল, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে গেল আর আমি যুবকবেশী এক শিশুকে আঁকড়ে রইলাম।

দেখ, আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা বই লিখতে জানিনে, ছবি আঁকতে জানিনে, কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারিনে, মরবার পর যা আমাদের চিহ্ন ধরে রাখবে অন্তত কিছুদিনের জন্যে কিছু লোকে মনে রাখলেও রাখবে। আমরা বাঁচতে পারি শুধু আমাদের সন্তানের মধ্যে। সেই সন্তান যত কৃতী হয়, সার্থক হয় আমাদের মনুমেন্ট গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় আত্মপ্রসাদ এই স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আমার বেলায় অন্যরকম হল সন্তান আমাদের স্মৃতিসৌধ নয়, শুধু কবরের গহ্বর।

বাচ্চু বুদ্ধিতেই জড়, কিন্তু বস্তুর মত জড়পিণ্ড নয়। ওর মন আছে, হৃদয় আছে। প্রাণোচ্ছল; চঞ্চল বালক। ও যদি আকারে না বাড়ত তা হলে হয়তো ওকে আমি ভালোবাসতে পারতাম। আমি

না বাসলেও ও কিন্তু ভালোবাসে। প্রচণ্ড আবেগ দিয়েই ভালোবাসে। ওর মাকে ভালোবাসে, আমার বয়সী যাদের ও কাকা বলে ডাকে তাদের পরম আত্মীয় বলে মনে করে। বুদ্ধির সঙ্গে কোথায় যেন আবেগের বিরোধিতা আছে। যেখানে আবেগের আধিক্য সেখানেই বুদ্ধির ক্ষীণতা। ওর বুদ্ধি নেই বলেই বোধ হয় আবেগের পাত্র এমন কানায় কানায় ভরা।

কিছুদিন আগে একটি ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম এই ধরনের ছেলেদের সেকস্ ইমপালস বাড়ছে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেক সময় যৌনবোধ যদি স্বাভাবিকভাবে আসে তাতে সুফল ফলতে পারে।

আমি আমার স্ত্রীর কাছে বাচ্চুর যৌনচেতনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

অসীমা তো লজ্জায় লাল। ও তো জানে না যা দোষ তাও কখনো কখনো গুণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে নিরাশ করল। বাচ্চুর ওসব কিছু হয় না। আসলে মনের যৌবনই যৌবন। সেই মনোরাজ্যে ও বালক মাত্র। সেখানে ও আজও যুবরাজ নয়। তবু আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলাম।

সেদিন বছরের শেষ বলে আমি ক্যাজুয়াল লীভ নিয়ে বাড়ি বসে আছি। অসীমা গেছে স্কুলে। আর বাচ্চু ঘরের মধ্যে বসে পীজবোর্ড দিয়ে এক ঘর বানাচ্ছে। শিশুর খেলাঘর।

হঠাৎ একটি মেয়ে এসে ঢুকল। বয়স আর কত হবে। আঠের কি উনিশ। আমি ওকে চিনি। আমাদের পাশের বাড়ির সনতবাবুর ছোট শালী রেবা। দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

রেবা আমাদের দেখে ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একখানা গল্পের বই নিতে এসেছিলাম। মাসীমা কোথায় ?'

অসীমাকে ও মাসীমা বলে ডাকে।

আমি বললাম, 'সে তো স্কুলে গেছে। এসো, ভিতরে এসো।'

রেবা ঘরে এল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে এক বৃহৎ শিশুর খেলা দেখতে লাগল। মেঝেয় বসে বাচ্চু পীজবোর্ট দিয়ে নতুন ঘর বাঁধছে।

আমি ওকে সচেতন করবার জন্যে বললাম, 'বাচ্চু, কে এসেছে দেখতো।'

বাচ্চু মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকাল। তারপরে আমার দিকে চেয়ে একটু ফিক করে হেসে বলল, 'জানি। নতুন মা।' তারপর ফের সে তার ঘর তৈরী খেলায় মন দিল।

মুহূর্তের জন্যে সেই অষ্টাদশী তন্বী, রূপবতী মেয়েটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। তার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। নারীর এই লজ্জা এই শোভন যৌবনশ্রী আমি যেন এই প্রথম দেখলাম। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল বাচ্চুর মত আমারও গ্রোথ বন্ধ হয়ে গেছে। বয়সে আমি বাহান্ন বছরের প্রৌঢ় ; মন আমার বাইশ বছরের আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

রেবা সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলতে হয় ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার তো পালাবার জায়গা নেই। পলাতকাকে ধরাই আমার একমাত্র কাজ। রেবা দু'দিন বাদেই তার দিদির বাড়ি থেকে চলে গেছে। আর আমি মনে মনে আজও সেই শরীরিনী হরিণীর পিছনে পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি।" সতীকান্তবাবু থামলেন।

ঘরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এল।

অমরেশ আলো জ্বালালেন না, কোন কথা বললেন না। নিঃশব্দে বন্ধুর হাতে শুধু আর একটি সিগারেট গুঁজে দিলেন।

সহযাত্রিণী

আজও বাসে মেয়েটির সঙ্গে সুব্রতর দেখা হয়ে গেল। ঠিক দেখা হওয়া বলা চলে না, দেখল সুব্রত। একতরফা দেখল। ও তো আর কোনদিকে চোখ তুলে তাকায় না। লেডিজ সিটে জানালার ধারে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে বসে চোখের সামনে বই কি মাসিক পত্র-টত্র একখানি খুলে ধরে। শীতের দিনে জাম্পার-টাম্পার কিছু একটা বোনে। এইভাবে সারাটা পথ কিছু না দেখে না শুনে কারো দিকে না তাকিয়ে ও একেবারে অফিসের সামনে গিয়ে নামে। একটু এগিয়ে গিয়ে স্ট্যান্ড থেকে ওঠে বলে ওই জায়গাটি ওর বেশি হাতছাড়া হয় না। সিটটি যেন ওর রিজার্ভ করা আছে।

প্রায়ই দেখা হয় সুব্রতর সঙ্গে, প্রায়ই দেখা হয়। দেখা তো হবেই। এই বাসটা তারও অফিসের বাস। এর পরের বাসে গেলে তাকে লেট হতে হয়। যেদিন ওকে দেখে না সুব্রত সেদিন কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে। মনে মনে ভাবে আজ কি কামাই করল, অসুখ বিসুখ হল ? না কি অন্য বাসে চলে গেল। আবার এই একতরফা দেখার মধ্যেও অস্বস্তি বড় কম নেই। বিশেষ করে কোন চেনা মেয়েকে যদি এইভাবে দূর থেকে দেখতে হয়, কোন পরিচিতা মেয়ে যদি এমন করে সম্পূর্ণ অপরিচিতা হয়ে যায়। তা হলে তার দিকে চোখ পড়লে নিজেরই সম্ভ্রমবোধে লাগে, একটু অপমানের খোঁচা মনে গিয়ে পৌঁছায়। সুব্রত চেষ্টা করে, না দেখবার না তাকাবার। বেশির ভাগ দিনই সফল হয়। ট্রামে বাসে সে অবশ্য বই কি কাগজ পড়াটা পছন্দ করে না। তার মধ্যে একটু যেন লোক-দেখানো অধ্যয়নশীলতা আছে ! সে যে অফিসে কি বাড়িতে খুবই কর্মব্যস্ত এই কথাটি ওই অভ্যাসের মধ্যে উচ্চারিত হয়। আসলে অত ব্যস্ততা সুব্রতর নেই। ইচ্ছা করলে সে বাড়িতে পড়বার সময় পায়। কারো সঙ্গে বাজার দর খেলার মাঠ কি রাজনীতির বাম দক্ষিণ পন্থা নিয়ে ট্রামে-বাসে আলোচনা করতেও তার রুচি হয় না। চেনাপরিচিত কেউ এসে পাশে বসলে কি কেউ পাশে বসতে দিলে তার সঙ্গে বড় জোর কুশল বিনিময়টুকু চলে। তারপর তাকে নীরব হতে দেখে সঙ্গীকেও চুপ করতে হয়। তাই এক-হিসেবে ওই মেয়েটির মত সুব্রত বোসও বালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ নিঃসঙ্গভাবে যায় আসে। কিন্তু মন কি সবদিন অতখানি অবিচল, নির্বিকল্প আর সঙ্গহীন থাকে।

ওই মেয়েটি—ওই শ্যামলী দত্তের সঙ্গে বছর পাঁচেক আগে এই বাসেই একদিন আলাপ হয়েছিল। তখন দামী শাড়ি ছিল ওর পরনে। হাতেব আংটিতে কানের ফুলে দামী পাথর বসানো ছিল। ও যে ধনীর ঘরের মেয়ে তা অতি উচ্চারিত না হলেও ওর চেহারায় ওর বসবার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল। মুখের কমনীয় কান্তিতে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য লাবণ্যের মতই মিশে ছিল।

এখন অবশ্য সে অবস্থা ওদের আর নেই। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুখ আর দুঃখ গাড়ির চাকার মত ঘোরে ওপর নিচ করে, এ কথা ওদের বেলায় বড় বেশিরকম খেটে গেছে। আজ আর সেই দামী দামী শাড়ি-গয়না নেই। সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ি পরেই বেরিয়েছে শ্যামলী। এক হাতে ঘড়ি আর এক হাতে একটি বালা পরেছে,আর কোথাও কোন ভূষণ রাখেনি। চেহারার মধ্যেও কেমন যেন একটু শুষ্কতা এসে গেছে। সে কি শুধু পাঁচ বছর বয়স বেড়েছে বলেই ? অবশ্য সেই সঙ্গে ওর চেহারার তীক্ষ্ণতাও বেড়েছে। বাইরের প্রতিকূল পৃথিবীর সঙ্গে বেশিরকম যুঝতে হলে মুখ চোখের যে তীব্রতা বাড়ে সেই তীব্রতা এসেছে ওর শরীরে। হয়তো বা মনেও। মুখ ত মনেরই প্রতিচ্ছবি।

তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনাটা বড় চোখে পড়ে, বড় বেশিরকম মনে হয় সুব্রতর। হওয়াটা যদিও উচিত নয়, অশোভনও। বাসভরতি এতগুলি যাত্রীর আর কারোরই বোধহয় সে সব দিনের কথা এমন করে মনে পড়ে না। আর সবাই সে কথা ভুলে গিয়ে বেঁচে গেছে। শহরের জীবনের কালস্রোত, ঘটনার স্রোত বড় প্রখর। সেই স্রোতে কে কবে হাবুডুবু খেয়েছে, কে কোথায় তলিয়ে গেছে, সে কথা বেশিদিন কে আর মনে করে রাখে। এমন কি পাড়াপড়শীতেও রাখে না। কিন্তু

আশ্চর্য, সুব্রত অমন করে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারেনি। আর ওই শ্যামলী—সেও নিশ্চয়ই মনে করে রেখেছে। মনে রেখেছে বলেই সুব্রতর দিকে ও তাকায় না। বাসে ওঠা নামার সময় কি পথে-টথে কোথাও দেখা হয়ে গেলে, চোখে চোখ পড়লে মুখ নামিয়ে নেয়, কি ফিরিয়ে নেয়। চোখে কি ঠোঁটে একটুও হাসি ফোটে না। অথচ হাসলে ওকে কী চমৎকার দেখাত। পাতলা ঠোঁট, সুন্দর সুষম দাঁতের সারি। হাসলে এখনো নিশ্চয়ই ওকে সুন্দর দেখায়। সেবার এই বাসেই শ্যামলীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল সুব্রতর। সে যথারীতি তার অফিসে বেরিয়েছিল। আর শ্যামলী যাচ্ছিল ইউনিভারসিটিতে। ওর হাতে ছিল সরু একটা নীল রঙের খাতা আর সেই সঙ্গে মোটা একখানা মনস্তত্ত্বের বই। সুব্রত যাচ্ছিল দাঁড়িয়ে দাঁডিযে, ও বসেছিল একটা লেডিজ সিটের আধখানায়। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল।

শ্যামলী আরো একটু সরে গিয়ে সুব্রতর দিকে চেয়ে বলেছিল, 'বসুন।'

কালো চোখের সেই তাকাবার ভঙ্গি বড় ভালো লেগেছিল সুব্রতর, গলাটুকু বড় মিষ্টি শুনিয়েছিল। অবশ্য এই ধ্বনিটুকু শুনবার কথা ছিল না, ও শুধু চোখের ইশারায় বসতে বললেই পারত। এমন কি না তাকিয়ে, কিছু না বলেও বসতে বলা যেত। কিন্তু যেজন্যেই হোক সেদিন ওর মনে প্রচুর দাক্ষিণ্য ছিল।

সুব্রত পাশে বসে ইংরেজিতে ধন্যবাদ জানিয়েছিল। চোখে আর একটু কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখে, মুখখানা শুধু সুন্দরই নয়, চেনাও। চেনা মানে অনেকবাব দেখা। এই পাড়ারই মেয়ে। দেখেছে পার্কে, লেকের ধারে, স্টেশনারি স্টোর্সের সামনে। আজ আরও কাছে বসে দেখা হল। সুব্রতর বিস্ময় দেখে মেয়েটি কি একটু হেসেছিল? যদি হেসে থাকে সে হাসি একটি চেনা মুখকে দেখতে পাওয়ার হাসি, যার সঙ্গে আলাপ ছিল না তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি। সুব্রতর চেহারাও তো একেবারে না চেয়ে দেখবার মত নয়।

তবু সেদিন শুধু স্মিত দৃষ্টি আব বিস্মিত দৃষ্টির বিনিময়ই হয়েছিল। কথাবার্তা আর এগোয়নি। সুব্রত ইচ্ছা করলে যে আলাপকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারত তা নয়, কিন্তু নাগরিক রীতিতে বাধত।

তারপর আরো কিছুদিন শুধু পথে-টথেই দেখাশোনা হল। সেই হাসি আর দৃষ্টির বিনিময়। কিন্তু তা শুধু একটি নিমেষের মধ্যেই শেষ হয় না। আড়ালে এসে তার মাধুর্য যেন আরও বেড়ে যায়। কিসের একটা মৃদু অস্পষ্ট প্রত্যাশা ভবিষ্যৎকালের মধ্যে পথের রেখা এঁকে দিতে দিতে এগোতে থাকে।

ততদিনে মেয়েটি কোন্ বাড়িতে থাকে, কোন্ বাড়ি থেকে বেরোয় সুব্রত তা লক্ষ্য করে রেখেছে। ইঞ্জিনীয়ার আর কে দত্তের বাড়ি। দোতলা, দুগ্ধধবল রঙ। সামনে বাগান। তাতে অজস্র মরসুমী ফুল। বাঁদিকে গ্যারেজ আছে। যে গ্যারেজ প্রায় শূন্যই থাকত। অতি ব্যস্ত মিঃ দত্তকে নিয়ে গাড়ি সব সময় ঘোরাফেরা করত। তবু ওঁদের ওই গাড়িতে উঠবার একদিন সুযোগ হয়েছিল সুব্রতর। অনেকদিন বাদে এলিটে ইংরেজি ছবি দেখতে গিয়েছিল, একটি বন্ধুর আসবার কথা ছিল। সে কথা রাখেনি। সেখানেও এই প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নাটকের আগেই এই নাটকীয় ঘটনাটুকু ঘটে যাওয়ায় সুব্রত অতিমাত্রায় খুশি হয়েছিল। নিশ্চয়ই সে তা চেপে রাখতে পারেনি। শ্যামলীর সঙ্গে তার এক ছোট ভাই ছিল প্রণব। বছর পনের ষোল বয়স। শ্যামলী যে কোন বন্ধুর সঙ্গে না এসে তার ভাইয়ের সঙ্গে এসেছে, তার জন্যে মনে মনে কৃতজ্ঞ হয়েছিল সুব্রত। ছবি আরম্ভ হওয়ার সামান্য দেরি ছিল। লবিতে বসে খানিকক্ষণ গল্প চলেছিল তিনজনের মধ্যে। সে গল্পের কোন মাথামুণ্ডু ছিল না। তবু সুব্রতর মনে হয়েছিল ভিতরে গিয়ে আর দরকার নেই। ভিতরে গিয়ে এর চেয়ে বেশি কী আর দেখবে, এর চেয়ে মধুরতর কী আর শুনবে। বিশেষ করে যখন পাশাপাশি বসা যাবে না, শ্যামলীদের টিকিটের নম্বর আর সুব্রতর টিকিটের নম্বরের মধ্যে যখন অনেক গাণিতিক ব্যবধান, আর সে টিকিট বদলে নেওয়ারও এখন উপায় নেই, তখন আর ভিতরে গিয়ে লাভ কী।

তবু তাদের ভিতরে যেতে হয়েছিল। শ্যামলী বলেছিল, 'বেরিয়ে এসে কিন্তু দাঁড়াবেন। এক

সঙ্গে ফিরব।'

ছবিটা বাজে লাগছিল, বেরিয়ে আসবার জন্যেই বড় বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সুব্রতর মন।

সেদিন বাসে কি ট্যাকসিতে আসতে হয়নি, শ্যামলীদের গাড়ি ছিল সঙ্গে। প্রণব বুদ্ধিমান ছেলে, দিদির পাশে না বসে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছিল।

আর সারা পথ শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসতে পেরেছিল সুব্রত। ছবি শ্যামলীরও ভালো লাগেনি। কিন্তু এই যৌথযাত্রা যে সব ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে সে কথা অনুচ্চারিত থাকলেও অপ্রকাশিত ছিল না।

কথায় কথায় সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেদিন দেখলাম আপনি সেতার নিয়ে যাচ্ছেন। কতদিন প্র্যাক্টিস করছেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'বছরখানেক হল।'

'এক বছর! আপনি তা হলে আমার চেয়ে সাত মাসের সিনিয়র।'

শ্যামলী হেসে বলেছিল, 'আপনারও এসব আছে বুঝি? কতদিন বাজাচ্ছেন?'

সুব্রত বলেছিল, 'বাজানো ওকে বলে না। অফিস থেকে ফিরে এসে যেদিন খেয়াল হয় একটু টুংটাং করি। নির্মলবাবু ধমকান। বলেন, আপনার মশাই একেবারেই মন নেই।'

শ্যামলী বলেছিল, 'নির্মলবাবু কে? নির্মল গুহঠাকুরতা?'

'হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'আমি যাঁর কাছে শিখি তিনি ওঁর বন্ধু। ইস্তাক হোসেন।'

সুব্রত বলেছিল, 'বাঃ চমৎকার তো। এক বন্ধুর ছাত্রী আর এক বন্ধুর ছাত্র, আমাদের মধ্যে তা হলে কী সম্পর্ক হল বলুন তো।'

শ্যামলী হেসে বলেছিল, 'আমি অত হিসেব করতে জানি নে। আপনি বসে বসে ভাবুন।'

ভাবনার চেয়ে সেদিন নির্ভাবনায় কথা বলতে ভালো লাগছিল সুব্রতর। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কি খুব রেয়াজ করেন?'

শ্যামলী বলেছিল, 'কই আর তেমন করতে পারি। সেতার নিয়ে বসতে দেখলেই বাবা ধমকান। ভয় দেখিয়ে বলেন, তুই ফেল করবি। আগে পড়াশুনোটা সেরে নে, তারপর যা খুশি তাই করিস।'

'আপনি বুঝি আপনার বাবার খুব বাধ্য মেয়ে?'

'অবাধ্য হবার কি জো আছে? বাবা আমাকে বড্ড ভালোবাসেন। আমাকে ছাড়া ওঁর এক মুহূর্ত চলে না। এই নিয়ে পিনুদের কী হিংসে।'

এই বেসুরো প্রসঙ্গটা সুব্রত বেশিক্ষণ চলতে দেয়নি। তাড়াতাড়ি ফের রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ এনে ফেলেছিল।

চৌরঙ্গী থেকে বালিগঞ্জের পথটা সেদিন বড়ই ছোট হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রতা আছে শ্যামলীদের। লেক টেম্পল রোডে সুব্রতদের-বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

সুব্রত বলেছিল, 'ভিতরে আসবেন না?'

শ্যামলী বলেছিল, 'না না আজ থাক, আজ বড় রাত হয়ে গেছে। আর একদিন আসব। কিন্তু তার আগে আপনার একদিন আসা উচিত।'

সুব্রত বলেছিল, 'বেশ তো যাব। কিন্তু একটি শর্ত আছে। আপনার বাজনা শোনাবেন।'

শ্যামলী বলেছিল, 'ওরে বাবা। আগে শিখেনি, তারপরে শোনাব। ওসব শর্ত-টর্ত থাকলে আপনাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।'

'একেবারে অনন্তকাল! অমন করে হতাশ করবেন না। ধৈর্যের অমন শক্ত পরীক্ষা নেবেন না।'

শ্যামলী মৃদু হেসেছিল, কোন কথা বলেনি।

তারপর সুব্রতর আর ওদের বাড়িতে যাওয়া হল না। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। শ্যামলীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের কথা সুব্রতর মা কী করে টের পেয়েছিলেন জানা যায় না। বোধ হয় কোন বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকবে। তার অনেকদিন আগে থেকেই মা 'বিয়ে কর, বিয়ে কর' বলে সুব্রতকে উত্যক্ত করে তুলছিলেন। বিয়ে করবে না এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ তার ছিল না। কিন্তু যাকে

দেখবে তাকেই ঘরে তুলবে অত উদারতার অভাব ছিল। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার গ্রেডে চাকুরিটা পাকা সুব্রতর। পৈতৃক দোতলা বাড়িটির একাই উত্তরাধিকারী। বোনের বিয়ে বাবাই দিয়ে গেছেন। ছেলের ওপর কোন দায় চাপিয়ে যাননি। এমন নির্ঝঞ্ঝাট সংসার সুলভ নয়। তাই ভালো ভালো সম্বন্ধই আসছিল। অনূঢ়া তরুণী মেয়েদের যে পরিমাণ ফোটো জমেছিল তা দিয়ে এক প্রদর্শনী খোলা যেত। কিন্তু দেখে শুনে সুব্রতর তেমন আগ্রহ হচ্ছিল না।

মা কেবল ধমকাচ্ছিলেন, 'তুই কী চাস বলতো ? অপ্সরী কিন্নরী না পটে আঁকা ছবি ?'

সুব্রত বলেছিল, 'না পটে আঁকা দিয়ে কী হবে। যে হেঁটে চলে বেড়াতে পারবে, ঘরের কাজকর্মে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে, সেবাশুশ্রূষা করতে পারবে, তেমন একজনকে আনা ভালো।'

কী করে মা দত্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনিই জানেন। খবর পাঠালেন ভবানীপুরে সুব্রতর কাকাকে। বাবার জ্যেঠতুতো ভাই। আলাদা অন্ন হলেও প্রায়ই এসে খোঁজখবর নেন। এসব বিয়েচূড়োর ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ। কাকা এলেন, কাকীমা এলেন, খুড়তুতো বোন ইলা এল সঙ্গে। দলবল নিয়ে ওরা গিয়ে মেয়ে দেখে এলেন। সুব্রতকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন কাকীমা কিন্তু সে রাজি হল না। ইলা বলল, 'দাদা আর কী দেখবে। দাদার তো অনেকবার দেখা মেয়ে।'

সুব্রত বলেছিল, 'কে বলল তোকে।'

ইলা বলেছিল, 'অনেক গুপ্তচর আছে আমাদের। তোমরা একসঙ্গে সিনেমা দেখেছ। ট্রামে বেড়িয়েছ, ট্যাকসিতে বেড়িয়েছ, কারে বেড়িয়েছ এখন শুধু প্লেনে আর রকেটে ভ্রমণ বাকি।'

সুব্রত বলেছিল, 'বিয়ের পর তুই বড় মুখরা হয়েছিস।'

ইলা জবাব দিয়েছিল, 'তুমি ঠিক উল্টোটি হবে দাদা, আমিও আগেই বলে রাখলাম। উপযুক্ত হাতে পড়লে আচ্ছা জব্দ হবে।'

মেয়ে দেখে সবারই পছন্দ হয়ে গেল। সুব্রত আগেই বলে দিয়েছিল, 'মা, কোনরকম দাবিদাওয়ার কথা যেন তোলা না হয়। ওসব আমি পছন্দ করি না।'

মা বললেন, 'বুঝেছি বাপু। আমাকে আর বেশি বলতে হবে না। দাবিদাওয়া তো ভালো, তোমার যা অবস্থা, ঘর থেকে টাকা খরচ করতে হলেও তুমি এখন রাজি আছ।'

ওপক্ষেরও ছেলে দেখে অপছন্দ হল না। শ্যামলীর মা বাবা দুজনেই এলেন চায়ের নিমন্ত্রণে। বাবা গুরুগম্ভীর রাশভারি মানুষ। খুবই ব্যস্ত। আধ ঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারলেন না। আধ কাপ চা খেলেন। ডায়বেটিস আছে বলে মিষ্টিটিষ্টি কিছু খেলেন না। ওই সময়টুকুর মধ্যেই জিজ্ঞাসা করে নিলেন, অফিসে সুব্রতর কত দিনের চাকরি, কী রকম প্রসপেক্ট, বাবার ওকালতি পেশা কেন নিল না সুব্রত, ব্যবসা-ট্যবসার দিকে ঝোঁক আছে কি না, কোন কোন কোম্পানির শেয়ার কেনা আছে।

শ্যামলীর মা দোহারা চেহারার লজ্জাবতী মহিলা। তিনি সুব্রতর সঙ্গে প্রায় কোন কথাই বললেন না। একটু আড়ালে বসে মার সঙ্গে গল্প করলেন আর পানদোক্তা খেলেন।

ওঁরা চলে গেলে সুব্রত মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী মনে হল মা। ইন্টারভিউতে উতরে গিয়েছি তো ?'

মা হেসে বললেন, 'আমার খোকার কী দুশ্চিন্তা ! এত চিন্তা তো কলেজের পরীক্ষাগুলির সময় দেখিনি, চাকরির ইন্টারভিউর সময়তেও দেখিনি। মনে তো হয় পাশ করেছ। চিন্তা তো ওঁদেরও আছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, দুটির বিয়ে দিয়েছেন। আরো দুটি বাকি। ছেলেও বুঝি গুটি তিনেক। সবই ছোট ছোট। শ্যামলীর মা বলছিলেন, ওঁদের হাতে আরো নাকি ভালো সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু মেয়ে তার ভাইবোন বন্ধুদের কাছে যা বলেছে— ।'

কী বলেছে সে কথাটুকু না বলে মা ফের আর একটু হাসলেন।

শুধু দিনক্ষণ ঠিক হওয়াই বাকি রইল। ওদের গুরুদেব গেছেন কাশীতে। তিনি ফিরে এলে পঞ্জিকা দেখবেন। হয় সামনের মাঘ ফাল্গুনে না হয় শ্যামলীর পরীক্ষার পর— ।

কিন্তু শুভদিন আসবার আগেই অপ্রত্যাশিত অশুভ দিন এসে গেল। আর কে দত্তের বাড়িতে

পুলিশ' এসে হানা দিল। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ। বিশ্বাসভঙ্গ, জালিয়াতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র। সরকারী কন্ট্রাক্ট নিয়ে যে সব কাজ তিনি করেছেন তাতে অনেক ফাঁকি ধরা পড়েছে। হিসাবের গরমিল হয়েছে লাখখানেক টাকার।

সুব্রতর মা বললেন, 'কী বিশ্রী সব ব্যাপার বল তো।' সুব্রত গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'বিশ্রী বইকি।'

মামলা চলল বছর তিনেক ধরে। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে সেসনে, সেসন থেকে হাইকোর্টে। আপীলে সুবিধে হল না। কয়েকজনের গুরুতর রকমের শাস্তি হল। আর কে দত্ত পেলেন আড়াই বছরের আর আই।

সবাই স্তম্ভিত। এ কী ব্যাপার। অবশ্য অনেকে কানাঘুষো করতে লাগল, এ ব্যাপার নতুন নয়, এবারই ধরা পড়েছেন।

সুব্রতদের সঙ্গে তো তেমন আলাপ নেই। এই সব গোলমালের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করলে ওঁরা কীভাবে নেবেন বলা শক্ত। তবু গোড়ার দিকে একবার খোঁজ নিতে গিয়েছিল সুব্রত। গেটে বলেছিল, দেখা করবার হুকুম নেই। তখন ভিতরে যাচ্ছেন শুধু বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার আর ওঁদের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন। সুব্রত তাঁদের মধ্যে পড়ে না।

শ্যামলীর নামটা মুখে আনি আনি করেও আনতে পারেনি। সংকোচ বোধ করেছে।

এই সব দুর্যোগের মধ্যে কোন শুভকাজের কথা উঠতেই পারে না। তবু পরোক্ষভাবে অস্ফুট স্বরে উঠেছিল। শ্যামলীর সম্পর্কিত এক মামা এসে বলেছিলেন,'কথাবার্তা যখন ঠিক হয়েই আছে তখন একটা দিন-টিন দেখে— । অবশ্য খরচপত্রের জন্যে ভাবনা নেই। মেয়ের বিয়ের টাকা ওঁরা আলাদা করে তুলে রেখেছেন।'

কিন্তু টাকাই তো সব নয়। এমন কি রূপবতী স্ত্রীও সব নয়। সামাজিক মানুষকে কুলশীল মানমর্যাদার কথাও ভাবতে হয়।

তাই প্রস্তাবটা আর এগোয়নি। সুব্রতর মা বলেছেন, 'অত ব্যস্ত হবার কী আছে। ওঁদের বিপদ আপদটা কাটুক তারপর সব দেখা যাবে। এই সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অশান্তির মধ্যে কারোরই তো মনের অবস্থা— ।'

বিপদ আপদ কাটেনি। কনভিকসনের ছ মাস পরেই মিঃ দত্ত হার্টফেল করে মারা গেলেন। ব্লাড প্রেসার নাকি আগে থেকেই ছিল। অবশ্য তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু স্বাভাবিক কিনা তা নিয়েও বেশ কিছু দিন ধরে আলাপ আলোচনা আর গবেষণা হয়েছিল পাড়ায়।

তারপর আস্তে আস্তে সব থেমে গেল।

শোনা গেল ওদের গাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। মামলার খরচ মেটাবার জন্যে সমস্ত সঞ্চয়ই শেষ হয়েছে। কে যেন বলল বাড়িটাও পুরোপুরি দায়মুক্ত নয়। সবই অবশ্য বাইরে থেকে শোনা। ওদের কারো সঙ্গেই আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না সুব্রতর। শুধু সুব্রতর কেন তার জানাশুনা কারো সঙ্গেই হয় না। ওরা যেন ওই বাড়িখানির মধ্যেই শেষ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। পাড়ার কাউকে ওরা ডাকে না, কারো বাড়িতেও ওরা যায় না। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলে নিজেরাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

সুব্রতর এক বন্ধু শিবতোষ ওদের বাড়ির উল্টোদিকে থাকে। শিবুদের বাড়ি থেকে সবই দেখা যায়। মানে আগে যেত। এখন আর যায় না। শিবু বলে, ওদের জানালা দরজা সব বন্ধ। যেন এক অবরুদ্ধ দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। দুর্গই বটে।

একটি পার্শী পরিবার ওদের দোতলাটি ভাড়া নিলেন। শুধু বুড়োবুড়ি। আর কেউ নেই, আর কোন ঝামেলা নেই। বোধহয় এইরকমই ওরা চেয়েছিল। নিজেরা নেমে এসেছে একতলার দু-তিনখানা ঘরে। আর কে দত্তের আশ্রিতের সংখ্যা কম ছিল না। তারা সব বিদায় নিয়েছে। শুধু যাদের আর কোথাও যাবার যো নেই, তারাই আছে। পাঁচটি ছেলেমেয়ে আর তাদের মা। ভাইবোনদের মধ্যে শ্যামলীই এখন বড়।

শিবু বলত, মেয়েটো বড় টাচি হয়ে গেছে।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী রকম ?'

'কেউ সামান্য কিছু বললে ওর মুখ কালো হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। ওদের বাবার কোন দোষ ছিল বলে কেউ স্বীকার তো করেই না, বোধহয় বিশ্বাসও করে না। যারা ওদের বাবাকে সম্মান করতে পারবে না, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ওরা অনিচ্ছুক। ফলে পাড়ায় ওদের কথা বলবাব মত কেউ নেই।

নেই যে তা সুব্রত জানে।

শিবু বলে, 'যাই বল, একটা গোটা পরিবার অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক হয়ে গেল। একটা কমপ্লেক্স ঢুকে গেছে ওদের মধ্যে। কোত্থেকে—কার কোন একটু কথা হাসি কি তাকাবার ধরন কি অন্য কোন ব্যবহারের ভিতর দিয়ে কোন নির্মম বিদ্রূপ, উপহাস, শ্লেষ, অপমান শেলের মত ছুটে আসবে, ওরা যেন সেই ভয়েই সব সময় অস্থির। ওদের দিকে ভয়ে আমি তাকাই না। ভয়টা সংক্রামক, কী বলো ? ওদের এই ভয়, আমাকে মাঝে মাঝে বড্ড ভয় পাইয়ে দেয়।'

সুব্রত নিজের ড্রয়িংরুমে বসে গম্ভীর হয়ে শোনে, সিগারেট টানে, বন্ধুর সিগারেট ধরিয়ে দেয়।

সিগারেটের ধোঁয়ায় শিবুর কবিত্বের উদ্রেক হয়, উপমা দিয়ে বলে, 'সারা বাড়িটা যেন এক শবাধার হয়ে রয়েছে।'

তারপর শিবুর বিশ্লেষণ আর খবর সরবরাহও একদিন থেমে যায়। ছুটিছাটার দিনে এসে সে অন্য কথা পাড়ে। ক্রিকেট, ফুটবল, সাহিত্য, সিনেমা, রাজনীতি নানা বিষয়ে এই সবজান্তা বন্ধুটির উৎসাহ আছে। শুধু শিবুই নয়, রবিবারের সকালে আড্ডা দিতে আরো অনেকেই আসে। কেউ আর শ্যামলীদের কথা তোলে না। ওদের বাড়ির অত বড় মুখরোচক ঘটনা, ওদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা সবই অতীতের, বহু কথিত জীর্ণ বস্তু। নতুন বিষয় আপনিই এসে পড়ে, পুরোন কাসুন্দি আপনিই চাপা পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্য সুব্রত নিজেই সব ভুলে গেল। কবে কোন মেয়ের সঙ্গে তার ক'টি কথা হয়েছিল, কবে ভদ্রতা করে তাকে লিফট দিয়েছিল সে চিত্র চিরজীবন চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখবার মত নয়। রাখতে চাইলেও রাখা যায় না।

তাই মা কাকীমা যখন বিয়ের জন্যে ফের পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, সুব্রত একসময় রাজিও হয়ে গেল। নন্দিতাও স্বচ্ছল ঘরের মেয়ে, দেখতে সুশ্রী, গ্রাজুয়েট। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে।

নিমন্ত্রণের চিঠি বিলি করবার সময় মা একবার বলেছিলেন, 'আচ্ছা ওদের কি একখানা চিঠি—'

সুব্রত মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ওদের মানে ?'

মা আরো অস্পষ্টভাবে, আরো দ্বিধাজড়িত গলায় বলেছিলেন, 'ওই ওদের কথা বলছি।'

সুব্রত ধমক দিয়ে বলেছিল, 'ছিঃ।'

তারপর কয়েকবার আর একটি মেয়ের কথা সুব্রতর মনে পড়েছিল। সম্বন্ধের কথা উঠবার পরেও একদিন বাস স্টপে শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল সুব্রতর। সেদিন আর ভালো করে তাকাতে পারেনি, কথাও বলেনি, শুধু সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু হেসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

শ্যামলীর সঙ্গে সুব্রতর সেই শেষ শুভদৃষ্টি।

তারপর প্রায় বছরখানেক বাদে সুব্রত একদিন আবিষ্কার করল শ্যামলী তার সঙ্গে একই বাসে অফিসে যাচ্ছে। চেনা মেয়ে, পরিচিত মেয়ে। সহজ সৌজন্যে সুব্রত হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু সে হাসির বিনিময় তো মিললই না—শ্যামলী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজের বোকা বোকা সেই হাসিটুকু নিয়ে সুব্রত যে কী করবে ভেবে পেল না। প্রথমেই ভয় হল তার সেই নিরর্থক হাসি পাছে বাসের প্যাসেঞ্জারদের আর কেউ দেখে থাকে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। সেই মূঢ় হাসিটুকু ঠোঁটের ওপর ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। তারপর আর ওর দিকে তাকিয়ে কোনদিন হাসেনি সুব্রত। হাসবার সাহস পায়নি এমন কি সরাসরি তাকাবার সাহসও তার নেই। কিসের একটা অপরাধবোধ তাকে ভিতরে ভিতরে দুর্বল করে দিয়েছে।

তবু চোখ দুটি সব সময় নিষেধ মানে না। আশ্চর্য নির্লজ্জতা। অপমানের ভয় নেই, সম্ভ্রম

হারাবার ভয় নেই দুটি লজ্জাহীন চোখের।

একখানি বিমুখ মুখের দিকেও তারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। তীব্রতায়, সংগ্রামে, সংঘাতে ও মুখ আরো এত সুন্দর হল কী করে!

শ্যামলী চাকরি করবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু এক দুর্ভেদ্য অদৃশ্য বর্ম নিজের চারিদিকে এঁটে নিয়েছে। কারো কোন চোখের দৃষ্টিই আর ওকে গিয়ে বিঁধবে না। সে দৃষ্টি সহানুভূতিরই হোক, অনুকম্পারই হোক, করুণারই হোক, কামনারই হোক। সুব্রতর একমাত্র সান্ত্বনা, ও শুধু তাকেই অস্বীকার করছে না, আশেপাশের কাউকেই কোন কিছুকেই স্বীকৃতি দেবার ওর গরজ নেই।

দেখেশুনে সুব্রত ভাবে, এই ক'বছরের মধ্যে কত বিচিত্র বিস্ময়কর বড় বড় ঘটনাই তো ঘটে গেল, এর পর ছোট একটু সামান্য কোন ঘটনা কি ঘটতে পারে না যাতে তাদের মধ্যে ফের সহজ প্রতিবেশীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেম নয়,ভালোবাসা নয়,এমন কি বন্ধুত্বও নয়। একই বাসে যেতে হলে দুটি পরিচিত নারী পুরুষের মধ্যে যে সাধারণ স্বীকৃতিটুকু দরকার ; শুধু সেইটুকু। যে মেয়ে জীবনযাত্রার সঙ্গিনী হতে পারত, সারাটা পথ তার সঙ্গে একই বাসে গিয়েও সে সহযাত্রিণী হয় না। সুব্রত চেষ্টা করেও তা করতে পারে না। নিজের এই ব্যর্থতায় সুব্রত কোনদিন ওর ওপর রাগ করে, কোনদিন বা নিজের ওপর। পর মুহূর্তে এই নিষ্ফল অসহায় আক্রোশের জন্যে তার লজ্জাও হয়। কোনদিন বা সুব্রত ভাবে যখন ওর সিঁথিতেও সিঁদুর উঠবে, স্বচ্ছল সংসারে সুস্থ সুন্দর স্বামীর ভালোবাসায় ধন্য হবে,সন্তানের মা হবে তখন—হয়তো তখন এই ঊষর ধূসর মরুভূমি ফের তার সেই শ্যামলী হয়ে উঠলেও উঠতে পারে।

রূপ লাগি

বছর খানেক ধরে চিঠিতে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ চলছিল শতদলের। কলকাতার মাসিক পত্রিকা 'পুষ্পিতা'র সহকারী সম্পাদক শতদল চক্রবর্তী। আলাপ হয়েছিল বসিরহাটের নিভাননী গার্লস স্কুলের বাংলার টিচার রমা মজুমদারের সঙ্গে। রমা শুধু ছাত্রীদের বিদ্যা দান করে না, কবিতাও লেখে। সেই কবিতা শতদল তার কাগজে ছেপেছিল এবং একটু প্রশংসাও করেছিল। সেই থেকেই চিঠিপত্র চলছে। রমা লিখেছিল এত উৎসাহ সে আর কারো কাছ থেকেই পায়নি! শতদলবাবু যে কবিতার প্রশংসা করেছেন, যে কবিতা সযত্নে ছেপেছেন, আজ রমার বলতে লজ্জা নেই সেই কবিতাটিই আরো অনেক কাগজ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শতদল জবাবে আরো সহানুভূতি আরো উৎসাহ জানিয়েছিল। লিখেছিল,'জীবনের পথ বড় বন্ধুর। এই পথে ধৈর্য নিয়ে অধ্যাবসায় নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বাধাবিপত্তি তো আছেই। কিন্তু তার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে কি আনন্দ নেই?' রমা লিখেছিল, 'আপনি তো ভারি চমৎকার চিঠি লেখেন। আপনি কবিতা লেখেন না কেন, গল্প উপন্যাস লেখেন না কেন?' শতদল জবাব দিয়েছিল, 'সবাই কি সব জিনিস লিখতে পারে? কেউ লেখে, কেউ বা সেই লেখার প্রুফ দেখে। কেউ বা হাজার হাজার লাখ লাখ পাঠকের জন্যে লিখতে পারে, কেউ বা চিঠিপত্রে শুধু একজনের কাছে নিজের সুখদুঃখের কথা বলে যায়। সংসারে লেখক তো এক রকম নয়।'

রমা এর জবাবে লিখেছিল, 'আপনি যতই বলুন, আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আপনি নিশ্চয়ই একজন প্রচ্ছন্ন লেখক। কোন ছদ্মনামে লিখছেন। না কি আগে লিখেছেন এখন আর লেখেন না? আপনি কোন দুঃখে লেখা ছেড়ে দিয়েছেন তাই বলুন? অনেক সময় দুঃখ তো মানুষকে লেখা ধরায়।'

এমনি করে সহানুভূতির খাতে পত্রধারা এগিয়ে চলেছিল।

মাসিক পত্রিকাটি একজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের। সম্পাদক হিসাবে তাঁর নামই ছাপা হয়। কিন্তু

কাজকর্ম দেখে শতদলই। পুষ্পিতা প্রকাশনীর কিছু পাবলিকেশনও আছে। সেই উপলক্ষে নানা লোকজন খাটে। প্রুফরীডার আছে তিন-চার জন। অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছে, ক্যাশিয়ার আছে, পার্টিশনের ওধারে উঁচু কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে দুজন সেলস্‌ম্যান বইপত্র বিক্রি করে। অফিসের সবাই জানে ব্যাপারটা। শতদলের সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ এই লেখালেখির কথা তুলে ঠাট্টা-তামাশাও করে।

ছোকরা প্রুফরীডার যতীন দত্ত বলে, 'শতদলবাবু, রমা মজুমদারের কবিতা দু'একমাস অন্তর অন্তরই কেন পুষ্পিতায় ছাপা হচ্ছে? তার একই মেয়েলী হাতের ঠিকানা লেখা নীল রঙের কেন অত পুরু-পুরু খাম আসছে আপনার নামে? দাঁড়ান বউদির কাছে গিয়ে সব ফাঁস করে দেব।'

বছর চল্লিশেক বয়স হয়েছে শতদলের। সংসারে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে তিনটি। শুধু পুষ্পিতার সহ-সম্পাদকগিরিতে সে সংসার চলে না। আরো অনেক কিছু করতে হয়। ফর্মা হিসাবে চুক্তিতে স্কুল-কলেজের নোট বই লেখে, বর্ষপঞ্জীতে এক বছরের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে। তাতে নাম থাকে না তবু দুটো পয়সা থাকে। টানাটানি কাড়াকাড়ির সংসারে পাঁচরকমের ঝামেলার মধ্যে সময় করে নিয়ে রমা মজুমদারকে মাসে দু'তিন খানা করে চিঠি লেখে শতদল। মন ভালো থাকলে কোন কোন মাসে চারখানাও হয়ে যায়। এই চিঠির মধ্যে যত তত্ত্ব যত কবিত্ব ঢেলে দেয় শতদল। অবশ্য একজন অনাত্মীয়া অপরিচিতা চিঠি লিখছে সেই হিসাবটুকু মনের মধ্যে রেখেই লেখে। এমন কোন কথা বা ইশারা-ইঙ্গিত থাকে না যাতে এসব চিঠিকে প্রেমপত্র বলে প্রমাণ করা যায়। কোনরকমের কিছু গোলমাল হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে সে ভয় শতদলের আছে। শতদল জানে এমন একটা বয়সে এসে সে পৌঁছেছে যখন উগ্র বাসনা-কামনাকে প্রীতি আর বন্ধুত্বের আচ্ছাদনে ঢেকে রাখতে হয়। বিধিনিষেধের দেয়াল ভাঙতে হলে যে শক্তির দরকার ততখানি মনের জোর শতদলের নেই। বেশী ঝুঁকি কি ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে জীবন থেকে যতটুকু রস আহরণ করা যায় শতদল তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করে।

তাছাড়া অন্যপক্ষও বেশ হুঁশিয়ার। রমা মজুমদারও তাকে লেখা শুরু করবার জন্যে উৎসাহ দেয়, সহানুভূতি ও সমবেদনা জানায় কিন্তু এমন কিছু লেখে না যাতে শতদল সেই প্রথম যৌবনের মত্ততা ফিরে পায়, যাতে বন্ধুত্বের গণ্ডি অতিক্রম করবার মত উদ্দীপনা পায় নিজের মধ্যে। তবু চিঠিপত্র চলে। শতদল নিজের ব্যক্তিগত সংসারের কথা চিঠির মধ্যে আনে না। তার যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, পারিবারিক জীবনের নানারকম সুখদুঃখ আছে, তার কিছুমাত্র উল্লেখ শতদলের চিঠিগুলিতে থাকে না, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের একটা বৃহৎ অংশকে লুকিয়ে রেখে সে চিঠির পর চিঠি লিখে যেতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক হয়েও তার চিঠিগুলিতে কিসের একটা স্বাদ জড়িয়ে থাকে। একজন মানুষের অনুচ্চ আশাআকাঙ্ক্ষা, তার ব্যর্থতা, তাই নিয়ে পরিমিত ক্ষোভ-দুঃখ-নৈরাশ্য, অনুগ্র অনুশোচনা, সব মিলিয়ে কিসের একটা মৃদু মিষ্টিগন্ধ চিঠিগুলির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকে। শতদল লেখে, 'কী যে হতে চেয়েছিলাম তাই ভালো করে জানিনে। কোন একটা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যে এঁটেবেঁধে চেষ্টা করেছি তাও নয়। তাই কাকে যে দোষ দেব ঠিক ভেবে পাইনে অথচ পুরোপুরি দোষটা নিজের ঘাড়ে নিতেও মন সরে না। যদি সেকেলে অদৃষ্টবাদী মানুষ হতাম, কোষ্ঠীর ওপর রাশিচক্রের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতাম। যদি সচেতন রাজনৈতিক কর্মী হতাম, সব দায়ভার চাপিয়ে দিতাম সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপরে। যদি উত্তরাধিকার তত্ত্বে পুরো আস্থা থাকত তাহলে আমি নিজে যা হয়েছি তার জন্যে বাপ-দাদা আর মা-দিদিমাকে নিন্দা করলেই নিষ্কৃতি পেতাম। যদি বিশ্বাস করতাম জন্মান্তরবাদের কর্মফলে তাহলে এই নিষ্ফল আত্মধিক্কারের কোন প্রয়োজন হত না। যে কোনকিছুতেই বিশ্বাস করে না, অথচ নিজের ওপরও যার আস্থা নেই, সে দাঁড়ায় কিসের ওপর বলুন তো! তার পায়ের নিচে তো মাটি থাকে না, থাকে জল। সেই জলের মধ্যে সে কখনো ডোবে, কখনো ভাসে, কখনো সাঁতরায়, কখনো কাতরায়। আমি তাই একেক মুহূর্তে একেক রকম। আমার চিঠিগুলি সেই ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তের প্রতিবিম্ব, সেই ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতির জলছবি।'

রমা মজুমদার এমন অস্পষ্ট ভাষায় চিঠি লেখে না। সেও নিজের কথাই লেখে। কিন্তু তার

দুঃখকষ্টের রূপ আর সেই সব কষ্টের মূল কারণ সে স্পষ্ট করে লিখতে পারে। রমা যে এম· এ-তে থার্ড ক্লাস পেয়েছে তার কারণ পরীক্ষার কিছু আগে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তবু সেকেন্ড ক্লাস পেত যদি একজন বদমেজাজের প্রফেসার একটা পেপারে তাকে একেবারে ডুবিয়ে না দিতেন। মাঝারি ধরনের একটা সেকেন্ড ক্লাস পেলে রমা নিশ্চয়ই প্রফেসরি পেত। কলকাতার আশেপাশে কলেজের তো অভাব নেই। বহু কলেজ তো তাদের উত্তরবঙ্গেও আছে। তাই যদি হত তাহলে তাকে আর মাস্টারি করতে হত না। চব্বিশ পরগনার এক অনগ্রসর মফস্বল শহরে কতকগুলি ক্ষুদ্রমনা মেয়েমাস্টারের সঙ্গে হস্টেলের নামে এক অন্ধকূপে বাস করতে হত না। এখানে সহজে কিছু হবার নয়, আত্ম বিকাশের সুযোগ কম। আর সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল মানুষের মন বড় ছোট। এখানকার আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে রমার। এই যে শতদলবাবু তাকে চিঠিপত্র লেখেন তা নিয়েও কত কথা হয়। কোন কোন চিঠি খোলা হয়, কোন কোন চিঠি মারা যায়। এমন বিশ্রী মন মেয়েদের। পুরুষরা বিশেষ করে পুরুষ কবি আর সাহিত্যিকরা মেয়েদের যত বেশী দেবী বলে জানে, যত লাবণ্য আর সুষমা দিয়ে তারা গড়া বলে কল্পনা করে, স্তবস্তুতিতে খাতার পর খাতা ভরে—মেয়েরা আসলে কিন্তু তা নয়। মেয়ে না হলে মেয়েদের চেনা যায় না। রমা তার সহকর্মীদের ভালো করে চিনেছে। একেকটি টিচার তো নয়, হিংসা-ঈর্ষা-পরশ্রীকাতরতার একেকটি পিপে। ওদের সঙ্গে রমার বনে না। প্রায় কারো সঙ্গেই তার প্রকৃতির মিল নেই, মেজাজের মিল নেই। তাই সে নিজের ঘরে নিজের মন নিয়ে থাকতে চায়। স্কুলের কাজে অনেক সময় যায়। ঝামেলা কিন্তু সেখানেই মেটে না। ছাত্রীদের রাশ রাশ খাতা বয়ে নিয়ে আসতে হয় বাড়িতে। ডেইলী টাস্কের খাতা, উইক্লী পরীক্ষার খাতা, দেখে দেখে প্রাণান্ত। হেডমিস্ট্রেস ভারি কড়া। নিত্য নতুন নিয়ম-কানুন জারি করতে ওস্তাদ। তাছাড়া তো আর কোন কাজ নেই তাঁর। এই সব বিড়ম্বনা সত্ত্বেও যদি একা একখানা ঘর পেত তাহলে বেঁচে যেত রমা। কিন্তু হস্টেলে ঘরের বড় অকুলান। একখানা ঘরে তিন-তিনটে করে সীট। এত ঠাসাঠাসি ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করতে কষ্ট হয় রমার। এভাবে তো সে থাকেনি। আর ভাগ্যক্রমে তার দুটি রুমমেট একেবারেই হস্টেলের সেরা। ওদের মধ্যে গভীরতা বলে কিছু নেই। রমাকে লিখতে দেখলেই বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। রমার নাম দিয়েছে ওরা—কবিনী। শতদলবাবুর চিঠিপত্র তার নামে আসে বলে ওরা তার আরো নাম দিয়েছে—শতদলবাসিনী, শতদলসুহাসিনী। কোন কোন সময় রমা নিজেও হাসে। তবে সব সময় তো ইয়ার্কি সহ্য হয় না। ওদের জ্বালায় লেখাপড়া করা অসম্ভব। ওরা নিজেরাও পড়াশুনো করে না, রমাকেও লিখতে-পড়তে দিতে চায় না। বড্ড জ্বালাতন করে মারে। শতদলবাবু হয়তো এসব ছোটখাটো উৎপাত-উপদ্রবকে গ্রাহ্য করেন না। রমা এসব কথা চিঠিতে বার বার করে লেখে বলে হয়তো বিরক্ত হন। কিন্তু মশা, ছারপোকা, পিঁপড়ে,এসব প্রাণী আকারে ছোট হলেও কম কষ্ট দেয় না। সময় সময় তারা প্রাণকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে। এমন কি মহৎ কোন আধ্যাত্মিক দুঃখের চেয়েও সে বেশী কষ্টদায়ক বলে মনে হয়। কথায় কথায় তার ছোট ছাত্রীদের মত তো আর রমা নিজের কলীগদের বিরুদ্ধে হেডমিস্ট্রেসের কাছে নালিশ করতে যেতে পারে না। মা-ঠাকুমার মত আকাশের দিকে চেয়ে 'হে ভগবান তুইই দেখিস' বলে শাপ-শাপান্তও করতে পারে না। ওদের উৎপাত-উপদ্রব সহ্য করে যেতে হয়। সব সময়েই কি আর নিঃশব্দে সহ্য করা যায়? এদের সঙ্গে থেকে থেকে নিজেও ছোট হয়ে যাচ্ছে রমা। ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি খিটিমিটি। একেক সময় তার নিজেরই লজ্জা হয়। শতদলবাবু কি তাকে এই ক্ষুদ্রতার গ্লানি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারেন না? কলকাতার মত বড় জায়গায় স্কুলে হোক অফিসে হোক রমা যদি একটা কাজকর্ম পায়, বেঁচে যায়। সেখানে কে তাকে চিঠি লিখল, সে কার কাছে চিঠি দিল এই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। সেখানে একজনের কাজে আর একজন নাক গলাতে আসবে না। সেখানে রমা নিজের মনে যতো খুশি লিখতে পারবে।

শতদল একবার জিজ্ঞাসা করেছিল রমার কে কে আছে। রমা কিন্তু কোন দিন একথা জিজ্ঞাসা করেনি। পুরুষ হয়ে শতদলই মেয়েলী কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিল একটি মেয়ের কাছে। সবাই আছে। বাবা-মা-ভাই-বোন সব। বাবা উকিল। অবস্থা সচ্ছল। ওখানে বাড়িঘর, বিষয়সম্পত্তি

আছে। তবু যে রমা তাদের কাছে না থেকে এত দূরে সামান্য চাকরি নিয়ে এসেছে, নানা রকম অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তার কারণ আছে বৈকি। রমা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। বাবা-মা তাকে খুবই ভালোবাসেন, সব সময় তার জন্যে চিন্তা করেন। কিন্তু বয়স বাড়লে অমন যে বাপ-মায়ের অনাবিল স্নেহ তাও কোন কোন সময় অত্যাচারের মতো হয়। ওঁরা অবশ্য সব সময়ই লিখছেন চলে এসো—তোমার চাকরির কোন দরকার নেই। কিন্তু তার সব দরকার-অদরকারের কথা তো এখন আর বাবা-মা বুঝতে পারেন না। তাঁরা যে বুঝতে পারেন না সেকথা তাঁরা স্বীকার পর্যন্ত করেন না। সেই হয়েছে আরো বিপদ। বাপ-মার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে দারুণ মতবিরোধ আছে বই কি রমার। সেকথা সে চিঠিতে লিখবে না। শতদলবাবুর সঙ্গে কোন দিন যদি দেখা-সাক্ষাৎ হয় তখন বলবে। তাছাড়া সেকথা শুনেই বা কী করবেন শতদলবাবু ? মানুষের সব গোপন কথা শুনতে নেই। সব দুঃখের ভার নিতে চাইতে নেই। যে দিতে যায় সেও বোকামি করে। রমা যতখানি পারে নিজের সেই ভার নিজেই বহন করে। যখন আর পারে না গোপনে গোপনে কাঁদে। যখন কেঁদেও কিছু হয় না তখন কবিতা লিখতে বসে। রমা জানে তার কবিতা দুর্বল, তার কবিতা সেকেলে। কিন্তু লিখে লিখে সে ভারমুক্ত হয়। যদি লিখতে না পারত তাহলে সে মরে যেত। কেঁদে কেঁদে কিছুতেই আর কূল পেত না।

চিঠি পড়তে পড়তে শতদল মেয়েটির মধ্যে কিসের যেন একটা রহস্যের সন্ধান পায়। যে-সব চিঠিতে অন্য টিচারদের নিন্দার কথা থাকে সে চিঠিগুলিকে শতদলের মনে হয় তুচ্ছ। তখন মেয়েটির একটি স্থূল বৈষয়িক রূপ শতদলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু রমা যখন তার অনির্দিষ্ট এক দুঃখের কথা, কাব্যের মধ্যে দুঃখমুক্তির স্বাদের কথা বলে তখন তার যেন রূপান্তর ঘটে। তখন তার ভাষাও বদলে যায়। শতদলের মনে হয় রমার এসব চিঠিকে একটু এডিট করে তার পুষ্পিতা কাগজে প্রকাশ পর্যন্ত করা চলে। রমার হাতের লেখাটি পর্যন্ত বেশ ভালো। লেখে নীলাভ পাতলা দামী প্যাডে সবুজ কালিতে। কবিতাও সে একই কাগজ-কালিতে লিখে পাঠায়।

চিঠি পড়ে পড়ে মেয়েটির চেহারা সম্বন্ধে শতদলের একটি বিশেষ ধারণা হয়ে গেল। মেয়েটির যে বিয়ে হয়নি তা তো ওর চিঠি পড়েই বোঝা যায়। বয়স-যে চব্বিশ-পঁচিশের কাছাকাছি তাও কোন্ বছর এম· এ· পাস করেছে রমা সেকথা জেনে নিয়ে শতদল হিসেব করে রেখেছে। তন্বী আর শ্যামা, শিখরদশনাও হতে পারে। মুখের ডৌলটি মিষ্টি, লম্বাটে গড়ন। দুটি চোখ বেশ বড় আর কালো, তাতে একটি প্রচ্ছন্ন বিষাদের নিবিড় ছায়া। রমার চিঠি পড়ে, এই ধরনের একটি আকার শতদলের মনের মধ্যে রূপ নিয়েছে।

শতদল ওকে আসতে লিখল, রমা ওকে যেতে লিখল। চিঠি পত্রে এতদিনের আলাপ, এবার দেখাসাক্ষাতের যথেষ্ট সময় হয়েছে। নিমন্ত্রণ আর প্রতিনিমন্ত্রণ চলল কিছুদিন ধরে। তারপর রমা একদিন নিজেই আসতে চাইল কলকাতায়। টালীগঞ্জে তার এক মাসীর বাড়ি আছে সেখানে এসে উঠবে। কলকাতায় এসে সাধারণত ওখানেই ওঠে। রমা আসবে বটে কিন্তু শতদলের অফিসে যাবে না। সেখানে লোকের বড় ভিড়। এক হাট লোক তার দিকে কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকাবে। সে বড় বিশ্রী লাগবে রমার। তাই শতদলবাবু যদি রমার জন্যে বাস-স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করেন তাহলে ভালো হয়। শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার সময় শতদলবাবু যেন ওখানে এসে দাঁড়ান। রমা ঠিক তাঁকে চিনে নিতে পারবে। শতদলবাবুও কি পারবেন না ! এতদিন চিঠি লেখালেখির পর যদি তারা একজন আর একজনকে চিনে নিতে না পারে তাহলে আলাপ করে লাভ কি হল ! ঘণ্টা দুই সময় হাতে থাকবে রমার। আশা করা যায় ওই সময়টুকু শতদলবাবুও দিতে পারবেন। বাস-স্ট্যান্ড থেকে তারা কাছাকাছি কোন চায়ের দোকানে যাবে। সেখানে বসে একটু গল্প করা যাবে। তারপর পার্কে কি আর কোথাও কোন নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসবে। রমা কিছু নতুন কবিতা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলি শোনাবে। এইটুকু অত্যাচার সহ্য করতেই হবে তাঁর। আর শতদলবাবু যদি কিছু লিখে নিয়ে আসেন, রমা তাঁর প্রতি চিরজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

পরিকল্পনাটা খুব ভালো লাগল শতদলের। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে সে সম্মতি জানাল। ভারি রোমাঞ্চকর মনে হল ব্যাপারটা। ঠিক যেন সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলি ফিরে এসেছে। যদিও

রমার সঙ্গে তার সেই ধরনের কোন রোমান্টিক সম্পর্ক নেই, রমা তার পত্র-বান্ধবী মাত্র, তবু ভিতরে ভিতরে কিসের যেন এক রোমাঞ্চ অনুভব করল শতদল। একটি নতুন মেয়ের মুখ দেখবে, নতুন একটি কণ্ঠস্বর শুনবে শতদল—এ যেন নতুন দেশ আবিষ্কারের মতই এক বৃহৎ তাৎপর্যময় ঘটনা।

শতদল যথা স্থানে যথা সময়ে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সারাদিনভর সে অযথা চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা ভোগ করেছে। বাস থেকে নেমে যাত্রীরা এদিক ওদিক চলে গেল। যাত্রিণী দু'তিন জন যা ছিল তাদের মাথায় আঁচল, কারো বা লম্বিত ঘোমটা। শতদল বুঝতে পারল এরা কেউ নয়। সব চেয়ে শেষে মণিপুরী থলি হাতে একটি মেয়ে নেমে এল। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। শতদলও তাই করছে। এরপর মেয়েটি আরো দু'এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি—।' শতদল একটুকাল শুধু চেয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ। আমিই। আপনি বুঝি—।'

রমা হেসে বলল, 'হ্যাঁ। আপনি—' রমা ফের একটু হাসল, 'আপনি অন্য সবারই দিকে তাকাচ্ছিলেন।'

শতদল সে কথা অস্বীকার করতে পারে না। পত্র-লেখিকার চেহারা সম্বন্ধে সে যা কল্পনা করেছিল এই রমা মজুমদারের সঙ্গে তার একেবারেই মিল নেই। বেঁটেখাটো চেহারা রমার। এই বয়সেই বেশ মুটিয়ে গেছে। রঙটা ফর্সা। কিন্তু চোখ-নাক-ঠোঁট-চিবুকে প্রকৃতি ওর ওপর বড়ই বিরূপ হয়েছেন।

শতদল বলল, 'চলুন।'

রমা বলল, 'কোথায় ?'

শতদল বলল, 'চলুন, আপাতত একটা চায়ের দোকানে। তারপর আপনি যেখানে যেতে চাইবেন যাওয়া যাবে।' চেষ্টা করেও কথায় একটু উত্তাপ আনতে পারল না শতদল।

রমা বলল, 'বাঃ রে, আমি যেতে চাইব কেন ? এসেছি আপনার এখানে। ক্ষণিকের না হোক ঘণ্টাখানেকের অতিথি। যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে যাব।'

খানিক দূর এগিয়ে শতদল ওকে নিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। বড় ভিড় দোকানে। লোক গিজ-গিজ করছে। কোন কেবিন খালি পাওয়া গেল না। বাইরের একটা টেবিলে বসতে হল খানিকক্ষণ।

রমা বলল, 'কলকাতায় আসব ভাবি। এসে এই ভিড় দেখলে সব উৎসাহ দমে যায়। কিন্তু হল কি আপনার ? আপনি যেন বড় গম্ভীর আর নির্লিপ্ত। চিঠির মানুষ আর আসল মানুষ এত আলাদা হবে ভাবিনি।'

শতদল অবাক হয়ে ভাবল—মেয়েটি তারই মনের কথা কেড়ে নিল কী করে।

মিনিট দশেক বাদে একটা কেবিন খালি হয়ে গেল। একটি সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে এক যুবক বেরিয়ে এল রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে। শতদল ভাবল মেয়েটি সেজেছে খুব। কিন্তু সেই আতিশয্য ওকে মানিয়ে গেছে। মানায়নি তার সঙ্গিনীকে।

ওরা ভিতরে গিয়ে বসল। ফাউল কাটলেটের অর্ডার দিল শতদল। রমার দিকে চেয়ে বলল, 'আর কিছু খাবেন ?'

রমা বলল, 'আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি মিছিমিছি কাটলেটের অর্ডার দিলেন।'

শতদল একটু আহত হয়ে বলল, 'কেন ?'

রমা বলল, 'খেতে তো আসিনি, এসেছি গল্প করতে। সেই গল্পই তো বন্ধ হয়ে গেল।'

শতদল বলল, 'বাঃ বন্ধ হবে কেন ? খেতে খেতে গল্প করব। গল্পের আগে কবিতা শুনব। নতুন কবিতা কিছু এনেছেন ? দিন, পড়ি।'

হাত পাতল শতদল।

রমা জবাব দেয়, 'এনেছিলাম। কিন্তু এখন ওসব থাক। পরে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।'

শতদল জানতে চায়, 'হল কি আপনার ? এমন করে নিভে গেলেন যে ?'

রমা একটু ম্লান হাসে, 'আমি তো নিভেই আছি।'

হঠাৎ ভারি মমতা হল শতদলের, ভারি লজ্জা হল নিজের ব্যবহারের জন্য। ছি-ছি মেয়েটি কি তার ঔদাসীন্য ও নৈরাশ্য ধরে ফেলেছে ? ও যদি কুরূপা হয়ে থাকে তাতে শতদলের কী ! সেও তো বিগত-যৌবন, প্রৌঢ়। সুদর্শন বলে দাবি করতে পারে না। তারও তো এরই মধ্যে সংসার চালাবার চিন্তায়-ভাবনায় কষ্টে-কৃচ্ছ্রতায় চুলে পাক ধরেছে, গালে ভাঙন। তাছাড়া রমার সঙ্গে তার তো নিতান্তই সাধারণ আলাপ-পরিচয়,বন্ধুত্বের সম্পর্ক। প্রণয়ও নয় পরিণয়ও নয়—রূপ যেখানে একটা বড় ফ্যাক্টর।

শতদল হঠাৎ বেশ সতেজ আর উঁচু গলায় বলে উঠল, 'আপনার গতবারের কবিতাটি কিন্তু চমৎকার হয়েছে। সবাই অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে আমাদের ওখানে। কিন্তু আপনার মধ্যে দুঃখ-বিলাস বড় বেশি।'

রমা এবার চোখ তুলে তাকাল, 'বিলাস ! বিলাস কেন বলছেন ?'

শতদল বলল, 'বিলাস ছাড়া কি। আপনার এই বয়সে এত দুঃখ কিসের !'

রমা বলল, 'আপনাকে তো আগেই লিখেছি, একজনের দুঃখ আর একজনকে পুরোপুরি বোঝানো যায় না। ছেলেবেলায় পড়েছেন তো, কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে—। কবিতা হিসাবে যাই হোক ভিতরকার কথাটা সত্যি।'

একটু চুপ করে থেকে শতদল প্রসঙ্গ বদলে নিলে, 'বাবার সঙ্গে আপনার ঝগড়া মিটল ?'

'ও ঝগড়া মিটবার নয়।'

শতদল বলল, 'কেন বলুন তো !'

'বাবা চান ধরে বেঁধে টাকার থলি সঙ্গে দিয়ে আমাকে কারো ঘাড়ে গছিয়ে দিতে। আমি তাতে রাজী নই। ওভাবে যে নেবে বাসি বিয়ের দিনই বোঝা ফেলে চম্পট দেবে। শুভরাতটি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।'

ওর কথার ভঙ্গীতে শতদল হাসল, 'অত ভয় কিসের ? গুণ তো আপনার কম নেই।'

রমা বলল, 'যদি কিছু থাকেও তা কি সহজে চোখে পড়বে ? চোখ বড় অদ্ভুত চীজ। অন্যের চোখকে দোষ দিয়ে কী হবে, আমার নিজের চোখ দুটোর জ্বালায় কি আমি কম অস্থির ?'

'কি রকম ?'

রমা বলল, 'এই চোখের জন্যে আমিও কম্প্রোমাইজ করতে পারিনে। আমিও তো তার পিছনে পিছনে ছুটি যার পিছনে ছোটা আমার একেবারেই উচিত নয়। আমিও তো কানা খোঁড়া অন্ধ, বেঁটে বুড়ো কাউকে বিয়ে করতে চাইনে।'

শতদল চুপ করে রইল। হঠাৎ কী যে বলবে ভেবে পেল না। শেষের দুটি শব্দ শেলের মত তার বুকে গিয়ে বিঁধেছে। রমা বলল, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন। যার কিছু নেই তারও দুটি চোখ আছে আর সেই চোখে ভরা আছে অনন্ত তৃষ্ণা।'

চোখ তুলে রমা তার দিকে তাকাল। শতদলের মনে হল দৃষ্টি যেন ভেজা-ভেজা। চোখ দুটি যে ছোট আর গোলাকার এই মুহূর্তে তা আর শতদলের চোখে পড়ল না।

রেস্টুরেন্টের কেবিনে কেবিনে হাসি। হৈ চৈ, কাঁটা চামচের শব্দ। একটি বেয়ারা চেঁচিয়ে উঠল, 'তিন নম্বর কেবিনে দুটো কারি, চার নম্বরে দুটো আমলেট !' কিন্তু সবচেয়ে ছোট সংকীর্ণ এই কোণের খুপরিটিতে দুটি অসমবয়সী, অসমঅবস্থার, অসমঅভিজ্ঞতার স্ত্রী-পুরুষ শুধু একটি মুহূর্তে একটি বিন্দুতে এসে সমদুঃখী হয়ে পৃথিবীর অপার রূপতৃষ্ণার কথা ভেবে স্তব্ধ হয়ে রইল।

পর্দা সরিয়ে খাবারের প্লেট হাতে রেস্টুরেন্টের বয় যতক্ষণ না ঘরে ঢুকল ওদের কোন খেয়ালই রইল না।

দুর্গ

অফিস ছুটির পর ললিতা আজ আবার সিনেমা হাউসটার সামনে এসে দাঁড়াল।

এখনো বেশ রোদ আছে বাইরে। গরমও কমেনি। আর কী লোকের ভীড়! কেন যে এই ভীড় ঠেলতে এল কে জানে। ললিতা কিন্তু আসতে চায়নি। যেন নিজের ইচ্ছায় আসেনি। কে যেন তাকে টেনে নিয়ে এসেছে।

আগেও এমন হ'ত। বেরোব না বেরোব না করতে করতে হঠাৎ যেন এক দমকা হাওয়ার ধাক্কায় ললিতা বেরিয়ে পড়ত, অচেনা অপরিচিত কতকগুলি ছায়া-মানুষের ভিতর থেকে একটি রক্তমাংসের মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়াতেন। তাঁর হাসি দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, মিষ্টি কণ্ঠ দিয়ে ললিতাকে তিনি অভ্যর্থনা করতেন। কিন্তু আজ তো আর তিনি নেই। ললিতা একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, না নেই। শুধু আজ নয়, অনেকদিন—মাস-ছয়েক হ'ল তিনি আর আসেন না। ললিতার এক মন বলে, তিনি আর কোনদিনই আসবেন না। আর এক মন বলে, আসবেন—আসবেন—আসবেন। একদিন যেমন তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, আরো একদিন তেমনি হবে।

হয় না। তবু ললিতা মাঝে মাঝে আসে। তিনি আসেন না, তবু ললিতাকে আসতে হয়।

টিকিটঘরের সামনে লাইন দিয়ে কয়েকজন লোক টিকিট কাটছে। ডাইনে-বাঁয়ে দু'তিনটি ছোট ছোট দঙ্গল। ফুটপাথের নিচে গাড়ির স্রোত, ফুটপাথের ওপরে মানুষের। দুজন ভদ্রলোক ললিতার গা ঘেঁষে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন। দুজনের চোখই ললিতার মুখের ওপর পড়ল। অবশ্য প'ড়ে স্থির হয়ে রইল না। সঙ্গে সঙ্গে সরেও গেল। তবু অস্বস্তিকর। অপরিচিত লোকের এই লুব্ধ কৌতূহলী চোখ আজও সহ্য করতে পারে না ললিতা। কিশোর হোক, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক কোনো মেয়েকে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই সবাই একবার করে তাকিয়ে নেবে। কী দেখে ওরা ললিতার মুখে? দেখে যে দেখবার মত কিছু নেই। নিজের অমত সত্ত্বেও বাবা কয়েকবার তার সম্বন্ধ এনেছিলেন। সেজেগুজে বরপক্ষের সামনে বসতেও হয়েছিল ললিতাকে। কিন্তু ফল একই রকম হয়েছে। তারাও দেখে গেছে ললিতা আর যাই হোক দ্রষ্টব্য নয়। বাবা অবশ্য তার গুণের লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। ললিতা বি· এ· পাস, সরকারী অফিসে চাকরি করে। অফিসাররা সবাই ওর সুখ্যাতি করেন। মা আর মাসিমা সার্টিফিকেট দেন ললিতা সংসারের সব কাজকর্ম জানে। রান্নাবান্নায় ওর হাত পাকা; ছোট ভাইবোনদের সেবাযত্ন তো ললিতাই করে। যারা দেখতে আসে তারা কান পেতে সব শুনে যায়। তাদের তখনকার চোখমুখ দেখলে মনে হয় ললিতার গুণ তাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তারপর আর কারো কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। একবার বুঝি কে একজন দুঃখ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কে একজন বুড়ো ভদ্রলোক। বোধ হয় ছেলের জ্যাঠা কি খুড়ো হবেন। লিখেছিলেন তাঁর খুবই মত ছিল কিন্তু—। তারপর থেকে আজ বছর-দুই হল ওসব উপসর্গ গেছে। কেউ আর আসে না। ললিতাও বেঁচেছে। অনর্থক ঝামেলা। আর মিছিমিছি জলখাবারের পয়সাগুলি নষ্ট। মিষ্টির দোকানে ধার-দেনা। এক টাকার সন্দেশ বাবা কোনদিন ছেলেমেয়েদের জন্য কিনে আনেন না, অথচ আগন্তুকরা এলে তাদের মিষ্টিমুখ করাতেই হয়।

আজ বছর-দুই হল ভদ্রতার দায় থেকে বেঁচেছে ললিতারা। শুধু মা-কে মাঝে মাঝে আফশোস করতে শোনা যায়, 'কী যে হ'ল মেয়ের। একটা সম্বন্ধও আজকাল আর আসে না। আসবে কি। যা শাঁকচুন্নীর মতো থাকিস দিনরাত। শরীরের যত্ন নিবিনে, সাজ নেই গোজ নেই, যেন সন্ন্যাসিনী। সাধ নেই, আহ্লাদ নেই, যেন ষাট বছরের বুড়ী। আর পেয়েছিস এক চাকরি! ওই চাকরি না ছাড়লে তোমার দেহ আর ভালো হবে না তা বলে দিলাম বাপু। ন'টা বাজতে-না-বাজতে ওই যে নাকে মুখে কতকগুলি গুঁজে বাসের ঝাঁকুনি খেতে-খেতে আপিস ছোটা—ও-সব কি মেয়েদের দেহে সয়? আপিস না ছাড়লে তোমার পেটের রোগও সারবে না, দেহও ভালো হবে না।' কড়ায় পুঁইশাক আর

কুচো চিংড়ির চচ্চড়িতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে মা উনুনের পিঠে বসে বকবক করতে থাকেন। ললিতা শোনে, হাসে আর অফিসের জন্যে তৈরি হয়। মা শরীর বলেন না, বলেন দেহ। শরীরের চেয়ে দেহ কথাটা ললিতারও বেশি প্রিয়। শরীর যেন স্বাস্থ্যরক্ষার বইয়ের শব্দ। শরীর পালন গো-পালনেরই তুল্য। কিন্তু দেহ কথাটা শুনলে সেই গানের কলিটি মনে পড়ে, 'দেহ হবে নন্দের পুরী।' প্যাশন আছে কথাটার মধ্যে। দেহ মানেই বাসনার আধার। ললিতা যদিও জানে তার দেহ নন্দের পুরীও নয়, আনন্দের পুরীও নয়। কোনোদিন হয়তো হবেও না। তবু দেহ তার ভালো লাগে। শুধু শব্দটিকে নয়, বস্তুটিকেও। আশ্চর্য, এই দেহই কিন্তু তার সমস্ত যন্ত্রণার মূল, কষ্টের মূল। দেহ যে শুধু তার অসুন্দর তাই নয়, দেহ তার রোগের ডিপো। এসিডিটির জন্যে শরীরের তার কিচ্ছু নেই। খেয়ে কিছু হজম করতে পারে না। খাওয়ার রুচিও চলে গেছে। কিন্তু খেলে পেটে আজকাল বড় যন্ত্রণা হয়। মজা এই, না খেলেও সেই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই মেলে না। আল্‌সার হয়েছে কি না কে জানে! বড় কষ্ট ললিতার এই দেহ নিয়ে। শুধু শরীরের কষ্টই নয়, মনেরও কষ্ট। সবাই তার দেহকে অপছন্দ করে বলে কষ্ট। রঙ কালো হলেও চোখমুখ তো দেখতে তার একেবারে খারাপ ছিল না। কিন্তু ব্যাধিতে সব গ্রাস করে নিয়েছে। কত বড় একগোছ চুল ছিল তার মাথায়। এখন বিনুনি করলে দেখায় টিকটিকির একটি লেজ। এই চব্বিশ বছর বয়সে কালব্যাধি তার বুককে পিষে একেবারে সমতল করে ফেলেছে। ললিতার ছোট বোনগুলি যাদের কৈশোর এখনো উতরোয়নি—সেই ইলা-নীলার দেহও কত পুষ্ট। অথচ ওরা যে ভালো খাবার-টাবার কিছু খায় তা তো নয়! ওরাও তো ডালভাত আর শাক-চচ্চড়ি খেয়ে বড় হচ্ছে। ললিতা চাকরিতে ঢুকবার পর থেকে একবেলা আজকাল মাছের মুখ দেখে। অফিসে তার কাজ হওয়ার পর সংসারের যে একটু সুবিধে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সবাই তা স্বীকার করে। নইলে বাবার শুধু মার্চেন্ট অফিসের চাকরিটুকুর ওপর নির্ভর করে থাকলে এ সংসার আগে চললেও এই দুর্মূল্যের বাজারে এখন আর চলত না। তার জন্যে বাবা-মা, দুটি বোন, দুটি ছোট ভাই, সবাই কৃতজ্ঞ। ওদের স্কুলের মাইনে ললিতা আজকাল আর বাকি পড়তে দেয় না। জামা আর প্যান্ট ছিঁড়ে যাবার আগেই কিনে দেয়। সেজন্যে ভারি খুশি রাসু আর বাসু। মা যতই বলুন, ললিতা শরীর পাত ক'রে চাকরি না করলে এ সংসার চলত না। যা এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে তা একেবারেই অচল হত। কী ভাগ্য যে ললিতার রূপ নেই, স্বাস্থ্যটি গেছে। গেছে বলেই বাবা মানসম্মান নিয়ে এখনো টিঁকে আছেন। ললিতা যদি পরের চাকরি না ক'রে পরের ঘর করতে যেত তাহলে এ সংসারের কী যে হাল হত ভাবা যায় না। তবু তো মা সাহস করে চাকরি ছাড়ার কথা বলেন, তবু তো বাবা ললিতার জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসেন। না, এ শুধু লোক-দেখানো ভালোমানুষিতা নয়।

কৃষ্ণচূড়া গাছটায় কী ফুলই না ফুটেছে! আশ্চর্য, ফুল দেখলে আজও মন যেন কি রকম হয়ে যায়। লাল রঙে অকারণে কিসের একটা উল্লাস আসে মনে। আসে আবার চলে যায়। দীপ জ্বলে ওঠে আবার নিভে যেতেও দেরি হয় না। তিনিও ফুল ভালোবাসতেন। ললিতাকে অনেকদিন ফুল কিনে দিয়েছেন। তাঁর মধ্যেও স্থূলতা আর সূক্ষ্মতার অদ্ভুত মিশেল ছিল। যিনি ফুল ভালোবাসতেন, ফুলের মতো কথা ভালোবাসতেন তাঁর মনেও স্থূল বাসনার অভাব ছিল না।

না, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। প্রত্যেকটি লোক একবার করে তাকে দেখে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখছে, কাছ থেকে দেখছে, আশপাশ থেকে দেখছে, কিন্তু কেউ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে না। ললিতা তা বেশ জানে। শুধু একজন দেখেছিলেন। মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলেন। সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলেন, নাকি মুগ্ধ হওয়ার ভান করেছিলেন, কে জানে!

বইয়ের স্টলটার কাছে একটি মেয়ে এতক্ষণ একা একা এ-বই সে-বই নাড়াচাড়া করছিল। এবার স্যুট-পরা একটি যুবক তার পাশে দাঁড়াতেই তারা চোখে চোখে তাকাল, রঙচঙে বইগুলিতে আর কোনো আগ্রহ রইল না মেয়েটির। সঙ্গীকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও। এতক্ষণ মেয়েটি অপেক্ষা করছিল। কেউ আসবে নিশ্চিত জানা থাকলে অপেক্ষা করতেও কী আনন্দ। ললিতাও এমন অপেক্ষা ক'রে দেখেছে, অপেক্ষা করতে দেখেছে। অবশ্য বেশিরভাগ তিনিই আগে আসতেন। দশ মিনিট পনেরো মিনিটও আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কোনোদিন ললিতার টিফিনের সময় সেই

ভরদুপুরে, কোনোদিন বা ছুটির পর। কোনো কোনো দিন ললিতার বেরোতে দেরি হয়ে যেত। হয়তো অফিসার আটকে দিতেন, কি চিত্রা পথ বন্ধ করে দাঁড়াত। হেসে বলত, 'কোথায় চলেছিস, রাই উন্মাদিনী।'

ললিতা জবাব দিত, 'যেখানেই যাই তোর কি। তোর মতো আমি তো রাজ্যের এরিয়ার ফেলে রেখে যাচ্ছিনে।'

চিত্রা বলত, 'বাব্বা, অহংকার দেখ মেয়ের! না হয় তোর হাতটা একটু তাড়াতাড়িই চলে। তাই বলে অমন করে মুখ চালাবি?'

মুখ চালাবার একটু অধিকার আছে বৈকি ললিতার। চিত্রার অনেক কাজ সে করে দেয়। একই টেবিলে মুখোমুখি বসে। কলমও চালায়, মুখও চালায়।

বাধা দিত চিত্রা, কিন্তু ললিতার যাওয়া বন্ধ ক'রে দিত না, কি সঙ্গে আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না। তা কেন করবে। ও-ও তো সব জানে, সবই বোঝে। ওর-ও তো একজন আছে। অনেকদিন ধরেই আছে, অনেকদিন ধরে—সারাজীবন ধরে থাকবে। বি· এ· ফেল করে এলে কি হবে, কাজে খাটো হলে কি হবে, চিত্রা দেখতে ভালো, ওর ভাগ্যও ভালো। শিগ্‌গিরই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে। চিত্রা নিজের মুখেই সে-কথা স্বীকার করেছে।

আসতে দেরি হলে ললিতা কৈফিয়ৎ দিত, 'হাতের কাজ না সেরে বেরোতে পারিনি। আপনাকে বোধ হয় অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

ভদ্রলোক হেসে বলতেন, 'কেউ আসবে জানলে আমি যুগ-যুগান্তর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।'

ললিতা বলত, 'এরই মধ্যে যুগযুগান্তর হয়ে গেল? দশ মিনিট তো মাত্র দেরি হয়েছে।'

তিনি বলতেন, 'দশ মিনিট কতগুলি সেকেন্ড হিসেব করে দেখুন। কত পল বিপল। আর একেকটি পলকে একেকটি প্রলয়।'

না, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। কার জন্যে বা দাঁড়াবে। দাঁড়িয়ে থাকতে পা ভেঙে আসে, ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয়। বেশি হাঁটতে পারে না ললিতা। কেউ সঙ্গে থাকলে কিন্তু পারা যায়। তখন রোদের মধ্যেও গায়ে রোদ লাগে না। আষাঢ়ে বৃষ্টিকেও মনে হয় পুষ্পবৃষ্টি। কিন্তু এখন তো ললিতার সঙ্গে আর কেউ নেই।

দাঁড়ানো নয়, ঘুরে বেড়ানো নয়, তার চেয়ে একটু বসা যাক।

'আসুন, একটু বসা যাক।'

কার যেন মৃদু মিষ্টি আমন্ত্রণ শুনতে পেল ললিতা।

একবার চমকে উঠে আশেপাশে তাকাল। না, কেউ নেই। কে আবার থাকবে। অনেকদিন আগে শোনা, অনেকদিন ধরে শোনা একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে ললিতা। বেশি দূরের অতীত তো নয়। সেই স্বর এখনো মনের কন্দরে কন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনের মধ্যে গুহা-গহ্বর কি কম আছে নাকি?

কয়েক পা হেঁটে রেস্টুরেন্টের ভিতরে গিয়ে ঢুকল ললিতা। বেশ সাজানো-গুছানো সুন্দর ঘরটি। বাইরের বড় টেবিলটায় কয়েকজন বসে গল্প করছে। বাঁ দিকে সারি সারি কেবিন। দরজায় সবুজ রঙের পর্দা। বয় এসে একটা খালি কেবিন তাকে দেখিয়ে দিল। অল্পবয়সী ছোকরা। মনে হ'ল ললিতাকে দেখে চিনেছে। একটু কি হাসল? নাকি ওর পাতলা দুটি ঠোঁটের গড়নই ওইরকম। চেনা অসম্ভব নয়। এই রেস্টুরেন্টে অনেকদিন এসেছে ললিতা। অসিতবাবুর সঙ্গেই এসেছে। প্রথম দিন তিনিই নিয়ে এসেছিলেন। আর শেষ দিন ললিতা তাঁকে ডেকে এনেছিল।

প্রথম দিন কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করেছিল ললিতা। বলেছিল, 'আবার এখানে কেন। আমি কিন্তু কিছু খাব না।'

অসিতবাবু বলেছিলেন, 'কেন? খেতে আপত্তি কিসের?'

ললিতা বলেছিল, 'আপত্তি আমার নয়, আমার দেহের।'

অসিতবাবু হেসেছিলেন, 'বাঃ, বেশ বলেছেন। মাঝে মাঝে দেহটাকে আলাদা বলেই মনে হয় বটে। আলাদা একটা উপসর্গ। কিন্তু আপনার দেহেরই বা এত আপত্তি কিসের।'

ললিতা বলেছিল, 'আর বলবেন না। খেয়ে কিছুই হজম করতে পারিনে। সহ্য হয় না।'

অসিতবাবু বলেছিলেন, 'বলেন কি! অথচ এই শরীরের নামই তো মহাশয়। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি তাকে ক্ষুদ্রাশয় ক'রে রেখেছেন। ভালো করে খেতে-পরতে দেন না।'

আশ্চর্য, প্রথম দিনেই অসিতবাবু এসব কথা বলেছিলেন। অবশ্য ঠিক প্রথম দিন নয়। এক হিসেবে দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ললিতার সহকর্মী যতীশ সেহানবীশ। অফিসে অসিতবাবু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মিঃ সেহানবীশ বলেছিলেন, 'আমার বন্ধু অসিত গুপ্ত। আর ইনি মিস্ চ্যাটার্জি। বেশ গুণী মেয়ে।'

অসিতবাবু বলেছিলেন, 'গুণী আর ভাগ্যবতীও।'

সেহানবীশ বলেছিলেন, 'ভাগ্যবতী কিসে?'

'বাঃ, ভাগ্যবতী নন? তোমার মতো একজন কলীগ পেয়েছেন। গুণের সমঝদার পাওয়া কি সোজা নাকি?'

ললিতা কোন কথা বলেনি। নিজের ফাইলে চোখ রেখেছিল। কিন্তু অফিসারের সাইড-নোটে মন ছিল না। কানও ছিল অন্যদিকে।

সেহানবীশ গলা নামিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি সবচেয়ে সেরা সমঝদার। তোমার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে না।'

মাত্র এইটুকু। এর চেয়ে বেশি কথা হয়নি। ললিতা তো প্রায় কোন কথা বলেইনি। তবু সপ্তাহখানেক বাদে ছুটির পর ফের যখন অসিতবাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি বেশ চিনতে পারলেন, হেসে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'এই যে, যতীশ আছে ভিতরে? না বেরিয়ে গেছে?'

ললিতা বলল, 'তিনি তো আজ আসেননি।'

অসিতবাবু বললেন, 'আসেইনি। তাহ'লে আর গিয়ে কী হবে।'

অসিতবাবু চলে গেলেন না। খুব যে হতাশ হয়েছেন তাও মনে হল না। ললিতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এসপ্ল্যানেডের দিকে এগোতে লাগলেন। চিত্রা সপ্তাহখানেক ছুটি নিয়ে মালদয় গেছে ওর মাসতুতো বোনের বিয়েতে। নইলে সেও সঙ্গে থাকত। অন্য মেয়েরা সঙ্গে না এলেও তারা যে লক্ষ্য করছে তা ললিতা বেশ বুঝতে পারছিল। তবু চট্ করে ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেনি। তিনি সেই সুযোগই দিলেন না।

একটু বাদে তিনি বললেন, 'কত নম্বরে যাবেন আপনি?'

ললিতা জবাব দিয়েছিল, 'চৌত্রিশ।'

'নর্থে থাকেন বুঝি? কোথায়?'

'দক্ষিণেশ্বর।'

তিনি হেসে বললেন, 'এখানে নর্থ মানে দক্ষিণ। সবই তো আপেক্ষিক। এখান থেকে যা উত্তর আরো উত্তর থেকে তা দক্ষিণ। আপনাকে কি বাসে তুলে দেব?'

ললিতা বলেছিল, 'আপনার কাজের ক্ষতি হবে না তো?'

'না, এখন আর কাজ কিসের?'

কিন্তু আরো কয়েক পা এগোতে-না-এগোতেই ভদ্রলোক মত পালটে ফেললেন, 'রথে উঠে বসবার আগে চলুন এককাপ চা খেয়ে যাওয়া যাক।'

চা যে সে খায় না, চা যে তার সহ্য হয় না, একথা ললিতা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল। কিন্তু আরো জোরে 'না' করতে পারেনি। আজ বুঝতে পারছে, পারলে কত ভালো ছিল।

পর্দা সরিয়ে সেই ছোকরা বয়টি এসে ঢুকেছে। ছাপানো মেনুটা সামনে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে কী দেব?'

ললিতা প্রথমে মাথা নেড়ে বলল, 'কিছু না।'

ছেলেটি একটু হেসে বলল, 'মানে, একটু পরে নেবেন? আচ্ছা।'

ও যে কী বুঝেছে, বোঝাতে চাইছে তা অনুমান করে ললিতা লজ্জিত বোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আচ্ছা, এক কাপ চা-ই দাও।'

'শুধু চা খাবেন ? চপ-কাটলেট, ফিশ-ফ্রাই—'

ললিতা মাথা নেড়ে বলল, 'শুধু চা।'

অসিতবাবুও আরো কিছু খাওয়াবার জন্য সেদিন সাধাসাধি করেছিলেন। 'যা হোক একটা কিছু নিন।'

ললিতা বলেছিল, 'না। আমার কিছুই সহ্য হয় না।'

অসিতবাবু বলেছিলেন, 'তাহ'লে আপনাকে তো শুধু শাস্তি দেওয়ার জন্যে টেনে আনলাম।'

'তা কেন। খাওয়াটাই কি সব নাকি ?'

'তা অবশ্য নয়। আসলে গল্প করাটা উদ্দেশ্য, খাওয়াটা তার উপায়। কিছু একটা সামনে নিয়ে না বসলে এরা আমাদের এখানে থাকতে দেবে কেন।'

অসিতবাবু দুটো ফাউল-কাটলেট আর দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন।

ললিতা ফের আপত্তি করল, 'আবার আমার জন্যে কেন।'

'নিন না। খেতে না পারেন ফেলে দেবেন।'

খাদ্য আর পানীয় দুই-ই এল। ভদ্রলোক যখন আনালেন একেবারে কী ফেলে দেওয়া যায় ? একটু একটু করে কথা বলতে বলতে, তার চেয়েও বেশি শুনতে শুনতে ললিতা তার শরীরের পক্ষে নিষিদ্ধ খাদ্য সবই খেয়ে ফেলল। খেতে কিন্তু ভারি চমৎকার লেগেছিল। ঈস্, কতদিন বাদে একটা কাটলেট খেল ললিতা ! কতদিন বাদে। খেয়ে কিন্তু সহ্য করতে পারেনি। রাত্রে টের পেয়েছিল মজা। কী যন্ত্রণা ! পেটের মধ্যে সে কী দুঃসহ যন্ত্রণা। শেষ পর্যন্ত বমি ক'রে ফেলে তবে শান্তি। সুখ যার কপালে নেই স্বস্তির চেয়ে বেশি কিছু তার চাওয়া উচিত নয়। কিন্তু মন কি সব সময় তা বোঝে ? রাশ টানলেই কি রাশ মানে ?

শুধু সেই একটি রাত্রির জন্যেই নয়, পর পর দু-তিন দিন সেই কাটলেটের প্রতিক্রিয়া ছিল ললিতার শরীরে। সারা দিনরাত অস্বস্তির আর শেষ নেই। যে দেহ শুধু যন্ত্রণাই দেয় তাকে একেকদিন নিজের হাতে শেষ ক'রে দিতে ইচ্ছা হয় ললিতার। দেহকে তখন মনে হয় বৈরী।

তার রকমসকম দেখে মা বলেছিলেন, 'হঠাৎ কী হল রে তোর ? কোনো অনিয়ম-টনিয়ম হয়েছে নাকি ? বাইরে কিছু খাসটাসনি তো ?'

ললিতা স্বীকার তো করেইনি বরং অস্বীকারের মাত্রা জোর গলায় চড়িয়ে দিয়েছিল, 'তোমরা ওইরকমই ভাব। কী খাই আমি ? এই যে সংসারে এত জিনিস আসে কোন্‌টা আমি মুখে দিই ? তোমাদের এত ঝাল-ঝোল-চচ্চড়ির কোন্‌টা আমার পাতে পড়ে ? সেই সেদ্ধ আর সেদ্ধ ! নিত্য, তিরিশ দিন রোচে মানুষের ?'

মা বলেছিলেন, 'কী করবি বল। যেমন তোর কপাল ! নইলে আমি তো সারাদিন রান্নাঘরেই কাটাই। ঠটিবটি যা-ই রাঁধি—পদে তো কম হয় না। শুধু তুই-ই কিছু খেতে পারিসনে। আমার অদেষ্ট।'

মার মুখ দেখলে মায়া হয় ললিতার। ওঁর শরীরও তো ভালো নয়। গরীবের সংসারে এতগুলি ছেলে মেয়ের ঝক্কি-ঝামেলা কি কম ? পাঁচজনে যা খায় তা ললিতা খেতে পারে না। মা তাই ওরই মধ্যে একটু আলাদা ব্যবস্থা করেন তার জন্যে। দুধ রেখে দেন আধসের ক'রে। ভাত আলাদা রান্না হয়। মাছের ঝোল হয় মশলা ছাড়া। পেঁপে, কাঁচকলা, মুলোর দিনে মুলো-ভাতে। অফিসে বেরোবার সময় টিফিনের কৌটোয় ছানা তৈরি ক'রে দেন কোনোদিন, কোনোদিন বা অন্য খাবার থাকে। বাবাও এত যত্ন পান না সংসারে। তাঁর কোনো টিফিনের কৌটো নেই। বলেন, 'ওসব আমার পোষায় না। আমি বাইরে যা হয় খেয়ে নিই।' কিন্তু সত্যি কিছু খান কিনা ললিতার সন্দেহ হয়। হয়তো এক কাপ চা কি পান-বিড়ির ওপর দিয়েই চালিয়ে দেন।

অসুস্থ শরীর নিয়ে চাকরি করে বলে ভাইবোনদেরও ভারি মমতা। অফিস থেকে বেরিয়ে এতখানি পথ বাসে আসতে আসতে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়ে ললিতা। সন্ধ্যার পর আর কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না। প্রায়ই এসে শুয়ে পড়ে। কোনোদিন বা বিছানায়, কোনোদিন বা পুরনো জরাজীর্ণ শস্তা ইজিচেয়ারটায়। ইলা নীলা যে যখন সময় পায় পরিচর্যার জন্যে ছুটে আসে। মাথা টিপে দেয়,

হাত-পা টিপে দেয়। গরমের দিনে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করে। ঘিঞ্জি গলির মধ্যে পুরনো বাড়ি। লাইট নেই, ফ্যান নেই। বিদ্যুতের কোনো ছোঁয়াই লাগেনি এদিকটায়।

সেবার শরীর খারাপ হওয়ার আসল কারণটা ইলা কিন্তু আন্দাজ করেছিল। গোপনে ফিসফিস করে বলেছিল, 'দিদি, তোর বমির মধ্যে মাংসের টুকরো দেখলাম যেন।'

'বাজে কথা।' বোনকে ধমক দিয়ে উঠেছিল ললিতা।

ইলা আর কোন কথা বলেনি।

তবু ওইটুকু পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত তো হয়েইছে, অনুতাপও কম হয়নি ললিতার। ছি ছি ছি, সত্যিই কাটলেটটা তার খাওয়া উচিত হয়নি। এমনিতেই ওষুধ-পথ্যের জন্যে কত টাকা ব্যয় করে ললিতা। ফুড আর টনিকের জন্যে হাতখরচের প্রায় সব টাকাই ব্যয় হয়ে যায়। টাকা থাকে না বলে সখ ক'রে একখানা ভালো শাড়ি পর্যন্ত কিনতে পারে না। সিনেমা দেখে না, থিয়েটার দেখে না। অবশ্য শুধু পয়সার অভাবে নয়, অতক্ষণ হলের মধ্যে বসে থাকলে শরীর খারাপ হয়, মাথা ধরে। তার শরীরে কোনো বিলাসিতাই সয় না, অথচ মন সবরকম সুখভোগের জন্যে লুব্ধ হয়। মন, তুমি কেন এই ভাঙা খাঁচায় এসে বাসা বাঁধলে!

বাবা বলেন, 'অসুখ-অসুখ একরকম বাতিক হয়ে গেছে তোর! মাসকয়েক ওসব ছেড়ে দে তো, ওষুধপথ্য। দেখবি, শরীর আপনিই ভালো হয়ে গেছে। শিশি-বোতলে বাড়ি ভরে ফেলেছিস, কিন্তু ফল তো কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।'

ধমক খেয়ে অভিমান হয়েছিল ললিতার। তার দেহের জ্বালা সে ছাড়া আর কে বুঝবে। আসলে কটা টাকা যে ওষুধের জন্য ব্যয় করে ললিতা, বাবা-মা তা ভালোর চোখে দেখেন না। একথা ওঁরা বুঝতে চান না নিজের হাত-খরচের টাকাটাই ব্যয় করে ললিতা। রোজগারের যে সামান্য অংশটুকু অন্য পাঁচরকম সাধ-আহ্লাদের জন্যে খরচ করতে পারত, শুধু সেইটুকুই নিজের দেহকে সুস্থ রাখবার জন্যে ব্যয় করে। বিদেহী হয়ে তো আর থাকতে পারবে না ললিতা। এই দেহ তার কারো চোখকে তৃপ্ত করতে পারে না, নিজেকেও কষ্ট দেয়। তবু একে পুষতে হয় ললিতার। জোড়াতালি লাগাতে হয়। চোয়াল বেরিয়ে আসা মুখে পাউডারের পাফ বুলাতে হয়। কোটরে-বসা চোখদুটিতেও কাজল পরাতে হয়। রঙীন শাড়ি-ব্লাউসে দেহের ক্ষীণতা বিবর্ণতা ঢেকে রাখতে হয়। নিজের দেহকে সময় সময় বড় ঘৃণা করে ললিতা, ভারি অপছন্দ করে। এই দেহ তার সব দুর্গতির মূল। তবু এরই চূড়ায় চূড়ায় সাধ-আহ্লাদের পতাকা উড়িয়ে রাখতে হয়। উপায় কি। এইদেহ তো কারো সঙ্গে বদলাবার উপায় নেই।

সেই নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়ে দিনকয়েক অসিতবাবু অদৃশ্য হয়ে রইলেন। কোথাও আর দেখাসাক্ষাৎ হল না।

ললিতা মনে মনে বলল, 'না হওয়াই ভালো। ভদ্রলোক বড় নাছোড়বান্দা। জোর ক'রে যা-তা খাইয়ে আমার শরীরটাকে আরো খারাপ ক'রে দিলেন। দেখা হলেও ওঁর সঙ্গে আমি আর কোথাও যাচ্ছিনে, শত অনুরোধ উপরোধেও না!'

কিন্তু একটি দেহের মধ্যে কি শুধু একটি মন বাস করে? একথা যে বলে সে হয় জেনে মিথ্যে কথা বলে, আর না হয় কিচ্ছু জানে না। ললিতা কারো কাছে স্বীকার করেনি, কিন্তু নিজে তো জেনেছিল তার মন কী বলছে, কী চাইছে।

কী যে চাইছে বুঝতে পারল ফের যখন দেখা হ'ল। এবার আর অফিসের সামনে নয়। একেবারে বাস-টার্মিনাসে। অফিস ছুটির পর।

ললিতা বিস্মিত হ'ল, হওয়া উচিত নয়, তবু খুসিও হ'ল। বলল, 'একি, আপনি যে এখানে?'

অসিতবাবু বললেন, 'কাজ ছিল একটু। শেষ ক'রে ভাবলাম একটা চান্স নেওয়া যাক।'

ললিতা বলল, 'কিসের চান্স?'

অসিতবাবু সরাসরি জবাব দিলেন না। হেসে বললেন, 'জানেন, খানিক আগে রাস্তার এক পামিস্টকে হাত দেখিয়েছিলাম। তিনি দেখে-টেখে বললেন, আমার এখন বৃহস্পতি তুঙ্গী। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমি খুসি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চার আনা দিলাম। তারপরেই আপনার সঙ্গে দেখা।

এমন হাতে হাতে ফল কখনও পাইনি।'

ভদ্রলোক বানিয়ে বানিয়ে কী কথাই না বলতে পারেন! কথাগুলি শুনতে কিন্তু বড় ভালো।

ললিতা বলল, 'আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন? আমি এই বাসটায় যাব।'

'উঁহু, ও বাসটায় আপনি যেতে পারবেন না। দেখুন না, এরই মধ্যে কেমন ভীড় হয়ে গেল। পরেরটায় যাবেন। তার দেরি আছে। ততক্ষণে চলুন কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক।'

ললিতা বলল, 'রক্ষে করুন। আর ওসব রেস্টুরেন্টে-টেস্টুরেন্টে যাব না! সেদিন সেই কাটলেট খেয়ে আমার যা অবস্থা!'

'খুব কষ্ট পেয়েছিলেন বুঝি?'

'তিনদিনের মধ্যে আর মাথা তুলতে পারিনি। তবু ওই নিয়ে অফিস করতে হয়েছে। ক্যাজুয়াল লীভ তো আর বেশি পাওনা নেই। আমার ছুটিগুলি এই অসুখে অসুখেই যায়। কোন আনন্দ-উৎসবের জন্যে যে ছুটি নেব তা আর হয় না।'

অসিতবাবু বললেন, 'সত্যি ভাবতে খারাপ লাগছে, আমার জন্যেই আপনাকে এবারকার কষ্টটা পেতে হ'ল।'

কথার মধ্যে যে এত সহানুভূতি ভরে দেওয়া যায় ললিতা যেন তা জানত না।

'আপনার অবশ্য দোষ নেই। খেয়েছি তো আমিই। তাছাড়া আপনি আমার দেহের কথা জানবেন কী করে?'

অসিতবাবু বললেন, 'সত্যি জানতাম না। আচ্ছা, আজ অন্য কোথাও চলুন। অন্য কিছু খাবেন।'

ললিতা বলল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। মিষ্টিটিষ্টিও আমি খেতে পারিনে। ভালো লাগে না। সহ্যও হয় না।'

অসিতবাবু হাঁটছিলেন আর কথা বলছিলেন। ললিতাও হাঁটছিল। কিন্তু ঠিক যেন মাটির ওপর দিয়ে নয়।

অসিতবাবু বললেন, 'বেশ, তাহলে আর একটা জিনিসের নাম করছি। তা খেলে আপনার কিছুতেই অসহ্য হবে না।'

'সেটা কী।'

'হাওয়া।'

'ওঃ, তাই বলুন।' ললিতা হেসে উঠেছিল।

পশ্চিমদিকে আরো খানিকক্ষণ এগোবার পরে একটা খালি ট্যাক্সি মিলল। এই ছুটির পর বিকেল সাড়ে পাঁচটা ছ'টায় এমন আরোহীহীন ট্যাক্সি দুর্লভ।

ললিতা ক্ষীণ প্রতিবাদে বলল, 'ওকি, গাড়ি কেন! কোথায় যাবেন? না না না, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে।'

তিনি হেসে বললেন, 'আমি কি বলছি ফিরতে হবে না?'

তাঁর সেই হাসিতে চোখের দৃষ্টিতে ললিতার অস্ফুট আপত্তি তলিয়ে গেল। একটু বাদে ললিতা দেখতে পেল গঙ্গার ধার দিয়ে তাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। আর সে এক ভদ্রলোকের পাশে বসে। যিনি আত্মীয় নন, বন্ধু নন, সদ্য পরিচিত মাত্র। সে পরিচয় অপরিচয়েরই সামিল। অপরিচয় ছাড়া কি। দুদিনের আলাপে সে তো ওঁর নাম ছাড়া আর কিছুই জানতে পারেনি। জানবার চেষ্টাও করেনি। কোথায় থাকেন, কী করেন, কে ওঁর আছে-না-আছে সব বৃত্তান্তই অজানা। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে সে কথা ললিতার মনেই হয়নি। একজন স্বাস্থ্যবান রুচিবান সদালাপী পুরুষের সে সাক্ষাৎ পেয়েছে সান্নিধ্য পেয়েছে, এই তো যথেষ্ট। এও তো সে আর কোথাও পায়নি।

পাশে বসলেও একটু দূরেই সরে বসেছিল ললিতা।

অসিতবাবু একসময় হেসে বললেন, 'মাঝখানে কি আপনি আর কারও জন্যে জায়গা রেখে দিয়েছেন? মাঝখানে আর কেউ নেই, এগিয়ে আসুন। নইলে গল্প জমে না।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ললিতা এগিয়ে এল। অসিতবাবু এগোলেন তার চেয়েও বেশি। মানে

গায়ে-গায়ে ছোঁয়া লাগতে লাগল। সে ছোঁয়া যেন লেগেই রইল। ট্রামে বাসে যাতায়াত করবার সময় অনেক পুরুষের অবাঞ্ছিত স্পর্শ ললিতাকে সহ্য করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে অসহ্যও লেগেছে। কিন্তু এ স্পর্শ তেমন নয়। স্পর্শ যে এত সুখ বয়ে বেড়ায় কে জানত।

খিদিরপুর ব্রীজ, আলিপুরের রাস্তা কিছুই ললিতার অচেনা নয়। কলেজে পড়বার সময় বারকয়েক তো এসেছে, চিত্রার সঙ্গেও কি দু'একবার বেড়িয়ে যায়নি ? তবু মনে হচ্ছিল কিছুই যেন পুরোপুরি চেনা নয়। সত্যিই যেন এক অলৌকিক রহস্যভরা অজানা পৃথিবীতে ললিতা এসে পড়েছে।

যেতে যেতে চোখে পড়ল দেয়াল-ঘেরা একটি ফুলের বাগান। দেয়ালটা জীর্ণ হয়ে গেছে। বাগানের ভিতরটা তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। বাড়তি গাছপালায় জংলা-জংলা ধরন। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা গাছে কী অজস্র বেগুনী ফুলই না ফুটে রয়েছে !

ললিতা বলেছিল, 'আহা দেখলেন না ! কী চমৎকার ফুলগুলি চলে গেল।'

অসিতবাবু বললেন, 'ফুল আপনি ভালোবাসেন ?'

ললিতা বলেছিল, 'আহা, ফুল কে না ভালোবাসে।'

সেইদিনই অসিতবাবু নিউ মার্কেট থেকে ফুল কিনে দিয়েছিলেন। এক ডজন রজনীগন্ধা আর একগুচ্ছ গোলাপ। কোনোটাই বেগুনী নয়। কিন্তু শাদা আর লাল রং-ও দেখতে কী সুন্দর !

ললিতা নিতে চায়নি। কিন্তু অসিতবাবু জোর ক'রে তার হাতে গুঁজে দিলেন।

ললিতা বলল, 'এবার আমি নেমে যাই। টার্মিনাসে গিয়ে বাস ধরব। কত রাত হয়ে গেল, দেখুন তো !'

অসিতবাবু বললেন, 'রাত কোথায় ! সবে তো সন্ধ্যা। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ললিতা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'না না, বাড়ি পর্যন্ত আপনাকে যেতে হবে না।'

অসিতবাবু একটু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, যে পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন সেই পর্যন্তই যাব।'

বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে ললিতা ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল। বলেছিল, 'ঈস্, কত ব্যয় হয়ে গেল আপনার।'

অসিতবাবু বলেছিলেন, 'হোক গিয়ে। সঞ্চয়ও তো কম হ'ল না !'

সঞ্চয়টা কিসের ভাবতে ভাবতে ললিতা বাড়ি ঢুকেছিল। অনেকগুলি টাকা ট্যাক্সি-ভাড়া দিলেন অসিতবাবু। দেওয়ার সময় একটু যেন হিসেব করলেন, এক টাকার নোটগুলি গুনে গুনে দিলেন। ফেরত খুচরো পয়সাগুলি গুনে নিলেন। ট্যাক্সিওয়ালাকে চার আনাও বকশিস দিলেন না। হয়তো ললিতাদের চেয়ে অবস্থা ভালো, কিন্তু বড়লোক যে নন তা ওঁর চালচলন দেখেই বোঝা যায়। বড়লোক হ'লে নিজের গাড়ি নিয়ে বেড়াতেন, ভাড়াটে ট্যাক্সিতে উঠতেন না। ভাড়াটা দেওয়ার সময় অত হিসেব করতেন না। অবস্থা ভালো হ'লে অমন শস্তা একটা ট্রাউজার আর পপলিনের শার্ট প'রে বেরোতেন না। ঘড়ির ব্যান্ডটা প্লাস্টিকের না হয়ে সোনার হত। আর হাতে কি দু'চারটে আংটি-টাংটি থাকত না ? ভদ্রলোক খুব যে বড়লোক নন তাতে বরং ললিতা খুসিই হয়েছিল। তিনি আর যাই হন নাগালের বাইরে নন।

তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে বাবা বললেন, 'এত রাত হল যে।'

মা বললেন, 'ওমা, এত ফুল কোত্থেকে পেলি ?'

ললিতা বলল, 'চিত্রাদের ওখানে গিয়েছিলাম, তারা দিয়েছে।'

মা বললেন, 'ওরা ফুলের বাগান করেছে নাকি ? যেখানেই যাও বাপু, অত রাত কোরো না। বলা নেই কওয়া নেই, আমি তো ভেবেই অস্থির।'

ফুলদানি একবার কিনেছিল ললিতা। বাসুর হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে যায়। আর কেনা হয়নি। দুটি কাঁচের গ্লাস ফুলদানি হ'ল। জলের মধ্যে ইলা ফুলগুলি রেখে দিতে দিতে বলল, 'কী সুন্দর ফুল, দিদি, আর কী চমৎকার ঘ্রাণ ! তুই যদি ওষুধ-টষুধ না এনে রোজ এমনি ফুল নিয়ে আসিস দিদি, তোর অসুখ আপনিই সেরে যাবে।'

ললিতা হেসে বলেছিল, 'ঈস, কী আমার লেডী ডাক্তার একখানা !'

লেডী ডাক্তার কিন্তু ঠিকই বলেছে। সেদিন ললিতার ক্লান্তি আসেনি, মাথা ধরেনি, শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করেনি। হাতে হাতে মার অনেক কাজ করে দিল ললিতা।

খেয়ে ওঠার পরেও কত গল্প আর গল্প। ভাইবোনেরা সব একঘরে শোয়। ইলা আর ললিতা থাকে এক বিছানায়। দুপুর রাত পর্যন্ত ইলার সঙ্গে গল্প ক'রে ক'রে কাটাল। আসল গল্পের ধার দিয়েও অবশ্য গেল না। কিন্তু যা বলল তাতেই যেন সেই অদৃশ্য গল্পের ছোঁয়া লেগে রইল। সেই অপরূপ আনন্দের স্পর্শ। খানিকবাদে ইলা ঘুমিয়ে পড়ল। ললিতা ঘুমোল না। ভাবতে লাগল কী এই বস্তু, কোত্থেকে এই অফুরন্ত আনন্দরস সে আহরণ ক'রে এনেছে। যে দেহ তার রোগের আধার, যন্ত্রণার মূল, সেই দেহই আজ কয়েক ঘন্টা ধরে উপভোগের উপকরণ জুগিয়েছে, সম্ভোগের সুখস্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে। একা সে কি পারত, যদি আর একজন এসে তার হাত না ধরত ?

হাত তিনি প্রথম দিন ধরেননি কিন্তু দুদিন পরে সত্যিই ধরে ছিলেন।

ললিতা বাধা দিতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার হাতের গড়নটুকু তো বেশ ভালো। সুখী ভাগ্যবতীর হাত।'

সম্বোধনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে ললিতা বাধা দিতে পারেনি। শুনিনি শুনিনি ক'রে এড়িয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া যে জ্যোতিষী সৌভাগ্যের কথা বলেন, তিনি কী বলে সম্বোধন করলেন, কে তা খেয়াল রাখে ?

ললিতা খুশি হয়ে বলেছিল, 'আপনি কি হাত দেখতে পারেন ?'

'পারি বইকি।'

'বলুন তো ভবিষ্যতে কী হবে।'

'আমি ভূত জানিনে, ভবিষ্যৎও জানিনে।'

'তবে কি জানেন ?'

'শুধু বর্তমান মুহূর্তটিকে।'

'কিন্তু মানুষকে তো ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়।'

'যারা পারে তারা ভাবে। যারা পারে তারা ভবিষ্যৎকে হাতের তালুতে দেখে না, হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে ধরে। নিজের হাতে গড়ে তোলে। আমি তা পারিনে। আমার আয়ু শুধু বর্তমানের নিশ্বাস বায়ুটুকুর মধ্যে।'

অনেক বিরুদ্ধ যুক্তি ছিল, তবু ললিতা সেদিন ঠিক সেই মুহূর্তে এই ক্ষণিকতাবাদের প্রতিবাদ করতে পারেনি। কথাগুলি বড় সুন্দর। ফুলের মতো মধুর আর মনোরম। তিনি সেই কথা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর অবশ্য শুধু কথা দিয়েই করেননি।

মাস দুই বাদে চিত্রা তাকে ধরে ফেলল! অফিস থেকে বেরোবার পথ আটকে দিয়ে বলল, 'শোন্, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'কী কথা।' অফিসের বাইরে এসে কার্জন পার্কের একটা নিরালা বেঞ্চে ব'সে চিত্রাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ললিতা।

চিত্রা বলেছিল, 'সাধ ক'রে কেন এমন সর্বনাশের পথে এগোচ্ছিস, বল তো ? মরবি যে।'

ললিতা সবই বুঝেছিল, তবু বলল, 'তুই কী বলছিস আমি বুঝতে পারছিনে।'

চিত্রা রুক্ষভাবে বলেছিল, 'সত্যিই তুই কিছু বুঝতে পারিসনি। তুই একটা বোকা। আর ওই লোকটা একটা ব্যাধ। পাক্কা শিকারী। কতজনের যে সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই। আমি আমাদের অফিসারের কাছে সব শুনেছি। তিনিই আমাকে ডেকে তোকে সাবধান করে দিতে বললেন। তুই তো একেবারে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিস। আর কোনো দিকে তোর লক্ষ্য নেই। কিন্তু তোর লক্ষ্য না থাকলে কী হবে, অফিসের অনেকেই তোকে লক্ষ্য করেছে। অফিসে একবার এসব বদনাম রটে গেলে কী যে হবে, ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।'

ললিতা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বলেছিল, 'যতীশবাবু কি ওঁকে জানেন ?'

'জানেন বৈকি। অনেকদিন ধরেই জানেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। তবু এই ব্যাধিটিকে তিনি পুষে রেখেছেন।'

ললিতা অস্ফুটস্বরে বলেছিল, 'ব্যাধি !'

ব্যাধ তাহলে নিজেও ব্যাধিগ্রস্ত। সেইজন্যেই কি ললিতাকে দেখে এমনভাবে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন ? যার দিকে আর কেউ ফিরেও তাকায় না, তাকে ফিরে ফিরে দেখেছেন ? এর মূলে তাহলে কি কোথাও কোন সুস্থতা নেই, সৌন্দর্য নেই ? এ কি ব্যাধির সঙ্গে ব্যাধির প্রেম ?

পরদিন খবর পেয়ে এই রেস্টুরেন্টে এসেই দেখা করেছিলেন অসিতবাবু। হেসে বলেছিলেন, 'কী ব্যাপার ?'

ললিতা হাসেনি, বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'তা তো মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

ললিতা বলেছিল, 'আপনার স্ত্রী আছে ? ছেলেমেয়ে আছে ?'

'আছে।'

'তাহলে বলেননি কেন ?'

'তাদের কথা তো ওঠেনি। তুমি নিজেও এড়িয়ে গেছ। তাছাড়া এক হিসেবে আমি তো সবই বলেছি।'

ললিতা তীব্র ভাষায় বলেছিল, 'কিচ্ছু বলেননি। আপনি একটি পয়লা নম্বরের লম্পট, বদমাস।'

অমন বাক্‌পটু মানুষও অনেকক্ষণের মধ্যে কোন কথা বলতে পারেননি। ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখখানা নিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। তারপর একটু হেসে বলেছিলেন, 'আমি হলে এসব কথা অন্য ভাষায় বলতাম।'

ভাষা ! ভাষাটাই যেন সব।

ললিতা বলেছিল, 'চুপ করুন। আপনি আর কোনো কথা বলবেন না। কোনো যোগাযোগ রাখবেন না আমার সঙ্গে।'

ভদ্রলোক ললিতার অনুশাসন একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনেছেন। আর দেখা হয়নি।

আশ্চর্য, জীবনে যদি-বা একটি ঘটনা ঘটল ললিতার, শেষ পর্যন্ত তা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু হতে পারল না। সারা জীবনে আর হয়তো কিছু ঘটবে না। ঢের শিক্ষা হয়ে গেছে ললিতার। আর কিছু সে ঘটতে দেবেও না। ওপরওয়ালার বকুনি খেতে খেতে অফিস করবে, ঝাঁকুনি খেতে খেতে বাসে করে ফিরবে। হাড়ভাঙা খাটুনির টাকা ব্যয় করে ওষুধ কিনবে, কিন্তু সে-ওষুধে রোগ সারবে না। ক্লান্ত হয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারটায় বসবে। কিন্তু সে-চেয়ারে সুখ পাবে না, স্বাচ্ছন্দ্য পাবে না। দেহ তার সব সুখের বাদী।

আশ্চর্য, তবু এই দেহই কিন্তু একদিন তাকে সব সুখ ধরে দিয়েছিল। আর একটি সুস্থ সবল সুন্দর দেহকে কাছে টেনে আনতে পেরেছিল। আজ বুঝতে পারছে তা প্রেম নয়, সে আকর্ষণ শুধু দেহজাত। তা প্রেম নয়, বন্ধুত্ব নয়, স্থূল এক বাসনার ছদ্মবেশ। তবু সেই বেশ কী মধুর ! তার দেহকে শুধু তা সাজিয়েই তোলেনি, সারিয়েও তুলেছিল।

'আপনাকে কি আর কিছু দেব ?'

রেস্টুরেন্টের বয় এসে দাঁড়াল।

এক কাপ চায়ে বোধ হয় এর চেয়ে বেশিক্ষণ এর কেবিনটিকে আটকে রাখা যায় না। কিন্তু চেয়ারটা ভারি নরম। আর জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। রাস্তায় বেরোলেই তো ভীড়ের মধ্যে পড়তে হবে। রাস্তায় ভীড় বাসে ভীড়। যাক আরো কিছুক্ষণ। ভীড়টা কমুক। বাড়িতে গেলেই তো গরমে পচে মরতে হবে। এখানে মাথার ওপর ফ্যান চলছে। ফ্যানের হাওয়াটুকু বেশ মিষ্টি। টেবিলের ওপর একটি ফুলদানিও আছে। কাগজের ফুল নয়, সত্যিকারের ফুল। বেগুনী রংটুকু বড় স্নিগ্ধ। দু'দিকে কাঠ, একদিকে দেয়াল, আর সামনে নীল পর্দা। এর আড়ালে বসে আরো কিছুক্ষণ ভাবতে পারে ললিতা। আরো খানিকক্ষণ ধরে নিজের দেহকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে।

'আপনাকে একটা কাট্‌লেট দিই তাহলে ?'

'দাও।'

ললিতা রাজী হওয়ায় বয় খুব খুশি।

হাসিমুখে বলল, 'কী দেব ? মাটন না ফাউল ?'
'ফাউল।'
একটি ভীত শঙ্কিত লজ্জিত উল্লসিত স্বর শুনতে পেল ললিতা। একি তার নিজের গলা ?
বয় চলে গেল।
ছি ছি ছি, একী করল সে ! ললিতার ইচ্ছা হল চেঁচিয়ে বলে—'না না না, আমার সহ্য হবে না। এনো না, এনো না।'
কিন্তু বলতে পারল না। পর্দাটা মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগল। অকারণে বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল।
সেই যুবকের দল এখনো বাইরের টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছে। অনেকগুলি কাঁটাচামচের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ললিতা। তারা খাচ্ছে, হাসছে, আর কথা বলছে। এরা কী হৈ-হৈ করতেই না ভালোবাসে।

বোধন

ছোট বোন দীপ্তির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাধনা ভেবেছিল বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কোন হোস্টেলে চলে যাবে। শুধু একার জন্যে পুরো বাড়িটা ভাড়া করে রাখার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া একা একটা বাড়ি আগলাবেই বা কে ? কিন্তু গীতা আর দীপ্তি দুজনেই আপত্তি করল, 'না দিদি ছেড়ে না। আমাদের বাপের বাড়ি বলতে তা হলে আর কিছু থাকবে না। তোমার হোস্টেলে গিয়ে আমরা তো এক রাতও কাটাতে পারব না, কিন্তু এ বাড়িটা থাকলে আমরা মাঝে মাঝে দু-চার দিন করে রেস্ট নিয়ে যেতে পারব।'
সাধনা বলেছিল, 'ইস, কত তোদের দরদ, বালিগঞ্জ ভবানীপুর ছেড়ে তোরা আসবি এই উল্টোডাঙ্গার ভাঙা বাড়িতে রেস্ট নিতে ? তোদের কি আর সেদিন আছে।'
গীতা বলল, 'না দিদি আসব। নিশ্চয়ই আসব। এ বাড়িতে বাবা ছিলেন, মা ছিলেন। তাঁরা চলে গেলে তুমি একা বাবা আর মা হয়ে আমাদের মানুষ করলে, বিয়ে-থা দিলে, এ বাড়ির সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের—'
সাধনা স্বীকার করল সে কথা। এ বাড়ির সঙ্গে তাদের অনেক সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে।
দীপ্তি বলল, 'তা ছাড়া রন্তু জার্মানী থেকে ফিরলে ওরও তো একটা দাঁড়াবার জায়গা—'
সাধনা হেসে বলল, 'কী যে বলিস তুই, জার্মানী ফেরত ইঞ্জিনিয়ারের এই সেকেলে গোয়ালঘরে উঠতে বয়ে গেছে। ও নিজেই তখন নতুন রাস্তায় নতুন বাড়ি করে নিতে পারবে।'
গীতা বলল, 'তা তো পারবেই। তখন তুমি সেই নূতন বাড়িতে উঠে যেও। তত দিন কষ্ট করে এই গোয়ালটা ভাড়া দিয়ে রাখ।'
রন্তু এই তিন বোনের একমাত্র ভাই। সবচেয়ে ছোট। কিন্তু সবচেয়ে কৃতী হয়েছে। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ওয়েস্ট জার্মানীর একটি নামকরা ফার্মে শিক্ষানবীশী নিয়ে চলে গেছে। ফিরতে আরও বছর দুয়েক বাকি। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট করে চাকরির টাকায় টুইশনের টাকায় তাকে পড়িয়েছে সাধনা। পরে তার স্কলারশিপের টাকারও খানিকটা সাহায্য পেয়েছে। চার বছর ধরে ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ চালাতে খুবই অবশ্য কষ্ট করতে হয়েছে সাধনাকে। রন্তুও কষ্ট করেই পড়েছে। একটি পয়সা বাজে ব্যয় করেনি। দিদির ওপর কোন ভাই-বোনেরই কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, সীমা নেই মায়ামমতার। শেষদিকে অবশ্য গীতাও তার স্বামীর পকেট থেকে তুলে কিছু কিছু দিয়েছে। কিন্তু সে টাকা তেমন খুশী মনে নিতে পারেনি সাধনা। কুটুম্বের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেওয়া কি ভালো ? চিরজীবনের জন্যে একটা খোঁটার ব্যাপার হয়ে থাকে।
কিন্তু গীতা যখন মুখ ভার করে বলেছে, 'তোমার মত বড় না হলেও আমিও তো রন্তুর দিদিই—'

তখন আর সাধনা ওর সাহায্য না নিয়ে পারেনি।

ভাই-বোনেদের মুখভার দেখতে পারে না সাধনা। তাদের মুখ কালো দেখলে তার বিশ্বসংসার আঁধার হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত বাড়িটি রেখেই দিল সাধনা। যদিও পুরনো একতলা বাড়ি, কিন্তু খানচারেক ঘর আছে। মাঝখানে উঠোন আছে, পিছনে বাগান করবার মত জায়গা আছে। বিকেলে কি জ্যোৎস্না রাত্রে আলিসায় বসে গল্প করবার মত ছাদ আছে। বাড়ির চারদিকে পাঁচিল। যদিও তা জীর্ণ হয়ে গেছে, তবু তার ধার ঘেঁষে যে কটি পেয়ারা আর কামরাঙা গাছ উপরে মাথা তুলেছে তা এখনও সতেজ সবুজ আর ফলবান।

সাধনার বাবা পঁচিশ বছর আগে মাত্র তিরিশ টাকায় এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। বাড়িওয়ালা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এতদিনে ষাটে তুলেছেন। কিন্তু সাধনা ছেড়ে দিলে এক্ষুণি এ বাড়ির দেড়শ টাকা ভাড়া হয়ে যাবে। বাড়িওয়ালা সেজন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। তিনি এ বাড়ি ভেঙে দোতলা করবেন, তিনতলা করবেন—অনেক রকম তাঁর পরিকল্পনা।

কিন্তু সাধনা বাড়ি ছাড়ল না। অনেককালের অনেক জিনিসপত্র জমেছে। এসব নিয়ে সে উঠবে কোথায়? বাক্স ডেস্ক খাট আলমারি। কোনটাই হয়তো তেমন মূল্যবান না। কিন্তু স্মৃতিরও তো মূল্য আছে।

তা ছাড়া গীতাও ছাড়তে দিল না। সে বলল, 'দিদি, তোমায় একা একা থাকতে হবে না। আমার পিসতুতো ননদ ছন্দা ঘর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে। আমার হাতে-পায়ে ধরে সে কি সাধাসাধি! দুখানা ঘর তাকে দিয়ে দাও, সে পুরো ষাট টাকাই তোমাকে দেবে। তাকে রসিদ দিতে হবে না। বাড়িওয়ালাকে বলবে আমাদের আত্মীয় এসে উঠেছে।'

সাধনা ভেবে দেখল কথাটা। জিজ্ঞেস করল, 'লোক কজন? শেষে আবার ঝামেলা-টামেলা বাড়বে না তো?'

গীতা বলল, 'না-না, ঝামেলা আবার কিসের? স্বামীটি শান্ত গোবেচারা গোছের। স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করেন। একটি বাচ্চা হয়েছে। ছেলে। বছর দুই-আড়াই হবে বুঝি বয়স। আর ছন্দার একটি দেওর আছে। দাদার গলগ্রহ। কিছুদিন থাকবে। তার পর চাকরি-বাকরি পেলেই চলে যাবে।'

গীতা গলা খাটো করে বলল, 'ছন্দার ইচ্ছা নয় একসঙ্গে থাকা। সেও ঝামেলা পছন্দ করে না।'

সাধনা আরো দু-তিন দিন ভাববার সময় নিল। শেষে অফিস থেকে এক দিন ফোনে বলল, 'আচ্ছা, আসতে বল তোর ননদকে। দেখ, তাদের আবার পছন্দ হয় কিনা।'

গীতা বলল, 'ইস, পছন্দ আবার হবে না। বর্তে যাবে!'

সাধনা ভেবে দেখল, কথাটা মন্দ নয়। একা একটা বাড়ি নিয়ে থাকা তার পক্ষে ঠিক হবে না। চোর-ডাকাত কি গুণ্ডা বদমাসের ভয় তার নেই, কলঙ্ক রটনার কথাও সে ভাবে না, পাড়ার সবাই তাকে চেনে। আড়ালে আবডালে ছেলেরা নাকি তার উদ্দেশ্যে কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বলে, 'উনি পুরুষের বাবা।'

সে জন্যে নয়। বোনেদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সাধনা নিজেই যেন কেমন বদলে গেছে। যেন আর কিছু করবার নেই, ভাববার নেই, সব ব্রত উদযাপন হয়ে গেছে। মনে মনে কিসের একটা শূন্যতা বোধ করে সাধনা যা কারো কাছে বলা যায় না। অথচ তার বাইরের জগৎ অফিসের কাজকর্ম তেমনি আছে। দায়িত্ব বেড়েছে ছাড়া কমেনি। অনেক নিশ্চিন্তভাবে সাধনা পড়াশুনা করতে পারে। কিন্তু তেমন যেন মন বসে না। অথচ বোনেদের বিয়ের জন্যে সাধনা নিজেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পাছে ওরাও তার মত চিরকৌমার্য বরণ করে নেয় তা নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না। সে চিন্তা গেছে। কিন্তু সেই নিশ্চিন্ততা এক গোপন নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গে করে নিয়েছে। নিজেদের ছোট্ট পরিবার আর অফিস-এর বাইরে সাধনার কোন জীবন ছিল না। মিশুক ধরনের মেয়ে নয় সে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গেই অন্তরের যোগ তার ঘনিষ্ঠ নয়। মেয়েদের সাধারণত মেয়েবন্ধু খুব থাকে। সাধনার তাও নেই। চল্লিশ পার হয়ে এসে নতুন করে সেই চেষ্টায় নামা বৃথা। বোনেরা অবশ্য মাঝে মাঝে আসে। আগের মতই হই-চই করে। তাদের শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে

টানাটানিও করে। কিন্তু সাধনা কোথাও গিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। গীতা আর দীপ্তি দুজনেই তাদের শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বুঝিয়ে দিয়েছে, 'দিদি ওই রকমই।'

ছন্দারা সত্যিই বর্তে গেল। বাড়ি দেখে যাওয়ার দু দিন বাদেই মালপত্র নিয়ে চলে এল ওরা। সরু গলির মধ্যে বাড়ি। গলিতে লরী ঢোকে না। বড় রাস্তায় লরী দাঁড় করিয়ে হাতে হাতে জিনিসপত্র ওরা নিয়ে এল।

সাধনা একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। ছন্দা দেখতে সুশ্রী। কিন্তু বড্ড ছোটখাটো চেহারা। ওর স্বামী সে তুলনায় মোটাসোটা। তেমন যেন মানায়নি। দেওরটি বেশ লম্বা। ছিপছিপে চেহারা। যেন তালপাতার সেপাই। তবে বেশ ফর্সা রঙ। নাখ-চোখ টানা টানা। মুখের ডৌলটুকু মিষ্টি। ঠোঁট দুটি পাতলা আর লাল। অনেকটা মেয়েদের মত।

সাধনা ওই এক দিনই দেখেছিল। তার পর আর তাকায়নি। ওদের ঘরদোর কলপায়খানা দেখিয়ে দিয়ে ফের নিজের কোটরে এসে ঢুকেছে। ছন্দাকে বলেছে, 'যখন যা দরকার হবে বলো। যদি কোন অসুবিধে-টসুবিধে হয় জানাতে লজ্জা করো না।'

ছন্দা জবাব দিয়েছে, 'আপনার কাছে আবার লজ্জা কি দিদি!'

বউটি অবশ্য মোটেই লাজুক ধরনের নয়। বেশ চটপটে। কোলে একটি বাচ্চা আছে। কাঁদলে তাকে খুব ধমকায়। মারেও। স্বামী-দেওরকেও ধমকাতে ছাড়ে না। সংসারের কাজকর্ম নিয়েও নিজেও যেমন সব সময় ব্যস্ত থাকে, দুটি পুরুষকেও তেমনি ব্যস্ত রাখতে চায়। অধীর অফিসে বেরিয়ে যায়। সারা দিনের মধ্যে তার আর নাগাল পায় না ছন্দা। কিন্তু দেওরটি তো হাতের কাছেই থাকে। তার ওপর ফাইফরমায়েস সব সময়েই চলে ছন্দার। সুধীর জল তোলে, বাজার করে, ছেলে রাখে। সংসারের আরো এটা ওটা করে দেয়। সাধনার ঠিকে ঝিটির সঙ্গেই ছন্দা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। সে দু-বেলা জল তুলে কয়লা ভেঙে উনুনের আঁচ দিয়ে বাটনা বেটে চলে যায়। কিন্তু আরো হাজার রকমের কাজ বাকি থাকে। সে সব সুধীর করে। একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ছন্দা বেশ বকে।

মাঝে মাঝে সাধনার কেমন যেন অসহ্য লাগে। বয়স অন্তত বাইশ-তেইশ বছরের কম হবে না। জোয়ান ছেলে। হলই বা বেকার, তবু কি ওর মধ্যে এতটুকু পৌরুষ নেই? তেজ নেই? বীর্য নেই? মাঝে মাঝে একটু-আধটু প্রতিবাদ করলেও তো পারে! কিন্তু সেটুকুও যেন শক্তি নেই ছেলেটির।

তা নেই ঠিকই, কিন্তু অদ্ভুত এক ধরনের কৌতূহল আছে। যখনই একটু সময় পায় সুধীর, দূর থেকে সাধনাকে লক্ষ্য করে। তার চলাফেরা অফিসে বেরোনো অফিস থেকে আসা ছেলেটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। প্রথম প্রথম একটু-আধটু অস্বস্তি বোধ করত সাধনা। কিন্তু পরে বুঝল, ওর দৃষ্টিতে আর কিছু নেই—শুধু শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর বিস্ময়। অফিসেও এমন অনেক যুবকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে সাধনা।

এক দিন সুধীর এসে নিজেই আলাপ করল। সাধনা বাজারে বেরোচ্ছিল। কাছেই ছোট বাজার। নিজের দৈনন্দিন বাজার সে নিজেই করে।

সুধীর এসে বলল, 'থলিটা দিন না আমাকে!'

সাধনা বলল, 'কেন?'

সুধীর বলল, 'আমি তো রোজই বাজারে যাই। আপনার তো বেশি কিছু আসে না। আমিও এনে দিতে পারি।'

সাধনা হেসে বলে, 'না-না, তার দরকার নেই। আমার এসব অভ্যাস আছে।'

ছন্দাও অবশ্য কদিন বলেছে, 'আপনি কেন অত কষ্ট করেন সাধনাদি, বাজারের টাকা সুধীরের কাছে যদি দিয়ে দেন, ওই তো এনে দিতে পারে। এর জন্যে তো ওকে দুবার যেতে হয় না!'

সাধনা জানে ওকে বহুবার বাজারে ছুটতে হয়।

হেসে এড়িয়ে যায় সাধনা, 'কী দরকার, আমি নিজেই তো পারি। আগেও তো নিজেই সব করতাম।'

পারতপক্ষে কারো সাহায্য নিতে চায় না সাধনা। ছোট ব্যাপারেই হোক আর বড় কাজেই হোক, আত্মনির্ভরতা তার আবাল্যের অভ্যাস। কারো কাছ থেকে সহজে কিছু নেব না, এমন একটু অহঙ্কারও আছে।

কিন্তু সুধীর যেন সেবা করবার জন্যে, সাহায্য করবার জন্যে উৎসুক হয়েই রয়েছে।

ছুটির দিনে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে সাধনা বই পড়ছে, সুধীর এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল।

প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল সাধনা, পড়ায় ব্যাঘাত হওয়ায় বিরক্তও হয়েছিল, কিন্তু সেটুকু চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

সুধীর একটু লজ্জিত হয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনার ঘরের পিছনটা জংলা হয়ে আছে, পরিষ্কার করে দেব?'

সাধনা হঠাৎ বলে ফেলল, 'দাও না!'

তার পর তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তোমার নিজেরই তো কত কাজ! আচ্ছা আমিই একদিন পরিষ্কার করে নেব, কী দরকার তোমার কষ্ট করে?'

মনে পড়ল বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে আগে সাধনার বেশ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আজকাল আর তেমন যেন উৎসাহ নেই। কেমন যেন চুপচাপ এক কোণে পড়ে থাকতে ভালো লাগে। ভালো কি লাগে? না, তাও ঠিক লাগে না। কিন্তু ভালোই লাগুক আর মন্দই লাগুক, জীবনকে মেনে নিতে হয়, জীবনকে সহ্য করতে হয়। বিশেষ করে যে জীবন তার নিজের পছন্দমত তৈরী করা, তাকে ভালো না লাগলে, ভালো না বাসালে তাতে নিজেরই পরাজয়।

সেই যে সুধীরকে একবার অনুমতি দিয়ে ফেলেছে সাধনা, ফিরিয়ে নিলেও ও আর তা নিতে পারল না।

সুধীর সাধনার ঘরগুলির পিছনে আনাচে-কানাচে যেসব ঘাস জন্মেছিল সেগুলি পরিষ্কার করে ফেলল। নিজেরা যেদিকে থাকে সে দিকটাও পরিচ্ছন্ন করল। শুধু তাই নয়, কোত্থেকে দুটি ফুলের টব এনে রাখল সাধনার ঘরের সামনে। সবুজ চারায় দুটি একটি করে বেলের কুঁড়ি ধরেছে।

দেখে অবশ্য সাধনা খুশী হল। ফুল দেখলে কে না খুশী হয়! কিন্তু মুখে রাগ দেখিয়ে বলল, 'না-না, এসব কি? এসব তুমি কিনতে গেলে! কত খরচ করেছ তাই বল!'

কিন্তু সুধীর কিছুতেই সে কথা বলবে না। তার সামান্যই খরচ হয়েছে। দাদা তো তাকে হাতখরচ দেয়, সেই টাকা থেকে করেছে। এতে সাধনাদি অত রাগ করছেন কেন? ফুল তো সারা বাড়িরই শোভা!

সাধনা আর কিছু বলল না। এর বদলে ওকে কী দেওয়া যায় কয়েক মিনিট ভাবল। ভাবল একটা জামাটামা কিনে দিলে হয়। খানিক বাদে সে কথা আর মনে রইল না।

দিনকয়েক বাদে সুধীর নিজেই এল উপযাচক হয়ে। অনুরোধ সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকল না। দোরের বাইরে থেকেই আবেদন নিবেদনের পালা চলল।

'আপনি বুঝি অডিট অফিসে কাজ করেন, না সাধনাদি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ওখানকার অফিসার?'

সাধনা হেসে বলল, 'ওই রকমই একটা কিছু। কেন বল তো?'

সুধীর তবু সরাসরি বলতে পারে না। খানিকক্ষণ মুখ নীচু করে রইল। দেয়ালের চুন খুঁটল। তার পর ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা ওখানে কি কোন কাজটাজ খালি আছে?'

'কি রকমের কাজ?'

'এই ক্ল্যারিক্যাল কাজের কথাই বলছিলাম।'

'তোমার জন্যে?'

সুধীর কোন জবাব দিল না।

সাধনা বলল, 'কিছু মনে করো না। তুমি পড়াশুনা কোন্ পর্যন্ত করেছিলে?'

সুধীর বলল, 'আই-এ পর্যন্ত।'

সাধনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা হলেই বড় মুশকিল। আমাদের অফিসে গ্র্যাজুয়েটের কমে আজকাল আর—, তা ছাড়া খালিটালিও নেই।'

সুধীর যেন পালাতে পারলে বাঁচে, 'আচ্ছা, সাধনাদি, আমি তবে এখন যাই, পরে আসব।'

সাধনা বলল, 'আচ্ছা এস।' তারপর একটু মৌখিক ভরসা দিয়ে বলল, 'দেখব আমি।'

সুধীর চলে গেলে সাধনা মনে মনে হাসল। এই জন্যেই কি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা, এত সেবা-শুশ্রূষার আগ্রহ? ছেলেটিকে দেখলে মায়া হয়। কিন্তু জীবনে কোন দিন যে ও কিছু করতে পারবে তেমন ভরসা হয় না।

বউদির সংসারের কাজে যোগান দিয়ে মাঝে মাঝে সুধীর চাকরির চেষ্টায় বেরোয়। কোত্থেকে, ঘুরে ঘুরে প্রায়ই ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

সাধনা ভাবে একেক দিন বলে, 'এর চেয়ে একটা বুকস্টল টুকস্টল দিয়ে বসে যাও। কি সাইকেল কিনে নিয়ে কাগজের চাকরি কর। তাতেও কিছু হবে। কিন্তু ওই বিদ্যেবুদ্ধিতে অফিসের চাকরি খোঁজা মানে সোনার হরিণের পিছনে পিছনে ছোটা।'

কিন্তু সাধনা ওকে কিছু বলে না। যার জন্যে কিছু করা যাবে না তাকে আঘাত দিয়ে লাভ কি? ব্যবসা বাণিজ্যের উপদেশ দেওয়াও বৃথা। তাতে মূলধন লাগে। সে টাকা ও পাবে কোথায়? টাকা যদি বা জোটে, দোকানপাট চালাবার মত বুদ্ধি কি ওর ঘটে আছে?

সেদিনকার মত পালিয়ে গেলেও সুধীর একেবারে পালায় না। আবার আসে। আবার সাধনার সেবা করতে চায়। কোন না কোন কাজে লাগতে চায়। কিন্তু সাধনা যে ওকে কী কাজ দেবে ভেবে পায় না।

সুধীর এক দিন নিজেই জোর করে সাধনার ময়লা শাড়িগুলি লন্ড্রিতে দিয়ে এল। রিসিট চেয়ে নিয়ে আগের দেওয়া শাড়িও নিয়ে এল।

সাধনা ভাবল ওকে একটা সস্তা ট্রাউজার আব সার্ট কিনে দিতে হবে। কিন্তু নানা কাজকর্মের চাপে ফের কথাটি ভুলে গেল।

সুধীরের মত ছেলের কথা বেশিক্ষণ মনে রাখা যায় না। অবশ্য এ ধরনেব কিছু কিছু ছেলেকে অফিসেও দেখেছে সাধনা। তারা কোন কাজের নয়।

সাধনার সেকসনেও এ ধরনের ছেলে আছে। তাদেব দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, ভয়ও করে। চেহারায়, গলার স্বরে, স্বভাবেও কেমন একটা দৃঢ়তা রূঢ়তা হয়তো এসেছে সাধনার। তার জন্যে সে লজ্জিত নয়। প্রত্যেক মেয়েই ললিতে কঠোরে বিপরীত। আর নারীই হোক পরুষই হোক, যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোন জনসমষ্টিকে চালনা করে, তাড়না করে, শাসন করে, কিছুটা কঠিন তাকে হতেই হয়।

কিন্তু বাইরে তার আচার-আচরণ যত কঠিনই হোক, ভিতরে ভিতরে একটি কোমল হৃদয়েরও যে সে অধিকারিণী তা সহকর্মীরা জানে। কাজে ভুলচুক কি গাফিলতির জন্যে যে মেয়েকে কড়া বকুনি দেয় সাধনা, খানিক বাদে কি বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা বাদে তাকে ডেকে হেসে দুটি মিষ্টি কথা বলে, বেশি আলাপ পরিচয় থাকলে হয়তো গালটাও টিপে দেয়, নববিবাহিতা হলে স্বামীর প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে, কিন্তু কাজটি আদায় করে নিতে ভোলে না। ছেলেদের সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। সাধনার চোখে ছেলে আর মেয়েতে তফাৎ নেই। মেয়েদের সে বলে, 'তোমরা অফিসের শোভা বাড়াতে এসেছ, কাজ করতে আসনি—ছেলেদের দেওয়া এই দুর্নাম তোমাদের দূর করতে হবে।'

মেয়েরা বলে, 'আসলে সাধনাদির আমাদের জন্যেই বেশি চিন্তা। আপনি আমাদেরই দলে।'

সাধনা বলে, 'তোমাদের নয়তো কাদের? আমার কি গোঁফদাড়ি গজিয়েছে?'

অফিসে একটা কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি আছে। সাধনা আছে তার একজিকিউটিভে। কোন কোন বছর সেক্রেটারীও হয়। তখন দেখা যায় অপাত্রে অযোগ্য পাত্রে সেক্রেটারীর কী অগাধ

মমতা ! যে বার বার কিস্তি খেলাপ করেছে, তাকেও সাধনা লোন দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করে। বলে, 'দিয়ে দাও হে টাকাটা, ওর বউটা নাকি মরমর ! এই বয়সে বউ মরলে ফের কি আর ভদ্রলোক বিয়ে করতে পারবেন ?'

শুধু অসুস্থ স্ত্রীর স্বামীর ওপর নয়, অনূঢ়া মেয়ের বাপের ওপরও সাধনার সমান সহানুভূতি।

মানুষের অভাব যে কী বস্তু তা তো সে হাড়েহাড়েই জানে। অপ্রবাসী হলে অঋণী থাকা যে অনেক গৃহস্থের পক্ষেই অসম্ভব, তাতে তাদের দিন চলা ভার, সে কথাও সাধনার অজানা নয়। এখনো সব ঋণ সে শোধ দিতে পারেনি। সব দায় থেকে মুক্তি পেতে এখনো অনেক দেরি আছে সাধনার।

অফিসে যায়, কাজকর্ম সেরে অফিস থেকে প্রায় রোজই সরাসরি বাড়ি ফিরে আসে। অকারণে বাইরে টো-টো করে ঘুরবার ও আড্ডা দেবার তার অভ্যাস নেই। বাড়িতেও যে আজকাল বিশেষ কোন আকর্ষণ আছে তা নয়। তবু বাড়িতেই চলে আসে। তালা খুলে নিজের ঘরখানার মধ্যে ঢোকে। অফিসের শাড়িটাড়ি ছাড়ে। মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করে। নিজের জন্যে স্টোভে চা আর খাবার তৈরি করে নেয়। তার পর হয়তো খানিকটা সময় বই পড়ে, খানিকটা সময় বোনে। কিছুক্ষণ জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। সামনে সারি সারি বাড়ি। চোখ বেশি দূর যাবার পথ পায় না। সময়টা অবশ্য কেটেই যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তেমন ভালোভাবে কাটল না। বড় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। নিজেই নিজের জীবনকে বড় একঘেয়ে করে ফেলেছে সাধনা। এখন জীবনে কিছু ঘটনা ঘটা দরকার, পরিবর্তন দরকার। কিন্তু পরিবর্তন তো চাইলেই আসে না। ঘটনা তো আর ইচ্ছা করলেই ঘটানো যায় না !

মাঝে মাঝে সিনেমা-টিনেমায় গিয়ে দেখেছে সাধনা, আগের মত আর ভালো লাগে না। মনে হয় উঠে আসতে পারলেই বাঁচে। গীতা আর দীপ্তি মাঝে মাঝে এসে অনুযোগ দেয়, 'তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ দিদি !'

সাধনা স্বীকার করে না, বলে, 'যাঃ, কেমন আবার হব ? আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।'

গীতা বলে, 'এর চেয়ে দিদি তুমি একটা বিয়ে কর।'

সাধনা হেসে বলে, 'হ্যাঁ, চল্লিশ বছর বয়সে ওইটাই এখন বাকি, দে পাত্র-টাত্র খুঁজে দে—কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দে একটা !'

দীপ্তিও তর্ক করে, 'কেন দিদি, আজকাল অনেকে করে। লেট এজেও অনেকে—'

সাধনা বলে, 'আচ্ছা দেখি, তোর মত একজন প্রফেসর-ট্রফেসর যদি পাই— !'

দীপ্তি লজ্জিত হয়। বিজন তাদের কলেজেরই প্রফেসর ছিল। দীপ্তিকে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। দীপ্তির বিয়ে নিয়ে বেশি ভুগতে হয়নি সাধনাকে।

তার জন্যে বোনেদের দুর্ভাবনা দেখে ভালো লাগে সাধনার। কিন্তু ওদের অসম্ভব কথায় স্ব দেয়ই বা কী করে ? কেউ কেউ অবশ্য করে, এত বেশি বয়সে এসেও করে। এই বাঙালী ম র রস সমাজেও ও-ধরনের ঘটনা যে একেবারে না ঘটে তা নয়। কিন্তু এই বয়সে এসে যেসব মে হাজার বিয়ে করে, তাদের হয়তো অনেক আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে জানা-শোনা থাকে, ব নিজের কোন বিশেষ ধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাবার পরে ওরকম একটা ঘটনা ঘটে। কোন ঘটব মা হতে এমন বিয়ে ঘটানো যায় না। ঘটালেও তা সুখের না হবারই কথা। সাধনার।

আজকাল মাঝে মাঝে এ ধরনের চিন্তাও আসে সাধনার। আমল দিতে চায় না, ে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ দিনগুলির কথা মনে হয়। রিটায়ার করবার পর বোনেদের স য়ে হয়েছে থাকবে না সাধনা। সে কথাই ওঠে না। ছোট ভাই আছে ওয়েস্ট জার্মানীতে। ইঞ্জি করে নিজেই এক জার্মান ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাইরে চলে গেছে। শিক্ষানবিশী ওর সঙ্গে। তিন বছর বাদে ফিরবার কথা। কিন্তু এরই মধ্যে ওর চিঠিপত্রে গীতা আর দীপ্তি নাবি দখে রেখা বান্ধবীর পায়ের সাড়া পাচ্ছে। বলা যায় না ভাইটি যখন সাহেব হয়ে দেশে ফিরে মেমকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে। তাতে অবশ্য সাধনার কোন আপত্তি ে ভালোবেসে যাকে খুশি তাকে বিয়ে করতে পারে। সে যে-কোন দেশের যে-কোন জাতে

হোক তাতে কিছু এসে যায় না। সেই উদারতা সাধনার আছে। কিন্তু তাই বলে সাধনা ভাইয়ের সংসারে আর থাকতে পারবে না। বস্তু এদেশের কোন মেয়েকে বিয়ে করলেও সাধনা তাদের মধ্যে গিয়ে বাস করবে না। যদিও সেই ভাইকে সে নিজের হাতে মানুষ করেছে, স্কুল-কলেজে পড়িয়েছে, তবু তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর—, না, আজকাল তা আর চলে না। শেষ পর্যন্ত তা একটা অশান্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এখনকার সংসারের হালচাল সাধনা তো আর জানে না এমন নয়।

নিজের চিন্তার ধারা দেখে সাধনা নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়। আচ্ছা এখনই অত ভাববার কী হয়েছে ? এখনো রিটায়ার করতে অনেক দেরি। অন্তত পনের বছর। একেবারে বুড়ী হবার আগে তার চেয়ে বেশি সময় পাবে সাধনা। তবু নিজের জীবনের শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের প্যাটার্নটা আগে থেকেই বুনে দেখতে ইচ্ছা করে সাধনার। পছন্দ আর হয় না। বোনে আর খোলে। বোনে আর খোলে। না মঠ নয়, মিশন নয়, আশ্রম নয়, ওসব কিছু নয়। চট করে কোন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়েও যেতে পারবে না সাধনা। দেশ-বিদেশ ঘোরাযও তেমন আগ্রহ নেই। সেই উৎসাহ বেশি বয়সে হঠাৎ আসবে ? মনে তো হয় না। তখন শরীর আরো অশক্ত হবে। আরো ঘরের কোণ শরণ নিতে ইচ্ছে করবে। শেষ পর্যন্ত সাধনা হয়তো যেমন আছে তেমনই থেকে যাবে। হয়তো এ বাড়িতে আর থাকবে না। কোন হোস্টেলের একটি ঘর ভাড়া নেবে। কি কোন ফ্ল্যাট বাড়ির একাংশ। তার পর হাতের কাছে যা পায় তাই পড়বে, বাকি সময়টায় হয়তো কিছু-না-কিছু বুনবে। তার পরেও যে সময় থাকবে, এমনি চেয়ারে শুয়ে একা একা বসে ভাববে। শুধু অফিসে আর যাবে না। সারাদিন ঘর আর ঘর। সে ঘরে আর কেউ নেই। যদি কারো কথা শুনতে ইচ্ছা করে নিজে কথা বলবে। যদি কাউকে দেখতে ইচ্ছা করে নিজে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াবে।

নাঃ, এ প্যাটার্নটাও পছন্দ হয় না সাধনার। আবার খুলে ফেলতে থাকে। কিন্তু নতুন প্যাটার্ন আর মনে আসে না।

ছন্দা একেক দিন ছেলে কোলে হঠাৎ দোরের কাছে এসে দাঁড়ায়, 'আসব সাধনাদি ?'

সাধনা বলে, 'বাঃ আসবে না কেন ? এস, বস এসে।'

সাধনা তাকে নিজের খাটখানা দেখিয়ে দেয়। ছন্দা এসে বসে। দুষ্টু ছেলেকে সামলাতে সামলাতে কথা বলে।

পরিবারটি খুব কৃতজ্ঞ। ওদের কাছ থেকে তিরিশ টাকা করেই ভাড়া নেয় সাধনা। বেশি নেয় না। তিরিশ টাকায় দুখানা ঘর আজকালকার দিনে অসম্ভব সস্তায় পেয়েছে ওরা। তা ছাড়া এক হিসেবে সারা বাড়িটাই তো ওদের। উঠোন ছাদ সমস্তই ওরা ব্যবহার করে। সাধনা যে সময়টুকু বাড়িতে থাকে নিজের ঘরের মধ্যেই থাকে। দু-একটা দরকারী কাজ ছাড়া বড় একটা বাইরে আসে না।

ন্দা অনুযোগ করে, 'সাধনাদি আমিই শুধু যেচে যেচে আসি। কই আপনি তো একবারও যান াদের ওখানে। আমিও তো মাঝে মাঝে একা একা থাকি !'

না মৃদু হেসে বলে, 'না গেলেও সব টের পাই।'

বলে, 'কী টের পান সাধনাদি ?'

া তেমনি হাসে, 'এই তোমাদের ঘর-সংসার, রান্না-খাওয়া, ঝগড়া-সন্ধি। সেদিন বুঝি একখানা সিল্কের শাড়ি এসেছে। অ্যানিভাসারি ছিল নাকি ?'

জ্জিত হয়ে বলে, 'বাব্বা, এতদিকেও আপনার লক্ষ্য থাকে ! এতও কানে যায় !'

য। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন যায়। চোখ, কান, অনুভূতি যেন আগের চেয়ে অনেক ছে সাধনার। আগে যেসব কথা কানে যেত না, এখন তা যায়। আগে যেসব দৃশ্য চোখে এখন তা পড়ে। এত কাছাকাছি, একটি দম্পতীর পাশাপাশি তো এর আগে কখনো বাস াধনা। ছেলেবেলায় বাবা-মাকে দেখেছে। সে আর কতটুকু দেখা ! এখন অনেক বেশি চোখ দিয়ে নয়, কল্পনা দিয়ে অনুভবশক্তি দিয়ে দেখে। একটি দম্পতী, তাদের একটি ছেলে, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ একটির সঙ্গে আর একটি সংলগ্ন। হাসি-ঠাট্টা, মান-অভিমান,

তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া আবার মিলন—ওদের মধ্যে কোনদিন কি ঘটে না ঘটে সবই জানতে পারে সাধনা। চেঁচেমেচি ঝগড়াঝাটিতে অবশ্য বিরক্ত হয়, আবার যখন ওদের দাম্পত্য জীবন ছন্দে মিলে ঝঙ্কৃত হয়, মন্দ লাগে না শুনতে। মনে হয় যেন সত্যিই একখানা কাব্য পড়ছে সাধনা, যেন উপন্যাস পড়ছে। তা কাগজের ওপরে কালির অক্ষরে লেখা নয়, এইটুকুই যা তফাৎ। হাতের বই বন্ধ করে কান পেতে থাকে সাধনা। পরে নিজেই লজ্জিত হয়! ছি ছি ছি, মেয়ে হলেও এমন আড়ি পাতবার অভ্যাস তো তার কোনকালে ছিল না!

ছন্দা সাধনার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেকে বলে, 'বল তো বাচ্চু উনি কে?'

বাচ্চু বলে, 'সাধনাদি!'

ছন্দা বলে, 'শুনলেন? ও-ও বলে সাধনাদি! পাজী হতভাগা কোথাকার—বল, মাসী, মা—সী।'

ছন্দার ছেলে আবার বলে, 'সাধনাদিদি।'

সাধনা হাসে, 'মন্দ কি ছন্দা, দরকার নেই আমার মা মাসী হবার! দিদি থেকে একেবারে দিদিমায় ডবল প্রমোশন পেয়ে যাব সেই ভালো।'

ছন্দা হঠাৎ বলে ফেলে, 'তাই কি হয় সাধনাদি? মা না হয়ে কি আর দিদিমা হওয়া যায়? সবাইকেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে হয়।'

বলে ছন্দা নিজেই যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। যে এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেনি, জীবনে কোনদিনই আর করবে না, তার কাছে মা হওয়ার কথা তোলা নিষ্ঠুরতা। ছন্দার হয়তো সেই কথাই মনে হয়।

একটু গম্ভীর হয়ে থেকে সাধনা হেসে ওঠে, 'সবাইকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে কেন ছন্দা? কেউ কেউ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে, কেউ বা লিফটে ওঠে। আমাদের অফিসে লিফট আছে।'

ছন্দা বলে, 'যাই দিদি, কাজকর্ম পড়ে আছে!'

ছেলে নিয়ে মাঝে মাঝে ছন্দা এ-ঘরে আসে, বসে। সাধনা কিছু লজেন্স আর বিস্কুট আনিয়ে রেখেছে। কৌটো খুলে সাধনা তার দু-একখানা বের করে ওর হাতে দেয়। গাল টিপে দিয়ে একটু-বা আদর করে, 'ভারি সুন্দর ছেলে হয়েছে ছন্দার!'

তার পর সাধনা কথাটা নিয়ে ভাবতে থাকে। মা হওয়া! মা হওয়ার মধ্যে নারী জীবনের সব সার্থকতা গচ্ছিত আছে সাধনা তা বিশ্বাস করে না। অনেক মেয়ের জীবনেই তো মা হওয়ার অভিজ্ঞতা ঘটে। তাদের জীবন কি সব দিক থেকে সার্থক? সাধনা তা বিশ্বাস করে না। মেয়েদের জীবনে সিদ্ধির কি আর দ্বিতীয় পথ নেই? সাধনা তা বিশ্বাস করে না। ওদেশে নাকি কোন মেয়ে কৃত্রিম উপায়েও মা হতে পারে। দূর, তাতে কি সুখ? তার চেয়ে কাউকে ছেলেবেলা থেকে নিজের কাছে রেখে পুষলেই হয়। সত্যি সত্যি সন্তান জন্ম দেওয়ার মধ্যে যে শারীরিক যন্ত্রণা আনন্দ সুখ-দুঃখের অনুভূতি তা আর কতক্ষণ থাকে? ছেলেমেয়ে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা তা ভুলে যায়। তখন আর দেহ নয়, শুধু মন। মা হয়ে যে স্বাদ মাতৃত্বের অনুভূতিতে, স্নেহ আর বাৎসল্যের রস মনের মধ্যে লালন করতে পারলে সেই সুখ সেই আনন্দ। আর কারো শিশুকে, হাজার হাজার শিশুকে ভালোবাসলেও সেই আনন্দ পাওয়া যায়। বরং যারা সন্তানের মা তারা স্বার্থপর। নিজের সন্তান ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। যারা মা হয় না, মনের ঔদার্যে তারা অনেকের মা হতে পারে। তবু সত্যিকারের মা হওয়ার মধ্যে দৈহিক কী সুখ মেয়েরা পায় জানতে ইচ্ছা করল সাধনার।

অফিসে যাতায়াতের পথে, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এই হল তার চিন্তার বিষয়।

রেখা সান্যাল ম্যাটার্নিটি লীভ নিয়েছিল। তিন মাস পরে ফের জয়েন করেছে। মেয়ে হয়েছে ওর।

ছুটির পরে সাধনা ওকে এক দিন চা খাওয়াতে নিয়ে গেল। খানিকক্ষণ গল্প করল ওর সঙ্গে। সহজে আসেনি মেয়ে। সীজারিয়ান অপারেশন করতে হয়েছে। সাধনার কৌতূহল দেখে রেখা একটু একটু অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল। 'সে যা কষ্ট মিস দাশগুপ্ত!'

সাধনা জিজ্ঞাসা করল, 'শুধুই কষ্ট? আর কিছু পাওনি? আনন্দ সুখ?'

রেখা লজ্জিতভাবে হাসে। 'কী যে বলেন মিস দাশগুপ্ত !'

সাধনা বুঝল কষ্টও আছে সুখও আছে, কিন্তু রেখার তা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই। অথচ লেখাপড়া জানা আজকালকার মেয়ে। কিছুই বলতে পারে না। সাধনা হতাশ হল। ভাবল কিছু বইপত্রের শরণ নিতে হবে। বই-ই জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ সহায়। কিন্তু এসব বই ধার পাওয়া দুষ্কর। গীতার স্বামীর কাছে চাইতে পারে। কিন্তু সে যদি বলে, 'কী করবেন এসব বই দিয়ে ?' লজ্জায় পড়ে যাবে সাধনা। কী জানি কে কী ভাববে ! তার চেয়ে কিনে নেওয়াই ভালো। এসব বিষয়েও সহজবোধ্য সুলভ সংস্করণের ইংরেজী বইয়ের নিশ্চয়ই অভাব নেই। সামনের মাসের মাইনে পেয়ে সাধনা নিজেই কিছু বই কিনে নেবে। এক মাসে সব কিনতে না পারে, মাসে মাসে কিনবে। মা যারা হয় তারাও মা হওয়ার সব রহস্য জানে না। সাধনা বই পড়ে সব জানবে। জানতে বাধা কি ? জানাও একরকমের হওয়া।

সাধনা মাঝে মাঝে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। দেখবার মত চেহারা তার নয়। কালো লম্বা একহারা চেহারা। চৌকো ধরনের মুখ। দেখবার মত নয় বলেই বোধ হয় তেমন করে কারো চোখে পড়েনি। তবু প্রথম প্রথম কোন কোন যুবক বিরক্ত করত। সাধনা তাদের কাউকে আমল দেয়নি। যারা এগোতে চেয়েছে, কঠিন শাসনে তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে সাধনা। আজ আর কেউ আসে না। সুন্দরী নয় সাধনা, তবে সবাই বলে স্বাস্থ্যবতী। পেটা লোহায় গড়া শরীর। নইলে কি এত খাটতে পারত ? অফিসে কেউ কেউ বলে, গত দশ বছরের মধ্যে মিস দাশগুপ্তের আর বয়স বাড়েনি। হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু সাধনার শরীর বেশ শক্ত মজবুত। সাধনার এক মাসীমা আছেন। বরানগরে থাকেন। তিনিও অনেকটা এই রকম। তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়েছে। পঞ্চাশ বছর বয়সেও সেদিন একটি ছেলে হয়েছে তাঁর। স্বাস্থ্য ভালো। থাকগে। সাধনার পঞ্চাশ হতে এখনো অনেক দেরি। ছি ছি ছি । সে কথা কিসে আসে ? এসব কি ভাবছে সে ? সাধনা তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে এল। নিজের মুখ নিজে দেখতে লজ্জা। নিজের চোখের দিকে তাকাতে লজ্জা করল সাধনার।

এর কয়েকদিন পরে সেদিন এক কাণ্ড ঘটল। অফিস থেকে ফিরে এসে সাধনা দেখল, বাচ্চু চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে তুলেছে। বেশ একটু বিরক্ত হল সাধনা। ব্যাপার কি ? ছেলেটাকে কেউ একটু শান্ত করতে পারে না ? আর কাউকে কি বাড়িতে টিকতে দেবে না ওরা ?

'ছন্দা ও ছন্দা ! কী হল তোমার ছেলের ?'

বলতে বলতে সাধনা ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পুবদিকের দুখানা ঘরে ওরা থাকে। সেদিক থেকে কান্নার শব্দ আসছে। কিন্তু ছন্দা নেই—তার বদলে সুধীরই ছেলে কোলে বেরিয়ে এল।

সাধনার মুখের ভাব দেখে একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দাদা বউদি তো বাড়িতে নেই ! সিনেমা দেখতে গেছেন।'

সাধনা একটুকাল তাকিয়ে কী দেখল। বিরক্তির বদলে এবার হাসি পেল তার। হেসেই বলল, 'আর ছেলেকে বুঝি তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন ! তুমি কি ছন্দার দেওর না ননদ ?'

সুধীর মৃদু হেসে মুখ নীচু করল।

সাধনা বলল, 'ওকে নিয়ে এ-ঘরে এস। আমি শান্ত করে দিচ্ছি।'

সুধীর একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'না সাধনাদি, আমি নিজেই পারব। আপনি এইমাত্র অফিস থেকে ফিরলেন—এখনো কাপড় ছাড়েননি, হাত-মুখ ধোননি !'

সাধনা বলল, 'থাক থাক, তোমার অত ভদ্রতা করতে হবে না। যা বলছি শোন, ওকে নিয়ে এস এ-ঘরে।'

এমন করে সাধনাদি তাকে এর আগে কখনো ডাকেনি। সুধীর বাচ্চুকে কোলে নিয়ে প্রায় তার পায়ে পায়ে চলে এল।

সাধনা ঘরের তালা খুলল। ভিতরে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। জুতো খুলে স্যান্ডাল

পরল।

তারপর সুধীরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওকে দাও আমার কাছে!'

সুধীরের তবু যেন সংকোচ যায় না। 'আপনি এখনো রেস্ট নিলেন না সাধনাদি—'

সাধনা আর কোন কথা না বলে বাচ্চুকে প্রায় ওর কাছ থেকে কেড়ে নিল।

সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সাধনা লক্ষ্য করল সুধীর তার চেয়েও প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা। কিন্তু কী লজ্জা ছেলের? এতটুকু ছোঁয়া লেগেছে কি লাগেনি, মুখ একেবারে নীচু করে রেখেছে। ওর লজ্জাটুকু উপভোগ করল সাধনা।

চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'বসো। ছেলে কী ভাবে শান্ত করে শিখিয়ে দিচ্ছি!'

তারপর সুধীরকে দেখাবার জন্যেই যেন বাচ্চুকে চেপে ধরে সাধনা খুব আদর করল। গালে ঠোঁটে চুমু খেলো। কৌটো থেকে বিস্কুট বের করে দিল ওব হাতে।

তারপর সুধীরের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'দেখেছ, ছেলের কান্না কেমন থেমে গেছে! পারতে তুমি?'

সুধীর নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে বলল, 'আপনারা যা পারেন, তা আমরা কী করে পারব? এবার ওকে দিন সাধনাদি, আমি যাই।'

সাধনা ওকে সস্নেহে ধমকে দিয়ে বলল, 'কেবল যাই-যাই করছ! বসো, চা-টা খাও। যদি পার বরং স্টোভটা ধরাও। দেখো, হাত-টাত পুড়িয়ে আবার কেলেঙ্কারি করে বসো না যেন।'

গা-টা ধুয়ে শাড়ি পাল্টে এল সাধনা। প্রায়ই সে সাদা খোলের শাড়ি পরে। আজ ফিকে বেগুনি রঙের শাড়ি পরল। কুঙ্কুমের টিপ পরল। তারপর নিজের হাতে চা করল, খাবার করল। খেতে খেতে সুধীরের সঙ্গে গল্প করল।

সুধীর তবু উসখুস করছে দেখে সাধনা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা ধর, আমাদের অফিসে তোমার যদি একটা কাজ-টাজ করে দেওয়া যায়—'

সুধীর এবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, 'সত্যি বলছেন সাধনাদি? তা হলে তো বেঁচে যাই! জানেন বোধ হয়, অধীরদা আমার আপন দাদা নয়। জ্ঞাতি সম্পর্কে—। কী কষ্টে যে এখানে আছি, সব মেনে সব সহ্য করে—কিন্তু আপনাদের ওখানে তো আবার গ্র্যাজুয়েট না হলে—'

সাধনা বলল, 'সে দেখা যাবে। সব ব্যাপারেরই তো একটু এদিক-ওদিক হয়!'

সুধীর আপ্যায়িত হল, আশ্বস্ত হল। ঘুমন্ত বাচ্চুকে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তা হলে সত্যি আমার জন্যে চেষ্টা করবেন সাধনাদি?'

সাধনা বলল, 'করব বই কি! আমি নিজেই তো বললাম। তুমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিও।'

'কী পোস্টের জন্যে।'

'অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেই লিখো। তার পর যা হয়!'

ও চলে যাওয়ার পর সাধনার হঠাৎ যেন খেয়াল হল। ছি ছি ছি, এ কী করে বসল সে? এ কী বলে বসল? এর পরিণাম কোথায়? এই ছলনা কোন্ অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবে সাধনাকে? এই লুব্ধতা কোন্ কলঙ্ক অপবাদ আর সর্বনাশের মধ্যে তাকে আকর্ষণ করে নেবে? ও হয়তো এখনো কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখন পারবে, তখন কোথায় থাকবে সাধনার মান-মর্যাদা—সকলের কাছে পাওয়া শ্রদ্ধা আর সুখ্যাতি? কী ভাববে রন্তু? যে ছোট ভাই এখনো বিদেশ থেকে লেখে 'দিদি, তোমার সেই ফটোখানা আমার টেবিলের সামনের দেয়ালে রেখেছি। যখন দেখি, কী যে বল পাই মনে—!' সেই রন্তুর কাছে কী করে মুখ দেখাবে সাধনা?

রাত্রে ভালো করে খাওয়া হল না সাধনার। ঘুমেরও ব্যাঘাত হল। কিসের একটা গ্লানি আর অনুশোচনায় মন বারবার ভরে উঠতে লাগল।

ভোরে উঠে অবশ্য রাত্রির সেই মনস্তাপ আর রইল না। সাধনা এমন কিছু করেনি যাতে সে অত অনুতপ্ত হতে পারে। চাকরির কথাটা যদি একটু বানিয়ে বলে থাকে, তাতেই বা কী হয়েছে? বোস

সাহেবকে বলে রুটিন-গ্রেড ক্লার্কের কাজ কি ফোন অপারেটর শিক্ষানবিশী কিছু-না-কিছু ওকে একটা জুটিয়ে দেওয়া যাবেই। ওর মত মানুষের পক্ষে আশা-ভরসারও তো একটা দাম আছে। তাই বা ও কোথায় পায় ?

একটু বেলা হলে সাধনা নিজেই ছন্দার সঙ্গে আলাপ করতে গেল। কেবলই খোঁটা দেয় আসেন না, আসেন না, আজ এসেছে।

ছন্দা বারান্দায় বঁটি পেতে বসে তরকারি কুটছিল, সাধনাকে দেখে খুশী হয়ে বলল, 'আসুন !'

একটা মোড়া এগিয়ে দিল বসতে।

তারপর হেসে বলল, 'কাল নাকি বাচ্চু আপনার ওপর খুব উৎপাত করেছে ?'

সাধনা বলল, 'উৎপাত আবার কিসের ?'

ছন্দা বলল, 'আপনি ওকে বিস্কুট খাইয়েছেন, আদর করেছেন। সবই শুনলাম। জানেন দেখি সব !'

সাধনা হঠাৎ বলে ফেলল, 'জানব না কেন ? আমিও তো মেয়েছেলে !'

ছন্দা হেসে বলল, 'সে কথা কে অস্বীকার করে সাধনাদি, বরং আপনিই যেন স্বীকার করতে চাইতেন না !'

সাধনা কী যে বলবে, হঠাৎ যেন ভেবে পেল না।

ছন্দা একটু হেসে বলল, 'শুনলুম আমাদের সুধীরের ভাগ্যেও কাল খুব সমাদর জুটেছে। আর আপনি নাকি ওকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন বলেছেন ?'

সাধনা বলল, 'দেবই যে এ কথা বলিনি, চেষ্টা করব বলেছি।'

ছন্দা বলল, 'দিন সাধনাদি। যাই হোক একটা কিছু জুটিয়ে দিন। তা হলে বেঁচে যাই। বাব্বা, একটা লোকের খরচ কি এ বাজারে কম ? মা নেই, বাপ নেই, কাছাকাছি আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। ঘাড়ে এসে পড়েছে। ফেলতে তো আর পারিনে !'

'অফিসের বেলা হল,' বলে উঠতে যাচ্ছিল সাধনা, কিন্তু ছন্দা ওকে উঠতে দিল না। বলল, 'তা হবে না সাধনাদি, চা খেয়ে যাবেন। আমাদের দু দফায় চা হয় সকালে। নইলে বাবুরা গরম।'

চা-টা খেয়ে উঠে পড়ল সাধনা। কিসের যেন একটা অস্বস্তি লেগে রইল মনে। সে মেয়েমানুষ, এ কথা তাকে আজ নিজের মুখেই বলতে হল ! ছন্দা তা নিয়ে তাকে ঠাট্টা করতেও ছাড়েনি। ঠাট্টা করবে বই কি ছন্দা, পুরুষের চোখেও এই নিঃশব্দ কৌতুক সাধনা দেখতে পায়। যত সব পরিচিত আধা-পরিচিত প্রৌঢ়, কি লোলুপ অক্ষম বৃদ্ধ তার সঙ্গে কথা বলে, ঘনিষ্ঠতার সুযোগ খোঁজে। কিন্তু যৌবন—হৃদয়হরণ দুঃখহরণ যৌবন তার দিকে আর তাকায় না। তাকে কি আর সাধনা কোন দিনই ফিরে পাবে ? নিজের দেহে নয়, অন্যের দেহেও নয়, কোথাও আর তাকে পাবে না। তাকে পেতে হলে চুরি করতে হবে, ডাকাতি করতে হবে।

সাবান তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে স্নান করতে এল সাধনা। এসেও ওই একই চিন্তাস্রোতে ভাসতে লাগল। আজও অক্ষতা অনাঘ্রাতা সাধনা। শুধু কুমারী নয়, মনে মনে কিশোরী। কিন্তু কে আর তার সেই কৈশোরকে মনে করে রেখেছে ? কবে যে একটি কুঁড়ি ধরল গাছে, ফুল হয়ে ফুটল, তা কেউ লক্ষ্যও করেনি। আজ ঝরা পাপড়িগুলির দিকে তাকিয়ে সবাই অবজ্ঞায় হাসছে, পায়ে দলে দলে যাচ্ছে। সাধনার সাধ্য নেই ছুটে গিয়ে কারো হাত ধরে কি কারো পা জড়িয়ে ধরে। সাধনা জানে ধরেও কোন লাভ নেই।

বড় রাস্তায় এসে বাসস্টপ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে দাঁড়ানো বাসটা দৌড় দিল। দ্বিতীয় বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সাধনা। স্টপে স্যুটপরা আরও কয়েকজন অফিসযাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অনেকেরই মুখ চেনে। চিনবে না কেন ? বছরের পর বছর ধরে দেখছে। সেই নবনী কোমল মুখগুলিতে কালের হাতের পাঁচ আঙুলের দাগ কী ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে সাধনা।

এক ভদ্রলোক সিগারেট ধরালেন। সাধনা একটু পিছিয়ে এল। আর হঠাৎ কানের কাছে শুনতে

পেল, 'সাধনাদি !'

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সাধনা, অস্ফুট স্বরে বলল, 'কে ?'

এতক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসেছে সুধীর। এখন রুদ্ধশ্বাস। কিন্তু ওর মুখে এখন প্রত্যাশা পূরণের প্রসন্ন হাসি।

সুধীর বলল, 'আমি একেবারে টাইপ করে নিয়ে এসেছি সাধনাদি !'

'কী ওটা ?'

'সেই অ্যাপলিকেশন ! দেব এখানে ?'

রোলকরা কাগজখানা একটু বাড়িয়ে ধরল সুধীর।

সাধনা মাথা নেড়ে বলল, 'না-না, এখানে নয়, অফিসে যেও—হেস্টিংস স্ট্রীট চেন তো ?'

সুধীর বলল, 'চিনি বই কি। কখন যাব ?'

'পাঁচটায়।'

'পাঁচটায় ! তখন যে ছুটি হয়ে যাবে সাধনাদি ?'

সাধনা বলল, 'তা হোক। তখনই কথাটথা বলতে সুবিধে হবে। তা ছাড়া ছুটিব পর ভেবেছি একটু মার্কেটিং করে ফিরব, তুমি তো ও-ব্যাপারে ওস্তাদ, যদি একটু হেলপ চাই—'

সুধীর উল্লসিত হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই সাধনাদি, নিশ্চয়ই। আপনি যা করতে বলবেন—'

সাধনা গলা নামিয়ে বলল, 'আস্তে !'

সঙ্গে সঙ্গে সুধীরও অর্ধস্ফুট হল, 'আপনি যেখানে যেতে বলবেন—'

সাধনা আর কোন কথা বলল না। দ্বিতীয়বার সুধীরের দিকে আর তাকাল না। যেন আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই।

দ্রুত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সাধনা। তার বাস এসে গেছে।

চিলেকোঠা

কাল সাহস করে শুধু এই ভূমিকাটুকু করে রাখতে পেরেছিল অমলেন্দু, 'তোমাকে একটা কথা বলব।'

রীনা বলেছিল, 'কী কথা ?'

অমলেন্দু বলেছিল, 'আজ নয় কাল বলব।'

সেই কাল আজ এসেছে।

রীনা চুপ করে ছিল। পীড়াপীড়ি করেনি। 'আজই বলুন', বলে জেদ ধরেনি।

আবার পাশ থেকে উঠেও যায়নি। তরুণ বয়সের চপলতায় হেসে ওঠেনি।

তারপর অবশ্য যেমন হয়, আরো নানা কথা এসে পড়েছে। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার গরজ অমলেন্দুরই যেন বেশি ছিল। শুধু এই ইশারাটুকু রেখেই সে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সেই সঙ্গে আশা ছিল যার কাছে থেকে পালাচ্ছে সে সহজে পালাতে দেবে না। সে পায়ে পায়ে ছুটে আসবে। খপ করে হাতখানা ধরে ফেলে বলবে, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। আঠার উনিশ বছরের একটি মেয়ের পক্ষে অতখানি সাহস হয়তো সম্ভব নয়। অবশ্য ও বয়সের মেয়েও অনেক দুঃসাহসের কাজ হয়তো করে। কিন্তু চল্লিশ বছরের পুরুষের কাছে করে না। বিশেষ করে সেই পুরুষের সঙ্গে যদি তার গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকে, সে যদি তার বাবা-মার বন্ধুস্থানীয় হয়, তাহলে মেয়েটির পক্ষে বেশি এগোন কি সম্ভব ? এগোতে হয় পুরুষকেই। কিন্তু অমলেন্দুর পক্ষে তা বোধ হয় আরো দুঃসাধ্য কাজ। একটানা এগিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। সে এক পা এগোয়, তিন পা পিছোয়। সারাজীবন বসে বসে সে শুধু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করল, আর কিছু করল না।

আজ ছুটির দিন। কোন কোন রবিবারে সে সকালেই গিয়ে রীনাদের বাড়িতে হাজির হয়। বিনয়দা আর তাঁর স্ত্রী কিছুতেই তাকে চলে আসতে দেন না। অমলেন্দু একটি প্রীতির কারাগারে সারাদিনের জন্যে বন্দী হয়ে থাকে। স্নান করে, একসঙ্গে গল্প করতে করতে খায়, খেয়ে উঠে ফের গল্প করে, কোন দিন হয়তো চারজনে মিলে তাস খেলে, কোন দিন বেড়াতে বেরোয়। কোন দিন সকালে বিনয়দা তাকে কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। ফিরিয়ে আনেন সন্ধ্যার পর। কোন দিন বা রেখা বউদি তাকে নিয়ে বাজার করতে বেরোন। রীনাও সঙ্গে থাকে। ছুটির দিনগুলি, বিশেষ করে বিকেল আর সন্ধ্যাগুলি, ওদের বাড়িতেই কাটে অমলেন্দুর। এই মফঃস্বল শহরে আর কোন পরিবারের সঙ্গে তার এমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। সাধারণ আলাপ পরিচয় অনেকের সঙ্গেই আছে। কিন্তু কারো বাড়িতে বড় একটা যায় না। খুব মিশুক স্বভাব তার নয়। যে দু একটি পরিবারের সঙ্গে মেশে তাদের আত্মীয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু একটি পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তা বুঝি আর রাখতে পারল না অমলেন্দু। এবার তার বিদায় নেওয়ার পালা এসেছে। এখন খালি হাতে যাবে, না ভরা হাতে যাবে সেই হল প্রশ্ন। চুরি করবে, না ডাকাতি করবে, না কি সাধু সৎ ভালোমানুষের মত শুধু হাতে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে—সেই হল কথা।

যাই করুক অমলেন্দু, ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। শুধু ভূমিকাটুকু করে রাখলে চলবে না, স্পষ্ট ভাষায় সব কথা বলা চাই। সে কথা বলতে গিয়ে দুটি কান যতই লাল হয়ে উঠুক, যতই কান কাটা যাবার আশঙ্কা থাকুক, একই সঙ্গে ভয় আর বাসনার উত্তেজনায় বুক যতই দুরু দুরু করুক মুখ ফুটে বলতেই হবে অমলেন্দুকে। শুধু অনুরোধ কাকুতি মিনতি নয়, জোরের সঙ্গে বলতে হবে, তার মনের সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ সংশয় জয় করতে হবে। তবে তো সাহস পাবে, ভরসা পাবে। আর বয়সের যত পার্থক্যই থাকুক তবে তো পুরুষ হিসেবে ওর কাছে স্বীকৃতি পাবে। এখনো অনেক কাজ বাকি, এখনো অনেক পথ বাকি অমলেন্দুর। কিন্তু কেউ যদি এক পা এগোয় আর দু পা পিছোয় তাহলে সারা জীবনেও কি তার পথ শেষ হয়, সারাজীবনেও সে কি আর ঘরে গিয়ে পৌঁছতে পারে? এই অনন্ত দ্বিধার জন্যেই অমলেন্দুর কোথাও গিয়ে পৌঁছানো হল না—কোথাও নয়।

সারা দিন আজ অমলেন্দু ঘর থেকে বেরোয়নি। ভাড়াটে বাড়ির চিলেকোঠার এই অপরিসর ঘরখানিতে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছে। একবার শুধু নীচে নেমেছিল স্নান করার জন্যে। নিতান্ত অনিচ্ছায় কুকারে ডিম আর আলু-ভাতে ভাত করে নিয়েছে। কিন্তু খাওয়ার রুচি আসেনি। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। অন্য দিন বইটই পড়ে, মাসিক সাপ্তাহিকে চোখ বুলায়। আজ আত্মচরিত ছাড়া আর কিছু অধ্যয়ন করবার নেই অমলেন্দুর। কিন্তু সে চরিত্রেই বা পাঠযোগ্যতা কী আছে? একটি দীন হীন দুর্বল চরিত্র। দুশ্চরিত্রও কি?

লোকে কিন্তু তা বলে না। এই শহরের, শুধু এই শহরের কেন, তার জন্মভূমি কখনো বা কর্মভূমি কলকাতারও যে কটি মানুষ যে কটি পরিবারের সঙ্গে অমলেন্দুর পরিচয়—তাদের কেউ বলে না, অমলেন্দু নামটি তার পক্ষে বেমানান। তার চালচলনে আচারে-ব্যবহারে মালিন্য আছে কেউ একথা বলে না, তার ভাষায় অকারণে কি স্বল্প কারণে রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে এমন ঘটনা তার নিজের তো মনে পড়ে না, অন্যেও মনে করিয়ে দেয়নি।

জীবনে সে কৃতী হয়নি—বন্ধুরা মাঝে মাঝে তাই নিয়ে ক্ষোভ করে। কিন্তু তাই বলে অমলেন্দু দত্তকে অপদার্থ কেউ বলে না। আর একটু উদ্যোগী আর একটু মনোযোগী, স্বকর্মে আরো একটু নিষ্ঠাবান হলে জীবনে আরো কিছু সাফল্য হয়তো হত; কিন্তু নৈষ্কর্ম্যের যে এই বিলাস, শুধু চিন্তা আর অনুভূতির রাজ্যে এই স্বচ্ছন্দ স্বেচ্ছা বিচরণ আর হয়ে উঠত না। যে জীবন কর্মব্যস্ত নয়, আলস্যের বিলাস মগ্ন, যে দু হাত দিয়ে কিছু গড়ে তোলে না, শুধু মনে মনে গড়ে, আর মনে মনে ভাঙে, যার সব সৌধ শুধু শূন্যে আর স্বপ্নে তেমন এক জীবনকেই তো অমলেন্দু নিজের জন্যে বেছে নিয়েছিল। সে নিজেই বেছে নিয়েছিল না জীবনই তাকে বেছে নিয়েছিল কে জানে। কোন আঘাত তার এই নিষ্ক্রিয়তা আর বিফলতার মূলে—মাঝে মাঝে খুঁটেখুঁটে দেখতে চায় অমলেন্দু। এম-এ-তে থার্ডক্লাস প্রাপ্তি? দীর্ঘ দিনের বেকারত্ব? মনের মত কাজের ব্যর্থ সন্ধান, শেষ পর্যন্ত একান্ত

অপছন্দের ব্যাঙ্কের এই কেরানীগিরিতে সারাজীবনের মত আটকে যাওয়া ? কোন দুঃখ সবচেয়ে চরম হয়ে উঠেছিল—মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করে অমলেন্দু। কোন দুর্নিরীক্ষ্য মারাত্মক আঘাত তাকে যৌবনের শুরুতেই এমন করে পঙ্গু আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রেখে দিয়েছে ? নিজের এই চল্লিশ বছরের জীবনের প্রতিটি পর্বে পর্বে, প্রতিটি দিনরাত্রির মধ্যে, পারে তো প্রতিটি মুহূর্তে, পদে পদে নিজের ব্যর্থতার বীজ খুঁজে বেড়ায় অমলেন্দু। সে বীজ তো আর বীজ নেই, সেই বীজ এখন বিষবৃক্ষ। সমস্ত ডালপালা ছড়িয়ে সে এখন অমলেন্দুর সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। তার মূল উপড়ে ফেলা তো দূরের কথা, ছোট একটি ডাল ভাঙলেও লাগে, একটি পাতা ছিড়লেও অঙ্গচ্ছেদের কষ্ট হয়।

যতদিন বাবা ছিলেন, তাকে কর্মযুক্ত অবস্থায় দেখে যাননি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রায়ই বলতেন, 'কী করে যে খাবি। আমি নিজের জন্যে ভাবিনে, নিজে কিছু চাইওনে। কিন্তু তোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দেখলে নিশ্চিন্ত হতাম।'

তিনি তা দেখে যেতে পারেননি। মা অবশ্য দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর আরো দেখবার বাসনা ছিল। ঘরে একটি বউ আসবে তিনি সেই স্বপ্ন দেখতেন। অমু শুধু নিজেই খাবে না আরো পাঁচজনকে খাওয়াবে। সংসারে আরো দশজন যেমন চলে তেমনি চলবে। কিন্তু অমলেন্দু তাঁর সে সাধ মিটায়নি। বলেছে, 'এই বেশ আছি। দরকার কি মা হাঙ্গামা বাড়িয়ে। যে আসবে সে তো আর কাঠের পুতুল হয়ে আসবে না। খেতে চাইবে, পরতে চাইবে।'

মা বলেছেন, 'কিরকম বেটাছেলেরে তুই। একটি মেয়েমানুষকে দুবেলা দুমুঠো ভাত, আর ছ মাস অন্তর একজোড়া করে কাপড়, তাও দিতে পারবিনে ? মনে সুখ থাকলে তার চেয়ে বেশি কিছু আর লাগে নাকি ?'

অমলেন্দু হেসে বলেছে, 'মা, মনের সুখের জন্যে আজকাল আরো অনেক সুখের দরকার হয়।'

অমলেন্দুর ধারণা যার আত্মবিশ্বাস নেই তার স্ত্রীর পদে পদে অবিশ্বাসিনী হওয়ার আশঙ্কা আছে। নিজের ওপর নিজের ঘৃণা তাচ্ছিল্য অনুকম্পা সহ্য হয়. সে অনেক সময় আত্মরতির মত। ছেলেকে যেমন মা এক হাতে মারে আর এক হাতে আদর করে—এও তেমনি। সন্তান-বাৎসল্যের মত আত্মবাৎসল্য। কিন্তু আর একজন যদি চব্বিশ ঘণ্টা তোমার পাশে থেকে দুটি বাঙ্ময় চোখ মেলে অবিরাম বলে যেতে থাকে—'তুমি হীন, তুমি দীন, তুমি দুর্বল,' তার চেয়ে দুঃখকর আর কিছু নেই। তাই অমলেন্দু ভেবে রেখেছিল গার্হস্থ্য সুখের চেয়ে তার পক্ষে অগৃহীর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ভালো, শান্তি ভালো, স্বস্তি ভালো। কিছুদিন বাদে মা মুক্তি দিয়ে গেলেন। অমলেন্দু ভাবল সমস্ত বন্ধনমুক্তি ঘটে গেল। কিন্তু বন্ধন না থাকলেও একটি দুটি বন্ধনের তৃষ্ণাই যে সহস্র বন্ধনের বাড়া সে কথা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে অমলেন্দু। তবু ধরা দেয়নি, তবু বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়নি। অনেক মেয়ের বাপ-মাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। আইবুড়ো বোন আছে এমন একাধিক বন্ধুকে হতাশ করেছে অমলেন্দু। নিজের ওপর যার প্রভুত্ব নেই, তার কি কারো স্বামী হওয়া সাজে ? সে শুধু নামে মাত্র স্বামী, আসলে দাসানুদাস। অমলেন্দুর এই কৌমার্য সংসারের নিবৃত্তি থেকে আসেনি। তার এই একক যাত্রা কোন সামাজিক রাজনৈতিক কি আধ্যাত্মিক আদর্শকে লক্ষ্য রেখে নয়। বরং কোন কিছুকে লক্ষ্য না রেখে যাত্রা, কোন গন্তব্যে পৌঁছবার আশা না রেখে অগ্রগমন। শুধু অগ্রগমন নয়. পিছনে অপসরণও। এমন যাত্রায় কাউকে কি সঙ্গিনী হতে ডাকা চলে ? অমলেন্দু ডাকেনি। মুখ ফুটে ডাকেনি। আর সেইজন্যেই বোধ হয় অস্ফুট আহ্বান মনের মধ্যে নিরন্তন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একটি ক্ষীণ প্রত্যাশা যেতে যেতেও যাচ্ছে না, যদি না ডাকলেও কেউ আসে। প্রকৃতি কি এইভাবেই প্রতিশোধ নেয় ? যে স্বেচ্ছায় সোহাগে গিয়ে তার হাত ধরে না প্রকৃতি কি তার চুলের মুঠি ধরে খায়া-ওঠা পথের ওপর দিয়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। সর্বাঙ্গে ঘা মুখে রক্ত তবু তার না গিয়ে উপায় থাকে না। এ কি ! বেলা যে একেবারেই শেষ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে দিনের আলো প্রায় নেই বললেই চলে। তাড়াতাড়ি তক্তপোষের ওপর উঠে বসল অমলেন্দু। এখনো দাড়ি কামানো হয়নি, বিকেলের হাত মুখ ধোয়া হয়নি। তৈরি হয়ে নিতে নিতে এখনো তার ঘণ্টাখানেক লাগবে। এর পর তো আনন্দপুরে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। রীনা যদি আর অপেক্ষা না করে। যদি ওর বাবা মার

সঙ্গে কি অন্য কোন মেয়েবন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে যায় ! তাহলে তো গিয়ে আর দেখা হবে না। হ্যাঁ মেয়েবন্ধু। এখনো ছেলেবন্ধুরা ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেনি। স্কুল ফাইনাল পাশ করে সবে কলেজে ঢুকেছে। মেয়েদের কলেজ। ক্লাসের দু-একজন সহপাঠিনীর সঙ্গেই ওকে দেখেছে অমলেন্দু। তাদের সঙ্গেই রীনা তার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। কোন ছেলেকে দেখেনি, যুবককে দেখেনি। তবু তারা কি একেবারেই নেই ? প্রকাশ্যে না থাকুক নেপথ্যে নিশ্চয়ই আছে। যৌবনের মূর্তি রীনার মত একটি তন্বী, সুশ্রী মেয়ের মনে কি এখনো ছায়া ফেলেনি, স্থায়ী হয়ে বসেনি ? যদি বসে থাকে সেই মূর্তি, সেই মুখ অমলেন্দুকে মুছে দিতে হবে। শুধু এখনই নয় আজীবন যৌবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে অমলেন্দুকে। তার ভাবী জীবনসংগ্রাম যৌবনের সঙ্গে। হয়তো বার বার হারতে হবে, মরবার ভয়ে আধমরা হয়ে থাকতে হবে, তবু মৃত্যুকাল পর্যন্ত লড়াই না করে উপায় নেই।

ঘরে যেটুকু আলো আছে তাতে দাড়ি কামানো চলে না। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল অমলেন্দু। এতক্ষণ যে ছোট্ট কুঠুরিটুকু ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন করেছিল এবার তা প্রখর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর এই চিরপরিচিত আলোটুকু দেখেই অমলেন্দুর মন ফের আশায় আশ্বাসে ভরে গেল। উজ্জ্বল আলোয় তার দুটি বড় বড় বইয়ের র‍্যাক দেখা যাচ্ছে। তাতে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস সব রকমের বইই আছে, শুধু ব্যাঙ্কিং-এর কোন বই নেই। দেখা যাচ্ছে দুটো স্যুটকেস, আলনায় ঝুলানো আধময়লা জামাকাপড়, স্টোভ, কুকার, তাকে তোলা চায়ের কাপ, চিনির বৈয়ম। সেই সঙ্গে পোড়ামাটির ফুলদানি, ধূপদানিও আছে। কিন্তু ফুলও নেই, ধূপও জ্বলছে না। কোন কোন দিন ফুল নিয়ে আসে অমলেন্দু। যত্ন করে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে। আবার কখন সে ফুল শুকিয়ে ঝরতে শুরু করে খেয়াল থাকে না। চোখে পড়লে সব রাস্তায় ফেলে দেয়। আবাব কিছুদিন শূন্যতার পালা চলে।

দাড়ি কামাবাব জিনিসগুলি নিয়ে দেয়ালে টানানো আয়নার সামনে দাঁড়াল অমলেন্দু। অন্যদিন অফিস থাকে বলে রোজ সকালেই দাড়ি কামায়। আজ আর কোথাও বেরোবার তাড়া ছিল না। তাই গড়িমসি কবতে করতে গালে ছত্রিশ ঘণ্টার দাড়ি জমে গেছে। রুপালি দানা চিক চিক করছে কিছু কিছু। বড় বিশ্রী লাগছে দেখতে। সাবানের ফেনায় তাড়াতাড়ি দুটি গাল ঢেকে ফেলল অমলেন্দু। বয়স শুধু দুটি গালেই তার হাত বুলিয়েছে। আর কোথাও কিছু করতে পারেনি। চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি, টাক পড়েনি। তার অনেক সমবয়সী বন্ধু অকালে বুড়ো হয়েছে। কিন্তু অমলেন্দুর শরীরে বয়সের ছাপ তত স্পষ্ট নয়। প্রকৃতি তাকে অনেক সময় দিয়েছে, অনেক খাতির করেছে। যদি সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার না করতে পারে অমলেন্দু সে তার নিজেবই দোষ। এখনো তার দীর্ঘ দেহে মেদ জমেনি, গায়ের চামড়া মসৃণ আর রঙ উজ্জ্বল রয়েছে। ওদের বাড়ির সামনের রাস্তা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রীনা সেদিন বলেছিল, 'আপনার মত এমন মানুষ আর আমি দেখিনি।'

রাস্তার ডানদিকে উঁচু দেয়াল। কোন এক পড়ন্ত জমিদারের বাগানবাড়ি। বাড়িটি পরিত্যক্ত, ব্যবহারের অযোগ্য। আর বাগান এখন জঙ্গল। তবু তার ভিতর থেকে বাতাবি ফুলের তীব্র গন্ধ আসছিল।

অমলেন্দু বলেছিল, 'তার মানে ?'

'মানে আপনাব মত এত অদ্ভুত—'

বলেই থেমে গিয়েছিল রীনা।

অমলেন্দু হেসে বলেছিল, 'থামলে কেন ? অদ্ভুত কী ! সুন্দর ?'

রীনা সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করে বলেছিল, 'মোটেই তা নয়। নিজের মুখেই নিজের রূপের কী প্রশংসা। গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ে না।'

অমলেন্দু বলেছিল, 'কী করবো বলো। প্রশংসা কববার মত আর তো কেউ নেই। তাই নিজেই নিজের সুখ্যাতি করি।'

রীনা বলেছিল, 'করুন গিয়ে। তাই বলে আমি কিন্তু করতে যাচ্ছিনে। বুড়ো মানুষের আবার সুন্দর অসুন্দর কি।'

অষ্টাদশী তরুণীর অমলেন্দুকে বুড়ো বলবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। তবু বুকের মধ্যে বল্লমের খোঁচা লেগেছিল অমলেন্দুর, মুখে যন্ত্রণার ছাপও ফুটে থাকবে।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি অমলেন্দু। নিঃশব্দে সেই বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছিল। কিন্তু বাতাসে সেই মধুরতাটুকু যেন আর ছিল না।

কিন্তু একটু বাদেই রীনা একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল, 'অমনি বুঝি রাগ হল ?'

'রাগ হবার কী আছে। তুমি তো সত্যি কথাই বলেছ।'

'মোটেই তা নয়। সত্যি মিথ্যে বুঝবার মত বুদ্ধি কি আপনার নেই। কী মানুষ আপনি।'

রীনার সেই মিষ্টি ধমকটুকু অমলেন্দুর ভারি ভালো লেগেছিল। হেসে বলেছিল, 'অদ্ভুত মানুষ। তাই না ?'

রীনা বলেছিল, 'সত্যিই অদ্ভুত। আপনি ঠিকই জানেন আপনি বুড়ো হননি। কোনদিনই বুড়ো হবেন না।'

অমলেন্দু বলেছিল, 'কোনদিনই বুড়ো হব না ? আশ্চর্য। তুমি কি বর দিচ্ছ ?'

রীনা বলেছিল, 'আমার বর দেওয়ার যদি শক্তি থাকে তাহলে দিচ্ছি।'

মুগ্ধ চোখে অমলেন্দু সেই তন্বী গৌরী বরদার দিকে তাকিয়েছিল। অনন্ত যৌবন কি শুধু মাস আর বছর গুণে গুণে হয় ? একটি মুহূর্তই কি সেই অনন্তের স্বাদ দেয় না ? অতি পরিমিত সীমিত এই জীবনকে অক্ষয় আনন্দে ভরে তোলে না ? গত দেড় বছরের মধ্যে এমন কত মুহূর্ত এসেছে। যে কোন একটি মুহূর্তে অমলেন্দু ওর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে নিতে পারত। জীবনের বাকী দিনগুলিকে ভরে নিতে পারত। কিন্তু পারেনি। সাহস হয়নি অমলেন্দুর। ধরা মানে তো ধরা দেওয়া। যদি সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি ছাড়িয়ে নিত রীনা, যদি হেসে উঠে বলত, 'ওকি হচ্ছে ছাড়ুন, ছাড়ুন।'

তাহলে অমলেন্দুর মান থাকত কোথায়।

এই অসমবয়সী বন্ধুত্ব কি অতখানি ভার সইত ? শিষ্টাচারের সঙ্গে সেই আচরণের কি কোন সম্বন্ধ থাকত ?'

কিন্তু ওই অষ্টাদশী মেয়েটির অমন করে সঙ্গদান, তার কথা দৃষ্টি হাসি সবই কি শুধু কৌতুক আর পরিহাস—আর কিছু নয় ? অমলেন্দুর নিজের মন ছাড়া বাসনার কোন অঙ্কুরই কি আর কোথাও উদ্গত হয়নি ? নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব কি একই জায়গায় থেমে থাকে ? তার রূপান্তর হয় না ? পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না ? অসমবয়সী নারীপুরুষের সার্থক প্রেমের কাহিনী কি অমলেন্দু শোনেনি, পড়েনি ? নিজের চোখে দেখেনি ? তবে এত ভয় কিসের অমলেন্দুর ? নারীকে জয় করতে হলে আগে ভয়কে জয় করতে হয়। অমলেন্দুর হারাবার কী আছে যে সে এত ভয় পাচ্ছে ?

অবশ্য বিনয়দা আর রেখা বউদি কিছুতেই মত দিতে পারেন না। জাতে যদিও এক, অমলেন্দু এখন যা আয় করে তাতে ছোট একটি সংসার যদিও সে দিব্যি চালাতে পারে তবু ওঁরা কিছুতেই মত দেবেন না। বিনয়দা যদিও অমলেন্দুর চেয়ে দশ বারো বছরের বড় আর রেখা বউদি ছ' সাত বছরের তবু অমলেন্দুর মত একজন বয়স্ক পুরুষকে ওঁরা নিশ্চয়ই কন্যা দান করবেন না। যদি কিছু করতে হয় ওঁদের অমতেই করতে হবে। ওঁদের সঙ্গে হয়তো চিরদিনের মত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অমলেন্দুকে নিশ্চয়ই ওঁরা বিশ্বাসঘাতী বলবেন, অকথ্য নিন্দায় তার পরিচিত মহলকে ভরে তুলবেন। কিন্তু তাতে কী এসে যায় ? একটি সম্পর্কই কি জীবনে যথেষ্ট নয় ? একটি নারীর জন্যে অমলেন্দু যদি সর্বস্ব পণ না করতে পারে তবে করল কি ?

দাড়ি কামাতেই চল্লিশ মিনিট লেগে গেল অমলেন্দুর। গালের ওপর দিয়ে সে শুধু ক্ষুর চালায়নি, ভীরুতা দুর্বলতার ওপর দিয়েও সমানে খুরপি চালিয়েছে।

কিন্তু আর বেশি দেরি করা চলবে না। বলা যায় না তার আশায় আশায় বসে থেকে রীনা হয়তো কোথাও বেরিয়ে যেতে পারে। ওই বয়সের একটি তরুণী ছুটির দিনের সন্ধ্যাটি শুধু ঘরে বসে বসে কাটাবে এমন আশা করাই ভুল। বলা যায় না, দেরি দেখলে বিনয়দা নিজেই হয়তো মেয়েকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারেন। বেড়াতে তিনিও তো কম ভালোবাসেন না।

ঘরের বাইরে সিঁড়ির পাশে বেশ বড় একফালি জায়গা। ঠিকে ঝি বালতিতে করে জল তুলে রেখে গেছে। সেখানেই মুখ ধুয়ে নিল অমলেন্দু। নীচে বাথরুম আছে। কিন্তু স্নান করতে গেলে আরো বেশি দেরি হয়ে যাবে। সব কিছুতেই দেরি হয় অমলেন্দুর। সব কিছুতে দেরি। আর কত দেরি করবে? আর কত দেরি সইবে? যৌবন নিঃশেষে ঝরে যেতে আর ক'টি মুহূর্তই বা বাকি? এই ক'টি মুহূর্তকে অসংকোচে ভোগ করতে হবে। শুধু ভোগ আর সম্ভোগ, ভোগ আর সম্ভোগ। আর কোন কথা নেই। নীতি দুর্নীতি সঙ্গতি অসঙ্গতি সমস্ত বিচার বিবেচনা নির্মমভাবে ঠেলে ফেলতে হবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই।

স্যুটকেস থেকে ধোয়া ধুতি পাঞ্জাবি বার করল অমলেন্দু। অফিসে অবশ্য বেশির ভাগ ট্রাউজার পরেই যায়। কিন্তু রীনা বলেছিল ধুতি পাঞ্জাবিতেই তাকে মানায় বেশি। রেখা বউদির তাই মত। মা আর মেয়ের রুচি অনেকটা একইরকম। চেহারার সাদৃশ্য তো আছেই। তবে গত বছর দশেকের মধ্যে রেখা বউদি দারুণ মোটা হয়ে গেছেন। তাঁকে যেন আর চেনা যায় না।

দ্রুত হাতে বোতাম লাগানো শেষ করল অমলেন্দু। সযত্নে চিরুনি বুলাল চুলে। ঘন কালো আর কোঁকড়ানো চুল অমলেন্দুর। তার এই চুলের মধ্যে কতদিন রীনা আঙুল বুলিয়ে দিয়েছে। খেয়েদেয়ে ওদের বাড়িতে শীতল পাটির ওপর গা এলিয়ে দিয়েছে অমলেন্দু। বাপের আদেশে মায়ের আদেশে রীনা এসেছে তার পরিচর্যা করতে।

রেখা বউদি বলেছেন, 'যত্ন কর কাকাবাবুর। পা টিপে দে।'

অমলেন্দু আপত্তি করে বলেছে, 'না না, ওসব আমার লাগবে না।'

রেখা বউদি বলেছেন, 'তোমার তো কিছুই লাগে না। কিন্তু ওর একটু সেবাযত্ন শেখা ভালো। আজকালকার মেয়েরা এসব মোটেই শিখতে চায় না। সেবা করতে জানা যে কত বড় গুণ—'

রীনা হেসে বলেছে, 'মা আমার কোন গুণ দেখতে পান না।'

ওর মা জবাব দিয়েছেন, 'কথা শুনেছ? কত বড় গুণবতী আমার।'

মায়ের উপদেশেই হোক আর নিজের অভিরুচিতেই হোক রীনা কিন্তু খুবই সেবা করে অমলেন্দুর। পায়ের কাছে কিছুতেই ওকে বসতে দেয় না অমলেন্দু। 'উঁহু, পায়ে হাত দিয়ো না. ভারি সুড়সুড়ি লাগে।'

বিনয়দা বলেন, 'অমল, তোমার ওই সুড়সুড়িটা মোটেই সুলক্ষণ নয়। এই সুড়সুড়ির জন্যেই পদসেবিকা কেউ ঘরে এলো না।'

রীনাকে মাথার কাছে এসে বসায় অমলেন্দু, বলে, 'তার চেয়ে তুমি আমার চুলে হাত বুলিয়ে দাও।'

অমলেন্দুর ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে রীনা বলে, 'ঈস, কী চুলই করে রেখেছেন। চুল তো নয় জটাজাল। সাবান-টাবান মাখেন না বুঝি?'

অমলেন্দু জবাব দিয়েছে, 'সময় কোথায়?'

'সময়ের জন্যেই বুঝি?'

'তবে কিসের জন্যে?'

রীনা গলা নামিয়ে বলেছে, 'আসলে মন নেই।'

কিন্তু কথাটা কানে গেছে রেখা বউদির। তিনি সায় দিয়ে বলেছেন, 'ঠিকই বলেছিস রিনি। আসলে তোর অমলকাকার বিবাগী হয়ে যাওয়ার মতলব। জটাজট্ রেখে রুদ্রাক্ষের মালা পরে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে—সেই সেকেলে সন্ন্যাসীর মত—'

রীনা জবাব দিয়েছে, 'তা কী আর করবেন বল। এখানে তুমি আর বাবাই তো ওঁর মুরুব্বি। তোমরা যদি ওঁর কোন ব্যবস্থা না করে দাও—'

রেখা বউদি বলেছেন, 'মেয়ে কেমন পাকা পাকা কথা শিখেছে দেখেছ অমল? এখন তো দেখছি সবচেয়ে বড় মুরুব্বি হয়েছিস তুই। আমরা তো বলে বলে হার মানলাম তুই একটা বিয়ে টিয়ে দিয়ে দে তোর কাকাবাবুর।'

রীনা বলেছে, 'তা তো দেবই। আমি যদি একবার চেষ্টায় নামি কিছুতেই হার মানব না।'

ওর মা বলেছেন, 'কি রকম জোর দেখেছ মেয়ের ? ওর বাবাও ওর কাছে ঠিক এমনি জব্দ !' তুমিও ভাই এবার বড় শক্ত হাতে পড়েছ ।'

অমলেন্দু লক্ষ্য করেছে, রীনার মা যতই 'কাকাবাবু কাকাবাবু' করুন, রীনা সম্বোধনটা এড়িয়ে যায় । রীনা তাকে কোন কিছু বলেই ডাকে না । বাবা মার সামনে যদি বা কদাচিৎ কাকু কি কাকাবাবু বলতে বাধ্য হয়, ওঁরা যখন না থাকেন রীনা ভুলেও কোন সম্বোধনের দিকে যায় না, কিন্তু সম্বন্ধটা আরও গাঢ়, আরও গভীর হয়ে ওঠে । তখন আরও চটুল, আরও প্রগলভ, নারী হিসাবে আরও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে রীনা । অমলেন্দু বাধা দেয় না, বরং উপভোগ করে । মনে হয় এমন বন্ধুত্বের স্বাদ সে আর কোন মেয়ের মধ্যেই পায়নি । এমনো মনে হয় এই যেন তার প্রথম রমণী দর্শন হল । তা অবশ্য ঠিক নয় । দেখেছে সে আরো অনেককেই । দূর থেকে দেখেছে, কাছে গিয়ে দেখেছে । শুধু দেখা, শুধু শোনা, আর কথা বলা । শুধু বাক্য বিনিময় । তার চেয়ে বেশি কিছু নয় । কিন্তু রীনার সঙ্গে এই দেখা যেন সব দেখাকে ঢেকে দিয়েছে । সব স্মৃতি এবং বেশির ভাগই দুঃখের স্মৃতি নিঃশেষে মুছে দিয়েছে । এখানেও শুধু বাক্য বিনিময় । কিন্তু সেই বাক্যের মধ্যে যে কায় আর মন এমন ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছে তা কে জানত ।

চুল আঁচড়ানো শেষ করল অমলেন্দু । তারপর কি ভেবে স্নোর কৌটো খুলে আঙুলের ডগায় ভরে ভরে একটু শ্বেত পদার্থ তুলে নিয়ে গালে কপালে ঘষে দিল । এ সব প্রসাধনের বস্তু আগে সে ছুঁয়েও দেখত না ।এখন তার সবই দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ।

এই যে রীনার কিছু বলে না ডাকা, অমলেন্দুকে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠা, তার সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করা, বেড়ানো, বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে একেবারে সমবয়সী বন্ধু হয়ে যাওয়া—এ সব কি একান্তই অর্থহীন ? এর মূলে কি আর কিছুই নেই ? কিছুই আশা করবার মত নেই অমলেন্দুর ? নারীচরিত্র কি এতই দুর্জ্ঞেয় ? দু একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে পরামর্শ নিয়েছে অমলেন্দু । যারা বিচক্ষণ আর অভিজ্ঞ এমন সব বন্ধুরই পরামর্শ চেয়েছে । নামধাম গোপন করে খুঁটে খুঁটে শুধু একটি তরুণীর আচার আচরণ বর্ণনা করেছে । প্রীতি শ্রদ্ধা বন্ধুত্ব ছাড়া অণুবীক্ষণে আরো কিছু ধরা পড়ে কি না, পরম আগ্রহে জানতে চেয়েছে । দু একজন অতিসাবধানী নীতিবাগীশ বন্ধু ছাড়া বেশিরভাগ সুহৃদই অমলেন্দুর অন্তরের কথা বলেছে । সে যা শুনতে চায় তাই শুনিয়েছে । তারা বলেছে, 'ভয় নেই এগিয়ে যাও । তবে চালে যেন ভুল না হয় ।'

চালে কি সত্যিই ভুল হবে অমলেন্দুর ? কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই, আত্মীয়তার সম্বন্ধ নেই । একান্তই বন্ধুত্বের সম্পর্ক । সে সম্বন্ধকে কোন বৈষয়িক স্বার্থ দিয়ে বাঁধেনি অমলেন্দু । কোন সাংসারিক প্রয়োজন দিয়ে বাঁধেনি । শুধু ভাবের সমুদ্রে এই সম্পর্ককে অবাধে সাঁতার কাটতে দিয়েছে । বিনয়দা প্রবীণ মুনসেফ । বাংলা দেশের নানা জেলায় কাজ করেছেন । সরকারী বেসরকারী কতজনের সঙ্গেই ওঁর জানাশোনা । কিন্তু অমলেন্দু কোন দিন কোন সুপারিশ চিঠি ওঁর কাছে চায়নি । চাকরির জন্যে উমেদারি করেনি, অর্থসঙ্কটে পড়েও টাকা ধার চায়নি । শুধু বই ধার নিয়েছে আর বই ধার দিয়েছে । আর যা দানপ্রতিদান তাকে ঠিক ধার বলা যায় না, তা একেবারেই ধরে দেওয়া, আর রূপান্তরে ফিরে পাওয়া । স্নেহপ্রীতি শ্রদ্ধা বন্ধুত্ব—যা কোন বস্তুতে আকার পায়নি, কোন বড় রকমের কাজের মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি, যা শুধুই মধুর অনুভূতিতে ছড়িয়ে রয়েছে । এমন একটি সম্পর্ককে নষ্ট করে দিতে হবে । নষ্ট করা ছাড়া কি । অমলেন্দু যা করতে যাচ্ছে তা ওঁদের পক্ষে একান্তই অভাবিত, অপ্রত্যাশিত আর অবাঞ্ছিত । কিছুতেই ওঁরা এতে রাজী হবেন না । রাজী তো হবেনই না, বরং অবাক হবেন—অমলেন্দু এমন কথা ভাবতে পারল কি করে । হয়তো অমলেন্দুর সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতি বলেই মনে করবেন ওঁরা । তাই যদি কিছু করতে হয় ওঁদের মতের বিরুদ্ধেই করতে হবে । ওঁদের বিরূপতা এমনকি ওঁদের বৈরিতার জন্যেও তৈরি থাকতে হবে অমলেন্দুকে । কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায় ? যাকে পেলে জীবনে সবই পাওয়া হবে বলে ভাবছে অমলেন্দু তার জন্যে কি সব ছাড়তে পারবে না? যা তাকে ছাড়তে হবে তা কি বাকি জীবনের পক্ষে একান্তই বাহুল্য আর অকিঞ্চিৎকর নয় ? শুধু একখানি ঘর, একটি মেয়ে আর পরস্পরের ভালোবাসা যা দুটি ভিন্ন সত্তাকে অভিন্ন করে তার জন্যে অমলেন্দু কী না ছাড়তে পারে, কাকে না ছাড়তে

পারে ?

কিন্তু ওই একটি তরুণীর সাময়িক অবুঝ অনুরাগ আর সেই সর্বপ্লাবী, সর্বাত্মক প্রেম যে একার্থক তা অমলেন্দুকে কে বলল ? এমন কি কোন নিশ্চয়তা আছে, রীনা অমলেন্দুর সঙ্গ পছন্দ করে বলে সে চিরজীবনের মতই তার সঙ্গিনী হতে চায় ? অমলেন্দুর কি সেই ঐশ্বর্য আছে, সেই অপরিমিত খ্যাতি প্রতিপত্তি যাকে রীনা যৌবনের বিকল্প হিসাবে মনে করতে পারে ? যৌবনের কি সত্যিই কোন বিকল্প আছে ?

জামাজুতো পরে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল অমলেন্দু হঠাৎ থেমে গেল। দু পা পিছিয়ে এল। নিজের সঙ্গে আরো একটু বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার। নইলে রীনাকে বোঝাবে কী করে। রীনা যদি জানতে চায়, রীনা যদি জিজ্ঞাসা করে 'কোন্ সম্পদ, কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তুমি আমার সামনে তুলে ধরছ ? তুমি আমাকে কী দিতে পারবে, কত দিন দিতে পারবে ?' রীনা যদি জানতে চায় ! সদুত্তর কি তৈরি করে যাওয়া উচিত নয় অমলেন্দুর। নইলে রীনার কাছে সে হয়তো একেবারেই বোকা বনে যাবে, বোবা বনে যাবে। অমলেন্দু তো শুধু সাময়িক দেহের তৃপ্তি চায় না, তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা আছে। কিছু টাকা খরচ করলেই ক্ষণিক অবকাশের সঙ্গিনী কাউকে না কাউকে জুটিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু অমলেন্দু তো তা চায় না। ছলে বলে কৌশলে কিছুক্ষণের জন্যে একটি তরুণীর দেহসান্নিধ্য তার লক্ষ্য নয়। সে চায় সারাজীবনের জন্যে। গোটা একটি জীবনকেই ধরে দিতে চায়। কিন্তু এই জীবন কোন অর্থে মূল্যবান ? রীনা তাকে কেনই বা এত দাম দেবে ? তাকে এমন কোন মহৎ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে অমলেন্দু ? শুধু প্রেম সংসার সন্তান ? তাতেই কি এ যুগের মেয়ে তৃপ্ত হবে ? দু দিন বাদে সত্যিই যখন জরা এসে অমলেন্দুকে আঁকড়ে ধরবে তখন কি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না রীনা ? হাসবে না উপহাসের হাসি ? ছুটে পালাতে চাইবে না বাহুবন্ধন ছেড়ে ? যদি নাও যেতে পারে একটি অকৃতার্থ অকিঞ্চিৎকর প্রৌঢ় পুরুষকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছে বলে মনে মনে কি অনুতাপ করবে না ? কে জানত এমন একটি রত্নমালা গলায় পরবার অমলেন্দুর সুযোগ হবে। তাহলে নিজেকে হয়তো সেই বরমাল্যের যোগ্য করে তুলত। এখন কি আর সেই সময় আছে ? যার জন্যে এক জীবনের সাধনা দরকার তা কি আর দু এক বছরে আয়ত্ত করতে পারবে অমলেন্দু ? এ তো আর জুয়ো নয়, লটারি নয় !

বন্ধুমহলে সৎ সজ্জন বলে কিছু খ্যাতি আছে অমলেন্দুর। অসফল হয়েও সে অমধুর নয়। আচারে আচরণে ভাষণে সে বন্ধুকে সঙ্গীকে প্রসন্ন করতে পারে। সেই প্রসন্নতা শুধু আর একজনের চোখে মুখে ফুটে ওঠে আবার ফুলের মতই পরমুহূর্তে মিলিয়ে যায়। কি সৌরভের স্মৃতিটুকু থাকে। কিন্তু প্রেম তো শুধু মৃদু ক্ষীণ সৌরভ মাত্র নয়। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর মধ্যে তাকে রূপ দিতে হবে। বিপুল খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্থসম্পদের আড়ালে যৌবনের অভাবকে লুকিয়ে রাখতে হবে। তা কি পারবে অমলেন্দু ? সে তো আর জুয়াড়ী নয়, ঐন্দ্রজালিক নয়।

তার চেয়ে অকপটে নিজের অক্ষমতার কথা খুলে বলাই ভালো। 'আমি তোমাকে বিপুল বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী করে রেখে যেতে পারব না। কিন্তু তোমার জন্যে সারাদিন পরিশ্রম করব। একটি মধুর সুখের নীড় গড়ে তুলব। সেই ঘরের সবচেয়ে বড় সজ্জা হবে গভীর বিশ্বাস নির্ভরতা আর প্রেম। কোন খ্যাতি কীর্তির অংশভাগিনী আমি তোমাকে করে তুলতে পারব না। আমি পাঁচজনের একজন নই, দশজনের একজন নই, সহস্রজনের একজন। অযুত নিযুতের সঙ্গে আমি যুক্ত। আমি তো শিল্পী নই, বিজ্ঞানী নই দার্শনিক নই। আমার একক সৃষ্টি একক আবিষ্কারের একক চিন্তায় কোন অহঙ্কার নেই। আমরা দুজনে মিলে সৃষ্টি করব। একটি সংসার—একটি কি দুটি সন্তান—

কিন্তু এ সব কী ভাবছে অমলেন্দু ? তার মাথা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেল ? সে কি এই ভাষায় ওই আঠের বছরের একটি মেয়ের কাছে প্রণয় নিবেদন করবে ! তার মুখ থেকে এই বৈদিক মন্ত্র যদি শোনে—রীনা কি হেসে উঠবে না ! হয় হাসবে না হয় বোকার মত তাকিয়ে থাকবে। ওর সঙ্গে ওর ভাষায় কথা বলতে হবে। ওর সঙ্গে ওর বয়সী হয়ে চলতে হবে। সমস্ত চিন্তাভার, আর অসফল অভিজ্ঞতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে নবযুবকের বেশে ওর হাত ধরতে হবে অমলেন্দুকে। তবে তো

সেই হাতখানা ধরে রাখতে পারবে। ওর বয়সী হয়ে ওর সঙ্গী হতে হবে। রীনা যদি অষ্টাদশী, অমলেন্দুকে কিছুতেই একুশের বেশি হলে চলবে না। ওরই মত ভাষায় ওরই মত উৎসাহে ঔজ্জ্বল্যে আনন্দে যৌবনের উদ্দীপনায় দীপ্ত হতে হবে অমলেন্দুকে। আর বিনয় কখনো নয়। বিনয় কখনো কাজে আসে না। না প্রকৃতির কাছে না প্রকৃতজনের কাছে। অহঙ্কার চাই, ঔদ্ধত্য চাই। কোন হতাশা নিরাশার চিত্র ওর সামনে তুলে ধরলে চলবে না। সাফল্যের সার্থকতার বহুবর্ণ বহ্নিরূপ ওর সামনে মেলে ধরতে হবে। বলতে পারা চাই, 'তোমাকে গাড়ি দেব, বাড়ি দেব, রত্ন অলঙ্কারে ভূষিত করে দেব। আর যৌবন ? যৌবন কি শুধু বয়সের সংখ্যার মধ্যে ? তুমি আমার স্বাস্থ্যের দিকে তাকাও, তুমি আমার দুর্বার বাসনা কামনার দিকে তাকাও, তুমি আমার শক্তিমত্তার দিকে চেয়ে দেখ।' শক্তি না থাকলেও শক্তিমত্তার কথা বলতে হবে। আত্মমহিমা প্রচার করতে হবে। যে নিঃসঙ্কোচ, নির্লজ্জ, স্বমহিমায় যে সোচ্চার, সেই তো স্বীকৃতি পায়। তোমার আশেপাশে যারা আছে তুমি যে কী তারা তা যাচাই করতে যাবে না। সেই সময় কোথায়, তাদের সেই সাধ্য কোথায়। তুমি যা চাও তাই তোমাকে তারা দেবে। শুধু চাইতে জানা চাই। তুমি নিজেকে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যে দেবতা বলেই ঘোষণা কর না, তারা সেই মন্ত্রে তোমার স্তব করবে, অর্চনা করবে, শুধু তোমার ঘোষণা করতে জানা চাই। শুধু কণ্ঠস্বর থাকা চাই তোমার। সেই স্বর যেন নির্দ্বিধ হয়, জড়তাহীন হয়, তাহলেই তা শরবৎ লক্ষ্য ভেদ করবে। অমলেন্দু তাহলে কোন দেবমূর্তি ধরে দেখা দেবে রীনার কাছে ? বজ্রধর ইন্দ্র না কি মুরলীধর মদনমোহন ? কিন্তু একটি দেবতার আসন কি ওই চৌধুরী পরিবারে এরই মধ্যে তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিনয়দা কি কথায় কথায় বলেন না, 'এ জীবনে কত মানুষকে দেখলাম, হাকিমের চেয়ারে বসে কত দণ্ডমুণ্ড দিলাম, কিন্তু আমাদের অমুর মত এমন একজনকেও দেখলাম না।'

বউদি প্রতিপক্ষ সেজে বলেছেন, 'আহাহা। কী দেখেছ তুমি ওর মধ্যে ?'

বিনয়দা বলেছেন, 'একজন সৎ মানুষকে। একজন আপন মানুষকে। সৎ না হলে একজন আর একজনের আপন হতে পারে না, বন্ধু হতে পারে মা।'

বউদি বলেছেন, 'তুমি ওকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে তো একেবারে চূড়ায় তুলে দিলে। কিন্তু মানুষ করতে পারলে কি ? অমল কি আর পুরুষের মত পুরুষ হতে পারল ? না পারবে কোন দিন ?'

বিনয়দা বলেছেন, 'পৌরুষ বুঝি শুধু পেশীতে ? তাহলে একজন পালোয়ানকে বিয়ে করলেই পারতে।'

বউদি জবাব দিয়েছেন, 'পারলে তো তাই করতাম। তাহলে কি আর এমন রোগা কালো শুকনো আইনের পুঁথি পড়া খেজুর গাছের গলায় মালা পরাতাম ? দশজনে যা বলল, তাই করলাম। চোখ বুজে মালা পরিয়ে দেখি আস্ত একটি গাছ।'

বিনয়দা বলেছেন, 'তোমার বাবা তোমাকে জলে ফেলে দিলেও পারতেন। তার বদলে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন এই তো তোমার দুঃখ ?'

বউদি বলেছেন, 'হ্যাঁ একটি বৃক্ষ, আর একটি দেবতা।'

বিনয়দা হেসে বলেছেন, 'যাকগে অমল, তোমার আফশোস করবার মত কিছু আর রইল না। তোমার বউদি তোমাকে মানুষ বলে না মানলেও সুপারম্যান বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। একেবারে দেবতা। আগে জানলে আমিও এমনি আইবুড়ো থাকতাম, পান-তামাক খেতাম না—'

বউদি প্রতিবাদ করেছেন, 'পান তামাক না খেলেই বুঝি সাত্ত্বিক হওয়া যায় ?'

বিনয়দা বলেছেন, 'গালভরা বিশেষণটি শুনলে ? রেখা তোমার মত সাত্ত্বিক পুরুষ আর দ্বিতীয় কাউকে দেখেনি। আধাসন্ন্যাসী হয়েই এই সম্মান, আর যদি কোন রকমে গেরুয়াটি পরে ফেলতে ভাই, তাহলে তোমার চারদিকে পুরোপুরি একটি আশ্রম গজিয়ে উঠত। মেয়েদের জন্যেই মহান্তরা টিকে আছে।'

বউদি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছেন, 'বরং বলো মেয়েদের জন্যেই মহতেরা টিকে আছেন।'

মহৎ না হোক একটি সজ্জন সুহৃদের আসন এই পরিবারটিতে বহুদিন আগে থেকেই অমলেন্দুর জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। এমন এক দেবতা যার বর দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সংহার করবার

প্রবৃত্তিও নেই। সে শুধু নিজে প্রসন্ন থেকে আশেপাশের আরো কয়েকজনকে প্রসন্ন করতে পারে। যার আকৃতি সুন্দর সুষম আর সৌম্য, যার প্রকৃতি মধুর—বাক্যে আচরণে, স্নেহে-প্রীতিতে সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়। যে জীবনে কিছুই করতে পারেনি, কিন্তু সেই না পারার হাহাকারে আর কারো অস্তিত্বকেও অসহনীয় করে তোলেনি। বরং দিনে দিনে সে তাদের সুদিনের সঙ্গী দুর্দিনের সুহৃদ্ হয়ে উঠেছে।

তখন কোথায় ছিল ওই রীনা? তার অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু সে আসুক, ছেলেই হোক মেয়েই হোক, একজন কেউ আসুক এই আকুতি দুজনের মনেই ছিল। অমলেন্দু বলতে পারে তিনজনের মনে। কলকাতায় নামকরা ডাক্তারদের কাছে ওঁরা তাকে সঙ্গে নিয়েই গেছেন। শিবতলা, ষষ্ঠীতলা কালীঘাটের সঙ্গী অবশ্য রেখা বউদি তাকে করেননি। হয়তো লজ্জা বোধ করেছেন। অমলের এসব অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস নেই জেনে নিরস্ত হয়েছেন। ওঁরা যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন প্রত্যাশার অতীত প্রতীতি হয়ে রীনা এল রেখা বউদির কোলে। এমন কষ্ট দিয়ে এমন কষ্ট করে এল যে আর কারো আসবার আর সম্ভাবনা রইল না।

বউদি বললেন, 'আর দরকার নেই। বেঁচে থাকলে এই একটিই যথেষ্ট।'

অমলেন্দু বলেছিল, 'একটি ছেলে হলে বেশ হত। তবে শতপুত্রসমা কন্যা।'

বিনয়দা হেসে বলেছিলেন, 'অগত্যা।'

তখন ওঁরা কৃষ্ণনগরে। নিঃসন্তানের ঘরে সন্তানের সেই প্রথম আবির্ভাব-উৎসবের কথা আজও মনে আছে অমলেন্দুর। মিষ্টির হাঁড়ি নিজেই সে হাতে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিনয়দার স্বজন বন্ধুদের পরিবেশন করেছিল নিজের হাতে। তারপর বদলীর চাকরিতে ওঁরাও নগরে নগরে ঘুরেছেন, অমলেন্দুও ব্যাঙ্কের এক শাখা থেকে আর এক শাখায় বদলী হতে হতে ঘুরে বেড়িয়েছে। নাগপুর, বোম্বে, সুরাট, বরোদা। বাইরে যাওয়ার জন্যে যখন আর কাউকে পাওয়া যায়নি, কেউ কেউ জেনারেল ম্যানেজারের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকেছে, অমল নিজে গিয়ে বলেছে, 'আমি যেতে পারি।'

যার ঘরও নেই, সংসারও নেই, ছেলেমেয়ের স্কুল পাল্টাবার সমস্যা নেই, সে যাবে না তো কে যাবে?

প্রথম দিকে তবু দেখাসাক্ষাৎ হত, মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় ওঁদের আতিথ্যও নিত, আতিথ্য দেওয়ার সৌভাগ্যও যে তার একেবারে না হয়েছে তা নয়, সমুদ্রতীরে ভ্রমণসঙ্গীও হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু শেষ আট-দশ বছর ধরে তেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আর ওঁদের সঙ্গে ছিল না অমলেন্দুর। চিঠিপত্র মাঝে মাঝে লিখেছে, দেখা হয়েছে ক্বচিৎ কখনো। আর সেই অদর্শনের সুযোগ নিয়ে তিলে তিলে বাড়তে বাড়তে তারই দেওয়া নাম বয়ে বেড়াতে বেড়াতে একটি মেয়ে হঠাৎ কখন যে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে তা অমলেন্দু টের পায়নি। পেল দেড় বছর আগে। ইছামতীর তীরে এই ছোট্ট সীমান্ত শহরে বিনয়দার নতুন কোয়ার্টারে বেড়াতে এসে। ফের যখন বদলীর আদেশ হল এত শহর বন্দর থাকতেও ব্যাঙ্কের এই নতুন শাখা অফিসই বরণীয় হয়ে উঠল অমলেন্দুর কাছে। সহকর্মীদের কেউ কেউ অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্য, আপনি তো বাংলাদেশের বাইরে বাইরে ঘুরতেই ভালোবাসতেন।'

অমলেন্দু হেসে বলেছিল, 'এবার একটু ভিতরটা ঘুরি।'

ভেবেছিল বিনয়দারা এখানে আছে, রোজ ওঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে সেই লাভই পরম লাভ। একই সঙ্গে লাভ আর লোকসানের সীমান্তে এসে যে এমন করে দাঁড়াতে হবে অমল কি তখন স্বপ্নেও কল্পনা করেছিল? না এলেই ভালো হত। না দেখলেই ভালো হত। নিমেষের জন্যে একটু দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে পারলেই ভালো হত। অমলেন্দু তা যেতে পারেনি। বরং প্রায় রোজ গেছে বিনয়দার ওখানে। রীনাকে পড়াশুনোয় সাহায্য করেছে। গল্প শুনিয়েছে, গান শুনেছে। আর মাঝে মাঝে বেড়াতেও বেরিয়েছে। বেশির ভাগই কম্পাউণ্ডের ভিতরে, কদাচিৎ বাইরে। রেখা বউদি বলেছেন, 'তুমি এত ঘুরতেও পারো। মেয়েটাকেও তুমি ঘুরুনী করে ছাড়লে। এরপর ঘরে আর ওর মন বসবে না।'

শুধু সান্নিধ্য, শুধু সঙ্গ। আর কিছু কাম্য ছিল না। এখন সরে গেলেই হয়। কিন্তু সাধ্য নেই যেন

সরে দাঁড়াবার। দূরে যাবার। সে যেন জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। তাকে ছাড়া বাঁচবার সাধ্য নেই অমলেন্দুর।

'বাব্বা!' কী খাড়া দেখেছ মা? এ যে একেবারে স্বর্গের সিঁড়ি। আর কী অন্ধকার।'

অমল উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সেই চেনা কণ্ঠ। সেই বাঞ্ছিত প্রার্থিত স্বর। অমলেন্দু এই এক বছর ধরে প্রায় প্রতিদিন শুনেছে। শুনবার জন্যে প্রতিদিন নিমেষ গুনেছে।

'কারোরই যে সাড়াশব্দ নেই। অমল নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে। ওর মত ভবঘুরে এই সময় ঘরে বসে থাকে নাকি? তোমরাও যেমন।'

রেখা বউদির গলা।

'আরে না না। ওই যে আলো জ্বলছে ঘরে। দোর খোলা। অমল কি অতই লেখা সব ফেলে রেখে পালাবে? বসে বসে কী করছ অমল? ঝিমুনি না যোগনিদ্রা?'

বিনয়বাবু ভেজানো দরজা ঠেলে সদলবলে ঘরে ঢুকলেন।

অমলেন্দু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একমুহূর্ত অবাক হয়ে থেকে সবাইকে অভ্যর্থনা করল, 'আসুন আসুন।'

রেখা বললেন, 'এসে গেছি, এখন আসুন আসুন। সারা বিকেল সারা সন্ধ্যেটা আমরা তোমার জন্যে বসে বসে কাটালাম, কোথাও বেরোলাম না। আর তুমি এমন করে রবিবারের আসরটা মাটি করে দিলে?'

রীনা বলল, 'মা, তুমি বরং ওই বেতের চেয়ারটায় বসো। যেভাবে হাঁপাচ্ছ।'

অমলেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, আপনি বসুন, বসুন এসে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'তুমি তো বসতে বলছ। কিন্তু উনি কি ওতে ধরবেন?'

রেখা যে সত্যিই ধরেন প্রমাণ করবার জন্যেই যেন গোল হাতলওয়ালা নিচু সুন্দর বেতের চেয়ারটির মধ্যে নিজেকে গলিয়ে দিলেন। বিনয়বাবু ছোট্ট তক্তপোষখানার একপাশে বসে বললেন, 'দেখেছ অমল? একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তুমি তো কত মানুষের নাম রেখে রেখে নাম করেছ, তোমার রেখা বউদির একটা নতুন নাম এবার রেখে দাও। স্ত্রীকে আমার আর নাম ধরে ডাকবার উপায় নেই। সবাই ভাবে আমি পত্নী প্রেমে অন্ধ। কিন্তু এটা যে ওঁর পিতৃদত্ত নাম—'

রেখা হেসে বললেন, 'কিভাবে আমাকে খুঁড়ছে দেখলে অমল? মোটা হওয়ার জন্যে রাতদিন বাপ মেয়ের কাছে আমাকে খোঁটা শুনতে হয়। আছি মোটা তো আছি। তার জন্যে সংসারের কোন কাজ পড়ে থাকে বল? এই দেহ নিয়ে সবই করি। ওমা রীনি, তুই অমন তালগাছের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন। বোস।'

রীনা বলল, 'আমাকে তো কেউ বসতে বলেননি।'

রেখা বউদি হেসে উঠলেন, 'তোমার অতিথি-অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়ে গেছে অমল। রীনাকে এখন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে ঘরে নিতে হবে। মেয়ের আত্মসম্মান জ্ঞান কত যে বেড়েছে তা তো জানো না। কোথাও কেউ যদি নেমন্তন্ন করে মেয়ে কিছুতেই যেতে চায় না। বলে, তোমাদের দুজনকে বলেছে, আমাকে তো বলেনি।'

রীনা অমলেন্দুর দিকে তাকাল। তারপর একটু হেসে বলল, 'সত্যি কিনা বলুন। ওঁদের সঙ্গে সব জায়গাতেই কি আমাকে যেতে হবে।'

দীর্ঘাঙ্গী তন্বীর দিকে তাকাল অমলেন্দু।

কচি কলাপাতা রঙের শাড়িখানা সুন্দর মানিয়েছে। জামার রঙ ঘন লাল। গায়ের সাদা গৌরবর্ণের সঙ্গে ওর সব পরিচ্ছদই মানায়। কপালে কুমকুমের টিপ। ঠোঁটে লিপস্টিকের আভাস। দীর্ঘ বেণী পিঠে দুলছে। সুডৌল সুন্দর দুখানি হাতে দুটি স্বর্ণবলয়। অন্য দিন বিকালে যেমন করে সাজে আজকের সায়াহ্ন সজ্জায় তার চেয়ে কি বিশেষ নতুন কিছু আছে? অমলেন্দুর তা মনে হল না। তবু ওই একটি লম্বাটে ধরনের মুখখানিকে এমন অপরূপ আর অভিনব মনে হচ্ছে কেন? কপালে তো রোজই টিপ পরে রীনা। আজও পরেছে। কাজলও রোজই পরে, রোজই মোছে। কিন্তু অমলেন্দুর মোহের কাজল কি কোনদিনই ঘুচবার নয়?

ওর কথার জবাব না দিয়ে অমল বলল, 'বোসো।' নিজে যে চেয়ারটায় বসেছিল, তার দিকেই আঙুল বাড়াল অমলেন্দু।

রীনা বলল, 'আপনি বসবেন না?'

অমলেন্দু হেসে বলল, আমার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আজ তুমি হলে অতিথি।'

রেখা বললেন, 'অতিথি বলে অতিথি, একেবারে প্রধান অতিথি। কী খাতির রীনার। এই খাতির অবশ্য ওর পাওনা। ওর জন্যেই তোমার এখানে আজ আমাদের আসা হল। সেই তখন থেকে তাগিদের পর তাগিদ—'

রীনা বলল, 'বাঃ রে, যত দোষ বুঝি এখন আমার ওপর চাপাতে চাইছ? তুমিই তো বলছিলে আজ বোধ হয় ও আর এল না। চল দেখে আসি ওর ডেরা।'

অমলেন্দু মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'আমার এই ঘরকে আপনারা ডেরা বলছেন?'

রেখা বউদি বললেন, 'বলব না? যা ছিরি করে রেখেছ ঘরের। এর মধ্যে বাস করো কী করে?'

বিনয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। অমলের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'তোমরা গৃহী আর অতিথিরা ততক্ষণে কোন্দলটা সেরে নাও। আমি তোমার ছাদটা ঘুরে দেখি, সিগারেটটা শেষ করি। চমৎকার ছাদ পেয়েছে তো অমল। এমন খেলার মাঠের মত ছাদ থাকলে ঘর ঘরণী না থাকলেও চলে। সব ফাউ বলে মনে হয়, ফেউ বললেও চলে।'

রেখা বউদি ফোঁস করে উঠলেন, 'কী কী বললে। দাঁত থাকতে কি আর লোকে দাঁতের মর্ম বোঝে? মরে একবার দেখতে ইচ্ছে করে আমাকে ছাড়া তোমার চলছে কী করে।'

বিনয়বাবু একথার কোন জবাব না দিয়ে ছাদের প্রান্তে গিয়ে আলিসায় ভব করে দাঁড়ালেন।

অমল বলল, 'আপনারা একটু বসুন। আমি বাইরে থেকে আসছি।'

রেখা বউদি বললেন, 'অতিথি সৎকারের আয়োজন? দরকার নেই ভাই। আজ আর সময় হবে না।'

'কেন, আজ কী?'

'আজ আর এক জায়গায় যেতে হবে।'

'তাই বলুন। কোথায়?'

'আর বোলো না। জ্ঞানেশ ডাক্তারের ওখানে। তিনি সস্ত্রীক দুবার এসে গেছেন। আমি একবারও যাইনি। কালও ফোন করে সেই খোঁটা দিলেন। আজ ভাবছি সামাজিক ত্রুটি শুধরে আসি। উঠি এবার। দেরি হয়ে গেল। আমার কর্তাটিকে ডেকে দাও তো ভাই। উনি বোধ হয় একটি প্যাকেট শেষ না করে আর ওখান থেকে নড়বেন না।'

অমলেন্দু বলল, 'তাই কি হয়? খালি মুখে এখান থেকে যাবেন কী করে? আমার সঙ্গে বুঝি আর সামাজিকতা করতে নেই?'

রেখা বউদি হাসলেন, 'তোমার সঙ্গে সামাজিকতা করব? তুমি কি সামাজিক মানুষ?'

রীনা এদিকে পিঠ ফিরিয়ে বইয়েব র‍্যাক থেকে এক একটা করে বই তুলছে আর রাখছে। কোন বই নেওয়ার মত মনে হচ্ছে না তার।

অমল একটু চুপ করে বলল, 'এক কাপ করে কফি তো খেয়ে যেতে পারেন। চাও আছে, কফিও আছে, কী খাবেন বলুন।'

রেখা বউদি বললেন, 'করে দেবে কে, তুমি?'

অমল বলল, 'কী আর করা যায়। আপনাদের অভ্যর্থনার আর যখন কেউ নেই, বেয়ারাটি পর্যন্ত পালিয়েছে। ছুটির দিন পেয়ে সিনেমা দেখতে গেছে। আমিই করি। খেয়ে দেখুন, খুব খারাপ হবে না।'

রেখা বউদি হেসে উঠলেন, 'শুনছিস রীনি? অমল কফি করবে আর সেই কফি আমি খাব। না আর স্থির হয়ে বসে থাকতে দিলে না দেখছি।'

উঠে দাঁড়ালেন রেখা বউদি: 'কই কোথায় তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছ চল দেখি। রীনি, ঠায় বসে আছিস তো আছিসই। লক্ষ্মী মা আমার, একটু হাত পা নাড় তো। অমলের ঘরখানা

একটু ঝেড়ে পুছে গুছিয়ে দে। আমি অমলের অতিথি সৎকারে খানিক সাহায্য করে আসি।'

স্টোভ জ্বাললেন রেখা বউদি। দুধ চিনি কফির কৌটোটা নামিয়ে নিলেন। তারপর এক ফাঁকে হেসে বললেন, 'মনে আছে অমল সেই ডায়মণ্ডহারবারের কথা। কলকাতা থেকে সপ্তাহে অন্তত দুবার করে যেতে। আমার রান্নাঘরে গিয়ে বসতে। তুমি যোগান দিতে, আমি রাঁধতুম। তুমি বসে বসে দেখতে আর আমি রাঁধতুম। রান্নাটা কিন্তু আমাকে দেখে দেখেই শিখেছ।'

অমল কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। রেখা বউদির পরনে শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি। সাদা খোল। পাড়ের রঙ কুচকুচে কালো। মাথায় টুকটুকে লাল সিঁদুরের রেখা। চুল পাতলা হয়ে গেছে রেখা বউদির। আর, ঈস, কী মোটাই না হয়েছেন। মেদ দেহের চারু রেখাগুলিকে ঢেকে দেয়। কিন্তু সব সুচারু সুখস্মৃতিকেও কি ঢাকে ? ঢাকা উচিত ? উচিত নয়, তবু ঢাকা পড়ে। এই নিয়ম সংসারের। নিয়ম ? না কি নিয়মের ব্যতিক্রম ?

বিনয়বাবু এবাব ছাদ থেকে ঘরে এলেন। একটু বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'না, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। একেবারে জাঁকিয়ে বসে গেছ দেখছি। জ্ঞানেশবাবুদের ওখানে একবার যেতে হবে না ? আর কখন যাবে ?'

রেখা বউদি বললেন, 'কী করব বলো। অমল যে তোমাদের কফি খাওয়াতে চাইল। ধরো, খাও।'

প্রথম কাপটি স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন রেখা।

বিনয়বাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'বাঃ, তবে নাকি রীনি আমাদের কাজ জানে না ? অমলের ঘর কি রকম সুন্দর করে গুছিয়ে দিচ্ছে দেখেছ ?'

রেখা বউদি হেসে বললেন, 'রাত দিন কেবল মেয়ের প্রশংসা আর মেয়ের প্রশংসা। আমার কফিটা কেমন হল তা আর বলার নাম নেই। দিনের নাগাল পেলে পুরনো দিনের কথা মানুষ এমনি করেই ভোলে।'

হেসে রেখা বউদি অমলের দিকে তাকালেন। সেও নিঃশব্দেই কফি খাচ্ছিল।

রীনা এবার মুখ খুলল। একটু হেসে বলল, 'তুমি তো ভারি হিংসুটে মা।'

রেখা বউদি বললেন, 'ভারি হিংসুটে, তাই না ? শোন রীনি, জ্ঞানেশবাবুরা বোধ হয় একটু গানটানের ব্যবস্থাও করেছেন। ওঁদের আরো নাকি বন্ধুবান্ধব কেউ কেউ আসবেন। গাইতে বললে তুমি কিন্তু গাইবে। তখন যেন না না করো না। মাঝে মাঝে কী যে মেজাজ হয় তোমার, লোকের মধ্যে এমন অপ্রস্তুত করো আমাকে।'

রীনা বলল, 'আমি যেতেই চাইছিলাম না। তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ। গাইতে আমি কিছুতেই পারব না। তুমি কিন্তু সেখানে আমাকে গাইতে বলো না মা।'

বিনয়বাবু সস্নেহে বললেন, 'পারবিনে কেন, বেশ পারবি। অমল, তোমারও তো গীতবিতান আছে দেখছি। দুখানা গান ওকে বেছে দাও তো। বসন্তের গানই উপযোগী হবে। কালটাও তো তাই। তোমার ছাদে দাঁড়িয়ে কোকিলের ডাক শুনছিলাম।'

রীনা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার আর ডাক শুনে কাজ নেই বাবা। ওঠো এবার। যাবে তো চল।'

বিনয়বাবু হেসে বললেন, 'ব্যাপার কি। তুই যে হঠাৎ একেবারে রক্ষাচণ্ডী হয়ে উঠলি মা। হল কী তোর ?'

সবাই উঠে পড়লেন। বেরোবার আগে রেখা ফের সব গুছিয়ে টুছিয়ে রেখে গেলেন। হেসে বললেন, 'আজ সহজেই পার পেয়ে গেলে। আর একদিন এলে কিন্তু মাছ মাংস পোলাও কালিয়া খেয়ে যাব।'

অমলেন্দু বলল, 'বেশ তো।'

সিঁড়ির দু একটা ধাপ পর্যন্ত ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে নেমে অমলেন্দু হঠাৎ বলল, 'আমি আর রাস্তা পর্যন্ত গেলাম না বিনয়দা। শরীরটা একটু—'

বিনয়বাবু বললেন, 'না না, তোমার আর এসে দরকার নেই। তোমাকে গোড়া থেকেই যেন একটু

টায়ার্ড দেখাচ্ছে। কী হয়েছে বলো তো।'
অমল বলল, 'কিছু হয়নি। এমনিই।'
রীনা বলল, 'সেজন্যেই বুঝি জামাটামা পরে ঘরে বসেছিলেন।'
অমল একথার কোন জবাব দিল না।
রেখা বউদি নেমে যাচ্ছিলেন, ফের উঠে এলেন। অমলের গায়ে একটু হাত দিয়ে বললেন, 'কই দেখি। জ্বরটর হয়নি তো?'
অমল বলল, 'না না, ওসব কিছু নয়।'
রেখা বউদি বললেন, 'কী জানি ভাই। বড় ভয় করে। ডেঙ্গুটেঙ্গু হচ্ছে চারদিকে। সাবধানে থেকো।'
রীনা এদিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।
অমলেন্দু বলল, 'আপনি ভাববেন না। মিছিমিছি আপনাদের দেরি করিয়ে দিলাম।'
বিনয়বাবু নামতে নামতে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'আরে না-না। সঙ্গে গাড়ি আছে, পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না পৌঁছতে।'
সিঁড়িতে ওঁদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে অমল ফের ঘরে ঢুকল। হাতল-উঁচু চেয়ারটার মধ্যে নিজেকে ফের ডুবিয়ে দিল। বড় ক্লান্তি লাগছে। কিন্তু নিজের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার তেমন সময় পেল না অমল, তার আগেই দরজায় টোকা পড়ল।
অমলেন্দু বলল, 'দোর খোলা আছে।'
তবু উঠে এসে ভেজানো দরজাটা ভালো করে খুলে দিল অমলেন্দু। দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'এ কি, তুমি?'
রীনা একটু দাঁড়াল। একটু তাকাল অমলেন্দুর দিকে। তার পর মৃদুস্বরে বলল, 'এলাম।' একটু হেসে বলল, 'গীতবিতানখানা নিতে এলাম, যদি সত্যিই গাইতে হয়—'
অমলেন্দু একটু চুপ করে রইল। একটু সময় নিয়ে বলল, 'বেশ তো, নিয়ে যাও।'
রীনা বলল, 'আমি নেব, না আপনি নিজে দেবেন?'
অমলেন্দু বলল, 'তুমিই নিয়ে যাও।'
রীনা ঘরে ঢুকল। র‍্যাকের কাছে একটু দাঁড়াল। বলল, 'কোন্‌খানা নেব?'
অমলেন্দু বলল, 'যেখানা ইচ্ছে।'
রীনা দ্বিতীয় খণ্ডটি তুলে নিল। অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইখানা নিলাম। প্রেম ও প্রকৃতি।'
অমলেন্দু বলল, 'আচ্ছা।'
বেরোবার জন্যে পা বাড়াল রীনা।
রাস্তায় গাড়ির হর্ন বাজাল একবার।
অমলেন্দু শঙ্কিত হয়ে উঠল। বলল, 'তোমার বাবা ডাকছেন বোধ হয়।'
রীনা একটু হাসল, 'বাবা নয়, মা হর্ন দিচ্ছেন। ধরন দেখেই বুঝতে পারছি।'
সিঁড়ির দিকে আরো দু-এক পা এগিয়ে গেল রীনা। তার পর হঠাৎ থেমে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী যেন বলবেন বলছিলেন।'
আর একটি মুহূর্ত। ইচ্ছা করলে অমলেন্দু বলতে পারে। সব বলতে পারে। সারাদিন ধরে সে যা ভেবেছে মাত্র একটি দুটি কথায় তার সবই জানাতে পারে অমলেন্দু। কিন্তু তার পর?
কয়েক সেকেন্ড ধরে কয়েক যুগের তোলপাড় চলল বুকের মধ্যে। তার পর অমলেন্দু বলল, 'চল, তোমাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসি।'
রীনা ফের একবার অমলেন্দুর দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝে উঠতে না উঠতে অমলেন্দু শুনতে পেল, 'থাক থাক, আপনাকে আর অত কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব।'
রীনা আর অপেক্ষা করল না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।
অমলেন্দু ইচ্ছা করলে এখনো ছুটে যেতে পারে। এখনো গিয়ে ওর হাত ধরতে পারে। কিন্তু

দুখানা পা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে। নাড়াবার শক্তি নেই অমলেন্দুর।

আস্তে আস্তে ফের নিজের চেয়ারটিতে এসে বসল অমলেন্দু। রীনাদের গাড়ি চলে গেছে, আর কোন আশঙ্কা নেই। দ্বিতীয়বার ওই তরুণী মেয়েটি হয়তো তার মুখের দিকে আর তাকাবে না। অমলেন্দুকে সে চিনে ফেলেছে। তবু ঝুঁকি না নিয়েই ভালো করেছে অমলেন্দু। ঢের বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। মুহূর্তের ভুলের জন্যে রীনা যে পরে অনুতপ্ত হত না তা কে বলবে ? বিনয়দা রেখা বউদির এত বিশ্বাস এত স্নেহ ভালোবাসার পরিবর্তে সে যা পেত তা কি সারাজীবন ধরে রাখতে পারত অমলেন্দু ? কোন নিশ্চয়তা নেই। তার চেয়ে এই ভালো। শেষ পর্যন্ত রীনা হয়তো এই ভীরুতার জন্যেই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কথায় কথায় বলবে, 'এমন মানুষ আর হয় না !'

তার পর রীনারও বিয়ে হবে। ঘর-সংসার হবে। আর সেখানে হয়তো আর একটি সম্মানিত অতিথির আসন জুটবে অমলেন্দুর, যে অতিথির জন্যে শ্রদ্ধা প্রীতি আর কৃতজ্ঞতার অফুরন্ত ভাণ্ডার খোলা থাকবে।

পুবের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে অমলেন্দু ছাদে এসে দাঁড়াল। সত্যি এত বড় ছাদ আশেপাশের অন্য বাড়িগুলির নেই।

এই জরাজীর্ণ দোতলা বাড়িটির প্রশস্ত ছাদখানাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। অবশ্য যে কোন দিন ধ্বসে পড়তেও পারে। একতলা দোতলায় দোকানপাট আর অফিস। সন্ধ্যা হতে না হতেই সব বন্ধ হয়ে যায়। আজ তো ছুটির দিনই ছিল। বাড়িওয়ালা এক দিন হেসে বলেছিলেন, 'এক হিসেবে পুরো বাড়িটাই আপনার দখলে। আর কত বড় ছাদ—খেলুন, বেড়ান, যা খুশি তাই করুন। একচ্ছত্র রাজত্ব। কেউ আপনার ভাগীদার নেই।'

তা ঠিক। কাউকে ভাগ দিতে হবে না অমলেন্দুর। না শয্যার, না চিন্তার, না স্মৃতির, না স্বপ্নের।

হয়তো আরো একটি সোনার মুহূর্ত অমলেন্দু হেলায় হারাল। সাহসের অভাবে পৌরুষের অভাবে আর একটি মধুর সম্ভাবনাকে নষ্ট হতে দিল। তার বিচক্ষণ বন্ধুরা বলবে,'এ তোমার দেবত্ব নয়, কাপুরুষতা। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবার ভয়কে তুমি ধর্মভয়ের মোড়কে মুড়ে রেখেছ।'

কত কথাই বলবে তারা। কিন্তু তাই বলে কি অমলেন্দুর স্বভাব পালটাবে ? তা পালটাবে না।

পালটাবে না, কিন্তু জৈব প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠার সাধ্যও তার নেই। তার নিষ্ঠুর নির্মম হাতের মার বার বার তাকে খেতে হবে।

উদ্দাম বাসনা কামনাকে সে যতই প্রীতি দিয়ে ঢাকুক, স্নেহ দিয়ে ঢাকুক, বন্ধুত্বের মোড়কে মুড়ে রাখুক, অতর্কিত এক-একটি ঝড়ের ঝাপটায় সেই ছদ্মবেশ কোন কোন মুহূর্তে খুলে খুলে পড়বে, আর বার বার তাকে হাতে হাতে ধরিয়ে দেবে। তার লজ্জা গ্লানি অপমান অন্তর্দাহের শেষ রাখবে না। অথচ এই অহেতুক আত্মনিগ্রহের কিছুমাত্র মূল্য আছে কি না, সেই সংশয় মুহূর্তে মুহূর্তে তাকে ছিন্নভিন্ন করবে, ব্যঙ্গে কৌতুকে উপহাসে পরিহাসে জর্জরিত করে তুলবে, অনির্বাণ জ্বালায় সে ধিকিধিকি জ্বলবে আর পুড়বে, জ্বলবে আর পুড়বে। কিন্তু মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চির অঙ্গারত্ব হয়তো তার আসবে না।

বিশ বছর আগেও যেমন পুড়েছে এখনও তেমনি পুড়ছে। হয়তো আরো বিশ বছর বাদেও এমনি পুড়তে থাকবে।

একটি নবযৌবনা নারী তাকে অপরিতৃপ্ত অনন্ত যৌবনের বর দিয়েছে। অনন্ত যন্ত্রণার সূত্রে সেই বরমাল্য গাঁথা রইল।

সীমান্তের এই ছোট্ট শহরটি যেমন দরিদ্র তেমনি অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সমস্ত কুশ্রীতা ঢাকা পড়েছে। সামনের দিগন্ত-ছোঁয়া শস্যহীন শূন্য মাঠকে মনে হচ্ছে স্তব্ধ সমুদ্রের মত।

ছাদটি সত্যিই বেশ বড়। চারদিক আলসে দিয়ে ঘেরা। ওপরেও একটি সুন্দর ঘেরাটোপ আছে। তারায় ভরা সুন্দর স্বচ্ছ আকাশ। জরীর কাজ করা নীলাম্বরী শাড়ির মত।

রীনা সেদিন ওই রকম একখানা শাড়ি পরেছিল। বলেছিল, 'মার ট্রাঙ্ক থেকে বার করলাম। সেই আমলের শাড়ি। কেমন দেখাচ্ছে বলুন তো ? ট্রাঙ্কে কত চিঠি দেখলাম। আপনার লেখা। চুরি করবার লোভ হচ্ছিল।'

এতক্ষণে বেশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে শুরু করেছে। এবার চেয়ারটা এনে এখানে বসতে পারবে অমলেন্দু। বসলে গা জুড়াবে।

বলা যায় না, বসন্ত পাখির ডাকে কান জুড়াতেও পারে। অমলেন্দু নিজের মনেই একটু হাসল। নিজেকে ছাড়া আর কাকেই বা বিদ্রূপ করবার অধিকার তার আছে?

হাসি

আজ আবার ডায়েরিটা নিয়ে বসেছি। ডায়েরি না বলে খাতা বলাই ভালো। আমি রোজ দিনের বিবরণ লিখিনে। ঘটনার বিবরণ লিখতে আমার প্রবৃত্তি নেই। অমুকের সঙ্গে দেখা হল, অমুকের সঙ্গে দুটো কথা হল এসব খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে কী হবে। তার চেয়ে আমার ভালো লাগে ডায়েরিতে চিন্তার কথা লিখতে, ভাবনার কথা লিখতে। আমার সেই চিন্তাস্রোত বছরের বেশিব ভাগ সময় বরফের মত জমাট বেঁধে থাকে। শুধু কোন কোন দিন সেই বরফ গলে স্রোতস্বতী হয়। সেই স্রোত দিনপঞ্জীর একটি পাতার মধ্যে আটকে থাকে না। পাতার পর পাতা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমার দিনপঞ্জী তাই বর্ষপঞ্জী।

ঘটনার কথা আমি লিখিনে। তবু অতি সামান্য একটি ঘটনাই আজ আমাকে এই রাত দেড়টার সময় লিখতে বসিয়েছে।

টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে আমি লিখছি। আর আমার রুমমেট আশি বছরের বৃদ্ধা আমার ঠাকুরমা মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। খুব যে নিরুপদ্রব ঘুম তা নয়। খানিকক্ষণ আগেও তিনি খিল খিল করে হাসছিলেন। ওঁর ওই এক রোগ: ঘুমের মধ্যেও হাসেন। ঘুমের মধ্যেও কাঁদেন। মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকেন। আমি উঠে গিয়ে ওঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিই। ছেলেবেলায় ওঁর এই অনৈস্বর্গিক হাসিকান্না আমাকে ভয় পাইয়ে দিত। তিনি ঘুমের মধ্যে চেঁচাতেন, আমি জেগে উঠে চেঁচাতাম। দোর খুলে পাশের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বাবাকে ডাকতাম, মাকে ডাকতাম।

এখন আর ভয় পাইনে। এখন দেখে দেখে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন ওই অপার্থিব হাসি-কান্নার ঐকতান ছাড়া আমি যেন কাজ করতে পারিনে। আমার পিছনে ওই অভ্যস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলতে থাকে। আর আমি নিজের মনে কাজ করে যাই। বসে বসে পড়ি, কদাচিৎ লিখি। কখনো-বা চুপ করে বসে থাকি। মন নিশ্চয়ই অমন বসে থাকার পাত্র নয়। সেখানে চিন্তাস্রোত অবিরাম বয়ে চলে। সেই স্রোতের ধারা কখনো অতি ক্ষীণ। আছে কি নেই বোঝা যায় না। কখনো-বা উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল। মাঝে মাঝে ডায়েরি আর কলম নিয়ে যেন ছোট ডিঙি আর বৈঠা নিয়ে আমি সেই তরঙ্গময়ীর উৎস সন্ধান করতে গিয়েছি। গিয়ে দেখেছি পণ্ডশ্রম। আমার ডিঙি ঘূর্ণির মধ্যে কোথায় যে তলিয়ে গেছে আমি আর তাকে টেনে তুলতে পারিনি। আমি নিশ্চয়ই অপটু মাঝি। আমি মনোবিজ্ঞানী নই, মনোবিলাসী মাত্র।

হাসিকান্না ছাড়াও ঠাকুরমার আরও একটি গান, ঘুমো ঘুমো। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই তিনি তাগিদ দিতে শুরু করেন। 'শুয়ে পড়, ও শাণ্টু শুয়ে পড়। এবার ঘুমোতে যা।'

ঘুমো ঘুমো ঘুমো। ওঁর সেই ঘুমপাড়ানি গান কত ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। শুনতে শুনতে আমার স্কুলের দিনগুলি কাটল, কলেজের দিনগুলি কাটল, ইউনিভার্সিটির দিনগুলি শেষ হল। চাকুরী জীবন শুরু হয়েছে। এখনো ঠাকুরমার মুখে শুনছি, 'ঘুমো ঘুমো।' ঘুমপাড়ানি গান এখন আর শুধু গানই নয়, মাঝে মাঝে ঘুমপাড়ানি ঝগড়া। 'তুই যদি সারারাত অমন করে আলো জ্বেলে রাখিস আমি ঘুমোই কী করে।' ঠাকুরমা বানরীর মত মুখ খিচিয়ে ওঠেন।

আমি জবাব দিই, 'দরকার কী অত ঘুমিয়ে। দিনভরেই তো ঘুমাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন, 'আমি সারাদিন ঘুমোই। কোন কাজ করিনে? তোর মাও যা বলে, তুইও তাই বলিস? তোরা কেউ আর আমাকে দেখতে পারিসনে। আমি এখন

তোদের আপদবালাই। দূর হলেই বাঁচিস তোরা।'

ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা ঠাকুরমা কখনো শুয়ে কখনো মশারির মধ্যে উঠে বসে বিলাপ করেন, বাবা মাকে আর রুমাকে একই ভাষায় দোষারোপ করেন। তারপর ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়েও পড়েন। আমি যে তরুর মত সহিষ্ণুতা নিয়ে সব সময় শুনে যাই, তা নয়! মাঝে মাঝে আমিও দু-চারটে কড়া ধমক দিই! বলি, 'অমন যদি করো, তোমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে আসব।'

ঠাকুরমা আরও চটে ওঠেন, 'তাই দে। শুধু বাইরে কেন, আমাকে রাস্তার আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আয়। সেও আমার স্বর্গ।'

তারপর আমার ছেলেবেলার শয্যাসঙ্গিনী, আজন্মঘরণীর সঙ্গে যে কলহটা হয় তা বাবা মার দাম্পত্য কলহের চেয়ে কম তীব্র নয়। আমাব সেই ক্রোধ আর বিরক্তির সময় আমি ভুলে যাই তিনি বৃদ্ধা, অতি বৃদ্ধা। জরা শুধু তাঁর রূপ নেয়নি, যৌবন নেয়নি, দেহের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ করে নেয়নি, সাধারণ জ্ঞান, সহজ বুদ্ধিটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

জরা যেমন মানুষের সব কেড়ে নেয়, ক্রোধ তেমনি মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী নেই, শিশু নেই, বৃদ্ধ নেই, আত্মীয়-অনাত্মীয় নেই। মল্লভূমিতে আমরা সবাই শুধু একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাবার সঙ্গেও সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক আমি মাঝে মাঝে অনুভব করি। অথচ কিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা? তাঁর সাম্রাজ্য নেই যে, তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর সিংহাসনে আমি বসব। কর্মক্ষেত্রে তিনি আমার প্রতিযোগী নন। তাঁর অফিস আলাদা, আমার অফিস আলাদা। সেখানে আমাদের কৃতিত্ব অকৃতিত্ব, যশ অপযশ বিভিন্ন। আমি তাঁর সম্পত্তির শরিক নই। তবু কিসের এই শত্রুতা? তবু কেন মাঝে মাঝে আমি অজাতশত্রু, তিনি বিম্বিসার?

আজ নিতান্তই একটা তুচ্ছ কারণে তাঁর সঙ্গে কথান্তর হয়ে গেল। আজ বাবাব পক্ষে একটি বিশেষ দিন। তাঁর বাবার মৃত্যুতিথি। তিথি কি তারিখ আমি ঠিক জানিনে। তাঁর বাবার স্মৃতিতর্পণ একা তাঁরই। এক সময় অবশ্য তাঁব ইচ্ছা হয়েছিল এই তর্পণকে পারিবারিক একটি অনুষ্ঠান করে তুলতে। বাবার কাছে শুনেছি এক সময় তিনি ভাবতেন ঠাকুরদার কোন কোন বন্ধু কি স্নেহভাজন যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের খুঁজে পেতে ডেকে এনে এক সঙ্গে বসে তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবেন। সবাই এসে চা-টা খাবেন। কি ক'জনকে না হয় এই উপলক্ষে একদিন দুপুরে কি রাত্রে খেতেই বলা হল। পিতৃপক্ষে যে তর্পণ হয় আমার বাবা তাতে বিশ্বাস কবেন না। আমরা হিন্দু সমাজে বাস করি। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কোন আচার অনুষ্ঠান মানিনে। আমাদের বাড়িতে কোন পুজো নেই, পার্বণ নেই, ব্রতকথা পুরাণ পাঠ নেই। আমরা ছেলেবেলা থেকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানহীনতার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছি। শুধু আমাদের পরিবারেই নয়, এই কলকাতা শহরে আমার জানাশোনা শিক্ষিত হিন্দু-অহিন্দু সব পরিবারেরই প্রায় এই চেহারা। কিন্তু ডেভিলেরও এক ধরনের রিচুয়াল আছে। অনুষ্ঠান ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? অনুষ্ঠান আমরাও করি।

আমাদের জন্মদিন পালন করা হয়। আমার জন্মদিনে আমি আমার বন্ধুদের বলি। রুমার জন্মদিনে তার বন্ধুরা আসে। যদিও দুজনের বন্ধু সংখ্যাই দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। ভাইবোন কেউ আর আমরা এখন বসুধৈব কুটম্বকম নয়। আমাদের কুটুম্ব সংখ্যা অতি সীমিত। প্রায় আঙুলে গোণা যায়। কোন কোন সময় মনে হয় চার করযুক্ত যে কড়ে আঙুলটি বন্ধুদের সংখ্যা গণনায় তাও বাহুল্য। জন্মদিনের ওইটুকু অনুষ্ঠানেও আমি এখন কুণ্ঠিত। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে লোক জানাজানি আমার ভালো লাগে না। আগে আমাদের উৎসব ছিল সামাজিক। সঙ্কুচিত হতে হতে তা ক্রমে পারিবারিক গণ্ডীতে আবদ্ধ হল। আরও কুঞ্চনে তা একান্তই ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কারো বিয়ে-টিয়ে হলে বাবা মা এখনও বেশ উৎসাহ বোধ করেন। সেজে-গুজে নিমন্ত্রণ রাখতে যান। যেন ফের দুটি বর-কনে চলেছেন। মাথায় টোপরটি শুধু নেই। ওঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমার লজ্জা হয়। অর্থ আর সময়ের বাজে খরচে অস্বস্তি বোধ করি। বাবা রাগ করে বলেন, 'তুই পরম অসামাজিক। কোথাও যাবিনে, কারও সঙ্গে মিশবিনে।' আমি জবাব দিই, 'সামাজিকতার ফর্ম বদলে যাচ্ছে বাবা। তা ছাড়া ব্যক্তিগত রুচিটাই এখানে বড়।'

বাবা চটে ওঠেন, 'কেবল ব্যক্তিগত আর ব্যক্তিগত। আসলে এ হল তোদের স্বার্থপরতা। তোরা ব্যক্তিতন্ত্র ছাড়া আর কোন তন্ত্র মানিসনে।'

আমি মনে মনে হাসি। বাবা নিজেও কম ব্যক্তিতান্ত্রিক নন। শুধু আমার মুখে ব্যক্তিত্বের কথাটা শুনতেই ওঁর আপত্তি।

অনুষ্ঠান আমাদের বাড়িতেও হয়। আমাদের জন্মদিন ছাড়াও বাবা-মার বিবাহবার্ষিকী আছে। তা অবশ্য আজকাল নিতান্তই পারিবারিক ব্যাপার। শুধু আমি আর রুমা সেই বার্ষিক উৎসবে অভ্যাগত। মাঝেসাজে আমরা দু-চারজন আত্মীয়বন্ধুকে খেতে বলি। বাবা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে শিল্প সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। এও তো এক ধরনের অনুষ্ঠান। কিন্তু এর মধ্যে কোথাও ধর্মগন্ধ নেই।

ঠাকুরদার মৃত্যুদিনে বাবা যে অনুষ্ঠানটুকু করবেন ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত তা কিন্তু করেননি। বাইরের কাউকে ডেকে এনে পিতৃকথা শোনাননি, কি শুনতে চাননি। ওইটুকু আনুষ্ঠানিক হতেও তিনি শেষ পর্যন্ত লজ্জা বোধ করেছেন। বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। চোদ্দপুরুষের খবর আমি রাখিনে ; কিন্তু তিন পুরুষ ধরে আমরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। আমাদের জীবন একান্তভাবেই বেসরকারী ব্যক্তিগত জীবন। সেই জীবনের কথা বাইরে ঢাক পিটিয়ে বলতে গেলে লোকে হাসবে। না হয় খানিকটা সেই ঢাকের বাদ্য শোনার পর কানে আঙুল দিয়ে উঠে যাবে।

বাবার আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে লৌকিক ধর্মগন্ধ নেই। কিন্তু ধর্মের বদলে শিল্পের সৌরভটুকু তিনি রাখতে চান।

ঠাকুরদার একটি অয়েলপেইন্টিং তিনি নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে সেই প্রতিকৃতিতে ফুলের মালা পড়ে, ধূপদানিতে ধূপের কাঠি পোড়ে আমি দেখতে পাই। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাবার ছবি দেখেন। আমি আমার জীবিত বাবার মধ্যে যা দেখতে পাই—স্নেহ-ভালোবাসা, ক্রোধ বিদ্বেষ, আনুকূল্য প্রতিকূলতা তিনিও কি তাই দেখেন? কে জানে? পিতৃমূর্তি তাঁর চিত্তে কোন মুহূর্তে কোন আবেগ জাগিয়ে তোলে আমি জানিনে। সব সময় তোলে কিনা তাতেও আমার সংশয় আছে। কখনো কখনো মনে হয় এও তাঁর একটা অভ্যাস। দাঁড়িয়ে থাকা তাকিয়ে থাকার অভ্যাসে তিনি বহুকাল ধরে অভ্যস্ত হয়েছেন। তিনি যখন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কি পারিবারিক কোন সমস্যায় মগ্ন হন, তখন ঠাকুরদার ছবিতে ধুলো পড়ে, যুঁই ফুলের মালা শুকিয়ে শুকিয়ে কালো দড়ি হয়ে ঝুলতে থাকে এও তো দেখতে পাই।

কিন্তু আজ সকালে উঠে তিনি বললেন, 'শাণ্টু, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে একটি মালা নিয়ে আসবি। আজ আমার বাবার—'

পাঁচ টাকার একখানা নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন বাবা।

হেসে বললাম, 'টাকা তো আমার কাছেই আছে।'

তিনি বললেন, 'না, না, এই টাকা দিয়েই নিয়ে আয়।'

আমি মনে মনে হাসলাম। বাবা তাঁর টাকাতেই তাঁর বাবার স্মৃতি তর্পণ করতে চান। আত্মপর ভেদবুদ্ধি বুঝি শুধু আমারই?

বললাম, 'আচ্ছা।'

মা বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু। ছুটির দিন বলে যেন আবার দুটো বাজিয়ে দিসনে।'

বোনেরও সেই মিনতি, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো দাদা। আজ আমরা দুপুরে এক সঙ্গে বসে খাব। খেতে খেতে বাবার কাছে দাদুর কথা শুনব।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

মনে মনে ভাবলাম দাদুর কথা বাবা আর আমাকে নতুন কী শোনাবেন। তেইশ বছর ধরেই তো তা শুনে আসছি। আমার আবির্ভাব আর তাঁর তিরোভাব একই খ্রিস্টাব্দে।

বাবার সাধ্য নেই তাঁর বাবাকে নিয়ে নতুন রূপকথা আমাদের শোনাতে পারেন। যেসব কথা ছেলেবেলায় শুনেছি শুনে মুগ্ধ হয়েছি, এখন কি আর তা ভালো লাগে? বাবার বয়স হচ্ছে। তিনি তাঁর ছেলেবেলায় ফিরে যেতে চান। তাঁর পিতৃস্মৃতি তাঁর বাল্যকৈশোরের স্মারক। কিন্তু আমার তো আর তা নয়। আমি যখন বুড়ো হব, তখন ফের ছেলেবেলার কথা ভাবব। আমি এখন অন্য চিন্তায়

অন্য ভাবনায় ব্যস্ত। স্মৃতিচারণ আমার জন্য নয়।

সঙ্কল্পটা সাধুই ছিল। মালা হাতে বেলা এগারোটার মধ্যেই ফিরব। কিন্তু father proposes friend disposes. কলেজ স্ট্রীটে যাওয়ার আগে সিমলা স্ট্রীটে শীতাংশুদের বাড়িটা একবার ঘুরে যেতে গিয়েই বিপদ হল। সেখানে অসিত, জিতেশও ছিল। আমরা চার সহপাঠী। দুজন স্কুল আমলের দুজন কলেজের। কিন্তু সেই আমল আর এখন নেই। এখন আর আমাদের অত ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আমরা এখন কেন্দ্রাতিগ। কেউ এঞ্জিনিয়র, কেউ ইনকামট্যাকসের কেরানী। আমাদের সম্পর্ক পালটে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে যখন একই জায়গায় আসি, একই ঘরে বসি, একই দিক নিয়ে আলোচনা করি তখন মনে হয় ফের যেন আমরা সেই এক মন এক প্রাণ হয়ে গেছি। একই কেটলীর চা খেতে খেতে পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন ব্রান্ডের সিগারেট বিনিময় করা যেন হৃদয় বিনিময়েরই মত। আমাদের এই বৈঠকে নারী ভূমিকা নেই বললেই চলে। শীতাংশুর বোন শিপ্রা অবশ্য আছে। সে চা জোগাবার জন্যে। সবে মাত্র বি এ পড়ে। আমি তাকে বালিকার চেয়ে বেশি মর্যাদা দিইনে। জিতেশ একটু একটু দেয়। কী জানি, দিয়ে সে বোধ হয় জিতেই যায়। কিন্তু আমি অমন জয় চাইনে।

যেমন হয়—ওদের সঙ্গে দেখা হলেই গল্প হয়, তর্ক হয়, মৃদু আলাপ আলোচনা শেষ পর্যন্ত উত্তপ্ত বিতর্কে গিয়ে পৌছায়, আজও তাই হল।

ঘণ্টা চারেক সময় যে কী করে কেটে গেল টের পেলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলাম। রাস্তা থেকে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। রেস্টুরেন্ট থেকে ঘুরতে ঘুরতে পার্কে। সেই আগেকার দিনগুলি যেন ফিরে এসেছে। তখন আমরা চারজনই ছিলাম যেন চার রাজপুত্র। অবস্থা যার যেমনই হোক, কেউ সওদাগর পুত্র কোটাল পুত্র নয়, সবাই রাজকুমার। আজও দেখা হলে চিন্তায় কল্পনায় আলাপে আলোচনায় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমরা সেই হৃত সাম্রাজ্য ফিরে পাই।

বন্ধুরা আমাকে বাসে তুলে দিয়ে বিদায় নিল। তিনখানা উঁচু হাতের অভিনন্দন দেখতে দেখতে আমি ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। ওদের প্রত্যেকের হাত একদিন আমার হাতের মুঠিতে উঠেছে। ওদের প্রত্যেকের কাঁধে আমি হাত রেখে চলেছি। তবু ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আলাদা আলাদা। সবাই বন্ধু। তবু কেউ আর যেন সেই আগের মত বন্ধু নয়।

বাড়িতে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে পৌনে দুটো। সবাইর মুখ গাম্ভীর্যে থমথম করছে। এত দেরি হয়েছে বলে আমার নিজেরই লজ্জার শেষ ছিল না। কিন্তু আমি সেই লজ্জা প্রকাশের সুযোগ পেলাম না।

মা বললেন, 'ছি ছি ছি, আজও তুই এত দেরি করলি। তোর জন্যে বসে থেকে থেকে এইমাত্র আমরা খেয়ে উঠলাম।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'খেয়ে উঠেছ ? বেশ করেছ।'

মা বললেন, 'বেশ করেছি মানে ? তোর বাবার ইচ্ছে ছিল আজ তোদের নিয়ে এক সঙ্গে বসে খাবেন।'

বললাম, 'পরেও একদিন খেতে পারবেন।'

'অন্য দিন আর আজ কি সমান ?'

'কেন আজ কী ?'

'আজ কী, তুই একেবারেই ভুলে গেলি ? আজ তোর ঠাকুরদার—'

আমি বললাম, 'ও। বাবার তো সবই মনে মনে। অন্য কারো মনে রাখবার মত কোন ব্যবস্থা তো তোমরা রাখোনি।'

'তোকে না বলেছিলেন মালা আনতে? টাকা দিয়েছিলেন না তোকে ? তুই খালি হাতে ফিরে এলি ?'

মা গালে হাত দিলেন।

তাঁর চেয়ে আমি কম অবাক হইনি। সত্যিই তো মালাটা আনতে ভুলে গেছি। এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল কী করে।

আধা লজ্জা আধা অনুশোচনায় বললাম, 'ভুল হয়ে গেছে। আমি বিকেলে এনে দেব মা।'

কিন্তু বাবা পাশের ঘর থেকে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমার আর মালা আনতে হবে না। মালা আনা হয়ে গেছে।'

বিস্মিত হয়ে দেখলাম বাবার পিতৃমূর্তি সত্যিই মাল্যভূষিত। তিনি কখন বেরিয়েছিলেন, কখন মালা নিয়ে এসেছেন কে জানে। আমার পিতৃভক্তি তাঁর ভক্তির ধারে কাছে গিয়েও পৌঁছতে পারে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ মুগ্ধ হয়ে থাকবার সুযোগ পেলাম না। বাবা আক্রোশে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। আমার মত দায়িত্বহীন, শ্রদ্ধাহীন, কর্তব্যবুদ্ধিহীন হৃদয়াবেগরহিত ছেলে নাকি তিনি আর দেখেননি। পারিবারিক কোন দায়িত্ব আমি নাকি স্বীকার করিনে, আমি শুধু আমার বন্ধুগোষ্ঠী নিয়ে মত্ত। সেই জগৎই আমার একমাত্র জগৎ। এই বাঁধাগতের কথাগুলি তাঁর মুখে শুধু আজ নয়, আরো শুনেছি। কিন্তু স্তুতির রিপিটিশনই আমার কাছে দুঃসহ লাগে। নিন্দার রিপিটিশন সহ্য করা আরো কঠিন। বাবা তাঁর স্মৃতিকথা রিপিট করবেন, রসিকতা রিপিট করবেন, গালমন্দগুলিরও পুনরাবৃত্তি করতে ছাড়বেন না। মানুষ যখন নিজেকে নিজে কনট্রাডিক্ট করে, তখন সে বরং ইনটারেস্টিং হয় ; কিন্তু রিপিটিশনের মত ক্লান্তিকর বস্তু আর নেই।

বাবা তাঁর বাবার মৃত্যুদিনে তাঁর পিতৃ-প্রতিকৃতির গলায় ফুলের মালা পরালেও ছেলের গলায় কাঁটার মালা পরাতে ছাড়লেন না। এই তো তাঁর হৃদয়াবেগের নমুনা। যিনি পুত্রবৎসল হতে পারেন না তিনি যে কখনো পিতৃভক্ত ছিলেন আমার বিশ্বাস হয় না। আমি ছেড়ে কথা বলিনি, আমিও যথেষ্ট রূঢ় কথা তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। সে কথাগুলির রেকর্ড রাখা নিষ্প্রয়োজন। আমার তা মনেও নেই। কিন্তু তিনি মনে করে রাখবেন। তিনি তার একটি অক্ষরও ভুলবেন না। তাঁর মনের মধ্যে একটি টেপরেকর্ডার বসানো আছে। তাতে সব ধরা থাকে।

আমি নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইতাম। আমার ভুলের জন্যে নিশ্চয়ই আমি দুঃখ আর লজ্জা প্রকাশ করতাম। কিন্তু আমাকে সে সুযোগ না দিলে আমি কী করব ?

বাবার মত পিতৃভক্ত আমি নই। কিন্তু কে জানে ঠাকুরদার জীবদ্দশায় তিনি কতখানি পিতৃভক্ত ছিলেন ? তাঁর মন সব সময় শ্রদ্ধা আর প্রীতিতে ভরা ছিল আমার তা বিশ্বাস হয় না। মৃত বাপের স্মৃতিকে সবাই শ্রদ্ধা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে। আত্মীয়ই হোক অনাত্মীয়ই হোক মৃতের সঙ্গে মানুষের কোন সংঘাত নেই। কিন্তু একজন জীবিত মানুষের সঙ্গে আর একজন জীবিত মানুষের নিত্য মরণপণ সংঘর্ষ।

বাবা এমন সব কথা বলবেন, এমনভাবে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করবেন যেন আমার প্রকৃতি তাঁর নখদর্পণে। Only wise fathers know their sons. বাবার বুদ্ধির পরিমাপ আমি করতে চাইনে। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞতম পিতারও সাধ্য নেই তাঁর ছেলেকে সবখানি জানেন, সবখানি বুঝতে পারেন।

বাবা আমাকে শুধু আড্ডা দিতেই দেখেন, আমাকে শুধু বন্ধুমণ্ডলী পরিবৃতই দেখতে পান। কিন্তু আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি তাঁর চোখে পড়ে না। কারণ আড্ডাটা তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের নিঃসঙ্গতা অনুভবের বস্তু। তা হৃদয় দিয়ে দেখতে হয়।

আমার মনে হয় আমার ঘরের অর্ধাংশভাগিনী ঠাকুরমা সে কথা হয়তো খানিকটা বোঝেন। তিনি অবশ্য টিপিক্যাল ঠাকুরমার মতই ঠাট্টা করে বলেন, 'অমন মনমরা হয়ে থাকিস কেন রে মাঝে মাঝে ? কী হয়েছে তোর ? দিনরাত কী ভাবিস অত ? কিসের অত চিন্তা। বিয়ে করবি ?'

'দেয় কে ?' আমি হেসে বলি।

'ওরে বাবা ! মুখ ফুটে বললেই তো হয়। একটি ফুটফুটে বউ এলেই আমার নাতির এখন সব দুঃখ ঘোচে।'

ঠাকুরমার কথার প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আমি জানি আমার নিঃসঙ্গতা তাঁর নাতবউ এসে ঘোচাতে পারবে না, তাঁর নাতির কোন বান্ধবীরও সে সাধ্য নেই।

এই নিঃসঙ্গতা কেন, এই নিঃসঙ্গতা কিসের ? আমি মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করি। সত্যিই কি আমি নিঃসঙ্গ, আমি একক ? না এ আমার এক ধরনের মনোবিলাস। বাবার ধারণা তাই। বিলাস।

বিলাস ছাড়া কিছু নয়। আচ্ছা তাই না হয় হল। আমার বাবা সঙ্গবিলাসী, আমি নিঃসঙ্গতাবিলাসী। আমি আমার বাবার মত নই এ কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। আমি কিছুতেই তাঁর প্রোটোটাইপ হব না, তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণ হব না। আমি তাঁর সদৃশ নই। সামান্য সাদৃশ্য শুধু চেহারায় আছে। তার ওপর আমার কোন হাত ছিল না। কিন্তু প্রকৃতিগত বাকি পনের আনা বৈসাদৃশ্য আমি নিজে হাতে করে গড়েছি।

এই বৈপরীত্যই বাবাকে পীড়িত করে আমি বেশ বুঝতে পারি। মানুষ মুখে যাই বলুক, আয়নায় সে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখে, ছেলের মধ্যেও তেমনি নিজের আর একটি প্রতিমূর্তি দেখতে চায়। আর তার সে বাসনা কোনদিনই পূর্ণ হয় না। ছেলের সঙ্গে বিরোধ এই অচরিতার্থ বাসনার বিরোধ। নইলে বাবার সঙ্গে বিরোধের তো আমার কোন কারণ নেই। কাঞ্চন নিয়ে নয়, কামিনী নিয়ে নয়, যশ নিয়ে নয়, জীবনের কোন আদর্শ নিয়ে নয। সব ব্যাপারেই আমরা স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ। আমরা কেউ কারো কাছে কিছু অংশ প্রত্যাশা করিনে। এই একই ফ্লাটে পাশাপাশি ঘরে বাস করেও আমরা যেন দুই দূরবর্তী গ্রহের অধিবাসী। এ কথা ভাবতে কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে। আমি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারিনে। বিনা কারণে অন্য একটা ফ্লাট ভাড়া করে উঠে গেলে বাবা শকড হবেন। তা ছাড়া সংসারে আমার কনট্রিবিউশনের অঙ্কটা একেবারেই তাতে হয়তো শূন্যে গিয়ে পৌঁছোবে। তা আমি চাইনে। আমি অবলিগেশন স্বীকার করি। কিন্তু বাবার সঙ্গে এই অতিসান্নিধ্য, নিরবচ্ছিন্নতা কামনা করিনে। তাই যে স্থানগত দূরত্ব আমাদের মধ্যে নেই কালগত ব্যবধান দিয়ে আমাকে তা পুষিয়ে নিতে হয়। এই ফ্লাটটা ঘড়ির কাঁটা দিয়েই আমি ভাগ করে নিয়েছি। বাবার জন্যে দিন, আমার জন্যে রাত। তিনি যখন কাজ করেন, কাজের চেয়েও বেশি কলরব কোলাহল করেন, আমি তখন ঘুমোই। আর রাত দশটা বাজতে না বাজতে তাঁর চোখ যখন ঘুমে বুজে আসে আমার তখন দিন শুরু হয়। এই সময়টায় আমি বসে বসে পড়ি, দু-চার পাতা লিখতে চেষ্টা করি। আর কখনো বা চুপচাপ বসে বসে নিজের একাকিত্ব অনুভব করি, উপভোগ করি। শুধু উপভোগ ? সেই সঙ্গে যন্ত্রণাও কি বোধ করিনে ? বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার যন্ত্রণা, অনাত্মীয় হয়ে পড়বার যন্ত্রণা। আমার বাবা মা আমার একাকিত্বের বিলাসটুকুই শুধু দেখেন, যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারেন না। যে বিচ্ছিন্নতা আমি কামনা করি তাকে আবার অপছন্দও করি, ভয়ও করি। আশ্চর্য ব্যাপার। বাবা তো জানেন না আমার বিরোধ শুধু তাঁর সঙ্গেই নয়, বিরোধ আমার নিজের সঙ্গেও। আর পাঁচজনের সঙ্গে যে বিরোধ তা নানা শর্তে মীমাংসা করে নেওয়া যায়। কিন্তু স্ববিরোধে কোন সন্ধির স্থান নেই।

বাবা বলেন, 'হাট করিসনে, বাজার করিসনে, সংসারে কী আছে না আছে সেদিকে তাকাসনে। কোন ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই। শুধু টাকাটা দিয়েই খালাস। যেন মেসে আছিস। যেন সংসারটা আমার একারই, তোরও নয়।'

ঠাকুরমা বলেন, 'কী করে হবে ' এখন একটি বউ এনে দাও বাপু। তবে তো ঘরে মন বসবে। সংসারকে আপন বলে মনে হবে। ওর ভাবসাব দেখে মনে হয় পরের গোয়ালে আছে। ঘাস বিচালি গামলা সব পরের। অন্তত নিজের দড়িগাছিটি ওকে তোমরা জোগাড় করে দাও।'

ঠাকুরমা হাসতে থাকেন।

বাবা ধমক দেন, 'কী যা তা বলো তোমরা। আজকাল ছেলেরা এ বয়সে কেউ বিয়ে করে নাকি ? মেয়েদের বিয়ের বয়েসই আজকাল তেইশ চব্বিশ। কি তারও বেশি। ছেলেদের বিয়ের বয়েস আরো পিছিয়ে গেছে।'

ঠাকুরমার ইন্টারপ্রিটেশন কিন্তু ঠিক নয়। অকৃতদারেরও যে পরিবার আছে পারিবারিক দায়িত্ব আছে তা আমি মানি। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করবার ধরন সকলের এক নয়। সাধ্যও বিভিন্ন। এতদিন যে আশা আমার কাছে কেউ করেনি, যে দাবি কেউ তোলেনি সেই সব দাবিও আজ দফায় দফায় এসে হাজির হয়েছে। তোমাকে শুধু তোমার মত হলে চলবে না, তোমার মন নিয়ে থাকলে চলবে না, তোমাকে আর পাঁচজনের মতও হতে হবে, আর পাঁচজনের মন বুঝে চলতে হবে, মনের আশা মিটাতে হবে।

মনে মনে আমি যে তেমন একজন হওয়ার কথা মাঝে মাঝে না ভাবি তা নয়। কিন্তু আমার মধ্যে এমন আরো একজন আছে যে তা হতে চায় না, কি হতে পারে না। কে সবাইকে বোঝাবে এই না চাওয়াটা না পারাটাই একমাত্র আমি নয়। বাবার প্রত্যাশা আমি এখন তাঁর ভাইয়ের মত হই, বন্ধুর মত হই। আমি তাঁর পাশে দাঁড়াই, পিছনে দাঁড়াই, সামনে দাঁড়াই। তাঁকে আমার মনের সব কথা খুলে বলি আর তিনিও বাজারের চড়া দর থেকে শুরু করে যাবতীয় সুখ দুঃখের কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। এই অত্যাগোসহনো বন্ধুত্ব আমার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। বাস্তবে তাকে সহ্য করা আরো কঠিন। বন্ধুত্ব যেন চাইলেই পাওয়া যায়! যেন দিতে চাইলেই দেওয়া যায়! তাই তিনি যত কাছে আসতে চান আমি তত দূরে সরতে থাকি। কী জানি কেন, এই গায়ে পড়া আত্মীয়তা আমার সহ্য হয় না। আমি আমার প্রাইভেসি বজায় রাখতে ভালোবাসি। তিনি সব সময় তা ভাঙবার জন্যে ব্যগ্র। মেয়ে বলে তিনি রুমার প্রাইভেসি মানবেন, কিন্তু ছেলের প্রাইভেসি মানবেন না। তিনি যখন তখন আমার ঘরে এসে উঁকি দেবেন। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখবেন, অনন্ত কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, 'কী করছিস ? কী পড়ছিস ? কী ভাবছিস ?'

যেন এই ত্রিপ্রশ্নের জন্যে মানুষের মন সব সময় তৈরি থাকে, যেন প্রশ্ন করলেই তার জবাব দেওয়া যায়। জবাব না পেয়ে বাবা রাগ করে চলে যান, অপমান বোধ করেন। তাঁর মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আমি সব টের পাই। টের পেয়েও কিছু করতে পারিনে। তাঁর মত আবেগে আপ্লুত হতে পারিনে। বরং যত্রতত্র মানুষকে আবেগে আর্দ্র হতে দেখলে আমার হাসি পায়। অথচ আমার বাবা আবেগ আর আসক্তির মধ্যে ডুবে থাকতে চান। আমি ঠিক উলটো। নিরাবেগ নিরাসক্তির শুষ্ক জমিতে আমার বাস। এই নিরাসক্তি আর নির্মমতা আমার মধ্যে কোত্থেকে এলো ? এ তো আমি ইনহেরিট করিনি। এ আমার স্বোপার্জিত সম্পদ। কিন্তু মজা এই, আমার এই উপার্জন সব সময় স্বেচ্ছাকৃত নয়, সব সময় একে ঠিক সম্পদ বলেও আমি গণ্য করিনে। তবু আমার প্রকৃতি আমারই প্রকৃতি।

বাবা যেন মনুষ্য সমাজের প্রতীক। বাবার সঙ্গে আমার যে বিচ্ছেদ আর বিচ্ছিন্নতা সংসারের সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমি সেই দূরত্ব অনুভব করি। ঠাকুরমা আমার পাশের তক্তপোশে থেকেও আমার নাগাল পান না। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলেন, 'শান্টু, তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস।'

মেজাজ ভালো থাকলে আমি হেসে জবাব দিই, 'ঠামা, নাতিরা বড় হলে এমন ধারা কেমনই হয়ে যায়।'

ঠাকুরমা তাঁর পাকা মাথা নাড়েন, 'না। সবাই হয় না। তুই বড্ড খিটখিটে হয়েছিস।'

'কেমন হয়েছি বলতো ? আমার ঠাকুরদার মত ? তুমি জানো না ঠামা, নাতি বড় হলে আজকাল ডবল প্রমোশন পেয়ে তার বুড়ো ঠাকুরদা হয়ে যায়।'

'কক্ষণো না। তিনি মোটেই তোর মত ছিলেন না। অমন খিটখিট করতেন না কথায় কথায়। তিনি ছিলেন হাসিখুশি সদাপ্রসন্ন।'

প্রাকৃত বাংলায় কথা বলতে বলতে ঠাকুরমা হঠাৎ এক একটি তৎসম শব্দ কোত্থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসেন।

আমি ভাবি আমি আমার বাবার মতও নই, ঠাকুরদার মতও নই। আমি কি স্বয়ম্ভূ ?

ঠাকুরমা আমার নাগাল পান না। মা আর বোন দুজনেই আমার কাছে কিশোরী। বয়সের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকে। মেয়েদের বয়স বাড়ে না বুদ্ধি হয় না। এ অভিজ্ঞতা আমার আরো হয়েছে। অথচ সে কথা বললে ওরা চটে। আমি আমার যে কটি ক্লাসমেটকে দেখলাম, তারা বয়সে সাবালিকা। বুদ্ধিতে চালচলনে আচারে ব্যবহারে বালিকা। তাই তাদের কারো সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব হল না। অসমকামিতা আমার আছে, কিন্তু অসম বন্ধুত্বে আমার বিশ্বাস নেই।

আমার নিঃসঙ্গতার মূলে কি এই অবন্ধুত্ব ? অপ্রেম ? রাজ্যের এই অনিচ্ছা আর অনাসক্তি কোত্থেকে আমার মধ্যে এল এখন আমি বুঝতে পারিনে। অথচ আমিও মাঝে মাঝে আসক্ত হতে চাই, উন্মত্ত হতে চাই। অভিন্ন হৃদয়ের সেই অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার অংশ নিতে চাই আমিও।

কিন্তু পেতে চাইলেই যেমন পাওয়া যায় না, হতে চাইলেই তেমন হওয়া যায় না। চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থেকেই যায়। মনে হয় এই তাদের চিরন্তন সম্পর্ক।

শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কাছে হাল ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি ? কার প্রকৃতি ? এ প্রকৃতির খানিকটা আচার, খানিকটা আচার নয়।

লেখা থামিয়ে রেখে খানিকক্ষণের জন্যে আমাকে ঠাকুরমার কাছে উঠে যেতে হয়েছিল। আবার এসে বসেছি।

ঠাকুরমা এই রাত আড়াইটের সময় তাঁর মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে খিলখিল করে হাসছিলেন। আশি বছরের বুড়ির হাসি নয় ; অষ্টাদশীর কলকণ্ঠ। কী করে যে তিনি এই বয়সেও অমন করে হাসতে পারেন, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমে আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি। স্বপ্নের মধ্যেই তো হাসছেন। হাসুন, যত পারেন হেসে নিন। ভয় পেয়ে তিনি যখন আঁতকে ওঠেন, বীভৎস শব্দ করতে থাকেন আমার ভয় হয় তিনি বোধ হয় এবার মরে যাবেন, আমি তাঁকে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে দিই। কিন্তু এখন নির্ভয়ে তাঁকে হাসতে দেওয়া যায়। লোকে বলে বটে হাসতে হাসতে মরি, সত্যিই মরে যায় না।

কিন্তু একটু বাদেই আমার ভুল ভাঙল। তিনি আমাকে ডাকলেন, 'শান্টু, শোন।'

আমি বললাম, 'একি তুমি এখনো জেগে আছ ?' তুমি কি ঘুমের মধ্যে হাসছ না ?'

'বাবে ঘুমের মধ্যে হাসব কেন ? ঘুমের মধ্যে আবার কেউ হাসে নাকি। আমি অনেকক্ষণ জেগেছি।'

'বেশ করেছ। কিন্তু অমন করে হাসছ কেন ?'

'তোর দাদুর একটা কাণ্ড মনে পড়ল। তাই— । তোর বাবা আজ বিকেলে এসে বলেছিল কি না আজ তাঁর চলে যাওয়ার দিন। সে আজ কতকাল হয়ে গেল। আবার মনে হয়, এই তো সেদিন। ঠিক তোর বয়েস। তুই আর ক'দিনের। সেই বিকেল থেকেই আজ তাঁর কথা থেকে থেকে মনে পড়ছিল। তোর ওই টেবিল ল্যাম্প না কী এক পোড়াছাই করেছিস। তার আলোয় ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে কী আর করি, তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে— ।'

ঠাকুরমা আবার খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

'কী হল ?'

আমি এবার তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি হাসি থামিয়ে হাস্যকর ঘটনার কথা বর্ণনা করলেন।

'তোর দাদুর কথা আর বলিসনে। সেবার হয়েছিল কি, খেয়ে দেয়ে দুপুরের পরে কাঁঠালতলার ছায়ায় ক্যাম্পখাট খানা পেতে তো গিয়ে শুয়েছেন। বিরাট ওজনের মানুষ, দশাসই চেহারা। তাতে খাওয়া-দাওয়াব পর ভুঁড়িটি আরও বড় হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পখাটের চটটা পুরোন, সইবে কেন। ছিঁড়ে একেবারে দুম করে মাটিতে পড়ে গেলেন। আর উঠতে পারেন না। দু হাত তুলে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন, ও মেজো বউ আমাকে তোল, আমাকে ধরে তোল। ধারে কাছে আর কেউ নেই। আমি এঁটো হাতে উঠে এলাম। কিন্তু আমি কেন পারব অত বড় মানুষটাকে সহজে টেনে তুলতে। আমার হাতের এঁটো তাঁর গায়ে লাগল, কাপড়ে লাগল, ভুঁড়িতে লাগল। দেখে তিনিও হাসেন আমিও হাসি।'

দৃশ্যটা কল্পনা করে আমিও হেসে উঠলাম। মনে হল অনেকদিন পরে নিজের উচ্চ-হাসি শুনতে পেলাম আমি।

ঠাকুরমা এখনো হাসছেন। আর ফিরে ফিরে আমাকে ডাকছেন। আমি এবার উঠব। গিয়ে বসব তাঁর কাছে। তারপর এমনি আরো কয়েকটি হাস্যকর স্মৃতির ভিতর দিয়ে দুজনে মিলে আমরা দাদুর মৃত্যুতিথি উদযাপন করব।

আমার নতুন জন্মতিথিও।

অনুচ্চ

বাস থেকে একসঙ্গেই নামলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সুমিতা তার সদ্যপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে রাস্তা পার হলে তিনি সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসো, এই গেট।'

তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়িগুলির দিকে সুমিতা একটুকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এত বদলে গেছে জায়গাটা। ভাবাই যায় না। এর আগে যাতায়াতের পথে চোখে পড়েছে উঁচু দেয়ালঘেরা বিরাট বাগান। বাগানের মধ্যে গরু মোষের চারণভূমি, চিকিৎসাশালা। সরকারী উদ্যোগে আজ সেখানে সারি সারি বাড়ি উঠেছে। ঘরে ঘরে মানুষ বাস করছে। ব্যালকনিগুলিতে রঙ-বেরঙের ফুলের টব। কোন কোন ঝুল-বারান্দায় রঙীন শাড়ি শুকোচ্ছে। বাঁদিকের একটা বাড়িতে মিস্ত্রীরা কাজ করছে। বেশ লাগে দেখতে। এখানে বাড়ির পর বাড়ি উঠছে। আরো কত বাড়ি তৈরি হবে, আরো কত লোক আসবে কে জানে। এই হাউসিং এস্টেটটাই ছোটখাটো এক শহর হয়ে উঠবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কোন্ ব্লকে যাবে?'

গায়ে সাদা জামা, মাথায় পাকা চুল। ভদ্রলোক এতক্ষণ তার পাশে বসে আসছিলেন। কথায় কথায় তিনি আলাপও করে নিয়েছেন সুমিতার সঙ্গে। সে বেলগাছিয়া হাউসিং এস্টেটে আসছে শুনে বলেছেন, 'আমিও ওখানেই থাকি।' ভদ্রলোক বাপের বয়সী সুমিতার। তবে বাবার মাথার চুল অত পাকেনি। এখনো তিনি অত বুড়ো হননি। এখনো যথেষ্ট কাজ করেন। স্কুলে মাস্টারি আছে, ট্যুইশন আছে, বাড়ির পিছনে তরিতরকারির বাগান করেছেন, সেখানে খাটেন। সব দেখেন।

মা যদি বলেন—'তুমি কি এক মিনিটও চুপচাপ থাকতে পার না?' বাবা উত্তরে বলেন—'যেদিন একেবারে মহাশয্যায় শোব, সেদিন চুপ করব।'

'কোন্ ব্লকে যাবে?' বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

সুমিতা বলল, 'কিউ ব্লক।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে। আমি উল্টো দিকের ব্লকে থাকি, পি-তে। কিউ ব্লকের কত নম্বর?'

সুমিতা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'দু' নম্বর।'

'ও, চাটুয্যেদের ওখানে যাবে বুঝি?'

সুমিতা চোখ নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।' মনে মনে ভাবল, ইনি দেখছি সবাইকেই চেনেন।

'আচ্ছা এবার আমি ঠিক যেতে পারব। চলি।'

সুমিতা তাঁর দিকে স্মিতমুখে তাকাল। কম বয়সী কোন ছেলে হলে বাংলায় কি ইংরেজীতে ধন্যবাদ দিত। কিন্তু বাপের বয়সী একজন ভদ্রলোককে মুখে ওকথা বলতে কেমন যেন লাগে। আপনার সৌজন্যে ধন্য হয়েছি একথা শুধু বিনীত ভঙ্গিতেই ফুটিয়ে তুলতে হয়।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আচ্ছা এসো। আছে সবাই। ছেলে বিদেশে যাচ্ছে। তাই নিয়ে এখন সবাই ব্যস্ত।' তিনি একটু হেসে কম্পাউন্ড পার হয়ে সামনের ব্লকের দিকে চলে গেলেন।

সুমিতা ভাবল, ওঁকে একটা নমস্কার জানালে হতো। উনি হয়তো তাই আশা করেছিলেন। অভদ্রতা হয়ে গেল। কিন্তু সুমিতার সঙ্কোচ হচ্ছিল ওভাবে নমস্কার জানাতে। অথচ এই সামান্য আলাপে ঠিক প্রণামও করা যায় না। ভদ্রলোক ওদের সবাইকেই চেনেন দেখা যাচ্ছে। সুমিতা যে প্রদীপের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছে তাও নিশ্চয়ই ওঁর অনুমান করতে বাকি নেই। সেই জন্যেই কি অমন করে মুখ টিপে হাসছিলেন! বুড়ো হলেও বেশ সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক। ভারি সুন্দর ব্যবহার।

সুমিতা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ডাইনে একটি ফ্ল্যাট, বাঁয়ে একটি ফ্ল্যাট। মাথার ওপরে নম্বর আর দরজার গায়ে নেম-প্লেট বসানো। আর একটি করে চিঠির বাক্স। সুমিতা ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে উঠতে লাগল। যেন ইচ্ছা করেই পথে দেরি করছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে আর কী হবে! যা হবে তা তো সে জেনেই এসেছে।

শেষ পর্যন্ত দু'নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুমিতা। এখানেও গায়ে আঁটা নম্বর

নেম-প্লেট। পি· চ্যাটার্জি অবশ্য এখনো প্রদীপ চ্যাটার্জি নয়, প্রশান্ত চ্যাটার্জি। ওর বাবা। সরকারী ফুড ডিপার্টমেন্টে ভালো চাকরি করেন। কলিং বেলের সাদা বোতামটা দেখা যাচ্ছে। তাতে আঙুল ছোঁয়াবার আগে সুমিতা একটু ভাবল। ইচ্ছা করলে সে বেল নাও বাজাতে পারে। তা হলে সে যে এসেছিল সে কথা না জানিয়েই চলে যেতে পারে সুমিতা। শুধু বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাড়া আর কেউ তো সাক্ষী নেই।

কিন্তু সত্যিই তো আর এভাবে চলে যাওয়া যায় না। অতদূর থেকে এসে দেখা না করে কি যাওয়া যায় ? কলিং বেলে মৃদু চাপ দিল সুমিতা। যাতে বেশি জোরে শব্দ না হয়। সে যে এসেছে সবাইকে জানিয়ে লাভ কি। যার শুনবার সে শুনলেই হলো।

দরজায় একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র দিয়ে একটি কালো চোখ দেখা গেল। আর মিষ্টি গলা—'কে ?' গলার স্বর শুনে সুমিতা ওকে চিনতে পেরেছে। প্রদীপ নয়, ছন্দা। ওর ছোট বোন।

সুমিতা বলল, 'আমি।'

ছন্দা দরজা খুলে দিয়ে হেসে বলল, 'ও আপনি ! সুমিতাদি ! আমি ভাবলাম কে না কে। তাই আগে দেখে নিলাম। চট করে সবাইকে তো আর দরজা খুলে দেওয়া যায় না। যদি ডাকাত-টাকাত কেউ হয় ?'

বছর পনের ষোল হবে বয়স। লাল টুকটুকে একটি ফ্রক পরেছে ছন্দা। খুব ফরসা রঙ। সব রঙই ওকে মানায়। সুমিতার মত কালো তো নয়।

সুমিতা একটু হেসে বলল, 'এই দিনের বেলায় কে আসবে তোমাদের এখানে ডাকাতি করতে ?'

ছন্দা হেসে বলল, 'তা কি বলা যায় ? দিনের বেলাও ডাকাত আসতে পারে। তখন খবরের কাগজে বেরোবে, দুঃসাহসিক ডাকাতি।'

বয়স কম হলে কি হবে, পাকা মেয়ে ছন্দা। বোঝে সব। কথাও বলে পাকা পাকা। কে জানে, কী ভেবে কথাটা বলেছে ! কিন্তু ডাকাতি করবার কি সাধ্য আছে সুমিতার ? সে এসেছে ভিখারী হয়ে। ডাকাতি করবে সে কী নিয়ে ? রূপের গর্ব কি আছে তার ? না কোন অসাধারণ যোগ্যতার গর্ব ?

প্রথমেই বসবার ঘর। দরজা ভেজানো। ঘরের ভিতর থেকে দু-তিনটি যুবকের গলা শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যে প্রদীপের গলা বেশ চেনা যায়। চড়া গলায় কথা বলছে প্রদীপ। আর খুব হাসছে। সফল পুরুষের প্রাণখোলা হাসি। এই হাসি দেখে আনন্দ পাওয়া উচিত, বন্ধুর এই সাফল্যে খুশি হওয়া উচিত সুমিতার। কিন্তু পারছে কই ? তার মন কি সত্যিই এত অনুদার ? ভাবতে লজ্জা হয় সুমিতার।

'দাদা, সুমিতাদি এসেছেন।' ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে ছন্দা উচ্চগলায় ঘোষণা করল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'আপনি কি আগে ও ঘরে যাবেন, না মা'র সঙ্গে দেখা করবেন ?'

সুমিতা বলল, 'চল , আগে মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ছন্দা বলল, 'সেই ভালো। একবার ওঘরে ঢুকলে কি সহজে বেরোতে পারবেন ?'

সুমিতা ছন্দার টোল পরা দু'টি গাল টিপে দিল। হেসে বলল, 'দুষ্টু।'

ঘরে গেলে সুমিতা সঙ্গে সঙ্গে বেরোতে পারত কি না বলা যায় না। প্রদীপ হয়তো বন্ধুদের সামনেই ওকে বসে থাকতে বলত। উঠতে চাইলে বাধা দিয়ে বলত, 'আরে, বোসো বোসো।'

আগের তুলনায় ওর লজ্জা-টজ্জা অনেক কমে গেছে আজকাল। কিন্তু সুমিতা এসেছে শুনে প্রদীপ তো একবার বাইরে আসতে পারত। একবার মুখ বাড়িয়ে হেসে বলতে পারত, 'এলে ?'

বন্ধুরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছিল না। কিন্তু প্রদীপ তার দরকার বোধ করেনি। সুমিতার অত গুরুত্ব তার কাছে এখন আর নেই। কিন্তু সেও তো অযাচিতভাবে আসেনি। প্রদীপ তাকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনেছে বলে এসেছে। কিন্তু সুমিতা আসবার পর আর তার কোন ঔৎসুক্য নেই। এমনিই হয়। ধরা দেওয়ার পর আর কোন কৌতূহল থাকে না। যতদিন অধরা ছিল ততদিনই ওর কাছে সুমিতার আদর ছিল। এখন আর তা নেই। থাকবে এমন আশা করাই ভুল।

প্রদীপ না এলেও তার মা এগিয়ে এলেন। রান্নাঘরে বসে খাবার তৈরি করছিলেন। পরনে খয়েরী

পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি। নিজেও ভারি সাদাসিধে মহিলা। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে হেসে বললেন, 'এসো সুমিতা, এসো। কতদিন পরে এলে। আমাদের এই নতুন বাসায় তুমি বোধহয় এই প্রথম—'

সুমিতা তাকে প্রণাম করে বলল, 'হ্যাঁ মাসীমা। এর আগে এখানে আসিনি। বেশ ভালো ফ্ল্যাট পেয়েছেন।'

প্রদীপের মা বললেন, 'আর ভালো ফ্ল্যাট পেয়েই বা কি হবে। ছেলে তো চলল জার্মানীতে। কী যেন ফার্মটার নাম, মনেও থাকে না ছাই। সেখানে কাজ করবে, কাজ শিখবে।'

সুমিতা চুপ করে রইল।

প্রদীপের মা বললেন, 'যাব যাব করছে কি আজ? পাস করেছে এই দু'বছর। দু'বছর ধরেই ওর এক ধ্যান এক জ্ঞান—বাইরে যাবে। বন্ধুরা অনেকেই গিয়ে সেখানে পুরোন হয়েছে। ওর না গেলে কি আর মান থাকে? আমি বললাম—যাচ্ছ বাপু যাও। বিয়ে করে একটি বউ আমাকে দিয়ে যাও।'

সুমিতার দিকে তাকালেন তিনি।

সুমিতা চোখ নামিয়ে নিল। ওঁর তো কিছুই অজানা নেই। ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথা মাসীমা ভালো করেই জানেন। প্রদীপ কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। তাদের দু'জনের বন্ধুত্বের কথা বাবা-মাকে বলেছে, বোনদের বলেছে। নিজের বন্ধুমহলেও ছড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। কম দিন তো নয়। দু'বছর ধরে জানাশোনা তাদের। কতদিন ধরে আসা-যাওয়া। সবাই জানে। কিন্তু যা জানে তার কতখানি ঠিক! কতখানিই বা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে উঠবে তা নিয়ে সুমিতার মনে আজ সংশয় জেগেছে। সেই সংশয় আজ কি ভঞ্জন করে যেতে পারবে সুমিতা?

প্রদীপের মা বলতে লাগলেন, 'কিন্তু বিয়ের কথায় ছেলে প্রায় মারতে ওঠে। বলে—এখনি বিয়ের কি হয়েছে! এখনো সেটেল্‌ড্‌ হতে পারলাম না ভালো করে। আমি বলি, বয়েস তো আর কম হলো না। ছাব্বিশ উতরে সাতাশে পড়েছিস। তারপর যদি আরো তিন-চার বছর বাইরে কাটিয়ে আসিস তা হলে তো বুড়ো হয়ে যাবি।'

সুমিতা এবারও কোন কথা বলল না।

প্রদীপের মা বলে যেতে লাগলেন, 'ছেলে কি জবাব দেয় জানো? ছেলে বলে, তিরিশ কেন মা, আজকাল চল্লিশেও বিয়ের বয়স পার হয় না। শোন কথা!'

শুধু ছেলে নয়, ছেলের মা-ও যে একই মত একই পথ নিয়েছেন, তাঁর কথার ধরন শুনে তাই মনে হয় সুমিতার। মনে পড়ল প্রদীপ একদিন বলেছিল—'আমার বাবার চেয়ে মা বেশি অ্যাম্বিসাস্‌। আমার মা চান আমি আরো বড় হই। দিগ্বিজয় করে আসি। নিজের মনের সব অপূর্ণ সাধ মা যেন আমার ভিতর দিয়ে মেটাতে চান।'

সুমিতা বলল, 'মেসোমশাই ফেরেননি এখনো?'

প্রদীপের মা বললেন, 'না। তাঁর ফিরতে দেরি হয় আজকাল। ছ'টা সাড়ে ছ'টার আগে ফিরতে পারেন না।'

'আর অরুণা? ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না।'

প্রদীপের মা বললেন, 'আমাদেরই দেখা হয় না, আর তো তোমার সঙ্গে! ওর শাশুড়ী ওকে ছাড়তে চান না। খোকা যাওয়ার আগে দু'দিন এসে থাকবে। দু'টি ছেলেমেয়ের মা হয়েছে। এখন তার পুরো সংসার। অথচ খোকার ঠিক পিঠাপিঠি আমার ঐ অনু। দু'বছরের মাত্র ছোট। ছেলে আর মেয়েতে এই তফাত মা।'

প্রদীপ তার ঘর থেকে হাঁক দিয়ে বলল, 'মা, শ্যামলরা চলে যাচ্ছে। চা-টা যদি দিতে হয় এক্ষুনি দিয়ে যাও।'

'যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি।' প্রদীপের মা হেসে সুমিতার দিকে তাকালেন, 'ছেলের বন্ধুবান্ধব এলে আর রক্ষা নেই। সব সময় তাদের আদর-আপ্যায়নের জন্যে আমাকে হাজির থাকতে হবে। তুমি ছন্দার সঙ্গে ওঘরে গিয়ে বসো। আমি ততক্ষণে ওদের খাবারটা দিয়ে আসি।'

প্রদীপের মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। ছন্দার পিছনে পিছনে সুমিতা পাশের ঘরে ঢুকল।

ঘরের আধখানা জুড়ে খাট। প্রদীপের বাবা মা থাকেন এ ঘরে। একপাশে গদরেজের আলমারি। আর একদিকে বাক্স সুটকেশ হোল্ডঅল সব টাল করা রয়েছে। একজন যে বাইরে যাচ্ছে তা বেশ বোঝা যায়।

ছন্দা বলল, 'এ ঘরটা বড় অগোছালো হয়ে রয়েছে সুমিতাদি। চলুন আমার ঘরে। আজকাল আমি একা একঘরে থাকি। পুরো একখানা ঘর এখন আমার।'

অধিকারিণীর গর্ব চোখে মুখে ফুটে উঠল ছন্দার। সুমিতা হেসে বলল, 'তাই নাকি?' তারপর ওর ঘরে গিয়ে বসল। দেয়াল ঘেঁষা ছোট একটি খাট। জানালার ধারে টেবিল-চেয়ার পাতা। টেবিলের একপাশে সেলফ্। স্কুলের বইখাতা সাজানো। আগরপাড়ার বাড়িতে প্রায় এমন একখানা ঘর সুমিতারও আছে। অনেকদিন ধরেই আছে। স্কুলে কলেজে যখন পড়ত একা একখানা ঘর দখল করতে পারার চেয়ে বড় স্বপ্ন যেন আর ছিল না। ধীরে ধীরে সাধ-আকাঙ্ক্ষা কত বদলে গেছে। এখন আর একা এক ঘরে মন ভরে না। এখন নিজেকে যেন মাত্র আধখানা বলে মনে হয়। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আর আধখানার জন্যে সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর একজনকে নিজের সবখানি ধরে দিতে না পারলে যেন তৃপ্তি নেই, স্বস্তি নেই। কে এই আকাঙ্ক্ষা সুমিতার মধ্যে ভরে দিল? যে আগুন শুধু পুড়িয়ে খাক করে দেয় তা কে এমন করে জ্বালিয়ে দিল? এ আগুন কি নিভবে?

'আমার ঘরখানা ভালো না সুমিতাদি?' ছন্দা পাশে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বসল।

সুমিতা বলল, 'খুব ভালো।'

'ওই যে সামনের বাড়িটা দেখছেন ওটা এন্ ব্লক। ওই ব্লকের তেতলার ফ্ল্যাটে আমার একজন বন্ধু আছে। এখানে এসে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

সুমিতা একটু হেসে বলল, 'ছেলে বন্ধু?'

ছন্দা বলল, 'কী দুষ্টু আপনি! ছেলে বন্ধু হতে যাবে কোন্ দুঃখে? আমি কি আপনার মত বোকা?'

ঠিকই বলেছে ছন্দা। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে দুঃখই পেতে হয়। যে করে সে বোকা ছাড়া কিছু নয়।

সুমিতা একটু হেসে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম ছন্দা। সত্যি তুমি মোটেই বোকা নও। তুমি আমার চেয়ে চালাক, ঢের চালাক।'

ছন্দা বলল, 'আপনি কি রাগ করলেন সুমিতাদি? রাগ করবেন না। দাদা চলে গেলেও আপনি কিন্তু আসবেন। প্রায়ই আসবেন। আর দু'এক বছর বাদে আমিও আপনার বন্ধু হতে পারব। পারব না সুমিতাদি?'

সুমিতা ছন্দাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'তুমি এখনই আমার বন্ধু হয়েছ।'

খাবারের প্লেট হাতে প্রদীপের মা ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন, 'ওকে আর অত আদব দিয়ো না সুমিতা। এমনিতেই যা সোহাগিনী হয়ে উঠেছেন মেয়ে! মাটিতে পা পড়ে না।'

টেবিলের ওপর প্লেট আর একটি বাটি নামিয়ে রাখলেন তিনি।

সুমিতা বলল, 'এত কে খাবে? আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। এখন কিচ্ছু খেতে পারব না মাসীমা।'

ছন্দা বলল, 'সুমিতাদি রাগ করেছেন, মা।'

'কেন? রাগ করবে কেন?'

'রাগ করবে না? তোমাদের ব্যবহার-ট্যবহার মোটেই ভালো না।'

মুখে খানিকটা লুচি-মাংস পুরে ছন্দা মা'র দিকে তাকিয়ে মুখ ফুলিয়ে রইল।

প্রদীপের মা হেসে উঠলেন, 'ফাজিল কোথাকার! সুমিতা কি তোর মত? ও আমার লক্ষ্মী মেয়ে। ওর কত বুদ্ধি। ও সব বোঝে। খাও সুমিতা। খেয়ে নাও। বেশি কিছু তো দিইনি। ওইটুকু খেতে পারবে। খেয়ে নাও।'

লুচি মাংস, হালুয়া রাজভোগ। প্লেট প্রায় সব ভরতি করে এনেছেন মাসীমা। অত কি খাওয়া যায়? সবই তো ভালো, কিন্তু কিছুই যেন ছুঁতে ইচ্ছা করছে না সুমিতার। কিন্তু কিছু না নিলে মাসীমা

কী মনে করবেন। হয়তো ছন্দার কথাই সত্যি বলে ভাববেন। বেশির ভাগ খাবারই ছন্দার প্লেটে তুলে দিল সুমিতা। নিজে সামান্য কিছু খেয়ে চায়ের কাপটি টেনে নিল।

আরো খানিক বাদে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে এল প্রদীপ। যেন এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে। রাজার মতই চেহারা হয়েছে প্রদীপের। রাজা তো নয়, যেন রাজাধিরাজ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর। লম্বা চেহারা। ছ ফুটের কাছাকাছি। চোখে মুখে সাফল্যের দীপ্তি। গায়ে টেরিলিনের সার্ট। পরনে ধূসর রঙের ট্রাউজার। এই সাধারণ বেশেও সুমিতার চোখে অসাধারণ লাগছে প্রদীপকে। অসাধারণ, কিন্তু বড় দূরের মানুষ, বড় নিষ্ঠুর আর আত্মকেন্দ্রিক। সুমিতা ভাবল, সাফল্য বোধহয় মানুষকে এমন দূরেই সরিয়ে দেয়। পরীক্ষায় একবার যখন ফেল করেছিল প্রদীপ, তখন যেন অনেক কাছে এসেছিল। তখন সান্ত্বনা সহানুভূতির দরকার হয়েছিল। তখন সুমিতার হাতখানা টেনে নিয়ে কপালে রেখেছিল, মুখে রেখেছিল, বুকের ওপর চেপে রেখেছিল সেই হাত। যেন একখানা হাতের মধ্যেই সংসারের সমস্ত অভয় আর অমৃত ধরা রয়েছে। ঠিক তেমনি করে কি প্রদীপকে আর কখনো পাবে সুমিতা ? ছি-ছি-ছি, সে কি প্রদীপের অকল্যাণ চায় ? সে কি প্রদীপের অসার্থক অসফল জীবন কামনা করে ? নিজে অতি সাধারণ বলে সে কি তার পরম বন্ধুকেও সাধারণের স্তরে নামিয়ে রাখবে ? না, তা সে কখনোই চায় না। এতে প্রদীপের সঙ্গে তার মিলন হোক আর নাই হোক, তাকে অকৃতী অকৃতার্থ করে নিজের কাছে ধরে রাখতে চায় না সুমিতা।

প্রদীপ বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে। এখন তার মন চঞ্চল। চালচলনেও সেই অস্থিরতা। কোথাও যেন এক মুহূর্ত সে স্থির হয়ে বসতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না।

'ওদের বিদায় করে এসেছি। চল এবার তোমাকে এগিয়ে দিই।'

প্রদীপ সুমিতার দিকে চেয়ে হাসল।

মা বললেন, 'ওমা, এখনি এগিয়ে দেওয়ার কি হলো ! সুমিতা এই তো এসে সবে বসেছে। তুইও বোস। একটু গল্প-টল্প কর। নিজেও বসবিনে, আর কাউকেও দু'দণ্ড বসতে দিবিনে। কী যে হয়েছিস তুই আজকাল !'

'কী করব বলো। বসে বসে গল্প করতে আমার ভালো লাগে না। সুমিতা, তুমি তা হলে মা'র কাছে বোসো। আমি বেরোই। কাজ আছে বাইরে।'

'তোর সব কাজই তো এখন বাইরে। বাইরেই তো যাচ্ছিস বাপু ! এই ক'টা দিন দু'দণ্ড না হয় আমাদের সঙ্গে ঘরেই রইলি।'

কিন্তু সুমিতা এবার উঠে দাঁড়াল, 'মাসীমা, আমিও চলি এবার। অনেক দূর যেতে হবে।'

ছন্দা বলল, 'ইস্ ভারি তো দূর ! বাড়ি কি তোমার সাত-সমুদ্রের পারে নাকি সুমিতাদি ?'

সুমিতা হেসে বলল, 'এখন তাই। সাত-সমুদ্রের পারেই।'

'শুনলে মা ? সুমিতাদির কথা শুনলে ? দাদা চলে গেলে সুমিতাদি আর আমাদের এখানে আসবেন না।'

প্রদীপের মা বললেন, 'পাগলী মেয়ে। তাই কি হয় ? সুমিতা কি আমার তেমন মেয়ে ? খোকা থাকতে থাকতে তুমি কিন্তু আর একদিন এসো সুমিতা। মাঝখানে আর চারদিন আছে। এর মধ্যে আর একদিন এসো।'

সুমিতা বলল, 'চেষ্টা করব মাসীমা। এখানে না আসতে পারলেও এয়ারপোর্টে হয়তো যাব।'

প্রদীপের মা বললেন, 'যাবে বইকি, নিশ্চয় যাবে। এয়ারপোর্টে কিন্তু তোমার অবশ্যই আসা চাই সুমিতা।'

কেবল আসা আর যাওয়া। সুমিতা প্রদীপের পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ভাবল কেবল আসা আর যাওয়া, আসা আর যাওয়া। কী হবে বার বার এসে ? মাসীমাও তো প্রদীপকে রাজি করাতে পারেননি। সুমিতা এ বাড়িতে বউ হয়ে আসুক তা উনি এখন চান কি না কে জানে ? হয়তো এখন আর চান না। স্কুল মাস্টারের মেয়ে, তাও দেখতে তেমন সুশ্রী নয়। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট, গাঁয়ের হাইস্কুলে কোনরকমে একটা টিচারি পেয়েছে। নিশ্চয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে ওঁর প্রত্যাশা সুমিতার সঙ্গে এখন আর খাপ খায় না। তাই সুমিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি একেবারে

নীরব হয়ে গেছেন। বাইরে যাওয়ার আগে প্রদীপ বিয়ে করে যাক, সুমিতার বাবা-মা নানাভাবে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু প্রদীপের বাবা-মা এদিক থেকে উদাসীন। প্রদীপ নিজেও তাই। ওঁদের পক্ষের সকলেরই ধারণা, এত ব্যস্ত হবার কি আছে ? কিন্তু সুমিতার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, 'বিয়ে করবে বলে কি তোকে প্রদীপ কথা দিয়েছে ? কথা যে রাখবে তেমন ভরসা কিছু কি পেয়েছিস ? যাওয়ার আগে রেজিস্ট্রিটা করে গেলেও তো পারত। তবু একটা লেখাপড়া হয়ে থাকত।'

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে সুমিতা। রাগ করে বলে, 'আমার কাছে ওসব কিছু জিজ্ঞেস করতে এসো না মা।'

মা বলেছেন, 'তোর ভালোর জন্যেই বলি বাছা। তুই তো সরল বিশ্বাসে সবই করে যাচ্ছিস। চিঠি লিখছিস, পত্র লিখছিস। বাড়িতে এলে আমরাও আদর-যত্ন করছি। সকাল নেই দুপুর নেই সন্ধ্যা নেই, যখনি বলছে—এসো, তুইও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছিস। কিন্তু পরিণামটা কি হবে ভেবে দেখেছিস কিছু ?'

সুমিতা জবাব দিয়েছে, 'না মা, আমি কিছুই ভাবতে চাই নে।' কিন্তু সত্যিই কি সে নির্ভাবনায় থাকতে পারে !

রাস্তায় নেমে প্রদীপ বলল, 'একটা ট্যাক্সি পেলে হতো।'

সুমিতা বলল, 'ট্যাক্সি দিয়ে কী হবে। এখান থেকে দমদম হেঁটে যেতে কতক্ষণই বা লাগবে ? বড়জোর বিশ মিনিট।'

প্রদীপ বলল, 'আরে, ট্যাক্সি পেলে কি সোজা দমদম যেতাম ?'

'তবে কোথায় যেতে ?'

'কোথায় যেতাম ? তুমি যেখানে যেতে বলতে।' প্রদীপ হাসল।

সুমিতা বলল, 'আমি স্টেশন ছাড়া কোথাও তোমাকে যেতে বলতাম না। তুমি বললেও যেতাম না।'

প্রদীপ সুমিতার আরো কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল, তারপর হেসে বলল, 'তুমি ভয়ঙ্কর রেগে গেছ দেখছি।'

সুমিতা মৃদুস্বরে বলল, 'রেগে গেছি ? আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ? কিন্তু আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এবার যাই।'

একটা খালি রিক্সা যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। রিক্সাওয়ালা তাদের দিকে দু-দুবার উৎসুক চোখে তাকিয়ে প্রায় নিরাশ হয়েই ফিরে যাচ্ছিল। প্রদীপ হঠাৎ ডেকে উঠল, 'এই রিক্সা।' রিক্সাওয়ালা কাছে এসে দাঁড়াতে সুমিতাকে প্রায় আদেশের সুরে বলল, 'ওঠো।'

সুমিতা বলল, 'আবার রিক্সা কেন, হেঁটেই তো যেতে পারতাম।'

প্রদীপ বলল, 'আহা চলোই না। কতদিন একসঙ্গে এমন করে আর যাওয়া হবে না ! তা ছাড়া জার্মানীতে নানারকম যানবাহনই জুটবে কিন্তু এমন রিক্সা আর জুটবে না।'

সুমিতা প্রদীপের পাশে উঠে বসে চুপ করে রইল। চওড়া নতুন রাস্তা দিয়ে রিক্সাওয়ালা তাদের নিয়ে চলল। দু'ধারে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। কোনটি দোতলা, কোনটি তিনতলা। একতলা বাড়ি একটিও নেই। সুমিতার বাবা গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে অতিকষ্টে কোনরকমে একটি একতলা বাড়ি তুলতে পেরেছেন। তার দেনা এখনো সব শোধ হয়নি।

প্রদীপ বলল, 'কথা বলছ না যে ?'

'কী বলব ?'

'কী বলবে তাও আমাকে বলে দিতে হবে ?'

সুমিতা চুপ করে রইল।

প্রদীপ হঠাৎ বলল, 'তুমি আমার ওপর খুব চটে গেছ, তাই না ?'

'কেন ? চটব কেন ?'

'বিয়ে না করেই চলে যাচ্ছি। না কি পুরুত-টুরুত একদিন ডাকব ? সময় তো এখনো ক'দিন আছে।'

'ঠাট্টা করছ ?'

'ঠাট্টা নয়, সত্যি। তুমি যদি চাও, তুমি যদি বিশ্বাস করতে না পারো তো একটা গ্যারান্টির ব্যবস্থা করে গেলে মন্দ হয় না।'

সুমিতা বলল, 'থাক। অমন একটা প্রহসন তোমার না করলেও চলবে।'

প্রদীপ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল, 'তুমি আরো একটা কারণে আমার ওপর চটেছ। নিশ্চয়ই চটেছ।'

'কেন ?'

'বাইরে যাওয়ার আগে তুমি আর আমি একটি দিন ভালো একটা হোটেলে কাটিয়ে যেতে চেয়েছিলাম বলে।'

'ওদেশে গিয়ে কাটিয়ো।'

প্রদীপ বলল, 'ওদেশ কেন, এদেশেও হয়। তুমি চোখ-কান বুঁজে আছ। কিছু দেখতে পাও না, শুনতে পাও না। কিছু জানো না।'

সুমিতা বলল, 'তুমি তো জানো আমরা হাল আমলের নই, সেকেলে। তবু বার বার কেন ওসব খোঁটা দিচ্ছ ?'

প্রদীপ বলল, 'খোঁটার কথা নয়। আসলে তুমি বদলাতে চাও না। কোন পরিবর্তনকে স্বীকার করতে চাও না। তুমি যেখানে আছ সেখানেই থেকে যেতে চাও।'

সুমিতা এ কথার কোন জবাব দিল না।

রিক্সা খানিক বাদে স্টেশনে এসে পৌঁছল। প্রদীপ ভাড়া মিটিয়ে দিল। দু'জনে এল টিকিট ঘরের সামনে।

প্রদীপ বলল, 'টিকেটটা আমিই কাটছি।'

সুমিতা বলল, 'কেন ?'

'একখানা টিকেট না হয় দিলামই তোমাকে। মনে করো যাওয়ার আগের উপহার।'

সুমিতা বলল, 'উপহার তোমার কাছ থেকে কতই তো নিয়েছি। আর নাই-বা নিলাম।'

প্রদীপ আর কোন কথা বলল না।

সুমিতা টিকেটখানা কেটে নিয়ে এল। তারপর দু'জনে এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াল।

প্রদীপ বলল, 'চল, একটু হাঁটা যাক।'

সুমিতা বলল, 'চল।'

দু'জনে দক্ষিণমুখে এগোতে লাগল।

সারা স্টেশনে বিকেলের ছায়া-ছায়া নেমেছে। চারদিকে কেমন যেন এক ধূসর বিষণ্ণতা। ট্রেন আসছে যাচ্ছে। গাড়ি বোঝাই মানুষ। কিন্তু সবই যেন ছায়া। কারো যেন কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়াল সুমিতা।

প্রদীপ বলল, 'ওকি, থামলে কেন ? কি দেখছ ?'

সুমিতা বলল, 'সূর্যাস্ত।'

প্রদীপ বলল, 'আমি সূর্যোদয় দেখতে চাই। অস্তরাগ দেখবেন তোমার বাবা আর আমার বাবা।'

সুমিতা চুপ করে রইল।

প্রদীপ তার আরো কাছে এসে দাঁড়াল। সুমিতার হাতখানা ধরতে গেল।

সুমিতা সরে গিয়ে মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। লোকজন দেখছ না ?'

প্রদীপ একটু হাসল, 'এখন আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখছিনে। আমাকে বিশ্বাস কর সুমিতা। আমি আবার ফিরে আসব। এসে একসঙ্গে বাস করব। আমি আরো বড় হতে চাই।'

সুমিতা মৃদুস্বরে বলল, 'বড় হওয়ার মানে কি ?'

প্রদীপ দৃঢ়স্বরে বলল, 'তোমার বাবা যে অর্থে বলেন সে অর্থে অবশ্যই নয়। কী করব বলো,

আমি চেষ্টা করেও অমন অধ্যাত্মবাদী হতে পারিনি।'

সুমিতার মনে পড়ল, তার বাবার সঙ্গে এ নিয়ে প্রদীপের কয়েকদিন তর্ক হয়ে গেছে। বাবা বলেছিলেন, 'এখনকার ছেলেরা শুধু ক্যারিয়ারিস্ট। তাদের মনে কোন উচ্চ আদর্শ নেই। তারা ব্যক্তিগত ভোগসুখের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। বেশির ভাগ ছেলেই বাইরে যায় শুধু বেশি টাকা রোজগার করতে পারবে বলে। শুধু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে বলে। তার চেয়ে বড় কিছু তাদের দেবারও নেই নেবারও নেই। শুনেছি অনেকেই আর ফিরে আসে না। ওসব দেশে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেশি বলেই আসে না। নিজের দেশকেও বড় করে তুলব—তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই বলেই আসে না। সব ক্যারিয়ারিস্ট আর সেলফ-সেনটারড্।'

বাবা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রদীপ উত্তেজিত হয়নি। সে শুধু পরিহাস আর অবজ্ঞা মিশিয়ে হেসেছিল। পুরোন মাস্টারমশাই বলে বাবাকে এখন আর তত শ্রদ্ধা করে না প্রদীপ—সুমিতা তা জানে।

প্রদীপ হেসে বলেছিল, 'আমি যদি বলি আপনার ছোট গণ্ডির মধ্যে আপনিও ক্যারিয়ারিস্ট, ষোল আনা ম্যাটেরিয়ালিস্ট। নিজের বাড়ি বাগান স্ত্রী আর মেয়ের ভবিষ্যৎ ছাড়া আপনিও কি আর বেশি কিছু ভাবেন ? আর সেই সঙ্গে স্কুলে আপনার নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি ? সব মিলিয়ে এইটুকুই কি আপনার দেশ নয় ? সেই দেশ আমরা যদি অন্য কোন দেশে গিয়ে গড়ে তুলি তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে বলুন ?'

বাবা কোন জবাব দিতে পারেননি। কিংবা দেননি। প্রদীপের ঔদ্ধত্য তাঁকে নিশ্চয়ই দুঃখ দিয়েছে।

প্রদীপ সুমিতার পাশে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর প্রবল আবেগের কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, সমাজে প্রতিষ্ঠা চাই, আর সেই সঙ্গে তোমাকে চাই। আর চাই ততদিন তুমিও চুপ করে বসে থাকবে না। তুমি আরো পড়াশুনো করবে। অনার্স দেবে, এম· এ· দেবে। আর প্রত্যেক চিঠিতে তোমার প্রোগ্রেসের খবর দেবে।'

সুমিতা চুপ করে রইল। সে জানে তার দ্বারা আর কিছু হবে না। প্রদীপের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে চলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই সাধ্য তার নেই। প্রদীপ যখন তা টের পাবে তখন কি আর তার দিকে ফিরে তাকাবে ? কিছুতেই তাকাবে না। প্রদীপ ভুলে যাবে, প্রদীপ তাকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবে।

সুমিতার মনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, একটি সুখের নীড় বাঁধা ছাড়া আর কোন উচ্চ আদর্শ নেই। প্রদীপের কাছে এসব তুচ্ছ, মূল্যহীন।

সুমিতার এখন শুধু একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা। প্রদীপ ভুলে যাওয়ার আগে সেও যেন সব ভুলে যেতে পারে। যেন ভুলে যেতে কোন কষ্ট না হয়।

একখানি ইলেকট্রিক ট্রেন এসে দাঁড়াল। গাড়ির রঙটা ভারি সুন্দর। স্নিগ্ধ সবুজ। সুমিতা প্রদীপের দিকে মুখ তুলে তাকাল। তারপর শান্তভাবে বলল, 'চলি এবার। আমার গাড়ি এসে গেছে।'

ঠোঙা

'গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! ওঠ বাবা। অনেক বেলা হয়ে গেছে ওঠ।'

চোখ মেলে তাকিয়ে মায়ের মুখ দেখতে পেল গোবিন্দ। কালো রোগাটে চেহারা। লম্বাটে ধরনের মুখ। বয়স এখনো চল্লিশ হয়নি কিন্তু গাল দুটো বসে গেছে। কপালের কাছে চুলে একটু একটু পাক ধরেছে।

সরলা একটু হাসল, 'কী দেখছিস অমন করে !'

মাকে হাসলে এখনো বেশ দেখায়, গোবিন্দ ভাবল। মাকে কেউ সুন্দরী বলবে না। কালো রঙ চ্যাপটা নাক চোখ দুটোও ছোট ছোট। তবু হাসলে মাকে এখনো ভারি সুন্দর দেখায়। হাসি মুখ মার অবশ্য খুব কমই দেখতে পায় গোবিন্দ। সারা দিন মা যেন রেগেই আছে, বিরক্ত হয়ে আছে জগৎ সংসারের ওপর। বাবাকে ধমকাচ্ছে। দাঁতে দাঁত ঘষে ছোট ভাই বোনগুলিকে বকছে, 'মর মর মর।' মা যেন দিন রাত মা-কালী হয়েই আছে। সংসারে অভাব অনটনের শেষ নেই। মার দোষ দেওয়া যায় না। তবু মার মুখখানা দেখতে ভালোই লাগে গোবিন্দর।

কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যে মুখখানা গোবিন্দ এতক্ষণ ধরে দেখছিল সে মুখ আরো সুন্দর। আশ্চর্য, যাকে সে দিনের বেলায় রোজ দেখে, রোজ দেখবার জন্যে বাসস্টপে অপেক্ষা করে, কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে স্বপ্নে যেন আরো অপূর্ব দেখাচ্ছিল। সেই স্বপ্ন রাজ্যে কোন তাড়া ছিল না কোন সংকোচ ছিল না, স্বপ্নে সে যেন অনন্ত সময় আর অফুরন্ত অবকাশ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

সরলা এবার বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, 'ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলি যে ? উঠবিনে ?'

গোবিন্দ এতক্ষণে বিছানার ওপর উঠে বসল। মাদুরের ওপর একটা বালিশ। একটার বেশি দুটো বালিশ ভাগে পড়ে না। হোসিয়ারি থেকে প্যাকিং-এর ব্রাউন পেপারগুলি দেয়ালের দিকে টান করা থাকে। মাঝে মাঝে সেই কাগজের বান্ডিল মাথার তলায় দিয়ে বালিশটা উঁচু করে নেয় গোবিন্দ। কিন্তু বাবা দেখলে ভারি রাগ করে, 'দিনের দিন বাবুগিরি বাড়ছে। কাগজগুলি নষ্ট করে ফেলবি। ঠোঙা আর বিক্রি হবে না তা হলে।'

গোবিন্দ মায়ের দেওয়া ছেঁড়া শাড়িখানা গা থেকে খুলে তার হাতে দিল। গায়ে দেওয়ার চাদর নেই। এই কার্তিক মাসে কারো চাদরের দরকারও হয় না। ঘরের মধ্যে এমনিতেই বেশ গরম। একখানা ঘরে তারা ছ'জন থাকে। গোবিন্দ বাবা মা আরো তিনটি ভাই-বোন। এতগুলি লোকের গায়ের গরমেই ঘর গরম হয়ে ওঠে। তারপর উনুনের আঁচ আছে। এই ঘরের মধ্যেই রান্না খাওয়া। ঠোঙার জন্যে আঠা জ্বাল দেওয়া চলে। আর কারো শীত লাগে না। কিন্তু রাত্রে একটা কিছু গায়ে জড়িয়ে শুতে না পারলে গোবিন্দ যেন অস্বস্তি বোধ করে। জড়াবার মত চাদর সব সময় তো জোটে না। কখনো মায়ের কখনো বোনের পুরোন ছেঁড়া শাড়ি-টারি চেয়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে শোয়। সেই ছেঁড়া শাড়িরও আজকাল অভাব। বাবা বলে, 'কী বাবুগিরিই শিখেছিস। মা বোনের পরবার কিছু থাক আর না থাক তোর গায়ে একটা কিছু দেওয়া চাই-ই চাই।'

মা তখন ছেলের পক্ষ নেয়, 'ইস্, কত শাল দোশালা গায়ে দিয়ে বেড়ায় তোমার ছেলে। তার জন্যে অত খোঁটা !'

গোবিন্দ জানে বাবা মুখে যতখানি ধমকায়, রাগ করে, ভিতরে ভিতরে কিন্তু তার ওপর তত অসন্তুষ্ট নয়। বরং মার মত বাবাও চায় গোবিন্দ বাড়ির আর সবাইর চেয়ে বেশি আরাম আয়েস করুক, একটু ভালো জিনিস খাক ভালো জামাকাপড় পরুক। কারণ গোবিন্দই সংসারের আশা ভরসা। সে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। বি· এ· পড়বে, বি· এ-র পর এম· এ·। তারপর ভালো চাকরি-বাকরি করবে। সে-ই তখন ছোট ভাই বোনগুলিকে মানুষ করার ভার নেবে। তখন আর তাদের ঠোঙা তৈরি করে খেতে হবে না। গুদাম ঘরের মত এই একখানা মাত্র টিনের ঘরে থাকতে হবে না। গোবিন্দ তখন সবাইকে নিয়ে পাকা বাড়িতে উঠে যাবে। এই স্বপ্ন সবাই দেখে। সবাই তার দিকে চেয়ে আছে। সবাই যেন তেল ঢেলে ঢেলে একটি দীপশিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছে। সে সব অন্ধকার দূর করবে, সবাইর সব দুঃখ ঘোচাবে। ভেবে মাঝে মাঝে বেশ গর্ব হয় গোবিন্দর। অহঙ্কারের সীমা থাকে না। মাঝে মাঝে আবার অবসাদ আসে। সংশয়ে আশঙ্কায় মন ছেয়ে যায়। পারবে তো গোবিন্দ ? বাড়িসুদ্ধ লোকের এত আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবে তো ? পরীক্ষার রেজাল্ট তো তেমন ভালো হয়নি। ফার্স্ট ডিভিসনে গেছে অবশ্য। কিন্তু সে ভেবেছিল দু-তিনটে লেটার থাকবে। আরো কিছু আশাও কি ছিল না ?

মুখে অবশ্য এরূপ কাউকে বলেনি। কিন্তু মনে মনে তো ভেবে রেখেছিল। সে আশা পূর্ণ হয়নি। এই বয়সেই গোবিন্দ বুঝতে শিখেছে সব আশা পূরণ করা যায় না। না নিজের না বাপ মা

ভাই বোনেদের। সব সাধ মেটে না, সাধ্যে সবখানি কুলোয় না। নানা বাধা আছে। কোন কোন বাধা দেখা যায়, কিছু বা চোখের আড়ালে থাকে।

গরীবের ছেলে বলে আধপেটা খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছে বলে গোবিন্দ এই অল্প বয়সেই সংসারের অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। আর বয়স নিতান্ত অল্পই বা কি। উনিশ পেরিয়ে বিশে পড়েছে। দাড়ি গোঁফ গজিয়ে গেছে। যে বয়সে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা কলেজ থেকে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকে সেই বয়সে সে সবে কলেজে ঢুকতে পেরেছে। তার পড়াশুনো আরম্ভ করতেই দেরি হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে এসে বাবা প্রথম কয়েক বছর শুধু পথে পথে ঘুরেছে। খাওয়া পরার চিন্তা ছাড়া তার আর কোন চিন্তা করবার ফুরসুৎ ছিল না। এখনো তো তাই। দিনরাত এখনো শুধু কী খাই আর কী খাব এই তাদের ভাবনা। অথচ চোখের ওপর কত অদলবদলই তো হল। এই পাড়ায় কত নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে। খানা খন্দ পানাপুকুর সব বন্ধ করে লোকে তার ওপর বড় বড় বাড়ি তুলেছে। যাতায়াতের পথে সবই তো দেখতে পায় গোবিন্দ, সবই চোখে পড়ে। শুধু তাদের টিনের বাড়িটারই কোন পরিবর্তন হল না। চৌদ্দ বছর ধরে যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। তারা একখানা মাত্র ঘরে থাকে। কিন্তু এ বাড়িতে ঘর অনেকগুলি। একতলায় দোতলায় মিলিয়ে দশটি পরিবারের বাস। কারো দখলে একখানা ঘর কারো বা দুখানা। কিন্তু বাড়িওয়ালা ছাড়া কেউ স্থায়ী বাসিন্দা নয়। সব গোবিন্দদেরই মতই ভাড়াটে। না সবাই গোবিন্দদের মত নয়। তারা আসে আবার চলেও যায়। এই টিনের খুপরি ছেড়ে দোতলা তেতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠে। কিন্তু গোবিন্দরা আর উঠতে পারল না। জ্ঞান হওয়া অবধি সেই যে দিন আনা দিন খাওয়ার পালা দেখছে গোবিন্দ সে পালার আর শেষ হয় না।

বাড়ির সামনের জলের কলটার কাছে দারুণ ভিড়। বালতি পড়েছে কলসী পড়েছে। বউ-ঝিরা রান্নার জন্যে খাবার জন্যে জল তুলছে। ওই ভিড় ঠেলে গোবিন্দ এখন আর এগোতে পারে না। আগে পারত। এখন এ পাড়ার মেয়ে বউরা তাকে দেখে লজ্জা পায়। সরাসরি তাকায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। ওদের ওই দেখার ভঙ্গি দেখতে গোবিন্দর বেশ লাগে। মায়ের রঙ কালো, কিন্তু গোবিন্দ তার রঙ পায়নি বাপের রঙ পেয়েছে। মায়ের মনে যখন একটু সুখ থাকে মা তাকে আদর করে বলে, 'আমার গোরাচাঁদ আমার গৌর গোপাল।'

শুধু মা নয় আরো একজন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। সে অমন খোলাখুলিভাবে গোবিন্দকে আদর করে ডাকতে পারে না। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি দেখে বোঝা যায়। সে গোবিন্দর সঙ্গে পড়ে। কিন্তু এক ক্লাসে পড়লে কি হবে আর সব দিক থেকেই সে উঁচু ক্লাসের। জাতে উঁচু মানে উঁচু। সে পাকা বাড়িতে থাকে। এক সময় অবশ্য গোবিন্দদের এই টিনের বাড়িতেই বাস করে গেছে। কিন্তু সে কথা কেই বা মনে করে রেখেছে। বাড়ি ছেড়ে গেলেও পাড়া ছেড়ে যায়নি ওরা। একই পাড়ায় আছে। একই বাসে করে গোবিন্দ তার সঙ্গে কলেজে যায়। একই ক্লাসের একই প্রফেসরদের কাছে পড়ে। তবু উকিলের মেয়ের সঙ্গে ঠোঙাওয়ালার ছেলের যে অনেক তফাৎ তা গোবিন্দ জানে। এই ব্যবধান কি কোনদিনই ঘুচবে? গোবিন্দর মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে জোর করে সব ঘুচিয়ে দেয়।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই সব হয় না। সেইটুকু বুঝবার মত বয়স আর অভিজ্ঞতা তার হয়েছে।

বাইরের কলে মুখটুকু ধোওয়া হল না। মেয়েরা জল নিচ্ছে তো নিচ্ছেই।

গোবিন্দ ফিরে এসে বোনকে বলল, 'লক্ষ্মী আমাকে এক ঘটি জল দে তো। মুখ ধোব।'

বছর ষোল বয়স হয়েছে লক্ষ্মীর। বাড়ন্ত গড়ন। বেশির ভাগ সময়ই ফ্রক পরে থাকে। কিন্তু ওর শাড়ি পরার ভারি সখ। মার একখানা পুরোন শাড়ি পরে এরই মধ্যে কাজে বসে গেছে। তোলা উনুনে বড় একটা কড়াতে আঠা জ্বাল হচ্ছে। আর বড় একখানা কাঁচি নিয়ে লক্ষ্মী আর সেবা বসে বসে ভাঁজ করা কাগজ কাটছে। আড়াই ছটাকি ঠোঙা, পাঁচ ছটাকি ঠোঙা, আড়াই পোয়া ঠোঙা সোয়া সেরী আড়াই সেরী ছোট বড় সব মাপের ঠোঙাই ওরা কাটতে পারে, জুড়তে পারে। গোবিন্দও এসব কাজ জানে। না জানার কী আছে। কিন্তু জেনেও সে আজকাল আর ওদের সঙ্গে ঠোঙা তৈরি করতে বসে না। সে শুধু পড়ে, সে শুধু সকলের হয়ে ভবিষ্যৎ গড়ে। গোটা পরিবার

তাকে এই আত্মগঠনের সুযোগ দিয়েছে। সে যেন এই পরিবারের মধ্যে থেকেও আলাদা। আজকালের পেটের দায় মিটাবার কাজ তার না, সে পরশুর সম্পদ গড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

লক্ষ্মী হাতের কাজ ফেলে রেখে তাকে জল এগিয়ে দিল। বাড়ির আর সবাই কয়লার গুড়ো দিয়ে দাঁত মাজে। কিন্তু গোবিন্দ নিজের জন্য সস্তা টুথ পাউডারের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পাড়ার যে স্টেশনারি দোকানে তারা ঠোঙা জোগায় সেই দোকানের মালিক কানাই বিনা পয়সায় তাকে এই টুথ পাউডার দিত। এখন গোবিন্দ কোন কোন মাসে কিনেও নেয়।

মুখ হাত ধুয়ে গোবিন্দ ঘরের কোণে পড়তে বসবে সরলা তাকে বাটিতে করে অল্প দুটি মুড়ি এনে দিল। গোবিন্দ বলল, 'ওরা খেয়েছে ?'

সরলা একটু হেসে বলল, 'সবাইর তো হবে বাবা। তুই খা। তোর মাথার কাজ। তোরই খাওয়া-দাওয়ার দরকার।'

গোবিন্দ নিজের মনেই হাসল। শুধু মুড়ি খেয়ে কি আর মাথার কাজ চলে ? যারা আজকাল পড়াশুনোয় ভালো হয় পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে তারা প্রায় সবাই বড়লোকের ছেলে। তারা ডিম খায় দুধ খায় বই কেনে নোট বই কেনে প্রাইভেট টিউটর রাখে। আর গোবিন্দর কী আছে ? বই আনে চেয়ে চিন্তে ধার করে। পড়তে বসবার একটু জায়গা পর্যন্ত নেই। এই একখানা ঘরের মধ্যেই তো সব। মাঝে মাঝে বাইরের লোকজন আসে। বাবা তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলে। ভারি তো বাণিজ্য। তবু বাবার কথা যেন আর শেষ হয় না !

গোবিন্দ বলল, 'ওরা কিছু খাবে না ?'

লক্ষ্মী সবাইর প্রতিনিধি হয়ে বলল, 'তুমি খাও দাদা। আর একটু বাদেই তো ভাত হবে। আমরা একেবারে ভাতই খাব।'

খাওয়া শেষ করে As you like it খানা কেবল খুলেছে গোবিন্দ, গুরুদাস বলল, 'পড়তে বসার আগে আজ কিছু কাগজ নিয়ে আয় গোবিন্দ।'

গোবিন্দ বলল, 'কাগজ ?'

গুরুদাস বলল, 'হ্যাঁ কাগজ। তুই যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লি। কাগজ চিনিস না ?'

গোবিন্দ বলল, 'চিনব না কেন ? কিন্তু আমার পড়া আছে, কলেজ আছে।'

গুরুদাস বলল, 'আরে বাবা সবই তো আছে বুঝি। পেটটাওতো আছে সঙ্গে সঙ্গে। আমার শরীরটা ভালো না। জ্বর জ্বর লাগছে। তবু তো না বেরিয়ে উপায় নেই। এখন ছুটে যাব সেই ঘুঘুডাঙার হোসিয়ারীতে। সেখান থেকে কাগজ আনাব। কানাইর দোকানে কটা টাকা পাওনা আছে। আজ আর পাড়ার কাগজ কেনার আমার সময় হবে না। আজ তুই যা। নইলে হাতগুলি বসে থাকবে। কাজ হবে না।'

গোবিন্দ অবাক হয়ে বলল, 'আমি যাব !'

তার সঙ্গে তার ক্লাসে পড়ে এমন অনেক ছেলে আছে পাড়ায়। মেয়েরাও আছে। বাসে দেখা হয়। কলেজের কমন রুমে গল্প হয় সহপাঠীদের সঙ্গে। তাদের মনে গোবিন্দ এমন একটা ধারণা জন্মিয়ে দেয় যেন সেও তাদের একজন। সে ধারণাটা গোবিন্দর নিজের মনেও এখন বদ্ধমূল হয়েছে। বাবার জীবিকা যে কী তাতো আর গোবিন্দর গায়ে লেখা নেই। তারা কোথায় থাকে কী খায় কে-ই বা তার খোঁজ খবর নিতে যায়। কলেজে অবশ্য হাফ ফ্রীশিপ করে নিয়েছে গোবিন্দ। কিন্তু এমন ফ্রীশিপ হাফ ফ্রীশিপ অনেকেরই আছে। যাদের নেই তাদেরও অনেকের মাইনে বাকি পড়ে। গোবিন্দর কিছু জানতে বাকি নেই। নিজের হাতে সাবানে কাচা ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি পরে গোবিন্দ কলেজে যায়। আজকাল ছেলেদের মধ্যে ধুতির চল প্রায় উঠেই গেছে। বেশির ভাগ ছেলেই ট্রাউজার পরে। গোবিন্দরও মনে মনে ইচ্ছা একটা প্যান্ট কেনে। কিন্তু বড় খরচ। একটা পাজামা জোটে না, তার আবার প্যান্ট। কিন্তু ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও অনেক প্রবীণ প্রফেসর তাকে দেখে খুশি হন। কেউ কেউ হেসে বলেন, 'তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে গোবিন্দ।' 'বেশ দেখাচ্ছে', এ কথা আরো একজন বলেছিল। 'তুমি যা পরো তাতেই তোমাকে সুন্দর দেখায়', সে সাহস করে বলেছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে নয় আরো তিনটি ছেলের সামনে। সেই সুখ্যাতি সলিলের সহ্য হয়নি।

সে দামী জামা প্যান্ট পরে আসে, পোশাক-আশাক সম্বন্ধে সে খুব সচেতন। সলিল হেসে বলেছিল, 'গোবিন্দ হাফ প্যান্ট কি গামছা পরে এলেও শ্যামলী বলবে এমনটি আর হয় না।'

তারপর সবাই মিলে রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিল। গোবিন্দ যেতে চায়নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত না গিয়েও পারেনি।

ছেলের কাছ থেকে সদুত্তর না পেয়ে গুরুদাস চটে উঠল, 'হ্যাঁ তুই-ই যাবি। তুই কোন লাটের বাট এসেছিস।'

আঘাত খেয়ে গোবিন্দও রুখে দাঁড়াল। 'বাবা কথাবার্তাগুলি একটু ভদ্রলোকের মত বোলো। কী যা তা বলছ।'

গুরুদাসও চটে উঠল। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। ফর্সা রং। কোঁচার খুট সারা গায়ে জড়ানো। অমনিতে শান্ত মেজাজের মানুষ। সহজে রাগে না। কিন্তু রাগলে বিষম কাণ্ড করে বসে। রেগে ছেলেকে তেড়ে গেল গুরুদাস,' পাঁঠা কোথাকার। দু'পাতা ইংরেজি পড়ে তুই আমাকে ভদ্রতা শেখাতে এসেছিস। আমরা দিন রাত খেটে মরছি। এই সাত বছরের ছেলেটা পর্যন্ত খাটে। তবে দুটো দানাপানি জোটে। আর তুই! লজ্জা নেই বেহায়া হারামজাদা তুই পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাস। সংসারের কুটো গাছটিও নাড়িসনে। বাবুগিরির ওপর বাবুগিরি ফলাস।'

সরলা এসে বাধা দিল। পিছনে পিছনে লক্ষ্মী আর সেবাও এসে দাঁড়াল।

সরলা স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'কী জ্বালা। কাজ নেই কর্ম নেই সকাল বেলায় উঠে ঠাকুর দেবতার নাম নেই, এ কী পাগলের কাণ্ড তোমাদের।'

গুরুদাস বলল, 'পাগল যদি হই তোমার এই ছেলের জন্যেই হব। ওর চালচলন দেখলে আমার গা রি-রি করে জ্বলে, আমি বুঝি বুঝিনে কিছু? এতই গোমুখ্যু আমি। ও কি সব সময় পড়ার বই পড়ে ভেবেছ? ও রাত জেগে জেগে নভেল পড়ে। আমার এত কষ্টের পয়সায় কেনা কেরোসিন তেল ও নভেল নাটক পড়ে পোড়ায়। এ ছেলের উচ্ছন্নে যেতে আর কি বাকি আছে বলো।'

গোবিন্দ একটি কথারও জবাব দিল না। বাবার একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল।

খানিক বাদে গুরুদাস তার আধময়লা জামাটা পরে বেরিয়ে গেল। দরকারি কাজ আছে। ছেলের সঙ্গে বেশিক্ষণ ঝগড়া করবার সময় কোথায়।

গোবিন্দ মাদুরের ওপর গুম হয়ে বসে রইল। সবাই কাজে হাত দিয়েছে। সরলা রান্নাবান্নার জোগাড় করছে। আঠার কড়া নামিয়ে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়েছে উনুনে। লক্ষ্মী আর সেবা কাগজ কাটছে কাগজ জুড়ছে। এক একটি করে ঠোঙা তৈরি হচ্ছে।

সেবা হঠাৎ বলল, 'দেখেছিস দিদি? সিনেমার ছবি দেখেছিস?'

খবরের কাগজে সিনেমার বিজ্ঞাপন বেরোয়, অভিনেতা অভিনেত্রীদের ছবি বেরোয়। এরা ঠোঙা তৈরি করবার আগে সেই সব ছবি দেখে। ওদের স্কুলে ভর্তি করতে পারেনি বাবা। ওরা ঘরে বসেই যেটুকু যা লেখাপড়া শিখেছে তাতে সিনেমার বিজ্ঞাপন পড়তে পারে। কোন হাউসে কোন ছবি চলছে কোন ছবিতে কারা কারা প্লে করেছে তা ওদের কণ্ঠস্থ। কিন্তু জীবনেও কেউ ওরা কখনো সিনেমা দেখেনি। সব ওরা ওই ঠোঙার কাগজেই দেখে। মাকে দেখায়। বাবাও সময় সুযোগ থাকলে মেজাজ থাকলে ওই সব পুরোন কাগজ থেকে কিছু কিছু পড়ে। সিনেমার দিকে বাবার ঝোঁক নেই। পুরোন খবর পড়ে, ধর্মমূলক কোন প্রবন্ধ থাকলে বসে বসে পড়ে। আর মাকে পড়ে পড়ে শোনায়। মা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে।

গোবিন্দ কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে এর মধ্যে একদিন সিনেমা দেখে এসেছে। বন্ধুদের এড়াতে পারেনি। তাদের যদি বা এড়ানো যায় নিজের লোভ আর কৌতূহল এড়ানো কি সোজা? বাড়িতে অবশ্য সবাইর কাছেই কথাটা গোপন রেখেছে। সব কথা কি সবাইর কাছে বলা যায়? না কি বললে কোন মজা থাকে? তবু বোনদের দিকে তাকিয়ে নিজের স্বার্থপরতায় মাঝে মাঝে নিজেই লজ্জিত হয় গোবিন্দ। ওদের ফাঁকি দিয়েছে বলে মন খারাপ হয়ে যায়। ওদের সাধ আহ্লাদ তো কিছুই মিটল না।

আঠা দিয়ে কাগজ জুড়ে জুড়ে ঠোঙা তৈরি করছে সবাই। এখন সব ছোট ছোট ঠোঙা তৈরি করছে। এগুলিকে বলে হাজারি ঠোঙা। গোবিন্দ সব জানে। এক সময় নিজেও তো করেছে। বাইশটা ঠোঙায় এক দিস্তা হবে। চব্বিশ দিস্তা হলে তবে এক টাকার মাল। সোজা খাটুনি ?

দ্রুত হাত চালাতে চালাতে লক্ষ্মী এক সময় হেসে বলল, 'রাগ বুঝি পড়েনি দাদা ? চুপচাপ বসে আছ কেন ? পড়তে বোসো। পরীক্ষা আসছে না সামনে ?'

গোবিন্দ বলল, 'আসছে তো আসছে। তাতে তোর কি ? ভারি গার্জিয়ান এসেছিস আমার।'

লক্ষ্মী হেসে বলল, 'আমি কেন গার্জিয়ান হতে যাব। আসল গার্জিয়ান তো রাগের চোটে নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এখন তোমার পোয়া বারো। শোন রাগ কোরো না। লক্ষ্মী ছেলেটির মত এখন পড়তে বোসো। তোমাকে কাগজ কিনতে যেতে হবে না। সেবা আর নিতাই দু'জনে গিয়ে নিয়ে আসবে। শ্যামলীদি কাল এসেছিল। বলে গেছে তাদের ঘরে নাকি অনেক পুরোন কাগজ জমেছে। আমরা যদি তাড়াতাড়ি না নিই অন্য কেউ এসে নিয়ে যাবে।'

আর কোন কথা যেন কানে গেল না গোবিন্দর। গোবিন্দ বলল, 'শ্যামলী এসেছিল ? কেন ?'

লক্ষ্মী মুখ টিপে হেসে বলল, 'কেন এসেছিল কী করে বলব ? কেন এসেছিল রে সেবা ?' গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে সেবাও একটু হাসল। চৌদ্দ বছরেব ফ্রক পরা মেয়ে। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ পেকে গেছে।

সেবা বলল, 'তার নাকি একখানা বই আছে তোমার কাছে ? সেই বইয়ের খোঁজে এসেছিল। আসলে বই নিতে আসেনি। বই তো সে রেখেই গেছে। এসেছিল বেড়াতে। দেখতে, আমরা কোথায় আছি, কী ভাবে আছি। কী খাই কী পরি।'

গোবিন্দ বলল, 'সে একাই এসেছিল ?'

লক্ষ্মী বলল, 'না না একা আসবে কেন। আর একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। আমি চিনি তাকে। দত্তবাবুদের ভাড়াটে। শিখা। তোমাদের কলেজেই তো পড়ে। শ্যামলীদির বন্ধু।'

গোবিন্দ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, 'কেন তাদের ঢুকতে দিলি ? কেন আমাদের ঘরে ঢুকতে দিলি তাদের ?'

লক্ষ্মী বলল, 'ও মা !' তারা আসতে চাইলে আমরা আসতে দেব না ? তারা ঘুরে ঘুরে সব দেখল। তোমার বইপত্তর কোথায় থাকে, তুমি কোথায় বসে পড়ো তাও দেখল। তুমি নিজের হাতে প্যাকিং বাক্স দিয়ে যে র‍্যাকটা তৈরি করেছ তা দেখে ওদের কি হাসি।'

গোবিন্দ বলল, 'আমাদের যে কিছু নেই তাইতো দেখালি তাদের। আমরা গুষ্টিসুদ্ধু ঠোঙা বানাই ঠোঙা বেচে খাই সবই জেনে গেল তারা। এখন কলেজে গিয়ে সবাইকে বলবে।'

বঁটি পেতে কয়েকটা আলু মুলো কুটতে বসেছিল সরলা। এতক্ষণ সে কোন কথা বলেনি। এবার মুখ তুলে ছেলের দিকে তাকাল, 'উনি যে তোকে রাগ করেন সাধে করেন না। ঠোঙা তৈরি করে খাই তো কী হয়েছে। আমরা চুরিও করিনে, ডাকাতিও করিনে, পেটের দায়ে ভিক্ষাও করিনে। আমরা কাজ করে খাই।'

গোবিন্দ চুপ করে রইল।

লক্ষ্মী বলল, 'তারা তো শুধু আমাদের ঘরেই আসেনি দাদা। শ্যামলীদিরা আগে তো এই বাড়িরই দোতালায় থাকত। সেই ঘরও দেখতে এসেছিল। তাদের সেই ঘরে কারা এখন থাকে দেখে-টেখে গেল।'

গোবিন্দ এসব কথার কোন জবাব দিল না। যেমন চুপ করে বসে ছিল তেমনি বসেই রইল।

আর সবাই তাদের কাজে মন দিল। যন্ত্রের মত তাদের হাত চলতে লাগল। ঠোঙার পর ঠোঙা তৈরি হচ্ছে। সেবা সেগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল গোবিন্দ। লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস্তাটা কোথায় ? আর পালা পাথর ?'

লক্ষ্মী বলল, 'ওইতো কোণের দিকে রয়েছে। কিন্তু ও সব দিয়ে তুমি কী করবে ?'

গোবিন্দ সংক্ষেপে বলল, 'দরকার আছে।'

কাউকে কিছু না বলে গোবিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সরলা পিছন থেকে বলল, 'কাগজ কিনতে চললি বুঝি ? টাকা নিয়ে গেলিনে ?'

গোবিন্দ বলল, 'টাকা আছে আমার কাছে।'

'কোথায় পেলি টাকা ?'

গোবিন্দ জবাব দিল না। বই কেনার জন্য গোটা পাঁচেক টাকা দিয়েছিলেন রানী রোডের পিসেমশাই। পাঁচ টাকায় ক'খানা বই-ই বা হবে। আর তা কিনেই বা লাভ কি।

থলির মধ্যে পালা পাথর ভরে গোবিন্দ এগিয়ে চলল। দু-তিন বছরের মধ্যে সে আর কাগজ কিনতে বেরোয়নি। বাবা নিজেই তাকে এসব কাজ করতে দেয়নি। বলেছে, 'তোর এ সব দেখতে হবে না। তোর পড়ার ক্ষতি হবে।' কিন্তু ইদানীং বাবার মতিগতি অন্য রকম হয়েছে। তার ধারণা গোবিন্দরই মতিগতির ঠিক নেই। সে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছে। সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শিখেছে। এ কথাও বোধ হয় বাবা ভাবে। সে মেলামেশার ধরনটা যে কি রকম তা বাবার ধারণা নেই।

খানিকটা পুবে এই পাড়ার মধ্যেই শ্যামলীদের বাড়ি। আর কোন দিকে না তাকিয়ে অন্য কোন বাড়িতে না গিয়ে গোবিন্দ সোজা শ্যামলীদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

সদ্য চুনকাম করা হয়েছে বাড়িতে। সাদা ধবধবে করছে দেয়াল। দু'পাশে দুটি সবুজ সুপারি গাছ যেন তোরণ তৈরি করে রেখেছে।

দোতলা বাড়ি। একতলায় থাকে শ্যামলীরা। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল গোবিন্দ। ভেবেছিল আর কেউ আসবে। ওর বাবা কি মা, কি বাড়ির ঝি। সবাইকেই চেনে গোবিন্দ। শ্যামলীর কাছে বই ধার নিতে, কি পড়াশুনো নিয়ে আলোচনার জন্যে আগেও কতবার এসেছে। ওর বাবা মা খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছেন তার সঙ্গে। গরীবের ছেলে বলে অবজ্ঞা করেননি, ভালো ছেলে বলে সম্মান করেছেন। সোফায় বসতে দিয়েছেন। পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। শ্যামলী ঠিক তার পাশে বসেনি, কিন্তু সামনের সোফাটায় বসে সহজ ভাবেই তার সঙ্গে কথা বলেছে। পড়াশুনো নিয়ে আলোচনা করেছে।

কিন্তু আজ গোবিন্দর ভূমিকা অন্যরকম। আজ আর বই খাতা হাতে আসেনি গোবিন্দ। এসেছে থলি হাতে। পালা পাথর হাতে। এসেছে ওজন করে কাগজ কিনতে।

একটু বাদে দোর খুলে শ্যামলীই এসে সামনে দাঁড়াল। সতের আঠের বছরের তন্বী মেয়ে। সুশ্রী সুঠাম গড়ন। রাত্রে যাকে স্বপ্নে দেখেছিল গোবিন্দ দিনের আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। তবু সে স্বপ্নেরই মত।

শ্যামলী অবাক হয়ে বলল, 'একি, তুমি ?'

গোবিন্দ একটু হাসল, 'কাগজ কিনতে এসেছি। তুমিই তো আসতে বলেছিলে।'

শ্যামলী বলল, 'কিন্তু তোমাকে তো আসতে বলিনি।'

গোবিন্দ বলল, 'আর কে আসবে। আমিই এলাম। কই কি কাগজ আছে বের করো। আমাকে আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

ঘরে ঢুকে গোবিন্দ মেঝের ওপর উটকো হয়ে বসল।

শ্যামলী অবাক হয়ে বলল, 'ওকি, ওখানে কেন। উঠে বোসো।'

গোবিন্দ বলল, 'না ওখানে বসে কাগজ ওজন করা যাবে না। এই বেশ আছি। কাকিমা কাকাবাবু সব কোথায় ?'

শ্যামলী একটু হেসে বলল, 'কালীঘাট গেছেন। কিসের যেন মানত পুজো আছে।'

গোবিন্দ বলল, 'তুমি গেলে না ?'

'না। আমার শরীর ভালো না।'

'কেন কী হয়েছে তোমার।'

শ্যামলী চুপ করে রইল।

গোবিন্দ বলল, 'তা হলে তুমিই তো বিক্রি করবে। এনে দাও কাগজগুলি। কাজ মিটিয়ে চলে যাই। অনেক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।'

গলার স্বরে রূঢ়তা ফুটে উঠল গোবিন্দর। তুচ্ছ কাজের লজ্জা আর অসম্মান সব যেন সে গলার ঝাঁজে ঢেলে দিতে চায়।

শ্যামলী একটুকাল গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, 'বোসো। এনে দিচ্ছি কাগজ।'

তক্তপোশের তলায় পাঁজা করা রয়েছে পুরোন খবরের কাগজ সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকার স্তূপ।

শ্যামলী টেনে টেনে সব বের করল।

গোবিন্দ নিঃশব্দে ওজন করে যেতে লাগল বাটখারায়।

তারপর বলল, 'পাঁচ কিলো হয়েছে। ষাট নয়া পয়সা করে কিলো।'

শ্যামলী একটু হেসে বলল, 'কিছু যদি বেশি চাই। ধরো পয়ষট্টি নয়া পয়সা।'

গোবিন্দ বলল, 'না। ওই ষাটই বাজার দর।'

'আর মাসিক পত্রিকাগুলি নেবে না ?'

'নেব। কিন্তু ওর দাম কম। পঞ্চাশ নয়া পয়সা কিলো।'

শ্যামলী বলল, 'বেশ তাই দিয়ো।'

কাগজগুলি সব থলিতে ভরল গোবিন্দ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোটখানা বার করে শ্যামলীর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

শ্যামলী একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'টাকা দিতে হবে না। ও তুমি অমনিই নিয়ে যাও। আমি বাবাকে বলে দেব এবারকার কাগজগুলি তোমাকে দিয়েছি। তিনি কিছু বলবেন না।'

গোবিন্দ শ্যামলীর দিকে তাকাল, 'দয়া করতে চাইছ!'

শ্যামলী ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'আজ তোমার কী হয়েছে বলতো।'

গোবিন্দ বলল, 'কী আবার হবে। এ আমাদের ব্যবসার জিনিস। ঠোঙার কাগজের জন্যে প্রায়ই তো আসব। ক'দিন দয়া করবে তুমি।'

শ্যামলী বলল, 'আচ্ছা দিয়ে যাও টাকা।'

তারপর হাত বাড়িয়ে নোটখানা নিল। মুখখানাও ফিরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

কাগজের থলিটা নিয়ে গোবিন্দ পথে নেমে এল। বেশ করেছে। শ্যামলীকে মুখের ওপর বলে দিতে পেরেছে সে তার দয়া চায় না। কিন্তু ওইটুকুই যেন যথেষ্ট নয়। আরো কিছু বলতে পারলে ভালো হত, আরো শক্ত রূঢ় কোন কথা যাতে শ্যামলীর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠত। এমন কোন কথা কেন মুখে এল না গোবিন্দর যাতে শ্যামলীর কান্না পায়, যাতে ওর চোখ ফেটে জল আসে। পৃথিবীর যত জনের ওপর যত আক্রোশ জমে উঠেছে গোবিন্দর মনে শুধু একজনকে আঘাত করে একজনকে কাঁদাতে পারলে যেন তার সব শোধ উঠে আসত।

থলি এখনো ভরেনি। আজ পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে কাগজ কিনবার জন্যে ঘুরবে গোবিন্দ। দেখুক ঠোঙাওয়ালাকে সবাই দেখুক। ক্লাসের ছেলেরা দেখুক মেয়েরা দেখুক। কলেজে গিয়ে সব গল্প করুক। সত্যিই তো নিজেদের অবস্থার কথা লুকোতে যাবে কেন গোবিন্দ। লুকোতে সবাই তাকে দেবে কেন। এতদিন সে ভুল করেছিল। আর করবে না। এবার সবাইর কাছে নিজের পেশাকে সে প্রকাশ করবে।

খানিকটা রাগে খানিকটা আক্রোশে থলিটা এবার কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল গোবিন্দ। হঠাৎ কানে গেল পিছন থেকে কে যেন চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে, 'ওগো শুনছ, ও কাগজওয়ালা শোন শোন।'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল গোবিন্দ। শ্যামলীদের বাড়ির ঝি আসছে তার পিছনে পিছনে। বেশ হাঁটতে পারে বুড়ি। এরই মধ্যে এসে তাকে ধরে ফেলেছে।

গোবিন্দ থেমে দাঁড়াল। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার। অমন করে ডাকছ, ডাকাত পড়েছে

না কি।'

বুড়ি বলল, 'কি জানি কি পড়েছে, দিদিমণি বলল, তুমি ছুটে যাও বুড়িদি। আমি তাই ছুটে এনু। তুমি নাকি হিসেবে ভুল করেছ। কম দিয়েছ। দিদিমণি তাই ডাকছে তোমাকে।'

গোবিন্দ তেড়ে উঠল, 'কম দিয়েছি। কক্ষনো না। আমি কাউকে ঠকাইনে বুড়ি। তোমার দিদিমণিকে বলো গিয়ে।'

পরনে ময়লা একখানা কাপড়। ছোটখাটো চেহারা। দাঁতগুলি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বয়সের হিসাব বুড়ি এখন কুড়িতে করে। বলে, 'চার কুড়ি এখনো হয়নি গো। তবে বাকিও বেশি নেই।'

বুড়ি গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসিতে বহু লব্ধ অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা। 'না ঠকায় না। এই দুনিয়ার সবাই সবাইকে ঠকায়। ফাঁক পেলে কে ছেড়ে দেয় বল দেখি বাপু। তোমাদের কাগজওয়ালাদের আমার চিনতে বাকি নেই। মাপের সময় সবাই ওজনে চুরি করে। আমরা তাই দোকান থেকে আগে মাপিয়ে এনে রেখে দিই। কাগজওয়ালারা এক কিলো দেড় কিলো কাগজ চুরি করবেই করবে।'

গোবিন্দ বলল, 'তোমার দিদিমণিও কি তাই বলেছে। আমি ওজনে চুরি করেছি। তার চোখের ওপরই তো ওজন করে নিলাম। তবু বিশ্বাস হল না।'

বুড়ি বলল, 'আরে বাবা সবাই তো চোখের সামনেই ওজন করে। সব দাড়িপাল্লা ধরবার কায়দা। তোমাদের মত ভেলকি বাজি কি আমরা জানি।'

গোবিন্দ এখন প্রায় গোঁয়ার গোবিন্দ। বলল, 'আচ্ছা চল।'

মনে মনে ভাবল, দরকার নেই আমার কাগজ, সব আমি ফেরত দিয়ে আসব।'

শ্যামলী দোরের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। বুড়ি গোবিন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'ধরে নিয়ে এসেছি দিদিমণি। তুমি ভালো করে একবার মাপিয়ে দেখ দেখি। কাগজ তো অত কম হবার কথা নয়।'

শ্যামলী বলল, 'দেখছি বুড়িদি। তুমি আমার জন্যে এক গ্লাস জল নিয়ে এসো তো।'

বুড়ি বলল, 'ওমা শীতের দিনে এত তেষ্টা।' বুড়ি চলে গেলে থলিটা ফের কাঁধ থেকে নামাল গোবিন্দ। শ্যামলীর দিকে চেয়ে বলল, 'কি মাপে নাকি তোমাকে আমি ঠকিয়েছি?'

শ্যামলী একটু হেসে বলল, 'কে বলল সে কথা।'

'তোমাদের ওই বুড়ি ঝি। আমি নাকি ওজনে চুরি করেছি পয়সা কম দিয়েছি।'

শ্যামলী বলল, 'ও এই রকমই বলে। তুমি একখানা কাগজ কম নিয়েছ। সেখানা দেওয়ার জন্যেই তোমাকে ফের ডাকলাম। এই নাও।'

পাতলা একখানা মাসিক পত্রিকা শ্যামলী গোবিন্দর দিকে এগিয়ে দিল।

গোবিন্দ বলল, 'কী এখানা।'

শ্যামলী বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ কাগজ। এত পাতলা কোন ওজনই নেই। আমার একটি কবিতা ওতে আছে। আমার এই প্রথম কবিতা ছাপা হল।'

গোবিন্দ শ্যামলীর দিকে তাকাল। চোখে জল আসতে চাইছে মুখের হাসিতে সেই জল লুকোবার চেষ্টা করল। হেসে বলল, 'দাও। এর কিন্তু দাম দিতে পারব না। এ কাগজে কোন ঠোঙা হবে না।'

জয়ন্তী

গাড়ি ঠিক দুয়ারে প্রস্তুত ছিল না। তবে আমরা প্রস্তুত হয়ে বসেছিলাম। সাঁত্রাগাছি জাগৃতি ক্লাবের পক্ষ থেকে যে ছেলেটি সভাপতিকে নিতে এসেছিল সে অনেকক্ষণ ট্যাকসি ডাকতে চলে গেছে। তারপর আর তার দেখা নেই।

আমার বন্ধু ভুবনবাবু এবার অধীর হয়ে উঠবার ভঙ্গি করে বললেন, "না মশাই, আপনার ট্যাকসির ভরসায় থাকলে রাত আটটার আগে আর উঠতে পারব না। একে তো বিয়ের তারিখ আছে, বউভাত, পৈতে, অন্নপ্রাশন আছে, তারপর আপনাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী। এতগুলি ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল একসঙ্গে। সুতরাং এই সন্ধ্যায় ট্যাকসির আশা নিতান্তই দুরাশা। যাই ঠেসাঠেসি করে বাসেই উঠে পড়ি। সামর্থ্যে যদি না কুলোয় তা হলে একটি রিকসাওয়ালার কাঁধে চড়ে বসব। উপায় কি! কিন্তু মাঝে মাঝে মশাই বড় লজ্জা করে। এই বিরাট বপু নিয়ে—"

ভুবনমোহনের চেহারাখানা বিশালই। দৈর্ঘ ছ' ফুটের কাছাকাছি। প্রস্থও আনুপাতিক হার বজায় রেখেছে। তবু ভদ্রলোককে ঠিক মোটা বলে মনে হয় না। বেশ সুগঠিত শক্তসমর্থ শরীর। পানে ভোজনে ভুবন ধরের মিতাচারের খ্যাতি নেই। তবু উত্তর-পঞ্চাশেও এমন মজবুত দেহ কী করে রেখেছেন সে এক রহস্য।

তাঁর কথায় হেসে বললাম, "লজ্জা করে?"

ভুবনবাবু একটু চটে উঠলেন, "আপনারা কি ভাবেন বলুন তো? ঘৃণা, লজ্জা, ভয় আপনাদের সাহিত্যিকদেরই একচেটিয়া? আমরা ইনসিওরেন্সের দালাল বলে সব বিসর্জন দিয়ে বসে আছি? আপনারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষ। সাদা জামা ছাড়া পরেন না, সাদা জল ছাড়া খান না। আর আমাদের না হয় সেই সঙ্গে লালও চলে। তাই বলে আমরা এতই জল-অচল যে মলে দিলেও কান আমাদের লাল হয় না, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে মাথায় রক্ত ওঠে না, চোখ দুটো জবাফুল হয় না?"

বলবার আনন্দে ভুবনবাবু বলে যেতে লাগলেন। ওঁকে একবার খুঁচিয়ে দিতে পারলেই হল। বাগ্‌ধারায় তিনি শ্রোতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন। ফাঁকে একটু টুঁ শব্দ করবার সময় পর্যন্ত দেবেন না।

বৈঠকী বক্তৃতায় ভুবনবাবু খুব ওস্তাদ। কিন্তু বহু সাধ্য-সাধনা করেও ওঁকে কোন সভায় নিয়ে যেতে পারিনি।

আজও বলেছিলাম, "চলুন না। এক সঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

ভুবনবাবু হাতজোড় করে বলেছেন, "না মশাই, ও-সবের মধ্যে আমি নেই। আপনার সঙ্গে যাব, তারপর সবাই মিলে ঠেলেঠুলে আমাকে ডায়াসে দাঁড় করিয়ে দেবে আর আমার মুখ থেকে তোতাপাখির মত বেরোতে শুরু করবে, 'রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় মহাকবি ছিলেন, আপনারা তা জানেন না। তিনি শুধু বাংলাদেশের কবি নন, শুধু ভারতবর্ষের কবি নন, তিনি শুধু বিশ্বজগতের কবি নন, তিনি সমগ্র সৌরজগতের কবি।"

হেসে বললাম, "শক্তিশেল যে কাদের দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়েছেন তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ও-সব বলা ছাড়া আমাদের উপায় কি বলুন। ডায়াসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই দেখতে পাই একদল অতি চঞ্চল শিশু, তাদের পাশে কি পিছনে একদল মহিলা আমাদের বক্তৃতা শেষ হওয়ার জন্যে নিমেষ গুণছেন। তাঁদের পিছনে যে সব কর্মকর্তারা আছেন তাঁরা উদ্যোগ আয়োজন নিয়ে সঙ্গীত শিল্পীদের অভ্যর্থনা আর বিদায়ের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত। তাই আমরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মহাকবির মহাপ্রশস্তি মুখস্ত বলে নেমে পড়ি।"

ভুবনবাবু বললেন, "নামবার আগে মালাগাছটি কুড়িয়ে নিতে নিশ্চয় ভোলেন না। কী ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। তাই আপনাদের সবাইর জন্যে মরশুমী বরমাল্যের ব্যবস্থা করে গেছেন।"

কথা শেষ করে ভুবনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। একটু বাদে

বললেন, "খুব রাগ করেছেন তাই না ? ভাবছেন এমন মানুষকে আবার বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়ানো, সিগারেট খাওয়ানো, সব জলে গেল।"

বললাম, "তা ঠিক নয়। এসব সভায় আমি কী জন্যে যাই তা আমি জানি। আমি শুনতেও যাইনে, শোনাতেও যাইনে। আমি যাই দেখতে।"

ভুবনবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "দেখতে ! কী দেখতে বলুন তো ?"

বললাম, "বলে কি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব ? আমি এক একটি পল্লীর উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখতে যাই। ক্ষণিকের লৌকিক উৎসবের রূপ চেয়ে চেয়ে দেখি। পাড়ার স্থানীয় ছেলে আসরে এসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করবে, মা এসে অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। প্রতিযোগিতায় ছেলে পুরস্কার পাবে, পুরস্কার না পেলেও হাততালি পাবে, দুটি চোখ সেই আশায় উজ্জ্বল। হয়তো পাড়ার মেয়েটি এসেছে গান গাইবে বলে। তিনশো চৌষট্টি দিন সংসারের অভাব অনটন হাড়ভাঙা খাটুনি। তারই মধ্যে ছেঁড়া গানের খাতা আর ভাঙা হারমোনিয়ম নিয়ে মাঝে মাঝে বসে। ক্লাবের জয়ন্তী উৎসবে মঞ্চে উঠবার সেও চান্স পেয়েছে। এই তার জগৎসভা।"

ভুবনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আপনি মশাই নিতান্ত সেন্টিমেন্টাল। আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।"

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। ভুবনবাবু আর একটি সিগারেট শেষ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "না মশাই, আর বসে থেকে লাভ নেই। আপনার সেই জাগৃতি ক্লাবের পাণ্ডা বোধ হয় ট্যাকসি না পেয়ে স্বস্থানে ফিরে গিয়ে ঘোষণা শুরু করেছে, অনিবার্য কারণবশতঃ মাননীয় সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হতে পারলেন না। ভেবেছিলাম, আপনার গাড়িতে খালটুকু পার হব, তা আর হল না দেখছি।"

তিনি সত্যিই চলে যাচ্ছেন দেখে আমি অনুরোধ করে বললাম, "বসুন না আব দু-চার মিনিট। একটু বসুন।"

ভুবনবাবু বসলেন। তারপর একটু কাল চুপ করে থেকে হেসে বললেন, "আপনার সভা দেখতে যাওয়ার কথায় আমারও এক জয়ন্তী সভার কথা মনে পড়ল। সেই সভা দেখবাব সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।"

আমি উৎসুক চোখে ভুবনবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। বুঝতে পারলাম আর ওঁকে ধরে বেঁধে বসিয়ে রাখতে হবে না। নিজের কথার জালে উনি নিজেই কিছুক্ষণ বন্দী হয়ে থাকবেন।

ভুবনবাবু বলতে লাগলেন, "বছর দশেক আগের কথা। হ্যাঁ, দশ বছরই হল। বছরগুলি আজকাল কিভাবে দৌড়ে চলে যায় দেখুন। কোন চিহ্ন থাকে না মশাই, কোন চিহ্ন থাকে না। শুধু বয়স বাড়ে, টাক পড়ে, দাঁত নড়ে। বছর দৌড়ায়। দিনটা ছিল, আমরা যারা এটা ওটা খাই—তাদের পক্ষে আইডিয়াল দিন। বোশেখ মাস। কিন্তু কী করে যেন নিজেব স্বভাব চরিত্র ভুলে গিয়ে আষাঢ় মাসেব মধ্যে মাথা গুঁজেছে। আকাশে রোদ নেই, থমথমে মেঘ। সকাল থেকে টিপ টিপ বৃষ্টি। কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। কিন্তু একেবারে থামছে না। কসবা অঞ্চলে আমি এক পুবোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আটকে পড়েছিলাম। এই যেমন আপনার এখানে পড়েছি। বন্ধু খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালে-টাওয়ালে। খানিকক্ষণ দিবানিদ্রা দিলাম। খানিকক্ষণ দাবা খেললাম দু'জনে। পুরোন দিনের গল্প-টল্প হল। সে সব গল্প বলে আর কী হবে। আপনি তাব একটিও লিখতে পাববেন না। এত করেও শালার সময় কাটে না। আমি তখন বন্ধুকে বললাম, 'আর কেন ভাই, এবার মালপত্তর যা আছে বের করে ফেল। সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে, সময় বয়ে যাচ্ছে আর কেন।' বন্ধু জিভ কেটে বলল, 'না ভাই, ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি হে ! তোমার কবে থেকে এমন দুর্মতি হল ?'

বন্ধু বলল, 'সেদিন মায়ের পায়ে হাত দিয়ে—'

আমি বললাম, 'আরে ধুত্তোর মায়ের পা ! আমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমি একবেলা মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, ওবেলা পেগের পব পেগ চালিয়েছি। এখন স্ত্রীর পায়ে ধরি। দেহি

পদপল্লবমুদারম্ । ফল একই রকম হয় । ওসব অজুহাত ছাড়ো, ঘরে কিছু থাকলে বের করো । আর না হয় চল দু'জনে গলাগলি করে বেরিয়ে পড়ি ।'

বন্ধু কাতর হয়ে বলল, 'না ভাই, আর না । ডাক্তার বারণ করে গেছেন; আর যদি অত্যাচার করি লিভারটি একেবারে যাবে । এমনিতেই যা জখম হয়েছে তা সারে কি না সন্দেহ । সবাইর দেহ তো এক রকম নয় । তোমার মত শরীর যদি থাকত, কিছু পরোয়া করতাম না । কিন্তু আমার আরো ক'টা দিন বেঁচে যাওয়ার সাধ । ছেলেপুলেগুলো এখনো মানুষ হল না, মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে—'

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হল । সত্যি ওর শরীরের আর কিছু নেই । ভুগে-ভুগে একেবারে তালপাতার সেপাই হয়েছে'।

বললাম, 'তা হলে উঠি ভাই !'

বন্ধু বললে, 'রাগ কোরো না । তোমার জন্যে একটি জিনিস রেখে দিয়েছি । এই দেখো ।'

আমার বন্ধু আলমারি খুলে গোপন জায়গা থেকে একটি হুইস্কির বোতল বার করে দিল ।

দেখে আমার জিভে জল এসে গেল । উল্লাসে চোখেও জল আসে আসে । বললাম, 'এমন জিনিস তুমি এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলে !'

বন্ধু বলল, 'বহু কষ্টে মা আর বউয়ের চোখের আড়াল করে রেখেছি । ওদের কারো চোখে পড়লে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিত । কিন্তু এ জিনিস ভাই এখানে বসে খাওয়া চলবে না । তোমাকে খেতে দেখলে আমি হয়তো লোভ সামলাতে পারব না । আর আমার স্ত্রী দেখতে পেলে রায় বাঘিনীর মত ছুটে আসবে ।'

বললাম, 'ঠিক আছে । কুছ পরোয়া নেই । আমি বাইরে কোথাও গিয়েই তোমার দেওয়া এই পরম বস্তুর সদগতি করব ।'

বোতলটি পকেটে করে বেরিয়ে পড়লাম । তখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে । বন্ধু তার ছাতাটি ধার দিতে চেয়েছিল, আমি নিলাম না । ছাতা আর চরিত্র আমি বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনে । পথে কোথাও না কোথাও তা হারাবেই হারাবে ।

বন্ধুর কাছে বড়াই করে তো বেরোলাম, এখন যাই কোথায় । কাছাকাছি বার-টার কোথাও নেই । ট্রাম বাসের রাস্তা অনেক দূরে । একটা রিক্সাও কোথাও দেখছিনে । দুখানা পা-ই একমাত্র বাহন । এদিকে সময় বুঝে বৃষ্টির ধার বেড়েছে । ভিজিয়ে চুপসে দিল আর কি ! মাথা বাঁচাবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমি সরু একটি কানা গলির দিকে পা বাড়ালাম । পাড়ায় পাড়ায় এ ধরনের গলিঘুজি আমাদের চিনে রাখতে হয় । খানিক দূর এগিয়ে বাঁদিকের জীর্ণ পুরোন একটি বাড়ির দরজায় ছায়ার মত একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম । এগিয়ে গেলাম । এ সব দরদস্তুরের ভাষা আলাদা, সেগুলি আপনাকে শুনিয়ে আর কী হবে ? রফা হল ঘণ্টাখানেক বসব । বোতলটি খালি করে নিয়ে চলে যাব, দর্শনী পাঁচ টাকা ।

মেয়েটি অতটা আশা করেনি । সোহাগে গলে গিয়ে বলল, 'যতক্ষণ খুশি বসুন না । ঈস, ভিজে যে একেবারে চুপসে গেছেন । আসুন ভিতরে, কাপড় বদলাবেন ? ধোয়া কাপড় আছে ।'

জামা কাপড় আর বদলালাম না । তবে ওর দেওয়া শুকনো গামছা দিয়ে গা মুছে ফেললাম ।

ছোট্ট সরু ঘর । ঘরের বারো আনি জুড়ে তক্তপোষ পাতা । কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মী মূর্তি । একদিকে একটা হারমোনিয়াম আর বাঁয়া তবলাও চোখে পড়ল ।

বললাম, 'গানবাজনা চলে নাকি ?'

মেয়েটি বলল, 'চলে । কত জনের কত রকমের আবদার । সবই তো মেটাতে হয় । উঠে বোসো না ! দাঁড়িয়ে আছ কেন ? আমার বিছানা ময়লা নয় । ধোয়া চাদর পেতে দিয়েছি ।'

আপনি থেকে তুমিতে নামতে ওদের দেরি হয় না । অতিথি যতক্ষণ ঘরের বাইরে, ততক্ষণ পর । ঘরে ঢুকলেই পরমাত্মীয় ।

তাকিয়ে দেখলাম, মেয়েটির বয়স তিরিশ বত্রিশ বছরের কম নয় । প্রথম যৌবনে রূপ হয়তো বা একটু ছিল, এখন আর তা নেই । স্বাস্থ্য একেবারেই গেছে ।

ওর দ্বিতীয়বারের অনুরোধে বিছানায় উঠে বসলাম । গ্লাস, সোডার বোতল ওই যোগাল ।

সবাইর সব রকম বাতিক মেটাবার ব্যবস্থা ওদের রাখতে হয়।

বোতল অর্ধেক খালি করে আমি বললাম, 'এবার একটু গান টান চলুক। তোমার ঘরে সব বন্দোবস্ত যখন আছেই শুনিই না একখানা গান।'

ও বিনা আপত্তিতে হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে বসল। তারপর কী গান ধরল জানেন? 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।'

গলা এমন কিছু ভালো নয়, সুরই বা কী করে নির্ভুল হবে। কিন্তু আমার সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। এই গান এখানে! এমন গান এখানে!

বললাম, 'এ গান তুমি কোথায় পেলে?'

ও বলল, 'আজ পঁচিশে বৈশাখ। সকালে রেডিওতে বাজছিল। অনেক দিন আগেই গানটি আমার শেখা ছিল। ভুলে গিয়েছিলাম। আজ নতুন করে তুলে নিলাম।'

আমি বললাম, 'আর একবার গাও তো, আর একবার গাও।'

শুনে মেয়েটি ভারি লজ্জিত হল। রূপহীন লাবণ্যহীন শিক্ষা দীক্ষাহীন সেই মুখে লজ্জার সে যে কী অপরূপ প্রকাশ সেদিন দেখলাম, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

মেয়েটি বলল, 'শুনতে সত্যিই ভালো লাগছে তোমার?'

আমি বললাম, 'খুব ভালো লাগছে, আবার গাও।'

মেয়েটি গাইতে লাগল, 'ধন্য হল অঙ্গ মম পুণ্য হল অন্তর।'

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

একটি মাতাল আর একটি বেশ্যা দুজনে মিলে আমরা সেদিন সেই পুণ্যতিথি যাপন করলাম।

সেই গান শুনতে শুনতে আমি সেদিন মনে মনে অনেক প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। মহৎ মহৎ সব সঙ্কল্প। তার কোনটিই রাখতে পারিনি। কিন্তু প্রতিজ্ঞাগুলির কথা আজও মনে আছে। সেই দিনটির কথা আজও ভুলিনি।"

কথা শেষ করে ভুবনবাবু চুপ করে বসে রইলেন।

কী ভাবতে লাগলেন কে জানে।

একটু পরে রাস্তায় হর্নের শব্দ হল। গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়াল।

জাগৃতি ক্লাবের রোগা মত ছেলেটি ঘরে ঢুকে বলল, 'আসুন স্যার, পেয়েছি।'

তার কপালে ঘাম, মুখে পরম পরিতৃপ্তির অপার্থিব হাসি।

আরোগ্য

চারুদর্শনা রিসেপসনিস্ট মেয়েটি যে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা বুঝতে পারল পরিমল। মেয়ে পুরুষ সবাই আজকাল তার দিকে ওইভাবেই তাকায়।

মেয়েটি চোখ ফিরিয়ে নেবার আগে অবশ্য জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই আপনার?'

চুল বাঁধবার ধরনে, লিপস্টিকের প্রগাঢ় প্রলেপে, রঞ্জিত নখে মেয়েটির চেহারায় খানিকটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ধরন এলেও কথা বাংলাতেই বলল।

পরিমল জবাব দিল 'শৈলেশ সেন। টেকস্টাইল ডিপার্টমেন্ট।'

মেয়েটি আছে উঁচুমত কাষ্ঠ বেষ্টনীর মধ্যে। তার সামনে গদি আঁটা কয়েকখানি চেয়ার। একটি চেয়ার দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'বসুন।' তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করতে লাগল।

আরো কয়েকজন ভিজিটর এল। মেয়েটি তাদের কারো কারো সঙ্গে একটু হেসে কথা বললো, বসতে অনুরোধ করল। কিন্তু পরিমলের দিকে আর দ্বিতীয়বার তাকাল না। পরিমল জানে সে আর তাকাবে না।

খানিক বাদে সাদা রঙের স্যুটপরা একটি যুবক ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

ইচ্ছা করেই চেয়ারখানা একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে সবাইর দৃষ্টি এড়িয়ে কোণের দিকে চুপ করে বসেছিল পরিমল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিয়ে বলল, 'শৈলেশ, এই যে আমি এখানে।'

বন্ধু এবার তার দিকে এগিয়ে এল। তারপর সেও মুহূর্তকাল বিস্মিত ব্যথিত চোখে পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদে অস্ফুট স্বরে বলল, 'কী ব্যাপার ? কী হয়েছে তোমার।'

পরিমল বলল, 'অপারেশন হয়েছে।'

শৈলেশ কি অফিসের কাজে অন্যমনস্ক রয়েছে ? নাকি ভুলে গেছে ব্যাপারটা ?

এবার তার যেন সবই মনে পড়ল।

শৈলেশ একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ওঃ হো। আমি তারপর আর যেতে পারিনি। অপারেশন হবে হবে শুনে এসেছিলাম। ফোনও করেছিলাম একদিন ক্যানসার হাসপাতালে। কিন্তু এনগেজড সাউন্ড পেলাম। জানো তো আমাদের অফিস থেকে ফোন করা কী শক্ত ?'

পরিমল শান্তভাবে বলল, 'জানি। তবু তো তুমি ভাই দুদিন গিয়েছিলে।'

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একটু অভিমানের সুর গলা থেকে বেরিয়ে এল পরিমলের।

শৈলেশ হাত ঘড়ির দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে এবার তার পাশের চেয়ারটিতে বসে পড়ে বলল, 'আর ভাই বোলো না। যা ঝামেলা। এদিকে অফিসের খাটুনি তারপর বাড়িতে গিয়েও ঠিক সুস্থ থাকবার জো নেই। বাজার করো, রেশন ধরো, মিল্ক ডিপোতে গিয়ে লাইন দাও—'

অসুস্থ বন্ধুকে কিছু বলা উচিত শৈলেশের এবার ফের যেন খেয়াল হল। ফের তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে শৈলেশ বলল, 'তোমার মুখের তো কিছু আর নেই দেখছি।'

পরিমল একটু হাসল, 'একখানা চোয়াল নেই, থুতনি নেই, আর জিভেরও খানিকটা গেছে। তা ছাড়া আর সবই আছে।'

শৈলেশ বলল, 'ও জিভও। সেইজন্যেই অমন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছ। খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে কথা। তোমার আবৃত্তি কি সুন্দর ছিল। তোমার উচ্চারণ—। কিন্তু জিভে—'

পরিমল মনে করিয়ে দিল, 'জিভেই তো ফুসকুরিটা প্রথম হয়। তোমাকে বলেছিলাম তো।'

শৈলেশ লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সবই তো জানি। শুনেছি সবই। সেদিন যখন হাসপাতালে যাই সবাই ছিলেন। তোমার মা বোনেরা—। তাঁরা সবই বললেন।'

পরিমল বলল, 'ধরা পড়তেই দেরি হয়ে গেল। প্রথমে একবার বায়াপসি করালাম। কিছুই পাওয়া গেল না। তারপর—'

পাছে ফের গোড়া থেকে রোগ আর তার চিকিৎসার বিবরণ শুরু করে দেয় পরিমল শৈলেশ তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পালটে দিয়ে বলল, 'যাক যা যাবার তা তো গেছেই। তা নিয়ে আর ক্ষোভ করে কী হবে। তোমাকে যে ফিরে পেয়েছি তাই যথেষ্ট। একদিন ভালো করে সেলিব্রেট করতে হবে। যেয়ো আমাদের ভবানীপুরের বাসায়। আজ তো ভাই সময় নেই। তোমাকে এক কাপ চাও অফার করতে পারলাম না। এত কাজ চাপিযেছে ঘাড়ে।এসো একদিন। ভালো করে খাওয়া দাওয়া করা যাবে। তোমার রোগমুক্তি সেলিব্রেট করব।'

আর সেলিব্রেশন। অক্ষত দেহে কি বেরিয়ে আসতে পেরেছে পরিমল যে আনন্দ উৎসব করবে ?

একটু চুপ করে থেকে পরিমল বলল, 'খাওয়া দাওয়ার কথা বললে শৈলেশ, খাওয়া দাওয়া জীবন থেকে উঠে গেছে।'

'কেন, কিচ্ছু খেতে পার না ?'

'সলিড কিচ্ছু না। কোন রকমে গলা ভাত দুটো। জিভের কাজ তো ভালো করে হয় না। কী করে খাব ?

'দুধ খেতে পার তো ?'

'পারি। কিন্তু দুধ কি বেশী জোটে না জুটবে ? গরীবের সংসার। তারপর এই অসুখ বিসুখে দেনা দায় কি কম হয়েছে ? ধারদেনায় তলিয়ে গেছি ভাই।'

শৈলেশ অনির্দিষ্টভাবে সহানুভূতি জানায়. 'হবে! সবই শোধ হবে। প্রাণে যখন বেঁচে উঠেছ।'

চেয়ার ছেড়ে শৈলেশ এবার উঠে দাঁড়ায়, 'আর একদিন এসো পরিমল। কি আমিই যাব। আমিই যাব একদিন। তুমি সেই উল্টোডাঙ্গাতেই আছ তো ?'

শৈলেশ চলে যাচ্ছিল পরিমল একটু বাধা দিয়ে বলল, 'শোন, আর একটা কথা।'

বিরক্ত না হোক বিব্রত হল শৈলেশ। কিন্তু মুখে হাসি টেনে বলল, 'ভাই এমন দিনেই এসেছ। বড্ড ব্যস্ত। আচ্ছা এক কাজ করো না। আমাদের সেকশনে এসেই বোসো না। হাতের কাজ সারতে সারতে তোমার কথা শুনব।'

রিসেপসনিস্ট মেয়েটির দিকে পরিমল ফের একবার তাকাল। ক্ষিপ্রগতিতে সে কাজ করছে। ভিজিটরদের দিকে শ্লিপের প্যাড আর পেন্সিল এগিয়ে দিচ্ছে। যাদের কার্ড আছে তাদের কার্ড নিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফোন করছে, রিসিভ করছে। এর দিকে তাকিয়ে হাসছে, ওর সঙ্গে কথা বলছে। চোখে ঝিলিক মুখে ঝিলিক যেন বিদ্যুৎলতা।

কিন্তু ওই বিদ্যুৎলতাটি পরিমলের দিকে দ্বিতীয়বার আর ফিরেও তাকায়নি।

পরিমল বন্ধুর কথার জবাবে বলল, 'না ভাই, ভিতরে আর যাব না। সবাই বিশ্রীভাবে তাকাবে, অস্বস্তি বোধ করবে, ভয় পাবে।'

শৈলেশ একটু হেসে বলল, 'আঃ চেহারা সম্বন্ধে অত কনসাস হচ্ছ কেন ? বিয়েটিয়ে তো আর করনি। বয়স তো প্রায় পার করেই দিলে। চেহারা দিয়ে আর কী করবে।'

পরিমল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা যা বলেছ। কিন্তু চেহারাটা জীবিকার জন্যেও দরকার শৈলেশ। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ। ফার্মের স্যাম্পল নিয়ে লিটারেচার নিয়ে নানা জায়গায় বেরোতে হয়। বহুলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। রাশ রাশ কথা বলতে হয়। সেই কথা তো আর তেমন করে বলতে পারব না। যে চেহারা দেখে ওরা নিয়েছিল তাও তো গেল। চাকরি থাকবে কি না কে জানে। এখনো জয়েন করতে দেয়নি। বলছে আরো রেস্ট নিন। তবে মাইনেটা দিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কী করবে কে জানে।'

শৈলেশ একটু ভরসা নিয়ে বলল, 'করবে আবার কি। তোমাকে আর মফঃস্বলের গঞ্জে বাজারে ঘোরাবে না। হেড অফিসেই রেখে দেবে। ডেসক ওয়ার্ক করবে বসে বসে।'

পরিমল বন্ধুর দিকে তাকায়, 'যদি তা না হয়, তুমি কি একটু চেষ্টা চরিত্র করবে শৈলেশ ?'

বন্ধুর মুখ দেখে মনে হল ও বোধহয় দারুণ এক রূঢ় কথা বলে বসবে। কি নৈরাশ্যকর কিছু। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মুখের ভাব বদলে নিল শৈলেশ। সে কোমল গলায় বলল, 'তেমন যদি কিছু হয়ই তোমার জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব পরিমল। তবে জানো তো আমাদের ক্ষমতা! আটতলায় বসে চাকরি করি। লিফটে করে উঠি নামি। কিন্তু আসলে একতলার জীব। শুধু প্রাণ ধারণের জন্যে কী যে স্ট্রাগল করতে হয়—। ক্যানসার তোমার ওই হাসপাতালেই আছে সে কথা ভেব না।'

কথাটা বলেই একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল শৈলেশ, তারপর বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেল।

একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে শৈলেশ, বয়সের তুলনায় কেমন যেন বুড়ো বুড়ো চেহারা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। গুটি তিনেক ছেলেমেয়ে হয়েছে। তা ছাড়াও ডিপেন্ডেন্ট আছে। ওর তুলনায় পরিমলের ফিগার অনেক ভালো ছিল। কিন্তু সে অতীতের ইতিহাস। সে কথা স্মরণ করে আর কী হবে।

লিফটের কাছে এসে দাঁড়াল পরিমল। একটু বাদে সুবৃহৎ খাঁচাটি নেমে এল। আরো কয়েকজনের সঙ্গে পরিমল ভিতরে ঢুকল। মনে হল সহযাত্রীরা সবাই তার স্পর্শ এড়াবার জন্যে ব্যস্ত। কেউ বা তার অস্তিত্ব উপেক্ষা করছে। সে যেন থেকেও নেই।

এ কি সত্যি ? না কি তারই ভিতরে একটা কমপ্লেক্স জন্মে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ? পরিমল নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিশ্লেষণের দৃষ্টি ফের গিয়ে পড়ল এইমাত্র ছেড়ে আসা বন্ধুর ওপর। আর একটু সহৃদয়তা যেন আশা করেছিল শৈলেশের কাছে। ওর সঙ্গে তো

আজকের আলাপ নয়। একসঙ্গে কলেজে পড়েছে। তারপরেও কত দেখাসাক্ষাৎ। একই ঘরে ছিল পাশাপাশি। কিন্তু ক্ষোভ করে লাভ নেই। সংসারে সবই বদলায়। মানুষ বদলায় সবচেয়ে বেশি।

লিফট তাকে ভূতলে নামিয়ে দিল। বেরিয়ে এসে দশতলা অফিস বাড়িটির দিকে পরিমল আর ফিরেও তাকাল না।

বিকালের অফিস পাড়া। বিভিন্ন মুখে বাস-ট্রাম ট্যাক্সি করে জনস্রোত এগিয়ে চলেছে। বাড়ি ফেরার তাড়া আরম্ভ হয়ে গেছে চারটে বাজতে না বাজতেই। আরো একটু আগে বেরিয়ে পড়লে ভালো ছিল। বাস-ট্রামে এখন আর ওঠা যাবে না। উঠে কীই বা করবে। কী হবে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে। মা অবশ্য বলে দিয়েছেন, 'সকাল সকাল বাসায় চলে আসিস। এত ঘোরাঘুরি ভালো না। এই সেদিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিস। তুই আবার কী একটা কাণ্ড ঘটাবি কে জানে।'

পরিমল হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেড পর্যন্ত এল। নতুন কাণ্ড কী আর ঘটবে। যা ঘটবার ছিল ঘটে গেছে। এখন থেকে একেবারেই ঘটনাহীন জীবন।

চা আর খাবারের দোকান সামনে। দোতলা বাড়ি। একতলাতেও বসবার ব্যবস্থা আছে। তবু পরিমল দোতলাতেই উঠে পড়ল। অমিতা সঙ্গে থাকলে দোতলাতেই ওঠে। আজ বান্ধবী নেই। তবু স্মৃতির সিঁড়ি আছে। পরিমল দোতলাতেই গিয়ে বসল। আগের মত ঠিক দক্ষিণ দিকের কোণটি ঘেঁষে। আশ্চর্য, সামনের চেয়ারটি খালি পড়ে আছে। যেন কেউ এসে বসবে তারই প্রতীক্ষায়। না, কেউ আর আসবে না। পরিমলের পরিচিত কেউ অন্তত নয়।

ঘরখানিতে গিজ গিজ করছে লোক। সবাই খাচ্ছে, গল্প করছে। কারো সঙ্গে বন্ধু আছে, কারো বা বান্ধবী। পরিমল আজ নিঃসঙ্গ।

বয় এসে দাঁড়াতে পরিমল এক কাপ চা চাইল।

বয়টি বালক নয়, বয়স্ক লোক। চুলে পাক ধরেছে। সে বেশ চেনে পরিমলকে। কোন কোন সময় তার কাছ থেকে ভালো টিপস পেয়েছে অমিতা সঙ্গে থাকতে।

'শুধু চা বাবু?'

লোকটি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল। হয়তো ভেবেছে শুধু চায়ের খদ্দের তো পরিমল এর আগে ছিল না।

ও তো জানে না, পেটে ক্ষিদে থাকলেও পরিমলের অন্য কিছু নেবার উপায় নেই।

'হ্যাঁ, শুধু চা।'

পরিচিত বয়টি তবু দাঁড়িয়ে রইল। তার কৌতূহল শেষ হতে চায় না। জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু কী হয়েছিল আপনার?'

পরিমল সংক্ষেপে বলল, 'একটা শক্ত অপারেশন হয়েছিল।'

অসুখটাও শক্ত। কিন্তু এই এক ঘর লোকের মধ্যে বসে ক্যানসারের নামটা পরিমল করল না। কে জানে কে কী ভাববে। কে কতখানি ভয় পাবে।

বয়টি চলে গেল।

অমিতা যে এই এসপ্লানেড অঞ্চলে খুব ঘন ঘন আসত তা নয়। পরিমলের অনুরোধ উপরোধেই ছুটির পর এসে দেখা করত। পরিমলেরও যে খুব বেশী সময় থাকত তা তো নয়। তারও তো বেশীর ভাগ সময় উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় কাটত। কোম্পানি তাকে কদিনই বা কলকাতায় রেখেছে।

বাইরে গিয়ে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখত পরিমল। দুজনের মধ্যে সেই বেশী চিঠি লিখত। মালদা দিনাজপুর দার্জিলিং যে জায়গাতেই গিয়েছে আর যে হোটেলেই উঠেছে সেখানকার বর্ণনা দিয়ে অমিতাকে চিঠি লিখেছে পরিমল। নদীনালা পাহাড় পর্বতের কথা, লোকজনের কথা সব বিবরণ দেওয়া চাই। চিঠি তো নয়, যেন ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী।

দেখা হলে মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়েছে অমিতা, 'চিঠিতে অত বাজে কথা লেখ কেন?'

'বাজে কথা ?'
'মানে অত বাজে লোকের কথা ?'
'তবে কী লিখব ?'
'কেন নিজের কথা লিখতে পার না ?'
'নিজের কথা তো সেই একঘেয়ে। সেই এক কথা।'
'তবু তাই ভালো।'

চিঠি অবশ্য দেওয়ার চেয়ে পেতেই ভালোবাসত অমিতা। অনুযোগ দিলে কৈফিয়ৎ দিয়ে বলত, 'লিখতে বড় আলস্য লাগে। দিন-রাত চিঠিপত্র, পার্শেল রেজিস্ট্রির মধ্যে থেকে থেকে চিঠিতে অরুচি ধরে গেছে।'

পরিমল বলত, 'অরুচি ! তাহলে আমার চিঠিতেও তোমার অরুচি ধরেছে তাই বলো।'

'আরে না না। চিঠি পেতে তো ভালোই লাগে। কিন্তু লিখতে বড় আলস্য।'

হ্যাঁ প্রথম পোস্ট অফিসেই আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে। নিজেদের পাড়ার পোস্ট অফিসে নয়, বিডন স্ট্রীটের পোস্ট অফিসে। তখন সেখানেই ও কাজ করত। বড় রকমের কাজ কিছু নয়, স্ট্যাম্প বিক্রির কাজ ! প্রায়ই হিসেবে গরমিল হত। আর ক্ষতিপূরণ দিত গাঁটের টাকায় আর বাবা মার কাছে বকুনি খেত। এসব গল্প অমিতাই করেছে তার কাছে।

পরিমল শুধু ওকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়নি, সামনে নিয়ে বসে চা খায়নি, চিঠির পর চিঠিতে শুধু সোহাগ ভালোবাসার কথাই জানায়নি, জীবনে উন্নতি করবার জন্যেও পরামর্শ দিয়েছে। তারই উপদেশে স্কুলফাইন্যাল পাশ করেছে অমিতা, আই-এ পাশ করেছে। মাঝে মাঝে প্রাইভেটে বি-এ পড়বার জন্যে তোড়জোড় করে।

বয়স অমিতারও কম হয়নি। সাতাশ আঠাশ ও তো নিজেই বলে। দু-এক বছর কি চুরি না করে ছাড়ে ? সংসারের অবস্থা ভালো নয়, ওর রোজগারের টাকাটাও বুড়ো বাপ-মাকে গুনতে হত বলে এতদিন বিয়ে হয়নি অমিতার। পরিমলেরও সুযোগ সুবিধে হয়ে ওঠেনি বিয়ে করার। একবার এগিয়েছে আর একবার পিছিয়েছে। বছর পাঁচেক ধরে ঘনিষ্ঠতা। এতদিন বাদে এবার দুজনেই ঠিক করেছিল বিয়ে করবে। অমিতার ছোট ভাই এতদিনে বড় হয়েছে, চাকরি পেয়েছে। বরং পরিমলের মা-বোনদেরই আপত্তি। বোনরা দেখেছে অমিতাকে। দেখতে সুন্দরী নয়। বয়স বেশী।

পরিমল হেসে বলেছে, 'আমিই কি কচি খোকা নাকি রে। আমারও তো পঁয়ত্রিশ পার হয়ে গেল।'

টুলু বলেছে, 'তা হোক। পুরুষ মানুষের বয়স হয় না। তা ছাড়া কতদিন ধরে চাকরি বাকরি করছে। আর কি রকম পাকা পাকা চেহারা। তুমি নিজে এত দেখতে সুন্দর দাদা। কিন্তু কী তোমার পছন্দের ছিরি।'

বুলু সায় দিয়ে বলেছে, 'বড় বিশ্রী ধরনের পছন্দ। তুমি আমাদের ওপর ভার দাও দাদা। আমরা তোমার জন্যে মেয়ে খুঁজে দেব। বয়সও কম হবে, দেখতেও সুন্দরী হবে। তুমি আমাদের ওপর ভার দাও।'

দুই বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তারা এখন পাকা গিন্নি। ছেলেমেয়ের মা। বয়সে ছোট হলেও সাংসারিক অভিজ্ঞতায় তারা যেন পরিমলের চেয়েও বড়।

তবু পরিমল ওদের ওপর মেয়ে খোঁজার ভার দিতে রাজি হয়নি। যাকে সে খুঁজে পেয়েছে তাকে ছাড়া সে আর কাউকে চায় না।

দিনক্ষণ দেখাদেখি চলছিল। তারপর হঠাৎ এই কাণ্ড। পরিমলের অসুখ, চিকিৎসা বিভ্রাট, হাসপাতাল ; অপারেশন এবং শেষ পর্যন্ত বিকলাঙ্গ হয়ে বাড়ি ফেরা।

অঙ্গ হারিয়ে বিরূপ, বিকৃত মুখ নিয়ে ফিরে এসেছে পরিমল। সেই সঙ্গে অনেক কিছু অভিজ্ঞতাও নিয়ে এসেছে। কে আপন কে পর চিনে এসেছে।

হাসপাতালে অমিতার বাবা মা মাঝে মাঝে আসতেন। যেদিন যেতেন, ফলটল নিতেন সঙ্গে। অমিতা আর তার ভাই-ই যেত বেশী। কিন্তু ক্রমে ওদের যাতায়াত কমতে শুরু করল। তারপর

যেই শুনল ক্যানসার ওদের আসা যাওয়া আরো কমে গেল। নানা অজুহাত, কাজকর্মের দোহাই। পরিমল বেশ বুঝতে পেরেছিল তারা ওকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছে। অপারেশনের পর দু-একবার ছাড়া অমিতাকে পরিমল দেখতেই পায়নি। পরিমল ফিরে এসে যেন অন্যায় করেছে। বেঁচে উঠে যেন ওদের হিসাব গরমিল করে দিয়েছে।

এখন যেটুকু সম্পর্ক সেটুকু নিতান্তই শুকনো ভদ্রতার সম্পর্ক। বিকলাঙ্গ কুদর্শন পরিমলকে অমিতা এখন এড়িয়ে যেতে চায় একথা কি কারো বুঝতে আর কষ্ট হয়। যদি অসুখে পড়বার কদিন আগেই বিয়েটা হয়ে যেত তাহলে কি অমিতা পারত বিকলাঙ্গ স্বামীকে ছেড়ে থাকতে ? অন্তত সামাজিক চক্ষুলজ্জার খাতিরেও পারত না। কিন্তু ঘটনাক্রমে বিয়ে যেহেতু হয়নি অমিতা তার সুযোগ নিচ্ছে। আস্তে আস্তে ভুলে যাবার, ছেড়ে যাবার ফিকির খুঁজছে।

হাসপাতালে গিয়ে আর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সংসারটাকে অন্য রকম করে চিনেছে পরিমল। বুঝতে পেরেছে বিপদের দিনে বন্ধু বড় কম। বেশীর ভাগ সহানুভূতিই মৌখিক। ভালোবাসাটা মানুষের স্বার্থবোধের সঙ্গে জড়িত।

খালি চেয়ারটা অনেকক্ষণ ধরেই খালি পড়ে আছে। পরিমলের চেহারা দেখে কেউ হয়তো সহজে তার সামনে বসতে চাইছে না। ওপরে আর জায়গা নেই দেখে কেউ কেউ ফের নীচেও নেমে যাচ্ছে।

চা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। পরিমল শূন্য কাপ নিয়ে বসে রইল। কেউ তাকে তাগিদ দিয়ে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত বসেই থাকবে পরিমল।

এতক্ষণে আর একটি যুবক এসে তার সামনের চেয়ারটায় বসল। সুদর্শন, ছিপছিপে চেহারা। বয়স তিরিশের নীচেই হবে।

সে এসে খাবারের অর্ডার দিয়ে একটি সিগারেট ধরাল।

যেন কিছু করবার নেই বলেই আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে পরিমলকে খানিকক্ষণ দেখল, তারপর নাগরিক সৌজন্যে বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?'

পরিমল একটু নির্লিপ্তভাবে বলল, 'করুন।'

'আপনার কী হয়েছিল ?'

পরিমল বলল, 'ক্যানসার।'

ইচ্ছা করেই কথাটার মধ্যে সে একটু রূঢ়তা মিশিয়ে দিল। যার এত কৌতূহল সে একটু আঘাত পাক।

'কোথায় হয়েছিল ? জিভে ?'

পরিমল একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী করে জানলেন ?'

'আমি আপনাকে দেখেছি। হাসপাতালেই দেখেছি।'

'আপনি আমাকে দেখতে যেতেন ? আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বলে তো মনে পড়ে না ?'

যুবকটি বলল, 'না, আপনাকে দেখতে ঠিক নয়। আপনার পাশের বেডেই ছিলেন অক্ষয় মুখার্জি। আমার আত্মীয় হতেন। লাংস ক্যানসার হয়েছিল তাঁর। তাঁকে দেখতে যেতাম। আপনার অসুখের কথা তখন শুনেছি।'

পরিমল বলল, 'ওঃ হো, এবার বুঝতে পেরেছি। আমার অপারেশনের আগেই তিনি মারা গেলেন। রেডিয়াম গোল্ড দেবার পরে বেশী দিন আর রইলেন না। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। প্রায়ই কথাবার্তা হত। ভারি ভালোমানুষ ছিলেন।'

যুবকটির খাবার এসে পৌঁছল। সিঙ্গাড়া, চাটনি আর চা।

পরিমলের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাকে আর এক কাপ চা দিক।'

পরিমল আপত্তি করল না।

'আর কিছু দেবে ?'

'না। থ্যাঙ্কস। আর কিছু খেতে পারিনে।'

'খেতে পারেন না?' যুবকটি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

পরিমল বলল, 'না বড্ড কষ্ট হয়।'

আর একজনকে সামনে বসে খেতে দেখে না খেতে পারার কষ্ট পরিমল যেন ফের নতুন করে অনুভব করল।

একটু চুপ করে রইল পরিমল। তারপর আগের কথায় ফিরে গিয়ে বলল, 'অক্ষয়বাবু বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন।'

যুবকটি স্মিতমুখে শুনে যেতে লাগল। নিজের যে আত্মীয়কে সে ভালো করেই চেনে তাঁর কথা সে আর একজন অনাত্মীয়ের মুখ থেকে এখন শুনতে চায়। শুনতে চায় তাঁর শেষ দিনগুলির কথা।

পরিমল বলল, 'সব মিলিয়ে মাস দেড়েক তিনি হাসপাতালে ছিলেন। তাঁরও খুব দেরিতে ধরা পড়েছিল রোগ। করবার মত প্রায় কিছুই ছিল না। প্রায়ই যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। তবু ওরই মধ্যে যখন একটু ভালো থাকতেন আমাকে খুব আশা ভরসা দিতেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বলতেন, পরিমলবাবু, সত্তরের কাছাকাছি বয়স হতে চলল, আমি তো সংসারের কারবার গুটিয়ে এনেছি। ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছি। নাতি নাতনীর মুখ দেখেছি। কিন্তু আপনার তো এখনো সবই বাকি।আপনাকে অনেক কাজ করতে হবে, আপনার বাঁচা দরকার। আমি বলতাম দরকার হলেই কি বাঁচা যায়? তিনি বলতেন আপনি বেঁচে যাবেন। আপনার তো ওপরে হয়েছে। অপারেশনের পর আপনি বেঁচে যাবেন।'

শ্রোতা একাগ্রভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে পরিমল লক্ষ্য করল। একটু চুপ করে থেকে পরিমল ফের বলতে লাগল, 'যখন চারদিকে পেশেন্টরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, রোজ কোন না কোন ওয়ার্ড থেকে কারো না কারো মৃত্যু সংবাদ আসছে তখন তাঁর মুখের ওই আশ্বাসটুকু যে কতখানি বল এনে দিত তা বলতে পারব না।'

একটু বাদে পরিমল বলল, 'যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। নামটা কী আপনার?'

'সলিল চক্রবর্তী।'

বয় বিল নিয়ে এলে সলিলই সেটা মিটিয়ে দিল। পরিমলের দু কাপ চায়ের দাম সমেত। সাধারণ সৌজন্য। সামান্য দাক্ষিণ্য একটু। তবু এও যেন অনেকখানি।

রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে ফুটপাতের ওপর ফের একটু দাঁড়াল দুজনে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলোয় উজ্জ্বল এসপ্লানেড। আকাশে চাঁদের ক্ষীণ একটু রেখা। সারা আকাশ জুড়ে কিসের এক স্তব্ধতা।

নীচে মহানগরের কেন্দ্রভূমি যানবাহন জনস্রোতে স্ফীতকায়, কোলাহল মুখর। সেদিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে পরিমল ফের বলল, 'রোগশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষ কী যে মানে আর কী যে মানে না তা সে নিজেই জানে না। কত নাস্তিককে সেখানে আস্তিক হতে দেখেছি। কত অবিশ্বাসীকে তাবিজ কবচ পরতে দেখেছি। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথাগুলি আমাকে তখন কী যে আশ্বাস দিয়েছিল—।'

সলিল বলল, 'তিনি আমার মেসোমশাই হতেন। যাবেন একদিন। গেলে খুব খুশি হব। মাসীমাদের ওখানে নিয়ে যাব আপনাকে। মেসোমশাইর একখানি ফটো এনলার্জ করে আমরা বাঁধিয়ে রেখেছি। দেখে আসবেন।'

'কেমন ফটো হয়েছে?'

সলিল বলল, 'বেশ ভালো। মুখে সেই মধুর হাসিটুকু লেগেই আছে। তাঁর ঠিক যৌবনকালের ফটো নয়, বেশী বয়সেরই ফটো। তবে তখন তো স্বাস্থ্য বেশ ভালোই ছিল। সুন্দরও ছিলেন দেখতে। একদিন দেখে আসবেন। আপনি গেলে সবাই খুব খুশি হবেন, আপনার মুখে তাঁর অনেক কথা শুনতেও পাবেন।'

সলিলকে ট্রামে তুলে দিয়ে পরিমল কার্জন পার্কের দিকে এগোতে লাগল। মনে মনে ভাবল,

হাসপাতালে অক্ষয়বাবুর হাসি মুখ বড় একটা দেখতে পায়নি পরিমল। কী করে পাবে ? প্রায় সারাক্ষণই তো যন্ত্রণায় কষ্ট পেতেন। শ্বাস নিতে কষ্ট হত বলে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হত। মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হত রাত্রে। তবু তাঁর হাসিমুখের ছবিই দেয়ালে টাঙানো আছে। পরিমলও অপারেশন টেবিলে কি সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনবার পর মারা যেতে পারত। কয়েকজনকে সে এইভাবে মারা যেতে দেখেছে। পরিমলও যদি মারা যেত নিশ্চয়ই তার মা বোনেরা তারা এই বিকৃত মুখের ছবি ঘরের দেয়ালে টানিয়ে রাখত না। তার সুস্থ সুন্দর সবল অবয়বের প্রতিকৃতি, তার হাসিমুখের ছবিই ঘরের দেয়ালে টানানো থাকত।

এমন ছবি অমিতার কাছেই কি দু একখানা নেই ? পাহাড় নদী ঝর্ণার ছবির সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজের ছবিও তো পরিমল পাঠিয়েছে অমিতাকে।

খানিকক্ষণ বসে থেকে পরিমল উঠে পড়ল। এবার বাড়ি ফিরবে। গিয়ে মার বকুনি শুনতে হবে। সত্যি আজ অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। শুধু আজ কেন, কদিন ধরেই ঘোরাঘুরি চলছে তার। অত বড় একটা অপারেশনের পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পরিমল যে পুনর্জন্ম পেয়েছে তা সবাইকে জানাতে ভালো লাগে পরিমলের। নিজের রোগের বিবরণ, তার চিকিৎসার কথা হাসপাতালের নানা রকম অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু শুনবার যেন সময় নেই মানুষের। কোনও ঔৎসুক্যও নেই। মানুষ বড় ব্যস্ত। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। শুধু শৈলেশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সবাই এই রকম। হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়ে যারা সহানুভূতি জানিয়েছে, খানিকক্ষণ কাছে বসে থেকেছে, বাইরে এসে পরিমল দেখেছে তারা অন্যরকম হয়ে গেছে। তাদের ঔদাসীন্যের শেষ নেই। পরিমল সুস্থ হয়ে উঠেছে এই সংবাদটুকুই যেন তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তার যে আরো কিছু সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে, বলবার কথা করবার কাজ থাকতে পারে তা যেন কেউ বিশ্বাস করে না।

অমিতা আর ওদের বাড়ির সবাইও খুব উদাসীন হয়ে গেছে। সেই আগেকার মত দেখা সাক্ষাৎ নেই, দুই পরিবারের মধ্যে সেই হৃদ্যতার সম্পর্ক যেন নিঃশেষিত। এর মূলে অমিতা। অমিতাই এখন সরে যেতে চায়, এড়িয়ে যেতে চায়, ক্যানসারের রোগীর সংস্পর্শে সে আর থাকতে চায় না। খবর দেওয়া সত্ত্বেও সে বহুদিনের মধ্যে আসেনি, একবার এসে খোঁজ নেয়নি। এসে জিজ্ঞাসা করেনি, 'কেমন আছ !'

যেতে যেতে পরিমল হঠাৎ সিদ্ধান্ত পালটে ফেলল। সার্কুলার রোডের ট্রাম না ধরে কলেজ স্ট্রীটের ট্রাম ধরল। তারপর বউবাজারের আগের স্পপটায় নেমে পড়ল। বোঝাপড়া করে আসবে সে অমিতার সঙ্গে। তার সুস্থ শরীরের দু একখানা ফটো যা আছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এত ভয় কিসের ? এত লুকোচুরিই বা কিসের জন্যে ! যে সম্পর্ক আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলাই ভালো।

হিদারাম ব্যানার্জির গলির মধ্যে পুরোন পরিচিত বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল পরিমল। সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই সাড়া পাওয়া গেল।

'কে ?'

অমিতার বাবার গলা।

একটু বাদেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দিলেন।

সামনের দিকটা অন্ধকার। বাড়িওয়ালা প্যাসেজে কোন আলোর ব্যবস্থা করেননি। বালব নাকি চুরি হয়ে যায়, অমিতা একবার বলেছিল।

'কে ?'

পরিমল এবার আত্মপরিচয় দিল।

অমিতার বাবা একটু চুপ করে রইলেন। পরিমল অন্ধকারে তাঁর মুখের ভাব কিছু দেখতে পেল না। একটু বাদে শুনতে পেল, 'ওঃ, পরিমল। তুমি এত রাত্রে এই শরীর নিয়ে বেরিয়েছ ? এসো।'

আমন্ত্রণে খুব যে আন্তরিকতা আছে তা পরিমলের মনে হল না। তবু সে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

বাপ তো প্রহরী মাত্র।

একতলার ঘর। দেয়ালগুলিতে অনেক দিনের মধ্যে চুনকাম হয়নি। আলোটা তেমন জোরালো নয়। কেমন যেন লালচে লালচে।

দেয়াল ঘেঁষা একখানা তক্তপোষ। তাতে বিছানা গুটানো। সামনে খান তিনেক চেয়ার। তারই একটিতে চেপে বসল পরিমল। বলবার অপেক্ষা রাখল না।

অমিতার বাবা একটু শুকনো গলায় বললেন, 'কেমন ? তোমার শরীর টরির কেমন আছে আজকাল ?'

'শরীর ভালোই।'

'তবু এত রাত্রে ঘোরাফেরা করা তো তোমার ঠিক নয়।'

'না, আর রাত করব না। এক্ষুনি চলে যাব। অমিতাকে একটু ডেকে দেবেন ?'

অমিতার বাবা একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

পরিমল নিজের মনেই হাসল। ভদ্রলোক অবাক হয়ে এখন আব তার বিকৃত মুখ দেখছেন না, স্পর্ধা দেখছেন।

কোন দিনই ওর বাবাকে এত স্পষ্ট ভাষায় অমিতাকে ডেকে দিতে বলতে পারেনি পরিমল।

ভদ্রলোক কি যেন একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'ওর শরীরটা তেমন ভালো নেই। আচ্ছা দিচ্ছি ডেকে। বোসো।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন।

পরিমল চুপচাপ বসে রইল। এই জীর্ণ পুরোন সাধারণ একখানি একতলার ঘর এক সময় তার কাছে আনন্দের আগার ছিল। আজ এর শূন্যতা রিক্ততাই শুধু চোখে পড়ছে।

ভিতর থেকে মেয়েদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভেসে আসছে রান্নার গন্ধ।

একটু বাদে ভিতর থেকে অমিতা এসে দাঁড়াল। সাধারণ আটপৌরে বেশ। সবুজ পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি পরনে।

পরিমল লক্ষ্য করল তার মুখের দিকে অমিতা ভালো করে তাকাচ্ছে না। কেন ? বিকৃত মুখ দেখবার ভয়ে ? না কি নিজের হৃদয়হীনতার লজ্জায় ?

একটু বাদে অমিতাই প্রথমে কথা বলল, 'এত রাত্রে একা তুমি।'

পরিমল বলল, 'হ্যাঁ, আমিই এলাম। তুমি তো সব সম্পর্ক তুলেই দিয়েছ।'

মুখের মাত্র আধখানা আছে, জিভেরও প্রায় তাই। তবু কি কড়া কড়া কথাই না বলতে পারে পরিমল।

অমিতা বলল, 'আমি তুলে দিয়েছি ? তোমরা তো এই কথাই বলে বেড়াচ্ছ। তুমি আর তোমার বোনেরা।'

পরিমল বলল, 'আমার বোনেদের সঙ্গে তোমার যে কি রকম সম্পর্ক তা আমি জানি। কিন্তু সেই সম্পর্কই কি সব ?'

অমিতা বলল, 'হ্যাঁ তাই সব। তুমি যখন অন্য কোন কথা বিশ্বাস করবে না তখন তাই সব। রোগে ভূগে ভুগে তুমি এত স্বার্থপর হয়ে গেছ আর কোন মানুষের যে অসুখ বিসুখ থাকতে পারে, দুঃখ কষ্ট থাকতে পারে তা তুমি আর ভাবতেই পার না।'

অমিতার ঠোঁট দুটি ফুলে উঠল, চোখ দুটি সজল হল, 'অপারেশনের পর প্রথম তোমাকে দেখে আমি যে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম, তারপর থেকে সেই ফিটের ব্যাধিটা আবার আমাকে শক্ত করে ধরেছে তা তুমি জানো ? না কি তোমার বোনেরা সে খবর রাখে ? না বিশ্বাস করে ? তুমি কি জানো, ভিতরে বাইরে কিভাবে যুঝতে হচ্ছে আমাকে ? আমি কী অশান্তির মধ্যে আছি তুমি খবর রাখো ?'

জলভরা চোখে পরিমলের দিকে তাকিয়ে রইল অমিতা।

একজনের অসুখের কথা শুনে চিত্তে যে এত সুখ হয় পরিমল এর আগে কখনো তা টের পায়নি।

সেই জলভরা চোখ পরিমলের মনের ক্ষোভ বিদ্বেষ আর সংশয়ের জ্বালা নিভিয়ে দিল। সে ভাবতে লাগল সত্যিই সে বড় স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। শুধু তার অঙ্গচ্ছেদই হয়নি, রুগ্নতা, দুর্বলতা সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।

পরিমল ভাবল অমিতার হৃদয়ের ওই স্পর্শটুকুই যথেষ্ট, তার চোখের ওই জলটুকুই যথেষ্ট। এইটুকু দেখবার জন্যেই সে এখানে এসেছিল।

পরিমলের মনে হল সংসারে তার ভোগ সুখের কতটুকু ক্ষমতাই বা আর আছে। খেতে পারে না সে ভালো করে, কথা বলতে পারে না। ক'দিন আর বাঁচবে তারই বা ঠিক কি। এ রোগকে তো বিশ্বাস নেই। কোন অঙ্গে ফের পচন ধরবে আর ডাক্তার ছুরি ধরবেন কিছুই বলা যায় না। আজ পরিমলকে দেখে অমিতার মনে যদি দ্বিধা এসে থাকে তা এমন কিছু অসঙ্গত নয়। দেহে মনে মানুষ যে কত দুর্বল, কত অসহায় তা তো পরিমল দিনের পর দিন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে নিজের চোখেই দেখেছে, নিজের অন্তরেই অনুভব করেছে।

পরিমল মনে মনে বলল, 'অমিতা আমার এই অনিশ্চিত আয়ু আর বিকল অঙ্গ দিয়ে তোমাকে চিরদিনের জন্যে বেঁধে রাখতে চাইব না। সে বাসনা আমার আর নেই। তোমাকে যে দেখে গেলাম, তোমার চোখের জলটুকু দেখে গেলাম এ জীবনে এই আমার পরম পাওয়া।'

পর্দার ওপাশে অমিতার বাবার কাসির শব্দ শোনা গেল।

প্রবাস

কিছুদিন ধরেই আমার মন পালাই পালাই করছিল। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে এসে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্যে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম। টালিগঞ্জের চণ্ডীতলায় শেষ পর্যন্ত একটা আস্তানা আমার জুটে গেল।

মা প্রথমে ছাড়তে চাননি। বলেছেন, 'কেন তুই যাবি সরোজ ? বাড়িতে তোর অসুবিধাটা কী হচ্ছে শুনি ? এখানেও তোর আলাদা ঘর আছে। যত খুশি তুই পড়াশুনো করতে পারিস। এখানেও সংসারের বাতাস তোর গায়ে লাগে না। যত ঝামেলা তো আমিই পোহাই। তুই তো টাকা কটা এনে দিয়েই খালাস। কী এমন অসুবিধে হচ্ছে এখানে ?'

হেসে বলেছি, 'কিছুই অসুবিধে হচ্ছে না মা। তোমার কাছে থাকতে অসুবিধে কিসের। অসুবিধে থাকার নয়, অসুবিধে যাতায়াতের। রোজ ট্রেনে এত সময় যায়। ভাবছি কটা দিন গিয়ে যদি কলকাতায় থাকি খানিকটা আমার সময়ও বাঁচে, আর কিছুটা চেঞ্জের মতও হবে। তাছাড়া হিমাংশুদা অত করে বলছেন। তাঁর বাড়িটা খালি থেকে থেকে একেবারে পোড়োবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি গিয়ে কিছুদিন থাকি ফের বসবাসের যোগ্য হবে।'

আমার ছোট বোন সুনন্দা বি· এ· পাশ করে বসে আছে। আমরা পাত্রের খোঁজ করছি। ও চাকরির খোঁজ করছে।

সে বলল, 'তুমি একা বাস করবে কেন দাদা ? তা হলে চল, আমরা সবাই মিলেই যাই ! অন্তত আমাকে নিয়ে যাও দাদা।'

বললাম, 'তাহলেই হয়েছে। আমি যাচ্ছি কটা দিন একটু নিরিবিলিতে থাকতে। তোমাকে নিয়ে গেলে আমার সেই নির্জন বাস মাথায় উঠবে। তুই তো একাই একশ। তারপর তোর আরো একশ সখী গিয়ে যখন তখন হানা দেবে।'

সুনন্দা বলল, 'হ্যাঁ, এই রাণাঘাট থেকে আমার সখীরা সেই টালিগঞ্জ যাবে তোমার ধ্যান ভাঙাতে। বয়ে গেছে তাদের। তুমি যেন কত বড় একজন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।'

তারপর মা আর ছোট ভাইদের আড়ালে সুনন্দা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, 'সত্যি করে বল তো দাদা, বউদি-টউদি একজন ঠিক করে ফেলেছ নাকি ? তার জন্যেই কি আলাদা বাড়ির

ব্যবস্থা !'

হেসে বলেছি, 'নিশ্চয়ই। তার জন্যেই তো। ঠিখানা তো দিয়ে যাচ্ছি। গিয়ে একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে দেখিস নিজেই অবাক হয়ে যাবি।'

মার আশঙ্কা অন্য রকম, 'তুই কি সংসার-টংসার ছেড়ে যাবি নাকি বাপু? একি তারই তোড়জোড়?'

তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'না মা। তেমন মনের অবস্থা এখনো হয়নি। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তাছাড়া সপ্তাহের শেষে তো একবার করে আসবই। এসে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। তারপর যদি একটু সুবিধে-টুবিধে সেখানে করতে পারি দরকার হলে তুমিও গিয়ে থাকতে পারবে।'

মা আর কোন কথা বললেন না। তিনি জানেন আমাকে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। বাবার অবর্তমানে আমিই এখন বাড়ির কর্তা। পরিবারে একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। বাবা বেঁচে থাকতেও মা কি আমার একরোখামির কথা জানতেন না?

কিন্তু সবাই আমাকে যতটা একগুঁয়ে বলে জানে আমি কি ততটাই একগুঁয়ে? আমিও যে ভিতরে ভিতরে কত দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জর তা হিমাংশুদার এই পুরনো বাড়িটায় এসে নতুন করে টের পেলাম।

বড় নয়, ছোটও নয়। মাঝাবি ধরনের বাড়ি। দোতলা। ওপরে নীচে চারখানা ঘর। দুদিকে রেলিং ঘেরা খোলা বারান্দা, ওপরে আলসে ঘেরা ঢালা ছাদ। শুনেছি কাঠা পাঁচেক জায়গা আছে। আশেপাশে এক সময় ফুলের বাগান ছিল। এখন ঝোপ জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমি প্রথম দিন সামান্য কিছু বইপত্র, বিছানা আর ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ নিয়ে হাজির হলাম। হিমাংশুদা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। তাঁকে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে গেল। এমন প্রসন্ন দর্শন দিব্যকান্তি পুরুষ আমি কমই দেখেছি। পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে বয়স। মাথার ঘন চুলের মধ্যে মাঝে মাঝে রুপালি রেখা ঝিকমিক করে। ছিপছিপে দীর্ঘ চেহারা লম্বাটে ধরনের মুখ। টানা নাক চোখ। গায়ে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। ধুতি কখনো খদ্দরেরও পরেন, কখনো মিলেরও পরেন। তবে মিহি নয় মোটা। বুক পকেটে ছোট ডায়েরি আর সস্তা দামের মোটা একটা পাটকেলে রঙের কলম। এই তো বেশবাস। কিন্তু এতেও ওঁকে এত সুন্দর দেখায়। শুনেছি প্রথম যৌবনে একাধিক মেয়ে ওঁর প্রেমে পড়েছিল। বিচিত্র কিছু নয়। আমি বছর দুই কৃষ্ণনগর কলেজে ওর ছাত্র ছিলাম। তখন ছেলেদেরও দেখেছি অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে। গোপন করব না সে দলে আমিও ছিলাম। আমি অবশ্য ওঁর গুণেরই বেশি অনুরাগী। কিন্তু আমার কখনো কখনো মনে হয় রূপের অনুরাগ আরও তীব্র, আরও প্রত্যক্ষ, আরও সান্নিধ্যকামী।

হিমাংশুদা কিন্তু বেশিদিন অধ্যাপনা করলেন না। কয়েক বছর পরেই ছেড়ে দিলেন।

ছাড়লেন কেন একবার জিজ্ঞেস করে দেখেছি। অনেক কথার জবাবেই তিনি হেসে চুপ করে থাকেন। একথার জবাবে তিনি একবার বলেছিলেন, 'দূর অত বাঁধাবাঁধি ভালো লাগে না। কোন বন্ধনই যখন মানলাম না, চাকরির বন্ধনই বা কেন।'

চাকরির বন্ধন না মেনে উনি পারেন। আমার মত পরিবার পালনের দায়িত্ব ওঁকে স্বীকার করতে হয় না। পৈতৃক বিত্তসম্পত্তি ওঁর এখনো যা আছে তার আয়ে ওঁর একার বেশ চলে যায়। হয়তো উদ্বৃত্তও থাকে। আবার শুনেছি সে টাকা তিনি নেন না। নিজের খরচ তিনি নিজের রোজগারেই চালান।

আসলে আমার মনে হয় হিমাংশুদার আপাত শান্ত প্রকৃতির মধ্যে একটি অস্থির চিত্ত বাসা বেঁধে আছে। সেই চিত্তের অস্থিরতা তাঁর এই চণ্ডীতলার বাড়িটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও দেখেছি। অবশ্য আমি নিজে থেকে আলোচনা করিনি। তিনি করেছেন। কখনো বলেছেন, এ বাড়িতে তিনি একটা অবৈতনিক স্কুল করবেন, কখনো বলেছেন, লাইব্রেরী আর রিডিং-রুম হবে। কখনো বা মেয়েদের জন্যে তাঁতের কাজ কি আরো কোন না কোন হাতের কাজ নিয়ে তিনি জল্পনাকল্পনা করেছেন। আর একবার কার যেন রোগযন্ত্রণা চাক্ষুষ দেখে এসে এ বাড়িতে ছোটখাটো একটি হাসপাতাল খোলা নিয়েও কাগজে কলমে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

আসলে আমি যতদূর ওঁকে চিনেছি, তিনি ওই কাগজ-কলমেরই মানুষ। হাতে কলমে তাঁকে দিয়ে কিছু হবার নয়।

তাই বাড়িটাকে তিনি বছরের পর বছর একটি বুড়ো মালির হেপাজতে ফেলে রেখেছেন। ভাড়াও দেননি, বিক্রিও করেননি। নিজে এসে যে বসবাস করবেন তাও না। ফলে বাড়িটা বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। বহুদিন চুনকাম করা হয়নি। দেয়ালগুলিতে নোনা ধরেছে। আর হয়তো কিছুকাল বাদেই ভুতুড়ে বাড়ি বলে এ বাড়ির অপবাদ রটত।

আমরা রাণাঘাটের তিনখানা ঘরের ভাড়াটে বাড়িতে ঠাসাঠাসি করে থাকি। আমাদের বাড়তি এক ফোঁটা একটু জায়গা জোটে না। আর হিমাংশুদা এত বড় বাড়িটা উঁই ইঁদুর আর চামচিকের বাসরঘর করে রেখে দিয়েছেন। আমি একদিন হাসতে হাসতে তাঁকে বলেছিলাম।

হঠাৎ হিমাংশুদা বললেন, 'তুমি আসবে? এসে থাকবে কিছুদিন? না না সপরিবারে নয়—একা। তাহলে আমিও মাঝে মাঝে এসে থাকতে পারব। বেশ হবে। দুজনে মিলে লিখব, পড়ব। আলাপ-আলোচনা হবে। তারপর এ বাড়ির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছু একটা ঠিক করে ফেলা যাবে।'

শুনে আমি খুশি হলাম। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে আসবার জন্যে আমার মন কিছুদিন বড় উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সাময়িকভাবে আমি হোটেল মেসের ঘর ভাড়া করেও থাকতে পারি। কিন্তু সেখানেও তো ভিড়। স্বজন পরিজনদের আমি ভালোবাসি। বাইরের লোকজনও যে আমি অপছন্দ করি তা নয়। তবু নির্জনতাই আমার প্রিয়। আর তার ফাঁকে ফাঁকে মনের মত একজন কি দুজন।

সেই দু একজনের মধ্যে আমি হিমাংশুদাকেও ধরি। ওঁর সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান সতের আঠার বছরের। অবস্থার ব্যবধান অনেক। রুচি আদর্শেও যে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিল তা নয়। তবু যে পরিমাণ মিল ওঁর সঙ্গে আমার আছে তাকে ঠিক তিল পরিমাণ বলা চলে না। আমিও এমন একটা বয়সের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি, যে বয়সে কথা বলার বন্ধুই বন্ধু। মনের কথা সবাইকে বলা যায় না। সকলের কথা মন দিয়ে শোনাই কি যায়?

অসম বয়সের আমাদের এই বন্ধুত্ব অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় আমি যখন ওঁর ছাত্র ছিলাম তখন বলতাম স্যার। তারপর কলেজ ছেড়ে দিয়ে তিনি একদিন নিজে থেকেই বললেন, 'ওই স্যারটি এবার ছাড়ো।'

তবু ওঁকে হিমাংশুদা বলে ডাকতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। আমি যাকে তাকে যখন তখন আত্মীয় সম্বোধনে বাঁধতে পারিনে। অনেকে দেখি পারেন। যাঁর সম্বন্ধে মনে আত্মীয়তা বোধের লেশও নেই তাঁকেও দাদা বলতে বাধা কি। আমি তা পেরে উঠিনে। এমন কি হিমাংশুদার সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশ্যে আমি দাদা বলি। কিন্তু সামনে কেমন আটকে যায়।

যতদূর জানি হিমাংশুদাও আমারই মত নির্জনতা-প্রিয়, নিঃসঙ্গ মানুষ। তিনিও সহজে কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেন না, কাউকে অন্তরঙ্গ হতে দেনও না। জানিনে আমাকে কেন তিনি তাঁর অত কাছে আনতে গিয়েছিলেন। গত পনের বছর ধরে এমন সপ্তাহ যায়নি, যে সপ্তাহে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছি। হয় দেখা সাক্ষাৎ নয় টেলিফোনে কথাবার্তা না হয় চিঠিতে কুশল বিনিময় হয়েছে।

সম্পর্কের এই অবিচ্ছিন্নতার আনন্দ আমরা সাধারণত মনে রাখিনে। নিত্য অভ্যস্ততা আমাদের বিস্ময়বোধকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়; দিয়ে হয়তো ভালোই করে। নইলে প্রতি মুহূর্তের বিস্ময়কে আমরা সহ্য করতে পারতাম না। প্রতি মুহূর্তে আমরা বিস্মিত হতে চাইনে, সহজ স্বাভাবিক প্রসন্ন প্রাপ্তির রসে ডুবে থাকতে চাই।

আমি কখনো কখনো অবসরক্ষণে এইসব সম্পর্কের কথা ভাবি। দ্বেষবিদ্বেষ বৈরিতার সম্পর্কও সম্পর্ক। কিন্তু সেগুলি আসলে শব্দগত সম্পর্ক। সম্পর্কের অভাবব্যঞ্জক শব্দ। স্নেহ প্রীতি, শ্রদ্ধা, প্রেমে আমরা যাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, হৃদয়রসে সিক্ত সেইসব বন্ধনই আসলে আমাদের মুক্তি দেয়। অহংকারের কারাগার থেকে মুক্তি।

আমি মাঝে মাঝে এইসব বন্ধনের কথা ভাবি। পারিবারিক বন্ধন, পারিবারিক গণ্ডির বাইরের বন্ধন। আমি যদি গল্প উপন্যাসের লেখক হতাম এই একেকটি বন্ধনের কথা নিয়ে একেকটি উপন্যাস লিখতাম। একেকটি সম্পর্কের ধারাকে অনুসরণ করে যাওয়া কি সহজ নাকি ? এদের উৎপত্তি বিকাশ ক্ষয়, এদের দৈনন্দিন জোয়ার ভাঁটা, প্লাবন, ক্ষীণতা লয় কখনো মনের গোচরে কখনো বা অগোচরে বইতে থাকে। এই স্রোতস্বতী কখনো আমাদের সমুখ দিয়ে চলে, কখনো বা অন্তঃশীলা হয়ে বয়। তখন তার সব লীলা অপ্রকট। আমি যাঁদের নিয়ে লেখার কথা ভাবি, মনে মনে লিখি, হিমাংশুদা তাঁদের একজন।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে করে আমরা এক সঙ্গে চণ্ডীতলায় এলাম। বড় একটা তালা ঝুলছে সদর দরজায়। তিনি তার মোটা চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও খোল! দ্বার খোল। এ বাড়ি এখন তোমার।'

আমি লজ্জিতভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কী যে বলেন। আপনি হলেন বাড়ির মালিক। আমি অতিথি।'

তিনি হেসে বললেন, 'তুমি অতিথি আর আমি বুঝি মস্তরকমের গৃহী ? আমিও তো বাইরের মানুষ। পথে পথে কাটাই। স্বত্বটা দুভাবে আসে। যে তৈরি করে সে বলতে পারে বাড়ি আমার কিংবা যে বাস করে সেও বলতে পারে বাড়ি আমার। কোনদিক থেকেই আমি সে দাবি করতে পারিনে। আমি না নির্মাণকারী, না বসবাসকারী।'

আমি তাঁর কথায় কান না দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। নিজেকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক মাঝে মাঝে পেয়ে বসে হিমাংশুদাকে। তিনি নিজের গুণপনাও অস্বীকার করেন, নিজের আসবাবপত্র বিষয়সম্পত্তির ওপর নিজের মালিকানাকেও পুরোপুরি স্বীকার করেন না। তাঁর অনেক জিনিস হারিয়ে গেছে, অনেক মূল্যবান বস্তু নষ্ট হয়েছে, বহু দামি দামি বই তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের দখলে রাখতে পারেননি।

আমি অনুযোগ করায় তিনি হেসে বলেছেন, 'কী করব বল, আমার স্বভাবের মধ্যে রক্ষণশীলতা নেই।'

আমি যতদূর তাঁকে চিনেছি রক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর নেই তা নয়, কিন্তু তাঁর মধ্যে রক্ষা করবার ক্ষমতার অভাব আছে। এই অভাব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম, কোন কোন ঘরে একটি করে তালা লাগানো, কোন ঘরে বা শুধু শিকল টানা।

হিমাংশুদা আমাকে দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটির ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বললেন, 'বাড়ির মধ্যে এইখানাই সবচেয়ে সেরা। পুব দক্ষিণ খোলা। তুমি এই ঘরটিতেই থেকো।'

আমি বললাম, 'সবচেয়ে ভালো ঘরে তো আমার দরকার নেই হিমাংশুদা। আমার কোনরকম একখানা ঘর হলেই হল।'

তিনি বললেন, 'ব্যবস্থাটা কে করবে শুনি! তুমি না আমি ?'

আমি বললুম, 'আপনি।'

তিনি হেসে বললেন, 'না হে তুমি তুমি তুমি। তুমিই সব ব্যবস্থা করবে। আমি শুধু এই ব্যবস্থাটুকু করে দিলাম তুমি এ ঘরে থাকবে। আমি পাশের ঘরে।'

হেসে বললাম, 'বেশ।'

তিনি বললেন, 'আমি যে একটানা এখানে থাকব তা কিন্তু ভেব না। মাঝে মাঝে এসে তোমাকে সঙ্গ দিয়ে যাব। একটানা এক জায়গায় থাকা আমার পোষাবে না। তাহলে তো ঘর সংসারই করতে পারতাম। ভালো কথা, তোমার সংসার করবার কী হল। এবার আর কি। বাড়িঘরের ব্যবস্থা তো মোটামুটি হল। এবার বিয়ে থা করে ফেল।'

হেসে বললাম, 'আপনি নিজে তো ও পথ মাড়ালেন না। এখন আমাকে বলছেন বিয়ে করতে ?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ বলছি। এরপর যত দিন যাবে তত হিসেবী হবে। বিয়ে করে লাভ হবে কি

হবে না, সুখী হতে পাববে কি পারবে না সেই চুলচেরা হিসেব করতে থাকবে। হিসেব করতে করতে চুল পেকে যাবে। বিয়ে করা আর হয়ে উঠবে না।'

আমার মনে হল হিমাংশুদা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার থেকে এ সব কথা বলছেন।

একটু হেসে বললাম, 'আজকাল তো কেউ কেউ পাকা চুলেও বিয়ে করেন।'

হিমাংশুদা বললেন, 'তাঁরা কাঁচা কাজ করেন।'

বিয়ের প্রসঙ্গ সেদিনকার মত সেখানেই শেষ হল।

আমরা ঘরদোর পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম।

হিমাংশুদা নিজে অবশ্য কিছুতে হাত লাগালেন না। তিনি কিছু করতে পারেন না, আমরাও তাঁকে কিছু করতে দিইনে।

বুড়ো মালী রাম আধারকে ডাকলাম সাহায্যের জন্যে। সে এসে ঝেড়েঝুড়ে যতটা পারে পরিষ্কার করল। সেদিন রবিবার। অফিস ছুটি। সারাটা দিন আমার গোছগাছ করতেই কাটল। হিমাংশুদা বই নিয়ে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইলেন। আমি কিন্তু আশা করেছিলাম তিনি অন্তত একবার আসবেন। ভদ্রতা করেও কিছু না কিছু করতে চাইবেন। অন্তত মুখে কিছু উৎসাহ দেবেন।

কিন্তু তেমন কিছুই হল না। আমি যে খুব প্র্যাকটিকাল তা নয়। তবু নিজের কাজটা কোনরকমে চালিয়ে নিতে পারি। অন্যের ওপর নির্ভর করতে আমার সঙ্কোচ হয়। কিন্তু হিমাংশুদা অন্য প্রকৃতির মানুষ। তিনি নিজের হাতে কিছুই করতে পারেন না। ছোটখাটো সব ব্যাপারেই তাঁকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এমন মানুষ বিয়ে না করে আছেন কী করে আমি মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই।

প্রথম দিনকয়েক আমি নিজেই রান্না করলাম। রাম আধার সব জোগাড় টোগাড় করে দিল। ওর পাকা চুল, পাকা গোঁফ। অনেক দিন বাংলা দেশে আছে। বাংলা বলতে পারে, বাংলা রান্না রাঁধতেও পারে। ও বলল, 'বাবু আমার হাতে যদি খান আমি রেঁধে দিই।'

বললাম, 'পরে খাব। কিছুদিন স্বপাকে খেয়ে দেখি।' নিজে রাঁধি বলে তা যে খুবই সুস্বাদু হল সে কথা বলছিনে। তবে খাওয়া চলে। কিন্তু হিমাংশুদার দেখলাম খেতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

আমি বললাম, 'কী হল হিমাংশুদা ? আপনি যে কিছুই খেলেন না।'

তিনি বললেন, 'আমি ওই রকমই খাই।' তারপব একটু হেসে বললেন, 'সরোজ, তুমি জাতে বামুন হলেও রান্নার কাজটা তোমাকে দিয়ে চলবে না। এর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।'

আমি ভিতরে ভিতরে একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। কিন্তু হেসেই জবাব দিলাম, 'তা ঠিক। জাতে বামুন হলেও রান্নাটাকে পেশা হিসেবে প্র্যাকটিশ করিনি। তাহলে হয়তো কিছু বাড়তি উপার্জন কবতে পারতাম। কিন্তু কেন খারাপ লাগছে বলুন তো ? ডাল তরকারিতে নুন কম হয়েছে না ঝাল বেশি হয়েছে ? কী খারাপ হয়েছে বলুন তো ?'

হিমাংশুদা তা বলতে পারলেন না।

ঠাকুর চাকর অবশ্য রাখা যায়। কিন্তু হিমাংশুদা যদি স্থায়ীভাবে এখানে বাস না করেন এসটাবলিশমেন্ট খরচ বাড়িয়ে লাভ কি। ওঁর না হয় কোন সংসারই নেই ; কিন্তু বিয়ে না করলেও আমার যে ইতিমধ্যে দুটি সংসার হয়ে পড়েছে। একটি সংসার রাণাঘাটে আর একটি সংসার এই আঘাটার চণ্ডীতলায়। ওঁর নিশ্চয়ই সঞ্চিত অর্থ আছে, কিন্তু আমার যে মাসমাইনের গোণা পয়সা।

হিমাংশুদা আমাকে কৃপণ ভাবলেন কিনা কে জানে। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি ওঁর কাছ থেকে আমি যা নেব তা নিতান্তই পারমার্থিক ; আর্থিক সাহায্য পারতপক্ষে নেব না। আমি যে ওঁর বাড়িতে আছি সে আশ্রয়টা নিছক পারমার্থিক আশ্রয় নয় এ কথাটা আমি তখনকার মত ভুলে গেলাম।

কয়েকদিন বাদে হিমাংশুদা বললেন, 'সরোজ, আমি ফেব লালবাগ যাচ্ছি। যোগেশ খবর পাঠিয়েছে, ওর প্রেসে আবার নাকি কি গোলমাল হয়েছে। দেখে আসি গিয়ে।'

মুর্শিদাবাদে ওঁর এক বন্ধুর প্রেস আছে। সেই প্রেসের উনি অবৈতনিক ম্যানেজার। আমি তা

জানি। সেখানে গঙ্গার ধারে ওঁর ছোট একটি বাসা আছে। সেই বাসায় আমি কতবার গিয়েছি, তাঁর বাইরের ঘরের তক্তপোষে মুখোমুখি বসে ঘন্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি। সাহিত্য দর্শন অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে অবাধে আসাযাওয়া করেছি। কখনো বা নিঃশব্দে গঙ্গার ধারে ধারে হেঁটে বেড়িয়েছি : কখনো বা দাঁড়িয়ে পড়ে পালতোলা নৌকোর সারি ভেসে যেতে দেখেছি।

কিন্তু একই বাড়িতে দুদিনের জন্যে দুজনের যৌথ পরিবারে আমরা যখন আবদ্ধ হলাম আমাদের সেই আসর যেন আর জমল না। বেশ বুঝতে পারলাম, কোথায় যেন খিচ ধরে গেছে। আমরা পরম বস্তু ছেড়ে নিতান্তই ক্ষুদ্র বস্তুতে নেমে এসেছি।

তাই হিমাংশুদা কদিনের জন্যে যখন আমার চোখের আড়ালে গেলেন, বলতে কি আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ওই একজনই যেন আমাকে জনতার ভিড় দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। অথচ আমি নির্জনতার সন্ধানে এসেছি। ঘরের একটি কোণ বেছে নিয়ে নিজের মুখোমুখি বসবার জন্যে এসেছি। আমি বলতে বলতে এসেছি 'মন চল নিজে নিকেতনে।'

সে নিকেতন কি হিমাংশুদার এই চণ্ডীতলার পোড়োবাড়ি ?

হিমাংশুদা অবশ্য যাওয়ার আগে মৃদু হেসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সরোজ, তোমার ভয় করবে না তো ?'

'ভয় কিসের ?'

'একা একা এই বাড়িতে থাকতে।'

হেসে বললাম, 'ভয় তো এক চোর ডাকাতের। তারা আমার কী নেবে ? আর ভূতপ্রেতের ভয়টা ছেলেবেলায় ছিল। এখন আর নেই।'

হিমাংশুদাও হাসলেন, 'ওহে, তোমাদের মত যুবকদের ভূতের ভয়ের চেয়েও আরও একটা অলৌকিক কি আধালৌকিক ভয় আছে। পরীর ভয়, কিন্নরীর ভয়।'

আমি চুপ করে রইলাম। হিমাংশুদার কথাবার্তায় আজকাল আদিরসের স্বাদ আর সৌরভ প্রায়ই এসে মিশে থাকে। অবশ্য তাঁর রসিকতা কখনো স্থূলতায় আক্রান্ত হয় না। তা প্রায় সবসময় সূক্ষ্ম এবং মৃদু। তবু ইদানীং তাঁর কথায় আদিরসের ভিয়েনের যে আধিক্য ঘটেছে তা লক্ষ্য করি।

হিমাংশুদা বললেন, 'ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি তখনকার দিনে সুদর্শন ছেলেদের পরীতে পেত। নির্জন কোন জায়গায় নদীর ধারে, পাহাড়ের কোলে কি কোন খালি বাড়িতে সুন্দর কোন ছেলেকে দেখলে সুন্দরী পরী বিচিত্র বর্ণের দুটি ডানা মেলে সেখানে উড়ে আসত। ঠাকুরমা বলতেন, তারপর সেই পাখায় করে ছেলেটিকে সে উড়িয়ে নিয়ে যেত। নিয়ে গিয়ে নাকি রসগোল্লা, সন্দেশ আর মোহনভোগ খাওয়াত। শুনতে শুনতে আমার জিভে জল আসত। আমি সেই বুড়ী ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরে বলতাম, ঠাকুরমা তুমি কবে পরী হবে ? তিনি বলতেন, কথা শোন ছেলের। আমি এ জন্মে আর পরী হব না রে। পরজন্মে পরী হয়ে আসব তোর ঘরে।'

হিমাংশুদা হাসতে হাসতে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন। সেই হাসির মধ্যে কি তেমন উজ্জ্বলতা ছিল ? তাঁর হাসি যেন অন্য কোন বিষাদ আর ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র।

হিমাংশুদার ঠাকুরমা মরে যাওয়ার পর ফের কী হয়ে জন্মেছেন জানিনে, কিন্তু নাতবউ হয়ে আর জন্মাননি। হিমাংশুদা যথাকালে বিয়ে করলেই পারতেন। তাঁর মত পাত্রের ঘরে নিশ্চয়ই একাধিক কনের বাপ আসা যাওয়া করেছেন। প্রথম যৌবনে মধ্য যৌবনে হিমাংশু গুহরায়ের রূপগুণের খ্যাতি কিছু কম ছিল না। ধীরে ধীরে কেন যেন তিনি নেপথ্যে সরে গেলেন। ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো আমার কম নয়। তবু আমি সে রহস্য উদ্ধার করতে পারিনি। খুব যে চেষ্টা করেছি তাও নয়। আমি নিজের প্রাইভেসি যেমন রাখতে চাই, অন্যের প্রাইভেসিকেও তেমনি সম্মান দিতে চেষ্টা করি। অন্তরঙ্গ বন্ধুরও সব গোপন কক্ষে হানা দিতে নেই। কোন কোন মহলে তাকে একাকী থাকতে দিতে হয়। সেই নিঃসঙ্গতায় নির্বাসনের দণ্ড পুরস্কারের স্বাভাবিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করতে নেই।

এই কদিনে মনের কোণে যে মালিন্যটুকু জমে উঠেছিল যাওয়ার সময় হিমাংশুদা তাঁর স্নিগ্ধ হাসি পরিহাসে সব যেন ধুয়ে মুছে দিয়ে গেলেন। তিনি যে শারীরিক কষ্টের জন্যেই কিছুদিনের জন্যে

এখান থেকে পালালেন আমার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ছেলেবেলা থেকে সচ্ছল অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছেন। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট তিনি সইতে পারেন না। যে ঠাকুরমার গল্প হিমাংশুদা মাঝে মাঝে করেন তিনিই হয়তো তাঁকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখে গেছেন। যিনি নিজের বিছানাটুকু পাততে পারেন না, মশারিটা টাঙাতে পারেন না, দু টাকার জিনিস বাজার থেকে কিনে আনতে হিমসিম খেয়ে যান, সেই জগন্নাথের চেয়ে সংসারে বড় অনাথ আর কে আছে। তাঁর অপটুতা ফের আমার কাছে সস্নেহ প্রশয় পেল। একদিন তিনি যে শারীরিক কষ্ট পেয়েছেন তার জন্যে আমি মনঃকষ্ট ভোগ করলাম।

গোটা বাড়িটা আমার একার দখলে। আমি ইচ্ছা করলে এখন প্রহরে প্রহরে ঘর বদলাতে পারি। এ ঘরে খাব, ও ঘরে ঘুমোব, সে ঘরে পড়ব, আর এক ঘরে বসে ভাবব। সে-ভাবনা কখনো ঘরের ভাবনা, কখনো বাইরের ভাবনা।

কিন্তু তেমন করে যেন মন বসে না। কেমন যেন খালি খালি মনে হয়। মা আর ভাইবোনদের কথা মনে পড়ে। রাণাঘাটের সেই ছোট্ট বাসাটুকু বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয় আমি যেন মাকে ছেড়ে বহু দূরে কোন প্রবাসে এসেছি। আর সেই নিজের বাসায় ফিরে যেতে পারব না। আশ্চর্য, মনের এই কাতরতা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই।

একা বাড়িতে থাকতে আমার যে কোন ভয় আছে তা নয়। আমার চোরের ভয় নেই, ভূতের ভয় নেই, হিমাংশুদা যে ভয় দেখিয়ে গেছেন সেই পরীর ভয়ও আমি করিনে। প্রথম তারুণ্য আমি পার হয়ে এসেছি। গাঢ় যৌবনের উদ্দামতাও অতিক্রান্ত। অতিক্রান্ত বলছি, কোনদিনই কি তেমন উদ্দামতা আমার ছিল? কি বিষয় সম্পত্তি কি প্রভাব প্রতিপত্তি, কি মনোরমা নারী, কোন কিছু সম্বন্ধেই উগ্র আসক্তি আমি অনুভব করিনি। তাই বলে নারী সম্বন্ধে যে আমি উদাসীন, কি আমি নারীবিদ্বেষী তা নয়। কী করে তা হব। আমি মাকে ভালোবেসেছি বোনকে ভালবেসেছি, পিসীমা, মাসীমা জ্যেঠীমা মাসীমাদের স্নেহের স্বাদ পেয়েছি ; পিসতুতো মাসতুতো বোনদের সঙ্গে স্নেহপ্রীতি সৌখ্যের বন্ধন স্বীকার করেছি। জীবনে মেয়েদের স্থান পুরোপুরি অস্বীকার করি কী করে? কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়েও মেয়েরা আমার কাছে একেবারে অপরিচিতা ছিল না। দরকার মত তাদের কারো কারো সঙ্গে কথা বলেছি, চায়ের টেবিলে আলাপ করেছি, তর্ক করেছি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি তারাও কেউ এগোয়নি, আমিও এগিয়ে যাবার গরজ দেখাইনি। আমার সেই সহপাঠিনীর দল নিশ্চয়ই এখন স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার করছে। তাদের কারো সঙ্গে যদি হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায় হয়তো পুরোপুরি চিনতেও পারব না। নাম মনে পড়বে তো মুখ মনে পড়বে না, মুখ মনে পড়বে তো নাম মনে পড়বে না।

বিয়ে করি কি না করি, নারীকে আমি তার যথাস্থানে রাখবার পক্ষপাতী, অযথা তাকে নির্বাসনেও পাঠাতে চাইনে, আবার সব বিলিয়ে দিয়ে তাকে সিংহাসনে ওঠাতেও আমি রাজি নই।

হিমাংশুদা চলে যাওয়ার পর আমি মালীকে নিয়ে এ বাড়ির সংস্কারে হাত লাগালাম। আগাছার জঙ্গল নিজের হাতে সাফ করে ফেললাম। শুধু ফুলের গাছগুলি রইল। কামিনী, গন্ধরাজ, যুঁই শিউলি। আমার উৎসাহ দেখে রাম আধার কিছু নতুন ফুলের চারা এনে লাগিয়ে দিল। আমি যেখানে থাকি পরিচ্ছন্নভাবে থাকি। সেই পরিচ্ছন্নতা আমার নিজের সৃষ্টি। আমার মনে হয় বাইরের পরিচ্ছন্নতা মানুষের অন্তরের পবিত্রতার প্রতীক।

দেখতে দেখতে বাড়ি আর বাগান আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে ফেলল। আশ্চর্য মমতা। আমি অফিসে যাই, কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে এই বাড়ির মধ্যে। আমার চাকরি সারভে অব ইন্ডিয়া অফিসে। ভারত সমীক্ষণ আমাকে করতে হয় না। পাবলিসিটি আর পাবলিকেশন বিভাগে আমার চাকরি।

আমার নিজের কর্তব্যটুকু সেরে মনে মনে আমি এই বাড়ির সারভে করি। বাড়িটার অয়্যারিং খারাপ হয়ে গেছে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নতুন করে দরকার। আমি শুধুওপরের কালিঝুলি সাফ করছি। কিন্তু বহুদিন এ বাড়ির চুনকাম হয়নি। হোয়াইটওয়াশটা না করিয়ে নিলেই নয়। এখানে ওখানে

ফাটল ধরেছে। জানলা দরজাগুলি সব অক্ষত অবস্থায় নেই। সব মেরামত করা দরকার। রাণাঘাটে আমি যে ভাড়াটে বাড়িতে থাকি সে বাড়িও আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। বাড়িওয়ালা অনেক দূরে থাকেন। তিনি কম ভাড়ার ভাড়াটের জন্যে আর বেশী পয়সা খরচ করতে চান না। আমি তাঁকে তাগিদ দিয়ে দিয়ে হয়রান হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের খরচেই হোয়াইটওয়াশ করিয়ে নিই। কাঠমিস্ত্রী ডেকে ভাঙা জানলা দরজা সারাতে বসি।

মা বলেন, 'তোর মত বোকা তো আর দেখিনি। পরের বাড়ির জন্যে এমন করে পয়সা খরচ করছিস কেন।'

আমি জবাব দি, 'কী করি বলো। বাইরে থেকে কেউ যখন আসবে সে তো আর বাড়িওয়ালাকে দেখবে না। যারা বাড়িতে বাস করে তাদেরই দেখবে। আমি যেমন-তেমন করে দায়সারা ভাবে বাঁচতে চাইনে। বাড়িটাই না হয় ভাড়া করেছি, জীবনটা তো আর ভাড়া করা নয়।'

মা বলেন, 'কী জানি বাপু, তোর যুক্তি আমি বুঝিনে। নষ্ট করবার মত অত টাকা কি আমাদের আছে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—'

সুনন্দা ঠাট্টা করে বলে, 'দাদা পরিচ্ছন্নতা পরচ্ছিন্নতা করেই গেল। এদিকে তো দেখি ঘরের কোণে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বাইরের দিকে তোমার তাকাবার কী অত দরকার।'

আমি ভাবি বাইরের দিকে না তাকালে কি চলে? অন্তরটা যেমন আমার, বাহিরটাও তেমনি আমারই। আমি ভিতরে বাইরে সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই। আমি ছবি আঁকতে পারিনে, গান গাইতে পারিনে, কবিতা লিখতে পারিনে। যদিও আমার সাধ্যমত সবই উপভোগ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সৌন্দর্য সম্ভোগ, শুধু ছবি কবিতা আর সঙ্গীতের সীমায় আবদ্ধ থাকতে চায় না। শিল্পের সৌন্দর্যকে দিনযাত্রায়ও ছড়িয়ে দিতে চায়। আমি ভাবি আমার গৃহও একটি দেহ। আমার বৃহত্তর দেহ! আর পরিবার পরিজন আমারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

অফিসে আমার কয়েকজন সহকর্মী কী করে যেন আমার এই নতুন বাড়ির খবর টের পেয়ে গেছে। আমি সামনের টেবিলে সুশান্তকে বলেছিলাম। সেই আমার আড়ালে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ, বিশেষ করে নববিবাহিত সুশান্ত সেন, ওর উৎসাহের শেষ নেই, উল্লাস অফুরন্ত। সে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, 'টালিগঞ্জের বাড়িটা কিনে ফেললে নাকি হে?'

'কী যে বলো। বাড়ি কেনবার মত টাকা কোথায়?'

'তবে কি পেয়ে গেছ? কী সূত্রে বল তো? বৈবাহিক সূত্রে?'

হেসে বলি, 'আমি কি তোমার মত ভাগ্যবান? অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একই সঙ্গে পেয়ে যাব?'

সুশান্ত বলে, 'রাজকন্যা পেয়েছি। কিন্তু অর্ধেক রাজত্ব আর কোথায়? পণ নেওয়ার রেওয়াজ তো নেই। সালঙ্কারা কন্যা আর কিছু আসবাবপত্র ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু তোমার মতলবখানা কি বলতো সরোজ? বাড়িটায় কি একাই আছ?'

'তোমার কি মনে হয়?'

'আমার যা মনে হয় তা বলতে গেলে তুমি আমার মুখ চেপে ধরবে। যা একখানা পিউরিটান ছেলে তুমি। আমার তো ধারণা পুরো একজন পত্নী আনবার সাহস যাদের হয় না তাদের অন্তত দু একজন উপপত্নী টুপপত্নী থাকে। নইলে তারা বাঁচে কী নিয়ে?'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক উল্টো। যাদের পত্নী আছে তারাই একটু বয়স হলে ওইসব উপসর্গের দিকে ঝোঁকে। তুমি কিন্তু গোড়া থেকেই সাবধানে থেকো।'

সুশান্ত বলে, 'আমার কোন ভয় নেই। আমার ঘরে রক্ষাকবচ, বাইরে তুমি। রোজ সাধুসন্তের চরণামৃত পান করছি।'

'চরণামৃত!'

'আরে ওই হল। বচনামৃত। নাও এবার চা খাওয়াও।'

নতুন পাড়ায় এসে আমি কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি। ইচ্ছা করেই করিনি। আমি তো ভিড়ের মধ্যে বাস করতে আসিনি, আমি এসেছি কয়েকটা দিন নির্জনে কাটাব বলে। সেইজন্যেই স্বজনদের

কাছ থেকে পর্যন্ত দূরে সরে এসেছি।

অফিসের কেউ কেউ বিশেষ করে সুশান্ত আমার বাড়িতে আসতে চেয়েছে। বলেছি, 'যাক কটা দিন। বাড়িটা আগে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলি। তারপর তুমি সস্ত্রীক সেজে গুজে আসবে।'

অফিসের বাইরের দু-একজন বন্ধু আমার নতুন আস্তানায় এসে হানা দেবার ভয় দেখিয়েছে। আমি তাদের নিরস্ত করে বলেছি, 'পরে এসো। সময় হলে আমি তোমাদের নিজে থেকেই ডেকে আনব।'

তারা হতাশ হয়ে বলেছে, 'তুমি আর ডেকেছ।'

সুনন্দা আর বিশু যীশু আসবার জন্যে পাগল। আমি বলেছি, 'নিয়ে যাব, সময় হলেই তোদের নিয়ে যাব।'

সুনন্দা বলেছে, 'তুমি আর নিয়েছ। তোমার এই অজ্ঞাতবাসের হেতুটা কি বল দেখি। কাউকে ভালোটালো বেসেছে নাকি ?'

'বেসেছি।'

'কাকে ?'

'আপাতত চণ্ডীতলার ওই বাড়িটাকে।'

'আমার মনের কথা বলেছ দাদা। বাসায় এসেও ওই বাড়ি আর বাড়ি। মাথার মধ্যে তোমার এখন আর বাড়ি ছাড়া কিচ্ছু নেই। লেখাপড়া কিছু হচ্ছে বলে তো মনে হয় না।'

বোনের গঞ্জনা আমি চুপ করে শুনি।

পড়াশুনোর দিকে খেয়াল আমার আছে।

আমি সাধ্যমত তাতে ত্রুটি ঘটতে দিইনি। তবে বাড়িটা যে আস্তে আস্তে আমাকে দখল করে নিচ্ছে তা অস্বীকার করি কী করে। আমি নিজেকেই নিজে মাঝে মাঝে শাসন করি। না না, এত আসক্তি ভালো নয়। আমি কোন কিছুর বন্ধন স্বীকার করতে চাইনে, শেষে কি কতকগুলি ইঁটকাঠের বাঁধনে বাঁধা পড়ব ?

সুনন্দা হাসতে হাসতে বলল, 'লোকে বলে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তোমার বেলায় দেখছি তার উল্টো।'

'মানে গৃহই আমার গৃহিণী ?'

'তাই তো দেখতে পাচ্ছি।'

হেসে বলি, 'কী করব বল। আমার জন্যে আসল একজন গৃহিণী আনবার গরজ তো তোদের নেই।'

'বাঃ রে, দোষ বুঝি আমাদের। নিজে ধনুর্ভাঙা পণ করে বসে আছ।'

পণটা যে কিসের তা আমিও নিজেও ভালো করে জানি নে। সে কথা জানবার জন্যেই আমি এই নিরালায় চলে এসেছি। আমি ভবিষ্যতে কী করব, জীবনটাকে কোন আকারে গড়ব তার জবাব আমাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে।

চণ্ডীতলায় আমি নিজে যেচে কারো সঙ্গে আলাপ না করলেও কারো কারো সঙ্গে মোটামুটি সাধারণ আলাপ পরিচয় অমনিতেই হয়ে গেল। যেমন রেশনের দোকানের মালিক, বাজারের আলুওয়ালা, মাছওয়ালা, সেলুনের সবজান্তা পরামাণিক, শুক্লা লন্ড্রির স্বত্বাধিকারী মাণিক দাস এমনি আরো অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল। তাদের কারো কারো নাম জানি, অনেকেরই জানিনে। জানবরার দরকারও বোধ করিনে। তাদের কেউ আমার মুখ চেনা, কেউ শুধু বৃত্তিতে চেনা, কাউকে বা আমি শুধু আমার প্রয়োজন দিয়ে চিনে রেখেছি।

ইতিমধ্যে দাম্ভিক অসামাজিক অহংকারী বলে আমার বদনাম রটে গেছে। তা আমার পড়শীদের চোখ মুখের ভাবে বুঝতে পারি। তাদের কিছু কিছু কাথাবার্তাও যে কানে না যায় তা নয়। কারো ধারণা আমি বাতিকগ্রস্ত, আমার মাথার ঠিক নেই। কারো ধারণা আমি সেয়ানা পাগল। কেউ কেউ ভেবে রেখেছেন, আমি কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্যে এখানে বাসা বেঁধেছি। কেউ কেউ কানাঘুষা করেন আমি বিদেশী রাষ্ট্রের স্পাই।

নিজেকে এমন রহস্যজালে আবৃত মাঝে মাঝে দেখতে মন্দ লাগে না। আমি যা নই লোকে আমাকে তাও ভেবে রেখেছে। নিতান্ত চোর ডাকাত ভেবে মারপিট শুরু না করলে তাদের এই ধারণা কৌতুকের খোরাক দেয়।

কিন্তু সেদিন এক ভদ্রলোক সরাসরি আমার সঙ্গে আলাপ করে আমার রহস্যের জালাবরণ ভেদ করে ফেললেন। বিকেলের দিকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাস থেকে নেমে ছাতা মাথায় আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি, আমার পাশাপাশি কালো মোটাসোটা আরো এক ভদ্রলোকও হাঁটছেন। তিনি একা নন। তাঁর ছাতার নীচে একটি মেয়েও আসছে সঙ্গে সঙ্গে। তার গায়ের রঙও কালো। তবে ছিপছিপে লম্বা গড়ন। টানা নাকচোখ। একে আমি চিনি। মানে মুখ চিনি। অফিসে যাতায়াতের সময় বাসে ট্রামে এই মেয়েটিকে আমি প্রায় রোজই দেখি। আমি যখন সহযাত্রীদের ভিড় ঠেলে আমার অফিসের সামনে নেমে পড়ি ও তখনো বসে থাকে। ওর অফিস বোধহয় আরো দূরে। এসপ্লানেডে কি ডালহৌসী স্কোয়ারে কোথায় ঠিক জানিনে।

দূর থেকে দেখা সহযাত্রিণীকে আজ একেবারে খুবই কাছে থেকে দেখলাম। স্মিতমুখে সে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি চোখ ফেরাতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখোচোখি হল। মাথায় ছোট ছোট চুল। গায়ে মোটা শাদা রঙের কোট।

তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, 'নমস্কার। আমাব নাম জগদীশ ভদ্র।' বলে একটু থামলেন। হয়তো ভাবলেন শুধু নাম শুনেই আমি ওঁকে চিনতে পারব। কিন্তু এ নাম আমার কাছে শ্রুতপূর্ব বলে মনে হল না।

তিনি তা বুঝতে পেরে বললেন, 'কনট্রাক্টর এন্ড ইঞ্জিনিযার। এই তো একটু এগিয়ে বাইশের বি-তে থাকি। হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। নেম প্লেট আছে, দেখেননি?'

ঠিক যে লক্ষ্য করে দেখেছি তা নয়। তবু হেসে বললাম, 'ও হ্যাঁ। দেখেছি। নমস্কার।'

জগদীশবাবু বললেন, 'আর এই আমার মেয়ে তপতী।'

বললাম, 'ওঁকে আমি চিনি।'

ভদ্রলোকের ভ্রূ সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্চিত হল, 'মানে?'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'মানে একই বাস-স্টপ থেকে উঠি। একই বাসে অফিসে যাতায়াত করি। কোন কোন দিন এক সঙ্গে ফিরিও।'

ভদ্রলোক একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'ও এই চেনার কথা বলছেন? সে তো মশাই আপনি আমাকেও রোজ দেখেন। কই চিনতে তো পারলেন না।'

তপতী লজ্জিত হয়ে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'বাবা!'

জগদীশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ও অফিসে যায়। মিলিটারি একাউন্টসে কাজ নিয়েছে। মেজাজটিও হচ্ছে তেমনি। কোন দরকার নেই তবু অফিসে যাওয়া চাই। এম· এ· পাশ করে কোন মেয়ে নাকি আজকাল ঘরে বসে থাকে না।'

তপতী বিব্রত হয়ে বলল, 'বাবা, চল আমরা যাই। কেন এই বৃষ্টির মধ্যে মিছিমিছি—'

জগদীশবাবু বললেন, 'দাঁড়া। ভদ্রলোককে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে আলাপ করলাম—। কথাটা সেরে নিই।'

এবার আমাকে বলতে হল, 'বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবেন কেন। আসুন, ভিতরে আসুন।'

তপতী বলল, 'বাবা, তুমি তোমার দরকারী কথা বল, আমি যাই।'

আমি বললাম, 'গেলে তো ভিজে যাবেন। আপনিও আসুন না।'

মনে হল, আমন্ত্রণ পেয়ে মেয়েটি খুশি হয়েছে।

একতলার ডানদিকের ঘরখানাতেই কোনরকমে একটু বৈঠকখানার মত করে নিয়েছি। দৈবাৎ কেউ এসে পড়লে তাদের জন্যে বসবার ব্যবস্থা রেখেছি একটু। ব্যবস্থা আর কি। খান তিনচার কাঠের চেয়ার আছে। আমারই সংগৃহীত। বাড়িতে এসে আমি কোন ফার্নিচার টার্নিচার পাইনি। যাঁরা এর আগে এ বাড়িতে ছিলেন তাঁরা নিজেদের জিনিসপত্র সব ঝেড়েপুছে নিয়ে গিয়েছেন। কোন চিহ্ন রেখে যাননি।

ঘরে ঢুকে লাইট জ্বাললাম। অতিথিদের বসতে অনুরোধ করলাম। রাম আধারকে ডেকে বললাম, 'চায়ের জল চাপাও।'

জগদীশবাবু বললেন, 'মালীকে দিয়ে আপনি চাও করাচ্ছেন ?'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ রাম আধারই একাধারে আমার সব।'

এবার জগদীশবাবু তাঁর দরকারী কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু মনে করবেন না। এ বাড়ি কি আপনি ভাড়া নিয়েছেন ?'

বললাম, 'না ভাড়া ঠিক নয়।'

'তবে কি কিনেছেন ? কি রকম দরে পেলেন ?'

একটু বিরক্ত হচ্ছিলাম। কিন্তু ওই মেয়েটির সামনে, অসৌজন্য প্রকাশ করতে বাধল। শান্তভাবে সত্যি কথাই বললাম, 'এ বাড়ির যিনি মালিক তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু। তিনি বাড়িটা ফেলে রেখেছেন। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি এলাম।'

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বুঝেছি মশাই বুঝেছি। উনি সব পারেন। নিজের সম্পত্তি ফেলে দিতেও পারেন, বিলিয়ে দিতেও পারেন। দারুণ খেয়ালী মানুষ। নইলে বছরের পর বছর এমন করে বাড়িটা ফেলে রেখেছেন ? ভাড়া দিলেও তো এতদিনে হাজার হাজার টাকা উঠে আসত।'

আমি চুপ করে রইলাম।

জগদীশবাবু বললেন, 'এ জায়গার ওপর আমারও চোখ ছিল। চেষ্টা চরিত্রও করেছিলাম। কিন্তু হল না। ভদ্রলোক এমন খেয়ালী ! আপনি ভাগ্যবান।'

আমি চুপ করে রইলাম।

জগদীশবাবু যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'পাঁচ কাঠার চেয়েও বেশী আছে জায়গা। তিনটে তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ি তুলে যদি ভাড়া দেওয়া যায় তাহলে ভেবে দেখুন।'

চা এল। বুড়ো মালীর মুখে যেন কিশোরীর লজ্জা। ও বোধহয় এর আগে কাউকে চা খাওয়াবার ভার পায়নি। শুধু ফুলই জুগিয়েছে।

ভদ্রলোক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন—

'ঈস, আপনার দেয়ালটা একেবারেই গেছে দেখছি। ড্যাম্প লেগে লেগে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ফের প্লাস্টার করিয়ে নিন। নইলে তো এর কিচ্ছু থাকবে না।'

নোনাধরা দেয়ালের জন্যে আমি যেমন লজ্জিত হলাম তেমনি একটু গর্বও বোধ হল। যেভাবেই হোক জগদীশবাবুর ধারণা হয়েছে বাড়িটা আমারই। আর তার মেরামত করবার কর্তাও আমি।

সে ধারণা আমি ভাঙতে চাইলাম না। এ বাড়ি আমার, অন্তত ভবিষ্যতে আমার হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এই ইলিউসনের মধ্যে তো আমিও বাস করতে শুরু করেছি।

একটু হেসে বললাম, 'বেশ তো আপনি দিন ঠিকঠাক করে।'

জগদীশ বললেন, 'বলেন তো নিশ্চয়ই দেব। ওই তো আমাদের কাজ। কিছু যদি মনে না করেন আপনার ওপরের ঘরগুলি একটু ঘুরে দেখতে পারি ?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সঙ্গে ওপরে এলেন। তপতীও এল।

জগদীশবাবু যখন ঘরের দেয়ালগুলি ঠুকে ঠুকে দেখছিলেন, তপতী আমার বইয়ের র‍্যাকগুলির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। 'আপনার তো অনেক বই।'

বললাম, 'অনেক আর কোথায়। সামান্য কিছু নিয়ে এসেছি। আর সব রাণাঘাটের বাড়িতে আছে।'

'সেখানে বুঝি আরো বই রয়েছে ?'

'তা কিছু আছে।'

'আপনার অনেক বই, অনেক বিদ্যা।'

'অনেক বই থাকলেই বুঝি অনেক বিদ্যা থাকে ?'

তপতী হেসে বলল, 'আপনার বিনয়ও তো কম নয়। দেখে কিন্তু আপনাকে বিনয়ী বলে মনে হয় না।'

হেসে বললাম, 'হয় না বুঝি ? কী বলে মনে হয় ?'

তপতী কিছু বলবার আগেই জগদীশবাবু বলে উঠলেন, 'চলুন মশাই, এবার আপনার ছাদটা দেখে আসি।'

তপতী একটু হেসে আমার দিকে তাকাল। তারপর সবাই আমরা ছাদে উঠতে লাগলাম। ছ'মাসের মধ্যে এই প্রথম আমার ঘরে একটি মেয়ের পদক্ষেপ হল। একটি মধুর নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু কেন যেন তেমন সামান্য বলে মনে হল না। আমি ভাবলাম, যে শুধু নিতান্তই মুখ চেনা ছিল তাকে আমি আরো একটু বেশি করে চিনলাম। এখন থেকে পরস্পরের দিকে তাকালে আমরা স্মিতমুখে পরিচয় স্বীকার করব, সুযোগ সুবিধা হলে কথা বলব। শুধু এইটুকু। যে অপরিচিতা ছিল, সে পরিচিতা হল। শুধু এইটুকু। তবু এই সামান্যতার মধ্যে যেন সম্ভাবনার শেষ নেই, মাধুর্য অফুরন্ত।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমরা ছাদে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকে শহরতলীর শান্ত স্তব্ধতা। সামনের গাছগুলি যেন কালি দিয়ে আঁকা। সে কালি এখনো শুকোয়নি।

তপতী বলল, 'আপনার ছাদটা তো বেশ বড়।' জগদীশবাবু বললেন, 'আপনার ছাদেও দেখছি ফাটল ধরেছে। এ বাড়িকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আমার ওপর যদি ভার দেন—'

বললাম, 'ভার তো আপনিই নেবেন।'

আমার সেদিনের ডায়েরিতে অনেকদিন—অনেকদিন বাদে একটি মেয়ের নাম উঠল। একটি মেয়ের মুখের কথা লিপিবদ্ধ হল। কী রহস্য আছে নারীর মধ্যে যার সামান্য দৃষ্টি সমান্য একটু হাসি, স্নিগ্ধ কণ্ঠ, সামান্য দাক্ষিণ্য অন্তরকে অসামান্য আনন্দে ভরে দেয়, চিত্তকে অনির্বচনীয় রসধারায় আপ্লুত করে। তত্ত্বের দিক থেকে কিছুই তো আমার জানতে বাকি নেই। শারীরবিদ্যা মনস্তত্ত্ব যৌনতত্ত্ব সবই তো একটু আধটু নেড়ে চেড়ে দেখেছি। কিন্তু ওদের কারো একজনের শুধু সান্নিধ্য সব বিদ্যা ভুলিয়ে দেয়, সব তত্ত্ব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে আর একটি সত্তাকেও আমি অনুভব করি যে ভুলতেও চায় না, ভাসতেও চায় না, যে অবিচল থাকতে চায়, প্রজ্ঞার আলোয় সব কিছুর স্বরূপ দেখতে চায়।

আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই কনট্রাক্টর জগদীশবাবুর সঙ্গে কোন চুক্তিবদ্ধ হলাম না। তার আগে হিমাংশুদার সম্মতি পাওয়া দরকার। এর মধ্যে আরো বারকয়েক তিনি এসেছেন। কোনবারই দু একদিনের বেশী থাকেননি। আমার কাণ্ডকারখানা দেখে বিস্ময় জানিয়ে বলেছেন, 'কী আশ্চর্য, তুমি এখনো এ বাড়িতে আছ ? আমি তো ভেবেছি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়েছ।'

'বাঃ রে আপনাকে না বলে পালাতে পারি নাকি ?' তিনি হেসে বলেছেন, 'বলে পালানোটা কি পালানো ?'

এখন তিনি অবশ্য লালবাগেও নেই। দলবলের সঙ্গে কেদারবদ্রী দর্শনে বেরিয়েছেন। সে দলে তাঁর সেই প্রেসের বন্ধু আছেন, বন্ধুর স্ত্রী আর বোন আছেন। আরো কে কে আছেন জানিনে। হিমাংশুদা মনে মনে বিবাগী। কিন্তু পথ চলার সময় দলবল ছাড়া চলতে পারেন না। অন্তত কাউকে না কাউকে তাঁর সঙ্গে চাই। নিজের শারীরিক অপটুতা, অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন। কিন্তু ত্রুটি শোধনে তাঁর মন নেই। তিনি হয়তো ভাবেন এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে পরাধীনতা স্বীকার করে নিলে চিন্তার রাজ্যে তিনি অবাধ মুক্তপক্ষ হতে পারবেন। মানুষের যত বয়স বাড়ে নিজের ভাবনা ধারণার—ধ্যান ধারণার সঙ্গে সে তত একাত্ম হয়ে যায়। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা বোধহয় আরো পাকা হয়।

লালবাগ থেকে আরো অনেক বাগবাগিচা ঘুরে আমার চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছল। তিনি এক

চটিতে বসে তার জবাবও দিলেন, 'ভাই সরোজ, আমি পথে তুমি ঘরে। আমাকে আর পিছনের দিকে টেনো না। তুমি যখন গৃহী, ও গৃহের সব ভার তোমার। অদল বদল, সংস্কার যা করবার তুমি কর।'

আমার মন উল্লাসে ভরে উঠল। আমি যেন এই রকমই আশা করেছিলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে।

কিন্তু গৃহসংস্কারের জন্যে টাকা তো চাই। হিমাংশুদার পথিকচিত্তকে টাকার তাগিদ দিতে আমার মন সরল না। আমার যেখানে যা-কিছু গোপন সঞ্চয় ছিল সব তুলে নিলাম। কিছু বা ধার করলাম, বন্ধুবান্ধবের কাছে। সেই সামান্য ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু করে দিতে লাগলাম জগদীশবাবুর হাতে।

তিনি বললেন, 'আরে মশাই টাকার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! আগে কাজ তারপরে টাকা। আপনি দেখুন, আপনার এই ভাঙা বাড়িকে আমি কি রকম ইন্দ্রপুরী করে তুলি।'

আমি বললাম, 'না, এক সঙ্গে বেশি টাকা জমে গেলে হয়তো দিতে পারব না। আমি অল্প অল্প করে আনি, আপনি অল্প অল্প করে নিন।'

ইঁট চুন সুরকি, সিমেন্ট কাঠ, লোহালক্কড় সব আসতে লাগল। মিস্ত্রীরা খাটতে লাগল। শুনেছি আপন কর্মরত মানুষই সবচেয়ে রূপবান মানুষ। কারিগরদের কাজ করতে দেখে যে এত আনন্দ হয় তা আমার ধারণা ছিল না। এতদিন আমি ভাব, রূপকল্প, কল্পনা, বিমূর্ত ধারণা ভাবনার চর্চায় আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু ইঁট কাঠ লোহালক্কড়ের মত নিরেট স্থূলবস্তুগুলিও যে এত আনন্দঘন তা কখনো অনুভব করিনি।

বাইরে জগদীশবাবুর মিস্ত্রী কাজ করতে লাগল। আর আমার বাড়ির ভিতরে তাঁর ছেলেমেয়েরা অবাধ অধিকার পেল।

তপতীর সঙ্গে এখন আর শুধু বাসে ট্রামে রাস্তার মোড়েই আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় না। সে আমার বাড়িতেও আসে। অবশ্য ছোট ভাইবোনদের কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়েই আসে। তারা তপতীর চেয়ে অনেক ছোট। চেয়ারে বসে বসে গল্প করতে তাদের কোন আনন্দ নেই। তারা সারা বাড়িময় ছুটোছুটি করে। ছাদে উঠে লাফায়, বাগানে গিয়ে গোলাপের কুঁড়ি ছেঁড়ে। আমি রাগ করতে পারিনে। আমার দ্বিতীয় রিপুটি যেন বিদায় নিয়েছে। তপতী আমার সামনে বসে বসে গল্প করে, গল্পের বই ধার নেয়, ফিরিয়ে দেয়, আবার ধার করে। আমাকে চা করতে দেখলে বলে, 'সরুন, আপনি পারবেন না, আমি করে দিচ্ছি।'

রান্নার সময় এসে বিরক্ত করে। কুকারের বাটিগুলি নিজেই সাজিয়ে দেয়। আমি হেসে বলি, 'সরুন, আমার জাত যাবে।'

ও বলে, 'আপনার জাত কি আছে নাকি।'

আমার মাঝে মাঝে হিমংশুদার মত হতে সাধ যায়। ঠুটো জগন্নাথ হতে।

একদিন তপতী বলল, 'আপনি যে সব এমন ছড়িয়ে টড়িয়ে রেখে যান, একদিন যদি সব চুরি যায়?'

হেসে বলি, 'চোর আমার কী নেবে।'

'আহাহা, নেওয়ার মত বুঝি কিছু আপনার নেই? সে আপনার সব নেবে শুধু আপনাকে ছাড়া।'

তপতী হেসে ওঠে।

মেয়েদের হাসি একই সঙ্গে দেখতে এত সুন্দর আর শুনতে এত মধুর কী করে হয়? আমি ভাবি।

এই সংলাপটুকু আমার ডায়েরিতে তুলে রাখতে ভুলিনে।

আরো একদিনের আলাপ আমার ডায়েরিতে তোলা থাকে।

আমি সেই প্রথম দিনের কথা তুলে ওকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি যে সেদিন বলে ছিলেন, আমাকে বিনয়ী বলে মনে হয় না, তবে কী বলে মনে হয়?'

'আপনি বুঝি সে কথা মুখস্থ করে রেখেছেন?'

'সব কথা কি চেষ্টা করে মুখস্ত করতে হয়? তা আপনিই থেকে যায়।'

তপতী হেসে বলল, 'কোথায় থাকে ?'

'যেখানে থাকবার। আমাকে কী বলে মনে হয় বলুন।'

তপতী নরম গলায় বলল, 'শক্ত শক্ত কথা শোনার জন্যে তৈরী হ'ন তা হলে। বিনয় আপনাকে মানায় না। আপনাকে মনে হয় দম্ভী, দর্পী, স্পর্ধিত, এক রাজপুরুষ।' একটু চুপ করে থেকে তপতী আরো মৃদুস্বরে বলল, 'আমি তাই ভালোবাসি।'

মনে মনে হাসলাম। সরকারী চাকরি করি বটে, তবে রাজপুরুষ আর হতে পরলাম কই। আমার লম্বাচওড়া চেহারা দেখে বোধহয় তপতীর অমন ধারণা হয়েছে।

তারপর দিনকয়েকের মধ্যে তপতীর আর দেখা মেলে না। ভাবলাম ও হয়তো কথাটা বলে ফেলে লজ্জা পেয়েছে।

ওর ছোট বোন আরতি নীল ফ্রক পরে স্কুলে যায়। বিনুনিতে লাল রঙের ফিতে। তাকে সেদিন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার। তোমাদের যে দেখাই নেই। তোমার দিদির খবর কি ?'

আরতি হেসে বলল, 'দিদির যে বিয়ে। জানেন না বুঝি ?'

জবাব দিতে একটু দেরি হয়ে যায়। তারপর হেসে ফের জিজ্ঞাসা করি, 'না, জানতাম না। কবে কার সঙ্গে ?'

'অতীনদার সঙ্গে। আগে থেকেই সব ঠিক হয়েছিল। আমেরিকায় গিয়েছিল রিসার্চ করতে। দু বছর বাদে এখন ডক্টর অতীন সরকার। আমরা ক্ষেপাই হোমিওপ্যাথ না এলোপ্যাথ ?'

'বেশ বেশ। একদিন নিয়ে এসো তোমাদের ডাক্তারবাবুকে।'

একটু থেমে জিজ্ঞেস করি, 'কেমন দেখতে ?'

হয়তো প্রশ্নটা একটু অশোভনই হয়।

আরতি হেসে জবাব দেয়, 'বি-শ্রী। কালো রোগা লিকলিকে চেহারা। কিন্তু হলে হবে কি। কত গুণ। রিসার্চ স্কলার। মা বলেন, পুরুষের আবার চেহারা দেখে নাকি কেউ ? তাদের গুণটাই সব। আমরা শিগগিরই একদিন আসব আপনার ওখানে। নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপতে গিয়েছে। সেই চিঠি নিয়ে সবাই মিলে আসব। বাড়িতে থাকবেন তো ?'

'থাকব। এসো।'

উচিত না, তবু দিনকয়েক একটু বিমনার মত কাটে। হেসে বলি, 'একেই বলে মোহ।' বাড়িটাকে আমি মুদ্গর হিসাবে ব্যবহার করি। দ্বিগুণ উৎসাহে গৃহসংস্কারে মন দিই। জগদীশবাবু আমার সহায়। তিনিই এ পাড়ার জগদীশ্বর। তিনি সময় নিলেন। তবে বাড়িটার চেহারা একেবারে পালটেও দিলেন। এখন আর ড্যাম্প নেই। কোথাও কোন ফুটো ফাটা নেই। ঘরে ঘরে পাখা, ঘরে ঘরে আলো। বিদ্যুতের তারগুলি নতুন। দেয়ালগুলিতে নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা। পুরোন পোড়ো বাড়িটা সত্যিই এবার নবজন্ম নিয়ে নতুন অধিবাসীদের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। নতুন একখানি ঘরও উঠেছে ছাদের ওপর। আমার লেখাপড়ার ধ্যান ধারণার ঘর। যা অনেকদিন স্থগিত আছে এই বাড়ির জন্যে।

এর মধ্যে একদিন রাণাঘাট থেকে ঘুরে এলাম।

মা বললেন, 'আজকাল তো আসা যাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিস। সেখানে বসে বসে কী যে তুই করছিস, তুইই জানিস।'

বললাম, 'এবার তোমরাও জানবে। এবার তোমাদেরও নিয়ে যাচ্ছি। সবাই মিলে সেখানে থাকবে।'

বিশু যীশু পুলকিত। সুনন্দা উল্লাসে অধীর, 'সত্যি ? কবে নিয়ে যাচ্ছ আমাদের, কবে ?'

মা পুরোহিত মশাইকে দিয়ে পাঁজি দেখালেন। যাত্রার দিন ঠিক হল, ঠিক হল গৃহপ্রবেশের দিনক্ষণ।

তার আগে সব ঠিকঠাক করবার জন্যে আমি আর একবার এলাম চণ্ডীতলায়। কে কোন ঘরে

থাকবে, কোন জিনিস কোন ঘরে রাখা হবে তাই নিয়ে মনে মনে জল্পনা কল্পনা চলল ।ভাবলাম এতদিনে আমার প্রবাস শেষ হল । এবার সবাইকে নিয়ে স্বগৃহবাস শুরু করতে পারব । অবশ্য হিমাংশুদার কাছ থেকে বাড়িটা আমি অমনিতে নেব না । টাকা দিয়েই নেব । রাণাঘাটে আমাদের সামান্য কিছু জমি আছে তা বিক্রি করে দেব । কিছু ধার দেনা করতেই হবে । হিমাংশুদা নিশ্চয়ই পুরো টাকাটা এক সঙ্গে চাইবেন না । কিস্তিতে কিস্তিতে দিলেই চলবে । তা ছাড়া দাম সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই কিছু বিবেচনা করবেন । জগদীশবাবুর কাছে যা চাইতে পারতেন তা নিশ্চয়ই আমার কাছে চাইবেন না ।

কিন্তু পঞ্জিকার শুভদিন আসবার দুদিন আগে একখানা ট্যাক্সি এসে বাড়ির দরজায় থামল । আর তার ভিতর থেকে নামলেন হিমাংশুদা আর একজন ভদ্রলোক এবং মহিলা । ভদ্রলোককে অল্পস্বল্প চিনি । লালবাগ প্রেসের স্বত্বাধিকারী যোগেশ সান্যাল ।—হিমাংশুদার বন্ধু । এঁদের সঙ্গেই তিনি কেদারবদ্রী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন । আরো নানা জায়গা তিনি এই দলের সঙ্গে ঘুরেছেন । মহিলাটি বেশ সুন্দরী । দীর্ঘ চেহারা, তবে একটু পুষ্টাঙ্গী । বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে । সিঁথিতে সিঁদুর নেই । গলায় সরু হার, বাঁ হাতের মনিবন্ধে দামি ঘড়ি । আর কোন অলঙ্কার নেই । হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি পরনে । পাড় চোখে পড়ল না । মুখখানি সুন্দরই, তবে যৌবনলাবণ্য কি ফিরে আসে চেহারার গড়নে বেশ একটু রাশভারি ধরনই বরং ফুটে উঠেছে ।

হিমাংশুদাই পরিচয় করিয়ে দিলেন । 'সরোজ, ইনি হচ্ছেন মনীষা সান্যাল । দেরাদুনের মিশনারী স্কুলের বড় দিদিমণি । ওকে আমরা জোর করে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনলাম । যোগেশকে তো তুমি চেন । ওরই বোন ।'

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তা প্রায় আন্দাজ করছিলাম । ভাইবোনের মুখের লম্বাটে ডৌলে মিল আছে ।

হিমাংশুদা ওঁদের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই হল চক্রধর শ্রীমান সরোজ চক্রবর্তী । ওর আর আলাদা কোন পরিচয়ের কি দরকার আছে ?'

যোগেশবাবু হেসে বললেন, 'তুমি তো দিনরাত ওর কথাই বলো ।'

মনীষা স্মিতমুখে বললেন, 'বাইরে বেরিয়ে উনি আপনাকে যত চিঠি লিখেছেন, তত আর কাউকেই লেখেননি ।'

ওঁরা ঘুরে ঘুরে ঘরগুলি দেখতে লাগলেন । হিমাংশুদা খুব খুশি । বললেন, 'বাড়ির চেহারাই একেবারে পালটে দিয়েছো ।'

যোগেশবাবু বললেন, 'তোমার প্ল্যানটাই ভালো হিমাংশু । নীচের ঘর দুটিতে প্রেস বসবে । আর ওপরে আমাদের কাগজের অফিস ।'

আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ।

হিমাংশুদা আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, 'এক বিরাট পরিকল্পনা করে ফেলেছি সরোজ । যোগেশ তার লালবাগের প্রেসটা এখানে তুলে আনছে । দূর মফঃস্বলে কি ওসব প্রেস ট্রেস চলে । তাছাড়া এখানে আমরা একটা কাগজও করব । উঁচু দরের মাসিক পত্রিকা । তোমাকে কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকতে হবে । কাগজে তোমার নিয়মিত কনট্রিবিউশন চাই ।'

আমি বললাম, 'আমাকে বাদ দিন হিমাংশুদা ।'

'তাই কী হয় ? তোমাকে বাদ দিয়ে আমি কি কিছু করতে পারি ?'

আমি তাঁকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গেলাম । তারপর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বেশ একটু জোরের সঙ্গে বললাম, 'আমি এখানে আমাদের বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসব বলে কথা দিয়ে এসেছি ।'

হিমাংশুদা আমার দিকে একটু যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন । তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'কিন্তু সরোজ এ বাড়ি তো ঠিক সপরিবারে বসবাসের উদ্দেশ্যে— । আচ্ছা যাক, সে না হয় পরে ভেবে দেখা যাবে ।'

আমি বললাম, 'না পরে না । যা হবার এখনই হয়ে যাক । আপনি লিখেছিলেন এ বাড়ির সব দায়িত্ব আমার ।'

পূর্বস্মৃতি মনে করতে চেষ্টা করলেন। তারপর হিমাংশুদা একটু হেসে বললেন, 'ও হ্যাঁ লিখেছিলাম বটে। কিন্তু তুমি যে তার এমন ভাষ্য করবে—'

আমি বললাম, 'ভাষাটা পাহাড়ে একরকম আর প্লেনে আর একরকম হয় তো আমার জানা ছিল না। এ বাড়ির জন্যে আমি খরচও করেছি।'

হিমাংশুদা আমার দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'সত্যি, তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে। তখন আমার কাছে নগদ টাকা প্রায় কিছুই ছিল না। চেক বইটা পর্যন্ত নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পথখরচ যোগেশ চালিয়েছে। কত খরচ হয়েছে তোমার?'

এই সেদিন জগদীশবাবুর বিল আমি পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়েছি। অঙ্কটা আমার মুখস্থ ছিল। বললাম,'চার হাজার নশো একানব্বই টাকা বাহান্ন পয়সা।'

হিমাংশুদা সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে সুটকেস খুলে তাঁর চেকবইটা নিয়ে এলেন। তারপর আমার নামে পাঁচ হাজার টাকার একটি বেয়ারার চেক লিখে দিলেন কলমের এক খোঁচায়।

আমি বললুম, 'বেশী লিখে ফেললেন যে। অত তো হয়নি।'

তারপর পকেট থেকে খুচরো টাকা আর পয়সাগুলি গুণে এনে আমি তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

তিনি একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বিনাবাক্যে সেই খুচরো টাকা পয়সাগুলি তাঁর ঝুল পকেটে রেখে দিলেন।

আমি সেইদিনই বিকালে আমার সামান্য জিনিসপত্র যা ছিল লরীতে তুলে দিলাম। নিজের জন্যে ট্যাকসি ডাকলাম একটা।

না, আমরা কেউ কোন রূঢ় কথা বলিনি। হাসি মুখেই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। কিন্তু তারপর কেউ আর কারো মুখোমুখি দাঁড়াবার উৎসাহ বোধ করিনি। চিঠিতে নয়, ফোনে নয়, কোনদিক থেকেই কোন সংযোগ আর আমাদের নেই।

মাঝে মাঝে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ভাবি কেন এই বিরোধ। আমরা কেউ তো পুরোপুরি সংসারী নই, কেউ তো বিষয়ী হবার স্বপ্ন দেখিনি। বরং যতদূর সম্ভব বিষয়কে বর্জন করবার চেষ্টাই করেছি। তবু কেন এই ব্যবধান।

আমার মন এখনো মাঝে মাঝে ছুটে যায় সেই চণ্ডীতলার দিকে। হিমাংশুদা সেখানেই আছেন। কিন্তু মন চলে তো পা চলে না। পা তো নয়, যেন দুটি পাথরের স্তম্ভ। মাটিতে প্রোথিত।

মাস ছয়েক পরে ফের একবার আমাকে চণ্ডীতলায় যেতে হল। আরতির জন্মদিনের নিমন্ত্রণ রাখতে। ওর দিদির বিয়েতে যেতে পারিনি। জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বারের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে পারলাম না। আরতি কাকুতি মিনতি করে চিঠি দিয়েছে। খোঁচা দিয়েছে, 'শুধু দিদিই বুঝি আপনার বন্ধু? আমরা বুঝি কেউ না?'

জন্মদিনে যা জাঁকজমক হল, বিয়ের চেয়ে তা সামান্য কম। আরতি খুব খুশি। ওর দিদিকেও দেখলাম গয়নাগাটিতে ঝলমল করছে। একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

আমি বললাম, 'ও কি।'

সে হেসে বলল, 'ব্রাহ্মণ তো।'

বললাম, 'তাহলে সতীসাবিত্রী হবার আশীর্বাদ করি।'

কথায় কথায় এক সময় জগদীশবাবু বললেন, 'কাণ্ড দেখুন মশাই। হিমাংশুবাবু বাড়িটা তো আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। নিয়ে যে বসবাস করবেন তা নয়! সেই আগের মতই ফেলে রেখেছেন।'

বললাম, 'ওখানে প্রেস বসেনি?'

জগদীশবাবু বললেন, 'না না, কোথায় প্রেস! তেমনি তালাবন্ধভাবে পড়ে আছে। এত করে সারালাম টারালাম, কোন কাজেই এল না মশাই। আচ্ছা লোক যা হোক। নিজেও ভোগ করলেন না, কাউকে ভোগ করতেও দিলেন না। শুধু দখলে রাখা, দখলদার হয়ে বসে থাকা। কী যে প্রবৃত্তি মানুষের।'

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। দখলদারির নেশা যে কী তা তো আমি জানি।

ফেরার পথে কলাপসিবল গেট লাগানো পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে আমি মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালাম। সামনেই লাইট পোস্ট। বিদ্যুতের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই বাড়িতে আমি পুরো এক বছর বাস করে গিয়েছি। কত সুখদুঃখের মুহূর্ত এখানে আমার কেটেছে। কত প্রত্যাশা আর নৈরাশ্য, কত সঙ্গ আর নিঃসঙ্গতা। এখানে যেমন আমি পেয়েওছি তেমন হারিয়েওছি। রাম আধার কোথায় আছে কে জানে। বোধহয় একধাবে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। বুড়ো ভারি ঘুমকাতুরে।

বড় একটা সীসের তালা ঝুলিয়ে বাড়িটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে ঘুমুচ্ছে কিনা।

রাম আধার কত বড় একটা তালা লাগিয়েছে তাই দেখ! ও মাঝে মাঝে চাবি হারিয়ে ফেলত। এখনো কি হাবায়?

তালার সঙ্গে মানুষেব হৃদয়েব কি কোন আদল আছে?

সন্ধ্যারাগ

এ ঘটনাটা এমন কিছুই নয়, তবু আজ সন্ধ্যায় যা ঘটে গেল আমার মন তাতে কেমন যেন অশান্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে নিজের মনের ওপর আমাব নিজেরই রাগ হয়। এত স্পর্শকাতর মন নিয়ে আমি যে কী করব ভেবে পাইনে। যদি পারতাম নিজের এই রুগ্ন দুর্বল মনের বদলে আর একটি সুস্থ সবল মন এনে আমি আমার মাথার মধ্যে বসাতাম। মন কি মাথায় থাকে? মস্তিষ্কের কতগুলি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিকেই তো আমরা মন বলি। আমি মনস্তত্ত্বের ছাত্র নই। মনের স্বরূপ নিয়ে আমার এত মাথা ব্যথার কী দরকার।

দরকার নেই। তবু নিজের এই অদরকারী মনটা আমাকে পেয়ে বসে। শরীর যখন একটু ভালো থাকে নিজের মনই আমাব বেশিরভাগ সময় সঙ্গী হয়। হাসপাতালের এই একলা ঘরে তাঁকে নিয়েই আমার দিনের পর দিন রাতের পর রাত কেটে যায়। এই অসুস্থ শরীর আর অসুস্থ মন নিয়ে আমাব আরো কতকাল কাটবে কে জানে। মাঝে মাঝে এত হতাশা আসে মনে যে বলবার নয়। তখন মনে হয় এই টি বি হাসপাতাল থেকে আমি আর জীবনেও বেরোতে পারব না। আমার মৃতদেহ হাসপাতালের লোক এসে বের করে নেবে। সেই দেহের সঙ্গে আমাব এই মনের কোনো যোগ থাকবে না। সবলই হোক দুর্বলই হোক আমার এই মন তখন কোথায় থাকবে? সেও থাকবে না। দেহ ছাড়া আমার মনের অস্তিত্বের কথা আমার কল্পনায় আসে না।

মৃত্যু যে কোন সময় আসতে পারে কিন্তু মৃত্যুর কথা আমি তত ভাবিনে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' কে বা চায়? আমার মুখে মৃত্যুর কথা শুনলে ডাক্তাররা হাসেন, রোগী বন্ধুরাও হাসে। আমি নিজেও জানি মরবার কিছু হয়নি। যদিও মাঝে মাঝে বেশ বাড়াবাড়ি হয়। ব্লীডিং আর জ্বর আমাকে কয়েক সপ্তাহ শুইয়ে রাখে। তারপর আমি ফের উঠে বসি। সারা হাসপাতাল টহল দিই। বাইরেও যাই। এমনি করেই তো বছরের পর বছর কাটছে। আরো কতদিন কাটবে কে জানে? সে হিসেব আমি আর করিনে।

আমার মুখে মৃত্যুর কথা শুনলে সবচেয়ে রাগ করে সুতপা। আর ওর ওই রাগ করবার মধুর ভঙ্গি আমাকে অমরত্ব দেয়। সুতপা বলে, 'সলিল তুমি যদি মরবার কথা বল আমি তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না।' আমি তখন কান পেতে জীবনের কথা শুনি। আমি তখন চোখ মেলে জীবনের লীলা দেখি। শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী সুঠাম গড়নের শ্রীময়ী এই মেয়েটি আমার শ্যাম ধরণী সরসা। অথচ ওই সুতপাও তো এই হাসপাতালের রোগিণী। অবশ্য আমার মত বছরের পর বছর ওকে এই হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়নি। কি হবে না। এক বছরেই ওর রোগ ভোগের মেয়াদ শেষ হয়েছে। অপারেশনের পর ওর ডিসচার্জের অর্ডার এসে গেছে। যে কোনদিন হাসপাতাল

থেকে ও হাসি মুখে বেরিয়ে যাবে। অবশ্য পুরোপুরি হাসিমুখেও বেরতে পারবে না। ওর মন ভারি নরম। যাওয়ার সময় কারো কারো জন্যে ওর মন কেমন করবে। ফিমেল ওয়ার্ডে ওর অনেক বন্ধু আছে। মেল ওয়ার্ডে আমি একাই ওর বন্ধু তা আমি জানি। অনেকের সঙ্গেই ওর আলাপ পরিচয় আছে, কিন্তু আমার মত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা আর কারো সঙ্গেই নেই।

একটি মেয়ের আমি ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ভাবতে কী ভালোই না লাগে। একটি মেয়ে আমার অন্তরঙ্গতম এই ধারণা যে কত বড় আনন্দের আধার তা কি কাউকে বলা যায়, না বলে বোঝানো যায় ? যার আর কিছু নেই, স্বাস্থ্য নেই, শ্রী নেই, নিকট আত্মীয় স্বজন নেই, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে জীবিকার কোন নিশ্চয়তা নেই, এমন কি জীবনও যার অনিশ্চিত, একটি তরুণী সুশ্রী শিক্ষিতা নারীর বন্ধুত্ব যে তার কাছে কী বস্তু তা কাউকে বোঝানো যায় না। তা শুধু নিজে অনুভব করতে হয়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি যেন হাসপাতালের এই ছোট একটি ঘরে বাস করিনে, আমি যেন শুধু একটি মাত্র সম্পর্কের মধ্যে বাস করি। সুতপার সৌহার্দ্য একটি মনোরম বাসগৃহ আমার জন্যে তুলে দিয়েছে।

আমার মুখে মৃত্যুর কথা শুনলে সুতপার রাগ হয়। অথচ ও নিজে যখন এখানে এসেছিল ওর মনেও মৃত্যুভয় জেগেছিল। মুখে আশঙ্কার ছায়া। দেখা হলে আমিই তখন ওকে বকতুম।

অবশ্য গোড়ার দিকে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ তো এমন খোলাখুলি হত না। ফিমেল ওয়ার্ডে যাওয়া আসা নিষেধ ছিল। সেই নিষেধ এখনও আছে। তবু সেই নিষেধের গণ্ডি ভেঙে আমরা আশ্চর্যভাবে পরস্পরের কাছে এসেছি। মনের দিক থেকে এই মুহূর্তে এত কাছে আমার আর কেউ নেই।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় সুতপা কোন-কোন মুহূর্তে আমার কাছ থেকে কত দূরেই না সরে যায়। অল্পদিনের মধ্যে দিরচিনের জন্যে কত দূরেই না সরে যাবে।

অথচ যাঁকে দেখে এই কথা আজ আমার মনে হচ্ছে তিনিও আমার আপনজন। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমার হিতৈষী বন্ধু। অমিয়দাকে আমি শুধু দাদা বলে ডাকিনে দাদার মতই মনে করি। কতদিনের আলাপ ওর সঙ্গে। সুতপার সঙ্গে পরিচয় তো মাত্র এক বছরের।

অমিয়দার সঙ্গে পরিচয় আমার বারো বছর আগের। আমি যখন সুস্থ ছিলাম তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। অসুস্থ হওয়ার পরও তিনি প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। এখন যাঁরা আমার খোঁজ খবর নেন তাঁদের সংখ্যা আমি একটি আঙুলের কর গুণেই বলতে পারি।

অমিয়দা এবার অনেকদিন বাদে এলেন। হাতে একটি ফলের ঠোঙ্গা আর কয়েকখানি বই। গল্প উপন্যাস নাটক হাতের কাছে যা পান আমার জন্যে নিয়ে আসেন। এগুলি আর ফেরৎ দিতে হয় না। পড়া হয়ে গেলে আমি হাসপাতালের লাইব্রেরীতে বইগুলি দান করি যখনই আসেন কিছু নিয়ে আসেন। তিনি খালি হাতে এলেও আমার দুঃখ হয় না। ওঁর সান্নিধ্যই আমার কাছে যথেষ্ট। সুস্থ জগতের বন্ধুরা আমাকে প্রায় ভুলেই গেছেন। অমিয়দা এখনো ফোন করেন, চিঠিপত্র লেখেন। ঘন ঘন না আসতে পারলেও বছরে দু-তিনবার অন্তত আসেন :

আজ যখন এলেন, ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে এসেছে।

অমিয়দা একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'স্টুডিও থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গেল।'

আমি জানি কাজ না থাকলেও স্টুডিওতে একবার করে না গিয়ে পারেন না অমিয়দা। অনেকদিনের অভ্যাস।

চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'তাতে কী হয়েছে, বসুন না। ছটার পরেও আপনি থাকতে পারবেন। আমরা বরং বাইরে গিয়ে বসব। কি একটু বেড়াব।'

অমিয়দা হেসে বললেন, 'বেড়াতে পারলে তুমি তো আর কিছু চাও না। ভালো আছো তো।'

বললাম 'ভালোই আছি।'

তিনি বললেন, 'তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

তারপর তিনি আমার টেবিলের বইগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। হঠাৎ মহুয়াখানা তুলে

নিয়ে বললেন, 'এ যে নতুন কপি দেখছি।'

আমি লজ্জিতভাবে চুপ করে রইলাম। জানতাম তিনি আরো কিছু না দেখে ছাড়বেন না। দেখলেনও। পাতা উল্টে তিনি সশব্দে পড়লেন, 'সলিলের জন্মদিনে সুতপা।'

তারপর হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কে এই সুতপা, সলিল ?'

আমি বললাম, 'এখানকারই একজন পেশেন্ট।'

তিনি মৃদু পরিহাসের সুরে বললেন, 'পেশেন্ট ? নার্স টার্স নয় ?'

তারপর তিনি নিজেই একটু লজ্জিত হলেন, 'কিছু মনে করলে না তো ?'

বললাম, 'কী মনে করব। আপনি সুতপার সঙ্গে আলাপ করবেন ? মেয়েটি খুব ভালো।'

তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই ভালো। তোমার মত ভালো ছেলেকে যখন— ।'

অমিয়দা থেমে গেলেন

আমি উদারভাবে বললাম, 'আপনি আলাপ করবেন ওর সঙ্গে ! একটু বাদেই ও নিচে নামবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ও খুশী হবে।'

অমিয়দা বললেন, 'তোমার যে কোন বন্ধুর সঙ্গে আমি আলাপ করতে রাজি আছি।'

আমি বললাম, 'আপনার কথা ওকে আমি বলেছি। তাছাড়া অভিনেতা হিসাবে আপনাকে কেই বা না চেনে ?'

তিনি বললেন, 'তুমি বাড়িয়ে বলছ সলিল। অনেকেই চেনে না। স্ক্রীনে তো নামিই না, স্টেজেও আজকাল কম নামি।'

আমি বললাম, 'কেন অমিয়দা, এমন করে সরে যাচ্ছেন কেন ? এই আত্মঘাতী অভিমান কেন আপনার ?'

অমিয়দা বললেন, 'সরে যাচ্ছি না ভাই, সরিয়ে দিচ্ছে। তুমি তো জানো, রোমান্টিক হিরো ছাড়া আমি আর কোন রোলে তেমন অভিনয় করতে পারিনে। অথচ প্রণয়ীর ভূমিকা আমাকে এখন আর কেউ দিতে চায় না। বয়স হয়েছে, চেহারা-টেহারা ভেঙে গেছে।'

অমিয়দা একটু হাসলেন। হাসিটুকু ভারি করুণ দেখাল। তাঁর সেই হাসি দেখে আমার মনে হল পৃথিবীতে রোগযন্ত্রণাই একমাত্র দুঃখ নয়। হাসপাতালে বছরের পর বছর শুয়ে থাকাই কমাত্র কষ্টের কারণ নয়। পৃথিবীতে আরো অনেক দুঃখকষ্ট আছে। খ্যাতির মৃত্যু, ক্ষমতার মৃত্যু তাদের একটি। যাঁরা জনপ্রিয়তাকে জীবনের বড় অবলম্বন বলে মনে করেন, তাঁরা প্রায়ই এই দুঃখ পান। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখেছি রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখেছি যাঁরা খ্যাতিমান তাঁরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। হয় ওঠেন না হয় পড়েন। প্রায়ই সরে আসেন নেমে আসেন। আমার দুর্ভাগ্য, আমার যাঁরা শুভানুধায়ী তাঁদের মধ্যে অবরোহণকারীদের সংখ্যাই বেশি। নাকি রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে জীবনের ব্যর্থতা বিফলতার দিকটাই আমার বেশি চোখে পড়ে ! আমি অবশ্য হাতে কলমে কিছু করবার সুযোগ এ পর্যন্ত পাইনি। দারিদ্র্য আর ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করে করেই যৌবনের প্রথম ভাগ কাটল। কিছু করব আর কখন ? আমি কিছুই করিনে। হাতের কাছে যা পাই পড়ি। আর শুয়ে শুয়ে অনুভব করি। আমার শুধু এই একটি জগৎই আছে। অনুভবের জগৎ। রোগ আমাকে কৃত্য আর কৃতিত্বের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

অমিয়দার অভিনয় আমি অনেক দিন দেখিনি। তবে এখন যে অভিনয়ের ধারা অনেক বদলে গেছে, তিনি পুরোন হয়ে গেছেন, আস্তে আস্তে নেপথ্যে সরে যাচ্ছেন তা মোটামুটি জানি।

ঘর থেকে বেরোবার সময় অমিয়দা মহুয়াখানা হাতে করে নিয়ে চললেন।

আমি বললাম, 'ওকি অমিয়দা, ওখানা আবার নিচ্ছেন কেন ?'

তিনি হেসে বললেন, 'ভয় নেই, একেবারে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিনে। যাওয়ার সময় ফিরিয়ে দিয়ে যাব। মহুয়া আমার খুব প্রিয় কাব্য। কিন্তু তোমার বান্ধবীতো দেখছি খুব সেকেলে। আজকালকার দিনে কেউ কি কাউকে রবীন্দ্রনাথ উপহার দেয় ? যুগটাতো তাঁর প্রপৌত্রদের !'

আমি বললাম, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। এদিক থেকে সুতপা একটু সেকেলেই। এখনো রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা নিয়ে ও পাগল।'

'গাইতে পারে নাকি ?'

বললাম, 'পারে অল্পস্বল্প।'

আমি নার্সকে দিয়ে খবর পাঠালাম। ও যেন বাইরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে।

কোথায় অপেক্ষা করতে হবে ও জানে। ঝাঁকড়া জুঁই ফুলের গাছটার কাছে প্রায়ই আমাদের দেখা হয়। কতদিন এখান থেকে ফুল তুলেছি। ও সব জানে।

ওকে দেখে আমার আনন্দ হল। শুধু দেখেই আনন্দ। প্রিয়জনের দেখা পাওয়া কি কম পাওয়া ? প্রায়ই রোজই তো ওকে দেখি। কিন্তু মনে হয় না ও মুখ পুরোন হয়ে গেছে।

অন্ধকারে আবছায়ার মত ও দাঁড়িয়েছিল। কায়ার চেয়ে ছায়ার অংশই ওর মধ্যে বেশি। একটু সেজেটেজে আসতে পারত। তা আসেনি। গয়নাটয়না একেবারেই পরে না। আমি বলি, 'পর না কেন ?' ও বলে 'দূ-র ভালো লাগে না। এতো আর বিয়ে বাড়ি নয়। আছি তো হাসপাতালে।'

পরনে সাদা খোলের শাড়ি। নীল কি খয়েরি রঙ থাকে পাড়ে। ঠিক স্কুলের মেয়েদের মত সাজ।

আমি বলি, 'হালকা রঙের কিছু পরলেও তো পার। যে বয়সের যা।'

ও বলে, 'যাঃ।'

দেখে দেখে ওই শ্বেতাম্বরাকেই আমার চোখ মেনে নিয়েছে। এখন ওর বেশান্তরেই বরং আমার অস্বস্তি হয়।

আমি অমিয়দার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, 'জানো কত বড় অভিনেতা ? দেখেছ ওঁর অভিনয় ?'

অমিয়দা বোধ হয় আশা করছিলেন সুতপা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

কিন্তু তা হল না।

সুতপা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি থিয়েটার-সিনেমা বড় একটা দেখিনে। অসুখের পর থেকে তো একেবারেই ওসব বন্ধ। কিন্তু আপনার কথা শুনেছি অনেক।'

অমিয়দা একটু যেন দমে গেলেন।

তারপর ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী শুনেছ ?'

সুতপা বলল, 'আপনি ভালো মানুষ। আপনি ওকে খুব ভালোবাসেন।'

অমিয়দা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কোন মানুষ ভালো কিনা অমন এক কথায় বলা যায় না। তবে ভালো কাউকে কাউকে বাসি। কেউ যদি মনে রাখে হয়তো সেইটুকুর জন্যেই রাখবে।'

কোন ধরনের ভালোবাসার কথা বলছিলেন অমিয়দা আমি জানিনে। তবে ভালোবাসা যে কোন মূর্তিতেই আসুক—স্নেহে প্রেমে বন্ধুত্বে বাৎসল্যে তা যদি খাঁটি হয় তার তুলনা নেই। আমি আত্মীয়-স্বজনের স্নেহপ্রীতি বেশি পাইনি। কিন্তু পরের কাছ থেকে যথেষ্ট পেয়েছি। যাঁরা পর, যাঁদের সঙ্গে কোন বন্ধন ছিল না, তাঁরা যখন আপন হয়ে ওঠেন আমার আজও বিস্ময়-মুগ্ধতার শেষ থাকে না। কিন্তু যারা অল্পেই খুশি হয় তাদের দুঃখও অনন্ত। যারা ক্ষণে ক্ষণে পায় তারা ক্ষণে ক্ষণে হারায়।

অমিয়দা সুতপার দিকে তাকালেন। ও ছিল আমাদের মধ্যবর্তিনী। তিনি ওর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি কবিতা ভালোবাসো, গানও গাইতে পার শুনলাম।'

সুতপা বলল, 'সলিলের কথা শুনবেন না। ও এত বাড়িয়ে বলে।'

ভারি মিষ্টি ওর গলা। এত লালিত্য আমি আর কারো কথায় পাইনি। ও যা কিছু বলে তাই যে বীণাগুঞ্জিত! যা কিছু বলে তাই যেন রাগরঞ্জিত।

অমিয়দা বললেন, 'বাড়িয়ে বলেন ? ভালোবাসার গুণই ওই। প্রিয়জনের গুণ তাতে বহুগুণ হয়ে যায়। কিন্তু তোমার বেলায় তো সলিল কিছু বাড়িয়ে বলেছে বলে মনে হয় না।'

সুতপা বলল, 'কেন ?'

অমিয়দা বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে কিছু অত্যুক্তি করা অসম্ভব।'

এও এক, অতিরঞ্জন। কিন্তু অমিয়দা এত অসঙ্কোচে এমন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বললেন

যে সুতপা আর আমি দুজনেই অবাক হয়ে রইলাম।

আমি বুঝতে পারলাম সুতপা খুশি হয়েছে। দেবতারা স্তবে তুষ্ট, দেবীরা স্তুতিতে।

সুদর্শন নট হিসাবে এক সময় খ্যাতি ছিল অমিয় চৌধুরীর।এই প্রৌঢ় বয়সে এখনো তার অনেকখানি দৃশ্যমান। পালোয়ান নন, কিন্তু সুস্বাস্থ্যবান বেশ। এখনো মেক আপ টেক আপ নিয়ে নামলে স্টেজে যুবা পুরুষ বলে মনে হয়। এই মুহূর্তে কোন মেক আপ তো ওঁর নেই।কিন্তু যৌবনের উত্তাপ কোত্থেকে ওঁর দৃষ্টিতে হাসিতে ভাষায় ভঙ্গিতে সঞ্চারিত হয়েছিল কে জানে ?

নাকি এ ওঁর অভ্যস্ত পটুতা ? গণতোষণ আর নারী তোষণে ওঁর কুশলতা থাকাই তো স্বাভাবিক।

সুতপা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'আমার সম্বন্ধে কিছু বাড়িয়ে বলা যায় না একথা কেন বললেন ? মানে বাড়িয়ে বলবার মত কিছু নেই ?'

অমিয়দা বললেন, 'তা নয়। তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার সম্বন্ধে শত বাড়িয়ে বললেও তৃপ্তি হবে না। ইচ্ছে হবে আরো বলি। কিন্তু তুমি বক্তার এই অতি ইচ্ছাকেও শাসন করতে জানো।'

শুধু পরিহাস পটুতা নয়, স্তুতির ক্ষমতা নয়, মেয়েদের সম্বন্ধে অমিয়দা মাঝে মাঝে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ও দেন। এইতো মাত্র কিছুক্ষণ আগে সুতপার সঙ্গে ওঁর পরিচয়। এর মধ্যে ওর প্রকৃতির কথা তিনি এমন করে জানলেন কী করে ?

সত্যিই সুতপার মধ্যে এক স্বাভাবিক সংযম আমি লক্ষ্য করেছি। ওর কথাবার্তা চালচলন আচার আচরণ সবই সুশাসিত। বলতে পারি রক্ষণশীলতা শাসিত। কিন্তু রীতিনীতির গোঁড়ামি ওকে রক্ষাচণ্ডী করে তোলেনি। ওর সঙ্গে রোদ বৃষ্টিতে ঘোরাঘুরি তো কম করিনি। স্বাস্থ্যের বিধিনিষেধ যথেষ্ট ভেঙেছি। আরো কিছু ভাঙবার উন্মুখতা থেকে ও আমাকে সংবৃত করেছে। কিন্তু কখনোই মনে হয়নি, ওর মধ্যে রূপ-রস-অনুরাগের অভাব আছে।

একটু বাদে আমরা উঠে পড়লাম। প্রস্তাবটা আমিই করলাম। বললাম, 'চলুন অমিয়দা, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। আপনাকে এখানে তো কিছু খাওয়াতে পারব না। কাছেই একটা কফি হাউস আছে। একটু নিরিবিলি। মাঝে মাঝে আমরা ওখানে গিয়ে বসি। গল্প টল্প করি। যাবেন ? খাবেন এক কাপ কফি ?'

অমিয়দা বললেন, 'যেতে পারি। কিন্তু তোমাদের অসুবিধে হবে না তো ? রাত হয়ে যাচ্ছে।'

বললাম, 'না অসুবিধে কিসের। জানা শোনা হয়ে গেছে। তা ছাড়া এই হাসপাতাল আমাদের প্রায় বাড়িঘর।'

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছিল। পেশেন্টরা রোগশয্যায় শুয়ে বসে কাটাচ্ছে। আমি রোগকে সব সময় গ্রাহ্য করিনে। ডাক্তাররা বলেন, এই জন্যে আমার রোগ সারে না। শান্তশিষ্ট ভালো ছেলে হয়েও তো থেকে দেখেছি। তাতেই বা রোগ সারল কই। মাঝে মাঝে মনে হয় এই রোগই আমার অর্ধাঙ্গিনী জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকবে। অবশ্য কিছুকাল ধরে আমি বেশ ভালোই আছি। স্পূটাম যখন নেগেটিভ থাকে আমি পজিটিভ হয়ে উঠি।

কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লাম। পথকে সংক্ষিপ্ত ও শোভন করবার জন্যে ঠিক সদর রাস্তা দিয়ে গেলাম না। কেয়ারী করা ঝাউ গাছগুলির পাশ দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেলফুলের গন্ধ আসছিল। আকাশে খণ্ড চাঁদ। আজ কোন তিথি ঠিক জানিনে তবে চাঁদের আকার দেখে মনে হচ্ছিল পূর্ণিমা বেশি দূরে নেই।

অমিয়দা কী যেন ভাবতে ভাবতে চলছিলেন। হঠাৎ সুতপাকে বললেন, 'বেশ লাগছে। তুমি একটি কবিতা আবৃত্তি কর না। এই সময়ের সঙ্গে বেশ মানাবে। মহুয়াখানা দেব তোমাকে ?'

সুতপা বলল, 'না অমিয়দা এখন থাক।'

অমিয়দা আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। বললেন, 'থাক তাহলে। আলাদা কবিতায় দরকার কি। তুমি নিজেই তো একটি লিরিক।'

আর কেউ হলে অন্য কোন সময় হলে আমিও হাসতাম, সুতপাও হাসত। কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে আমার মনে হল না সুতপা হেসেছে। এই কমপ্লিমেন্টকে বরং সুতপা নিঃশব্দে যেন সারা

অন্তর দিয়ে গ্রহণ করল। উপভোগ করল। আমার মনে হল, ওর মধ্যে যে কবিতার অনির্বচনীয়তা আছে তা আমি এমন কোন একটি মুহূর্তে, এমন ভাষায় বলতে পারিনি। অমিয়দার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবক, এক রোমান্টিক নাটকের হিরো। আর সুতপা যেন সদ্য কৈশোর পার হয়েছে। এই ইলিউশন তিনি কী করে সৃষ্টি করেছিলেন, কী করে আরো একজনের মনে তা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন তিনিই জানেন।

কফি হাউসে এসেও সেই মোহাবেশ কাটল না।

ছোট হাউসটিতে বেশি ভিড় ছিল না। দোতলায় উঠে জানালার ধারে আমরা একটি নিরিবিলি টেবিল বেছে নিয়ে ত্রিকোণ রচনা করলাম। অমিয়দাকে দেখে অন্য টেবিলের দু একজন তাঁর দিকে তাকাল, কেউ কেউ ফিসফিস করে কী যেন বললও, কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করলেন না। কিংবা হয়তো লক্ষ্যও করলেন না। তিনি সুতপার মুখোমুখি বসলেন। সারা কফি হাউসে যেন আর কেউ নেই। আমি পাশে থেকেও যেন বহু দূরে আছি। কিংবা আমিও নেই।

আমার খুশি হবারই কথা। আমার বান্ধবী একজন গুণবানের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি যদি অস্বীকৃত হই অবজ্ঞাত হই, আমার আমিত্ব কোথায় থাকে?

নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দেবার জন্যেই যেন বললাম, 'কী খাবেন অমিয়দা?'

তিনি বললেন, 'শুধু কফি। তোমরা কি আর কিছু খাবে? আমি বলে দিই।'

আমি বললাম, 'না না। আমি বলছি।'

তিনি হেসে বললেন, 'ও তোমার বুঝি আজ হোস্টের রোল? ঠিক আছে। আমাকে যে পার্ট দেবে তাই নেব।'

আমি তিন কাপ কফি আর এক প্লেট কাজু বাদামের অর্ডার দিলাম।

তিনি সুতপার দিকে চেয়ে বললেন, 'তারপর তোমার কথা বল শুনি।'

সুতপা বলল, 'আমার কথা? আমার কথা কী আর বলব? ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কোথায় চাকরি বাকরি করব, ধরল এই রোগে। পুরো এক বছর হাসপাতাল বাস। তবু তো মনে হচ্ছে অল্পেই গেল।'

অমিয়দা বললেন, 'অসুখের কথা থাক। অন্য কথা বল।'

সুতপা বলল, 'অন্য কথা কী বলব?'

অমিয়দা বললেন, 'প্রত্যেকের জীবনেই বলবার মত কথা কিছু না কিছু থাকে।'

সুতপা বলল, 'সব কথা কি সব সময় বলা যায়?'

অমিয়দা একটু হেসে বললেন, 'তা ঠিক। সব কথা সব সময় বলা যায় না। সবাইকেও বলা যায় না।'

সুতপা বলল, 'আপনি সেই সবাইর মধ্যে পড়েন না।'

অমিয়দা বললেন, 'শুনে খুশি হলাম।'

কেবল আমাকে আর তোমাকে। কেবল আমি আর তুমি। অমিয়দা ভুলেও আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন না।

জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, 'কীভাবে তোমাদের আলাপ পরিচয় হল? তোমাদের বন্ধুত্ব কেমন এগোচ্ছে?'

কিন্তু সে সম্বন্ধে অমিয়দার যেন কৌতূহল কম। আমার কথা তাঁর মনে আছে কি নেই আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

বয় পটে করে কফি এনে রাখল। সুতপা প্রত্যেকের কাপে কফি ঢালল, দুধ মেশাল। তারপর চিনি দেওয়ার সময় অমিয়দার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাকে ক'চামচ চিনি দেব বলুন।'

অমিয়দা বললেন, 'আমি বলব তবে তুমি দেবে?' সুতপা বলল, 'বাঃ রে যদি বেশি হয় কি কম হয়।'

অমিয়দা বললেন, 'তা তো হবেই। তুমি যা দেবে তোমার দিক থেকে বেশি, আমার দিক থেকে কম।'

• সুতপা মধুর লীলায়িত ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'অমন যদি করেন তা হলে কাপ শুদ্ধু চিনি আপনার কফির মধ্যে ঢেলে দেব।'

অমিয়দা বললেন, 'না না, তা করতে যেয়ো না। তাতে বেচারা সলিলের ভাগে কিছুই পড়বে না। সলিলকে যা দাও, তার চেয়ে আমাকে বরং কিছু কম দিয়ো। তবে অনুপাতটা যেন উনিশ আর বিশের চেয়ে কম না হয়।'

আমি দেখছিলাম শুনছিলাম আর ভাবছিলাম। অমিয়দার এমন প্রসন্ন মূর্তি অনেকদিন দেখিনি। এ তো অভিনয় নয়, এ তো রঙ্গমঞ্চ নয়। এ যে একেবারে সরাসরি জীবনের মঞ্চে অবতরণ। কিন্তু দর্শক হিসাবে আমার আনন্দ কই ?

আমি আবার বললাম, 'অয়মহং ভোঃ।'

বললাম, 'অমিয়দা রাত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এবার ফিরতে হবে। বেশি দেরি হলে আবার কৈফিয়তের ঝামেলা আছে।'

অমিয়দা বললেন, 'ওহে তাই তো, আমি ভুলেই যাচ্ছিলাম। সলিল, এই বিস্মৃতির জন্যে কিন্তু আমি দায়ী নই।' বলে সুতপার দিকে তাকালেন।

সুতপা একটু লজ্জিত হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর অমিয়দার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আমি যদি আপনাকেই দায়ী করি ?'

'তুমি যদি দায়ী কর ? তাহলে সব দায় দায়িত্ব মাথা পেতে নেব।'

অপূর্ব ভঙ্গিতে ঈষৎ মাথা নোয়ালেন অমিয়দা। এখনো কী ঘন কালো চুল। উনি কি কলপ পরেন ? নাকি সবটাই পরচুলা ? কে জানে ?

বিল মিটিয়ে দিলাম। অমিয়দা আরো কিছুক্ষণ বসে রইলেন। সুতপারও যেন ওঠার নাম নেই।

ওকে তুলে নেওয়ার গরজ আমারই। বললাম, 'চলুন অমিয়দা।'

তিনি বললেন, 'দাঁড়াও সলিল, আমার আর একটু করণীয় আছে।'

তারপর হেসে পকেট থেকে ডায়েরি বের করে আজকের পাতাটি সুতপার দিকে মেলে ধরে বললেন, 'কিছু লিখে দাও।'

কোন কিশোর যেন এক যশস্বিনীর অটোগ্রাফ প্রার্থী।

সুতপা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ওমা, আমি আবার কী লিখব। আমি কি লেখিকা নাকি ?'

তিনি বললেন, 'দু লাইন লিখতে হলে লেখিকা হবার দরকার হয় না। আজকের ইতিহাসটুকু স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক। সোনার অক্ষরে আর সোনার হাতে।'

আমি হেসে বললাম, 'অমিয়দা, ওর অঙ্গ কিন্তু সোনার অঙ্গ নয়। শ্যামল অঙ্গ।'

অমিয়দা আমাকে সস্নেহে তিরস্কার করে বললেন, 'তুমি একটি নির্বোধ। নির্বোধ আর অন্ধ। শুধু অঙ্গই দেখছ ? মনটা দেখতে পাচ্ছ না ? তা যে সোনায় মাখামাখি।'

নিজের কলমটি খুলে নিয়ে সুতপার হাতে গুঁজে দিলেন, 'নাও লেখ।'

সুতপা বলল, 'কী লিখব ?'

অমিয়দা বললেন, 'তা বলতে পারব না। খাতা দিলাম কলম দিলাম। এবার তুমি তোমার নিজের মনের কথা ঢেলে দাও।'

সুতপা একটু ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবল। কলম দিয়ে একটি দুটি আঁচড় কাটল। তারপর লিখে ফেলল কয়েক লাইন। ওর টুকরো চিঠি আমি অনেক পেয়েছি। দোতলা থেকে একতলায় প্রথম প্রথম চিঠিতে চিঠিতেই তো আমাদের আলাপ।

তবু অমিয়দার ডায়েরিতে ওকে লিখতে দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এ কি ঈর্ষা ? হতে পারে। কিন্তু অমিয়দারই বা একি ছেলেমানুষি ? কতক্ষণ আর এই ছেলেখেলা চেয়ে চেয়ে দেখা যায় ?

লেখা শেষ করে সুতপা ডায়েরিখানা তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিল।

প্রথমে তিনি নিজে মনে মনে পড়ে মৃদু হাসলেন। বন্ধ করে বুকপকেটে রাখতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। একটু যেন লজ্জিত হলেন। যেন কিসের একটা লুকোচুরি ধরা

পড়ে গেছে।

বললেন, 'দেখবে নাকি ?'

'আমি আর কী দেখব ?'

'না না, দেখ।'

তিনি এবার খুলে দেখালেন পকেট-ডায়েরির পাতা।

সুতপা লিখেছে—

'মনের কথা গুছিয়ে বলা ভারি শক্ত। কখনো কখনো বলতে ইচ্ছেও করে না। এলোমেলো ভাবে শুধু ভাবতেই ভালো লাগে। আজ তাই ভাবি। পারি তো কাল লিখব।'

আমার মনে আর একবার ঈর্ষার খোঁচা লাগল। এক সন্ধ্যায় এত অন্তরঙ্গতা ? আমার এখানে পৌঁছতে এক বছর লেগেছে। আমি ভাবতাম এ ধরনের চিঠি সুতপা বুঝি শুধু আমাকেই লেখে। এখন দেখছি সবাইকেই লেখে।

এ কি শুধুই রঙ্গকৌতুক ? এর আড়ালে আর কি কিছুই নেই ?

সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে আমরা খোলা ছাতে একবার দাঁড়ালাম।

রাস্তায় লোক-চলাচল। যানবাহনের ভিড়। অমিয়দা বললেন, 'যেন মেলা মিলেছে। বেশ লাগছে, তাই না ?'

তারপর হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর এক মেলা লক্ষ্য করেছ সুতপা ?'

একটুকাল মুগ্ধ এবং স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এ যেন আর এক মানুষ। আকাশে তারার মেলা আমিও চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আমি দেখছিলাম একটি তারাকে। সেই তারা কত উজ্জ্বল, তবু কত সুদূর।

সুতপার মনের আকাশে তখন বাল্যস্মৃতির তারা। ও তার মধুর অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'জানেন, গরমের দিনে গাঁয়ের বাড়িতে আমরা ছাতে ঘুমোতাম। অনেক রাত্রে হঠাৎ এক-একদিন ঘুম ভেঙে যেত। পাশে রাঙাদি ঘুমে বিভোর ; আমি শুয়ে শুয়ে তারা দেখতাম। গা ছমছম করত। মনে হতো কী একা, কী একা ! মনে হতো কেউ বুঝি আমাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। ভয়ে ভয়ে ডাকতাম, রাঙাদি, এই রাঙাদি, ওঠো।'

সুতপার এই নিবিড় অনুভূতির কথা এর আগে তো এমন করে শুনিনি।

রাস্তায় নেমে অমিয়দা বললেন, 'এখানে ফুল আছে ? এসো, তোমাদের ফুল কিনে দিই।'

বাজারের কাছে ফুলের দোকান একটি আছে। সেই দোকান থেকে আমি অনেকদিন ওকে ফুল কিনে দিয়েছি। আজ অমিয়দা কিনলেন। প্রত্যেকের হাতে এক ডজন করে রজনীগন্ধা। দুটি গোলাপও কিনলেন। সুতপার দিকে ফুল দুটি বাড়িয়ে দিলেন।

সুতপা বলল, 'সব আমাকে কেন ?'

অমিয়দা বললেন, 'সব আর কোথায় ? দুটি তো মাত্র ফুল।'

সুতপা একটু হেসে বলল, 'একটি আপনি নিন।'

অমিয়দা হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দাও।'

সুতপা বলল, 'কিন্তু আপনার দেওয়া ফুলই আপনাকে দিচ্ছি ! আপনি তো আমাকে কিনতে দিলেন না।'

অমিয়দা হেসে বললেন, 'তবু তুমিই সব দিলে। দিতেও দিলে নিতেও দিলে।'

হঠাৎ আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। লজ্জিত হলেন বোধ হয়। এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'সলিল, এবার আমাকে যেতে হবে। সাবধানে থেকো। শরীরের অযত্ন কোরো না।'

আবার আমার সেই অমিয়দার অমৃত-স্পর্শ। কিন্তু এতক্ষণ উনি কোথায় ছিলেন ?

ওঁকে বাসে তুলে দিলাম। তারপর সুতপা আর আমি পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। এগোতে লাগলাম হাসপাতালের দিকে। একটু বাদে আমি বললাম, 'কেমন লাগল, সুতপা !'

'কাকে ?'

'কাকে আবার ? অমিয়দাকে ? তুমি তো একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিলে।'

আমি একটু হাসলাম।

সুতপা লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বল। তবে ভারি মজার মানুষ কিন্তু। বেশ লাইভলি। সন্ধ্যাটি বেশ কাটল। তাই না?'

আমি সংক্ষেপে বললাম, 'হুঁ।'

আরো কয়েক পা এগিয়ে সুতপা বলল, 'শোন, এই গোলাপটি তুমি নিয়ে যাও।'

বললাম, 'না। ওটা তো আমাকে উনি দেননি। তোমাকে দিয়েছেন।'

'কী হিংসুটে!'

তারপর সুতপা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

আজ সন্ধ্যায় ওর এই উল্লাস উচ্ছলতাকে কেন আমি প্রসন্ন মনে নিতে পারছিনে! অমিয়দা যদি ওকে আনন্দ দিয়ে থাকেন সে তো আমারই অমিয়দা। সুতপা যদি আনন্দ পেয়ে থাকে সে তো আমারই বান্ধবী। কিন্তু যে মন আজ এমন করে কষ্ট পাচ্ছে, সে মনও আমারই। দুর্বল পঙ্গু অসহায়, আমার ফুসফুসের মতই বিক্ষত। তবু সে মন একান্তই আমার। তাঁর স্বত্ব আমি অস্বীকার করি কী করে? এই অসহায় মন নিয়ে আমি নিজেই কি কম বিব্রত? কিন্তু নিজের দুর্বল অঙ্গে যেমন আমি হাত বুলোই, তেমনি যতই বকিঝকি, দুর্বল মনের ওপরও আমার অসীম মমতা। হয়তো সেইজন্যেই তার দুর্বলতা আর গেল না। জীবনেও যাবে কিনা কে জানে!

আজকের এই সন্ধ্যাটির জন্যে আমি কি অমিয়দার ওপর অবিচার করছি? ঈর্ষা করছি একজন প্রৌঢ়ের ক্ষণিক চিত্তবিনোদনকে? যদিও সব সময় তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দেননি, একথা আমাকে বলতেই হবে।

মাঝে মাঝে তাঁকে আমার নিষ্ঠুর নির্মম স্বার্থপর বলে মনে হচ্ছিল। আশ্চর্য, তিনি আমার কথা ভুলে যাচ্ছিলেন কী করে? তাঁরই স্নেহভাজন, দুর্বল অসহায় এক চিররুগ্নর কথা? তার একমাত্র আশ্রয়কে তিনি কি ক্ষণিকের জন্যেও কেড়ে নিয়ে যাননি?

তবু তাঁর ওপর আমার বিদ্বেষ-বোধ অনুচিত। তাঁকে নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। তাঁর এই সম্মোহন শক্তি শুধু দুটি-একটি সন্ধ্যার জন্যেই। যে কলাকৌশলে তিনি এই মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিঁড়ে পড়তে কতক্ষণই বা লাগবে? এই মোহাবেশ সুতপার মনে কতক্ষণই বা স্থায়ী হবে?

সে কথা নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা। সুতপা যখন ওঁর সঙ্গে কথা বলছিল, আমি ওকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। আমি দেখছিলাম উদ্বেল উচ্ছল বর্ণবহুল জীবন ওকে কীভাবে হাতছানি দিচ্ছে।

আমি ভাবছি, হাসপাতালের এই রোগশয্যা আঁকড়ে-থাকা আমাকেই বা ক'দিন সুতপা মনে রাখতে পারবে?

দুই যোদ্ধা

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে।

নিরঞ্জন চৌধুরী বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগলেন। আশা করতে লাগলেন কেউ যখন ধরছে না ফোনটা আপনিই থেমে যাবে। কিন্তু সে আশা বৃথা। কোন নাছোড়বান্দা টেলিফোনটা হাতে নিয়েছে কে জানে। সে কচ্ছপের মত ধরতে জানে ছাড়তে পারে না।

বিছানায় শুয়েই নিরঞ্জন হাঁক দিলেন, 'টেলিফোনটা কেউ ধরো না গিয়ে।'

প্রথমে কারো কোন সাড়া পেলেন না। ছেলে টিকলু সশব্দে ফিজিক্সের 'সাউন্ডের চ্যাপটার' পড়ছে। ওর এবার ক্লাস নাইন হল।

ফোন ধরায় ওর বেশ উৎসাহ। কিন্তু কি বলতে কি বলে ফেলবে তাই ওকে ফোনের কাছে

যেতে দেওয়া হয় না।

তা ছাড়া মনীষার খুব আপত্তি। সে ছেলেকে অনাচার মিথ্যাচার থেকে এখনো বাঁচাতে চায়। হায়রে দুরাশা! এই নীতিবাগীশিনী সহধর্মিণীকে নিয়ে মহা বিপদে পড়েছেন নিরঞ্জন। মেয়ে দুটোকেও দলে টেনে সে ওদের বাবাকে একঘরে করতে চায়। মিতা ফিলজফি নিয়ে এম. এ. পড়ে আর রিতা ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ.। ছেলেমেয়ে তিনটি গর্ভধারিণীর অহঙ্কারের আধার।

নিরঞ্জন হাসলেন। যেহেতু মেয়েরা পড়াশুনোয় ভালো, মনীষা বোধহয় এখনো স্বপ্ন দেখে ওরা দুজনে দুটি মহীয়সী মহিলা হবে। পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া। যেহেতু ওরা দেখতে সুশ্রী মনীষার এখনো বোধহয় আশা ওরা ভালো ঘরে ভালো বরে পড়বে। ধন্য আশা কুহকিনী। নিরঞ্জন দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছেন ওদের সমস্ত রূপ আর গুণ পুরুষ শিকারে নিয়োজিত হবে। বেঁচে থাকার জন্য ওদের নান্যঃ পন্থাঃ। কামিনীলোভী পুরুষের কাছ থেকে ওরা দু'হাতে কাঞ্চন লুটবে। এখন থেকে তাই ওদের শেখাতে হবে। সেই বিদ্যাই মহাবিদ্যা।

'মিতু রিতু মা ফোনটা ধরতো গিয়ে।' পাশ ফিরে শুতে শুতে নিরঞ্জন মেয়েদের অনুরোধ করলেন।

মনীষা এসে সামনে দাঁড়ালেন, সুশ্রী গৌরাঙ্গ। কিন্তু এখন আর যৌবনবতী ন'ন। সাজ সম্বন্ধে সেদিন পর্যন্ত নজর ছিল, এখন আর সাধ্যে কুলায় না। নেটের মশারি তুলে স্বামীর দিকে তাকালেন মনীষা। 'না, ওরা কেউ যাবে না ফোনের কাছে। একরাশ মিথ্যাকথা তোমার জন্যে কে বলবে শুনি, তোমার ফোন তুমি গিয়ে ধরো।'

নিরঞ্জন হাসলেন। সেই দস্যু রত্নাকরের সমস্যা, তার পাপের ভাগ দারাপুত্র কেউ নিতে চায় না। শুধু পাপার্জিত অন্নে ভাগ বসায়। বলা যায় না আমিও হয়তো একদিন বাল্মীকি মুনি হব।

শেষ পর্যন্ত মিতা গিয়েই ফোনটা ধরল। নিরঞ্জনও তাই চান, স্ত্রীর চেয়ে ওদের গলা কোমল মধুর। পাওনাদারেরা ওদের কথা কান পেতে শোনে।

শোবার ঘরে নয় বসবার ঘরে নয় সব ঘর থেকে সরিয়ে এনে একটি সরু প্যাসেজের মধ্যে টেলিফোনটিকে রেখেছেন নিরঞ্জন। পরনে ডোরাকাটা রাত্রিবাস। রাত্রে মানায়। কিন্তু দিনের আলোয় নিজেকে কেমন যেন ক্লাউন বলে মনে হয়।

ইস্পাতের আলমারিতে বিলিতি কাঁচ বসানো। নিরঞ্জন তাতে নিজের ছায়া দেখলেন। দেনায় মাথা বিকিয়ে গেছে। কিন্তু যারা মাথাটা কিনবে তারা ঠকবে না। পাকা মাথা নয়। এই ঊনপঞ্চাশেও কাঁচা কুন্তলদাম নিরঞ্জনের শিরোশোভা, বড়জোর দুটি একটি পাকা চুল খুঁজে বের করা যায়। ঊনপঞ্চাশেও ইচ্ছা করলে ঊনচল্লিশ বলে নিজেকে রমণীসমাজে চালাতে পারেন নিরঞ্জন। চালিয়ে থাকেনও। ঈশ্বর একেবারে নির্দয় নন। তিনি মনের শান্তি কেড়ে নিলেও দেহের শান্তি লুটে নেননি। শুধু শান্তি নয় শক্তিও। নিরঞ্জনের মনে হয় তাঁর দেহে এখনো অসুরের সামর্থ্য আছে। এত অত্যাচারেও দেহে রোগ নেই ব্যাধি নেই, স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগতে হয় না নিরঞ্জনকে। এ দান দেবতার নয়, দানবের। মদ অর্থাভাবে আগের মত প্রচুর আর চলে না। তবু কিছু তো চলে। কিন্তু গোরাচাঁদ অয়েল মিলের ম্যানেজার বিভূতি বটব্যালের মত অ্যালকোহলিক ফ্যাট জমেনি শরীরে। জিতেন্দ্রিয় মিতাচারী পুরুষ বলে নিজেকে এখনো বেশ চালাতে পারেন নিরঞ্জন। দুর্ভাগ্যের ভূমিকম্পে সব ধসে গেছে। তবু দেহ অটুট। কিন্তু মনোবলহীন এই দেহকে নিয়ে আমি কী করব ? ঠেলাগাড়ী চালাব ? মোট বইব ? নাকি ডাকাত হব ? ধার করে করে আর পারিনে। অন্যের বুকে ছোরার ধার পরীক্ষা করার দিন এসেছে। কিন্তু পেন্সিল কাটা ছুরি ছাড়া আর কোন ছুরি ধরতে শিখেছি যে এখন তা চাইলেই পারব ? নিরঞ্জন মনে মনে হাসলেন। তারপর মেয়ের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। কার সঙ্গে তাঁর এই তন্বী লাবণ্যবতী মেয়েটি কথা বলছে বুঝতে চেষ্টা করলেন নিরঞ্জন। ফোনে আলাপ করবার মত ওদেরও বন্ধুবান্ধব আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা কেউ ধরেছে বলে মনে হচ্ছে না। ধরলে বেঁচে যেতেন নিরঞ্জন। 'বাবা অসুস্থ, শুয়ে আছেন। আপনি বরং পরে ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন।'

ফোনটা রেখে দিল মিতা।

শুধু এই কথাটুকু শুনে পাওনাদারকে শনাক্ত করতে পারলেন না নিরঞ্জন। তাই জিজ্ঞাসা

করলেন, 'কে' ?

মিতা বিরক্ত হয়ে বললো, 'নিউ ন্যাশনাল পাবলিসিটির সঞ্জয় সিকদার।'

নিরঞ্জন হেসে বললেন, 'সে কি ? এরই মধ্যে তাগিদ দিতে শুরু করেছে। ওতো মাত্র আমার দেড় মাসের উত্তমর্ণ।'

জানলার ধারে রিতার পড়ার টেবিল, সামনে ঝুলছে ফুলের টব। সেখান থেকে উঠে এসে রিতা নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'বাপি, এই এক সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন ভদ্রলোক ফোন করলেন।'

'তা হলে অন্য ইনটারেস্ট আছে। আসলের চেয়ে সুদের দিকেই লক্ষ্য।'

রিতা একটু ব্লাশ করল, ওর গায়ের রং দিদির চেয়ে আরো ফর্সা। রিতা ফের গিয়ে টেবিলে পড়তে বসল।

মনীষা কোত্থেকে কথাটা শুনতে পেয়েছেন, কোথায় ছিলেন কে জানে, তেড়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

'হল কি তোমার ? নিজের মেয়েদের সামনে ওই সব কথা বলছ ? মুখে আটকায় না ?'

নিরঞ্জন হেসে বললেন, 'সত্যি বড়ো আলগা হয়ে গেছে, ছুঁচ সুতো দিয়ে ফের দাও না গেঁথে।'

মিতা দু'পা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, 'বাপি'!

'কী বলছিস ?'

'সব নিয়ে তোমার দেনার পরিমাণ কত ? কতজনের কাছে তোমার ধার ?'

নিরঞ্জন বললে, 'তা শুনে তুই কী করবি ?'

মিতা আবেগরুদ্ধ স্বরে বলল, 'মার, আমার, রিতার গায়ে যে গয়না আছে, আমাদের যা কিছু জিনিসপত্র আছে সব বিক্রি করে দিলেও কি তোমার দেনা শোধ হবে না ?'

নিরঞ্জন গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? তোমাদের গয়নায় আমি হাত দিতে পারবো না। তবে এই রেফ্রিজারেটর আর আলমারি, সোফা সেট যে বেশিদিন আর ধরে রাখতে পারবো তা মনে হয় না।' মিতা বললো, 'এ সবের কিছুই দরকার নেই বাপি। সব বিক্রি করে দিলেও কি তোমার দেনা শোধ হবে না ? অন্তত খানিকটা তো শোধ হবে।' নিরঞ্জন বললেন, 'তা হয়তো হবে, কিন্তু আবার তা সঙ্গে সঙ্গে গজাবে। দেনা ঠিক দাড়ির মত। যত ছেটে ফেলি তত বাড়ে।' কিন্তু এ কথায় মেয়ে হাসল না। সে আরও কঠিন স্বরে বলল, 'ঠাট্টা নয় বাপি। চলো এই চারশো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে আমরা বস্তিতে গিয়ে থাকি। আমরা সবাই মিলে খাটব। তাতে আমাদের শাকভাত ডালভাত যা জোটে তাই ভালো। এখানে আমরা মুখ দেখাতে পারিনে। সবাই আমাদের দেখে হাসে। আঙুল দিয়ে দেখায়। তুমি আমাদের এমন দশা করে ছেড়েছ।'

নিরঞ্জন ভাবলেন এ তো তাঁর মনের কথা। তাঁরও তো মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় সব বিক্রি করে দিয়ে দেনা মেটাতে। হীনতা ত্যাগ করে দীনতা বরণ করতে। শুতে বসতে হাঁটতে চলতে এ সংকল্প দিনে রাতে তিনি কতবার যে করেন তার ঠিক নেই। কোন কোন সময় মনে হয় সেই শুভ সংকল্প বুঝি জয়ী হল। সত্যিই তিনি বুঝি গ্লানিমুক্ত হলেন। ভয়-দুশ্চিন্তা-অপমান-মুক্ত। তিনি দেখতে পান দক্ষিণ কলকাতার এই অভিজাত পাড়া ছেড়ে এক অখ্যাত পল্লীতে একশো দেড়শো কি আরো কম টাকার ভাড়ায় দুখানা ঘরের একটি বাড়িতে স্ত্রী পুত্র মেয়েদের নিয়ে তিনি বাস করছেন। দুশো আড়াইশো টাকা মাইনের একটি কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন। স্ত্রী মাস্টারি করছে, মেয়েরা টুইশন করছে। সেই অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীতে একটি ভদ্র পরিবার প্রতিদিনের আহার বাসের জন্যে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছে। এ ছবি প্রায়ই দেখতে পান নিরঞ্জন। কিন্তু বেশিক্ষণ তা চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকে না। ছায়াছবির মতই দেখতে না দেখতে মিলিয়ে যায়। এক অশিল্পীর স্থূল রোমশ হাত সেই পূত পবিত্র চিত্রের ওপর কালো তুলি বুলিয়ে দেয়।

অবশ্য এ বাড়ি ছাড়তেই হবে নিরঞ্জনকে। ভাড়া যে পরিমাণ বাকি পড়েছে তাতে বাড়িওয়ালা আর বেশিদিন এখানে থাকতে দিতে রাজি হবে না। যতদিন টালবাহানা করে কাটানো যায়। ঘাড় ধরে নামিয়ে না দিলে নিরঞ্জন এখান থেকে নড়বেন না। এই অচিরস্থায়ী জীবনে ছলে হোক বলে হোক যতটুকু সুখ সম্পদ তুমি ভোগ করতে পার ততটুকুই তোমার লাভ। মৃত্যুর পর তুমি যখন

নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে, তুমি যখন নির্ঘাত ধূলিতে লীন হবে, কোন সুনাম দুর্নাম তোমাকে যখন স্পর্শ করতে পারবে না তখন কিসের ভয় ? তখন কেন তুমি খেটে খাবে, কেন তুমি ঋণ করে ঘি খাবে না ? কেন তুমি পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে না যখন অনেককেই তুমি তা ভাঙতে দেখো।

খাবার ঘরে এসে বসেন নিরঞ্জন। চা বিস্কিট দিয়ে প্রাতরাশ সারেন। আগে চায়ের সঙ্গে ডিম মাখন রুটি মর্তমান কলা অনেক কিছু ছিল। বর্তমানে সে সব অদৃশ্য। তার বদলে স্ত্রীর মুখনাড়া আছে। আছে কখনো গঞ্জনা কখনো হিতোপদেশ। সে হিতকথা মধুর নয়। হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ।

নিরঞ্জন মনে মনে বলেন, 'কিন্তু আমি হিতকথা শুনতে চাইনে, শুধু মধুর কথা চাই। সে মাধুর্য ক্ষণস্থায়ী হোক সেও ভালো। মিথ্যে হোক সেও ভালো, মঙ্গলের দরকার নেই, আমি চাই রমণীয়তা।'

ফরমাইকার আস্তরণ দেওয়া সুদৃশ্য বিরাট ডাইনিং টেবিলটা পড়ে আছে। টেবিলটা শূন্য। আহার্যের কোন উপচার উপকরণ নেই। প্রাচুর্যের দিনে স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে খেতে ভালোবাসতেন নিরঞ্জন। এখন আর তা হয় না। এখন তিনিও ওদের কাছে ডাকেন না, ওরাও সহজে কাছে ঘেঁষে না। পারিবারিক বন্ধন শিথিল ছিন্নপ্রায়। চোখ দেখে মনে হয় যেন একজন আর একজনের মুখের গ্রাস কেড়ে খাবে সেই মতলব নিয়ে রয়েছে। ওদের সামনে বসে খেতে আর ভালো লাগে না নিরঞ্জনের। ওদের চোখগুলি যেন অভিযোগের বল্লম। সে চোখে শ্রদ্ধা নেই, প্রীতি নেই, সহানুভূতি নেই। শুধু তর্জনীসংকেত আছে—'তুমি, তুমি, তুমি। তুমিই দায়ী। তোমার দুষ্কৃতিই আমাদের এই দুর্দশার পঙ্কে টেনে নামিয়েছে।'

এই খাবার টেবিলে আজকাল কেউ আর এসে বসে না। আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, আজকাল বন্ধুজনেরাও বিমুখ হয়েছে। আগে অনাহূত হয়েও অনেকে আসত। আজকাল ডাকলেও আসে না। সবাই রুষ্ট অসন্তুষ্ট উত্তমর্ণ। কারো ধারই শোধ করতে পারেননি নিরঞ্জন। কেউ কেউ হয়তো ভাবে এক কাপ চায়ের বদলে নিরঞ্জন মোটা টাকা ধার চেয়ে বসবেন।

চেয়ারগুলি আজকাল শূন্য পড়ে থাকে। টেবিলটা খাঁ খাঁ করে। নিরঞ্জন ভাবেন টেবিলটা এবার বিক্রি করে দিলে হয়। হাতে কিছু নগদ টাকা আসে।

ছোট মেয়ে রিতা এসে কাছে দাঁড়ায়, 'বাপি।' রিতা তো নয় রিক্তা। ওদের গায়ে গয়নাগাটি এখন আর কিছু নেই। যা আছে সব ঝুটো। মিতা তখন মিথ্যাই গয়নার দম্ভ করেছিল।

নিরঞ্জন মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি রে।'

রিতা বলল, 'একজন ভদ্রলোক এসে ড্রয়িংরুমে বসেছেন।'

নিরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন ওঁকে বসতে দিলি ?'

রিতা বলল, 'আমি কি তাঁকে ডেকে এনে বসিয়েছি ? তিনি নিজেই এসে বসলেন।'

'বলতে পারলিনে বাপি বাড়ি নেই।'

'কী করে বলব ?'

নিরঞ্জন বিরক্ত হলেন, 'কী করে বলব ! কোথাকার লেডী যুধিষ্ঠির এসেছিস। এথিকস তোর দিদির স্পেশাল পেপার। তবু কেমন অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারে। আর তুই একটা দুটো কথা বানিয়ে বলে লোকটিকে তাড়াতে পারিসনে ? হোপলেস।'

রিতা বলল, 'তিনি জানেন তুমি বাড়ির ভিতরই আছো, বোধহয় জানালা দিয়ে দেখতে পেয়েছেন।'

নিরঞ্জন হুকুমের সুরে বললেন, 'কাল থেকে এ বাড়ির সব জানালা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখবি। কখনো খুলবিনে।'

জামাকাপড় বদলে নিরঞ্জন বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন। আসবার আগে আড়াল থেকে একটু দেখে নিলেন। আধা পরিচিত কে এই ভদ্রলোক। ওঁর কাছ থেকে কখনো টাকা ধার নিয়েছেন বলে তো মনে পড়ে না। বলা যায় না স্বয়ং পাওনাদার না হলেও হয়তো তার কোন দূত কি গুপ্তচর।

নিরঞ্জন সতর্ক পদক্ষেপে একটু একটু করে এগোলেন। মুখে হাসি টেনে বললেন, 'কী ব্যাপার।

আপনি কোত্থেকে—'

ভদ্রলোকের মাথায় কাঁচা পাকা চুল, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি। ভাব ভঙ্গিতে ভয়ানক কিছু মনে হল না।

ভদ্রলোক বিনীত হাস্যে বললেন, 'স্যার আমাকে চিনতে পারছেন না ?' নিরঞ্জন স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। 'আমি সোনাপাড়া থেকে এসেছি। আমাদের স্কুলে আপনি সেবার দুশো পঞ্চাশ টাকা ডোনেট করেছিলেন, তখন ছিল জুনিয়র হাই। এখন পুরোপুরি হাইস্কুল হয়েছে।'

নিরঞ্জন হেসে বললেন, 'হ্যাঁ এবার মনে পড়ছে। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আপনারা এসেছিলেন। এবারো কি ডোনেশন চাই নাকি ?'

নিরঞ্জন হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন। যেন চাইলেই তিনি টাকাটা এই মুহূর্তে দিয়ে ফেলবেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'না স্যার। ডোনেশনের আর দরকার নেই। আপনাদের আশীর্বাদে স্কুল আমাদের সেলফ সাপোরটেড হয়েছে। সরকারী অ্যাফিলিয়েশনও পেয়েছি আমরা। আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশন এই মাসের পনেরোই। আপনাকে কিন্তু আসতে হবে স্যার।'

ভদ্রলোক নিরঞ্জনের নাম ঠিকানা লেখা একখানা খাম বাড়িয়ে ধরলেন তাঁর দিকে।

'কার্ড নিয়ে আমি আপনার অফিসে গিয়েছিলাম স্যার।'

'অফিসে ?' একটু আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন নিরঞ্জন। ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনি ছুটিতে আছেন কিনা। সুন্দরপানা এক ভদ্রলোক অল্প হেসে বললেন, আপনি লম্বা ছুটিতে আছেন। তখন আপনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে— । কাল আর সময় ছিল না স্যার। আজ তাই সকালের ট্রেনে চলে এসেছি।' কার্ডখানা হাত বাড়িয়ে নিলেন নিরঞ্জন। হাসিমুখে অতিথিকে বিদায় দিলেন। নিরঞ্জন যাবেন এই প্রতিশ্রুতিটুকু না নিয়ে তিনি ছাড়লেন না। নিরঞ্জন খোলা দরজার পাশে একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সোনাপাড়া এখান থেকে বেশি দূর নয়। ট্রেনে বড়জোর মাইল পনেরো। ভদ্রলোকের কানে নিরঞ্জনের দুষ্কৃতির কথা এখনো পৌঁছয়নি। তিনি তার ছিটেফোঁটা সৎকর্মের কথা এখনো মনে রেখেছেন। সেই কীর্তিটুকু কেবল অতীতেরই ! তার সঙ্গে কি আজকের নিরঞ্জন চৌধুরীর কোন সম্পর্ক নেই ?

নিরঞ্জন ভাবলেন, আজ যদি ওকে আমি ডেকে বলি বিদেশী সওদাগরী অফিসের সেই স্পেশ্যাল অফিসারের চাকরিটি আজ আর আমার নেই। নিজের দোষেই আমি তা খুইয়েছি। আজ আমার দোষের অন্ত নেই। আজ আমার ঋণ আরম্ভ। ছল চাতুরী আজ আমার জীবিকা। যদি বলতাম ভদ্রলোক কি কার্ডখানা রেখে যেতেন না ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন ? তিনি কি বলতেন আপনাকে তো আমি নিমন্ত্রণ করতে আসিনি। আপনি সেই মানুষ নন। আপনাদের দুজনের নামসাম্য আছে। কিন্তু আর কোথাও কোন মিল নেই। এ কার্ড আপনার নয়।

নিরঞ্জন ভাবলেন, তিনি ফিরিয়ে না নিলেও আমি এই মুহূর্তে সদম্ভে যদি কার্ডখানা ফেরত দিতে পারতাম। বেশ হত। যদি চেঁচিয়ে বলতে পারতাম আপনি চলে যান। আপনি ভুল করেছেন। আমি আর এক নিরঞ্জন চৌধুরী। আমি পুরোপুরি অসৎ। আমি মিথ্যা বলতে দ্বিধা করিনে। যে কোন খারাপ কাজ করতে পিছপা হইনে। যদি তা পারতাম তাহলে সেদিনের সেই সৎ সাধু নিরঞ্জন চৌধুরীর নাম ভাঙিয়ে আমাকে খেতে হত না। আর একজনের আইডেনটিটিকার্ড আমাকে বয়ে বেড়াতে হত না। আমি লজ্জা বোধ করি, ঘৃণা বোধ করি। কিন্তু উপায় নেই। ওই কার্ড দেখিয়ে এখনো আমাকে ধার নিতে হয়। আমি যদি চোরাকারবারী হতাম, যদি ডাকাতি করতে পারতাম তাহলে কি আমি ওই কার্ডের ধার ধারতাম ?

নিরঞ্জন দ্রুত হাতে দাড়ি কামিয়ে নিলেন। স্নান সারলেন। ন'টার মধ্যে বেরোবার জন্যে তৈরি। আগে যেমন অফিসে যেতেন এখনো তাই। কী হবে বাড়িতে বসে থেকে ? গৃহ এখন পরগৃহ।

মনীষা এসে সামনে দাঁড়ালেন, 'এত সাত তাড়াতাড়ি কোথায় বেরোচ্ছ ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'বেরোব না তো করব কি ? তোমার আঁচলের তলায় আর কতক্ষণ বসে থাকব ?'

মনীষা বললেন, 'কপাল আমার। আমার কি আর অত বড় আঁচল। সত্যি এত তাড়াতাড়ি

বেরোচ্ছ কেন ? আর তো অফিসের বালাই নেই।'

নিরঞ্জন দাড়ি কামাতে কামাতে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'সে বালাই ফের জুটতেও তো পারে। অন্তত চেষ্টা চরিত্র তো করে দেখতে হয়। একটা ইন্টারভিউ আছে।'

মনীষা সন্দিগ্ধ চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন, 'সত্যি বলছ ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'তোমার কাছে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি ?'

মনীষা বললেন, 'মিথ্যে বলাটা তোমার আজকাল অভ্যাস হয়ে গেছে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'আমার ওপর তোমার তো নিদারুণ শ্রদ্ধা দেখছি।'

মনীষা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর ফের বিরক্তির সুরে বললেন, 'এত তাড়াতাড়িই যদি বেরোন দরকার আগে বললেই পারতে। ডালভাত দুটো নামিয়ে দিতাম।'

কালও বাজার হয়নি আজও বাজার বন্ধ। নিরঞ্জন বললেন, 'কী দরকার তোমার অত কষ্ট করে ?'

তিনি নিঃশব্দে তৈরি হতে লাগলেন। চুল আঁচড়ালেন, শার্টের বোতাম লাগালেন।

মনীষা চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। বললেন, 'সত্যিই ইন্টারভিউ আছে ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'এক দফা ইন্টারভিউ তো তোমার কাছেই এখন হয়ে গেল।'

মনীষা বললেন, 'বাড়ি থেকে তো কিছু খেয়ে বেরোলে না। বাইরে খেয়ে নিয়ো তাহলে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'খেয়ে নিয়ো বললেই তো হয় না। আগেকার অফিসটি আর নেই যে পঞ্চ ব্যঞ্জনে লাঞ্চ খাওয়াবে। তোমার ভাঁড়ারে যেমন ভবানী আমার পকেটেও তাই। দাও দেখি দু চারটে টাকা। ফিরে এসে দিয়ে দেব।'

এই একই প্রতিশ্রুতি বাইরেও যেমন দিয়ে থাকেন ঘরেও তেমনি দেন নিরঞ্জন। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতিই রাখা হয় না।

মনীষা বলে উঠলেন, 'ঘরে কি টাকার গাছ পুঁতে রেখেছ যে টাকা দেব। শুনতে পাচ্ছ বাজার হচ্ছে না, ছেলেমেয়েগুলিকে খেতে দিতে পারছিনে—'

রাগ করে স্বামীর সামনে থেকে চলে গেলেন মনীষা। একটু বাদেই ফিরে এসে বললেন, 'এই নাও। মিতার কাছে এই পাঁচটা টাকাই মাত্র ছিল—'

হাত পেতে পাঁচ টাকার নোটখানা নিলেন নিরঞ্জন।

বেরোতে যাচ্ছেন, মনীষা বললেন, 'টাইটা বদলে গেলে হত না ? অমন একটা ময়লা টাই পরে কেউ কি ইন্টারভিউ দিতে যায় ?'

আলমারি খুলে খুঁজে পেতে আর একটা টাই বার করে আনলেন মনীষা। নিরঞ্জন বললেন, 'আনলেই যদি বেঁধে দাও।' মনীষা একটু হেসে বললেন, 'আহাহা সোহাগে আর বাঁচিনে।'

কিন্তু সত্যি সত্যিই আগের মত বেঁধে দিলেন টাইটা। টিকলুকে ডেকে বললেন, 'কী করছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ? জুতো জোড়া ব্রাশ করে দিলেও তো পারিস।'

টিকলু এসে জুতো ব্রাশ করতে বসে গেল। আগে খুব টিপটপ থাকতেন নিরঞ্জন। কিন্তু ইদানীং কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ওঠেন। এখনই বরং চাকচিক্যটা বেশি থাকা দরকার। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন পোশাক পরিচ্ছদে লোক যেন টের না পায়।

জুতো ব্রাশ করে টিকলু উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'ভালো করে ইন্টারভিউ দিয়ো বাপি। যা জিজ্ঞেস করবে চটপট জবাব দিয়ো।'

'খুব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে।'

হেসে সস্নেহে ছেলের গাল টিপে দিলেন নিরঞ্জন। রংটা কালো হয়েছে টিকলুর। কিন্তু মুখের ডৌলটুকু ভারি মিষ্টি।

হঠাৎ এই কিশোর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভাবান্তর হল নিরঞ্জনের। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর একখানা ফটো তিনি পকেটে করে বয়ে বেড়ান। আর কোন রক্ষাকবচের দরকার নেই। এই নির্দোষ নিষ্পাপ ছেলের ফটোই তাঁকে প্রতারণাবৃত্তি. ভিক্ষার জীবিকা থেকে রক্ষা করবে।

ছেলের এক ফোঁটা শ্রদ্ধার জন্যে তিনি আবার উঠে দাঁড়াতে পারবেন। আবার সেই সৎ নিষ্কলঙ্ক জীবনের অধিকারী হবেন।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসেন নিরঞ্জন। গলির মুখ থেকে বড় রাস্তায় পড়বার আগে একটু থেমে দাঁড়ান। গলির মোড়ে ছোটমত একটি দোকান। সামনের বাজার থেকে জিনিস কিনে ফটিক একটু বেশি দামে বিক্রি করে। ডিম আর আলু ওর কাছে প্রায় সব সময়েই থাকে।

নিরঞ্জন বললেন, 'এক কেজি আলু দাওতো ফটিক আর চারটি ডিম।'

ফটিক বলল, 'দাম কিন্তু নগদ দিতে হবে বাবু।'

নিরঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ, নগদই দিচ্ছি।'

পাঁচ টাকার নোটখানি বের করে দোকানদারের হাতে দিলেন নিরঞ্জন।

তারপর অনুরোধের সুরে বললেন, 'একটা কাজ করে দিতে হবে ফটিক। তোমার ওই ছেলেটিকে দিয়ে এই জিনিসগুলি আমার তিনতলার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে। আমার একটু তাড়া আছে। ফিরে যেতে পারছিনে।'

ফটিক বলল, 'ঠিক আছে বাবু। পৌঁছে দেব।' রাস্তার মোড়ে দু-চার জন প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা। কারো কারো সঙ্গে দৃষ্টি আর হাসি বিনিময়। কিন্তু ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের চৌরঙ্গী ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নীতীশ চাটুয্যে একটু বেশি আলাপী। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'অফিসে বেরোচ্ছেন নাকি নিরঞ্জনবাবু ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ ?'

তাড়াতাড়ি তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন নিরঞ্জন। লোকটি কি জানে তাঁর অফিস নেই ? তিনি এখন বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। জেনে শুনেও এই খোঁচা দেওয়ার প্রবৃত্তি ? অবশ্য নাও হতে পারে। এক অফিস থেকে চাকরি গেলেও যে আর এক অফিসে নিরঞ্জন চৌধুরীর মত লোকের এতদিন চাকরি জোটেনি সে কথা কারো কাছে অনুমানের অতীত।

কিন্তু লোকে তাঁকে অকারণে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করে। কী দরকার ছিল নীতিশ চাটুয্যের ওই নাগরিক সৌজন্যের।

বাসস্টপে এসে দাঁড়ালেন নিরঞ্জন চৌধুরী। এরই মধ্যে অফিসের ভিড় শুরু হয়েছে।

একজন আধচেনা ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী মিঃ চৌধুরী। বাসে যাচ্ছেন যে ? আপনার গাড়ি বুঝি সার্ভিসে ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ।'

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই হাসলেন নিরঞ্জন। রাজ্যশুদ্ধ লোক যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বানাবার ষড়যন্ত্র করে আমি কী করব ?'

কে যেন ভিতর থেকে টিপ্পনী কাটল, 'আহাহা, মিথ্যা কথা বলতে যেন তোমার কত আপত্তি। ওই বিদ্যায় যেন তুমি কত অপারগ। চিটিং বিগিন্স্ অ্যাট হোম। তুমি তো বাড়ি থেকেই প্রতারণা শুরু করলে। ইন্টারভিউর নাম করে মেয়ের টাকা ক'টা কেড়ে নিলে। স্ত্রীর আদরটুকু চুরি করলে। ছেলের পিতৃভক্তির ওপর ডাকাতি চালালে। তোমার কথা আর বোলো না।'

'বেশ করেছি।'

'বুঝতাম বুকের পাটা যদি বলতে পারতে আমি চোর হই, ডাকাত হই, ধার করি, ভিক্ষে করি তোমরা আমার ভজনা করতে বাধ্য।'

'ইন সো মেনি ওয়ার্ডস না বললে কী হবে তারা জানে আমি কী। জেনে শুনেই তারা আমার পরিচর্যা করে।'

'যেটুকু যা করে বাধ্য হয়ে করে, দায়ে ঠেকে করে। স্ত্রী পুত্র কন্যার কাছেও তুমি আমার নাম ভাঙিয়ে খাও ; আমার ছদ্মবেশ পরে যাও। সাহস নেই নিজের মূর্তিতে নিজের বেশে স্ত্রীর সামনে দাঁড়াও।'

'হাসালে তুমি। যাকে তুমি আমার বলছ সে এখন আমার সহধর্মিণী। তোমার ভাষায়

অর্ধাঙ্গিনী। দিনের মধ্যে কতবার যে সে মিথ্যা কথা বলে পাওনাদার ঠেকায় তার ঠিক নেই। তোমার ওই পুণ্যবতী সতী সাধ্বী পাড়াপড়শীর কাছে এখনো মিথ্যা জাঁক করে, আত্মীয়স্বজনের কাছে দেমাক দেখায়। আমি যেমন ছলনাময় সেও তেমনি ছলনাময়ী। সতী সাধ্বীর শাঁখা সিঁদুর ঠিকই আছে, বিছানা পাটি ঠিকই আছে, শুধু তোমার জায়গায় আমি তার শয্যাসঙ্গী।'

ভিড় ঠেলে বাসে উঠলেন নিরঞ্জন। দোতলা পর্যন্ত আর উঠলেন না, একতলাতেই রয়ে গেলেন। বসবার জায়গা নেই। রড ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলেন।

তিনি দেখতে পেলেন একটু দূরেই তাকিয়ে আছে এল আই সি-র শীতাংশু হালদার। সে বারবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। শীতাংশু আর এক মহাজন। ওর কাছ থেকে মাস দুয়েক আগে দুশো টাকা নিয়েছেন নিরঞ্জন। শোধ দেওয়া হয়নি। শোধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অনেকবার দিয়েছেন। লোকটি বাড়ি বয়ে এসে তাগিদ দিয়ে গেছে। টেলিফোনে তো প্রায়ই করে। আচ্ছা নাছোড়বান্দা। নিরঞ্জন মাঝে মাঝে ভাবেন ফোনের কানেকশনটা এবার কেটে দিলেই পারেন। আগে এই টেলিফোনে বন্ধুদের বান্ধবীদের কণ্ঠস্বর শোনা যেত। এখন শুধু পাওনাদারদের তাগিদ। কোন সাধে আর ফোন রাখা। তবু এই টেলিফোনে কারো মুখোমুখি না হয়ে নতুন ধারের জন্যে অনুরোধ করা যায়। মিথ্যে প্রতিশ্রুতিও টেলিফোনে দেওয়া সহজ। তা ছাড়া আরো একটি মিথ্যে আশার গুঞ্জরন মনে মনে শুনতে পান নিরঞ্জন। যদি ফের সুদিন আসে। তখন তো আর চাইলেই পাওয়া যাবে না। ফোনের বড় ডিম্যান্ড।

নিরঞ্জন শীতাংশুর দিকে চোখ না ফিরিয়েও বুঝতে পারেন ও তাঁর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। শীতাংশু নিরঞ্জনের চেয়ে অন্তত বছর পনেরোর ছোট। দেখতেও সুশ্রী স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ও যদি নিরঞ্জনের মত প্রৌঢ় পুরুষের রূপসুধা পান করে আনন্দ পায় করুক।

'পপৌ নিমেষাল·····লোচনাভ্যাম্।'

নিরঞ্জন মনে মনে আবৃত্তি করলেন আর হাসলেন। কালিদাসের এই শ্লোক যে এমন তাৎপর্যে মণ্ডিত হবে কে জানত।

বাস ট্রামে ওঠার এই এক বিপদ। সহস্র লোচনের মধ্যে কোন বিরূপাক্ষ মহাজন যে তাঁকে দৃষ্টিশূলে বিদ্ধ করতে থাকবে তা নিরঞ্জনের জানবার জো নেই।

গা সওয়া হয়ে গেছে আজকাল। তবুও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। হাতে টাকা থাকলে ট্যাকসি করে যেতেন। এখানে নেমে গেলেও হয়। কিন্তু এই জগুবাবুর বাজারের স্টপ থেকে এখন ট্রাম কি বাসে ওঠার সময় অন্তত ঠায় দু ঘণ্টা পথে আটকে পড়ে থাকতে হবে নিরঞ্জনকে। তার চেয়ে বাসের মধ্যে শীতাংশুর উপস্থিতি অস্বীকার করা ভালো, কি নিজের অস্তিত্বকে।

শীতাংশু যেন তাক করে ছিল। নিরঞ্জন এস্প্লানেডের মোড়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে শীতাংশুও নেমে পড়ল। একটা স্টপ বেশি এগিয়ে এসেছে শীতাংশু নিরঞ্জন তা জানেন। ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত যদি নিরঞ্জন যেতেন শীতাংশু নিশ্চয়ই অফিস কামাই করে তাঁকে ফলো করত। হয়তো পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতেও পিছপা হবে না।

এহেন ব্যক্তিকে এড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই। পিঠ দেখালে পিঠে ছোরা মারবে। তার চেয়ে মুখ দেখানোই ভালো। নিশ্চয়ই ঘুষি মারতে সাহস পাবে না।

বাস থেকে নেমে নিরঞ্জন ওর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, 'এই যে শীতাংশু আজ যেন একটু আর্লিয়ার বেরিয়ে পড়েছ।'

শীতাংশু গম্ভীরভাবে বলল, 'আমার তো বেরোবার এইই সময়। আপনাকে বরং আজকাল সব সময় দেখতে পাইনে।'

নিরঞ্জন স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। বলুক যা বলবার আছে, শীতাংশুই আগে বলে ফেলুক।

'আমার টাকাটার কী করলেন নিরঞ্জনদা ? এই সেদিনও বললেন এ মাসের প্রথমে দেবেন। আজ মাসের ফিফটিনথ।'

'নিরঞ্জনের মুখে তবু হাসি লেগে রইল। হেসে মধুর স্বরে বললেন, 'আজকের তারিখটিতো ভাই আমিও ক্যালেন্ডারে দেখে এসেছি। ভেবে ছিলাম এ মাসেই দিয়ে দিতে পারব। কিন্তু ভাই, এমন ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। ছেলেমেয়েগুলি সেই যে ভুগছে। ডাক্তারের বিলই শুধব না কি—'

শীতাংশু এবার স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বিরস কণ্ঠে বলল, 'মাসের পর মাস আপনি তো এই একই কথা বলে আসছেন।'

নিরঞ্জনের মনে আছে ঠিক একই অসুবিধার কথা বলেননি। এর আগের বারে এক দুস্থ আত্মীয়ার কন্যাদায়ের দোহাই দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে মহাজনের কথার কোন প্রতিবাদ করলেন না নিরঞ্জন। শুধু মৃদু প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহেই পেয়ে যাবে শীতাংশু।'

শীতাংশু বলল, 'আর পেয়েছি। করুন আপনার ধর্মে কর্মে যা লয়।'

শীতাংশু তাঁর দিকে পিছন ফিরে রাস্তা পার হয়ে গেল। নির্বিঘ্নেই পার হল। কলকাতার রাস্তায় কত দুর্ঘটনা ঘটে, কত গাড়ি এসে লরি এসে পদাতিককে চাপা দেয় কিন্তু শীতাংশুর বেলায় তেমন কিছুই ঘটল না।

শীতাংশু পার হয়ে গেল। নিরঞ্জন কিন্তু পার হতে পারলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ওই ফুটপাতে তার পুরোন অফিস। অফিস ঠিকই আছে। কাজকর্ম যথারীতি আগের মতই চলছে। শুধু নিরঞ্জনই সেখান থেকে চিরদিনের জন্যে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আর ওই অফিসে কখনো ফিরে যেতে পারবেন না। পুরোন সহকর্মীদের কারো সঙ্গে আজকাল দেখা সাক্ষাৎও বড় একটা হয় না। অবশ্য দেখা হোক নিরঞ্জন নিজেও তা চান না। দেখা হলেই একরাশ মিথ্যা কথা বলতে হবে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির একটা সীমা আছে। তা ছাড়া ভারি অস্বস্তি লাগে। এক কালের প্রিয় পরিচিত মুখগুলি আজকাল আর কোন সুখের উদ্রেক করে না। এই সেদিন পর্যন্ত নিরঞ্জন যাদের অনেকেরই ওপরওয়ালা ছিলেন আজ তিনি তাদের সবাব নীচে। সবার পিছে। দীনের হতে দীন। ওদের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছা হয় না নিরঞ্জনের। কোন দৃষ্টিই তো শুভদৃষ্টি নয়। কারো চোখে ঘৃণা, কারো চোখে বিদ্রূপ, কারো চোখে বা অনুকম্পা। ওই চোখগুলিকে এক এক সময় অন্ধ করে দিতে ইচ্ছা করে নিরঞ্জনের। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। নিজেই তাই চোখ ফিরিয়ে নেন। নিজেই চোখ বুজে অন্ধ সেজে থাকেন।

বৃত্তান্তটা এতদিনে অফিসের কারোরই আর জানতে বাকি নেই। নিরঞ্জনকে বাধ্য হয়ে রেজিগনেশন দিতে হয়েছে। সাহেব এই খাতিরটুকু দেখিয়েছেন। 'চৌধুরী তুমি স্বেচ্ছায় নাও চির নির্বাসিন দণ্ড। আমরা তোমাকে চলে যেতে বলব না। নিজেব মান বজায় রেখে তুমি নিজে বেরিয়ে যাও।'

তবু যদি কোম্পানির লাখ টাকা মেরে বেরোতে পারতেন নিরঞ্জন। তা পারেননি। সেদিকে মতি যায়নি। তাহলেও একটা গতি হত। হাতি ঘোড়া মারতে পারেননি। ছুঁচো চামচিকে মেরে হাত নষ্ট করেছেন। অফিসের উঁচু চেয়ারের মোটা মাইনের দোহাই দিয়ে বন্ধুবান্ধব পরিচিত আধা পরিচিত লোকের কাছ থেকে ধার করেছেন। সেই সব মরা ছুঁচো টিকটিকি বড় সাহেবের দরবারে গেছে নালিশ করতে। টেলিফোনে জ্বালিয়েছে। চিঠির পর চিঠি লিখেছে। সশরীরে হাজিরা দিতেও বাকি রাখেনি।

তারপর সাহেব নিরঞ্জনকে ডেকে নিয়ে বলেছেন, 'চৌধুরী হয় আমার তোমাকে রাখতে হয়, না হয় অফিসের প্রেস্টিজকে। কোম্পানি দ্বিতীয়টিকেই রক্ষণীয় মনে করেন। তুমি অন্য কাজকর্ম খুঁজে নাও।'

'তাই নেব' বলে সেদিন সদম্ভে বেরিয়ে এসেছিলেন নিরঞ্জন চৌধুরী। অফিস পরিচালনায় বিলিতি ডিগ্রি আছে। কাকে তিনি পরোয়া করেন ? কিন্তু আশ্চর্য, বাজারে ফিরি করতে গিয়ে দেখেন গিনি সোনা কোন ভোজবাজিতে কানাকড়ি বনে গেছে। এই রক্ষণশীল সমাজে তাঁর যোগ্যতা দক্ষতার কোন দাম নেই। দাম আছে শুধু কতকগুলি অখ্যাতি আর অপবাদের। তিনি রেস খেলেন, বিলাস ব্যসন ছাড়া তাঁর এক মুহূর্তও চলে না। লোক এত বাড়িয়েও বলতে পারে। এ সব ভাইস কি তার একার ? আরো কতজন তাঁর দলে। তাই বলে তারা কি কাজকর্ম করে খায় না ? স্ত্রী-পুত্র পালন

করে না ? কিন্তু আশ্চর্য সবাইর বেলায় সমাজের সমান অপক্ষপাত নেই। যে ধরা পড়ে সে মার খায়, যে মেরে যেতে পারে সে চূড়ামণি।

কিন্তু আজ নিরঞ্জনের কিছু টাকা চাই যে। আজ যে কিছু না হলেই চলবে না। স্ত্রীর দেওয়া ক'টি টাকায় সস্তা হোটেলে ডালভাত শাক চচ্চড়িতে অবশ্য মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেওয়া যায়, কিন্তু তারপর ? তাতেই কি সব তৃষ্ণা মিটবে ? তা ছাড়া নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণাই তো সব নয়। বাড়ির আরো চারটি প্রাণীর কথা ভাবতে হবে। রাত পোহালে রেশন আছে বাজার আছে। শরীর পোষণের জন্য এত কিছুর দরকার হয় মানুষের।

ডালহৌসী স্কোয়ার দিয়ে হাঁটতে থাকেন নিরঞ্জন। সরকারী বেসরকারী অফিসে আজ হানা দেওয়া যায়। চাকরির আবেদন নিবেদন নিয়ে আজকাল আর তিনি বড় একটা প্রার্থী হন না। যোগ্য কাজ কোথায় ? কোথায় সুযোগ্য নিয়োগকারী ? তাঁর অন্বিষ্ট আজ ভিন্নতর। পরিচিত কি স্বল্পপরিচিতদের মধ্যে কে কে বাকী আছে যার কাছে ধার চাওয়া যায় টেলিফোন গাইড খুলে কি পুরোন ডায়েরির পাতা উল্টে উল্টে সেই উত্তমর্ণের সন্ধান করেন নিরঞ্জন। আগে দু-হাজার এক হাজারের কম চাইলে মান থাকত না। এখন দুশো একশ থেকে বিশ পঁচিশে নামতে হয়। যে ঋণের কোন দলিল নেই, যার কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই, যে ঋণ পরিশোধের শুধু প্রতিশ্রুতি দিলেই চলে, পরিশোধ পর্যন্ত আর এগোতে হয় না তেমন দাতাকর্ণ নরোত্তম উত্তমর্ণকে খুঁজে বেড়ানোই এখন নিরঞ্জনের কাজ।

নিরঞ্জন এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোতে থাকেন। একদল লোককে তিনি এড়িয়ে যেতে চান। আগে যাদের কাছ থেকে ধার নিয়েছেন। আর একদল লোক তাঁকে এড়িয়ে যেতে চায় যাদের আশঙ্কা দেখলেই নিরঞ্জন তাদের কাছে ধার চাইবে।

কে জানে কারা দলে বেশি ভারী। ঘুরে ঘুরে যাচাই বাছাই করতে করতে ব্রেবোর্ন রোডের একটি ছ'তলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন নিরঞ্জন। আশেপাশে সামনে পিছনে লোকজন গিজগিজ করছে। দুটো লিফট পাশাপাশি উঠছে নামছে। যেটি নেমে আসছে, নিরঞ্জন তার অপেক্ষায় দাঁড়ালেন। এমন কোন লিফটে উঠতে পারলে ভালো হত যা ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধতর লোকে নিয়ে যায়। যেতে যেতে অদৃশ্য হয়ে যায়, পৃথিবীর মানুষ যার আর নাগাল পায় না। এমন কোন লিফটে নামতে পারলে ভালো হত যা ক্রমেই নামে, ক্রমেই নামে। যে অধঃপতনের শেষ নেই। নামতে নামতে যা ভূগর্ভের অতলে অদৃশ্য হয়ে যায়। পৃথিবীর ওপরের মানুষ যার আর নাগাল পায় না। কিন্তু নিরঞ্জনের ওঠানামা বড়ই সীমিত গণ্ডির মধ্যে। সবাই তা দেখতে পায়। শুধু তাই নয়। এ ওকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'ওই দেখ ওই দেখ লোকটার দুর্দশা দেখ। লোকটা কোত্থেকে কোথায় নেমে এসেছে চেয়ে দেখ।'

বুড়ো লিফ্‌টম্যান সেলাম জানাল। নিরঞ্জনকে চেনে বোধ হয়। চেনাই স্বাভাবিক। আগেও এ অফিসে এসেছেন। কিন্তু তখন তিনি স্পেশ্যাল অফিসার। এমন নির্বিশেষ, নিঃস্ব রিক্ত নন। কিন্তু নিরঞ্জন অসংকোচে তার সেই অভিবাদন গ্রহণ করলেন। এপাশে ওপাশে খোপে খোপে মৌচাকের মত অফিস, মৌমাছিদের গুঞ্জরন। লিফ্‌ট থার্ড ফ্লোরে এলে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলেন নিরঞ্জন। কর অ্যান্ড বসু প্রাইভেট লিমিটেডের সামনে এসে থামলেন। সুশ্রী তরুণী তির্যক চোখের দৃষ্টি দিয়ে রিসেপসনিস্টের লিপস্টিক রঞ্জিত হাসি দিয়ে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানাল।

নিরঞ্জন নিজের পুরোন কার্ডখানা এগিয়ে দিলেন তার সামনে। সুর্মাটানা চোখের তারায় এবার সম্ভ্রম প্রগাঢ় হল। পাইপ মুখে দিয়ে ট্রাউজারের পকেটে হাত রেখে নিরঞ্জন বললেন, 'সলিল বিশ্বাস আছে ? চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট' ?

বড় সাহেব কি ছোট সাহেব কারো নাম না করে সম্মানিত ভিজিটর অ্যাকাউন্ট্যান্টকে চাইবেন এ যেন এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিরঞ্জন তরুণীর সেই বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'সলিল আমার অনেক দিনের পুরোন বন্ধু, একটু দরকার আছে তার সঙ্গে।'

রিসেপশনিস্ট তাঁকে সামনের চেয়ারে বসতে বলে টেলিফোন তুললেন। একটু বাদে রোগা লম্বা একটু বা কুঁজো এক ভদ্রলোক নিরঞ্জনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার আধখানা জুড়ে টাক।

চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নিরঞ্জন সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'কেমন আছো ?' সলিলবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'অত চাপ দিয়ো না লাগে। তারপর কি ব্যাপার ? গরীবের বাড়িতে হাতির পা। তুমি এখানে। চল বসবে।' পাশের ভিজিটর্স রুমের দিকে নিরঞ্জনকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সলিলবাবু। নিরঞ্জন বললেন, 'বিনয়ের অবতার। তোমার প্রমোশনের খবর আমি পেয়েছি, কন্‌গ্র্যাচুলেশন।'

সলিলবাবু বললেন, 'আর ভাই বুড়ো বয়সে বিয়ে আর বুড়ো বয়সে প্রমোশন একই ব্যাপার। ক'দিনই বা ভোগসুখ করতে পারবো।'

নিরঞ্জন চোখ বাঁকা করে বললেন, 'ভোগসুখ ওসব বুড়ো টুড়োয় যায় আসে না। অভ্যাস, অনুশীলন। তারপর ? চীফ হয়েছ তবু ধুতি পাঞ্জাবিই বহাল রেখছ দেখছি। বিড়ির কৌটোটিও আছে নাকি সঙ্গে ? টাকা জমাবার ট্যাকটিক্স শিখেছ বটে।'

সলিলবাবু বললেন, 'কোথায় আর জমাতে পারলাম ভাই। যা খরচ সংসারের। তারপর তোমার খবর কি বলো।'

নিরঞ্জন বললেন, 'খবর একটু আছে। একটা জরুরি দরকার আছে তোমার সঙ্গে। বাইরে যাবে একটু ?'

সলিলবাবু নিরঞ্জনের দিকে তাকালেন, 'এখানেও বলতে পারো। কেউ তো নেই। নাকি আমার ঘরে আসবে ?'

কিন্তু নিরঞ্জন ভিতরে যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না। এ অফিসে চেনা জানা আরো কেউ কেউ আছে। এই মুহূর্তে তাদের মুখোমুখি হতে চান না নিরঞ্জন।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে একটু দূরে কোণের দিকে বন্ধুকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। সলিলবাবুর পিছনে দেয়াল। নিজে রইলেন বাইরের দিকে। যেন প্রস্তাবে রাজি না হলে লোকটিকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরতে পারেন নিরঞ্জন।

সলিলবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'ব্যাপারটা গোপন। প্রাইভেট অ্যান্ড পার্সনাল।'

সলিলবাবু একটু হেসে বললেন, 'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'কাউকে বলো না কিন্তু।'

'তোমার আপত্তি থাকলে বলব কেন ?'

নিরঞ্জন একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হঠাৎ বড়ো বিপদে পড়ে গেছি সলিল। স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত লুম্বিনী পার্কে দিতে হয়েছে।'

সলিলবাবু বললেন, 'লুম্বিনী পার্ক ? সে কোথায় ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'তুমি নামই শোননি ? ওখানে একটা লুনাটিক অ্যাসাইলাম আছে। আমার স্ত্রীকে সেখানে ভরতি করতে হয়েছে।'

সলিলবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কি হে মনীষার ও রোগ কবে থেকে হল ?'

নিরঞ্জন বললেন, 'বহুদিনের পুরোন। ইদানীং বেড়েছে। মহা অশান্তিতে আছি ভাই।' গলাটা ধরে এল নিরঞ্জনের। তারপর সলিলবাবুর দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে ফের বললেন, 'বাধ্য হয়ে হাসপাতালে দিতে হয়েছে। না দিয়ে উপায় কি। মারধোর চেঁচামেচি। জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ। কিন্তু ভাই মাসে সাতশো টাকা করে খরচ। এ মাসে হঠাৎ বড় ঠেকায় পড়েছি। তুমি শ'দুই টাকা আমাকে দাও তো। সামনের মাসের সেকেন্ড তারিখে তুমি ফেরত পেয়ে যাবে। ফার্স্ট আমি পাব সেকেন্ড তুমি।'

সলিলবাবু বন্ধুর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'সত্যিই বড় দুঃখের ব্যাপার। স্ত্রীর মাথা খারাপ হলে কি আর নিজের মাথা ঠিক থাকে ? বিশেষ করে অতগুলি ছেলেমেয়ে যার ? তোমার এই বিপদের দিনে টাকা দিতে পারলে খুবই ভালো হত। কিন্তু ভাই আমারও বড়ো দুর্দিন যাচ্ছে। আমার বাড়িতেও অসুখ বিসুখ।'

নিরঞ্জন একটু ঠোঁট কামড়ালেন, বললেন, 'সে কি ? শুনিনি তো ?'

সলিলবাবু বললেন, 'তোমার সঙ্গে কি আমার হামেশা দেখাসাক্ষাৎ হয় যে শুনবে ? এই তো দু

বছর আড়াই বছর বাদে দেখা। আমার স্ত্রীরও একটা মেজর অপারেশন হয়ে গেছে এর মধ্যে।' নিরঞ্জন বললেন, 'কোথায় ?' সলিলবাবু বললেন, 'পেটে।' মুড়ি আর ভুড়ি যত রোগের গুঁড়ি। খরচার একশেষ।' নিরঞ্জন হাল ছেড়ে দিলেও একেবারে ছাড়লেন না। বললেন, 'তা হ'লে অন্তত একশো দাও। তুমি ঠিক সেকেন্ড তারিখে পেয়ে যাবে। কোন ভাবনা নেই তোমার।' সলিলবাবু হেসে বললেন, 'ভাবনার কী আছে। তোমার কত বড় অফিস আর কত বড় চাকরি। দুশো চারশো টাকা তোমার কাছে কী। কিন্তু ভাই একশো তো দূরের কথা, দশটা টাকাও আমার দেওয়ার উপায় নেই। তোমাকে আমি ব্যাগ উপুড় করে দেখাতে পারি।'

নিরঞ্জন একটু হাসলেন। 'উপুড় করার আর দরকার নেই। তুমি আমাকে অমনিতেই কাত করে ফেলেছ। আজ না হোক দু-একটা দিন পরে দিলেও চলতো। পারবে ? কাল কি পরশু ?'

সলিলবাবু মাথা নাড়লেন। 'আজ কাল পরশুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই ভাই। আমাদের মত ছা-পোষা মানুষের কাছে সব সমান। সত্যি বড় দুঃখ হচ্ছে নিরঞ্জন কিছুই করতে পারলাম না তোমার জন্যে। আরো যেন কার কাছে শুনেছিলাম তোমার স্ত্রীর ওই অসুখের কথা। ভেবেছিলাম এতদিনে বুঝি সেরে গেছে।' নিরঞ্জন বললেন, 'সারল আর কই।' সলিলবাবু বললেন, 'তা ঠিক। সব রোগ সহজে সারে না। যাচ্ছ যে। চল আমার ঘরে। এক কাপ চা খেয়ে যাবে।' 'না না। চায়ের আর দরকার নেই।'

বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন নিরঞ্জন। সলিল কি সব টের পেয়েছে ? ও বোধ হয় ইচ্ছা করেই টাকাটা দিল না। ওর তাকাবার ভঙ্গিতে ওর কথার ধরনে মনে হচ্ছে ও যেন অনেক কিছু জানে। শুধু তাই নয়। ও আরো অনেককে না জানিয়ে ছাড়বে না। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাতটা নিশপিশ করছিল নিরঞ্জনের। কিন্তু উপায় নেই। ওই রোগা দুর্বল বুড়োটে চেহারার সলিল বিশ্বাসের গায়ে একটি আঁচড় কাটবারও উপায় নেই তাঁর। শুধু এই লোকজন ভরা অফিসের মধ্যে বলে নয়, নিরিবিলি কোন গলির মধ্যে সলিলকে পেলেও কি নিরঞ্জন তার গলা টিপে ধরতে পারতেন ? পারতেন না।

'সুতরাং দেখতে পাচ্ছ তুমি দুর্বল। ভয়ংকর দুর্বল। তোমার ওই পেশী বহুল দেহ বলের ছলনা মাত্র। আসলে বলবীর্য বলে তোমার কিছু নেই। তুমি শুধু স্ত্রীর কি ছেলে মেয়ের অসুখ-বিসুখ নিয়ে দু'একটা কাহিনী বানিয়ে বলতে পারো। সে গল্পও সকলের কাছে বিশ্বাস্য করে তুলবার শক্তি তোমার নেই। আর কারিকুরি জারিজুরি খাটাতে যেয়ো না। আমি যা বলি তাই করো। খেটে খাও। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করো। কেরানীগিরি যা জোটে তাই হাত পেতে নাও। সততার চেয়ে সেরা চাতুরী আর কিছু নেই।'

নিরঞ্জনের দ্বিতীয় সত্তা চুপ করে রইল। এই মুহূর্তে তার মুখ বন্ধ। পেট খিদেয় জ্বলছে।

নিরঞ্জন ভাবলেন করগুপ্ত কোম্পানির অফিসে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। এ অফিসে তিনি এর আগে আরো দু-একজনের কাছে এসে গোপনে ধার চেয়েছেন। তারা ব্যাপারটা গোপন রাখেনি। সব বিশ্বাসঘাতকের দল।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের একটি পাজাবি রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন নিরঞ্জন। কোন কেবিন খালি নেই। পিছনের দিকে একটি টেবিল বেছে নিলেন। দুখানা তন্দুরী রুটি আর হাফ প্লেট মাংসের অর্ডার দিলেন। শরীরের নাম মহাশয়। এর চেয়ে তাকে বেশি দানাপানি যোগাবার সামর্থ্য এই মুহূর্তে নিরঞ্জনের নেই।

মনে হলো আরও একটি চেনা মুখ নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে গেল। কাগজের রিপোর্টার গোকুল ভদ্র। ওর কাছে টাকা ধারেন না নিরঞ্জন। তবুও এই মুহূর্তে ওর সঙ্গ তাঁর কাছে অভিপ্রেত নয়। লোকটি অনেকের হাঁড়ির খবর রাখে। নিরঞ্জনের খোঁজ-খবরও নিশ্চয়ই ওর অজানা নেই। ওর চোখ-মুখের দিকে তাকালেই নিরঞ্জন তা বুঝতে পারেন। এই চতুর চোখগুলি নিরঞ্জনের কাছে এখন দুঃসহ। চেনা চোখের আড়ালে থাকবার জন্যে একটি মুখোশ পরে বেরোলে মন্দ হয় না।

'মুখোশ তো তুমি যখন তখনই পরছ।'

'কার মুখোশ ?'

'কেন আমার।'

খোঁচা খেয়ে দ্বিতীয় রথী চুপ করে থাকে। নিরঞ্জন মনে মনে বললেন, 'একটু বুঝে শুনে চললে সলিল বিশ্বাসের কাছে আর অমন করে ধরা পড়তাম না। লোকটি দেখতে হাবা-গোবা। কিন্তু আসলে ধূর্তের একশেষ।'

কিন্তু মুখ ফুটে বলতে হয় না। একজনের মনের ভাবনা অন্য একজনে সঙ্গে সঙ্গে টের পায়। তার পেটভরা শুধু খোঁচামারা কথা।

'সলিলকে গাল দিয়ে কী হবে ? দোষটা কার ! তা ছাড়া ধরা কি তুমি এই প্রথম পড়লে যে এত জ্বালা ? লাঞ্ছিত অপমানিত এই কি প্রথম হলে ? পদে পদে হচ্ছ। তবু তো তোমার শিক্ষা হল না।'

'থাক থাক। আমাকে আর তোমার শিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। আমার একটু ফুটো পেলেই তুমি ছুঁচ ঢুকিয়ে দাও। আমি যখন প্রচুর ধার পেতাম, চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়ের ব্যবস্থা করতাম তুমি দিব্যি তাতে ভাগ বসিয়েছ। তখন কি তুমি বলেছ, আমি ওসব চাইনে ? আমি কিচ্ছু খাইনে ? আমাদের গ্রীবা আলাদা, পরস্পরকে ভেংচি কাটবার জন্যে দু'খানি মুখ আলাদা। কিন্তু আমরা উভয়ে আসলে একই সত্তা। শুধু আমার দুর্ভোগের বেলায় তুমি স্বার্থপর আলাদা হয়ে যাও। হাতি যখন কাদায় পড়ে চামচিকেতেও লাথি মারে।'

'যাই বলো না কেন। ছুঁচো চামচিকের পরামর্শ এবার মন দিয়ে শোন। যে কোন জীবিকা বেছে নাও। কিন্তু জীবনটিকে সৎ রাখো। চুরি কোরো না, ভিক্ষে কোরো না, প্রতারণা কোরো না। পাঁচজনের কাছে শ্রদ্ধা আর সম্মান নিয়ে যদি বাঁচতে পারো শাকান্নও পরমান্ন।'

শহরের পথে পথে ঘুরতে থাকেন নিরঞ্জন আর ভাবতে থাকেন সত্যি সমাজে জীবিকার অভাব নেই। ফলওয়ালা ফল বিক্রি করছে, কাপড় গজ মেপে বিক্রি করছে মুসলমান ফিরিওয়ালা। কিন্তু তাই বলে নিরঞ্জন এক্ষুনি ফলওয়ালাও হতে পারেন না, কাপড়ওয়ালাও হতে পারেন না। ট্রাম বাসের কন্ডাক্টর হতে পারেন না। কোন অফিসে গিয়ে ধুপ করে একখানি চেয়ারে বসে বলতে পারেন না দাও আমাকে দেড়শ টাকার একটি কেরানীগিরি। বললেও তা তিনি পাবেন না। তিনি যা পারেন তা করেছেন। খবরের কাগজ দেখে দেখে বিভিন্ন অফিসে তাঁর উপযুক্ত পদের জন্যে চাকরির দরখাস্ত করেছেন। ইন্টারভিউর কল এলে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। আশ্চর্য তবু চাকরি হয়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন সেক্রেটারি কি ম্যানেজার কি পার্সন্যাল অফিসারের জন্যে লোক আগেই ঠিক হয়েছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন আর সাক্ষাতের আহ্বান নিতান্তই লোকদেখানো। বন্ধুবান্ধবের মারফত ভালো চাকরির খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছেন। খোঁজ পেলেও চাকরি পাননি।

মিতা রিতা গোপনে গোপনে টিউশনি করে। কিন্তু তাই বলে তো নিরঞ্জন চৌধুরী এই বয়সে কারো প্রাইভেট টিউটর হতে পারেন না। স্কুল কলেজের শেখা বিদ্যা সব ভুলে বসে আছেন। কাড়কে বিদ্যা দান করবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। কারো কাছ থেকে নতুন কোন বিদ্যা গ্রহণ করবার ক্ষমতাই কি তার আছে ?

অনেক অসৎ অসামাজিক বৃত্তি আছে। পকেটকাটা থেকে শুরু করে সিঁধকাটা গলাকাটা পর্যন্ত। ছুরি হাতে ছোরা হাতে শাবল হাতে অনেক কিছুই কাটাকুটি করা যায়। নিরঞ্জনের আপত্তি নেই। প্রাণ ধারণের জন্যে অসৎ হতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু চাইলেই কি তিনি তা পারবেন ? চোর গুণ্ডা পকেটমারের দলে গিয়ে আবেদন জানাতে পারবেন, 'আমাকে ভর্তি করে নাও।' বললেও তারা সঙ্গে সঙ্গে পত্রপাঠ বিদায় দেবে, 'আপনার দ্বারা হবে না মশাই। যে বেড়ালে ইঁদুর মারে তার গোঁফ দেখলে চেনা যায়। আপনার গোঁফ কোথায়।'

তাই পুরোপুরি সৎ হবার যেমন ক্ষমতা নেই নিরঞ্জন চৌধুরীর, পুরোপুরি অসৎ হওয়াও তেমনি তাঁর শক্তিবহির্ভূত। তিনি এমনই এক পাপী, স্বর্গ তাঁর দিকে ফিরে তাকায় না নরকও অবজ্ঞার হাসি হাসে।

আরো দু'তিনটি অফিসে হানা দিয়ে নিরঞ্জন বুঝতে পারলেন আজ আর সুবিধে হবে না। আজ পাঁজিতে অশ্লেষা মঘা কি ত্র্যহস্পর্শ কিছু একটা আছে। এসব আগে মানতেন না নিরঞ্জন। কিন্তু কতদিন আর না মেনে পারবেন ? দুর্ভাগ্য ঘাড় ধরে তাঁকে সব মানিয়ে নেবে। তাঁর আলোকপ্রাপ্তা উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী এরই মধ্যে গোপনে গোপনে শান্তিস্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করেছেন তা কি আর তিনি জানেন না ? কিন্তু একথাও জানেন কিছুতেই কিছু হবে না।

ছেলেবেলায় দুরন্তপনা করলে ঠাকুরমা বলতেন, 'তোর কাঁধে শনি চেপেছে।'

জীবনের এই অপরাহ্নে সেই শনিকে কাঁধে করেই কি ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিরঞ্জন ? মাহুত যেমন বিরাটকায় হাতিকে চালায় শনিও কি তেমনি তাঁর কাঁধে চেপে বসে বুকের ওপর দুই পা ঝুলিয়ে দিয়ে জুতোর ঠোক্করে ঠোক্করে তাঁকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন ? সেই ক্রূর নির্মম অশুভ শক্তির কাছে নিরঞ্জন অসহায়, সেই অমোঘ অনুজ্ঞার একান্ত আজ্ঞাবহ দাস। মাঝে মাঝে নিজেরই অবাক লাগে নিরঞ্জনের। খুব বড় রকমের পাপ না, ক্ষুদ্র এক দুর্বলতা। তবু সেই দুর্বলতাই তাঁকে কী ভাবে আচ্ছন্ন করে ধরেছে। ধার নিয়ে কোন বন্ধুকে তিনি ফাঁকি দিতে চাননি। প্রথম প্রথম ধার শোধ করবার চেষ্টা করেছেন। একজনের কাছ থেকে নিয়ে আর একজনকে দিয়েছেন। তাতে ধারের অঙ্ক কমেনি। শুধু উত্তমর্ণের নাম বদল হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন চলেনি। ধারের টাকা বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে মিথ্যাচার ছলনা প্রতারণা। অপমান লাঞ্ছনা, জীবনের দুর্বিষহতা। ক্ষুদ্র পাপে ক্ষুদ্র দুর্বলতা। কিন্তু তার শক্তি কী অমোঘ। এক এক সময় নিরঞ্জনের মনে হয় এই দুর্দম দানবীয় শক্তি যেন বাইরের কোন বস্তু। সেই অশুভ শক্তি প্রচণ্ড ধাক্কায় নিরঞ্জনকে জীবনের স্বর্ণচূড়া থেকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ফেলে দিয়েছে। সেই গহ্বর থেকে নিরঞ্জনের আর উঠে দাঁড়াবার উপায় নেই। কোন উপায় নেই।

জীবনের একটি সরল সহজ পথ তো সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। সেই পথরেখা কি নিরঞ্জনের মাঝে মাঝে চোখে পড়ে না ? আশেপাশে যারা আছে তাদের প্রীতি শ্রদ্ধা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা। এর চেয়ে কাঙ্ক্ষিত জীবন আর কি হতে পারে ? সেই পথেই তো জীবন শুরু করেছিলেন নিরঞ্জন। তারপর কখন যে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন তা তিনি নিজেও জানেন না। আর সেই রাজপথের পথিক হবার সাধ্য নেই। এখন গলি ঘুঁজিতে লুকিয়ে লুকিয়ে চলা। দিনভর রাতভর গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে জীবনের শেষ দিনটির প্রতীক্ষা করা।

বিকালের দিকে ধর্মতলার একটি রেস্টুরেন্টে চা নিয়ে বসলেন নিরঞ্জন। শুধু এক কাপ চায়ে অবশ্য এই আসন্ন সন্ধ্যার তৃষ্ণা মেটার নয়। কিন্তু যে পানীয় সব দুঃখ দৈন্য ব্যর্থতার গ্লানিকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও ভুলিয়ে রাখে আজ তা সংগ্রহ করবার সাধ্য নিরঞ্জনের নেই। টাকা নেই পকেটে। যখন সুদিন, অনেক বন্ধুকে শহরের সেরা বারে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়িত করেছেন। আজ তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার কেউ নেই। কারো হাত দিয়ে জল গলে না। সবাই টের পেয়েছে তিনি দ্যুতিহীন মৃত নক্ষত্র। ফের যদি জ্বলে না উঠতে পারেন তিনি আর কখনোই কারো চোখে পড়বেন না। তিনি চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন।

কিন্তু আর কিছু না হোক এই নিস্ফলা দিনে এক গ্লাস লাল জল যে তাঁর চাইই। সুরা আর অন্যান্য আনুসঙ্গিক এখন আর তাঁকে প্রত্যক্ষ কোন সুখ দেয় না। দু দণ্ড দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্যে তিনি উপকরণ হাতড়ে বেড়ান।

কার কাছে পাওয়া যায় ? কার কাছে হাত পাতা যায় ? পকেট ডায়েরিতে বহু আত্মীয় বন্ধু পরিচিত আধা পরিচিতদের নাম ঠিকানা, যাদের ফোন আছে, তাদের ফোন নম্বর নোট করা আছে। নিরঞ্জন পাতা উল্টে উল্টে প্রত্যেকটি নাম পরীক্ষা করে দেখেন। কিন্তু কোন নামই মনঃপূত হয় না। ভরসা করা যায় না কারো কাছে কিছু জুটবে। অতিপরিচয়ে বহু সম্পর্কই জীর্ণ হয়ে গেছে। তা ছাড়া নিরঞ্জন হাত পাতেননি এমন স্বজন বন্ধুর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। তাদের কার কাছেই বা হাত উপুড় করেছেন ?

পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটি নামের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল নিরঞ্জনের। সুলতা সমাদ্দার, দুর্গা পিতুরি লেন। এ নামটি পুরোন বছরের ডায়েরি থেকে নতুন বছরের ডায়েরিতে কেন তুলে

এনেছিলেন এখন আর তার কোন তাৎপর্য খুঁজে পান না নিরঞ্জন। প্রথম যৌবনে তারা আর সুলতারা একই পাড়ায় থাকতেন। বাড়ি ছিল পাশাপাশি। নিরঞ্জন কলেজে পড়তেন সুলতা স্কুলে যেত। যাতায়াতের পথে দেখা সাক্ষাৎ হত। কখনো বা একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি। দুই পরিবারের মধ্যে কিঞ্চিৎ হৃদ্যতা ছিল। যাতায়াত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ চলত। সুলতার বাবা মা মনে মনে অবশ্য কোন গোপন আশা পোষণ করতেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু নিরঞ্জন কোনদিন তাকে আমল দেননি। সাধারণ আলাপ পরিচয়। বড়জোর একটু ভালো লাগা। দেখলে খুশি হওয়া। তারপর ক্লাশ টেনে উঠতে না উঠতেই সুলতার বিয়ে হয়ে যায়। নিরঞ্জনরা শুধু বাড়িই নয় পাড়াও বদলালেন।

তারপর বহুকাল বাদে এক বিয়ে বাড়িতে সুলতার সঙ্গে দেখা। নিরঞ্জন সপরিবারে এসেছেন। সুলতার সঙ্গেও স্বামী-পুত্র। নিরঞ্জন স্ত্রীর সঙ্গে সুলতার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সুলতা চটুল স্বরে বলেছিল, 'আমাকে চিনবেন না বউদি। আমি যদি তেমন জোর করতাম আপনার হয়তো মিসেস চৌধুরী হওয়া কপালে ঘটত না।'

মনীষা হেসে বলেছিলেন, 'ভালোই তো।'

আড়ালে অবশ্য মেয়েটি সম্বন্ধে খুব প্রসন্নতার পরিচয় দেননি। ভ্রূ কুঁচকে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মেয়েটি কে বল তো। ভারি গায়েপড়া স্বভাব। কী সম্পর্ক ছিল তোমার সঙ্গে?'

নিরঞ্জন হেসে বলেছিলেন, 'পাড়াতুতো, তেমন আশঙ্কা করবার কিছু নেই।'

মনীষা বলেছিলেন, 'আমার আবার আশঙ্কা। সমুদ্রে যার শয়ন তার আবার শিশিরে ভয়। তবে তোমার যে বাছবিচার কিছু নেই, তা আমি জানি।'

সুলতাদের সঙ্গে সামাজিক স্তরভেদ যে বিস্তর তা সেদিন কিছুক্ষণের আলাপেই টের পেয়েছিলেন নিরঞ্জন। সুলতার স্বামী বিমলেন্দু সরকারী অফিসে সিনিয়ার গ্রেডের ক্লার্ক। ছেলে মেয়ে গুটিচারেক।

ক্ষীণ সম্পর্ক। তবু সেটুকু রাখবার জন্যে এমনকি বাড়াবার জন্যে সুলতার আগ্রহের সীমা ছিল না। সে নিরঞ্জনের ঠিকানা নিয়েছিল। নিজের ঠিকানা দিয়েছিল। বারবার করে অনুরোধ করেছিল, 'এসো কিন্তু একদিন।'

নিরঞ্জনের যাওয়া আর হয়নি। সুলতা কিন্তু যোগাযোগ রেখেছে। বছরে দুখানা করে পোস্টকার্ড সে লেখে। একখানা পয়লা কি দোসরা বৈশাখে আর একখানা বিজয়া দশমীর পর। সুলতা দাদা বউদিকে প্রণাম জানায়, ভাইপো ভাইঝিদের স্নেহাশীর্বাদ দেয়।

নিরঞ্জন কোন বার জবাব দেন কোন বার দেন না। মেয়েটি অতিমাত্রায় সামাজিক তাতে সন্দেহ কি। কিন্তু নিরঞ্জনের যখন সুদিন ছিল অনেকেই নিজের গরজে তাঁর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতেন। নিরঞ্জনের ঔদাসীন্যে তাঁদের অধ্যবসায় ক্ষুণ্ণ হত না। একটু দ্বিধান্বিত হলেন নিরঞ্জন। যাবেন কি যাবেন না? তার পর যাওয়াটাই স্থির করলেন। অন্তত এক কাপ চা তো জুটবে। আজ কঞ্জুস ভাগ্যের হাত দিয়ে এক ফোঁটা জলও গলেনি। দেখা যাক দুর্গা পিতুরি লেন তাঁর বরাতে আজ কী লেখে।

আবার সেই বাসের ভিড়। অফিসের কেরানীরা বাড়ি ফিরছে। নিরঞ্জনের অফিস ছিল না, এই মুহূর্তে বাড়িও তিনি ফিরছেন না। তবু ভিড়ের কষ্ট সহ্য করতেই হল। জনবহুল বাসে উঠতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন বেশি, দিলেন কম। তারপর বউবাজারের স্টপে নেমে পুবমুখে হাঁটতে লাগলেন। দু-একজনকে পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করতে হল।

গলির মধ্যে পশ্চিমমুখী একটি দোতলা পুরোন বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লেন নিরঞ্জন।

শ্যামবর্ণা একটি প্রৌঢ়া মহিলা দোর খুলে সামনে দাঁড়ালেন। মাথায় আঁচল ছিল না, আঁচল তুলে দিলেন। পরনে সাদাখোলের খয়েরি পাড়ের শাড়ি। আঁচলে চাবির রিং বাঁধা।

'ওমা তুমি নিরুদা! কী ভাগ্য।'

নিরঞ্জন বললেন, 'এতক্ষণ লাগল চিনতে।'

সুলতা বললেন, 'ওমা এতক্ষণ আর কই। আমি দেখামাত্রই চিনেছি। তুমি তো আর বদলাওনি নিরুদা চিনতে কেন কষ্ট হবে। সেই পাঁচ-বছর আগেও যা ছিলে এখনো তাই আছো। এসো ভিতরে এসো।'

নিরঞ্জন সুলতার পিছনে পিছনে যেতে যেতে বললেন, 'তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ।'

সুলতা বললেন, 'বুড়ি হয়ে গেছি তাই না?'

পুরুষ আর মেয়েমানুষ কি সমান? ছ'টি ছেলে মেয়ে হয়েছে। তার মধ্যে ভগবান আবার দুটি কেড়ে নিয়েছেন।

চুল পাকেনি দাঁত পড়েনি। তবু সারা মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। নিরঞ্জনের বান্ধবীর অবয়বে এখন প্রগাঢ় প্রৌঢ়ত্ব।

দোরগোড়ায় এসে জুতো খুলতে যাচ্ছিলেন নিরঞ্জন, সুলতা বললেন, 'জুতো নিয়েই এসো। আবার খুলছ কেন?'

ভিতরে ঢুকলেন নিরঞ্জন। একখানি মাত্র ঘর। জিনিসপত্র ঠাসা। খাট আলমারি, কাপড় রাখার আলনা। খাটের নিচে বাক্স পেঁটরা আরো কি সব আসবাবপত্র।

একদিকে একখানি পড়ার টেবিল। তার পাশে পালিশ উঠে যাওয়া কালো রঙের চেয়ার। চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন নিরঞ্জন। সুলতা বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, 'মীনা বীণা, দেখ এসে কে এসেছেন?'

দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। একটি কৈশোর-উত্তীর্ণা আর একটি এখনো কিশোরী। ওদের দেখলে পঁচিশ বছর আগের সুলতাকে মনে পড়ে।

সুলতা পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'জানিস কে? মামা হন তোদের। খুব বড়লোক। কত বড় অফিসার।'

মীনা বীণা ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করল।

নিরঞ্জন হেসে বললেন, 'ধুলো আর নিতে হবে না। পা তো জুতো মোজার মধ্যে। তোমাদের মা বার করতে দেয়নি।'

একটু বাদে কিশোর দুটি ছেলেকেও দেখতে পেলেন নিরঞ্জন। ওরা কোথায় খেলতে গিয়েছিল। পরনে হাফ প্যান্ট। গায়ে খাটো হাতার জামা। সে জামা ভিজে গেছে।

সুলতা বললেন, 'পিণ্টু রিণ্টু প্রণাম কর মামাকে। কত বড় মামা জানিস?'

নিরঞ্জন সস্নেহে ওদের পিঠে হাত রাখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কে কোন স্কুলে পড়ে।

সুলতা চা করতে বসলেন। তার আগে পিণ্টুকে ডেকে কানে কানে কী যেন বলে দিলেন। হাতে টাকা গুঁজে দিলেন একটা।

কয়েক মিনিট পরেই ঠোঙায় করে সিঙ্গাড়া আর মিষ্টি নিয়ে এল পিণ্টু।

তার আগে সুলতা নিরঞ্জনকে অনেক তথ্য জানিয়েছেন। এই একখানি মাত্র ঘরে ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করতে হয়। পাশে আলাদা রান্নাঘর আছে। তবে বাথরুমটা ভাগের। তিন ঘর ভাড়াটের সমান অংশ। দশ বছর হয়ে গেল এই বাড়িতে আছেন সুলতারা। এর মধ্যে অনেকবার বাড়ি বদলাবার কথা হয়েছে। কিন্তু বদলানো আর হয়ে ওঠেনি। বাড়ির কর্তাটি এসব ব্যাপারে একেবারেই অকর্মা মানুষ। তা ছাড়া ভদ্রলোক সময়ও পান না। অফিসের পর আবার দুটো টিউশনি আছে। সব সেরে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা।

প্লেটে সিঙ্গাড়া আর মিষ্টি ক'টি সাজিয়ে নিরঞ্জনের সামনে ধরে দিলেন সুলতা।

নিরঞ্জন বললেন, 'ওরে বাবা। এত কে খাবে।' সুলতার ছেলেমেয়েদের হাতে জোর করে একটি মিষ্টি কি সিঙ্গাড়া গুঁজে দিলেন নিরঞ্জন।

সুলতা বললেন, 'তুমি তো কিছুই খেলে না নিরুদা। সবই তো দিয়ে দিলে।'

নিরঞ্জন বললেন, 'এই তো চা খাচ্ছি।'

চায়ের একটি কাপ নিয়ে সুলতাও বসলেন সামনে। বললেন, 'বউদিকে কেন নিয়ে এলে না? আমরা গরীব বলে?'

·নিরঞ্জন বললেন, 'আচ্ছা আনব একদিন।'
সুলতা বললেন, 'একটা কথা নিরুদা। আমার একটি মামাত ভাই এবার বি· এ· পাশ করেছে। ছোট মামার সাধ্য নেই আর পড়ান। তার একটা চাকরি তোমার অফিসে করে দিতেই হবে।'
নিরঞ্জন একটু হেসে বললেন, 'চাকরি বাকরির যা বাজার আজকাল।'
সুলতা বললেন, 'বাজার যেমনি হোক তুমি বললেই একটা চাকরি হয়ে যাবে। তোমার কি পজিসন ওখানে আমি জানিনে বুঝি ?'
নিরঞ্জন প্রতিবাদ করেন না। স্মিতমুখে সব মেনে নেন। তাঁর সেই মৌনের মধ্যে সুলতা প্রত্যাশা পূরণের আশ্বাস পান।
একটু বাদে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ান, এবার বিদায় নেওয়ার পালা। হঠাৎ কী যেন তাঁর মনে পড়ে যায়। বুকপকেটে হাত দিয়েই আঁতকে উঠে বললেন, 'ঈস্, সব গেছে।'
সুলতা সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিস্মিত হয়ে বলেন, 'কী গেছে নিরুদা।'
নিরঞ্জন বললেন, 'ব্যাগটা বাসের ভিড়ে তুলে নিয়ে গেছে।'
সুলতা স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।
নিরঞ্জনও কি কম স্তম্ভিত হয়েছেন ! যেন তিনি নন, তাঁর ভিতর থেকে অন্য কেউ কথা বলছে। নিরঞ্জন সেই মিথ্যাচারীর মুখপাত্র মাত্র।
সুলতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা ছিল নিরুদা ?' নিরঞ্জন বললেন, 'শ' চারেক। আরো কিছু কাগজপত্র ছিল। সেগুলি আরো দরকারী।'
ছেলেমেয়েরা নিরঞ্জনকে ঘিরে দাঁড়াল। কোত্থেকে কোন বাসে আসছিলেন তারা সব জানতে চায়।
সুলতা বললেন, 'ঈস্, এই বাজারে অতগুলি টাকা। এখন বাড়ি ফিরবে কী করে।'
নিরঞ্জন বললেন, 'তাই তো ভাবছি। মাথাটা কেমন করছে।'
'তাহলে বাসে-টাসে গিয়ে আর দরকার নেই।' নিরঞ্জন বললেন,'ট্যাকসিতেই যাব। সুলতা গোটা দশেক টাকা দাও তো। যাওয়ার সময় একটা ওষুধ কিনে নিয়ে যাব।'
তারপর একটু হেসে বললেন, 'কালকেই পাঠিয়ে দেব।'
সুলতা বললেন, 'আহা, কাল না হয়, দু'দিন পরে দেবে। তাতে কী হয়েছে।'
নিরঞ্জনের দিকে পিছন ফিরে আলমারিটি খুলতে লাগলেন।
চারটি ছেলেমেয়ে কাঠের চারটি পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।
এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই নিরঞ্জন ট্রাউজারের পকেটে হাত দিলেন, 'আরে সুলতা শোন শোন। খুচরো কয়েকটা টাকা আলাদা করে রেখেছিলাম। সেগুলো যায়নি। আছে। এতেই আমার ট্যাকসি ভাড়া হয়ে যাবে।'
সুলতা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'হবে তো নিরুদা ? নাকি লজ্জা করছ ?'
নিরঞ্জন বললেন, 'না না না। ঠিক হয়ে যাবে।' তিনি বাইরের দিকে পা বাড়ালেন।
পিণ্টু রিণ্টু খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিল।
নিরঞ্জন তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তোমাদের আর আসতে হবে না।'
ওরা বলল, 'আপনি কিন্তু আর একদিন আসবেন।'
নিরঞ্জন ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন। তারপর দ্রুত পায়ে মোড়ের দিকে এগোতে লাগলেন। কেউ যেন তার পিছু নিয়েছে। তার হাত থেকে রেহাই পেতে চান নিরঞ্জন।
দক্ষিণগামী লাল রঙের বাস এসে দাঁড়াল। নিরঞ্জন ভিড় ঠেলে একেবারে দোতলায় উঠলেন।
একজন সহযাত্রী ধমক দিলেন, 'অত ছুটছেন কেন মশাই ? কেউ তাড়া করেছে নাকি ?'
নিরঞ্জন একটি বেঞ্চে জায়গা পেয়ে জানালার ধারে বসলেন।
যে সঙ্গে সঙ্গে আসছিল সে নিরঞ্জনের কাণ্ড দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগল।
তাকে নিরঞ্জন পিছনে দেখতে পেলেন না সামনে দেখতে পেলেন না, ডাইনে বাঁয়ে কোথাও দেখতে পেলেন না। দেখবেন কী করে ? সে ততক্ষণে ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। এক কোণে ঘুপটি

মেরে বসে আছে।

'আজ পালালে কিন্তু কাল ? কাল যাবে কোথায়। কাল আবার আমি তোমার হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দেব। নাকে দড়ি দিয়ে তোমাকে শহরময় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াব। যেখানে কোন আশা নেই তুমি সেখানেও যাবে। তুমি ছলনা করবে আর ছলিত হবে। বজ্রশূলে তুমি আমাকে বিঁধবে আমি তোমাকে বিঁধব। লৌহপেষণে তুমি আমাকে বাঁধবে আমি তোমাকে বাঁধব। আমাদের নাড়ীর বাঁধন ছেঁড়া কি এতই সোজা।'

বিষাদযোগ

বাসস্টপ থেকে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। খোয়া ছড়ানো রাস্তা। পথ মোটেই মসৃণ নয়। দুদিকে ছোট ছোট বাড়ি। টালিতে ছাওয়া, কোন কোন ঘরের ওপরে করোগেটেড টিনের চাল, পাকা বাড়িও আছে মাঝে মাঝে। আছে সেই মোষের খাটাল আর কচুরিপানায় ঢাকা ছোট বড় দু'তিনটি পুকুর। এগুতে এগুতে শুভেন্দু ভাবল বিজনদের শহীদনগরের টপোগ্রাফির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। কলোনীটি পাঁচ ছয় বছর আগেও যা ছিল এখনো প্রায় তেমনি আছে।

বিজুদের বাড়ি অবশ্য পাকাই। একতলায় খান তিনেক ঘর। সামনে উঠোন আছে। পশ্চিমদিকে শাকসবজী ফুলফলের বাগান। দেয়াল ঘেঁষে যে বেলের চারাটিকে উঠতে দেখে গিয়েছিল শুভেন্দু, তা এখন ডালপালায় ছড়ানো ফলন্ত বৃক্ষ। সবুজ সুগোল ফলগুলির দিকে শুভেন্দু মুগ্ধ চোখে তাকাল। বেল অবশ্য সে খেতে ভালোবাসে না। ক্বচিৎ কখনো খায়। বিজনের বাবা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে বারো মাস বেল খেতেন—তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। বাজার থেকেই কিনতেন অবশ্য। তখন নিজেদের বাড়িতে বেলের গাছ ছিল না। গতবার এসে তাঁকে আর দেখতে পায়নি শুভেন্দু। তিনি দেহরক্ষা করেছেন। মেসোমশাই শুভেন্দুকে খুব ভালোবাসতেন।

সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু কড়া নাড়ল। কে জানে বিজন বাড়িতে আছে কি নেই। ও যা সভাসমিতি মিছিলটিছিল করে বেড়ায় তাতে এই রবিবারের বিকালে বাড়িতে না থাকবারই কথা। শুভেন্দু আগে খবর দিয়ে আসেনি।

কিন্তু ভাগ্য ভালো দেখা হয়ে গেল। বিজন নিজেই এসে দোর খুলে সামনে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'আরে তুমি। কবে এলে রায়পুর থেকে।'

শুভেন্দু বলল, 'পরশু।'

বিজনদের কলোনীরও কোন পরিবর্তন হয়নি ওর নিজের শরীরও তেমনি বিশেষ কিছু বদলায়নি। শুভেন্দুর মনে হয় কলেজে পড়বার সময় বিজুর যে চেহারা ছিল এই দশ বছর বাদে আজও তেমনি আছে। ছোটোখাটো শরীর। পাঁচ ফুটের ওপর বড়জোর ইঞ্চি দেড়েক হবে দৈর্ঘ্যে। কিন্তু রোগা বলে ওকে বেঁটে মনে হয় না। বাইশ তেইশ বছরের পর বয়স যেন আর বাড়েনি। মুখে দাড়িগোঁফের চিহ্ন সামান্য। ও যেন আজও পূর্ণ যৌবনে পৌঁছায়নি। এই ক্ষীণ দুর্বল অপুষ্ট শরীর নিয়ে ও কী করে এত পরিশ্রম করে! অফিসে কাজ করে। বাকি সময় যায় রাজনীতিতে। ওর মনের জোর আছে বলতে হবে। ওর সঙ্গে সর্বদা যে মতের মিল হয় শুভেন্দুর তা নয় কিন্তু বন্ধুর মানসিক দৃঢ়তাকে সে সব সময় শ্রদ্ধা করে।

বাইরের বসবার ঘরটিতে সামান্য কিছু আসবাবপত্র। একখানি তক্তপোষ, খানকয়েক হাতলহীন চেয়ার, একটি আলমারিতে কিছু বই পত্রপত্রিকা। অল্পবয়সী গুটি তিনেক ছেলে বোধ হয় বিজনের জন্যেই অপেক্ষা করছে। বিজু তাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে কি যেন উপদেশ নির্দেশ দিল তারপর ওদের বিদায় দিয়ে ফের এসে বসল বন্ধুর সামনে।

শুভেন্দু হেসে বলল, 'কী ব্যাপার, বাইরের লোককে বুঝি বলা যায় না ?' বিজনও মৃদু হাসল, 'বলে লাভ কি বলো ? তার চেয়ে বল সুমিতা কেমন আছে ? ছেলের বয়স বোধ হয় বছর দুই হ'ল

তাই না ? কী যেন নাম রেখেছ ?'

শুভেন্দু হেসে বলল, 'তুমি মনে রাখতে পারবে না। তোমার ধারণা নিজের স্ত্রীপুত্র ছাড়া আর কোন ব্যাপারে আমার ইনটারেস্ট নেই।'

বিজন স্মিত মুখে বলল, 'ওসব কথা তুলে কি লাভ, দেশের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থ যেমন নিজের বউ ছেলে নিয়ে এক একটি করে দুনিয়া গড়ে তুলেছে তুমিও তাই। তোমার তো লজ্জার কিছু নেই।'

শুভেন্দু বন্ধুর দিকে তাকাল, তারপর হেসে বলল, 'আর তোমার নিজের বউ ছেলে হয়নি বলেই কোটি কোটি পরের বউ আর তাদের ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীদের ভাবনা তুমি কাঁধে নিয়ে বসে আছ। তোমার ওপর তিন ভুবনের ভার।'

বিজন বলল, 'তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই শুভেন্দু। একটু বসো। মাকে শিখাকে খবর দিই। নাকি তুমি যাবে ভিতরে ?'

শুভেন্দুর কেমন যেন মনে হ'ল তাকে চট করে ভিতরে নিয়ে যেতে যেন বিজন অনিচ্ছুক। এও কি মন্ত্রগুপ্তি না পারিবারিক প্রাইভেসি রক্ষা ? কিন্তু কলেজের সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে বিজনের সঙ্গে শুভেন্দুর বন্ধুত্ব। ভিতরে নিয়ে যেতে ওর এত অনিচ্ছা এর আগে শুভেন্দু দেখেনি। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হল শুভেন্দু। বলল, 'না না না, ভিতরে গিয়ে আর কি হবে ? মাসীমাকে খবর দাও। তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। আবার কবে আসা হবে। আর শিখা—'

বিজন একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'শিখার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ও শুয়ে আছে।'

শিখা বিজনের ছোট বোন। ওর সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানোটা মোটেই অসঙ্গত মনে হয় না শুভেন্দুর। শিখাকে ফ্রক পরতে দেখেছে শুভেন্দু। বাড়িতে থাকতে খুবই যাতায়াত ছিল, দুই পরিবারে খুবই হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ওর দুই দিদি রেখা আর লেখার সঙ্গে শিখাও আসত শুভেন্দুর বাড়িতে। ওর দিদিরা মোটামোটা উপন্যাস চেয়ে নিত। দিদিদের সঙ্গে ওর ছিল রেষারেষি। ও বলত, 'শুভদা, আমাকে গল্পের বই দেবেন না ?'

'কিসের গল্প ? ভূতের না রাক্ষসের ?'

গায়ের রঙ কালো শিখার। কিন্তু মুখশ্রী ভারি সুন্দর। টানা নাক। চোখ দুটি উজ্জ্বল। দেখলেই মনে হয় বেশ বুদ্ধিমতী। ওর দিদিদের বিয়ে হয়ে গেল। একজন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছিল আর একজন পেরোতে পারেনি। বিজুই চেষ্টা চরিত্র করে বিয়ে দিয়েছে। শিখা বি-এ পাশ করে স্কুলে মাষ্টারি করে। শুভেন্দু শুনেছিল ওরও বিয়ের সম্বন্ধটম্বন্ধ দেখা চলছে। শুভেন্দুর বউভাতে বিজু শিখাকে নিয়ে গিয়েছিল নিমন্ত্রণ রাখতে। বিজুর চেহারা বদলায়নি, কিন্তু শিখা অনেক বদলে গেছে। আরো লম্বা হয়েছে, আরো সুশ্রী। এ যেন শুধু দেহের যৌবনশ্রীই নয় সেই সঙ্গে আরো কিছু আছে।

শুভেন্দু হেসে বলেছিল, 'এ যে একেবারে লেডি হয়ে গেছিস। এত বড় হলি কবে ?'

শিখা বলেছিল, 'কী জানি, ক্যালেন্ডার তো দেখিনি। বউদি কিন্তু ভারি সুন্দর হয়েছে।' শুভেন্দু বলেছিল, 'তাই নাকি ? আমার তো মনে হচ্ছিল তোর বউদিকে যত লোক দেখেছে তার চেয়ে বেশি তোকে দেখেছে।'

শিখা লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'যান।' তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছিল, 'আপনি বড্ড ফাজিল হয়ে গেছেন। বিয়ে করলে মানুষ বুঝি এই রকম হয় ?'

সেই মধুর লজ্জা আর মধুরতর অনুযোগটুকু ভারি ভালো লেগেছিল শুভেন্দুর। তারপর বছর তিনেকের মধ্যে ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ওকে একটু দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল শুভেন্দুর। কিন্তু যে মেয়ে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে তাকে তো আর দেখতে চাওয়া যায় না। বিশেষ করে বিজুর যখন এত অনিচ্ছা। ভিতরের ঘর থেকে বিজুর মা বেরিয়ে এলেন, 'এই যে শুভেন্দু। কবে এসেছ ?'

মাসীমার চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেছে। পরনে সরু কালো পাড়ের সাদা খোলের আধময়লা শাড়ি। মুখে ম্লান হাসি। এই মহিলাটির কাছে কত স্নেহই না ছেলেবেলায় পেয়েছে—শুভেন্দুর মনে পড়ল।

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল শুভেন্দু। 'কেমন আছেন মাসীমা ?'

বিজুর মা একটু হেসে বললেন, 'আর বাবা আমাদের আর থাকাথাকি। দেখতেই তো পাচ্ছ

দিনকালের অবস্থা ।'

শুভেন্দু বলল, 'সত্যি মাসীমা কলকাতায় এসে দেখছি না এলেই ভালো হত. বোমা-বারুদ গুলি-গোলা লেগেই আছে । এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাওয়ার জো নেই । কখন কোথায় কি বিভ্রাট ঘটে । দেখেশুনে মনে হচ্ছে কলকাতা যেন এক পাগলের দুঃস্বপ্ন ।'

বিজন সামনের চেয়ারটায় বসেছিল । বন্ধুর কথা শুনে ফোঁস করে উঠল, 'স্বপ্ন নয় শুভেন্দু, কঠোর বাস্তব । বলতে পার ভয়ঙ্কর বাস্তব । কাল যবে জাগে তাকে সভয়ে অকাল কহে সবে । বহুদিনের অবিচার অব্যবস্থা গলদ আর গ্লানি জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে ।'

শুভেন্দু বলল, 'সেই পাহাড় বুঝি এখন আগ্নেয়গিরি ?'

মাসীমা বললেন, 'থাক বাবা ওসব তর্ক । দিনরাত তো এইসব নিয়েই আছি । আর ভালো লাগে না । মাঝে মাঝে ভাবি দুদিন কোথাও গিয়ে ঘুরে আসি ।'

শুভেন্দু বলল, 'চলুন না মাসীমা আমাদের রায়পুরে । আমাদের কোয়ার্টারে থাকবেন । বেশ ফাঁকা জায়গা । কোথাও কোন গোলমাল নেই । আপনার কোন অসুবিধে হবে না ।'

মাসীমা বললেন, 'ছেলের কাছে আবার অসুবিধে কিসের ? তুমি সেখানে ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি কর । বউমা আছে । আমার কি কোন থাকার জায়গার অভাব হবে ? সেজন্যে নয় ।'

'তবে ?'

মাসীমা বললেন, 'আমার দুটি পাগল ছেলে মেয়েকে ফেলে কোথায় যাব বাবা ? বউমা আর বাচ্চাটি ভালো আছে তো ? ওদের কতদিন দেখিনে ।'

শুভেন্দু বলল, 'ওরা গড়িয়াহাট পর্যন্ত এসেছে । সুমিতার কাকা আছে সেখানে । দেখা করে যাবে । একবার ভেবেছিলাম নিয়ে আসব । কিন্তু—'

মাসীমা বললেন, 'না বাবা না নিয়ে এসে ভালোই করেছ । ভাগ্যে যদি থাকে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ হবেই । তোমার আসাটাও আমার ভালো লাগছে না । চা-টা খেয়ে তুমি বরং সন্ধ্যার আগেই চলে যাও । যাই, তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি ।'

বিজু বলল, 'মা বড্ড প্যানিকি ।'

বিজুর মা ফিরে তাকালেন, 'প্যানিকি ! যা দেখলাম তার পরেও যে বেঁচে আছি—'

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে বিজু ?'

বিজু বলল, 'কিছু না ।'

তারপর আর কিছু না বলে গম্ভীরভাবে চুপ করে রইল ।

লম্বা চওড়া চেহারা নিয়েও এই ছোটখাট মানুষটির কাছে মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র বলে মনে হয় শুভেন্দুর । কলেজে সে পড়াশোনায় বিজুর চেয়ে ভালো ছিল, রেজাল্টও খারাপ করেনি । ভালো চাকরিও পেয়েছে । বাবা মা স্ত্রী পুত্র নিয়ে মোটামুটি সুখেই আছে শুভেন্দু । সেই তুলনায় শুরু থেকেই সংগ্রামের জীবন বিজনের । অসচ্ছল পরিবারে মানুষ । বাবা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সামান্য মাইনের কাজ করতেন । টিউশনি করে পড়ত বিজু । তা সত্ত্বেও রেজাল্ট ভালো করত । তখন থেকেই শুভেন্দুর মনে হত তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েও বিজু আলাদা । ও আড্ডা দেয় না, সিগারেট খায় না, ক্বচিৎ কখনো সিনেমা দেখে । যেটুকু সময় পায় পড়াশোনা করে । আর বসে বসে ভাবে । চোখের সামনে ও যেন কিছু একটা দেখে । নিজের কল্পনার পৃথিবীকে । শুভেন্দু ভেবেছিল ও বুঝি কবিতা লিখবে । কিন্তু তা লিখল না । ও পদ্য লিখল না গদ্য লিখল না । সায়ান্সের ছেলে, অথচ সেই বিজ্ঞানচর্চাও ছেড়ে দিল । ও নিজের পাড়ায় স্কুল গড়ল, যুব সমিতি গড়ে তুলল । সমাজের যে স্তরের মানুষকে শুভেন্দু দূর থেকে দেখে বিজু তাদের ভিতরে চলে গেল ।

শুভেন্দু একদিন বলেছিল, 'বিজু ম্যাথেম্যাটিকসে তোমার মত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে আমাদের মধ্যে আর কেউ ছিল না । তুমি তোমার সাবজেক্ট নিয়ে থাকলেই বোধহয় ভালো করতে ।'

বিজন মৃদু হেসে বলেছিল, 'আমি তো আমার সাবজেক্ট নিয়েই আছি ।'

শুভেন্দু ভাবত গণিত নয়, অগণিতের ভাবনা ওর মনে । সেই ভাবনা ভাবতে গিয়ে ও পারিবারিক দায়িত্ব অস্বীকার করেনি । বাবাকে সাহায্য করেছে, বোনদের সাধ্যমত লেখাপড়া শিখিয়ে

বিয়ে দিয়েছে। অমন বিপ্লবীও কতকগুলি পুরোন মূল্যবোধকে স্বীকার করে নিয়েছে। শুভেন্দুর একাধিক বন্ধু জীবনে সফল হয়েছে। কেউ বড় ব্যবসায়ী, কেউ বড় চাকুরে, কেউ বা গেছে লেখালেখির দিকে। কেউ বা শুধু একটি সুন্দরী নারীর ভালোবাসা পেয়েই খুশি হয়েছে। বিজু তাদের কারো মত হয়নি। ও প্রেম চায়নি, যশ চায়নি, অর্থ চায়নি। দলের মধ্যেও ও বোধহয় প্রধান কেউ নয়। তা হলে কাগজে ওর নাম ছাপা হত।

শুভেন্দু শ্রদ্ধা করে বিজনকে। যে শুধু নিজের জন্যে ভাবে না, দশজনের জন্য ভাবে, দশজনের কিছু না কিছু করে, আরো দশজনের শ্রদ্ধা সে পাবেই। কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে শুভেন্দু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি রাজনৈতিক কর্মী আর নেতা মাত্রেই অতিমানব? বহুমানবের সুখ দুঃখে তাঁদের হৃদয় আন্দোলিত? রাজনৈতিক চৈতন্যই একমাত্র চৈতন্য? রাজনৈতিক কর্মমাত্রই একমাত্র কর্ম? না কি লোকের আরো পাঁচটি কর্মপ্রবণতার মধ্যে এও একটি? বিজন মুখে খুব বিনয়ী। মনে মনে কিন্তু ওর প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' সব দলেরই তো ওই একই বাণী, একই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ছাড়া বোধহয় কাজ করা চলে না। এই অহঙ্কার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার ভিতরে ভিতরে মারেও।

মাসীমা তাদের দুজনের জন্যে চা আর খাবার নিয়ে এলেন। বিস্কুট আর দুটি করে সন্দেশ।

শুভেন্দু বলল, 'আবার এসব কেন মাসীমা?'

মাসীমা বললেন, 'খাও না বাবা, সবই আমার ঘরের তৈরি।'

শুভেন্দু বলল, 'বিজু কি একটা বিস্কুটের কারখানাও বসিয়েছে নাকি?'

মাসীমা হাসলেন, 'আমার কি আর সেই ভাগ্য বাবা? তোমার বন্ধুর কাণ্ডকারখানা অন্য রকম।'

শুভেন্দু আবার শিখার কথা তুলল, 'ওর কি অসুখ মাসীমা? উঠে এসে একবার দেখাই করতে পারল না। কবে আবার আসব তার তো ঠিক নেই। বলুন না ওকে।'

মাসীমা বললেন,'কী আর বলব বাবা। ওর মন বড্ড খারাপ। ঘরের বাইরে ওকে আনা যায় না। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না। চুপচাপ পড়ে আছে।'

শুভেন্দু বলল, 'কী হয়েছে মাসীমা?'

তিনি ছেলের দিকে তাকালেন।

বিজু বলল, 'তুমি ভিতরে যাও মা। আমি শুভকে সব বুঝিয়ে বলছি।'

মাসীমা আর কথা না বলে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন।

বিজন কোনদিনই বেশি কথার মানুষ নয়। আজও সংক্ষেপে শুভেন্দুর কৌতূহল নিবৃত্ত করল। 'খুব একটা দুঃখের ব্যাপার ঘটে গেছে ভাই। শিখা একটি ছেলেকে ভালোবাসত। খুব ব্রাইট বয়। হঠাৎ গোলমালের মধ্যে পড়ে মারা গেল। হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। বাঁচানো যায়নি।'

শুভেন্দু চুপ করে রইল। কখন যে সূর্য অস্ত গেছে, ঘরের মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে কারোরই খেয়াল নেই। শুধু ঘর নয় সারা বাড়ি, সারা কলোনীটা জুড়ে যেন অন্ধকারের রাজত্ব। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো সেই বেলের গাছটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা অপার্থিব ভূতুড়ে একটা কিছু কাঠামো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাধবীলতার গাছটাকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। ফুলগুলি অদৃশ্য।

শুভেন্দু উঠে দাঁড়াল। বলল, 'অন্ধকার হয়ে গেল বিজু। এবার চলি।'

বিজন বলল, 'দাঁড়াও আগে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে দিই।'

স্যুইচ টিপে আলো জ্বালল বিজন।

শুভেন্দু বলল, 'তোমাদের এই কলোনীতে তো ইলেকট্রিক লাইট ছিল না।'

বিজু একটু হেসে বলল, 'চেষ্টাচরিত্র করে আনতে হয়। সবই কি আর আপনা থেকে আসে? চল তোমাকে বড় রাস্তার মোড়ে বাস স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

শুভেন্দু বলল, 'কেন আবার অত কষ্ট করবে?'

হঠাৎ ভিতরের দরজা ঠেলে শিখা বাইরের ঘরে চলে এল, তারপর শুভেন্দুর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন শুভেন্দুদা আমি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

বিজন বোনের দিকে তাকাল, 'তুই যাবি?'

শিখা মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'হ্যাঁ দাদা, আমিই যাই।'
মাসীমা পিছনে পিছনে এসেছিলেন।
তিনি বললেন, 'বেরোবিই যদি শাড়িটা বদলে যা। আয় তোর চুলটা বেঁধে দিই।'
শিখা বলল,'না মা, ওসব কিছু দরকার নেই।'
আটপৌরে শাড়িখানা পরেই শিখা শুভেন্দুর সঙ্গে সঙ্গে চলল। পিঠ ভরে চুলের রাশ ছড়ানো। কতদিন যে চুলের যত্ন নেয় না কে জানে।
দুদিকে সারি সারি বাড়ি। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। কোন কোন বাড়ি থেকে রান্নার গন্ধ আসছে। কোথাও বা শিশুদের কলরব। কিন্তু শুভেন্দুর সঙ্গে যে তরুণী মেয়েটি চলেছে সে যেন এই লোকালয়ের কেউ নয়। আর একটি লোকান্তরিতের সঙ্গে সে কি অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে আছে? সে কি শুভেন্দুকে কোন কথা বলবে না? যদি নাই বলবে তবে সঙ্গে এল কেন?
বড় রাস্তার কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ শিখা কথা বলল, 'শুভেন্দুদা!'
'কি শিখা।'
'আমরা কেউ আর কাউকে বিশ্বাস করিনে। আমরা পাশাপাশি ঘরে থাকি। এক ঘরে দাদা আর এক ঘরে আমি আর মা। মা করে কি জানো? আমার হাতখানা তার হাতের মুঠিতে ধরে রাখে। সেই ছেলেবেলার মত আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়।'
শুভেন্দু বলল, 'কী যে বল। মাসীমা তোমাকে কত ভালোবাসেন।'
শিখা বলল, 'ভালোবাসে কিন্তু বিশ্বাস করে না।'
শুভেন্দু কী যে বলবে ভেবে পেল না। এক অসহায় অনির্দেশ্য বিষাদ তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। শোকার্তার পিঠে হাতখানা রেখে শুভেন্দু বাস ধরবার জন্যে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল।

কাঁটাতার

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে দীপা পার্কের দিকে তাকিয়ে ছিল। এ পাড়ায় আসা অবধি সে এই পার্কটিকে নানা সময়ে নানাভাবে দেখে আসছে। পার্কের ভিতর দিয়ে তার স্কুলে যাতায়াতের পথ। সে যখন পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে স্কুলে যায় কয়েকজন বুড়ো ভদ্রলোককে পার্কের চারদিকে রাউন্ড দিতে দেখে। আবার স্কুল ছুটির পর বেলা সাড়ে দশটায় কি এগারোটায় যখন বাড়ি ফেরে একদল ছেলেকে দেখে গাছতলায় বসে আড্ডা দিচ্ছে আর সিগারেট খাচ্ছে। ওদের মধ্যে বাজে ছেলেও আছে। কিন্তু কেউ তাদের কাছে আসতে সাহস পায় না। দূর থেকেই এটা ওটা মন্তব্য করে। কিন্তু দীপা নীলা আর কমলাদের কেউ ওসব গ্রাহ্য করে না।
পার্কের মধ্যে যে বড় একটি পুকুর আছে তাতে কেউ কেউ নাইতে নামে। কেউ বা সাঁতার কাটে কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। পার্কের শোভা সব চেয়ে বেশি হয় বিকালে আর সন্ধ্যা বেলায়। তখন পাড়ার সমস্ত লোক যেন পার্কে এসে জড় হয়। কেউ কেউ ঘুরে বেড়ায় কেউ কেউ বেঞ্চে বসে গল্প করে। যাদের নতুন বিয়ে হয়েছে তারা আসে। বিয়ে যাদের হয়নি তারাও ঘাসের পর পা ছড়িয়ে বসে গল্প করে। দীপার মনে হয় ওরা নিশ্চয়ই এ পাড়ার নয়। অন্য পাড়ার ছেলে মেয়ে বলেই এমন অসঙ্কোচে আসতে পারে, অমন কাছাকাছি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারে। চেনা মুখ দেখলেই লজ্জা। অচেনা মানুষ আর গাছপালা সমান।
আগে আগে নীলা মালা কমলার সঙ্গে বিকাল বেলায় দীপাও এই পার্কে বেড়াতে আসত। সবাই মিলে চাঁদা তুলে ফুচকা খেত আলুকাবলি খেত। কোন দিন বা চীনাবাদাম কি চানাচুরেই খুশি থাকত।
কিন্তু বছর দুই ধরে মা আর দীপাকে সন্ধ্যাবেলায় পার্কে যেতে দেন না। বলেন, 'না বাপু, এখন

বড় হয়ে গেছ এখন আর হুট হুট করে যেখানে সেখানে যাওয়া ভালো দেখায় না।'

বড় হওয়ায় সুখও যত আছে অসুবিধা অস্বস্তিও প্রায় ততটাই। নীলা আর মালার মা জেঠীমারাও ওদের ওই রকম শাসনে রাখেন।

দীপা বড় হয়েছে বইকি। দু বছর ধরে স্কুলে শাড়ি পরে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম পায়ে জড়িয়ে যেত, অস্বস্তি লাগত, এখন আর তেমন লাগে না। যদিও শাড়ি যে সব সময় পরে থাকে দীপা তা নয়, স্কুল থেকে বাড়িতে এসেই শাড়ি ছেড়ে ফ্রক পরে। মা-ই বলেন ফ্রক পরতে। শাড়ি পরতে দেখলে বাবা খুশি হন বেশি। হেসে বলেন, 'ঈস্ একেবারে লক্ষ্মী ঠাকরুণটি হয়েছিস যে।'

মা বলেন, 'লক্ষ্মী না আরো কিছু। মেয়ে তো নয় যেন একখানি ফোঁস মনসা। যেমন রাগ তেমনি জেদি। ঠিক একেবারে তোমার স্বভাব পেয়েছে।'

বাবা বলেন, 'স্বভাব আমার পায় পাক। কিন্তু আকার খানি যে তোমার পেয়েছে তাতেই আমি খুশি।'

মা বাবাকে ধমক দেন, 'বয়স বাড়ছে আর আক্কেল বুদ্ধি দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে তাই না ?'

দীপার সামনে বাবা যে ঠাট্টা তামাশা করেন মা তা পছন্দ করেন না। কারণ দীপা বড় হয়ে উঠছে। মা দেখতে সুন্দরী। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রং ফর্সা। সবাই বলে দীপা নাকি মায়ের মতই হয়েছে। একতলার মাসীমা বলেন, 'তুই তোর মার চেয়েও সুন্দরী হবি।'

মাসীমার বাবা মেয়ে জামাইর কাছে থাকেন। তাঁকে দাদু বলে ডাকে দীপা। দাদু বলেন, 'এই তো সেদিনও ঘাঘরা পরে ঘুরে বেড়াতিস, এরই মধ্যে ষোড়শী ভুবনেশ্বরী হয়ে উঠলি কবে ?'

দীপা বলে, 'তাতে আপনার কি দাদু।'

এই দাদুই সেদিন মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে এসে খবর দিলেন, 'দীপা তোদের পার্কের ভিতর দিয়ে স্কুলে যাওয়া বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেল।'

দীপা বলল, 'কেন দাদু ?'

'দেখিসনি পার্কের পশ্চিম দিকে মিলিটারি তাঁবু বসেছে ? দক্ষিণের মাঠ জুড়েও অগুণতি তাঁবু। যেন যুদ্ধ শিবির।'

দীপা বলল, 'আপনি কাছে গিয়েছিলেন দাদু ?'

দাদু ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, 'ওরে বাবা। চারিদিকে কাঁটাতাবের বেড়া। বেড়ার ওপাশে রাইফেল হাতে মূর্তিমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। সামনে গেলেই গুলি।'

দীপা হেসে বলল, 'দাদু, আপনি তো ভারি ভীতু !'

দাদু বললেন, 'তোর মত বীরঙ্গনা আর ক'জন ?'

দীপা বলল, 'আমি যদি ভিতরে গিয়ে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে আসতে পারি আমাকে কী দেবেন ?'

দাদু দীপার চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, 'টুকটুকে একটি বর এনে দেব।'

দীপা বলল, 'ধ্যেৎ বর কে চায় ?'

নীলা কমলাদের পাশের বাড়িতে থাকে। স্কুলে বেরোবার সময় নীলা বলল, 'দীপা পার্কের ভিতর দিয়ে যাবি, নাকি বাইরে দিয়ে যাবি ? ভিতরে মিলিটারি বসেছে জানিস !'

দীপা বলল, 'জানি। আমাদের দোতলা থেকে সব দেখা যায়। মিলিটারি বসে আমাদের কী করবে শুনি ?'

নীলা বলল, 'তোর সাহস আছে বাবা।'

কোন কোন ব্যাপারে সাহস নীলারও কম নেই। মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ও সিনেমায় যায় রেস্টুরন্টে খায়। কিন্তু দীপা তা নিয়ে আজ আর বন্ধুকে খোঁটা দিল না। রাস্তা পার হয়ে পার্কের ধার ঘেঁষে যে শিমূল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চোখ পড়ল দীপার।

অনেক উঁচু থেকে একটি ডাল একেবারে রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। কী ফুলই না ফুটেছে গাছটায়। একেবারে লালে লাল হয়ে গেছে।

পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে পার্কের ভিতরে ঢুকল দীপারা। একটু এগোতেই দেখতে পেল

ব্যাপারটা। ওমা সত্যিই তো পথ একেবারে বন্ধ। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। দীপার যে সাহস আছে সঙ্গিনীদের তা দেখাবার জন্যে সে একেবারে বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তিমান পাহারাদারও যেন দু এক পা এগিয়ে এল। ভারি সুন্দর চেহারা তো। দাদু যে সেই লাল টুকটুকে বরের কথা বলেছিলেন অনেকটা সেই রকমই। বাবার মতই ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা। সবুজ পোশাকে ঢাকা। কিসের পোশাক কে জানে। খাকি নাকি। হাতে রাইফেলটা লম্বালম্বিভাবে ঝোলানো। খাপ খোলা সাদা ধবধবে তরবারি থাকলে আরো কত সুন্দর মানাত। মাথায় রাজপুত্রের উষ্ণীষ নেই তার বদলে আছে একটি টুপি। কপালের আধখানি তাতে ঢাকা পড়েছে। তবু মুখের যতটা দেখা যায় ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। টানা নাক চোখ। দাড়ি গোঁফ কামানো লম্বাটে ধরনের সুশ্রী মুখ। পাতলা ঠোঁটে এক রত্তি সুখের হাসি লেগে রয়েছে। দেখে দেখে দীপার মনে হল পৃথিবীতে ভয়ের কোথাও কিছু নেই। সৈনিকের হাতে যে রাইফেলটি আছে সে যেন ভয়ঙ্কর কিছু নয়, দাদুর রূপো বাঁধানো শখের ছড়িটির মতই। শোভাবর্ধক।

নীলা পিছন থেকে ডাকল, 'এই আয়। স্কুলে লেট হয়ে যাবি যে।'

দীপা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে এল। সোজা পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ঘুর পথ খোলা। বাঁদিকে ঘুরে পুকুরের পুব পার দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুইমিং ক্লাবের বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে পশ্চিম মুখে খানিকটা এগোতে আবার সেই কাঁটাতারের বেড়া। কিন্তু তত দূর গেল না দীপারা। তার আগেই ক্যাকটাসের ঝোপটা ডাইনে রেখে রেলিং তুলে নেওয়া ফাঁকা জায়গা দিয়ে পীচ ঢালা চওড়া রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তারপর দক্ষিণ দিকে এগোতে এগোতে দেখতে পেল বাঁ দিকের মাঠ জুড়ে আবার সেই সৈন্যদের ছোট ছোট ছাউনি। মাঠের মধ্যে পার্কের ধারে মিলিটারি ট্রাক। বন্দুকধারী সৈন্যরা কেউ উঠছে কেউ নামছে। তাঁবুর ভিতরে কেউ ঢুকছে কেউ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কেউ লম্বা কেউ বেঁটে। কারো মুখে দাঁড়ি গোঁফের লেশ নেই কারো মুখে কালো চাপ দাড়ি।

কমলা বলল, 'এই দীপা, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়! দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!'

নীলা বলল, 'তোর যে চরণ আর সরছে না রে! তোর আঁচল সেই কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে গিয়েছিল না রে দীপা?'

'যাঃ ফাজিল কোথাকার।'

নীলা বলল, 'বড় দিদিমনির পারমিশন নিয়ে তুই কাল থেকে আবার ফ্রক পরে আসিস দীপা। শাড়ির ঝামেলা অনেক। পদে পদে পা জড়িয়ে যায়, কাঁটাতারে আঁচল আটকে যায়। কবে যে তুই মুখ থুবড়ে রাইফেলের বাঁটের ওপর পড়ে যাবি তার ঠিক নেই।'

দীপা বন্ধুকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুই থামতো তুবড়ীমুখী।'

খানিকটা এগিয়ে ওলাই চণ্ডীতলার গলি। দুদিকে গরু মোষের খাটাল। দুর্গন্ধের আর শেষ নেই। কিন্তু আর একটি গন্ধও আছে বাতাসে। পুরোন ভাঙ্গা বাড়িটার দেয়াল-ঘেঁষে আমগাছটার বহর যেন আরো বড় হয়ে উঠেছে। পাতাগুলি বোলে ঢেকে গেছে। তার শোভা যেন নতুন করে চোখে পড়ল দীপার।

স্কুলে ঢুকে ক্লাসের পর ক্লাস। বাংলার টিচার সুনেত্রাদির এই বছরই বিয়ে হয়েছে। সুন্দর মানিয়েছে সিঁথিতে সিঁদুর। অনেকদিন ধরেই তো মাষ্টারি করছেন সুনেত্রাদি। কিন্তু ওঁকে আগে এত সুন্দর দেখাত না। কথাবার্তায় এত মাধুর্য ছিল না যেন। তিনি বললেন, 'বসন্তকাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে আনবে।'

নীলা বলল, 'সুনেত্রাদি পার্কের মাঠে মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে দেখেছেন? তাঁবু সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেবেন না?'

নীলা দীপার দিকে আড়চোখে তাকাল। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল নীলা। আচ্ছা ফাজিল মেয়ে। ওর জারিজুরি যখন দীপা ভেঙ্গে দেবে তখন বুঝবে মজা।

লজিকের ক্লাস তেমন ভালো লাগে না দীপার, আজ কিন্তু বেশ লাগল। ইতিহাসের ক্লাসে মন

উধাও' হয়ে গেল পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার উপাখ্যানে। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর রণক্ষেত্রে দীপাও ঘুরে বেড়াতে লাগল। পৃথ্বীরাজের মুখখানা যেন চেনা চেনা। সদ্য দেখা জনৈক সৈনিকের মুখের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

ফেরার পথে সেই কাঁটাতারের বেড়ার সম্মুখ দিয়ে আর গেল না দীপা। নীলা আর কমলা ঠাট্টা করবে।

সন্ধ্যার পর একতলার দাদু ওপরে উঠে এলেন বাবার সঙ্গে গল্প করতে আর চা খেতে। পাড়া সম্পর্কে পাতানো দাদু। কিন্তু আপনজনের মতই ভালোবাসেন।

দাদু বললেন, 'নাঃ পার্কের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে। বেড়িয়ে আর সুখ নেই।'

বাবা বললেন, 'কেন মেসোমশাই।'

দাদু বললেন, 'আর বল কেন। আগে অবাধে চলাফেরা করতে পারতাম। সেই অভ্যাসে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়েছিলাম, রাইফেলধারী পাহারাদার কটমট করে তাকাল। গুলি করে দিলেই হল।'

দীপার বাবা বললেন, 'সত্যি এই মিলিটারি দিয়ে যে কী হবে আমি তো ভেবে পাইনে। এ কি সরাসরি যুদ্ধ ?'

দাদু বললেন, 'তা হলে তো অনেক ভালো ছিল। কে জানে আমরা হয়তো সেই যুদ্ধের দিকেই এগোচ্ছি।'

তারপর কলকাতায় এখনকার অবস্থা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হল। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক। দুজনের মধ্যে কখনো মতের মিল হয় কখনো বা হয় না।

দীপার মা বললেন, 'আর পারিনে মেসোমশাই। এবার আপনারা অন্য কথা বলুন। দু বেলা এই খুন জখমের আলোচনা আর বোমার আওয়াজ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। দীপা তুই এখানে বসে কী করছিস। যা, পড়তে যা। পড়াশোনা তো গোল্লায় গেছে—'

দীপা উঠে পাশের ঘরে চলে এল। পড়ার টেবিলে এসে বসল। কিন্তু মন যেন পড়ায় বসতে চায় না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রূপকথার রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়।

জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে পার্কটিকে দেখা যাচ্ছে। গাছপালার আড়ালে টিউবে নিওন লাইট জ্বলছে। ফাঁকে ফাঁকে তাঁবুগুলির অস্পষ্ট আভাস। আচ্ছা সেই সৈনিকটি কি এখনো সেখানে তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর পা ব্যথা হয় না ? বিরক্তি ধরে যায় না দিনভর অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে। দাদু বলছিলেন সৈন্যটি নাকি কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। দীপার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না। দাদু বানিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসেন। বড় বাড়াবাড়ি করেন। দীপা যে চোখ দেখেছে সে তো কটমট করে তাকাবার চোখ নয়। দাদু নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দেখেছেন।

খেয়ে দেয়ে শোবার পরেও পার্ক আর পার্কের ওই তাঁবুগুলি দীপার মন জুড়ে রইল। সেবার ওই পার্কের মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়েছিল। এমন ছোট ছোট তাঁবু নয়, মাঠ জোড়া বিরাট এক তাঁবু। বাবা-মার সঙ্গে সেই সার্কাসে বাঘসিংহের খেলা দেখতে গিয়েছিল দীপা। কিন্তু এবারকার এই তাঁবু যেন আরো রহস্যময়, আরো রোমাঞ্চকর। ভাবাই যায় না তাদের বাড়ির এত কাছে যুদ্ধশিবির বসেছে। যে কোন সময় অসংখ্য গুলির শব্দ শোনা যাবে। গুলিগুলি রাস্তা পেরিয়ে ছুটে ছুটে এদিকে চলে আসবে। আচ্ছা কত সৈন্য আছে ওদের। এক হাজার দেড় হাজার দু' হাজার ? দীপা ঠিক জানে না। নাকি এক অক্ষৌহিনী ? অক্ষৌহিনী কথাটি শুনতে বেশ ভালো। মহাভারতের যুদ্ধের কথা ভাবতে বেশ ভালো লাগে। কি ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু আমল, মোগল আমল এমন কি ইংরেজ আমলের যুদ্ধের কাহিনী পড়তেও ভালো লাগে। সেই সব যুদ্ধে কত লোক মারা গিয়েছিল কত ক্ষয় আর ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু দীপার যেন তাতে কিছু এসে যায়না। সব যেন রূপকথার আর মহাভারতের গল্পের মত। কিন্তু চোখের সামনে যেন ওই যুদ্ধবিগ্রহ না দেখতে হয় বাবা। রক্ত দেখতে দীপার বড় ভয় করে। অথচ কত রক্তারক্তি কাণ্ডই না হচ্ছে। নিজের চোখে ওই ধরনের

বীভৎস ব্যাপার এখনো কিছু দীপা দেখেনি তাই রক্ষা। দেখলে কী যে হত তা ভাবা যায় না। সেবার মেডিক্যাল কলেজের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল মেজোমামাকে দেখতে। তাঁর অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন হয়েছিল। হাত-পা বাঁধা সব রোগী। কেউ কাতরাচ্ছে, কেউ কোঁকাচ্ছে। ফিরে এসে সে কি গা বমি বমি দীপার। দু'দিনের মধ্যে ভালো করে খেতে পারেনি, ঘুমুতে পারেনি। সৈনিক তুমি বন্দুক হাতে করে দাঁড়িয়ে থেকো। বন্দুক ছুঁড়ে আর তোমার দরকার নেই। কারো গায়ে লাগলে সে বড় ব্যথা পাবে। মরে যেতেও পারে।

রাত্রে দীপা স্বপ্ন দেখল সে যেন এক সাদা-ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে। তরোয়াল হাতে আর একজন অশ্বারোহী তার সামনে। সেই রাজপুত্রের রূপের তুলনা হয় না। ঘোড়াটা ছুটছে তো ছুটছে। তার আর থামবার নাম নেই।

সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে দীপার ঘুম ভাঙল। জেগে উঠেও কি কম সুখ ? স্কুলে যাতায়াতের পথে দূর থেকে একটি মুখ সে এক পলকের জন্য দেখে যায়। যে চোখের দিকে সে তাকায় আশ্চর্য সেই চোখ দুটিরও দৃষ্টিশক্তি আছে। কী সুন্দর সেই শক্তি। শুধু দেখবার শক্তি,দেখবার ভঙ্গি। কী মধুর এই দেখার বদলে দেখা। এই পার্কের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে গাছপালা, ফুল, ফল, বাতাসে পুকুরের ছোট ছোট ঢেউ কত সুন্দর সুন্দর বস্তুই না দীপা দেখে। কিন্তু সবই একদিকের দেখা। সেও দেখছে ওরাও দেখছে তাতো আর হয় না। কোন চক্ষুষ্মানকে দেখার মত আনন্দ যেন আর নেই। সব চোখ অবশ্য দেখার মত নয়। কোন কোন বুড়োর লুব্ধ দৃষ্টি দু-একটি বকাটে অশালীন ছেলের তাকাবার ভঙ্গিতে দীপা ভ্রূ কুঁচকে শাসন করে। কিন্তু এমন একজোড়া চোখ যে পৃথিবীতে আছে তা কে জানত, যাকে আর শাসন করা যায় না, শাসন করতে ইচ্ছাও হয় না ?

স্কুল থেকে ফিরে এসে দীপা মাঝে মাঝে দেখতে পায় মা তখনো রান্না করছেন। একটা না একটা তরকারি মায়ের কড়াতে থাকবেই।

বইখাতা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দীপা মায়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়, 'অত কি রাঁধছ মা ? কত রাঁধছ ?'

মা বললেন, 'স্কুলের কাপড়েই চলে এলি ? যা শাড়ি বদলে আয়।'

দীপা হেসে বলল 'কেবল ধমক আর ধমক। তুমি কি ধমক ছাড়া কিছু জান না মা ? কী হয়েছে বলত ?'

মা বললেন, 'মনমেজাজ ভালো না বাপু। বলাই দত্ত লেন থেকে ছোড়দার ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে। এখনো ছাড়েনি। তোর মত নেচে নেচে যদি বেড়াতে পারতাম তাহলে আর কথা ছিল কি। চারদিকে খুনোখুনি কাণ্ড লেগেই আছে। ভালো লাগে না আর।'

মায়ের আপন ভাই নয় পিসতুতো ভাই। তাঁর ছেলে নির্মলদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। বোমা ছোঁড়াছুড়ির মধ্যে নাকি ছিল। শুনে কিছুক্ষণের জন্যে মন খারাপ হয়েছিল দীপার। কিন্তু বেশিক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকতে পারেনি। তাদের বাড়িতে নির্মলদার তো বেশি আসা যাওয়া ছিল না। কতটুকুই বা নির্মলদার সঙ্গে তার আলাপ। কিন্তু তবু তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, বেদম মার দিয়েছে বলে দুঃখ পাওয়া উচিত। দমদমে দুই দলের মধ্যে প্রায়ই খুনোখুনি হচ্ছে। আরো কত জায়গায় অল্প বয়সী সব ছেলেরা ছুরি খেয়ে মরছে গুলি খেয়ে মরছে। মারছে আর মরছে। দমদম তো বেশি দূর নয়।সেখানকার বোমার শব্দ শেষ রাত্রে দীপাদের বাড়ি থেকে শোনা যায়। দীপার দুঃখ পাওয়া উচিত, পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া উচিত।

তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে কাজল পরতে পরতে ঠোঁটে আলতো করে লিপস্টিকের ছোঁয়া লাগাতে লাগাতে দীপা নিজেকে শাসন করে, 'তোমার এত সুখী হওয়া উচিত নয়, এত সুখী হওয়া নিষ্ঠুরতা। স্কুলের দিদিমনিরাও তো সেই কথা বলেন। দেশের যা দিনকাল তাতে কারোরই বেশি আমোদপ্রমোদ করা উচিত নয়।'

দীপা ভাবে, 'সত্যি এত দুঃখকষ্টের মধ্যে আমার দুঃখিত না হওয়া অন্যায়। বাংলার দিদিমণি বলেন, সমবেদনা সহানুভূতি মানবীয় ধর্ম। ভগবান আমাকে সহানুভূতিশীলা কর। আমাকে দুঃখিত

হতে দাও। বাবার বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মা কত চিন্তা করেন। আমাকেও তেমনি চিন্তা করতে দাও। উদ্বিগ্ন হতে দাও। আমাকে বেশি সুখী কোরো না। এত সুখ নিয়ে আমি কী করব। এত সুখ কি মানুষের সহ্য হয়?'

বিকালে ছড়ি হাতে বেরোবার আগে দাদু একবার করে খোঁজ নিয়ে যান দীপার, 'কী গো দীপালীরানী আজ যে একবারে লাল টুকটুকে ফ্রক পরেছ।'

দাদুর মুখের দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথায় একরাশ পাকা চুল। রূপোর টোপরের মত দেখতে। শুধু চুলেই বুড়ো। চাল চলনে অত বুড়ো মনে হয় না।

দীপা হেসে বলে, 'আপনার ভালো লাগছে দাদু?'

দাদু বলেন, 'তা আবার বলতে? এখন তো সব লাল রঙেরই বাহার। শহরের রাস্তা ঘাট লালে লাল। রণজিৎ সিংহের মত ছেলেরা বলছে সব লাল হো জায়গা। কিন্তু রক্তকরবী, তোর ঘাঘরার রঙের মানে আলাদা।'

দীপা রাগ করে, 'আপনি ঘাঘরা বলেন কেন দাদু ফ্রক বলতে পারেন না?'

দাদু হেসে বলেন, 'ওই হল। ইংরেজী শব্দ মনে থাকে না। চারদিকে মৃত্যুতরঙ্গিনী ধারা। জীবনরঙ্গিনী শুধু তুই।'

দীপা বলে, 'দাদু, আমাকে যুদ্ধের বই এনে দেবেন বলেছিলেন। কই দিলেন না তো?'

দাদু বলেন, 'ভুলে গিয়েছি। দেব এনে।'

'হ্যাঁ, অবিশ্যি এনে দেবেন। আপনাকে আমি চা করে দেব. কফি করে খাওয়াব। আমি মার চেয়ে ভালো কফি করতে পারি। না দাদু?'

দাদু বলেন, 'ভুলে গিয়েছি। দেব এনে। সন্দেহ কি।'

আর কিছুই না। রোজ যাতায়াতের পথে একবার করে একজনের মুখের দিকে তাকানো। আর তার সঙ্গে প্রসন্ন দৃষ্টির বিনিময়। বাকি যা তা কল্পনায়। বাকি যা তা স্বপ্নে। বাকি যা তা নিজের ভালো লাগার মধ্যে। দীপার গুন গুন করে গান গাইতে ভালো লাগে, দাদুর কাছে বসে আবৃত্তি করতে ভালো লাগে, রোজ গোপনে গোপনে ডায়েরি লিখতে ভালো লাগে। জীবনটা যেন অগুণতি ভালো লাগায় ভরে উঠেছে। অথচ দীপা মাঝে মাঝে অনুভব করে তার এই ভালো লাগার সঙ্গে চারদিকের পরিবেশের যেন তেমন মিল নেই। অফিসে বাবার প্রমোশন হয়নি। তাঁকে ডিঙিয়ে আর একজনকে উঁচু আসনে বসানো হয়েছে তাই নিয়ে তাঁর মন খারাপ। মেজাজ প্রায়ই ভালো থাকে না। মার জিনিসপত্র কেনার খুব সখ। সাজানো গোছানো ভালোবাসেন। কিন্তু বাবার সাধ্যে তা কুলোয় না। তাই নিয়ে দুজনের ঝগড়া লেগেই আছ। ছেলেমানুষের মত ঝগড়া, একতলার মাসীমার দুটি ছেলেমেয়ে রণ্টু আর রীনা যেমন ঝগড়া করে এও তেমনি। তাছাড়া কাগজ খুললেই খুন জখমের খবর। কান পাতলেই বোমা আর গুলির শব্দ! কিন্তু এ যেন আর এক অবুঝ পৃথিবী যে সুখী হতে জানে না, সন্তুষ্ট হতে চায় না. ছোট মেয়ের মত কেবল পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে আর কোঁদল করে। তার সঙ্গে দীপার যেন কোন সম্পর্ক নেই। সে গোপনে গোপনে নিজের জন্যে একটি ভালো লাগার জগৎ গড়ে তুলেছে। না কি সে জগৎ নিজের থেকেই গড়ে উঠছে বেড়ে উঠছে। সে জগতের অধিবাসীর সংখ্যা কম নয়। সেখানে তার ক্লাসের সহপাঠিনী কয়েকটি বন্ধু আছে, ভালো ছাত্রী বলে দিদিমণিদের প্রশংসা আছে। দেখতে সুশ্রী বলে প্রতিবেশী যুবকদের মুগ্ধ দৃষ্টির অভিনন্দন আছে। আর সেই পৃথিবীতে এক নতুন নাগরিক এসে বাসা বেঁধেছে। সে কাঁটাতারের বেড়ায় বন্দী, সশস্ত্র প্রহরী। কিসের পাহারা কে জানে কাকে পাহারা দেয় কে জানে। মা যেমন দীপাকে পাহারা দেন, এক অদৃশ্য বেষ্টনীর মধ্যে আটকে রাখেন এও কি তেমনি? মায়ের সেই স্নেহ শাসনের বেড়া অবশ্য কাঁটার বেড়া নয় তবু দীপার মাঝে মাঝে মনে হয় একটু দূরে যেতে পারলে যেন ভালো হত। যেখানে মাও নেই বাবাও নেই চেনাজানা কেউ নেই তেমনি এক নতুন এক অপরিচিত দেশ থেকে ঘুরে আসতে পারলে মন্দ হত না।

দাদুও যাব যাব করেন। বলেন, 'তোর হাতের চা বোধহয় আর বেশীদিন খেতে পারব না দীপা।'

দীপা বলে, 'কেন দাদু?'

দাদু হেসে বলেন, 'মেয়ের বাড়িতে আর কতদিন পড়ে থাকব ?'

দীপা বলে, 'পেনসন নিয়ে বসে আছেন ! কী আর করবেন ।'

দাদু বলেন, 'সেই তো একেবারে ঠায় বসে আছি । ভাবছি শেষবারের মত একটু ঘোরাঘুরি করে দেখি ।'

'কোথায় যাবেন দাদু ?'

'যে দিকে দু চোখ যায় ।'

দীপা বলে, 'কী মজা ! দু চোখ তো অনেক দূর যায় দাদু ! নিয়ে যাবেন আমাকে সঙ্গে ?'

দাদু বলেন,'আধখানা শতাব্দী পরে জন্মালে তা নিতে পারতাম । কিন্তু এখন কি তুই আর আধ মিনিটের বেশি আমার সঙ্গে থাকবি ?'

দীপা বলে, 'কেন থাকব না দাদু ! নিয়েই দেখুন না ।'

তার যেন অফুরন্ত সময় অনন্ত ঐশ্বর্য ! সে উলুবনেও মুক্তা ছড়াতে পারে ।

তারপর সেদিন এক কাণ্ড ঘটল । নিটোল সুখের জগৎ প্রথম চিড় খেল দীপার ।

লজিকের ক্লাসে কাজল দিদিমণির সেদিন পড়াবার মন ছিল না । তার চেয়েও বেশি অমনোযোগীনী হয়েছিল ছাত্রীরা । ক্লাস ইলেভেনের মঞ্জুষার বিয়ে । টিচাররা সবাই নিমন্ত্রিত । ক্লাস টেনেরও যে কটি মেয়ের সঙ্গে মঞ্জুর ভাব আছে তাদের সে আলাদা চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে । দীপা তার সেই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর মধ্যে নেই । আছে নীলা । বিয়েতে কী উপকার দেওয়া যায় তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছিল ।

কাজল দিদিমণি বললেন, 'আজকাল আবার অল্প বয়সে বিয়ের চলন হচ্ছে দেখছি । সেই বাল্য বিবাহের যুগ বোধহয় আবার ফিরে এল ।'

নীলা বলল, 'দিদিমণি আমাদেব ক্লাসেও একটা বিয়ে বোধ হয় তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ।'

কাজলদি বললেন, 'তাই নাকি ? কার ?'

দীপা পাশের একটি বেঞ্চে বসেছিল । নীলা আড়চোখে তাকে দেখিয়ে দিল । তারপর হেসে বলল, 'ওর আবার সেপাই ছাড়া আর কাউকে পছন্দ নয় । সেদিন আমাকে বলেছিল বিয়ে যদি করি একজন সোলজারকে করব । সোলজারকে তো বাংলায় সেপাই বলে না দিদিমণি ? নাকি আজকাল হয়েছে জওয়ান ?'

ক্লাস সুদ্ধ মেয়েরা হেসে উঠল । কাজলদিও হাসলেন । হেসে বললেন, 'আমার মেয়ে তিলতিলেরও এই অবস্থা । চার বছর মাত্র বয়স । কিন্তু দারুণ পাকা । ফি মাসে একবার করে বর বদলায় । গয়লা কয়লাওয়ালাকে ডিভোর্স করে এখন সে ডাকপিওনের গলায় ববমাল্য পরিয়েছে । দীপা তোমার অ্যামবিশন আরো কিছু উঁচু হবে আশা করেছিলাম ।'

সারা ক্লাস আর একবার হাসিতে ফেটে পড়ল ।

দীপা রাগে দুঃখে স্তব্ধ হয়ে রইল । তার এতদিনের বন্ধু নীলা যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে দীপা কি ভাবতে পেরেছিল ? বয়সে তার চেয়ে দু বছরের বড় নীলা । দীপা তাকে দিদির মত দেখে । তার এই কাজ ? সে এমন করে তাকে ক্লাসের মধ্যে উপহাসের পাত্রী করে তুলল ?

ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে নীলা অবশ্য তারপর ফের দীপার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করল । বার বার করে ক্ষমা চাইল । কিন্তু দীপা আর ওকে আমল দিল না, ওর সঙ্গে কথাও বলল না । স্কুলে যাতায়াতের সময়ও সে ওদের এড়িয়ে চলতে লাগল । এক সঙ্গে এলেও সে হয় অনেক এগিয়ে যায়, না হয় পিছিয়ে থাকে । কিছুতেই আগের মত পাশাপাশি গল্প করতে করতে হাঁটে না ।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে বন্দুক নিয়ে যে সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকে সৈন্যদলে সে যে কোন পদের অধিকারী তা কি আর দীপা জানে ? নাকি জানবার কোন দরকার বোধ করেছে ? সে যে রূপকথার রাজপুত্র । তার জন্যে আছে রাজাধিরাজ স্বর্ণ সিংহাসন । কিন্তু আজ দীপার মনে হল সে হয়তো সত্যিই সেপাই শাস্ত্রীর চেয়ে বড় কিছু নয় । রাগ হল দীপার নিজের ওপর, রাগ হল বন্দুকধারী সেপাইয়ের ওপর, বিশ্ব সংসার দীপার ক্রোধে দগ্ধ হতে লাগল ।

মা বললেন, 'কী হল তোর ? এতদিন তো বেশ আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছিলি। হঠাৎ তোর মেজাজ বিগড়ে গেল কেন ? এটা ভাঙছিস ওটা ফেলছিস। ক্ষেপে গেলি কেন অমন করে ?' বাবা অনেকবার 'মামণি মা মণি' বলে ডাকলেন। কিন্তু দীপা সাড়া দিল না।

বাবা বললেন, 'মা ডাকে যখন সাড়া দিচ্ছে না এবার থেকে কিন্তু মাসি বলে ডাকতে শুরু করব।'

পদাবনতির আশঙ্কাও দীপাকে টলাতে পারল না।

দাদু বললেন, 'দিদি তোর কী হল বলত ? মনে হচ্ছে তুই যেন এক জগৎ জোড়া গোসা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিস ? দোর জানালা সব বন্ধ।'

পথ আটকে ধরলেন দাদু।

কিন্তু দীপা পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলল, 'যান সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।'

দাদু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিন চারদিনের মধ্যে দীপা আর সেই কাঁটাতারের বেড়ার কাছাকাছি গেল না। ঘুর পথে স্কুলে যেতে লাগল। ফিরতেও লাগল সেই পথে।

কিন্তু পঞ্চম দিনে আর পারল না। খুব ভোরে সেদিন স্কুলে বেরোল। আজ আর কেউ তার সঙ্গে নেই। যাঁরা মর্নিং ওয়াক করেন তাঁদের সংখ্যা কমে গেছে। দু একজন যাঁরা বেড়াচ্ছেন তাঁরা অনেক দূরে। কাঁটাতারের কাছে কেউ আসছেন না।

দীপা ভাবল আজ সে সাহস করে কথা বলবে। জিজ্ঞাসা করবে, 'আপনি এখানে কী চাকরি করেন ? আপনি এখানে কোন পোস্টে আছেন ?'

দীপার দৃঢ় বিশ্বাস এই চারুদর্শন সৈনিকটি বাঙ্গালী। তিনি তার সব কথা বুঝবেন। সব কথার জবাবও দেবেন। বেশি বলতে হবে না। তাঁর একটি দুটি কথাতেই দীপা সব বুঝতে পারবে।

দীপা কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কি ! কোথায় সেই স্মিতমুখ প্রসন্ন পরিচিত দৃষ্টি ? সেই চেনা সেনানীর বদলে কালো কুচকুচে চাপ-দাড়িওয়ালা মোটা সোটা এক শিখ জওয়ান বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দীপাকে দেখে সে কটমট করে তাকাল। তারপর হাতের ইশারায় দূরে সবে যেতে বলল।

দীপা দ্রুত পায়ে সেখান থেকে সরে এল। তার মনে হল শুধু নীলা নয় আজ সমস্ত পৃথিবী দীপার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বন্ধন

সন্ধ্যার পর বন্ধুর ড্রয়িংরুমে বসে গল্প করছিলেন অধ্যাপক সুধাবিন্দু দত্ত। তাঁর বন্ধু প্রিয়তোষ সেহানবিশ অবশ্য এখনো বাড়িতে ফেরেননি। হাজরা রোডে তাঁর চেম্বার। সেখানকার কাজ সেরে তিনি যাবেন নার্সিং হোমে, রাত দশটার আগে ফিরবেন না। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যাঁরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন তাঁদের আদর আপ্যায়ন অভ্যর্থনার ভার সুনন্দাই নেন আর সঙ্গে থাকে ওঁদের মেয়ে দীপা। বাবার বন্ধুরা তারও বন্ধু। ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এখন আর ওকে এই লেক রোডের বাড়িতে বড় একটা দেখতে পাননা সুধাবিন্দু। ও থাকে গিরিডিতে। সেখানে ওর স্বামী আর শ্বশুরের মাইকার বিজনেস আছে।

আজও দোর খুলে দিয়ে সুনন্দাই সুধাবিন্দুকে অভ্যর্থনা করেছেন। হেসে বলেছেন "আসুন আসুন। আপনি তো আজকাল আর আসনেই না।"

সুধাবিন্দু বললেন, "সে কি এই তো কয়েক মাস আগে নতুন মা আর নতুন দিদিমাকে কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে গেলাম। তারপরেও এসেছি।"

সুনন্দা হেসে বললেন, "এসেছেন। তবে আপনার আসা যাওয়া অনেক কমে গেছে। এসে তো

আর দীপাকে পান না। আজও সে বাড়িতে নেই। সিনেমায় গেছে। তবে ওর প্রতিনিধিকে রেখে গেছে।"

আঙুল দিয়ে তিনি দোলনাটা দেখিয়ে দিলেন। দোলনায় একটি ফুটফুটে মেয়ে ঘুমোচ্ছে।

সুধাবিন্দু সোফাটায় হেলান দিয়ে বসলেন। তারপর সুনন্দার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "আপনার ঘরে নতুন ফার্নিচার এসেছে দেখছি। দোলনাটি ভারি সুন্দর।"

সুনন্দা বললেন, "বাঃ রে। আপনি আমার নাতনির সুখ্যাতি না করে শুধু দোলনার সুখ্যাতি করছেন। দীপা শুনলে খুব চটে যেত। আপনার সঙ্গে কথাই বলত না।"

সুধাবিন্দু বললেন, "সুন্দরী তো হবেই। ওরা তো তিন জেনারেশন ধরেই সুন্দরী। আপনি মেয়ের কাছে হেরে গেছেন, নাতনির কাছে আরো হারবেন।"

সুনন্দা হেসে বললেন, "আমরা তো এই চাই, উত্তরপুরুষের কাছে আমরা তো হেরে যেতেই চাই।"

সুধাবিন্দু আস্তে আস্তে বললেন, "সব সময় যদি তা চাইতাম তাহলে আর দুঃখ ছিল না।"

সুনন্দা অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, "চা খাবেন না কফি?"

সুধাবিন্দু বললেন, "আপনার যা অভিরুচি। খাওয়াপরার ব্যাপারে আমার নিজের পছন্দ অপছন্দ বলে কিছু নেই। আমি আমার হস্টেসের ওপর সব ভার ছেড়ে দিই।"

সুনন্দা উঠে যেতে যেতে বললেন, "আপনি তাহলে নাতনিকে পাহারা দিন। আমি এক্ষুণি আসছি।"

সুনন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সুধাবিন্দু উঠে দোলনার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত শিশু স্বপ্নের মধ্যে হাসছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। ভাবলেন শিশুর হাসিতে রূপ ছাড়া আর কিছু নেই, বক্তব্য থাকার দরকার করে না। ফুলেরও কি রূপ ছাড়া কিছু আছে, কি শুদ্ধ সঙ্গীতের?

সুনন্দা ফিরে এসে মুগ্ধ সুধাবিন্দুকে দেখে মুখ টিপে হাসলেন, "এই যে ধরা পড়ে গেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে নাতনিকে দেখা হচ্ছে। আপনার বন্ধুও তাই করেন। লুকিয়ে লুকিয়ে আদর সোহাগ। পুরুষরা এত লুকোচুরিও জানে!"

সুধাবিন্দু বললেন, "আমি তো জানি ও-বিদ্যায় ছেলেরা মেয়েদের কাছে শিশু।"

দুজনে ফের এসে যার যার আসনে বসলেন। ছোট সোফাটায় সুধাবিন্দু, বড়টায় সুনন্দা। মাঝখানে সেন্টার টেবিল।

সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে ট্রেতে করে দু কাপ কফি নিয়ে এল।

সুনন্দা বললেন, "খান। শ্যামা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এরই মধ্যে সব কাজকর্ম শিখে নিয়েছে। দীপা বলছে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। মেয়েকে বলেছি তুই আমাকে নিয়ে য'। টুকরিকে আমিই রাখবটাখব। মেয়ে বলে বাবার কী দশা হবে? আজকালকার ছেলেমেয়ে কী ফাজিলই না হয়েছে।"

সুধাবিন্দু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "তা বটে।"

সুনন্দা বললেন, "আজ কিন্তু আপনাকে অনেকক্ষণ বসতে হবে। নটার আগেই এসে যাবে দীপা। এসে যদি শোনে আপনি তার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেছেন মেয়ে ভয়ানক রাগ করবে। আজকাল আর মেয়ে বেশি বেরোয় টেরোয় না। ঘোরাঘুরি বন্ধ, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করা, আড্ডা দেওয়া সব কমে গেছে। চিঠিপত্র লেখা, সাহিত্যচর্চা সব বাদ পড়েছে। এখন নিজের মেয়ে নিয়েই অস্থির। মর্ডার্ন মাদার। একেবারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মেয়েকে মানুষ করতে শুরু করেছে। আমি ওকে বলেছি তুই টুকরিকে লেবরেটরিতে রেখে দে। সায়েন্স পড়ে তো আর কিছু হল না মেয়ের ওপর দিয়েই এক্সপেরিমেন্ট চলুক।"

সুধাবিন্দু হাসলেন। একটু বাদে বললেন, "প্রিয়তোষবাবুর তো ফিরতে অনেক দেরি। সেই এগারটায়।"

সুনন্দা বললেন, "না না আজকাল আর অত দেরি করেন না, নাতনির টানে তাড়াতাড়িই ফিরে আসেন। আর সকালে যতক্ষণ থাকেন নাতনিকে কোল থেকে নামাতে চান না। ওই এখন গলার মালা।"

সুধাবিন্দু বললেন, "তাহলে সত্যিই এবার একটি সতীন এসেছে আপনার ঘরে।"

সুনন্দা একথার কোন জবাব না দিয়ে বললেন, "একটু বসুন। ওর খাবারটা নিয়ে আসি।"

ফীডিং বোতলটা পাশের ঘর থেকে নিয়ে এসে শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে গুঁজে দিয়ে হেসে বললেন, "যতদিন এখানে থাকে আমার এই নাতনিকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। ভারি দুষ্টু হয়েছে। স্কুলটা কাছে আছে তাই রক্ষা। কোনরকমে সেরে আসি। তারপর সারাদিন ওকে নিয়েই কাটে। সময়টা মন্দ কাটে না। এও এক ধরনের নেশা, কী বলুন?"

"নেশা? তা বলতে পারেন।"

সুনন্দা বললেন, "বুড়ো বয়সের অনেক দুঃখ। পথ দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ তাকিয়ে দেখে না। কেউ খোঁজখবর নেয় না। এই নাতিনাতনিরাই একমাত্র কম্পেনসেসন। কী বলুন!"

সুধাবিন্দু মৃদুস্বরে বললেন, "তা ঠিক।"

সুনন্দা বললেন, "আপনি যেন তেমন মন খুলে কথা বলছেন না। কী হয়েছে আপনার বলুন তো।"

সুধাবিন্দু বললেন, "কী আর হবে।"

"না না, সত্যি বলুন না কী হয়েছে। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি আপনি যেন খুব টায়ার্ড। কিছু মনে করবেন না। হঠাৎ যেন আপনার বয়স বেড়ে গেছে।"

সুধাবিন্দু একটু হেসে বললেন, "আমার বয়স তো বেড়েই আছে। আমি আপনাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়।"

সুনন্দা বললেন, "কিন্তু এতদিন তো মনে হতো আপনি আমার মেয়ের সমবয়সী।"

সুধাবিন্দু বললেন, "আপনার নাতনি যখন ষোড়শী সপ্তদশী হবে ততদিন যদি বেঁচে থাকি আমি ওরও সমবয়সী হব। কিন্তু সেই মায়াজাল কি দুচার মিনিটের বেশি থাকে?"

সুনন্দা ক্লান্ত বিষণ্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। তাঁদের পুরোন এই প্রবীণ বন্ধুটির কী হয়েছে বুঝতে চেষ্টা করলেন একটু। কিছু যে অনুমান না করলেন তাও নয়। যে পারিবারিক সুখে তিনি প্রসন্ন আনন্দিত, সেই গার্হস্থ্য অশান্তিই হয়তো তাঁদের বন্ধুকে এমন বিষণ্ণ বিরস করে তুলেছে।

সুনন্দা হেসে বললেন, "আমি প্রার্থনা করি আপনি ততদিন বেঁচে থাকুন। তখন আমিও নাতনির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামব। মেয়ের সঙ্গে লড়াইতে লজ্জা আছে কিন্তু নাতনির সঙ্গে যদি ছলাকলার প্রতিযোগিতায় যোগ দিই কেউ দোষ দিতে পারবে না। কী বলুন।"

তারপর কোলের শিশুটির দিকে মুখ নামিয়ে বললেন, "মহারাণী এবার জেগে উঠেছেন, দেখুন দেখুন। কিরকম করে তাকাচ্ছে দেখুন। আমার কুতকুতাক্ষী মানুষকে মজাবে ভাবাই যায় না।"

নাতনিকে একটু আদর করে নিয়ে তিনি হেসে অতিথির দিকে তাকালেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হলে কী হবে নয়নবাণে এখনো যে তিনি মোহ সৃষ্টি করতে পারেন সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তাঁর বর্ণ এখনো উজ্জ্বল গৌর, দীর্ঘ দেহাধার এখনো মেদ মাংসের বাহুল্যবর্জিত। যে যতই সমালোচনা করুক বসন ভূষণের বর্ণাঢ্যতায় তাঁর এখনো বৈরাগ্য আসেনি। দিদ্বিমা হয়েও পাড়ার যুবকদের কাছে তিনি এখনো দিদি বউদি এবং সভাসমিতি গানের জলসায় এবং আর্ট একজিবিশনে স্বচ্ছন্দচারিনী।

নাতনিকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এবার তিনি ওকে ভিতরের ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন।

সুধাবিন্দুর সামনে বসে সুনন্দা হেসে বললেন, "আপনারও তো দুই অভিজ্ঞতাই হয়েছে। ছেলের মুখও দেখছেন, নাতির মুখও দেখেছেন। বলুন তো কোন মুখ দেখে বেশি সুখ? মানুষ কাকে বেশি ভালোবাসে? ছেলেকে না নাতিকে?"

সুধাবিন্দু একটু চুপ করে থেকে বললেন, "শৈশবে ছেলের মুখও সুন্দর, নাতির মুখও সুন্দর। তখন কারো কাছেই আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যাশা বাড়ে। নাতির চেয়ে ছেলের কাছে অনেক আশা। আমাদের ভালোবাসা আশার সঙ্গে জড়ানো।"

"কিন্তু কার মুখ দেখে আনন্দ বেশি?"

সুধাবিন্দু বললেন, "নিশ্চয়ই নিজের ছেলের। ছেলের ছেলে বেশ খানিকটা দূরের।"

সুনন্দা হেসে বললেন, "কী জানি, আমি তো আমার মেয়েকে বলেছি আমি বাছা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব কিন্তু আমি আমার টুকরিকে ছেড়ে থাকতে পারব না। ওর জন্যে আমাকে গিরিডিতে উইক এন্ড করতে হবে।"

একটু ভেবে তিনি ফের সুধাবিন্দুর দিকে তাকালেন, "লোকে বলে নিষ্কাম ভালোবাসাই নাকি যথার্থ ভালোবাসা। তাই যদি হয় নাতি-নাতনিকে ভালোবাসাইতো ওজনে ভারি। তারই তো দাম বেশি।"

সুধাবিন্দু বললেন, "দাম কার বেশি জানিনে তবে ওজনে ভারি খাদভরা সোনাই। নিক্তি সেই সোনার ভারেই বেশি ঝুলে পড়ে। খাদ ছাড়া আমাদের অগাধ ভালোবাসা সম্ভব কি ?"

সুনন্দা বললেন, "কিন্তু খাদের ভালোবাসা যতই অগাধ হোক সে কি ধোপে টেঁকে ? ছেলে আপনার পছন্দমত হলে তবে তাকে আপনি ভালোবাসবেন। সে ভালোবাসা তো নিজেকেই ভালোবাসা।"

সুধাবিন্দু বললেন, "আপনি আমার সেজো ছেলের মত কথা বলছেন। সেও ওই কথা বলে। তুমি আমাকে ভালোবাসো না, তোমাকে ভালোবাসো। তুমি চাও আমি অবিকল তোমার প্রোটোটাইপ হই। আমি নিশ্চয়ই তা চাই না। তা সম্ভব নয়। তবে অবাধ্য, অননুগত, অকৃতজ্ঞ ছেলেকে ভালোবাসাও খুব কঠিন।"

সুনন্দা বললেন, "আপনি আপনার বাড়িঘরের কথা এত কম বলেন কিছুই তাঁদের সম্বন্ধে আমরা জানিনে। আপনি নিজে থেকে যখন কিছু বলেন না, জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। আজ যখন কথাটা উঠলই আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। আপনার কটি ছেলেমেয়ে সুধাবিন্দুবাবু ? তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি—"

সুধাবিন্দু বললেন, "চারটি ছেলে। মেয়ে নেই। আর সম্পর্ক ? আজকালকার দিনে বাপ আর ছেলের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক ঘরে ঘরে থাকে প্রায় সেইরকমই। খুব একটা নতুন কিছু নয়। তবে যে সত্য নির্বিশেষ তাও আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। মনে হয় সে অনুভূতি আমার একারই অনুভূতি। সুখে তীব্র, দুঃখে নির্মম।"

সুনন্দা বললেন, "ওভাবে শুনে আমারও তৃপ্তি হবে না, আপনারও মনের ভার হালকা হবে না। তার চেয়ে আপনি যদি বলেন কোন ছেলের কাছে আপনি কী চেয়েছিলেন কী পাননি কিংবা কোন বস্তু না চেয়েও পেয়েছেন তাহলে আমার বুঝতে সুবিধে হবে। আমি ধরতে পারব কোথায় আপনার ভুল, কোথায় তাদের ভুল। কোথায় আপনার দোষ, কোথায় তাদের ত্রুটি।"

সুধাবিন্দু একটু হাসলেন, "মানে আপনি আমার চারকুমার চরিত শুনতে চান। তাতে অনেক সময় লাগবে ! আমি তিনকুমারের কথা তিন লাইনে সেরে একটির কথা একটু বিস্তৃত করে বলব। তাতেই আপনি আমার মনের ভাব বুঝতে পারবেন। আমার বড় ছেলে বেশ কৃতী নাম করা ডাক্তার। এখন ক্যানাডায় আছে। সেখানেই বিয়ে থা করেছে। বিয়ে করেছে অবশ্য একটি বাঙালী মেয়েকেই। একটি ছেলেও হয়েছে। কিন্তু সবই আমার কাছে খবর। তাদের সঙ্গে আমার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখে। কিন্তু আমার মনে হয় সে চিঠি নিতান্তই ফর্মাল চিঠি। তাতে কারো অন্তরের স্পর্শ পাইনে। আমার প্রতিদিনের সুখ দুঃখের সঙ্গী এই ছেলে নয়। আমার চিন্তা ভাবনা বেদনা, দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড় সমস্যার কোন খোঁজখবরই সে রাখে না। সে তার নিজের জায়গায় স্বনামধন্য। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমার নামগন্ধও সেখানে উচ্চারিত হয় না। সেখানে তার খ্যাতি হয়েছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বাড়ি গাড়ি সব হয়েছে। আমি জানি সে আর দেশে ফিরবে না। চিঠিপত্রে মাঝে মাঝে যত ভরসাই দিক এদেশে সে আর বাস করতে আসবে না। এদেশ যদি মর্ত্য, সুবিধা-সুযোগ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রাচুর্যে সে দেশ স্বর্গ। অন্য দেশে নয়, সে যেন অন্য লোকে আছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সে যেন একটা আইডিয়া। বর্তমান মুহূর্তে বাস্তব কিছু নয়, অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের কল্পনা। আমার মনে হয় তার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। না হওয়াই সম্ভব। আমার অত টাকা নেই যে আমি সেই দূর দেশে যাব। তার

আসবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল অনিচ্ছা। প্রথম জীবনে আমার আয় খুব সামান্য ছিল। মফঃস্বলে প্রাইভেট কলেজে মাস্টারি করতাম। পুরো একশ টাকাও পেতাম না। টিউশনি করে ওই ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়িয়েছি। নিজে ভালো জামা কাপড় পরিনি, বেশি ভাড়ার বাড়িতে থাকিনি, ট্যাকসিতে উঠিনি। কদাচিৎ সিনেমা থিয়েটার দেখেছি। সে কি এই জন্যে ? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ওর কাছে আমি আর কিচ্ছু চাইনে। টাকা পয়সা জিনিসপত্তর কিচ্ছু নয়। শুধু ও এসে আমাকে জড়িয়ে ধরুক যেমন ছেলেবেলায় ধরত, শুধু ও এসে আমাকে বাবা বলে ডাকুক যেমন কাছে থাকতে ডাকত। কিন্তু তা হবার নয়। কারণ সে তা চায় না। সে ভাবতেই পারে না একটি বুভুক্ষু হৃদয় তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার স্পর্শের জন্যে কাতর হয়ে রয়েছে। একটি নয়, দুটি। তার মা'র কথা উল্লেখ না করলেও আপনি বুঝতে পারবেন।

আমার মেজো ছেলের অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়াব অবশ্য ভালো নয়। সে কোনরকমে বি এ পাশ করল। আমি তাকে এক বন্ধুর ফার্মে ঢুকিয়ে দিলাম। লেগে থাকলে সে এতদিনে বেশ উন্নতি করতে পারত। কিন্তু তা তার সইল না। চাকরি ছেড়ে সে আর দুজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায় নামল। আমাদের রক্তের মধ্যে ব্যবসা নেই। তিন পুরুষের মধ্যেও ব্যবসা বানিজ্যে কেউ হাত দেয়নি। ও পারবে কী করে ? ধারদেনার একটা বড় অংশই আমার ঘাড়ে পড়ল। অতিকষ্টে মিটিয়ে দিলাম। কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে ? ও যাতায়াত শুরু করল শেয়ার মার্কেটে। আরো যেসব জায়গায় ওর আনাগোনা শুরু হল আমি ভাবতেই পারিনি ও সেদিকে কখনো যাবে। আমরা তো আর ছেলেমেয়েদের লেবরেটরিতে রেখে মানুষ করতে পারিনে। বড় হওয়ার পর ছেলেকে বৃহৎ সংসারের মাঝখানে ছেড়ে দিতেই হয়। সে তার নিজের পছন্দমত সঙ্গী বেছে নেয়। তার জীবনের ধরন ধারণ কী করে যে আলাদা হয়ে যায় আমরা টেরও পাইনে। তার কীর্তি কাহিনী শুনে এক্কেক সময় চমকে উঠি। মনে হয় সে যেন আমাদের বাড়ির ছেলে নয়, বংশের ছেলে নয়। সে যেন অন্য কেউ। প্রথম প্রথম সে তার মার কাছ থেকে গোপনে গোপনে টাকা নিয়ে যেত। টের পেয়ে আমি সব বন্ধ করে দিলাম। স্ত্রীকে বললাম, 'তুমি ওকে সর্বনাশের পথে আর ঠেলে দিয়ো না'। অবশ্য দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন সে আমার পরিচয় দিয়ে আমার বন্ধুদের কাছে ধার করতে লাগল। কী লজ্জা। আমি তাকে ডেকে বললাম 'খবরদার তুই আর আমার পরিচয় দিবিনে।' সে বলল, 'তুমি ভেব না। সব ধার আমি নিজেই শোধ দিয়ে দেব। আমার নোট বুকে সব টোকা আছে। আপাতত একটু সুবিধার জন্যে তোমার নামটা শুধু ব্যবহার কবছি।'

আমি বলি, 'কে বলছে তোকে আমার নাম ব্যবহার করতে ?'

সে বলে, 'তুমি তো এত সত্যবাদী ! তোমার নামের জায়গায় অন্যের নাম বসিয়ে দিলে কি সত্যি কথা বলা হবে ? নাকি সত্যি সত্যিই তুমি তা সহ্য করতে পারবে ?'

তা ঠিক। ওকে আমি পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে কিন্তু অস্বীকার করতেই কি পারি ? ও যেন আমার অবচেতন মনের ছবি। বহু গোপন আকাঙ্ক্ষার বহিপ্রকাশ।

আমি আমার যে আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াই সব সময় আমি কি তার যোগ্য ? আমার কি মনে হয় না, তখন অন্য কেউ আমার কার্ড ব্যবহার করছে ? আমিই যদি মাঝে মাঝে জাল আমি হতে পারি আমার ছেলেই বা তা পারবে না কেন ?

ওর চালচলন আচার আচরণের সব খবর আমি পাইনি। রাখতেও যাইনে। ও কোনদিন বাড়িতে আসে কোনদিন আসে না। কোনদিন বা খুব বেশি রাত্রে আসে। অসময়টাই ওর সময়। এই নিয়ে অনেক ঝগড়াঝাটি বিবাদ বিসংবাদ হয়েছে। এখনো হয়। শেষ পর্যন্ত আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি। থাকুক ও নিজের মনে নিজের ধরনধারণ নিয়ে। আমার দিক থেকে এই অসহযোগে ও দুঃখিত নয়। বরং ওর অবাধ স্বাধীনতায় ও খুশি। ওর রকমসকম দেখে মনে হয় আমার অস্তিত্ব নেই। ইতিমধ্যেই আমি লোকান্তরিত হয়েছি।

আমার সেজো ছেলে ইনটেলেকচুয়াল। ও বিদেশী মার্চেন্ট অফিসে মোটা মাইনেতেই চাকরি করে। বাড়িতে খানদুই ঘর নিয়ে থাকে। সেই ঘরদু'খানাই ওর নিজের জগৎ। আর একটি অধিবাসিনীও সে জগতে এসেছে। ওর স্ত্রী। স্বনির্বাচিত। সেও চাকরি করে। বেশির ভাগ সময়

ওরা দুজন বাইরে বাইরে থাকে। বেশ বুঝতে পারি বাড়ির আবহাওয়া ওদের পছন্দ নয়। ওরা হাওয়া বদলের জন্যে তৈরি হচ্ছিল এমন সময় একটি বাচ্চা হল। ছেলেদের মা বললেন,'বাচ্চাটা আর একটু বড় হোক তারপর তোরা যাস।' ছেলে ভেবে চিন্তে মত বদলাল। মায়ের কথা শুনল। ছেলেও অফিসে যায় বউমাও অফিসে বেরোন। বাচ্চাটি আমাদের কাছে থাকে। সে আমাদের সঙ্গী। অবশ্য তার দেখাশোনার জন্যে বউমা আলাদা লোক রেখে দিয়েছেন। শাশুড়ীর খোঁটা যাতে শুনতে না হয়। তবু আমার স্ত্রী নাতির কাছে না এসে পারেন না। প্রাণের টানেই আসেন। আদর যত্ন সেবাশুশ্রূষা করেন। যদিও তাঁর লালনপালনের ধরনের সঙ্গে বউমার রুচির মিল নেই। এই নিয়ে মাঝে মাঝে খিটিমিটি বাধে। তবু ব্যাপারটা মোটামুটি সয়ে গেছে।

এই ছেলের সঙ্গেও আমার মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। ও আমার দিকে এমনভাবে তাকায় আমি যেন উনবিংশ কি অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ। বাপ নয়, পিতামহ কি প্রপিতামহ! ওর সাহিত্যরুচির সঙ্গে আমার মিল নেই, রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে আমার মিল নেই, সামাজিক রীতিনীতি আদবকায়দা কোন কিছুর সঙ্গে মিল নেই। আমরা মাঝে মাঝে মিলিত হই আমাদের বিরোধটা যে কত বড় তা অনুভব করবার জন্যে। কাছাকাছি এসে আমাদের ব্যবধানটা যে কত বেশি তা প্রত্যক্ষ করি। সঙ্গে সঙ্গে আরো দূরে ছিটকে সরে যাই। দিনের পর দিন আমাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে। আমার ছেলের চোখে আমি অতি মাত্রায় রক্ষণশীল, স্বৈরাচারের প্রতিভূ। সেই প্রতিভূকে বার বার ঘা দিয়ে তাকে আসন থেকে নামিয়ে এনে ও যেন বিশ্বসংসারের রূপ পালটে দেবে। ওর দিকে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে তাকাই আর ভাবি ওর সঙ্গে আমি কী করে অভিন্নতা বোধ করব? আমরা শুধু অন্নেই অভিন্ন। আর কোন দিক থেকে তো অভিন্ন নই। অথচ আত্মজের সঙ্গে সেই অভিন্নতা বোধই যদি না এল তাহলে কিসের আত্মীয়তা? আমি ওর স্পর্শ পেতে চাই, একান্তভাবে কাছে পেতে চাই যেমন ছেলেবেলায় পেতাম। কিন্তু কিছুতেই কাছে যেতে পারিনে। অল্প বয়সে ওর সুড়সুড়ি বোধটা বেশি ছিল। একটু ধরলেই ওর সারা গা রোমাঞ্চিত হত। এখন আমি কাছে গেলে ওর কৌতুক বোধে সুড়সুড়ি লাগে। কখনো কখনো বিরক্তও হয়। ও ওর সমবয়সী সমরুচি বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে এক আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। সে জগতে আমার প্রবেশের অধিকার নেই। আমি শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ওকে হিংসা করতে পারি, ঈর্ষা করতে পারি আর কিছু করার আমার সাধ্য নেই।

আমার স্ত্রী শুধু মাঝে মাঝে বলেন, 'কেন তুমি অমন করছ। বয়সের কালে তুমিও একদিন ওইরকমই ছিলে। ও অবিকল তোমার স্বভাব পেয়েছে।'

প্রমাণ হিসাবে তিনি আমার অতীত জীবন থেকে দুটি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। খুঁটিনাটি চালচলন আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেন। আমি প্রায় সেগুলি ভুলেই গেছি।

আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি সত্যিই কি তাই? আমার অতীতই কি আমার ভবিষ্যতে রূপান্তরিত?

কাছাকাছি থাকে বলে ছেলে আমার অনেক দুর্বলতার কথা জানে। সুযোগ পেলেই সে সেইদিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়। 'তোমারও যথেষ্ট উইকনেস আছে। তুমিও দেবচিবত্র নও।'

সেই মুহূর্তে আমার দানব হয়ে উঠতে ইচ্ছা করে!

'সে কথা তুমি বলবার কে? তুমি কি আমার বিবেক?'

আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করি। কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে, কখনো পরোক্ষে কখনো প্রত্যক্ষে। বেশির ভাগ সময় পরোক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যাই। ও যেন আমার দ্বিধাবিভক্ত সত্তার দ্বিতীয় সত্তা। কখনো আত্মসংগ্রাম কখনো আত্মজের সঙ্গে সংগ্রাম। শান্তি নেই। ও নিজেও খণ্ডিত। দিনের মধ্যে কতবার যে আত্মখণ্ডন করে তার ঠিক নেই। আমরা অখণ্ডতা চাই, অথচ মুহূর্তে মুহূর্তে নিজেদের চূর্ণবিচূর্ণ করি। আমাদের লড়াই আসলে নীতির নয়, আদর্শের নয়, লড়াই দুই অহংবোধের। আমার রক্ত থেকে আর এক রক্তবীজের জন্ম হয়েছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাই কখনো বা রক্তচক্ষু হই।

এই ব্যাকগ্রাউণ্ডে আমি নাতির মুখ দেখলাম। শিশুর সুন্দর মুখ। আমি তাকে আদর করি, কোলে তুলে নিই, বুকে চেপে ধরি। এ অভিজ্ঞতা যে আমার আরও হয়েছে তা কখনো কখনো মনে পড়ে।

বেশির ভাগ সময়ই ভুলে যাই । আমাদের সদ্যতম প্রণয় কি পূর্ব প্রণয়কে সব সময় মনে করিয়ে দেয় ? দেয় না । শিশুকে বুকে চাপতে চাপতে আমি মাঝে মাঝে ভাবি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে একাত্ম হবার ত্বকই কি প্রধান মাধ্যম ? যে ত্বক অন্য স্পর্শের জন্য সতৃষ্ণ, সেই ত্বকই শিশুর স্পর্শে পরিতৃপ্ত । শিশুর সেই অকারণ হাসি দেখতে দেখতে আমি এক এক সময় ভাবি, 'তোমার কাছে আমার শুধু আনন্দটুকুই পাওনা । তুমি আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না । তুমি দণ্ডধর হবার আগেই আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেব । অন্তত যাতে নিতে পারি সেই আমার কামনা ।'

আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে বলেন, 'তুমি না হয় উইপিং ফিলসফার । কিন্তু ওকে তো একটু হাসাতে পার । তোমার কোলে থাকলে ও হাসতে ভুলে যাবে, কথা বলতে শিখবে না । দাও ওকে আমার কাছে দাও ।' শিশু দোলনায় দোলে আর আমি তার কাছে মাঝে মাঝে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি । আমি ভাবি এমনি করে আরো চারটি শিশুকে আমি দুলতে দেখেছি । এত ভালো দোলনা হয়তো তাদের জোটেনি কিন্তু বাপমায়ের কোলে তারা আনন্দে দুলেছে । তারাও ছোট থেকে বড় হয়েছে । কিন্তু এখন তারা ভাবে তারা স্বয়ম্ভু । তাদের জন্যে কাউকে কিছু করতে হয়নি, আমরা যেটুকু করেছি তা যেন নিতান্তই জীবধর্ম । সেখানে ত্যাগ স্বীকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না ।

কিন্তু আমি সব সময় নিরাসক্ত থাকতে পারিনি । এই নতুন শিশু আমাকে টানে । আমি তার মধ্যে নিজের ছেলেদের শৈশব দেখি । কখনো বা কিছুই দেখিনে । আদরে সোহাগে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাই, নাকি নিজেই ভাসি । আর মনে মনে বলি, 'ন্যাড়া কতবার বেলতলায় যাবে ।'

তারপর যেমন হয় । সে ছেলের বাপের চাকরির জায়গার বদল হল । বাচ্চাকে নিয়ে ওরা চলে গেল দিল্লিতে । আরো একবার কষ্ট যন্ত্রণা বিরহ বেদনা, আসক্তির অশ্রু । অনুভব করলাম বুড়ো হয়েছি । আমি বালক আর বণিতার মধ্যবর্তী ।"

সুধাবিন্দু হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, "আটটা বেজে গেল এবার উঠি । ওদের বোধহয় ফিরতে আরো দেরি হবে ।"

সুনন্দা বললেন, "আর একটু বসুন । আপনি তো খাবার-টাবার কিছুই খেলেন না । আর এক কাপ চা খান । দীপা এবার এসে যাবে । আপনার ছোট ছেলের কথা তো বললেন না ।"

সুধাবিন্দু বললেন, "ছোটছেলের কথা খাটো গলায় বলতে হয় ।

তিনটি বড় হবার পর ছোটটিকেই আমি বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলাম । ফুটফুটে সুন্দর চেহারা । একটু বা মেয়েলি । মনে হত ও যেন আমার মেয়ের অভাব পূর্ণ করেছে । কাছে কাছে থাকে পাছে পাছে ফেরে । সব সময় সঙ্গী । এমন বাধ্য ছেলে আর হয় না । পড়াশোনায় ভালো । ইকনমিকসে অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেল বি. এ-তে । আমি তো ভেবেছিলাম এম.এ-তেও তাই পাবে । কিন্তু কী যে হল । পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে গেল । অমন শান্ত ভদ্র বিনয়ী । আমি ভেবেছিলাম ওকে আমি সবচেয়ে কাছে পাব । গোপনে গোপনে সে অন্য পথ নিল । আমার মতে তা বিপথ । কিন্তু হলে হবে কি । আমি তাকে বুঝিয়ে শুনিয়েও কিছু করতে পারিনি । সে এখন জেলে । মাসে একবার করে দেখতে যাই । সেদিন গিয়ে দেখি মারের চোটে ধনুকের মত বেঁকে গেছে তার দেহ । পালাবার চেষ্টা করেছিল সেই শাস্তি । ও যে কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে, কাজকর্ম করে খেতে পারবে আমার তো মনে হয় না । এদিকে আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে । গোপনে গোপনে বিয়ে করেছে ওর এক ক্লাসমেটকে । বাপের বাড়িতে বাধ্য হয়ে আছে । সেও তার কাছে এক কংস কারাগার ।"

সুধাবিন্দু একটু চুপ করে থেকে হাসলেন, "আমি ভাবি এই সাহস তার হল কোত্থেকে । চাকরি নেই বাকরি নেই বিয়ে করে বসল । যে আসক্তি দিয়ে সে তার আদর্শকে ভালোবেসেছে সেই আসক্তি দিয়ে একটি নারীকেও সে বুকে টেনে নিয়েছে । যেন মরবার আগে পৃথিবীর কাছে সব পাওনা পেয়ে যেতে চায় । তার মত আদর্শ আমার নেই । কিন্তু আসক্তি যে কী তা আমি জানি । তার আদর্শ আমার আদর্শ নয় । কিন্তু তার মৃত্যুযন্ত্রণা পুরোপুরি আমার ।

আর একটি জন্মের আভাসও পেয়েছি । মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা । দু একদিনের মধ্যেই নার্সিং হোমে যাবে ।"

সুনন্দা বললেন, "ওমা !"

সুধাবিন্দু এবার বেরোবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আজ চলি। দীপাকে বলবেন. প্রিয়তোষবাবুকেও বলবেন আমি এসেছিলাম।"

সুনন্দা বললেন, "আর একদিন আসবেন। এখন কি সোজা বাড়ি যাবেন ?"

সুধাবিন্দু বললেন, "না একটু ঘুরে যাব।"

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন সুনন্দা। তারপর হেসে ফের জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাতে কোথায় আবার ঘুরতে যাচ্ছেন ?"

সুধাবিন্দু সে কথার জবাব দিলেন না। মনে মনে ভাবলেন মেয়েদের কৌতূহল অফুরন্ত।

আকাশে খণ্ড চাঁদের রেখা। শান্ত স্তব্ধ ট্রাঙ্গুলার পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুধাবিন্দু ভাবলেন সুনন্দা হাসলেন কেন ? তিনি কি সন্দেহ করছেন সুধাবিন্দু আর এক বান্ধবীর ড্রয়িংরুমে যাচ্ছেন আড্ডা জমাতে ? নাকি তিনি যে ফার্ন রোডে আর একটি কুমারসম্ভবের সংবাদ নিতে যাচ্ছেন তাও এই মাতামহীর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে ?